অনন্ত দ্রাঘিমা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শঙ্কর প্রকাশন ॥ কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : জন্মাষ্টমী, ১৩৬৬

শঙ্কর প্রকাশন, ১৫/১এ, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে
নিতাই মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও শঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২৬১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে
গৌর মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত।
প্রচ্ছদ : ইন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী, প্রিয় মানুষ

খাটো ধুতি হাঁটুর উপর চড়ানো, চুনারাম বাঁধের উপর উঠে এসে পিছন ফিরে তাকাল। যার হড়বড়িয়ে চনমনে ফড়িংয়ের মতো উড়ে বেড়ানোর কথা সেই রঘুনাথ হাঁপু ধরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে চুনারামের দিকে। আজকালকার ছেলেপুলেদের গায়ে তেমন জোর নেই, বালিছাতুর চেয়ে পলকা ওদের গতর, চুনারাম মোটা ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে কিছুটা নেমে এসে হাত বাড়িয়ে দিল, ধর দাদু, উঠে আয়। হা-দেখ, বেলা কেমন বাড়চে। কখুন পৌঁছাব ক' তো? চিন্তাটা চুনারামের একার নয়, এর সঙ্গে দুর্গামণির ভাবনাটাও দুধে-ঘোলে মিশে আছে। গুয়ারাম মাসের উপর ঘরছাড়া। গাঙ পেরিয়ে সে চলে গিয়েছে চাষের কাজে। প্রথম বর্ষায় এই ঝুঁকি নিয়ে ঘর ছাড়া তার উচিত হয়নি। শুধু দুর্গামণি নয়—চুনারামও বুঝিয়েছিল, যাসনি বেটা। মাটি হারালে দুঃখু বাড়ে। কথাটা মনে রাখিস। গরিবের কথা বাসি হলে কাজে লাগবে। বরাবরই একগুঁয়ে গুয়ারাম। নিজে যা বুঝবে সেটাই মক্কা-মদিনা, ছোট বড়কে তত বিশেষ পাত্তা দেয় না। দুর্গামণি অভিমান করে-মুখ ফোলায়, অত জেদ ভালো নয় গো, জেদ বুনো-মানুষকে ঝোড়-জঙ্গলে খেদিয়ে নিয়ে যায়। মাথা সামলাও, না হলে ঠকবে।

—মেলা খ্যাচরম্যাচর করো না তো, ভাল্ লাগে না। গুয়ারামের সব কথাতেই বিরক্তি। এই সংসারের কোনো কিছুই বুঝি তার ভালো লাগে না। মন মতো কথা না হলে বিরক্তিতে সে চাপানদী। মুখটা কুয়াশার গভীরে ঢুকে যায়। ধুতি সামলে পানসে হেসে চুনারাম রঘুনাথের দিকে তাকাল, কিরে, উঠে আয় দাদু। বেলা চড়চে, সে খেয়াল কি তুর আচে। সময়ে ঘর না গেলে তুর মা কি বলবে বল তো!

—কি আর বলবে, খেতে টুকে দেরি হবে। চোখ নাচিয়ে রঘুনাথ রগড় করে হাসল। ওর সারা গায়ে ধুলোভর্তি, তবু রোদ যেন পিছলে যায় ওর মাগুর মাছের গতর থেকে। ঝাঁকড়া মাথায় কুঁকড়ে আছে ওর মোটা মোটা কুচকুচে চুলগুলো। একেবারে দুর্গামণির মুখটা যেন বসানো, হাসিটাও ছাঁচের সন্দেশের মতো! চুনারাম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, হতাশায় প্যানপেনিয়ে উঠল গলা, তুর জন্যি আর পারি না, আমারই ভুল হয়েচে তুরে সাথে করে নিয়ে আসা। এবার রাগে ফোঁস করে উঠল রঘুনাথ, নিয়ে এসেচো মানে? আমি কি তুমার ঘাড়ে চেপে এসেচি নাকি? আমি এসেচি-নিজের পায়ে। চরণবাবুর ট্যাকসি বোঝো? কিচু বোঝো না তুমি! বুড়া মানুষ...ছ্যা...!

—হ অ। আমি বুঝিনি, তুই সব বুঝিস? তাচ্ছিল্যে ঠোঁট বেঁকে গেল চুনারামের, তবু বেশ ভালো লাগছিল তার। একমাত্র নাতি বলে কথা। লোকে বলে আসলের চাইতে সুদ মিষ্টি। কথাটা মন্দ বলে না। কত মানত করার পর রঘু এল। গুয়ারামের খুশি আর ধরে না। দৌড়ে এসে খবর দিল, খোকা হয়েচে বাবা, যাক এবার আটকুড়া অপবাদটা ঘুচল! চুনারামও খুশি হয়েছিল সে দিন। দোক্তা পান মুখে পুরে সে বিভোর হয়ে গিয়েছিল সুখে। ছেলের সুখ মানে তো তার সুখ। এই বয়সে এর চেয়ে আর কি চাই? শুধু লজ্জাবতীর জন্য দুঃখ হয়। সে এসব দেখে যেতে পারল না। তার ভাগ্যটাই ফোঁপরা, পোকায় কাটা, খরার আকাশ। রঘুর সাথে লড়তে খারাপ লাগে না চুনারামের। আর রঘুও সব সময় ওর পেছনে লেগে আছে। দাদু, এটা করে দাও, সেটা করে দাও। হেন-তেন সাত-সতেরো ফরমাশ। ঘরটা আলো করে আছে ছেলেটা। চুনারামের

মান-অভিমান সব কিছু এখন এই নাতির উপর। রঘু সেটা বোঝে কিনা কে জানে। চুনারাম বাঁধের ঢালু পথ বেয়ে নেমে গেল সরসরিয়ে, রঘুনাথের হাত ধরে বলল, আর খুপড়িটা তেতিয়ে দিস নে, এবার চল। হা-দেখ কেমন চড়া রোদ উঠেচে, মনে হচ্ছে মাথার ঘিলু শুকিয়ে দেবে। চুনারাম খটখটে আকাশের দিকে তাকাল। চারদিকে কড়া রোদের হিলহিলানো সাপ নাচছে। গায়ে ছ্যাঁকা দেওয়া ফোঁসফোঁসানী হাওয়া! সেই বিষে চড়বড় করে চামড়া, গলা শুকায়, টান ধরে পেটে।

আর জেদ ধরে থাকা উচিত নয়! রঘুনাথ দু'হাতে ধুলো জেবড়ে উঠে দাঁড়ায়। এই সামান্য চড়াই উঠতে তার কিছু যায় আসে না। শুধু বুড়াটাকে তাতানোর জন্য তার এই মনগড়া নাটক। রঘুনাথ চুনারামকে খুশি করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ধরো গো! আর পারচি নে। বয়স হল, মাজা পড়লো-আর কতকাল এই শরীলটাকে ঠেলব?

—মারব দুই থাপ্পড়, ইরকি হচ্ছে? চুনারামও নাটকে ওস্তাদ, ডান হাত উঠিয়ে সে ভঙ্গি করে দাঁড়ায়। রঘু তার ভঙ্গি দেখে বাঁধের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িগাঙের মতো খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। এক দমে জগৎখালি বাঁধের উপর উঠে এসে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সে ঠাট্টা করে বলে, দেখলে তুমারে কেমন ঘাবড়ে দিলাম। আমার সাথে লড়তে এসো না, হেরে যাবে।

হঅ, হঅ। হারবা তো হারবা। চুনারাম বুক হালকা করে শ্বাস ছাড়ল, এবার চল দেখি ঝটপট। নালফুল তুলতে হবে। তুই পারবি তো দাদু?

—পারব না মানে, ঢের পারব।

—আমি কিন্তু জলে নামবনি। কাল আমার ঘুসঘুসিয়া জ্বর এয়েচিল। রাতভর জ্বরের ঠেলায় কুঁকড়ে-মুকড়ে পড়ে ছিলাম। ভোরের আলো ফুটতে শরীরটা টুকে হালকা হল। চুনারাম রঘুনাথের পাশাপাশি হাঁটছিল। নাতির মন পাওয়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু অন্যপ্রান্ত অসাড় দেখে তার কথা বলার ইচ্ছেটাই শ্মশানমুখো হয়ে গেল।

এ সময় বাঁধের ধারটা বেশ জমজমাট, ধুলো মেখে ঝোপঝাড়গুলো বেশ স্ফূর্তিবাজ, সেই সঙ্গে রোদের সাথে মালাম লড়ায় ব্যস্ত। চাপড়াঘাসের শেষ যেখানে সেখান থেকে শুরু হয়েছে টলটলে জল, এখন স্রোতহীন বুড়িগাঙ লম্বা-দিঘির গতর নিয়ে চিতিয়ে-কেতিয়ে আকাশ দেখে হরদম। অথচ বর্ষার মাঝামাঝি এর দাপট, চোটপাট, গতি-গর্জন দেখলে শুকিয়ে যায় কলজে, ভয়-তরাসে বুকটা গেছো ব্যাঙের মতো লাফায়। এই বুড়িগাঙ তখন দশ গুণ চেহারা নিয়ে ভাঙতে আসে ঘর, শুধু ঘর ভাঙে না জলের তোড়ে কাঁদিয়ে ছাড়ে চারপাশ। এখন গো-বেচারা, বুঝি ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না।

বুনো পাড়ার মুড়োতে ঝাঁকড়া অশোত্থ গাছের ছায়া। গেল বছর এখানে একটা সবজে রঙের টিউকল বসিয়েছে সরকার। তার আগে বেশির ভাগ বুনো পাড়ার লোকে জল খেত বুড়িগাঙের, যাদের ভাগ্য ভালো তারা যেত গাঁয়ের বারোয়ারি কুয়োটায় জল আনতে। দড়ি-বালতি সেখানে ধপাস করে ফেলে দিয়ে জল তোল। খ্যাচাকলের ঘটাং ঘটাং শব্দ, পেশির টানে জলভরা বালতি উঠবে উপরপানে, কষ্ট বলতে চরম কষ্ট। তবু দুর্গামণি যেত মাটির কলসী নিয়ে, লাইন দিয়ে জল আনত। পাড়ার বউ-ঝিউড়িদের টীকা-টিপ্পনী কানে আসত তার। ভালো লাগত না পরনিন্দা পরচর্চা শুনতে। বেশি বয়সে মা-হওয়ার সুখ যেমন জ্বালাও কম নয়। দু-চার শব্দ কানে বোলতার হুল ঢোকায়। তা-ও নেই নেই করে দেখতে-দেখতে রঘুর বয়স ষোল ছাড়াল। চুনারাম সেবার কথায় কথায় বলছিল, আমাদের ঘরের রঘুটা তো গায়ে-গতরে হয়েচে, এবার ওর বিয়ে-থা দিয়ে লেটা চুকিয়ে দাও। আমারও বয়স হচ্ছে, কবে ফুট করে চলে যাব শিবের বাপও টের

পাবে না। যেতে তো হবেই, তার আগে মনের বাসনা মিটিয়ে যাই না হলে যে সঙ্গে গিয়েও সুখ পাব না।

দুর্গামণি বুড়োর কথা শুনে অবাক হয়নি, এ বংশের এমনই ধারা। এর মধ্যেই ছেলেটার জন্য মেয়েঘর থেকে লোক আসতে শুরু করেছে। রঘুর এতে ঘোর আপত্তি। বিয়ে মানে বে মতলব জড়িয়ে যাওয়া। হাঁড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দেওয়া। রঘু চোটপাট করেছে দমতক। তাতেও কাজ হয়নি দেখে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে দু'দিন। শেষে আবার গুয়ারাম তাকে খুঁজে আনল দেবগ্রাম স্টেশন থেকে।

সকাল থেকে ঘরে আজ আনাজ বাড়ন্ত। শাক-লতায় মন ভরতে চায় না দাদু-নাতি কারোরই। জলখাবারের মুড়ির বাটি দিতে এসে দুর্গামণি মনে করিয়ে দিয়েছিল কথাগুলো, আজ কিন্তু ভাতের সাথে তরকারি দিতে পারব না। ঘরে কিছু নেই। যা ছিল সব সাঁঝবেলায় করে ফেলেছি।

—কেনে কচুর ডাঁটি, সেগুলো কি সব ফুরিয়ে গেল? চুনারামের জিজ্ঞাসায় দুর্গামণি ঘাবড়ায়নি, না, ফুরোবে কেনে? কিন্তু হররোজ কি কচু মুখে সুয়োদ লাগে? তাছাড়া বুনো কচু কুটকুটায়। তেঁতুল দিয়ে ঠিক করে জব্দ না করলে ওরা দাঁত বসাতে ছাড়ে না।

—তাহলে কি করতে হবে? চুনারামের ফাঁপড়ে পড়া চোখ-মুখ।

দুর্গামণি তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিল, তাহলে যাও না কেনে বামুন পুকুরে। ওদিকে কাঠ-কুড়োতে গিয়ে দেখেছিলাম নালফুলে ভরে আছে পুকুরের জল। আজ কচুডাঁটির বদলে নালফুলের ডাঁটা-চচ্চড়ি রেঁধে দেব।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। গুয়ারাম যতদিন ঘর না ধরছে ততদিন এ সংসারের দায়-দায়িত্ব তো সব ওর। ছেলেটার সব কাজে হড়বড়ানো। দু-চার দিন বৃষ্টি দেখেই সে চাষ কাজে চলে গেল। তার এই যাওয়াটা উচিত হয়নি। আষাঢ়ের মেঘ সবসময় যে ঢালবে এমন মাথার দিব্যি কেউ দিতে পারে না। হলও তাই। দু'দিন ঝরেই ঝোর বন্ধ করে দিল মেঘ দেবতা। কিন্তু তার আগে বাবুর পুঁটলি বাঁধা সারা। ধার-উধার করে ছেলেটা দলের সঙ্গে গাঙ পেরিয়ে চলে গেছে। এদিকে কে কি খাবে পরবে সে চিন্তা তার নেই।

অশোথতলা ছাড়িয়ে এলেই হাঁপু লাগে চুনারামের, গা ভিজিয়ে ঘাম নামে দরদরিয়ে। একটু যে জিরিয়ে নেবে তার জো নেই। রঘুর মুখ চলবে ক্ষুরের মতো। খড়খড়ে হাতে ঘাম মুছে চুনারাম রঘুর দিকে তাকাল, বুঝলি কিনা, তোর বাপের দুদ্রুম করে চলে যাওয়াটা উচিত হয়নি।

রঘুনাথ ঢোক গিলল। সামান্য বিরক্তি ওর চোখে-মুখে, না গেলে ঘর চলবে কি দিয়ে? এ গাঁয়ে কাজ কুথায়? এখানে তো খরা চলচে।

—যা বলেছিস। হাজার কথার এক কথা। চুনারাম উৎসাহিত হল, সেইজন্যিই তো বলছিলাম ওর এভাবে যাওয়াটা বিবেচকের কাজ হয়নি। আরে যাবি যখন তখন ধার-উধার করে কিছু টাকা ঘরে দিয়ে যা। তা না, কেবল ফক্কা!

—থাকলে তো দেবে। বাপের নিন্দে সহ্য হয় না রঘুর, শুধু মুখ দেখে কেউ টাকা উধার দেয় না। থালা-গেলাস তো সব গিয়েচে। বন্ধকের মাল ফেরত পাওয়া ঝামেলার।

—তা যা বলেছিস। সুদের সুদ বেড়ে ন' মাসের পোয়াতি হয়ে যায়। চুনারাম হতাশ গলায় বলল, ছেলেটারে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। ঠা-ঠা খরায় দেশ-গাঁ জ্বলচে। সবখানে পাতা পোড়ার বদঘ্রাণ। চোত-বোশেখের মতো ধুলো এখন দামাল। কে বলবে আষাঢ় মাস পেরিয়ে গেল। কবে যে শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে যাবে বুড়িগাঙ? তখন সারা বুনোপাড়া জুড়ে জলকষ্ট। দল বেঁধে যেতে হবে সেই অশোথ তলার চাপা কলে। সে চরমদিন আসার আগে হড়হড়িয়ে

ছেরাক মেঘ। আর ভাল্ লাগে না। সারা গায়ে বিজবিজানো ঘামাচি ফুটেছে চুনারামের, গা-গতর গোসাপের চামের মতো খসখসে। রাতে ঘুম নেই, দুপুরেও তাই। এভাবে চললে বর্ষা খুন হয়ে যাবে, বীজতলা কঁকিয়ে কাঁদবে। বিধবার সাদা শাড়ির মতো দেখাবে মাঠঘাট।

—সাবধানে নামবু। সামনে ধুলো চুবানো ঢালুপথ। রঘুকে সতর্ক করে চুনারাম। শুধু চ্যাটচেটে কাদা নয়, ধুলোও পেছল কাটায় ওস্তাদ। বেকায়দায় ব্যাঙ ঠিকরানো ঠিকরে গেলে ধুলো ঢুকে যাবে চোখে-মুখে। এ ধুলো ভূত সাজাতে ভালোবাসে। রঘু নিজে সতর্ক হয়ে বুড়ো মানুষটাকে হুঁশে ফেরায়, আমার জন্যি ভাবতে হবেনি। তুমি ঠিকঠাক নামো তো।

—নামছি রে, নামছি। গলা ঘড়ঘড় করল চুনারামের। ঘর থেকে বেরনোর সময় হড়বড়িতে ভুল হয়ে গিয়েছে। হাতের লাঠিটা ভুলে ফেলে এসেছে সে। লাঠি থাকলে শুধু পায়ের নয় মনেরও জোর বাড়ে। ঢালুপথে লাঠি, সাইকেলের ব্রেকের মতো কাজ করে। এখন নিজের ভুলের জন্য নিজেই আফসোস করে চুনারাম। কিন্তু মুখ ফুটিয়ে রঘুকে সে কিছু বলে না, রঘুই তার নড়বড়ে চেহারা দেখে খিঁচিয়ে ওঠে, সেদিন যে বেবুর ডালার লাঠিটা এনে দিলাম, সেটা কুথায়?

—ঘরে আচে। চুনারাম হালকা করতে চাইল প্রসঙ্গ।

রঘু রাগে লাল হয়ে বলল, ঘরে থাকলে চলবে? লাঠি দিয়ে কি ঘরে ঠেকো দেওয়া হবে?

—বললাম তো ভুল হয়ে গিয়েচে। চুনারামকে অসহায় দেখাল, বয়স হলে সব কথা কী ঠিকঠাক মনে থাকে রে। তাছাড়া আমার হাজার চিন্তা। তোর বাপ যে কুথায় গিয়েচে কে জানে। সে না ফেরা তক আমার চোখে নিদ আসবে নি।

—ফি-বছর তো যায়, এবারের ক্ষেপটা নিয়ে এত ভাবচো কেন?

—ও তুই বুঝবি নে, বয়স হোক, তারপর সব বুঝবি! চুনারামের কথাটায় রঘুর ভেতরটা ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেল। সে এখন যা বুঝতে পারে না ঠিকঠাক-বয়স হলে কি সব বুঝতে পারবে সে? তার তো ঢের বয়স হয়েছে, গোঁফের রেখা ফুটেছে তাহলে সে কেন বুঝতে পারবে না। চুনারামের কথাগুলোই রহস্যে মোড়া। এই হেঁয়ালি সে প্রায়ই বুড়োথুড়োদের মধ্যে লক্ষ্য করে। তার ভালো লাগে না। তার মনে হয়-এরা বুঝি কিছু লুকোতে চায় যা ওদের অক্ষমতা, কমজোরি।

বাঁধের গাঁ-ছোঁয়া ঢালুপথ সাপের চেরা জিভের মতো দু'ফাঁক হয়ে দু'দিকে চলে গিয়েছে। একদিকে জমজমাট গ্রাম, অন্যদিকে বামুন পুকুরয়াড়। ছায়ায় ছায়ায় পথটা বেশ আরামদায়ক। খুব বড়ো-সড়ো গাছ চোখে পড়ে না, মাঝারি মাপের গাছগুলোই এখানকার শাসনকর্তা। কতবার যে এখানে ছুতোনাতায় পালিয়ে এসেছে তা রঘুনাথ নিজেও জানে না। পথের ধুলোয় ভরে আছে চুনারামের গোড়ালির নিচটা, ধুলো সোহাগে গায়ের বর্ণ বোঝা দায়, শরীরও ধুলোছোঁয়ায় গিরগিটির মতো রঙ বদলায়। ক' পা হেঁটে এলেই ঝোপ-ঝাড়ে ঠাসা হয়ে যায় এলাকা, টাক তাতানো রোদের বুক ছুঁয়ে পাখির ডাক ভেসে আসে। হা-করে দাঁড়িয়ে পড়ে রঘু। জুলজুলিয়ে আশেপাশে তাকায়। চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে আশ্চর্যবোধ। নজর এড়ায় না চুনারামের, অমন করে ভ্যালভেলিয়ে কী দেখচিস? হ্যাঁ রা, তুর কি হলো বল তো?

এ সময় ঢিলি কাকিকে দেখবে স্বপ্নেও ভাবেনি সে। মেয়েমানুষটার কি গরম-টরম লাগে না? লু' কে জব্দ করে কিভাবে। ছাতিতে দম আছে বলতে হবে। চোখ ডলে নিয়ে রঘু আপন মনে বলল, হা দেখো দাদু, ঢিলি কাকি বনের ভেতর কি করচে দেখো। ওর জানে কি ভয়-ডর নেই?

হাসল চুনারাম, ম্যায়াঝিটার মাথাটা গিয়েচে। টুকে গরম পড়লে ঘিলু গলে লাড়িয়া তেল

হয়ে যায়। যাদের মাথার দোষ, তাদের এই সময়টাতে ঘরে এটকে রাখা দায়। লুলারামের বৌ-ভাগ্যটা পুকায় কাটা। এ আর ভালা হবার নয়।

জ্ঞান পড়ার পর থেকে রঘুনাথ ঢিলিকে দেখছে টো-টো কোম্পানী হয়ে ঘুরে বেড়াতে। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই জানে তার মাথার গণ্ডগোল। এ রোগ সহজে সারে না। কবিরাজ, ফকির, বৈদ্য, পীরবাবার থান, মনসাতলা, ঢিলবাঁধা, সুতো বাঁধা...সব বৃথা গেল, হত্যে দেওয়াও বিফলে গেল, ঢিলি কোনো কিছুতেই ভালো হল না, তার চঞ্চল চোখ, অসহিষ্ণু চোখের তারা সব সময় কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়। পাড়ার লোকে বলে লুলারামের চরিত্র দোষ, ভিকনাথের বউয়ের সঙ্গে তার নাকি লটখট চলছে। অনেকেই দেখেছে ওদের আড়ালে-আবডালে কথা বলতে। ঢিলির কানে গিয়েছে কথাগুলো। শোনার পর থেকে তেতে গিয়েছে মাথা। পাগল বলে সে তো দেখতে শুনতে মন্দ নয়। দেখে-শুনে লুলারাম তাকে বউ করে এনেছিল ঘরে। তখন চাঁদের সাথে, নালফুলের সঙ্গে তুলনা করত তার। দুই মেয়ের পরে সে এখন আকাশের ঘুরঘুট্টিয়া আঁধার। ঘরে থাকলেও লুলারাম তাকে পুছেও দেখে না, ক্ষেপি, বদমেজাজী বনবেড়াল ভেবে এড়িয়ে চলে। ঢিলি মরমে মরে, মনে মনে কাঁদে। ঝারির কথা সে দুর্গামণির কাছে ফলারের চিড়ের মতো চটকে দেয়, জানো তো দিদি, সে ঢেমনিটা তুমার ঠাকুরপোকে বশ করেচে। বেহায়া মরদটা তার আঁচলের চাবিগোছা হয়ে ঝুলচে। আমি কোথায় যাই বলদিনি। তাদের তো লাজ-লজ্জা নেই। এদিকে আমি যে লাজে মুখ দেখাতে পারচি নে।

—তুমি বেশি ভেবো না বুন। তুমার তো শরীল তত বিশেষ ভালো নেই।

কে বলল ভালো নেই? ঢিলি প্রতিবাদে মুখর হল, আমার শরীল দিব্যি ভালো আচে। শরীলের দোহাই দিয়ে তোমরা কেউ পার পাবা না। আমি কাউরে ছাড়বো না। সব্বাইকে টানতে-টানতে পাকুড়তলার বিচার সভায় নিয়ে যাব। ছাড়ব না। মা'র দিব্যি দিয়ে বলচি—কাউরে ছাড়ব না।

হাট ছাড়ি দিব, পরনের কাপড় ছাড়ি দিব তবু ভাতার ছাড়ব না। ঢিলি মুখের দু'পাশে গ্যাঁজরা ছড়িয়ে হাঁপায়। চোখের গুলি দুটো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চায়, এক অসহনীয় জ্বালা তার বুকের ভেতরটাতে নারকেল কোরার মতো কুরতে থাকে। ঘরে আর মন বসে না ঢিলির, বাইরের উন্মুক্ত প্রকৃতি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ঢিলি বাঁধের ধুলোয় উঠে আসে, দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে সে কার সঙ্গে কথা বলে, বিড়বিড় করে, কখনও কাঁদে, কখনও হাসে। কখনও বা জলের দিকে তাকিয়ে সে একনাগাড়ে ধারাভাষ্য দেয়, সারাদিনের ঘটনাগুলোকে সে হুড়মুড়িয়ে আউড়াতে থাকে, যেন এ পৃথিবীর সমাজ সংসারের সব কিছু তার মুখস্থ, স্বয়ং মা সরস্বতী তার কণ্ঠে যেন ভর করেছেন, এতকিছুর পরেও ঢিলির কোনো ক্লান্তি নেই, সে বুনোপাড়া ছাড়িয়ে অনায়াসে চলে যায় বাবুপাড়ায়, বাবুপাড়া ছাড়িয়ে চোখের নিমেষে পৌঁছে যায় অশোথ তলায়, সেখান থেকে বামুনপুকুর কিংবা মোকামপাড়ার বিলে। মন ভালো থাকলে সে উচ্চস্বরে গান গায়, হাসিতে বাতাস ফালাফালা করে নিজের অস্বস্তিকে ভাসিয়ে দেয়।

ঢিলিকাকিকে দেখে রঘুনাথের অবাক হওয়ার ঘোর বুঝি আর কাটে না, সে ভাবতে থাকে এত চড়া রোদে বউ-মানুষটা এখানে এল কী ভাবে? তাহলে পাড়াপড়শিরা যা বলে তা সব সত্যি। ঢিলিকাকি পাগলী, তার মাথার দোষ আছে, হরিনাথপুরের বুড়োমা তলায় মানত করেও সে আর ভালো হবে না। লুলারাম কাকা আবার আর একটা বিয়ে করবে, ঝারি বা তার চেয়ে সুন্দরী কাউকে। ঢিলিকাকির দু' মেয়ে নুপুর আর নোলক চোখ ভাসিয়ে কাঁদবে, কাকার হাতে-পায়ে ধরেও তার মন গলাতে পারবে না। লোকে বলে লুলারাম কাকার নাকি পাথরের মন, মুনিরাম দাদুর ডাকাতের রক্ত তার শরীরেও বইছে। রক্তের দোষ যাবে কোথায়?

ঝোপঝাড় ঠেলে ভর দুপুরে এলোমেলো শরীরে ধুলো পথের উপর এগিয়ে এল ঢিলি। ঘাড় বেঁকিয়ে রঘুনাথ আর চুনারামকে এক ঝলক দেখে নিয়ে সে ক্ষিপ্রপায়ে এগিয়ে গেল ঘাটের দিকে। রঘুনাথ ভয় পাচ্ছিল, ঝোঁকের মাথায় ঢিলি কাকি আবার বামুনপুকুরে ঝাঁপ দেবে না তো? পাগলের মন বোঝা দায়, কখন কি করে আগাম বলা মুশকিল। ভয় আর উত্তেজনায় চোখের তারা কেঁপে উঠল রঘুনাথের, চুনারামের দিকে সে অসহায় চোখে তাকাল। চুনারাম তাকে ভরসা দিয়ে বলল, ভয় পাওয়ার কিচু নেই রে। ও ম্যায়াঝি মরবে না। পুরো ঘর-সনসার জ্বালাবে, তারপর যদি কিচু হয় তো হবে।

রঘুনাথ খুশি হল, কেমন থতমত খাওয়া চোখে তাকাল, তুমি অমন করে কেনে বলচো গো দাদু? কাকির উপর তুমার দেখচি কুনো মায়া দয়া নেই।

—না, নেই। যেন হ্যাটাবাঘের গলায় গর্জে উঠল চুনারাম, ও আটকুড়ীর বেটি রাজোয়ার বংশের মুখে চুনকালি লেপবে, তুই জানিস নে দাদু, ওর জন্যি আমাদের কত দুর্নাম, লোকে ঢি-ঢি কার দেয়। সব কতা তো কানে আসে, শুনি। বুঝি না কেন যে ডুবে মরতে জল জোটে না ওর।

রঘুনাথ স্পষ্টত বুঝতে পারে ঢিলি কাকির উপর চুনারামের কেন গোখরো ক্ষরিস রাগ। বুনো পাড়ায় ঘর হলেও লুলারামের রমারমা অবস্থা, গেল সনের আউড়গাদাই বলে দেবে ক' বস্তা ধান উঠেছিল জলজমি থেকে। এখনও বাড়িঘরে ধানের গন্ধ ম-ম করে। ঘর-বাড়ি সবখানে মা লক্ষ্মীর উপচে পড়ার ছাপ আছে। লুলারাম কাকারা বড়লোক, ওদের পয়সাকড়ি আছে—এ কথা ভেবে মনে মনে সুখ পায় রঘুনাথ। তবে সে জানে—পরের সোনা নিয়ে গর্ব করা ভালো নয়, কেন না ফি-কথায় দুর্গামণি বলে—পরের সোনা দিও না কানে, খুলে নেবে হ্যাঁচকা টানে।

উবু হয়ে ঢিলি দু-হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে বুনো জল-শ্যাওলা। পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনো লক্ষ্মণ তার আর নেই। বেশ বোঝা যায় পাগলামীর উগ্রতায় সর পড়েছে। ঢিলি আঁজলা ভরে জল খায় পশুর মতো। কাপড়-চোপড় এমন কী বুকের কাছটা তার ভিজে সপসপে দেখায়। চুনারাম হা করে দেখছে। শুধু চোখ নয়, মুহূর্তে কঠিন হয়ে ওঠে তার মেটে রঙের পুরু ঠোঁট দুটো, দেখলু, আমি বলছিলেম না ও ম্যায়াঝি মরবে নি। ও হল গিয়ে সাধের পাগল, সেয়ানা পাগল। সবার চোখে ধুল দিলেও আমার চক্ষে তা ছিটোতে পারবে নি। আরো বাব্বাঃ, বয়সে আমার মুচ পেকেচে, রসে পাকেনি রে! হুঁস করে শ্বাস ভাসিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল চুনারাম। ঘরের বউ না যাওয়া অবধি সে ঘাটে যাবে কি করে? খুড়শ্বশুর বলে কথা। ধর্ম মান ভাসিয়ে দিয়ে তো লোকালয়ে বাঁচা যাবে না। একটা মাঝারি মাপের পিটুলিগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে খুঁট থেকে ডিবা বের করে বিড়ি ধরাল। বিড়ির পেছনে লম্বা টান দিয়ে আয়েসী চোখে সে দূরের দিকে তাকাল। এখন আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি তবু রোদের কী তেজ দেখো। মনে মনে সে যেন নিজেকেই শোনাতে চাইল ভাবনাগুলো। গুয়ারামের উপর আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে সে কেমন ময়দা-লেচির মতো লতলতে হয়ে গেল স্নেহ-মায়ায়।

জল খেয়ে, মাথা ভিজিয়ে পাড়ে উঠে এল ঢিলি। রঘুনাথ লক্ষ্য করল ঢিলিকাকির পরনের কাপড় চোপড়ের কোনো ঠিক নেই। ঢিলাঢালা পোশাকটা কোনোমতে লজ্জা স্থানগুলোয় ঢাকা দেওয়া। জোরে বাতাস এলে তা পুরনো, হলদেটে পাতার মতো খসে গিয়ে মহালজ্জাকাণ্ড বাঁধিয়ে দিতে পারে। নূপুর, নোলক বড়ো হয়েছে। ওরাও তো এদিকটা দেখভাল করতে পারে। নাকি লোকমুখে শুনে শুনে ওরাও হাল ছেড়ে দিয়েছে। মেয়ে দুটোর এই অমনোযোগী মনোভাব মন থেকে মেনে নিতে পারল না রঘুনাথ। কোথা থেকে কষ্ট এসে তার মনটাকে সাঁতিয়ে গেল।

মনে মনে সে ভাবল ঘরে ফিরে গিয়ে সে নূপুর আর নোলকের দুয়ারে যাবে। ওদের বোঝাবে। ওরা যদি না বোঝে তা হলে লুলারাম কাকাকে দিয়ে ওদের গাল খাওয়াবে। সে যে ওদের থেকে বড়ো—এটা আজ সে প্রমাণ করে ছাড়বে।

বামুনপুকুরে চ্যাটপেটে কাদা নেই, বেশির ভাগই বালি, ফলে ঘাটের কাদা পায়ে জড়িয়ে যাবার কোনো সুযোগই থাকে না। এ তল্লাটের সব চাইতে বড়ো পুকুর বামুনপুকুর। বর্ষাকালে এই পুকুর যেন মোকামপাড়ার বিলটাকে শরীর ফুলিয়ে শুঁশিয়ার করে দেয়, গর্বে গাল ভরিয়ে বলে, দেখো, বিলকুমারী আমি তুমার চাইতে কোনো অংশে কম নই। তুমার শরীল পেঁচিয়ে শুধু ভ্যাদকা লতা, জলা-শ্যাওলা। আর আমাকে দেখো-কেমুন লাল শাপলা আর সাদা শাপলায় সেজেচি দেখো। আমার জলো-লতার ফুলগুলো নাকছাবি, মন হলে আমি পাল্টে পাল্টে পরি। সাজতে যে আমার বড়ো ভালো লাগে। তুমি বিলকুমারী হলে আমি হলাম জলকুমারী, রাজকুমারী।

চোখ ভরে দেখার মতো পুকুর বটে বামুনপুকুর। চারধারের পাড় বাঁধানো জল বুড়ো-মা মেলায় বেচতে আসা কাচ বাঁধানো ফ্রেমের মতো, একবার দেখলে চোখ ফেরান যায় না, বট আঠায় লটকে যাওয়া বনিপাখির মতো লটপটায়। ভালো লাগার রেণুগুলো মথের গায়ে জড়িয়ে থাকা রেশমী ধুলোর মতো মনের আনাচে কানাচে ভেসে বেড়ায়, মনটাকে চোখের পলকে বানিয়ে দেয় ফুলের বাগান। এই মুগ্ধতাকে দু'হাতে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে উড়িয়ে দেয় ঢিলি, রঘুনাথের মুখোমুখি এসে সে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়, রঘু না? এখানে মরতে কী করতে এয়েচিস? যা ঘর যা। চড়া রোদে তুর মাথার চুল উঠে চাঁদ পড়ে যাবে। তখন ব্যা-থা হবে না, মেয়েঘরের বাপ বলবে ছেলে তুমাদের টাকলা। কথা শেষ হল না হাসি সংগতের মতো বেজে উঠল দুই ঠোঁটে। অবাক হয়ে তা দেখতে থাকল রঘুনাথ। ঢিলি কাকির বয়স চল্লিশ ছুঁয়েছে তবু এই বয়সে তার চেহারাটা বামুনপুকুরের চেয়েও ভরাট। তার শরীরে ঢেউ ওঠে সর্বদা, চঞ্চল চোখের মণি দুটোয় ক্ষ্যাপাটে এক দৃষ্টি বুনো বাতাসের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভালো লাগার ডালপালা ছড়িয়ে ঢিলিকাকি যেন বলে—আমাকে দেখ। আমি গাঁয়ের বউ তবু শহরের কারোর চাইতে কম নয়। বুনো ঘরের বউ বলে নয় ঢিলি বরাবরই সুন্দর! রঘুর মনে হল সব পাগলই সুন্দর, ওদের মনের স্বচ্ছতা সুন্দর করে তোলে বাঁধনহীন, তোয়াক্কাহীন মনটাকে।

ঢিলি কাকির কথায় রঘুনাথ তাই অবাক না হয়ে পারে না, কি বলছো গো কাকি? আমার আর কত বয়স, আমাকে কেনে বিয়ে সাদীর কথা বলছো?

—তোকে বলব না তো কি গাছকে বলব? ঢিলি বিড়বিড়িয়ে উঠল, যা বাপ কথা না বাড়িয়ে গা ধুয়ে আয়। এক সাথে ঘর ফিরব।

আমার ফিরতে দেরি হবে। রঘুনাথ ঢিলির চক্করকাটা চোখের দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলল, তুমি যাও গো। আমি নাল ফুলের ডাঁটি তুলব। মা বলেচে—ঘরে শাকপাতা নেই। আজ নালফুলের ডাঁটি চচ্চড়ি হবে।

—অঃ। তুর মায়ের যেমন বুদ্ধি। নালফুলের ডাঁটায় কি আচে রে, কিচ্ছু নেই। শুধু ভুসভুসিয়া জল। টুকে আঁচ লাগলে জল কাটে, লোহার কড়াই হয়ে যায় বুড়িগাঙ। ঢিলি রহস্যভরা চোখে হাসল, তুর মা বাপু সুবিধের মেয়েমানুষ নয়। ওর মনে ভারি গর্ব। আমার ছিমুতে হাত পাততে শরমায়। আরে বাব্বাঃ, আমার কাছে লাজে রাঙা হওয়ার কি আচে, আমি কি পর নাকি?

—মা বরাবরই ওইরকম। শুকোবে, শুকিয়ে সুপুরি হয়ে যাবে তবু হাত পাতবে না। রঘুনাথের গলায় দৃঢ়তা ফুটে উঠল।

পানসে হেসে ঢিলি বলল, তুর মা'র মতো তুর বাবার মাথাতে গোবর পুরা। ড্যাং-ড্যাং করে

জন-ঘাটতে ভিন দেশে চলে গেল। গিয়ে কি লাভ হল, কিচু না! চারদিকে এখন খরা চলচে। তুই দেখে নিস এবছর ঠিক আকাল হবে। টিলি বেশ গুছিয়ে কথাগুলো বলে তৃপ্তি পেল। এরকম ভালো ভালো কথা সে প্রায়ই বলে থাকে। যখন সে এসব বিবেচনার কথা বলে তখন তাকে পাগলি বলে মনেই হয় না। এই জন্যই বুঝি চুনারাম তাকে সেয়ানা পাগলা বলে আখ্যা দিল। চুনারামের কথার সঙ্গে রঘুনাথ একমত নয়। তার নজরে টিলি কাকির আলাদা সম্মান আছে। ওরা শুধু বড়োলোক বলে নয়, বড়ো মন আছে ওদের। বুনোপাড়ায় একমাত্র টিলিকাকিদের মাটির দোতলা ঘর, ঘরের মাথায় সোনাখড়ের টাইট চাল। সেই চালের মাঝখানে বিশেষ কায়দায় লাগানো আছে মুখোমুখি দুটো টিনের ময়ূর, মিস্ত্রি যত্ন নিয়ে বানিয়েছে। হাওয়া দিলে সেই পাতলা টিনের ময়ূর ঝনঝনিয়ে কেঁপে যায়, ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে ওরা যেন উড়তে চাইছে খোলা আকাশে। ওরা টিনের নয়, যেন সত্যিকারের ময়ূর।

বয়সকালে খারাপ দেখতে ছিল না টিলিকাকি, রাতে ফোটা পদ্মফুলের মতো চনমনে ছিল তার মেজাজখানা। লুলারাম খুড়া তার রূপে মোহিত হয়ে ঘুরঘুর করত তার চারধারে। তার তখন কাজে কম্মে মন ছিল না। টিলিই ঠেলে-ঠেলে পাঠাত কাজের জন্য। অভিমানে মুখ ফোলাত, ঘরে বসে কি সুখ পাও জানি না গো...। তুমার জন্যি লোকে আমাকে দশ কথা শোনায়। নিন্দে করে।

—কি কথা আমি কি শুনতে পারি?

—শুনে হজম করতে পারবা তো? সব খাবার সবার পেটে হজমায় না।

—বলে তো দেখো। লুলারাম কাকার কণ্ঠস্বরে জেদ।

হাসতে হাসতে টিলির কাঁচা হলুদ শরীরে ঢেউ উঠত, সব্বাই বলে—আমি তুমারে নাকি জাদু করেছি। আমার নজরে নাকি আটা আচে। আমার শরীরটা নাকি শ্যাওড়াগাছের চেয়েও ভয়ের। বলদিনি, এসব শুনে কার মন ভালো থাকে?

—কে বলেচে এসব কথা, বলো। আমি তার জিভ উপড়ে নেব। লুলারাম হাঁপাতে থাকে। তার বুকের ভেতর পাঁচ-ঘোড়ার ইঞ্জিন চলে, এ গাঁয়ের কাউকে না হলে আমার চলে যাবে কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার এক পল চলবে না। আমি পাগল হয়ে যাবেখন।

—কেন? দিঘল চোখে আঠা বেছায় টিলি।

—সত্যি কথা বলব? শুনে তুমার হাসি পাবে। ভেজা বেড়ালের মতো চোখে টিলির দিকে তাকাল লুলারাম, আগে বুঝিনি—এখন বুঝেচি গো, বউ হল মায়ের চেয়েও বড়ো। বউকে সুখে রাখলে আমার দশদিক সুখে থাকবে।

—এ কথা তুমি মন থিকে বলতে পারলে? তুমার জিভ উল্টালো না? টিলির নিরীহ শান্ত চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরল, খবরদার তুমি আমারে ছোঁবে না। শরীলের নেশায় তুমি পাগল হয়ে গিয়েচ। তুমি আমাকে ভালোবাসো না, শুধু আমার এই নাদুসনুদুস গতরটাকে ভালোবাসো। যতদিন আমার রূপ যৌবন থাকবে ততদিন তোমার ভালোবাসা টাটকা থাকবে। রূপ ফুরোলে তুমিও ফুড়ুত করে উড়ে যাবে।

—মিচে কথা। লুলারাম চোখের নিমেষে তার খড়খড়ে হাতটা চেপে ধরে ঢিলির বাসনা তেল চুবানো মাথায়, মা'র দিব্যি, শুতে-বসতে আমি তুমার মুখ ছাড়া আর কিচু দেখতে পাই নে। আমি যা বলেচি তা সত্যি গো! কেন বলেচি-জানো? মা'র জন্য আমার কুনোদিন মন খারাপ করে না। এমনকী মা'র কথা আমার একদম মনে পড়ে না। তুমার সঙ্গে আমার একহপ্তাও হয়নি, অথচ তুমার জন্যি আমার বুক টাটায়। আমার চোখে নিদ আসে না।

এই অনুগত লুলারাম এখন লোহার মোটা শিক, বাঁকানো যায় না। রাত-বেরাতে সে ঢিলিকে বিছানায় ফেলে বাহ্যি করার নাম করে ঝারির ঘরে ঢুকে যায়। ভিকনাথের খাটা গতর মড়ার মতো ঘুমোয়। তেল-টিনের দরজায় টোকা পড়লেই ঝারি এলোমেলো শাড়িতেই বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। দরজায় শেকল তুলে সে আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে চলে আসে জগৎখালির বাঁধ-ধারে। শরীরের দাবি মিটিয়ে ভোর রাতে সে ফিরে যায় নিজের ঘরে। ওরা ভাবে—এসব কেউ টের পায় না। অথচ হাওয়া-জল-গাছ সব জানে। মরা চাঁদে জানে, তারা জানে। ঝারি ভয়ে ভয়ে বলে, পেট বেঁধে গেলে কি করব গো? তখুন ডুবে মরতেও যে জলা জুটবে না।

—ভয় কি, প্রভা বুড়ির শেকড়বাটা খাইয়ে দেব। পচা লাউজালির মতো কখন পেট খসে যাবে, ভিকনাথ তো ছেলেমানুষ, ওর বাপও টের পাবে না। লুলারামের কণ্ঠস্বরে অশ্বত্থের ছায়া ঢলে পড়ে, তুমি চিন্তা করো না তো! আমি তো আছি, আমি তো মরে যাইনি। আমার যা জমিজমা আছে তুমি বসে খেয়েও শেষ করতে পারবে না।

ঝারির কাজলটানা চোখে স্বপ্ন ঝিলিক দিয়ে ওঠে, সত্যি বলচো, আমাকে ছুঁয়ে বলো।

লুলারাম তাকে ছোঁয়, শুধু ছোঁয়া নয়—বুকের যাঁতায় পিষতে থাকে বুক, ঝারির শরীর কাদামাছের মতো মোড়া মারে উত্তেজনায়, কথা জড়িয়ে যায়, উঃ, আমি মরে যাবো গো, আর পারচি নে! ছাড়ো, ছাড়ো! আলো ফুটচে চারধারে। ভিকনাথ জেনে গেলে আমারে গলা দাবিয়ে মেরে দেবে। ইবার আমাকে যেতে দাও—।

—ও শালাকে আমি ছাড়ব ভাবছো? ওর মরণ আমার হাতে। বেশি তেড়িবেড়ি করলে গলায় হেঁসুয়া চালিয়ে দেব। লুলারামের লুললুলে শরীর পাকানো দড়ির মতো শক্ত হয়ে উঠল, কঠিন চোয়াল নড়ে উঠল, তুমারে রাজরানী করে রাখব। আগে পাগলীটার গতি করি, তারপর—।

—যা করার তাড়াতাড়ি করো। আমার তর সয় না। ফি-রাতে পেলিয়ে আসতে মন করে না। খালি ভাবি—আমি কি রাতচরা গোরু?

—গোরু কেনে হবে গো, তুমি আমার হরিণী! আহা কী রূপ, কী রূপ! লুলারামের পিছল জিভ চুকচুক শব্দ করে ওঠে শঙ্খ লাগা সাপের মতো।

এসব ভাবলে তার মনটা চৈত্রের রোদে ফাটা জমির মতো ফেটে চৌচির, আর সেই ফাটলের মধ্যে লুকিয়ে-ছাপিয়ে বসে থাকে রাগের ফণাধারী সাপ, তার শুধু ফোঁসফোঁসানী, ওই দুটা তিলে—খচ্চর মানুষকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য মনটা শীতকাতর কুকুরছানার মতো যন্ত্রণায় কুঁইকুঁই করে। সব খবর ঢিলির কানে আছে, মনে আছে। লোক ভাবে সে পাগল। হ্যাঁ পাগল। লুলারামই তাকে পাগল করে ছেড়েছে। শুধু খেতে-পরতে পেলে কি একটা বৌয়ের সব পাওয়া হয়ে যায়, আর কিছু কি দরকার হয় না জীবনভর। লুলারামের ভালোবাসাটা এখন খরায় ঝলসে খড়খড়ে ঘাস; প্রাণ নেই, টান নেই-যা আছে শুধু অবহেলা আর তাচ্ছিল্যের ধুলো ওড়া। এর শাস্তি ওকে পেতে হবে। মাথায় খাঁ খাঁ রোদ নিয়ে ঢিলি শক্ত হয়ে দাঁড়াল, নিজের অজান্তে হাতের মুঠি শক্ত হয়ে এল তার, মাথাটা চোখের নিমেষে বুমবুমিয়ে উঠল, নাক ছাপিয়ে নেমে এল গাঢ়

নিঃশ্বাস। এমন অস্বস্তিবোধ হলে সে বুঝতে পারে মাথার অসুখটা বাড়ছে, এবার সে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে, নিজেকে আর ধরে রাখার কোনো ক্ষমতা থাকবে না ওর। ঢিলি কী ভেবে আবার পুকুরঘাটের দিকে দৌড়ে গেল, এবার আর ধীর পায়ে নামল না, ডাঙা থেকে ব্যাঙের মতো ঝাঁপ দিল পুকুরে। তার ছিপছিপে সুন্দর শরীরটা মৃগেল মাছের মতো ঢুকে যেতে লাগল জলের গভীরে। প্রায় মিনিট খানেক পরে কালবাউস মাছের মতো চুলভর্তি মাথা ঠেলে জলের উপরভাগে উঠে দু-হাত থাবড়াতে লাগল ঢেউওঠা জলের উপর। পাড়ে যে দু-জন পুরুষমানুষ দাঁড়িয়ে আছে তখন তার সে খেয়াল নেই। প্রায় একরকম ভয় পেয়ে রঘুনাথ চিৎকার করে উঠল, ও কাকি, উঠে আসো গো... উঠে আসো। আমার বড্ড ভয় করচে—।

কথাটা কানে গিয়েছিল ঢিলির, ভয় কি রে বেটা, ভয় কি? জল আমার সই রে, আগুন আমার মিতে। তুর কুনো ভয় নেই বেটা, আমাকে কেউ মারতে পারবে না। আমি হলাম মা বুড়োমার বেটি। মা চণ্ডীর বেটি। আমার ক্ষতি করবে কিনা ওই ভিকনাথের বউটা! ছ্যাঃ—!

জল দাপিয়ে পাড়ে উঠে এল ঢিলি, ওর চুল বেয়ে জল নামছে খড়ের চাল বেয়ে জল নামার মতো, পুরো মুখখানার মলিনতা ধুয়ে গিয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে বর্ষার কদমফুলের মতো। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসছিল চুনারাম, সে আর থাকতে না পেরে সামনে এগিয়ে এসে মুখ নিচু করে দাঁড়াল। মনে মনে ভাবল খুড়শ্বশুরকে দেখে ঢিলি নিশ্চয়ই লাজ পাবে, শরমে চোখের আড়ালে চলে যাবে। চুনারাম যা ভেবেছিল তাই হল। ঢিলির সাথে চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিল উভয়ে। লজ্জায় গুটিয়ে গেল ঢিলি, লম্বা হাতের চাঁপাকলি আঙুল দিয়ে সে ঘোমটা দিল সযত্নে। ঠাণ্ডা জলে তার মাথাটা বুঝি ঠাণ্ডা হয়েছে, সে আর আশেপাশে না তাকিয়ে বিড়বিড় করতে করতে সোজা চলে গেল বাঁধের দিকে। বুক থেকে পাথর নেমে যাওয়ার সুখ অনুভব করল রঘুনাথ, পরমুহূর্তে ঢিলিকাকির জন্য তার কষ্ট হল, বুকের ভেতর গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল, পুরো মুখটা নিমেষে বিষাদছায়ায় ভরে উঠল। চুনারাম বিড়ি ধরিয়ে এবার একটা বিড়ি রঘুনাথের দিকে এগিয়ে দিল, নে ধরা। বাপের ছিমুতে খাস আর আমার ছিমুতে খাবি নে তা কি হতে পারে?

ভালো না লাগলেও হাত বাড়িয়ে দিল রঘুনাথ, দাও। মাথাটা ধরে আচে—। ধোঁয়ায় যদি চিন্তার ধোঁয়া ওড়ে।

—তুর এত চিন্তা কিসের? গলায় ধোঁয়া আটকে চুনারাম খুকখুক করে কাশল, আজ দিনটার দফারফা সেরে দিয়ে গেল লুলার বউটা। কুন কুক্ষণে যে ওর সাথে দেখা হল হে ভগবান। দেখা না হলে কখুন আমরা ঘর ধরে যেতাম।

আয়েশ করে বিড়ি টেনে রঘু পুকুরের দিকে তাকাল, দাদু গো, এবার আমি তাহলে কইফুল তোলা শুরু করি।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা আর বলতে। চুনারাম পুকুরের চারধারে, এমনকী স্থির হয়ে থাকা দৈত্যের মতো জলটাকে নিবিড় চোখে দেখল, যা দাদু। ঝেঁপিয়ে পড়। আর দেরি করা উচিত হবে না। বেলা তো টিকলিতে উঠে গিয়েচে। আমাদের ফিরতে দেরি দেখে তুর মা নিশ্চয় খুব ভাবচে।

—তা ভাববে বইকি। জলের দিকে তাকিয়ে রঘুনাথের চোখ ছোট হয়ে এল, মনের ভেতর ভয় হামাগুড়ি দিলেও বাইরে সে তা ভুল করেও বুঝতে দিল না, পায়ে পায়ে পুকুরয়াড়ির মুড়োয় গিয়ে দাঁড়াল সে। চুনারাম বিড়ির শেষটুকু ফেলে দিল জলে, তার চোখের তারায় সামান্য হলেও

ভয়ের কাঁপুনী ছড়িয়ে পড়ল, বেশি দূর যাবি নে, যা তোলার ধারে-ধারে তুলে চটপট উঠে পড়বি। পুরনা পুকুর আর ছোকরা বাঘের গোঁ বোঝা দায়।

এই বয়সে সাঁতার কাটায় রঘুনাথ হয়ে উঠেছে ওস্তাদ। এ গাঁয়ের কোনো ছেলে ছোকরা তার সাথে ডুবসাঁতার-চিৎসাঁতারে পারে না। ভরা বর্ষায় রঘুনাথ গাঙ পেরিয়ে চলে যায় ভিন পাড়ে, তার হাঁপু ধরা তো দূরে থাক, সামান্য বড়ো করেও শ্বাস ছাড়ে না। লুলারাম তার সাঁতারের বহর দেখে বলেছিল, রাজোয়ার বংশের মান রাখবি তুই। তুর যদি মন চায়, আমার বিদ্যেটাও শিখতে পারিস। তোর মতোন চ্যালা পেলে আমি শরীল নিংড়ে দু-হাত উজাড় করে সব দিয়ে যাব। কি রে নিবি? লুলাখুড়ার কথা শুনে হাঁ-হয়ে গিয়েছিল রঘুনাথ। চট করে তার মুখে কোনো ভাষা আসে নি। সেদিন প্রস্তাবটা শুনে ভয়ে তার গলা জড়িয়ে গিয়েছিল। লুলারাম এ তল্লাটের নাম করা ডাকাত। এ বিদ্যায় তার বুদ্ধি প্রখর। নিজের গাঁয়ে কিংবা তার আশেপাশে সে কোনো কাণ্ড করে না। কিন্তু ভিন গাঁয়ে তার দাপট নোনা অঞ্চলের বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর। গ্রামের প্রায় মানুষ এ সংবাদ জানলেও ভয়ে কেউ মুখের উপর কিছু বলে না। তবে মাঝে মাঝে থানার জিপ আসে কালীগঞ্জ থানা থেকে। ওরা বেশির ভাগ আসে মাঝ রাতে। পাকুড়তলায় জিপ দাঁড় করিয়ে ওরা হেঁটে আসে লুলারামের দোতলা ঘর অবধি। পাড়ার কুকুরগুলো তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে, চিল্লিয়ে—চিল্লিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় গেরস্থের। ঘুম চোখে রঘুনাথ অনেকদিন শুনেছে খিস্তি-খেউড়। চোখ ডলে নিয়ে লুলারাম কাকা হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছে থানার মেজবাবুর সামনে, আজ্ঞে বাবু, ছি-চরণের ধুলো যখন পড়েচে তখন টুকে ভেতরে আসুন। কিচু না হোক এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে যান।

মেজবাবুর চোখ আগুন উগরায় আঁধারে, মারব এক লাথ, মেরে সার গাদায় ফেলে দেব। হারামীর বাচ্চা, থানার হাজিরা কি তোর বাপ দিতে যাবে? যদি শুনি ফের বিলা করেছিস—তোর চ্যাং মাছ কেটে তোকেই ভেজে খাইয়ে দেব। আমাদের সব সময় তোর উপর নজর আছে। চরকুঠিয়া—হাটাগাছার কেসটার এখনও ডিসিশন হয়নি। যদি প্রমাণ হয় ডাকাতিতে তুই ছিলিস তা হলে পেঁদিয়ে তোর পেছনের হাড়-মাংস আলাদা করে দেব।

মেজবাবুর ধমকানীতে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপে ঢিলি। থানার মেনিমুখো মানুষগুলো কি যে বলে তার মগজে তিলমাত্র ঢোকে না। তবে লুলারাম লতপতে চোখে তাকায়, তার দৃষ্টিতে ভয় তো নেই উল্টে বদলা নেবার বাসনা। রঘুনাথ ঘুমশরীরে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে সব শোনে, শোনামাত্র ভয়ে গা-হাত-পা কাঠ হয়ে যায়, দুর্গামণি ভয়ে ফিসফিসায়, আতঙ্কে কালো হয়ে যায় তার মুখ, এ ব্যাটা, ঘর চ। কার ঢিল কার গায়ে লাগবে ঠাকুর জানে। ছিঃ ছিঃ, ঠাকুরপোর চরিত্র আর শুধরালো না! এ সব দেখাও পাপ, শোনাও পাপ। চ, ব্যাটা ঘর চ।

লুলারাম খুড়ার কথাগুলো এখনও মনের ভেতর ঘাই দেয়। সৎ-পথে তার মাটির দোতলা ঘরখানা ওঠে নি। এই ঠাঁটবাট, চলা ফেরা এসবের জন্য টাকা-পয়সা দরকার। এ সব খরচা আসে কোথা থেকে? চুনারাম পেছনের চামড়ার খড়ি উসকে বলে, উৎপাতের ধন চিৎপাতে যাবে, তুই দেখে নিস দাদু। চাঁদ—সুয্যি এখনও আলো দেয় রে, তুই দেখে নিস দাদু, ওদের ভালো হবেনি। যারা পরের ধনে পোদ্দারী করে তাদের সেই ধন খসে যায়।

নাল ফুলের ডাঁটায় বাঁ-হাতের বেড় ভরে গিয়েছে রঘুনাথের। জলজ ডাঁটাগুলো থেকে অদ্ভুত একটা সুঘ্রাণ আসছে, টাটকা ফুলগুলোও কম যায় না, সুগন্ধ গায়ে মেখে ওরা সব যেন জলকুমারী! রঘুনাথ ওদের নরম শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে, আদর করে। মন ভরে যায়। এতক্ষণ জলে থাকার মেহনতটা সুদে আসলে উঠে যায়। ডাঙার কাছে সাঁতরে গিয়ে সে চুনারামকে ডাকে, দাদু, ধরো।

জলে ভেসে গেলে আর আমি জড়ো করতে পারব না। হেঁপ্‌সে গিয়েচি।

হাঁটুজলে নেমে নালফুলের ডাঁটিগুলো যত্ন নিয়ে ডাঙায় ছুঁড়ে দিচ্ছিল চুনারাম। বার বার জল থেকে ডাঙায় ওঠা সময় সাপেক্ষ কাজ, সময় বাঁচাতে চুনারামের বুদ্ধিটা মনে মনে তারিফ করল রঘুনাথ। মনে মনে সে ভাবল আজ ঘরে ফিরলে দুর্গামণির আঁধার মুখে আলো ঝরে পড়বে। অনেক দিন পরে মায়ের খুশি মুখটা দেখতে পাবে সে। গুয়ারাম খাটতে যাবার পর থেকে কেমন মেঘলা হয়ে আছে দুর্গামণির মনটা। রঘুনাথ আড়চোখে দেখেছে। তারও মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। অভাবই এই মন খারাপের জন্য দায়ী—একথা বুঝতে আর বাকি নেই রঘুনাথের। আর একটু বড়ো হয়ে অভাবের টুঁটিটা সে টিপে ধরবে। লুলারাম কাকার কথাগুলো সে আজও মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি। কথাটায় দম আছে; মদের মতো নেশা হয় শুনলে। পরের ধন চুরিয়ে যারা বাঁচে তারাও তো মানুষ। তাদের কেউ ডরে, কেউ ঘেন্না করে। তবে তারা বেশ ঠাটবাট নিয়ে থাকে। তাদের কাছে নিজ-হাত জগন্নাথ। কোনো কাজই তো পাপের নয়। বিধান যদি এই হয় তাহলে পাপের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। রঘুনাথ অন্যমনস্ক হয়ে গেল ভাবতে-ভাবতে। জলে গা-ভাসাতে আর ভালো লাগল না তার। উড়ুলমাছের চেয়েও জোর-গতিতে সাঁতার কেটে সে ডাঙার কাছাকাছি এল। চুনারামকে বলল, তুমি ডাঙায় ওঠো, আমি একদিকটা সামলে নিচ্ছি।

—পারবি রে দাদু?

—না পারার কি হল? রঘুনাথের গলায় ছোকরা হয়ে ওঠার জেদ ঝরে পড়ল। নাল ফুল আর ডাঁটা লোকে নিয়ে সে জল সাপড়ে ডাঙায় উঠে এল। ডাঙায় উঠে বাঘ দেখার মতো চমকে উঠল সে, বুকের মধ্যে চলতে থাকল আটাচাকির মেসিন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই নীলাক্ষবাবু কোঁচা সামলে সাইকেল থেকে নেমে পড়লেন। ভরদুপুরে এদের পুকুরয়াড়িতে দেখতে পাবেন আশা করেন নি; তিনি অবাক হলেন, কি ব্যাপার, তোমারা এখানে কী করছ?

চুনারাম ভেজা হাত পরনের খাটো ধুতিতে মুছে নিয়ে হাসল, এই যে বাবু, নালফুল তুলচিলাম। পেটের ধান্দায় কুথায় না যেতে হয় গো!

—তা বলে যাওয়ার আর জায়গা পেলে না? শেষ পর্যন্ত আমার এই পুকুরটাই তোমাদের নজরে পড়ল? বলিহারি দিই তোমাদের চোখকে। নীলাক্ষবাবুর গলা চুঁইয়ে ঘৃণা আর বিস্ময় পাশাপাশি ঝরে পড়ল, তিনি এক দৃষ্টিতে নালফুলগুলোর দিকে তাকালেন, এগুলো তুললে যে, অনুমতি নিয়েছ?

অসহায় ঘাড় নাড়ল চুনারাম, জলের মুফুতে জিনিস, কত লোকে তো নেয় বাবু, আমি না হয় দুটো ডাঁটা না বলে তুলে নিয়েচি।

—কেন নিলে? আমার জলের ফসল আমার, মানো তো কথাটা? রাগে লাল দেখাচ্ছে নীলাক্ষবাবুর চোখ দুটো। সেই অগ্নিবর্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ ম্যাদামারা হয়ে গেল চুনারামের, তার ভাবখানা এমন, সে যেন টানাজাল ফেলে সব মাছ ধরে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এখন ধরা পড়ে যাওয়াতে কাঁচুমাচু মুখ। তাকে দেখে হুঁকরে উঠলেন নীলাক্ষবাবু, জান, আমি তোমাকে থানায় ঢুকিয়ে বেধড়ক মার খাওয়াতে পারি।

—জানি, সে ক্ষেমতা আপনার আচে, বাবু! আপোসের পথে হাঁটতে চাইল চুনারাম, এবারকার মতো ছেড়ে দিন গো, বেলা বাড়চে ঘর যাই। তাছাড়া ভোখও লেগেচে জব্বর। পেটের ভেতর খিদে ভাবটা কুকুরের নখ হয়ে আঁচড় কাটচে।

অনেকক্ষণ পরে নীলাক্ষবাবুর নজর রঘুনাথের উপর পড়ল, তোমার সাথে এটা কে?

—আজ্ঞে, গুয়ারামের ব্যাটা।

—ওঃ। তা এখন থেকে ওকে হাত ধরে সব শেখাচ্চো বুঝি? নীলাক্ষবাবু ঠোঁট বেঁকাল, রক্তের দোষ আর যাবে কোথায়? কালকেউটের ছা তো কালকেউটেই হয়। কেউ হেলে সাপ হলে ওরা তাকে মেরে ফেলে।

—দুটো ডাঁটার জন্যি এত কতা বলা কি নেয্য হয়, বাবু? চুনারামের কথায় হোঁচট খেলেন নীলাক্ষবাবু। তিনি আগের মতো উত্তেজিত হলেন না, শুধু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তোমাদের সাহস দেখে আমার খুব অবাক লাগছে। দিনে দিনে আর কত কী যে দেখতে হবে।

—দেখার তো সবে শুরু। মুখ ফসকে রঘুনাথের গলা ঠেলে বেরিয়ে এল কথাগুলো। নীলাক্ষবাবু অবাক চোখে তাকালেন, তুমি চুপ করো হে ছোকরা? সেদিনের ছেলে, নাক টিপলে দুধ বেরয়, তার আবার বড়ো বড়ো কথা।

—এখন তো ছোট মুখে বড়ো কথা শোনা যায়। রঘু কথাগুলো বলেই মাঝ পুকুরের দিকে তাকাল, নালফুলগুলো আমরা না নিলে ও গুলান পচে যেত। জল নষ্ট হোত ওতে। বদঘেরাণ ছাড়ত, সেটা কি ভালো হোত?

—ভালো-মন্দ যা বোঝার আমি বুঝব, তুমি আগ বাড়িয়ে কথা বলার কে? নীলাক্ষবাবুর চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। রাগে ফুঁসছিলেন তিনি। ছেলেটার স্পর্ধা দেখে তিনি বিস্মিত। ছোটলোকদের এই বাড় কোনোমতে সহ্য করা যাবে না, ফলে গায়ে গরম তেল ছিটিয়ে পড়ার যন্ত্রণা শুরু হল নীলাক্ষবাবুর, তোমার বাবার নাম কি আমি জানতে পারি?

—শ্রীগুয়ারাম রাজোয়ার! রঘুনাথ ঘাবড়াল না।

নীলাক্ষবাবু দাঁত দিয়ে দাঁত ঘষলেন, হালকা হলেও সেই ঘর্ষণের শব্দটা তার কানে বোলতার ভোঁ-ভোঁ আওয়াজের মতো বিশ্রী শোনাল, দরকার হলে আমি আজই থানায় যাব। আজ পুকুরে নালফুল তুলছে, কাল সুযোগ পেলে মাছ ধরবে। এটা কি মামার বাড়ি? যা খুশি তাই করবে। থানার বড়বাবু আমার চেনা-জানা। দেখি শেষ পর্যন্ত কী করা যায়। নীলাক্ষবাবু উবু হয়ে ডাঁটাগুলো খামচে ধরলেন, তারপর সক্রোধে ছুঁড়ে দিতে চাইলেন জলের দিকে। চুনারাম কালবিলম্ব না করে বাবুর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, এ কাজ করবে নি বাবু, বড়ো আশার জিনিস। ঘরে কুনো বাজার নেই। এগুলান নিয়ে গেলে চচ্চড়ি হবে। কত আশা করে নাতিটা পুকুর থিকে তুলেচে।

—ঠিক আছে, আজকের মতো নাও। পরে যদি দেখি ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। নীলাক্ষবাবু গা থেকে ক্রোধ ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন। যাওয়ার সময় তিনি কঁড়া চোখে রঘুনাথের দিকে কটমট করে তাকালেন, শোন ছোকরা, তোমার সাথে আমার আবার দেখা হবে। আজকের দিনটার কথা মনে রেখো, তাতে দু'পক্ষের মঙ্গল। রঘুনাথ গুরুত্ব দিল না নীলাক্ষবাবুর কথাকে, অবজ্ঞায় শক্ত হয়ে উঠল তার ঠোঁট, আমিও চাইচি—চটজলদি আবার দেখা হোক। যত দেখা হবে তত সম্পর্ক আরও ভালো হবে।

ওরা দু-জন দু'দিকে ছিটকে গেল।

ফেরার পথে চুনারামের মুখে কোনো শব্দ নেই। খাঁ-খাঁ রোদের ভেতর সে একমনে হাঁটছিল। রঘুনাথ তাকে তাতানোর জন্য বলল, কি গো দাদু, ভয়ে কি দম এটকে গেল নাকি?

পায়ের গিঁট ফুটিয়ে চুনারাম ভয়ার্ত চোকে তাকাল, বাবু লোক ভালো নয়, হারামীর হদ্দ। আশেপাশের গাঁ-গুলাকে জ্বালিয়ে মারচে। ভয় তো হবেই। খরিস সাপের লেজে পা দেওয়া তো মুখের কথা নয়।

—মিচিমিচি ভয় পেওনি তো? রঘুনাথ দম নিল, এই তো দেখলে লাঙল যার জমি তার নিয়ে কত লড়াই হয়ে গেল। কারা জিতল? সে তো তুমি নিজের চোখে দেখলে! ফলে বাবুদের অতো ফটফটানী থাকবে না। তবে সময়ের সাথে ওরা যদি না বদলায় তাহলে পরে মুখ থুবড়ে পড়বে।

—তুই এসব কতা শিখলি কুথা থেকে?

—কেসনগর থিকে মাস্টুর আসে, সে আমাদের আখ খেতে কেলাস নেয়।

—আগে বলিস নি তো?

—মাস্টুর মানা করেচে।

—মাস্টুর আর কী কী বলেচে? আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে পড়ল চুনারাম। তার ভয়-ভয় করলেও সে কথাগুলো শুনতে চায়।

রঘুনাথ উৎসাহিত হয়ে হাতের মুঠি পাকাল, তারপর গলার রগ ফুলিয়ে ডান হাত মুঠো করে ছুঁড়ে দিল শূন্যে, লড়াই-লড়াই লড়াই চাই। লড়াই করে বাঁচতে চাই। বুঝলে দাদু, লড়াই ছাড়া এদেশে কিচু হবার নাই। কুশলবাবু বলেচে—সে আসচে রোববার আসবে। এবার গাঙধারে মিটিং হবে। হলদেপোঁতা ধাওড়া থেকে শুরু করে বসন্তপুর ধাওড়া থিকেও লোক আসবে। ইবারের মিটিংটায় খাস জমি দখল নিয়ে কথা হবে।

—খাস জমি যে দখল নিবি—জমিটা কুথায়? চুনারাম খ্যা-খ্যা করে কালো দাঁত দেখিয়ে হাসল, বাবুদের বোন্দুক আচে, তুই বাপু ওসব ঝুটঝামেলায় যাবি নে। গুয়া যদি জানে তো লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে ছাড়বে। ওর রাগ তো জানিস, দিবে ঘর থেকে বের করে। কথায় কথায় বেলা ঢলে পড়ে, অশ্বত্থের ডালে হাজার-কিসিমের পাখি এসে জড়ো হয়েছে। ওদের ছোট-বড়ো চিৎকারে বাতাস পুলকিত হয়ে হিল্লোল তুলেছে তেলা পাতায়। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল রঘুনাথের, টিউকলটার দিকে তাকিয়ে সেই শুকনো ভাবটা খরার মাটির চেয়েও খড়খড়ে হয়ে উঠল।

—দাদু, তুমি টুকে দাঁড়াও। রঘুনাথ ছুটে গেল কলের দিকে। সরকারি এই কলের জল যেন চিনি পাতা সরবত। খরানী দিনে এর শীতল জল যেন পাতাল থেকে স্বেচ্ছায় উঠে এসেছে মানুষের সেবায়। এই শেষ-দুপুরেও কলপাড়ে ভিড়ের কোনো শেষ নেই। নূপুর মাটির কলসী নিয়ে এসেছে জল নিতে, ওর বেণী করা তেল জবজবে চুল শিরদাঁড়ার দু'দিকে ঝুলে আছে কালো রঙের সাপের মতন। টিউকলের হ্যাণ্ডেলে চাপ দিলে ভসভসিয়ে জল উঠছে পাতাল ফুঁড়ে। নূপুর অবাক হয়ে দেখছে সেই স্ফটিকস্বচ্ছ জল। রঘুনাথ গিয়ে সেখানে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল, এই সর বলচি। তেষ্টা পেয়েচে। ভরপেট জল খাবো। এই বুন, কল দাবিয়ে দে নারে।

আব্দারের কথায় নূপুর বেজে উঠল খুশিতে, নে। তবে মুখ লাগাবি নে। জানিস রঘুদা, এই ধাওড়াপাড়ার টিউকলে কত বাবুলোকে তেষ্টা মেটায়।

রঘুনাথ খুশি হল না কথা শুনে। কলসীতে জল ভরে নূপুর তার ছোট্ট কোমরের খাঁজে আটকে নিল। অমনি কলসী চুয়ানো জলে তার হলদে রঙের পুরনো ফ্রকটা ভিজে রঙবদল করে ফেলল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নূপুর বলল, রঘুদা, তুর খোঁজে সেই বামুনপাড়ার ঢ্যাঙ্গা ছেলেটা এসেছিল। জেঠি বসতে বললে সে বসল না। যাওয়ার সময় বলল, সে কালীগঞ্জ থিকে বিকেলবেলায় ফিরবে। তোকে ঘরে থাকতে বলেচে। কী যেন দরকার।

রঘুনাথ চুপ করে থাকল। সূর্য সময়-অসময়ে এখন ঘরে আসে। দশ বছর আগেও তার বাপ-ঠাকুরদা এদিকের ছায়া মাড়াত না। তবে কি সময় ঢলছে? নাকি নতুন করে সূর্য উঠবে আবার।

বিকেলবেলায় লাখুরিয়ার ওদিক থেকে একখণ্ড মেঘ কালো দৈত্যের চেহারা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধাওড়াপাড়ার মাথার উপর, চক্কর কেটে চতুর চিলের মতো ওড়ে, উড়তে উড়তে হুস করে মানিকডিহির ঘাটের কাছে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যায়, তাকে আর দেখতে পায় না চুনারাম। শুধু বুক ফুঁড়ে উঠে আসা একটা বড়োশ্বাস বুকের পাকা লোম কাঁপিয়ে সরসরিয়ে নেমে যায় পায়ের গোড়ালির দিকে। চুনারাম অস্ফুটে বলে ওঠে, আজও ভাগলো, আজও ঠকালো। শালা আকাশটাও কেমুন হারামী হয়েচে দেখো, ঢালব ঢালব করেও ঢালচে না। মানুষগুলার সাথে ধ্যাসটুমু মারাচ্চে। চুনারাম আর নিজেকে নিজের ভেতর ধরে রাখতে পারে না, চাপা রাগটা ক্ষরিস সাপের মতো ফণা তুলতে চায় প্রকৃতির বিরুদ্ধে। দেশ-গাঁ জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেলে এখন তার অত চিন্তা নেই, তার যত চিন্তা শুধু গুয়ারামকে নিয়ে। ছেলেটা বুনোপাড়ার দলের সঙ্গে মুনিষ খাটতে মানিকডিহির ঘাট পেরিয়ে নয়াগ্রামের দিকে চলে গিয়েছে। ওদিকটায় বর্ধমান, শুনেছে সেখানে নাকি চাষকাজের লোকের বড্ড অভাব, টাকা ছড়ালেও কাজের লোক পাওয়া যায় না, ফলে মাঠকাজে সেখানে বরষার দিনে ভীষণ অসুবিধে। বৃষ্টি না হলে ছেলেটা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে বিদেশ বিভুঁইয়ে, যা সাথে করে নিয়ে গিয়েছে তা-ও আঁজলা চুয়ানো জলের মতো নিঃশেষ হয়ে যাবে, আসলে বসে খেলে সসাগরা পৃথিবীটাকে চিবিয়ে খেতে মানুষের বেশিদিন লাগবে না। দুলাল আর ইন্দুবালার ঘর আসার কথা শুনেছে সে, তবে ওরা এবার বসন্তপুর ধাওড়া হয়ে আসবে, সেখানে দুলালের বড় মেয়ে বিন্দুর বিয়ে হয়েছে, তাদের সংসারে কী সব অশান্তি, তা মিটমাট করে না এলে বিদেশে—বিভুঁইয়ে গিয়েও শান্তি নেই দুলালের। দুলাল এই আসে ওই আসে বলে চুনারামের ভেতরটাতে অপেক্ষার ট্যাক গজিয়ে গিয়েছে, এখন একটা উন্মনা অস্থিরতা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে হরসময়। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকতে বেলা গড়ে যায় পশ্চিমে, রোদের তেজ মরে আসে শুকনো তেজপাতার মতো, আর ঠিক তখনই রঘুনাথকে দুলালের ঘরে বলে কয়ে পাঠাল চুনারাম। রঘুনাথের যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, বিশেষ করে খাওয়ার পরে তার একটু গড়িয়ে নেওয়ার দরকার, এটা এখন এক প্রকার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তবু চুনারামের অনুরোধকে ঠেলতে পারল না রঘুনাথ, আর সেই সঙ্গে দুর্গামণিও চাইছিল রঘুনাথ যেন দুলালের ঘরে যায় এবং খোঁজ নিয়ে আসে। মায়ের দুঃখী মুখের কথা ভেবে রঘুনাথ দুলালের ঘরে গিয়েছিল, এবং সেখানে দুলালের বুড়ি মা ভূষণী ছাড়া আর কেউ নেই। ভূষণী বুড়ি খনখনে স্বরে যা বলল তার অর্থ করলে দাঁড়ায়, সে ছেলে এখুন আসবে না গো। আসা কি মুখের কথা? এ তো লাখুরে—হলদেপোঁতা ধাওড়া নয়, পথ যে অনেকটা, এট্টা নদী পেরতে হয়, তাপ্পর হাঁটা পথে ক' ক্রোশ আমি ঠিক জানি নে বাবু। ছেলেটারে আগে ঘর ধরতে দাও, ঘর এলে আমি তারে তুমাদের ঘরে পেঠিয়ে দেবো। চিন্তা করো না।

ভূষণীবুড়ি এই বয়সে একা আছে, ঘর সামলায়, স্বপাক খায়। শরীর ভালো বুঝলে সে ভিখ মাঙতে যায় পাড়ায়-পাড়ায়। দশ ঘরের চাল ফুটিয়ে না খেলে তার খিদে মরে না। আসলে অভ্যেস, স্বভাব দোষ যাবে কোথায়। দুলালের বাপ গত হবার পর ভিক্ষাই ছিল তার একমাত্র জীবিকা, এত দিনেব অভ্যাসকে সে তাই ভুলতে পারেনি, কেউ বাধা দিলে সে ফোকলা মাড়ি বের করে বলবে, ভিখ মাঙাটা অক্তে ঢুকে গিয়েচে গো, ঘরে হাত মুড়িয়ে বসে থাকলি পরে

শরীলটা ম্যাজম্যাজ করে, সুখের ভাত হজমাতে চায় না। শুনলে হাসবে—ভিখ মাঙতে না গেলে রাতে আমার নিদ হয় না।

রঘুনাথ বেজার মুখে ঘর ফিরে এসে চুনারামকে কথাটা উগলে দিয়ে আর দাঁড়াল না, এক ছুটে টেরি বাগিয়ে বাঁধের গোড়ায় গিয়ে কদমছায়ায় দাঁড়াল। সূর্যর আসার সময় হল, সে গেলে সাইকেল ঠনঠনিয়ে এ পথ দিয়ে যাবে, এবং অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করে যাবে। সূর্য লাখুরিয়ার হাই ইস্কুলে পড়ছে, অথচ রঘুও ওই ইস্কুলে পড়তে পারত, কিন্তু তার বাবার জন্য বড়ো ইস্কুলে শেষঅব্দি পড়া তার হল না। প্রধান বড়ো মুখ করে বলেছিল, বুনোঘরের কোনো ছেলে যদি পড়তে চায় তার সবরকম খরচাপাতি তিনি সরকার থেকে পাইয়ে দেবেন। কথাটা গুয়ারামের কানে পৌঁছেছিল। কিন্তু গুয়ারাম রাজি হল না, ওর সাহসেও কুলাল না কেন না এর আগে সে এরকম বড়ো বড়ো কথা শুনেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোটাই তাদের কপালে জোটে নি। ছেলেকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিতে সে রাজি নয়, তার চেয়ে নিজের কাজে লেগে যাক। দু-পয়সা কামাক, তা সংসারের দায়ে-অদায়ে লাগবে। মায়ের সঙ্গে পাড়ার সব গোরু নিয়ে চরাতে যেত রঘুনাথ, দুর্গামণির কোঁচড় ভর্তি মুড়ি, যার জন্য ভরদুপুরেও ঘর আসত না তারা, বুড়িগাঙের জলে মুড়ি বাঁধা গামছা ভিজিয়ে পাটালি কিংবা ভেলিগুড় দিয়ে দুপুরের আহারটা সেরে নিত তারা। গোরু চরানোয় যে এত সুখ আগে জানত না রঘুনাথ, পরে যত দিন অতিবাহিত হল—এই সুখ একদিন নেশায় পরিণত হল, সেই সঙ্গে খুলে গেল মনের জানলা-দরজা। বাবুদের গোরু চরাতে এসে কৃষ্ণনগরের কুশল মাস্টারের সাথে তার পরিচয়। এত ভালো মানুষ তাদের আশেপাশের দশ-গাঁ ঘুরে এলেও পাওয়া যাবে না। কুশল মাস্টারের কথায় জাদু আছে যে জাদু হরিনাথপুরের কদবেলতলা ধাওড়াপাড়ার বিদুর রাজোয়ারের আছে। শুধু বিদুর নয়, তার স্ত্রী লাবণি রাজোয়ারও কম যায় না, ওরা এখন সব ধাওড়াপাড়ায় গিয়ে মিটিং-সভা করে বেড়াচ্ছে, বিচারসভার গাঁওবুড়োকে ওরা কোনো পাত্তাই দিতে চায় না। ওদের কথা মন দিয়ে শুনলে গায়ের খুন গরম হয়ে যায় রঘুনাথের। একা থাকলে সেসব কথা মনে পড়ে ওর, মাছ ঘাই দেওয়ার মতো তোলপাড় করে দেয় মন, বাবুদের তখন মনে হয় কালীপুজোর তুচ্ছ শ্যামাপোকা, ওদের ভয় করে কি হবে, ওদের না আছে হুল, না আছে তেজ-বিষ। ওরা ঢোঁড়া সাপেরও অধম, শুধু চেহারায় দশাসই রাবণ। ওদের সাথে মিশে বাবুদের আর ভয় পায় না রঘুনাথ, বাবুরা উল্টা-সিধা বললে সে মুখের উপর জবাব দিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে মনের ভেতর আনন্দ এসে জড়ো হয়, আর সেই অন্তর্গত আনন্দটা জিয়োল মাছের মতো রক্তের পুকুরে বেঁচে থাকে ঢের দিন। এখন সময় পেলেই সে হাঁটতে হাঁটতে কদবেলতলার ধাওড়াপাড়ায় চলে যায়। বিদুর আর লাবণির সঙ্গে গল্পগুজব করে ফিরে আসে সাঁঝের বেলায়। দুর্গামণি বকাঝকা করলে সে দাঁত বের করে হাসবে, ও তুমি বুঝবে না মা। সব কতা সবার মগজে কি ঢোকে গো।

—আমার ভয় করে বাপ। শুনেচি ওরা মানুষ ভালো নয়, সুযোগ পেলে মানুষ খেপায়, মানুষ তাতায়। হাসি মিলিয়ে যায় দুর্গামণির শুকনো মুখের। ভয় এসে রাতচরা বাদুড়ের মতো খামচায় মুখের চামড়া।

গুয়ারামের কথা ভেবে চুনারামের রাতের ঘুম উধাও। গুয়ারাম ভিন গাঁয়ে গিয়ে কী খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে এই নিয়ে যত চিন্তা। বাপকে নিয়ে রঘুনাথের কোনো মাথাব্যথা নেই, সে জানে তার বাবা যেখানে থাকবে ভালো থাকবে। মানুষের ঘাড়ে দায়িত্ব না চাপলে সে ভার বইতে পারে না, এমনকী সিধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সেদিক দিয়ে দুলাল যা করেছে ভালো করেছে,

অন্তত কটা দিন ওই কুঁড়ে মানুষটা কাজের মধ্যে থাকতে পারবে যা তার নিজের জন্য মঙ্গল তো বটে, পুরো সংসারের জন্যও সুখের।

চুনারাম বিকেলের দিকে ঘর ছাড়লে হাতে একটা বেতের লাঠি আঁকড়ে ধরে। আজ সে যে লাঠিটা নিয়েছে সেটা তার দাদুর আমলের। শুনেছে এই লাঠিটা দেবগ্রামের গোরুর হাট থেকে কেনা, এই তেলতেলা লাঠিটার বয়স শ'বছরের কম হবে না। লাঠি হাতে নিয়ে হাঁটলে শুধু শরীরের নয়, মনের বয়সও বেড়ে যায়। তখন বাঁধের ধার দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িগাঙের চেয়েও নিস্তেজ মনে হয় নিজেকে। অথচ এই লাঠিটা আঁকড়ে ধরলে শরীরে একটা টগবগে স্ফূর্তি আসে, আত্মবিশ্বাস প্রজাপতির মতো ফুরফুর করে ওড়ে মনের বাদাড়ে।

এখন আলোর রঙ সর্ষেফুলের চেয়েও নজরকাড়া। লাখুরিয়া থেকে উড়ে আসা মেঘটা ছুটে চলে গিয়েছে গাঙের দিকে। ফাঁকা বাঁধের উপর দাঁড়ালেও মেঘের রংটা বোঝা যায় না। এবছরটা খরা জ্বালাবে গাঁ। নামসংকীর্তনের দল খোল-করতাল বাজিয়ে গ্রাম ঘুরবে ভোরবেলায়। ললিত রাগিণীর সুর ভাসবে বাতাসে, হারমোনিয়ামের ব্লো টেনে কৃষ্ণনামের সুর ভাসবে সারা গাঁ-ময়। চুনারাম শুনেছে আজ থেকে দু'ক্ষেপে হবে নামগান। ভোরবেলা আর সাঁঝবেলায়। গাঁওবুড়া গ্রামসভা ডেকে বলেছে, তুলসীমঞ্চে ঝারা বাঁধো সব্বাই। মা তুলসী শেতল হলে পুরা ধরণী শেতল হবে। নামগানের জোরে মেঘ ঝরবে, এছাড়া কুনো গত্যন্তর নেই।

গাঁওবুড়ার কথা মেনে নিয়েছে সবাই। সেই সঙ্গে সবাই একবাক্যে বলেছে, গাঁয়ের ধুলোয় পাপ মিশেছে। যে পাপ করছে সে ভেবে দেখুক বারবার। একার পাপে হাজার কেন কাঁদবে। কথা শেষ হলে পুরো সভা মুনিরামের দিকে তাকিয়েছে। আর তাতেই চমকে উঠেছে কুষ্ঠরোগী মুনিরাম। বারবার ঢোক গিলে সে খড়খড়ে গলায় বলেছে, আমাকে দোষ দিও নি গো, আমি আর সাতে-পাঁচে নেই। ওসব কু-বিদ্যে আমি ছেড়ে দিয়েছি বহুৎ দিন হল। আমি এখন আমার মতো করে বাঁচি।

—তুমার কথা বলচি নে মুনি। সভার সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটি মুনিরামের দিকে তাকিয়ে কাশল, সন্দেহ পাকমোড়া মারছে তার পুরো শরীরে, মুনিভাই তোমার কথা হচ্ছে না, হচ্ছে তুমার ছেলে লুলার কথা। ওর চলন-বলন ভালো ঠেকচে না আমাদের। খবর আছে ফি-রাতে ও ঘরে থাকে না।

মুনিরাম তেনা জড়ানো শরীর হেলিয়ে খুঁক খুঁক করে কাশল, আমি যত দূর জানি ব্যাটা আমার কু-কাজ করতে বেরয় না। সে এখন ঘরেই থাকে। আমার ঘরের বউটা তাকে রাত-বেরাতে যেতে দেয় না। বউয়ের কোল ছেড়ে লুলা আমার কেন যাবে বলো? ওপরওয়ালার দয়ায় আমার কি খাওয়া-পরার অভাব আচে? সে সব তো তুমরা নিজের চোখে দেখচো।

—দেখচি বলেই তো এত কথা বলা। সভা গমগমিয়ে উঠল, লুলার স্বভাব-চরিত্তির ভালো নয়। ভিকনাথের বউটার সাথে লটঘট চলছে। অনেকে ওদের আঁধার রাতে বাঁধের ধারে ঘুরঘুর করতে দেখেচে। বল, এসব তো ভালো নয়। এটাও তো সেই অনাচারের মধ্যে পড়ে। কী বলো?

মুনিরামের মুখে যেন এঁটেল মাটির কাদা লেপে দেয় গ্রামসভা। কথা হারিয়ে বুড়োটা ভ্যালভ্যাল করে তাকায়। বুকের ভেতরটা তার ঢিসঢিস করে ভয়ে। যৌবনে তার সামনে এমন কথা বলার হিম্মোত কেউ রাখত না। তখন ঘোড়ায় চেপে বাঁধের ধারে টহল দিত মুনিরাম। তার কালো ঘোড়াটা হাওয়ার গতিতে ছুটত, দেবগ্রাম পৌঁছোতে সময় নিত বিশ মিনিটেরও কম। এ গ্রামের মানুষ সেই প্রথম আরবী ঘোড়া দেখে। মুনিরাম ঘোড়াটা কিনেছিল পলাশী মনুমেন্টের এক সাহেবের কাছ থেকে। কালো রঙের তেল চুয়োনো ঘোড়াটা সাহেবের বিশেষ পছন্দের ছিল।

কিন্তু দেশে ফেরার সময় ঘোড়া নিয়ে তো উড়োজাহাজে চড়া যাবে না, তাই জলের দামে বেচে দেওয়া। সাহেবঘোড়ার মেজাজ ছিল সাহেবের মতো, ছোলা ভুষি গুড় কচিঘাস ছাড়া সে আর কিছু খাবে না। যে কেউ তাকে ছুঁলেই পেছন পা দিয়ে লাথ ছুঁড়ে দিত সজোরে, চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দে পিলে চমকানো ডেকে উঠত তার অনিচ্ছা জানিয়ে। সেই জাঁদরেল ঘোড়াকে শেষ পর্যন্ত বশে এনেছিল মুনিরাম। চাবুকের ভয় পশুরও আছে। এক টানা দশ মাইল দৌড়ে ঘোড়াটাকে জব্দ করেছিল সে। পরে এই ঘোড়া তার অবস্থা ঘোরাতে সাহায্য করে। অমাবস্যা রাতে গাছপুজো সেরে মুনিরাম চলে যেত পরের দোরে ডাকাতি করতে। তার ঘাড়ে চামড়ার প্লেটের সাথে টাইট করে বাঁধা থাকত ছররা বন্দুক। কাজ শেষ করে ওই বন্দুক সে লুকিয়ে রাখত খড়গাদায়। থানা থেকে পুলিশ এলে টের পেত না কোনো কিছু। চোরাই মাল পুকুরে বস্তায় বেঁধে রেখে আসত মুনিরাম। জলের তলায় মাসের পর মাস পড়ে থাকত বাসন-কোশন সোনা দানা। তখন ছিল সুখের সময়, তখন চোখ টাটাত মানুষজন। আজ কত বদলে গেছে হলদেপোঁতা ধাওড়াপাড়া, তবু মানুষের মন থেকে ঈর্ষার কঠিন আঁচড় মুছল না। লুলারামের পেছনে লেগেছে সবাই। ছেলেটার বদনাম করতে পারলে ওরা আর কিছু চায় না। ভিকনাথের কচি বউটাকে নিয়ে এসব গল্পকথার কোনো মানে হয়? কষ্টে বুক ভেঙে যেতে থাকে মুনিরামের, তবু সে ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে। পরক্ষণে তার মনে হয় লুলারামকে তার বিশ্বাস নেই। যৌবন গঙ্গার পাড় ভাঙা ঢেউয়ের মতো, উপর থেকে কিছু বোঝা যায় না, তলায় তলায় চাকু শানায়। দশ লোকে যে কথা বলে তা কি আর ভুল হবে? যা রটে তা কিছু না কিছু বটে। এবার থেকে চোখে-চোখে রাখতে হবে ছেলেটাকে। বউটা আর পেরে ওঠে না, ওরও তো মাথার কোনো ঠিক নেই, গরম চড়লে ঘিলু গলে যায়, শুরু হয় পাগলামী। ইংরেজি দাবাই করিয়ে এ রোগের কোন সুরাহা হবে না, আয়ুর্বেদ কিংবা তুকতাক ঝাড়ফুঁকে একে জব্দ করার ওষুধ আছে। মুনিরাম তার বিশ্বাস নিয়ে পড়ে আছে বছরের পর বছর। ঢিলি গাছগাছড়ার ওষুধ খায়, কিন্তু কোনো সুফল পায় না। প্রভাবুড়ি রোজ সকালে এসে তাকে ঝাড়ফুঁক করে যায়, সেই সঙ্গে মন্ত্রপোড়া জল খাইয়ে যায় কিন্তু এতেও কোনো ফল হয় না। আসলে বিধি মারলে ওষুধ মেলা ভার। ঢিলি তাই বুনো হাওয়ার মতো দৌড়ে বেড়ায়, তার রাত-বেরাত নেই, খরা-বর্ষার ধার ধারে না। সে স্বাধীন জলের ধারা। তাকে ঠেকানো যায় না, আটকানোও যায় না।

সভা শেষ হলে মুনিরাম একা হয়ে যায়, কানের ভেতর ঝাঁ-ঝাঁ বোলতার কামড় নিয়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সে পাড়ায় ফিরে আসে। ধারে-কাছে সে লুলারামকে দেখতে পায় না। ঢিলি মাটিতে পা-থেবড়ে বসে খোলামকুচি দিয়ে আঁচড় কাঁটছিল। মুনিরাম তার দিকে এগিয়ে গেলে সে চিল্লিয়ে ওঠে, খবরদার, এদিক পানে আসবে না। আমি ঝারির পুতুল গড়িয়েচি গো। ওর বুকে আমি হলাবান মারব। ওকে আমি নাগবান মেরে বিষ ঢালব। ও মাগী আমার সব খেল গো। ওর জন্যি আমি আজ ভাতার ছাড়া।

মুনিরাম কী বলবে কথা খুঁজল। সে কিছু বলার আগেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল ঢিলি, ধুলো হাতটা ছাপা শাড়িতে মুছে সে ছাতা ধরা দাঁত বের করে খ্যা-খ্যা করে হাসল, বুড়ার আবার মরণ দেখো, ছেলের হয়ে বলতে এয়েচে। ছ্যা- ছ্যা! ও আবার ছেলে নাকি? ওতো ছেলি—প্যাঁঠা। বদা গো, বদা! বুঝোনি। হা-হা-হা! থুতু ছিটিয়ে হাসি ছড়াল ঢিলি। লাঠিতে ভর দিয়ে কিছুটা তফাত-এ দাঁড়াল মুনিরাম, লুলারে দেখেচো, সে কুথায় গেল বলতে পারো?

—পারি গো সব পারি। কেনে পারব নাই। ঢিলি বুক দুলিয়ে হাঁপাচ্ছিল, বেধুয়ার বেটা বেধুয়া হবে এ আর বড়ো কি কথা! এতদিন নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে বুড়া এখন এয়েচে ছেলের খোঁজ

করতে। মরতেও দড়ি জোটে না। রাগে শরীরটা তেতে উঠলেও মুনিরামের এখন কিছু করার নেই। অসুখ তার ক্ষমতায় থাবা মেরেছে, মানুষের অভিশাপ তাকে আজ অক্ষম করেছে, সারাজীবনের পাপকাজে তার পাপের ডিঙা ভরে গিয়েচে, সে এ জনমের শাস্তি শেষ জীবনে পেয়ে গিয়ে নিজের প্রতি বড়ো বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে। গাঁয়ের লোক আড়ালে আবডালে বলে, মুনিরাম কুনোদিন মুনিও হবেনি, রামও হবেনি। যে মানুষটা আগাগোড়া শয়তান সে দেবতার সাজ পরলেও মানুষ ঠিক তাকে চিনতে পারে। পাপের বদঘেরাণ যে দুনিয়া ছাড়া। অত মানুষের চোখের জল কি বেথা যাবে।

মাঝে মাঝে দগদগে ঘাগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজেকে নিয়ে হিসাব কষে মুনিরাম। বামুনপাড়ায় ডাকাতি করতে গিয়ে সে সোনাদানা ছিনিয়ে নিয়েছিল বিধবার। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়ে পরের ঘরে তুলে দেবে মা। সেই মায়ের স্বপ্ন আর পূরণ হতে দিল না মুনিরাম। জোর করে ছিনিয়ে নিল আঁচলের চাবিগোছা। টিনের বাক্স খুলে বের করে আনল স্যাকরার দোকানে গড়ানো বালা বাউটি চুড় চন্দ্রহার। পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছিল বিধবা-মা, চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল দুঃখিনীর হৃদয়-সমুদ্দুর, ওগুলো নিও না গো, এর চেয়ে আমার জান নিয়ে নাও। এই ফালগুনে আমার মেয়েটার বিয়েঘর। ওর বাবা নেই। আমি বহু কষ্টে এগুলো জমিয়ে রেখেছি। এগুলো নিয়ে গেলে আমি পঙ্গু হয়ে যাব, খালি হাতে আমার মেয়েকে কেউ ছোঁবে না গো।

কেউ না নিক, আমি নেব। রানী করে রাখব। দেবে তো বলো।

তোর ওই মুখে পোকা পড়ুক। আমিও বামুনের মেয়ে। কোনোদিন পাপ আমাকে ছোঁয়নি। তোকে আমি শাপ দেব।

—তবে রে মাগী। চিৎ হয়ে শো। আজ রস গোটাব। হাত ধরে বউটাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিয়েছিল মুনিরাম। তারপর সে পশু হয়ে গেল নিমেষে। ধুতি সামলে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, যা এবার তোকে পাপ ছুঁয়ে গেল। এবার তুই প্রাণভরে আমাকে শাপশাপান্তি দে। আমি জানিরে—শকুনের শাপে গোরু মরে না। এলোমেলো শাড়িতে লজ্জাস্থান ঢেকে বিধবা মা'টি কাঁদছিল, তোকে আমি শাপ দেব, হ্যাঁ, হাজার বার দেব। যার মা-বোন জ্ঞান নেই সে বেঁচেও মরার মতো বাঁচবে। যে হাত দিয়ে তুই আমাকে ধরলি—সেই হাতে তোর কুঁড়িকুষ্ঠি হবে। খসে খসে পড়বে তোর হাত-পা। তুই নুলো হবি, তুই কৃমিকীট হবি। সবাই তোকে দেখে নাক কুঁচকাবে। তোর মুখে থুতু দেবে। পরের দয়া নিয়ে তুই বাকি জীবনটা বাঁচবি। আমি যদি সতী হই, আমার শাপ তোর ঠিক লাগবে।

মাত্র তিন বছরের মাথায় কুঁড়িকুষ্ট ফুটল মুনিরামের শরীরে। অসাড় হয়ে গেল শরীরের নিম্নাঙ্গ। তখন সত্যবতী বেঁচে, যৌবন কইমাছের মতো ছড়ছড়াচ্ছে অথচ তার কিছু করার নেই, শুধু পুঁজ-রক্ত নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া। বামুনবাড়ির বিধবা বউটার কথা মনে পড়েছে মুনিরামের, ভয়ে আঁতকে উঠেছে সে, পাপের ডোবায় সে তখন ডুবে যেতে গিয়ে নিজেকে বাঁচাবার উপায়গুলো হারিয়ে ফেলে। এক ঘনঘোর আচ্ছন্নতা, আত্মধিক্কার, অপরাধবোধ সেদিন থেকে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, এর থেকে নিষ্কৃতি সে আজও পায় নি।

হাঁটতে হাঁটতে বাঁধের গোড়ায় চলে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল চুনারামের কিন্তু অতটা খাড়াপথ লাঠিতে ভর দিয়ে উঠতে তার শরীর সায় দিল না। পিটুলিগাছটাকে পাশ কাটিয়ে সে ঘরের সামনের পথটায় এসে দাঁড়াল, ধুলোয় থিকথিক করছে পথটা, পা ফেললেই পায়ের চেটো ধুলোর বিছানায় ডুবে যায়, সারা পায়ে ধুলো জড়িয়ে নিজের পা'টাকে আর চেনা যায় না। ধুলোভরা পা দুটো যেন অন্য কারোর।

কঞ্চির বেড়ার উপর ফড়ফড় করে উড়ছে রাজফড়িং; কিছু দূরে একটা কালো কুচকুচে ফিঙে হা-করে দেখছে ফড়িংগুলোর গতিবিধি, একটু সুযোগ পেলেই ফিঙে পাখিটা উড়ে এসে খাবলা মেরে ধরে নেবে রাজফড়িং তারপর উড়ে গিয়ে কোঁত করে গিলে নিয়ে আবার অপেক্ষায় থাকবে দ্বিতীয় শিকার ধরার জন্য। আগড় সরিয়ে চুনারাম গলা খেঁকারি দিয়ে মুনিরামের উঠোনে ঢুকে এল। এ সময় ঢিলির ঘরে থাকার কথা নয়, যথারীতি সে ছিল না, শুধু নূপুর এগিয়ে এল তার গলার আওয়াজ পেয়ে, দাদু, আসো গো।

পথ দেখিয়ে নূপুর সরে দাঁড়াল, নূপুরের ব্যবহারে মুগ্ধ চুনারাম হাঁ-করে তাকাল, ভাই কইরে?

নূপুর কিছু না বলে উঁচু জায়গাটা দেখিয়ে দিল, বহু বছর আগে মুনিরাম মাটির ঘর তুলেছিল, ভয়ঙ্কর বন্যায় তা গলে যায়, হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে মাটির ঘরখানা। সেই থেকে জায়গাটা উঁচু হয়ে আছে, ছাগলছানা তিড়িং বিড়িং লাফায় সেই উঁচু ভাঙা কাঁথ দেওয়ালে। শীতকালের সকালে রোদ উঠলে মুনিরাম ওই উঁচু ঢিবি জায়গাটায় গিয়ে বসে, পিঠে রোদ লাগিয়ে সময় কোথা দিয়ে কেটে যায়, সে নিজেও টের পায় না। বছরের অন্য সময়গুলোতে রোদ সরে গেলে কিংবা রোদের তেজ কমলে মুনিরাম বোরা বিছিয়ে ওখানে বিশ্রাম নেয়। খিদে লাগলে ওখানে বসেই মুড়ি চেবায়, নূপুর পেতলের ঘটিতে জল দিয়ে যায়, বুড়োটা ঢকঢক করে খায় তারপর মুখ মুছে নিয়ে নূপুরকে আশীর্বাদ করে, তুই রাজরানী হবি। তোর মন অনেক উঁচা হবে। তোর মনে দয়া-মায়া উপচে পড়বে। তুই তোর বাপ-মায়ের মান রাখবি। সেদিক থেকে ভাগ্যবান লুলারাম। ওর ছেলে নেই ঠিকই, কিন্তু মেয়ে দুটো ছেলেকেও ছাপিয়ে যায়, সংসারের কাজে ওরা দশভুজা, ক্লান্তি নেই, সারাদিন মেশিনের মতো খাটছে তো খাটছে ফলে ঢিলির অভাবটা কাজের মাধ্যমে পুষিয়ে দিয়েছে ওরা। লুলারাম তাই শান্তিতে ঘোরাফেরা করতে পারে, শুধু বাজারহাট করে দিয়ে সে খালাস। লোকজন হাঁড়ি খুন্তি সব সামাল দেয় ওই দুটি মেয়ে। মুনিরাম চোখের সামনে অষ্টপ্রহর সব দেখে তাই কেউ কিছু ওদের নামে বললে ওর পিত্তি জ্বলে যায়, রাগে মুখ দিয়ে আজেবাজে কথা বের হয়ে আসে।

পড়ন্ত রোদে চুনারাম খাটো ধুতি গুছিয়ে মুনিরামের মুখোমুখি বসল। পাশাপাশি ঘর তবু অনেক দিন হল এদিকটায় তার আসা হয়নি, এমনকি খোঁজ খবরও নেওয়া হয়নি। অসুস্থ ভাইয়ের উপর চুনারামের একটা চোরাটান আছে যা সে কখনও কাউকে বলে বোঝাতে পারবে না। বাপ ঢুলিরাম গত হবার সময় তার হাত ধরে বলেছিল, আমার সময় হয়েছে বাছা, ইবার আমাকে যেতে হবেখন। তোর ভাই থাকল, তারে তুই দেখিস। বড় ভাই তো বাপের সমান।

ঢুলিরামের কথাগুলো আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে চুনারামের, তখন মনটা কেমন কঁকিয়ে ওঠে, ব্যথায় নীল হয়ে যায়। দেশ-দুনিয়া, এ জগত কিছু ভালো লাগে না, মুনিরামের যেয়ো শরীরটা যেন তার শরীরের ভেতর ঢুকে যায়, কিছুতেই এই ব্যাধিটাকে ঠেলে বের করে দেওয়া যায় না। কালীগঞ্জ হাসপাতালের মোটা টিকাদারবাবু মুনিরামকে দেখে বলেছিলেন, ঘরে বসে থাকলে এ অসুখ সারবে না। হাসপাতালে যেও, ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়ে দেবেন। হাসাপাতালে এ রোগের চিকিৎসা হয়।

—পাপরোগের চিকিৎসা হয়? যেন আকাশ থেকে পড়েছিল মুনিরাম। সেদিন পাশে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল চুনারাম। টিকাদারবাবু মুনিরামকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, পাপরোগ বলে কোনো রোগ হয় না। কুষ্ঠ কোনো অভিশাপ নয়, ওটা একটা রোগ। যে-কারোর হতে পারে। সব কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে নয়। নিয়ম করে দেখালে এ অসুখ সেরে যায়, এ রোগটাকে ভয় পাবার বা লুকোবার

দরকার নেই। জ্বরজ্বালা, মাথা ব্যথার মতো এটাও একটা অসুখ।

তবু টিকাদারবাবুর কথায় ভরসা রাখতে পারে নি চুনারাম আর মুনিরাম। ওই মাঝ বয়েসী মানুষটা বলে কি! এমন কথা কি বিশ্বাস করা যায় যে কুষ্ঠরোগটা কোনো বিধির অভিশাপ নয়? পাপের ফল নয়? গ্রামসমাজের চাপে পড়ে মুনিরামকে আলাদা করে দিয়েছে লুলারাম। তার জন্য আলাদা একটা ঝুপড়ি বানিয়ে দিয়েছে পণ্ডিতবিলের ধারে। চাপা গলায় সতর্ক করে বলেছে, এদিকপানে এসো না, গাঁয়ের কেউ দেখে নিলে আমার ঝামেলা হয়ে যাবেখন। তুমার যখন যা দরকার হবে আমাকে বলবে—আমি দিয়ে আসব।

—দুকুরবেলায়, সাঁঝবেলায় তাহলে কুথায় খাবো? মুনিরামের গলা বুজে এসেছিল কান্নায়। বাঁশপাতার মতো কাঁপছিল সে।

—আঃ, মন খারাপের কী আচে? আমরা তো তুমার পাশে আচি, শুধু ঘরটা যা আলাদা। লুলারাম ধমক দিল।

—নিজের হাতে বানানো ঘরে নিজে থাকতে পারব না! ওঃ, এ যে কী মা শীতলা বুড়ির মহিমা কিছু বুঝতে পারি না। এর চেয়ে শ্মশানঘাটে চলে গেলে ভালো হত। ওখানে সমাজের লাল চোখ নেই। কোঁকড়া চুলগুলো সজোরে চেপে ধরে হা-হুতোশ করে মুনিরাম। খড় আর ছিটে বেড়ায় বানানো ঝুপড়িটাকে সে মন থেকে মেনে নিতে পারে না, কষ্ট হয়, বুক মোচড় দিয়ে ওঠে, চোখের কোণে থিকথিক করে জল, বুঝতে পারে সে এ সংসারে এখন একটা এঁটো পাতা ছাড়া আর কিছু নয়। তবু চুনারাম আসে, মাঝে মধ্যে তার খোঁজখবর নিয়ে যায়, ভালো-মন্দ কিছু হলে সে ছোটভাইটার জন্য পাঠিয়ে দেয়। একা খেতে মন সায় দেয় না। বাবার কথাটা মনে পড়ে, বড়ো ভাই তো বাপের সমান।

আজ দাদাকে দেখে মুনিরাম উৎসাহিত বোধ করল, আয়, ছিমুতে সরে আয়। কৎদিন পরে এলি বল তো? আমি তো পথের দিকে হাঁ-করে চেয়ে থাকি। বুড়াটার খোঁজ নিতে কেউ আসে না। আর আমার কাচে আসবেই বা কেন? মধু যা ছিল সব আমি যে নিংড়ে দিয়েচি।

—চুপ কর ভাই। চুনারামের চোখে ব্যথার সর পড়ল, কেউ না আসুক—আমি সময় পেলে ঠিক আসব। তুই ভাববি নে। তা এখুন কেমুন আচিস ভাইরে...?

—ভালো নেই, ভালো নেই রে! ডানে-বাঁয়ে নিয়ন্ত্রণহীন ঘাড় দোলায় মুনিরাম, ক্ষয়ে যাওয়া, ঘেয়ো হাতটার দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভেতরটায় ডানা ভাঙা প্রজাপতির মতো ফড়ফড় করে, খুব কষ্ট হয় রে, এবার চলে গেলে বুঝি ভালো হত। শীতলাবুড়ির কবে যে দয়া হবে কে জানে। আমি তো হররোজ দু-বেলা তারে ডাকচি।

—সব ঠিক হয়ে যাবেখন। চুনারাম মিথ্যা আশ্বাস দিতে চাইল।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুনিরাম ভাবুক হয়ে গেল, আর ভালো হবে না রে, যা হবার তা হয়ে গিয়েচে! এবার পুঁটলি বাঁধার সময় হয়েচে। আর তা ছাড়া, আমিও আর বাঁচতে চাইনে। এ জীবনটার ওপর ঘেন্না ধরে গেচে, হাঁপসে গেচি আমি, আর ভাল্ লাগে না ভাই, আর ভাল্ লাগে না। মুনিরাম থামল, চোখ রগড়ে নিয়ে নির্লিপ্ত তাকাল, লুলাটাকে নিয়ে আর পারিনে। বউটারে সে ভেষণ জ্বালাচ্ছে। ভিকনাথের বউটার সাথে সে নাকি ঢলাচ্ছে। ছিঃ, ছিঃ, আমি কুন দিকে যাই বলদিনি। এই বয়সে এসব কি মানায় রে। শরীলটা এট্টু জুৎ হলে আমি ভাবছি বউটার সাথে টুকে দেখা করব। ওরে বুঝিয়ে বলব। দেখি কুনো কাজ হয় নাকি?

—প্রেমরোগ কুঠরোগের চেয়েও খতরনাক। খবরদার তুই ওই রাড়ুয়া ম্যায়াঝিটার কাছে যাবি

নে। আমি শুনেচি—সে বড়ো মুখরা। তুর মান-সম্মান রাখবে নি। চুনারাম বোঝাবার মতো করে বলল কথাগুলো। মুনিরাম মন দিয়ে শুনে শুধুমাত্র ফুঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, তারপর কেমন হাওয়া বেরনো বেলুনের মতো চুপসে গেল। কালীগঞ্জ থেকে ইস্কুল সেরে সাইকেল নিয়ে ফিরছিল সূর্যাক্ষ, রঘুনাথ তাকে পাকুড়তলায় ধরে ফেলল। সূর্যাক্ষ সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল, গালে টোল ফেলে হাসল সে, কোথায় থাকিস রে রঘু, তোর যে আর টিকির নাগাল পাওয়া যায় না। ভুলে গিয়েছিস—আজ ফুটবল ম্যাচ আছে। যাবি না?

রঘুনাথ উৎসাহিত হল, যাব না মানে? সেই কখুন থিকে আমি ঘুর ঘুর করচি তুর জন্যি। যাক, দেখা হয়ে ভালো হল। রঘুনাথ এগিয়ে গিয়ে সূর্যাক্ষের সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে হাত রাখল, দে, সাইকেলটা আমাকে দে। মাঠ অব্দি আমি চালিয়ে নিয়ে যাবো। তুই পেছনে বসবি।

—তুই পারবি? সূর্যাক্ষের চোখে সন্দেহ, পড়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। সে দিন একটা চালকারবারী সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে বাঁধের নিচে গড়িয়ে গিয়েছিল। ওর অন্ডকোষে লেগেছে। হাসপাতালে ভর্তি আছে। শুনেছি অবস্থা নাকি ভালো নয়।

—অত ভয় পেলে চলবে? রঘুনাথ সাহসী হয়ে উঠল, যা হবার হবে। সবাইকে একদিন তো পটল তুলতে হবেই। দে সাইকেলটা দে।

একরকম জোর করে সূর্যাক্ষের সাইকেলটা কেড়ে নিল রঘুনাথ, তারপর কিছুটা দৌড়ে ধপাস করে সে সাইকেলের সিটে চড়ে বসল, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকল, এই সূর্য, বসে পড়, দেখ, বেলা কুথায় চলে গিয়েচে। খপখপ কর। আজ তুই দেরিতে এসে সব কিছু এলেবেলে করে দিলি।

সূর্যাক্ষ বই আঁকড়ে ধপাস করে ক্যারিয়ারে বসে পড়ল, তারপর পাছায় জোরসে চিমটি কেটে বলল, মেয়েদের মতো চালাস নে, জোরে-জোরে চালা। এমন শামুকের মতো চললে কখন পৌঁছাবি?

বাঁই-বাঁই করে সাইকেল ছুটল বাঁধের ধুলো উড়িয়ে, সারা শরীরে স্ফূর্তি এসে গেল রঘুনাথের, সে শিস দিয়ে গান ধরল দূরের দিকে তাকিয়ে। এ সময় বাঁধের ধার অপরূপ সাজে সেজে ওঠে। এই আলোটাকে লোকে বলে কনে দেখা আলো। কিছুটা আসার পর সূর্য গাঙধারের ঝাউগাছগুলো দিকে তাকাল, দেখ গাছগুলোকে কেমন বড়ো দেখাচ্ছে। রোজ দেখি আর মনে হয় ওরা কত তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যাচ্ছে।

রঘুনাথ সাইকেলের হ্যাণ্ডেল জোরসে ধরে প্যাডেলে জোরে চাপ দিয়ে থামল, গাঙধারের বাতাসে গাছপালার বড় বেশি হয়। গাঙের ঘোলাটে জলে পলি থাকে। সেই পলি হাড়গুঁড়া সারের কাজ করে। আমার দাদু বলে, ঘোলা জলে আয়ু বাড়ে মাছেদের, আর গাছ বাড়ে চড়চড়িয়ে।

সূর্যাক্ষের মধ্যে একটা ভাবুক মন সর্বদা হাড়ুডু খেলে, কোনোসময় তাকে দুঃখ এসে ছুঁতে পারে না। তার মা তাকে শিখিয়েছে, হাসি হল মানুষের শরীরের একটা মোক্ষম ওষুধ। এই ওষুধে সব রোগজ্বালা ভালো হয়ে যায়, মানুষের কোনো কষ্ট থাকে না।

কথাটা মনে ধরেছে রঘুনাথের, তার খুব ইচ্ছে করে সূর্যাক্ষের বাড়ি গিয়ে ওর মায়ের সাথে গল্প করতে। দুর্গামণির সঙ্গে সূর্যাক্ষের মায়ের বুঝি তুলনাই চলে না। রঘুনাথ তার মায়ের কথা ভেবে মনে মনে কেমন গুটিয়ে যায়, দু'মায়ের ফারাকটা তার দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

সূর্যাক্ষের খোলা হাওয়ার মতো মন, তা না হলে বুনোপাড়ায় আসতে তার বয়ে গেছে। গাঁয়ে মাত্র ক'ঘর বামুনের বাস, তার মধ্যে ওরা বেশ সম্পন্ন। সূর্যাক্ষের মামার বাড়ি কৃষ্ণনগরে, জলঙ্গী

নদীর ধারে। বিকেলে সেখানে খোলা বাতাস দৌড়-ঝাঁপ খেলে বেড়ায়, সেই বাতাসের গায়ে থাকে হিমেল সুবাস, জলকণার মিহি আদর। গরমের দিনে জলঙ্গী নদীর বাঁধের উপর দাঁড়ালে শরীর একেবারে জুড়িয়ে শীতল হয়ে যায়, আরামে চোখ বুজে আসতে চায় ঘুমে। কতদিন সূর্যাক্ষের মামার বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি, তার মা বলেছে—আগে ভালো মতো পাশ কর, তারপর তোকে নিয়ে যাবো। বারোদোলের মেলায় ভিড় বেশি। সে সময় গেলে বেশ আনন্দ হয়।

সাইকেল ঢালু পথ বেয়ে নেমে এল মাঠের উপর। সবুজ ঘাসের উপর রোদ পড়ে চিকচিক করছে মাঠখানা। ঠিক গোল-পোস্টের পিছনে একটা বুনো জামগাছ। বুড়োটে পাতা শুকনো তেজপাতার মতো ছড়িয়ে আছে মাঠের ভেতর, পাতাগুলো সাতভায়া পাখির মতো উড়ছে হাওয়ায়। সেদিকে হা-করে তাকিয়ে আছে সূর্যাক্ষ। আর একটু পরে খেলা শুরু হবে, তার প্রস্তুতিতে মাঠ সেজে উঠছে। সূর্যাক্ষ আর রঘুনাথকে দেখে এগিয়ে এল তারক। খুব অবাক হয়ে সে শুধোল, তোদের দু জনের এত আসতে দেরি হল যে—।

রঘুনাথ কিছু বলার আগেই সূর্যাক্ষ বলল, কালীগঞ্জ থেকে ফিরতে আমার অনেক দেরি হয়ে গেল। মোকামপাড়ার কাছে এসে সাইকেলের হাওয়া কমে গেল। ওই অত দূর থেকে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে আবার ফিরে গেলাম বাজারে। বাজার ছাড়া তো সাইকেল সারানোর কোনো দোকান নেই জানিস তো। তবে রঘু ধাওড়াপাড়ার কাছে আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিল। হেঁটে এলে রঘু আগে পৌঁছে যেত কিন্তু ও-যে আমাকে ছাড়া আসবে না।

—রঘু তোর চামএঁটুলি। গলা ফাড়িয়ে হাসল তারক। তার সেই দরাজ হাসি সংক্রামিত হল রঘুনাথের শরীরে। সেখান থেকে হাসি রাজহাঁসের মতো গলা বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিল সূর্যাক্ষের কণ্ঠ। ওরা তিনজন হা-হা শব্দে হাসতে লাগল।

এক সময় হাসি থামিয়ে সূর্যাক্ষ বলল, আজ রঘু ব্যাকে খেলবে। ওকে আমি সাহস দিয়েছি। ওর কোনো অসুবিধা নেই।

ব্যাকে খেলার জন্য রঘুর গায়ের জোরটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে সূর্যাক্ষ। ওর গাট্টাগোট্টা চেহারায় যে শক্তি লুকিয়ে আছে তা একটা চামড়ার বলকে শাসন করার পক্ষে মাত্রারিক্ত। রঘুনাথ খেলার 'খ' না জানলেও এই লুকিয়ে থাকা শক্তি ওকে অনেক দূর নিয়ে যাবে। বল খেলার প্রস্তাব সূর্যাক্ষ প্রথম দিতেই রঘুনাথ আকাশ থেকে পড়েছিল, ওসব বল পেটাপেটি খেলা আমার দ্বারা হবে নি।

—কেন হবে না, আলবাত হবে, চল। রঘুনাথের হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সূর্যাক্ষ পাকুড়তলায়। তারপর বুঝিয়ে বলেছিল, বল খেলা খুব সহজ রে, একটু বুদ্ধি ঘিলুতে থাকলে যে কেউ খেলতে পারে।

রঘুর তবু আড়ষ্টতা কাটে না, ছোটবেলায় বাতাবীলেবু নিয়ে বহু খেলেচি। সে খেলা ছিল মজার খেলা। মাঠে নেমে খেলতে যাওয়ার মানে দশ লোক হা-করে দেখবে। খেলা ভালো হলে হাততালি দেবে, খেলা খারাপ হলে গালমন্দ। আমার এমনি-তে মাথা গরম, কার সাথে ঝুট-ঝামেলা হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমি মাঠের বাইরে থাকবখন, সেটা আমার জন্যি ভালো হবে।

—তোর ভালো-মন্দ তোর বুঝে কাজ নেই। যা বোঝার আমরা বুঝব। বুঝলি? সূর্যাক্ষের দাবি রঘুনাথ ঠেলতে পারে নি। বামুনবাড়ির এই ছেলেটাকে তার মন্দ লাগে না, ওর মধ্যে কোনো উপরচালাকি নেই, পুরনো কুয়োর জলের চাইতে ঠাণ্ডা এবং উপাদেয়। এমন মনের মানুষের

সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় অনায়াসে। এরপর সূর্যাক্ষ রঘুনাথের বন্ধু হয়ে গেল। ইস্কুল যাওয়া আসার পথে রোজ ওদের দেখা হয়, রঘুনাথ বেলা দশটা বাজলে সূর্যাক্ষর জন্য দাঁড়িয়ে থাকে কদবেল তলায়। দুর্গামণি তার এই পাগলামী দেখে সতর্ক করে বলছিল, বুঝে-শুনে মিশবি বাপ। বাবুঘরের ছেলে মেয়েরা বড্ড চালাক হয়। ওরা সুযোগ পেলে তুর সব নিয়ে, তাপ্পর ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তাই বলচি বাপ, হিসেব করে পা ফেলিস। গড়বড় হলে নড়বড়ে হয়ে যাবে তুর জেবন, তখন কেঁদেকেটে কুনো পথ পাবি না। মায়ের কথা সবসময় যে সত্যি হয় তা নয়। সূর্যাক্ষের মন তার চেয়েও ভালো। প্রায় সে চরানীমাঠে দেখা করে রঘুনাথের সঙ্গে। তার গলায় অবুঝ আব্দার, চল তোকে আজ বাড়ি নিয়ে যাবো। আমার মা বলেছে তোকে ঘরে নিয়ে যেতে।

—ধ্যাৎ, তুর ঘরে গিয়ে কী হবে?

—কেন থাকবি খাবি গল্প করবি। সূর্যাক্ষর কণ্ঠস্বরে বন্ধুত্ব উছলে ওঠে, আমার মা যে কত ভালো তা তুই নিজের চোখে দেখতে পাবি। ওখানে একবার গেলে তোর আর আসতেই মন করবে না।

—যাব, সময় করে ঠিক যাবো।

—না, আজই চল। আজ মা পায়েস রেঁধেছে। তুই খাবি। সূর্যাক্ষ জেদ করল।

—ধুর, পায়েস আমরা হররোজ খাই। রঘুনাথ অবাক হল না মোটে, জাউভাতে গরম দুধ ঢেলে দিলে পায়েসভাত হয়ে যায়। আমার মা বলে পায়েস ভাত খেলে গতরে শক্তি আসে। তখন ভালো মুনিষ খাটা যায়। বাবুরা খুশি হয়ে দু-পাঁচ টাকা বকশিস দেয়। রঘুনাথ নিজের বিশ্বাসে অনড় থাকে। তাকে বোঝাবার ক্ষমতা সূর্যাক্ষের নেই, সে শুধু অবাক হওয়া চোখে তাকায় আর বোকার মতো হাসে। মানুষ এখনও কোথায় পড়ে আছে ভাবলে অবাক হয় সূর্যাক্ষে। তার বাবা কপোতাক্ষ বলেন, মানুষকে অন্ধকার থেকে টেনে তুলতে হবে। সবার চোখে শিক্ষার আলো দিতে হবে। স্বাধীনতার চব্বিশ বছর পরেও মানুষ অন্ধকারে ডুবে আছে। অশিক্ষা-কুশিক্ষা ওদের গ্রাস করছে। ওদের সচেতন করার দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে সূর্য। শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ে তোমাদের এ শিক্ষা পূর্ণ হবে না। চোখ-কান খোলা রেখে মানুষের কাছাকাছি যেতে হবে তোমাদের। ধনী দরিদ্র ছোট বড়ো সবাইকে কাছে টেনে নিতে হবে। তবেই আমাদের এই মহান দেশ প্রগতির পথে অগ্রসর হবে।

মাঠের মধ্যে রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে সূর্যাক্ষ চঞ্চল হয়ে উঠল; এই রঘু, যা করার তাড়াতাড়ি কর। দেখ, মোকামপাড়ার দল আগে-ভাগে মাঠে নেমে গিয়েছে। ওরা গা-ঘামাচ্ছে। তুই ঝটপট ড্রেস করে নে। আজ ওদের ছাড়ব না, গো হারা হারাবো। তারক রঘুনাথের বরাদ্দ সাদা কালো জার্সিটা এগিয়ে দিল, জামগাছের আড়ালে গিয়ে এটা পরে আয়। আর হ্যাঁ, প্যান্টের নীচে তোর জাঙ্গিয়া আছে তো?

রঘু ঘাড় নাড়ল, জাঙ্গিয়া কি সে জানে না, ঘোর কাটিয়ে সে তাকাল, প্যান্টের নীচে ল্যাঙ্গোট পরে এয়েচি।

—তুই এই বয়স ল্যাঙ্গোট পরিস? সূর্যাক্ষ হাসি আটকাতে পারছিল না, ল্যাঙ্গোট তো রামনগর সুগার-মিলের বিহারী দারোয়ানগুলো পরে। ওরা ল্যাঙ্গোট পরে রোজ সকালে মালাম লড়ে। আমি বাবার সাথে গিয়ে দেখেছি।

তারক তার কথাকে সমর্থন করল, হ্যাঁ, সূর্যর কথাটা ঠিক। আমিও ল্যাঙ্গোট পরা কুস্তিবীর দেখেছি। জানিস ওরা গায়ে কত্তো তেল মাখে!

রঘুনাথের এসব কিছু দেখা হয়নি, সে ধাওড়াপাড়া ছেড়ে পলাশী সুগারমিলের দিকে

কোনোদিনও যেতে পারেনি। গুয়ারাম তাকে যেতে দেয় না, বেশি জেদ ধরলে বলে, হারিয়ে যাবি বাপরে। গাঙের ধারে ছেলেধরা ঘোরে। লালগুলার ওদিক পানে টেরেন যাওয়ার লোহার পুল হচ্চে, সেখানে নরবলি না দিলে পুল খাড়া হবে নি। তাই ছেলেধরা বড়ো বোরা নিয়ে ঘুরচে ছেলে ধরতে। ওদের হাতে লাল গুলাপফুল থাকে। সেই গুলাপফুল মন্ত্রপুড়া। একবার নাকে শুঁকিই দিলে একেবারে রামছেলির মতুন হয়ে যাবি। অমনি খপ করে বোরায় ঢুকিয়ে নিবে তুরে, মা বলে চেঁচাতেও সময় পাবিনে। গুয়ারামের কথায় ভয়ে গায়ের লোম চেগে উঠত রঘুনাথের, মাকে জড়িয়ে ধরে শুলেও ভয় কাটত না, চোখ বুজলেই সেই জাদুকর আলখাল্লা পরা ছেলেধরাকে দেখতে পেত সে, ভয়ে হিম হয়ে যেত শরীর, কথা আটকে গিয়ে ঘড়ঘড় করত গলা।

বুনো জামগাছের আড়ালে হাফ-প্যান্টুলুন ছেড়ে কালো প্যান্ট আর রঙচঙে জার্সি পরে নেয় রঘুনাথ। পোশাকটা পরার সাথে সাথে তার মনে হয় সে যেন জাতে উঠে গেল। এই পোশাক পরা অবস্থায় তার মা যদি একবার দেখতে পেত তাকে তাহলে পুত্রগর্বে বুক ভরে যেত মায়ের। মনে মনে সে ভাবল খেলা শেষ হয়ে গেলে এই পোশাকটা সে চেয়ে নেবে। গোল-পোস্টের সামনে চুন দিয়ে দাগ কেটে রেখেছে ক্লাবের ছেলেরা অনেক আগেই। শুধু গোল-পোস্টের সামনে নয়, খেলার মাঠের চারধারে চুনের দাগ লম্বা হাড়ের মতো শুয়ে আছে। গাঁ-ভেঙে লোক এসেছে খেলা দেখতে। আজকের খেলাটায় যে জিতবে সেই দলকে একটা কাপ আর সের পাঁচেক ওজনের খাসি উপহার দেওয়া হবে। যারা হারবে তারা খাসি পাবে না, শুধু পাবে ছোট একটা রানার্স কাপ। সূর্যাক্ষ এসব কথা পাখি পড়ানোর মতো করে শিখিয়েছে রঘুনাথকে, ভালো করে খেলবি, আজ জিতলে রোববারে ফিস্ট হবে ক্লাব ঘরে। সেদিন খাসি কাটা হবে। তোরও নেমতন্ন থাকবে।

খাওয়ার কথায় গায়ের জোর ফিরে পায় রঘুনাথ। সে খেলার কিছু না বুঝলেও এটুকু বুঝে নিয়েছে—বল কোনোমতে গোলের দিকে যেতে দেওয়া যাবে না। যে আসবে বল নিয়ে তাকে ক্ষামি করে ফেলে দিতে হবে ফলে তার আর সাহস হবে না পুনরায় বল নিয়ে তার সামনে দাঁড়াবার। গায়ের জোরে সে যে এদের হারিয়ে দেবে—এ ব্যাপারে সে একশ ভাগ নিশ্চিত। সূর্যাক্ষ কেন ক্লাবের অনেক ছেলেই তার পায়ের শট পরীক্ষা করে দেখেছে। রঘুনাথের এক শটে বল চলে গিয়েছে বাঁধের ওপিঠে, যা অবিশ্বাস্য এবং চোখ ছানাবড়া হবার জোগাড়। যার শটে এত জোর সে কি মামুলি খেলোয়াড় নাকি। রঘুনাথের কদর বেড়ে গিয়েছে সেই থেকে।

উৎসাহীদের ভিড় বাড়তেই খেলা শুরু হয়ে গেল রেফারির বাঁশি বাজার সাথে সাথে। সূর্যাক্ষ সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলছে, ওর ডান পায়ের কাজ নিঁখুত, লক্ষ্যভেদ করতে পারে প্রতিকূল পরিবেশেও।

ব্যাক পজিশনে দাঁড়িয়ে সূর্যাক্ষের খেলা দেখছিল রঘুনাথ, হঠাৎ ওর পা গলে বল এসে পড়ল পেনাল্টি লাইনের কাছাকাছি, তাই দেখে শরীর নিয়ে কটাশের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল রঘুনাথ, গায়ের জোরে সে লাথ কষাল বলের মাঝখানে, ঘাস ছিলে গেল সেই শটের জোরে, বল গিয়ে পড়ল অন্য প্রান্তের গোলরক্ষকের হাতে। হাততালিতে ফেটে পড়ল দর্শকমহল। ওদের আনন্দ ভাসিয়ে নিয়ে গেল রঘুনাথকে।

খেলা শেষ হল দুই শূন্য গোলে। রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই সূর্যাক্ষ দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল রঘুনাথকে, কী দারুণ খেললি রে তুই! আজ তোর উপর অসুর ভর করে ছিল।

তারকের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি, রঘুনাথ সবাইকে দেখিয়ে দিল ফুটবল কীভাবে খেলতে হয়। উরিব্বাস; ও যে ভাবে খেলল—তা কেবল স্বপ্নেই ভাবা যায়! রঘুর পিঠ চাপড়ে দিল তারক, আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারি মদনদা রঘুকে দেখা করতে বলেছে। ও আজকের খেলার সেরা প্লেয়ার পুরস্কার পাবে। আঃ, যা লাগছে না আমার! তারক আর একবার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। ওর যে ব্যস্ততার শেষ নেই। পুরস্কার বিতরণী সভা শেষ হতেই সাঁঝ নেমে এল বাঁধের ধারে। ধাওড়াপাড়ায় একা একা ফিরে যেতে হবে রঘুনাথকে, আজকে আর সূর্যাক্ষদের বাড়ি যাওয়া হবে না কোনো মতে। রাত করে ঘর ফিরলে দুর্গামণি ঘর-বার করবে, চুনারাম লাঠি হাতে অন্ধকারে বাঁধের উপর উঠে এসে ছানিপড়া চোখে দূরের গাঁখানার দিকে তাকাবে।

খাড়া পথ বেয়ে বাঁধের উপর রঘুনাথ উঠে এল। বেশ ফুরফুরে লাগছে মনটা। বিরাট কোনো কিছু করে ফেলেছে এমন একটা অনুভব তার স্নায়ুতন্ত্রকে টান টান করে মেলে ধরতে চাইছে। ভালো লাগার অনুভূতিগুলো খ্যাপলা জালের মতো ছড়িয়ে পড়ছে শরীরের রক্তজলে। এ সময় গাঙধারের ঝাউবনগুলোর দিকে তাকানো যায় না, মনে হয় ওরা গাছ নয়, এক একটা ঝাঁকড়া মাথার আগোলদার। ওদের হাতে লাঠি, কোমরে ফেট্টি দেওয়া ধুতি। পায়ের দশ আঙুল শেকড়ের মতো ছড়িয়ে আছে মাটির ভেতর।

রঘুনাথ ভাবছিল সূর্যাক্ষর সঙ্গে যাওয়ার সময় দেখা হলে ভালো হোত। ও যে কোথায় চলে গেল ওকে আর দেখতে পায় নি সে। মনটা খারাপ লাগছিল রঘুনাথের। আর ঠিক তখনই ফিকে আঁধারে সূর্যাক্ষ দৌড়াতে দৌড়াতে তার সামনে এসে হাজির হল, কী ব্যাপার তুই যে চলে যাচ্ছিস?

রঘুনাথ শান্ত চোখে তাকাল, ঘর তো যেতেই হবে। ঘর না গেলে মা খুব ভাববে। তাছাড়া বাবা ঘরে নেই। দাদু রাতে ভালো চোখে দেখে না। আমাকে যেতে হবে।

—যাবি মানে? আজ মা তোর জন্য রাঁধবে! আজ তুই আমাদের ঘরে যাবি। মাকে সেইমতো বলে এসেছি। সূর্যাক্ষ অবুঝ হয়ে উঠল।

রঘুনাথ মিনমিনে গলায় বলল, বললাম তো ঘরে যেতে হবে, ঘরে না গেলে মা চিন্তে করবে।

—ঠিক আছে, আমিও তোর সাথে যাবো।

—মিচিমিচি কেনে যাবি? রঘু বোঝাতে চাইল, পরে একদিন তোদের ঘরে যাব। আজ বাদ দে।

—তুই দাঁড়া, আমি আসছি। সূর্যাক্ষ রকেটগতিতে মাঠে নেমে গিয়ে সাইকেলটা বেল বাজাতে বাজাতে মাঠে নিয়ে এল, ওঠ।

—আমাকে চালাতে দিবি নে বুঝি? রঘুনাথ প্রশ্ন করল।

সূর্যাক্ষ আদেশের ভঙ্গিতে বলল, তোর এখন আরামের দরকার। চুপচাপ সাইকেলের পিছনে গিয়ে বসে পড়। তুই কি করে ভাবলি আমি তোকে একলা ছেড়ে দেব অন্ধকারে। যদি তোর কিছু হয়ে যায়?

—আমার কিচু হবে নাই। আঁধারে আমার চোখ জ্বলে। রঘু দাঁত বের করে হাসল। কিছুটা

আসার পর মাঠ-পালানো হাওয়া আছড়ে পড়ল তার গায়ের উপর, সেই হাওয়া সারা গায়ে বুলিয়ে দিল শীতলতার চাদর। ধবধবে খড়ি ফোটা চালকুমড়োর মতো চাঁদ ফুটেছে আকাশে, ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে সাঁঝবেলার অন্ধকার, পোকামাকড়ের আজব ডাকে চেনা পৃথিবীটা জেগে উঠছে চোখের সামনে। অ্যাঁশশ্যাওড়া ঝোপের ভেতর থেকে একটা শেয়াল মোটা লেজ ফুলিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল। রঘুনাথ বুঝতে পারল শেয়ালটা আখখেতের আল ধরে সোজা চলে যাবে বুড়ি গাঙের ধারে, ওখানের কাঁকড়ার গর্তে লেজ ঢুকিয়ে কাঁকড়া ধরে খাবে। মরা-কাঁকড়ার খোলা পায়ে লাগলে কেটে যায়, রক্তপাত ঘটতে পারে, তাই খালি পায়ে বুড়িগাঙের ধারে গেলেও রঘুনাথ খুব সতর্ক হয়ে চলা ফেরা করে।

পাকুড়তলায় এ সময় বুড়োথুড়োদের জটলা হয়, বিড়ির ধোঁয়ায় তৈরি হয় কৃত্রিম মেঘ, তার অনেকক্ষণ পরে রঘুনাথের ভেতরটা বিড়ি ফুঁকবার জন্য লুলিয়ে ওঠে। খুব ছোটবেলা থেকে সে নেশা-ভাং করছে, চুনারাম খুশি হয়ে তার মুখে মদ ঢেলে দিত, পাঁচুই ঢকঢক করে খাইয়ে দিয়ে বলত, খা দাদু, খা। হাড় শক্ত হবে।

বিড়ি খাওয়াটা এখন আর রঘুনাথের কাছে কোনো সমস্যা নয়। সে খুড়া, দাদু, এমন কি বাপের সামনেও বিড়ি টানে। দুর্গামণিরও বিড়ির নেশা জব্বর, আগে সে চাষ-কাজে যেত মাঠে তখন গোটা দশেক লাল সুতোর বিড়ি না হলে কাজে তার মন বসত না। গুয়ারাম সতর্ক করত, অত খাসনে রে বউ, ফুসফুস ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। নেশা রঘুনাথের জীবনে বুড়িগাঙের জলের মতো ছুঁয়ে আছে, এর থেকে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় নেই, নেশা যেন পাখি ধরার ফাঁস হয়ে চেপে বসেছে গলার উপর।

পাকুড়তলায় আর দাঁড়াল না সূর্যাক্ষ, তার তাড়া আছে, রঘুনাথকে সঙ্গে নিয়ে তাকে আবার গাঁয়ে ফিরতে হবে, না হলে চিন্তায় ভেঙে পড়বে মীনাক্ষী। কপোতাক্ষ সাধারণত ঘরে খুব কম থাকে, বাঁধে-বাঁধে সাইকেল নিয়ে তিনি চলে যান কদবেলতলা ধাওড়া, হলদেপোঁতা, কমলবাটি আর বসন্তপুর ধাওড়া। মানুষগুলোর প্রতি যত দিন যাচ্ছে তার দায়িত্ব বাড়ছে। সূর্যাক্ষকে তিনি বলেছেন, তৈরি থাকো। শ্রেণী-সংগ্রাম আবশ্যক। আমাদের লড়াই করে সুখ-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে হবে। ব্রিটিশ পরবর্তী সামন্তপ্রভুরা আমাদের হাতে ভালোবেসে ক্ষীরের সন্দেশ তুলে দেবে না।

কপোতাক্ষর কথাগুলো বড়ো অস্পষ্ট আর ধোঁয়াশা লাগে সূর্যাক্ষর। সংগ্রাম কথাটার অর্থ সে সঠিক জানে না। কদবেলতলা ধাওড়ার বিদুর রাজোয়ার গলার রগ ফুলিয়ে বলে, এ অত্যাচার বঞ্চনা বেশি দিন চলতে পারে না। আগে আমরা এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল বাড়িয়ে দিয়েছি। এখন যুগ পাল্টাচ্ছে। চড়ের বদলে লাথি মারতে হবে ওদের। আমি লেনিন পড়িনি, মার্কস পড়িনি। ওরা কে আমি জানি নে। জানার দরকারও নেই। আমি শুধু জানি—লাঙ্গল যার, জমি তার। যে ভাগের জমি কেড়ে নিতে আসবে তার কাটামুণ্ডু জমির আলে শুইয়ে দেব আমরা।

বুনোপাড়ার ঘরগুলোয় টিমটিম করে বাতি জ্বলে। বেশির ভাগই লম্ফো, ডিবিরি, সলতে পাকানো তেলের প্রদীপ। একমাত্র লুলারামের ঘর ছাড়া আর কারোর ঘরে হ্যারিকেন নেই। ফলে একটু বেশি হাওয়া বইলে বাতি নিভে যায়, ঘুরঘুটি অন্ধকার হামলা চালায় বিনা বাধায়। এভাবেই বছরের পর বছর চলছে। এখনও কারোর কেরোসিন তেল কেনার সামর্থ হল না। দারিদ্রসীমার অনেক নীচে বাস করে ওরা। মাঝে মাঝে রঘুনাথের এসব দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে না, তার মাথায় বিষপোকা কামড়ে দেয়, বড়ো বড়ো শ্বাস ছেড়ে সে দুর্গামণির মুখের দিকে তাকায়, কথা আটকে যায় তার মুখগহ্বরে।

সাইকেলটা উঠোনে ঢুকিয়ে বড়ো করে শ্বাস ছাড়ল সূর্যাক্ষ। তার কানে ভেসে এল টিলির

এলোমেলো গানের স্বরলিপি। গরমটা আজ একটু কম তবু ঢিলির গানের কোনো বিরাম নেই।

এসব এড়িয়ে রঘুনাথ মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, হাঁ দেখ মা, কী এনেচি তুর জন্যি।

—হায় বাপ, কুথায় পেলিরে এমুন বাবু জিনিস? বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠে গেল দুর্গামণির।

রঘুনাথের মোটা ঠোঁটে গর্বিত হাসি, বল খেলতে গিয়েছিলাম, বাবুরা দেলে গো! রঘুনাথ হঠাৎ করে সূর্যাক্ষর দিকে তাকাল, ওকে বসতে না বলার জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হল সে। এক সময় নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, মারে, আজ আমি ঘরে খাবনি। সূর্য আমারে লিতে এয়েচে। আমি ওর ঘরে গিয়ে খাবো।

—সে তো মানলাম কিন্তু অত রাতে আসবি কী করে? দুর্গামণির কপালে চিন্তার রেখাগুলো নেচে উঠল।

সূর্যাক্ষ এদের আলোচনায় অংশ নিল, কাকিমা, রঘু আজ ফিরবে না। খেয়ে-দেয়ে রঘু আর আমি এক সাথে ঘুমিয়ে যাবো।

—রঘু যে যাবে তুমার মা জানে?

—হ্যাঁ, মা-ই তো বলেছে রঘুকে নিয়ে যেতে। সূর্যাক্ষ বোঝাল, রঘু না গেলে মা মন খারাপ করে বসে থাকবে।

একটা অস্বস্তি দুর্গামণির গলায় ঘোঁট পাকাচ্ছিল, তার থেকে মুক্তি পেতে সে নির্দ্বিধায় বলল, তুমি খাটে শুয়ে, আমার ঘরের রঘুরে নীচে বিছানা করে দিবে।

—তা কেন হবে? আমরা তো এক সাথে ঘুমোবো। ঘুমাতে ঘুমাতে কত গল্প হবে। সূর্যাক্ষ যেন সব দেখতে পেল।

—কী জানি বাবা, আমার ডর লাগে। দুর্গামণি পানসে হাসি দিয়ে নিজের ভয়টাকে লুকাতে চাইল। যুগ বদলেছে কিন্তু তার কোনো আলো ওদের পাড়ার উপর পড়ে নি। এখনও গাঁওবুড়ো রাজ করে চলেছে। চাপা কলটা খারাপ হয়ে গেলে সারাবার লোক আসে না বিডিও অফিস থেকে। অনেকেই গায়ে ছোঁয়া লাগলে ঘেন্নায় নাক কুঁচকায়, দিলি তো ছুঁয়ে, এখন আমাকে ফিরে নাইতে হবে।

এখনও পাল-খেদানোর মুড়ি দেয় গেরস্থ। এমনভাবে দেয় যাতে ছোঁয়া না লাগে শরীরে। দুর্গামণি সব বুঝলেও মুখে তার কোনো ভাষা নেই, শুধু চোখের জল আগুনের অক্ষর হয়ে ঝরে পড়ে!

আঁচলে চোখের জল মুছে নিয়ে দুর্গামণি উদাস হয়ে গেল, তুর দাদুরে বলে যাবিনে? ঘরে এসে বুড়ামানুষটা কি ভাববে বল তো? শেষবেলায় আমাকে গাল মন্দ করবে।

—দাদু কুথায়? রঘুনাথের প্রশ্নে দুর্গামণি আঁধার পথের দিকে তাকাল, সে গিয়েচে দুলাল ঠাকুরপোর ঘরে। তার সাঁঝবেলায় আসার কথা। তুর বাপের খপর না পেলে বুড়াটা মনে হয় পাগল হয়ে যাবে।

—পাগল হওয়ার কি আচে, মা? রঘুনাথের অবাক চোখে প্রশ্ন বিছিয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কষ্ট করে হাসল দুর্গামণি, ও তুই বুঝবিনে বাপ, বড়ো হ, তারপর বুঝবি। এট্টা ধানে যে এট্টা চাল হয়—এ হিসাবের মতো জেবনটা অত সহজ নয়। বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল চুনারাম, আঁধারে সে সাহস করে বেরিয়ে ফেঁসে গেছে। রাতকানা মানুষের এই এক সমস্যা।

চুনারামকে দেখে রঘুনাথ জলের মাছের মতো স্ফূর্তিতে টগবগে হয়ে উঠল, দাদু, আজ আমি নতুন-গাঁয়ে যাচ্চি। আমার সঙ্গে সূর্য আচে।

—কে সূর্য? সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল চুনারাম।

বিরক্তি ঝেড়ে ফেলে রঘুনাথ মিষ্টি করে হাসল, নতুন গাঁয়ে ঘর। তুমি ওকে দিনের বেলায় দেখেচো। ওর বাপের নাম কপোতাক্ষ। পার্টি করে। কাঁধে ঝোলা নিয়ে ঘোরে গো!

অন্ধকারের হাজার রূপ। আঁধার রাতে রঘুনাথের বুঝি চোখ জ্বলে, সে সাঁই সাঁই করে সাইকেল হাঁকায়, এঁড়ে গোরুর মতো হাঁপিয়ে ওঠে তবু ক্লান্তির কথা সে মুখ ফুটিয়ে সূর্যাক্ষ'র কাছে বলে না। সাইকেল চালানো এখন তার কাছে নেশার চাইতেও বেশি কিছু। সূর্যাক্ষ তার এই অতিরিক্ত আগ্রহকে ভয় পায়, বলা যায় না কখন কি হয়, তখন বিপদে পড়ে যাবে ওর পরিবার।

গাঁয়ে ঢোকার আগেই আলোর ফুটকিগুলো নাচতে লাগল চোখের তারায়। একটা পেঁচা গোমড়া মুখ নিয়ে উড়ে গেল পিটুলিগাছের মাথা থেকে। ঢালু বলে সাইকেল থেকে নেমে পড়েছে সূর্যাক্ষ আর রঘুনাথ। ধুলো পথে ওরা পাশাপাশি হাঁটছে। দুপাশে বাঁশবন আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়। ঝিঁঝি পোকার ডাকের ভেতর থেকে আলো ছুঁড়ে দিচ্ছে অসংখ্য জোনাকি পোকা। আলোগুলো জ্বলছে, নিভছে বেশ ছন্দোবদ্ধ, চোখে রাতের আবেশ বুলিয়ে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। ধুলোভরা পথের শরীর এখন নরম হয়ে আছে, এদিককার ধুলোর রূপ ভারী সুন্দর, বড়ো ঘরের ফর্সা টুকটুকে মেয়ের মতো তার ঘি-বর্ণ গায়ের রঙ, মোলায়েম, নরম একেবারে ধূলিচন্দনের চেয়েও সুন্দর। এই ধুলো পথ দু একবার বৃষ্টি হলেই মাখা ময়দার মতো চ্যাটচ্যাটে হয়ে যাবে, তখন কাদায় ভরে যাবে সারা পথ, হাঁটা চলায় মানুষের রাজ্যের অসুবিধা।

আজ আকাশে ফ্যাকাসে একটা চাঁদ উঠেছে, হাওয়া বইছে মৃদুমন্দ। আশেপাশের ঝোপ থেকে ভেসে আসছে রাতফুলের ঘ্রাণ। বেশ উগ্র সেই সুগন্ধ। সূর্যাক্ষ হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল, দাঁড়া তো। আঃ, কী সুঘ্রাণ রে! মনে হচ্ছে কাঁঠালীচাঁপা ফুল ফুটেছে। গন্ধটা চিনতে পারছিল না রঘুনাথ, সূর্যাক্ষ নির্দিষ্ট করে বলাতে সে মনে মনে মিলিয়ে নিল গন্ধটা, দুইয়ে-দুইয়ে চার হয়ে যেতেই তার পুরু ঠোঁটেও খুশি গড়িয়ে পড়ল, ঠিক বলেছিস সূর্য, এ ঘ্রাণ কাঁঠালীচাঁপা ফুলের ছাড়া অন্য কোনো ফুলের হতে পারে না। দিনের বেলায় হলে এক ছুটে গিয়ে তোকে ফুল পেড়ে দিতাম।

সূর্যাক্ষ-র কমনীয় কণ্ঠস্বর, জানিস রঘু, মা কাঁঠালীচাঁপা ফুল ভীষণ পছন্দ করে। আমাকে প্রায় বলে ফুল এনে দিতে। কিন্তু রাস্তার ধারে গাছ, কখন ফোটে, কে তুলে নিয়ে যায় টের পাওয়া যায় না।

—আমাদের পাড়ায় একটা মস্ত কাঁঠালীচাঁপা গাছ আছে। ওর পাতাগুলান এই খরার দিনেও তেলতেলে। রোদ পড়লে দেবদারু পাতার মতো চকচক করে। জানিস, আগে আমার মায়ের মুখ ওই কাঁঠালীচাঁপা পাতার চেয়েও চকচকে ছিল। এখন খাটতে গিয়ে খসখসে ডুমুরপাতা। মাকে দেখলে আমার ভেতরটা কষ্টে মোচড় দিয়ে ওঠে। আমার আর তখুন বেঁচে থাকতে সাধ যায় না। রঘুনাথের গলার স্বর আর্দ্র হয়ে উঠল, তুই দাঁড়া, আমি দেখচি কাঁঠালীচাঁপা ফুল পাওয়া যায় কিনা। আমি ঘেরাণ শুঁকে ফুলের কাছে পৌঁচে যেতে পারি।

—না। খবরদার যাবি নে। সূর্যাক্ষ চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে, ওখানে সাপ আছে। কাঁঠালীচাঁপা ফুলের

গন্ধে বিষধর সাপ আসে। দিনেরবেলায় এ গ্রামের বহু মানুষ তা দেখেছে।

—সাপ আমার কি করবে রে, সাপকে আমি থোড়াই ডরাই! আমি বুনো ঘরের ছেলে, সাপ-পোকামাকড় আমার কুনো ক্ষতি করতে পারবে না। রঘুনাথ কথা না শুনে রাস্তা থেকে নেমে ঝোপের দিকে চলে গেল। কাঁঠালীচাঁপা গাছটা অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে সাঁওতাল যুবতীর মতো শুয়েছিল আকাশের তলায়। রঘুনাথ হাতড়ে হাতড়ে আন্দাজে ঠিক পৌঁছে গিয়ে ছুঁয়ে দিল গাছের সরু ডাল। মনে মনে ভাবল চাঁদ যদি আর একটু জ্যোৎস্না দিত তাহলে কত ভালো হত। তবু সে দমল না। হাত বাড়িয়ে একসময় খুঁজে নিল ফুলটা। পৃথিবী জয় করে আসার আনন্দ তার ভেতরে ছড়িয়ে পড়ল। কাঁঠালীচাঁপা ফুলটা সূর্যাক্ষর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, যাক মনে বড়ো শান্তি হচ্চে। যদি ফুলটা পাড়তে না পারতাম তাহলে মনে মনে এট্টা দুঃখ হোত।

সূর্যাক্ষ চুপ করে থাকল। আর ক'পা এগোলেই বুড়ো নিমগাছটাকে দেখতে পাবে সে। এখানে মাচা বেঁধে বয়স্করা তাস পেটায়। হাজার কথার ফোয়ারা ছোটে সন্ধের পর থেকে। দীনবন্ধু নতুন রেডিও কিনেছে কালীগঞ্জ বাজার থেকে। সেই রেডিওটাকে গোল করে ঘিরে থাকে প্রায় জনা দশেক মানুষ। ওরা খবর শোনে, গান শোনে। যাত্রা বা নাটক হলে এই ভিড়টা আরও বেড়ে যায়, তাদের হল্লা থামাতে দীনবন্ধু মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে, এই তোরা থামবি, যদি না থামিস তাহলে রেডিও আমি ঘরে দিয়ে আসব। ঘরে মেয়েরা শুনবে, তখন বুঝবি মজা।

রেডিও চলে যাওয়া মানে আসরের প্রাণ চলে যাওয়া ফলে হৈ-হট্টগোল থেমে যায় চোখের পলকে। মানুষের আগ্রহ-কোলাহল ফুটরসের গুড়ের মতো জুড়াতে থাকে। রাত বাড়লে এই আসর ভেঙে যায়, তখন যে যার মতো ঘরে ফিরে যায় বিড়ি ফুঁকতে-ফুঁকতে। গ্রামসমাজে বিড়ির প্রভাব অনস্বীকার্য। দীনবন্ধু রসিকতা করে বলে, কেঁদুপাতা আমাদের কাঁদিয়ে ছাড়বে গো! ধোঁয়া গিলতে গিলতে আমাদের ফুসফুস ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। তবু আমাদের হুঁশ নেই।

প্রভাত মজা করে বলল, বিড়িকে বিড়ি বললে অপমান করা হয় দাদা। লাখুরিয়া গিয়ে শুনে এলাম—ওরা বিড়ির এট্টা আলাদা নাম দিয়েছে। শুনবা? মাজায় দড়ি, খাকি চেহারা। মেজাজ কড়া। সাদা কাঠি ওর কাছে পাত্তা পায় না। বিড়ি হলো গিয়ে গাঁ-ঘরের বুনো বাউরির বিটি, আর সাদা কাঠি মানে সিগারেট হলো গিয়ে বাবুঘরের ঝিউড়ি, দেখতে ভালো, কিন্তু খাটতে পারে না। আর স্বাদেও মন ভরে না। নেশা হওয়া তো দুরে থাক নেশা চটকে যায়। তোমরা এ ব্যাপারে কি বলো হে?

নিমতলার মাচায় গবেষণার শেষ নেই। এ বছর ফলন কেমন হবে, কার মেয়ে কার সাথে পালাল, পেট ধসাল সব। তবু এই নিমতলা সূর্যাক্ষর বুকের মধ্যে কাঁপুনি তোলে। এখান দিয়ে যাওয়া-আসার সময় ওর চোখ চলে যায় পুরনো, ছিরিছাঁদ হীন, নোনাধরা ঘরখানার দিকে। ওই হুমড়ে পড়া জরাজীর্ণ পাকা ঘরটাকে তার মনে হয় তাজমহলের চেয়েও সুন্দর। ওখানে যে দ্বীপী থাকে। দ্বীপীর কথা রঘুকে বলা হয়নি তার। সেই সুযোগও আসে নি। তবে সময় করে সব বলতে হবে ওকে।

নিমতলার বাঁক পেরিয়ে এলে সূর্যাক্ষদের পাকা দোতলা বাড়িটা চোখে পড়বে। দোতলা অবধি লতিয়ে উঠেছে মাধবীলতার গাছ, থোকা থোকা ফুল বছরের সব সময় ফুটে থাকে, বিশেষ করে রাতের দিকে সুগন্ধ উজাড় করে ঢেলে দেয়, ঘরের পরিবেশ পুরোপুরি পাল্টে যায়, মনের অন্তঃস্থলে ভালোলাগার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো টান টান হয়ে ওঠে। মাধবীলতার গাছটা ছাড়া ওদের ঘরের সামনের বাগানটায় শোভা পাচ্ছে হাসনুহানা গাছটা। হাসনুহানার সবুজ সংসারটা বেশ গোছানো। কাতার দড়ি দিয়ে ছড়িয়ে যাওয়া ডালপালাকে বেঁধে দিয়েছে সূর্যাক্ষ, বেঁধে না দিলে

ওরা মাটিতে লুটায়, যেন ওদের কেউ দেখার নেই এ সংসারে। গরমের সময় গাছটাতে কুঁড়ি ভরে যায়, রাতে ফুলগুলো ওদের ছোট্ট শরীর দেখিয়ে হেসে ওঠে, অমন সাদা হাসি ফুল আর শিশু ছাড়া আর কেউ হাসতে পারে না। হাসনুহানার উগ্র সুবাস বাতাসকে মাতাল করে তোলে। দ্বীপী বেড়াতে এলে গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, অমন একাগ্র দৃষ্টিতে ও কী যে দেখে তা অনুমান করা যায় না। সূর্যাক্ষ কোনো প্রশ্ন করলে নিরুত্তর হাসে। দ্বীপীর এই হাসি সূর্যাক্ষকে পাগল করে দেয়। সে দ্বীপীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওর শরীর থেকে হাসনুহানার সুবাস চুরি করে নেয়। টোকা মেরে বলে, গাছটা তোর পছন্দ? নিবি?

দ্বীপীর ডাগর ভাসা চোখের দৃষ্টি থেকে হাসির রেশ মেলায় না, তুই আমাকে এই গাছটার চারা এনে দিবি, কোথায় পাবি?

—সে যেখানেই পাই, তুই নিবি কিনা বল?

—নেব তো বললাম।

—রোজ জল দিতে হবে কিন্তু। সূর্যাক্ষর কণ্ঠস্বর নিচু হয়ে এল, আর একটা কথা। গাছটা আমরা দু'জনে মিলে লাগাব। কি রাজি আছিস তো?

—হঠাৎ এমন শখ? দ্বীপী তরল করে হাসল।

—না, তেমন কিছু নয়। মনে হল তাই বললাম। অবশ্য রাজি হওয়া না হওয়া সব তোর উপর নির্ভর করছে। এ তো জোর করার জিনিস নয়। সূর্যাক্ষ কথাগুলো যেন দ্বীপীকে নয়, নিজেকে শোনাল।

দ্বীপী অবাক হল না, সে স্বতঃস্ফূর্ত স্বরে বলল, এতে রাজি না হওয়ার কি আছে। সমরবাবু আমাদের গাছ লাগাতে বলেছেন। গাছ লাগালে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে। ছায়ায় ভরে যাবে আমাদের গ্রাম।

সমরবাবু যে গাছ লাগানোর কথা বলেছেন সে তো ফুলগাছ নয়। তাছাড়া ফুলগাছের আয়ু কম। একটা হাসনুহানা গাছ আর কত বছর বাঁচে। সূর্যাক্ষর এ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হয়, মা যদি পাল্টা কোনো প্রশ্ন করে।

একটা হ্যারিকেন টানা বারান্দার মাঝখানে বসানো থাকে। হলদেটে আলো ঢেকে দেয় বারান্দার অন্ধকার। এদিকটায় এখনো বিদ্যুৎ আসেনি। আগামী বিশ বছরে আসবে কিনা সন্দেহ আছে কপোতাক্ষ'র। এ বিষয়ে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা দরকার। গম পেষাতে এখানকার মানুষকে যেতে হয় লাখুরিয়া কালীগঞ্জ। ওখানে ডায়নোমো চলে, গলগল ধোঁয়া আর বিকট ভট ভট শব্দ। সেই ডাইনোমো আটাকলের মেসিন ঘোরায়, গম পিষে গিয়ে সাদা আটা বাতাসে ওড়ে। সের প্রতি পেষাই খরচ গুণে নেয় চাকির মালিক।

সূর্যাক্ষ বাইরে দাঁড়িয়ে 'মা' বলে ডাকতেই ভেতর থেকে সাড়া দিলেন মীনাক্ষী। ব্যস্ত পায়ে তিনি দরজা খুলে শুধোলেন, এত দেরি হলো যে। আমি তো ভাবছিলাম কি হল আবার!

—কী আবার হবে, রঘুর জন্য দেরি হয়ে গেল। সূর্যাক্ষ বলল, ওর আসার কোনো ঠিক ছিল না। বল খেলার পর ও বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল। আমি ওর মাকে বলে জোর করে নিয়ে এলাম।

মীনাক্ষী হ্যারিকেনের বাতিটা উসকে দিলেন, সামান্য উঁচুতে হ্যারিকেনটা উঠিয়ে ধরে তিনি রঘুর দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকালেন, ঘরে এসো বাবা। সূর্যের মুখে আমি তোমার অনেক গল্প শুনেছি। আজ আসতে পেরেছ, বেশ ভালো হল। আসা-যাওয়া না থাকলে সম্পর্ক স্থায়ী হয় না।

রঘুনাথ কি বলবে ভাবছিল, তার ভেতরে অস্বস্তির আস্তরণটা ক্রমশ মোটা হচ্ছিল। এমন

পরিবেশে আসা তার জীবনে এই প্রথম। এরা কি জানে না তার বুনোপাড়ায় ঘর, ছোট জাত বলে গ্রামের অনেকেই তাদের ঘৃণার চোখে দেখে। সব জেনে শুনেও এমন আদর আপ্যায়ন তাকে বিস্মিত করল। ঘটনাটা সে ঘরে গিয়ে চুনারামকে বললে সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে মোঁচ নাচাবে, ওসব হল গিয়ে বাবু ভদ্দর লোকদের ভান। ও ফাঁদে পা দিস নে দাদুরে, ভুসভুসিয়ে সার গাদার মতো তলিয়ে যাবি, শ্বাস নিতে পারবি নে। এই অবিশ্বাস এক দিনের নয়, বহু জন্মের। এ এক অভিশাপ।

সূর্যাক্ষ কি শাপমুক্ত করতে তার জীবনে উদয় হয়েছে?

রঘুনাথের সংশয় তখনও কাটে না। সে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে আছে মীনাক্ষীর মুখের দিকে। এমন সুন্দর মেয়েমানুষ সে কালীগঞ্জে কালীপুজোর সময় দেখেছে। সচরাচর এরা ঘরের বাইরে আসে না, উৎসব পার্বণের কথা আলাদা।

মীনাক্ষী রঘুকে বললেন, তুমি বসো। আমি তোমাদের জন্য জলখাবার করে আনি। রঘুর খিদে পাচ্ছিল তবু সে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, জলখাবারের দরকার হবে নি। রাতে আমি ভিজে ভাত খাই। মা আলু মাখা দেয়। আলু মাখা আর পেঁয়াজ দিয়ে ভিজে ভাত খেতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। ভিজে ভাতে খিদে মরে।

মীনাক্ষীর ঠোঁটে রঘুর সরলতার সমর্থনে হাসি ফুটল, আজ আর ভিজে ভাত খেতে হবে না, আজ গরম ভাত খেও। আমি তোমাদের জন্য ভাত রেঁধেছি। পুকুরে জাল ফেলা হয়েছিল। পুকুরের রুই মাছের ঝোল রেঁধেছি।

রঘুর জিভে জল এলেও নিজেকে সংযত করল সে। ভালো খাওয়া তার কপালে জোটে কোথায়? বাবুদের ঘরে মোহৎসব থাকলে সেদিনটা ভোজ খাওয়ার দিন। শালপাতায় ভাত, কুমড়োর ঘন্ট আর ডাল খেতে কী যে আনন্দ! টমাটোর চাটনি যদি তার সঙ্গে হয় তাহলে তো আর কথা নেই। রাত্রিকালে মহোৎসব খেতে গেলে টায়ার ধরিয়ে নেয় রঘু, পুরনো টায়ার পোড়ে চড়বড়িয়ে, হালকা লালচে আলোয় পথ দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না। সেই খুশির দিন বুঝি সূর্যাক্ষ তাকে ফিরিয়ে দিল। রঘুর চোখ করকরিয়ে ওঠে দুর্বলতায়, তার সামাজিক অবস্থানের কথা বিচার-বিবেচনা করে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। নিজেকে তখন আর ছোট মনে হয় না, মনে হয় সেও এই এলাকার একজন, তারও বেঁচে থাকার অধিকার আছে সবার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে। ফলে আর গুটিয়ে থাকা নয়, এবার থেকে তার নিজেকে মেলে ধরার সময়।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে রাত্রি হল। রঘুনাথের জীবনে এই প্রথম এত ভালো ভালো খাবার খাওয়া। খাওয়ার সময় দুর্গামণির কথা তার খুব মনে পড়ছিল। বার দুই বেদম কাশিতে কাহিল হয়ে পড়েছিল তার মা, শেষে কালীগঞ্জ হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়ে সে ভালো হল। হাসপাতালের বড়ো ডাক্তার বলেছিলেন, যা খাবে পেট ভরে খেতে হবে। দিনভর মাঠেঘাটে খাটতে গেলে খাওয়ার দরকার। বুকের রোগ ধরে গেলে তখন আর বাঁচানো যাবে না।

বুকের রোগ মানে যক্ষ্মা। আতঙ্কিত গুয়ারাম সেদিন গালে হাত দিয়ে বসেছিল। দুর্গামণির কিছু হয়ে গেলে সে-ও পঙ্গু। এ সংসার টানবে কে। আর এই বয়সে ফের ঘরের চালে চড়ে বিয়ের নাটক করা যাবে না। সেদিন থেকে দুর্গামণির মাঠে খাটতে যাওয়া বারণ। এমন কী নেশার জিনিস সে কু নজরে দেখবে, সাধ হলেও ছুঁয়েও দেখবে না।

ভালো-মন্দ খাওয়ার সময় রঘুনাথের হাত আর মুখের কাছে উঠতে চায় না। যেন শিরায় খিঁচ ধরেছে হঠাৎ এমনভাব। মনটা কোথায় যেন উড়ে পালায়, কিছুতেই আর স্বাভাবিক হতে চায় না।

মীনাক্ষী বলেন, খেয়ে নাও, কী ভাবছো?

—না, কিছু না। রঘুনাথ নিজেকে আড়াল করে নিজের গভীরে। শামুক লুকানো বিদ্যা সে বুঝি শিখে ফেলেছে।

সূর্যাক্ষ তার অস্থিরতা অনুমান করে নিজেই কেমন অস্থির হয়ে উঠল, কী ব্যাপার রঘু, খাচ্ছিস না যে! মা'র রান্না বুঝি ভালো হয়নি?

সংকোচে রঘুনাথ যেন মাটিতে মিশে যেতে চায়, না, না, তা নয়।

—তাহলে কি?

—মা'র কথা খুউব মনে পড়চে। মা তো এত ভালো খাবার কুনোদিন খায়নি।

রঘুনাথ ছুঁয়ে দেওয়া লাজবন্তী লতার মতো কুঁকড়ে গেল।

—তুই খেয়ে নে। কাল যাওয়ার সময় মাসীমার জন্য পাঠিয়ে দেব। সূর্যাক্ষ ওর মায়ের দিকে তাকাল। মীনাক্ষী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তুমি কিছু ভেব না বাবা। আমার মাথায় থাকবে। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। ঘন করে কলাই ডাল মীনাক্ষী রেঁধেছেন নারকেল কোরা দিয়ে। এক হাতা ডাল রঘুনাথের পাতে দিয়ে তিনি বাইরের দিকে তাকালেন, কী আশ্চর্য, এখনও মানুষটা ঘরে ফিরল না!

—বাবা কোথায় গিয়েছে মা? সূর্যাক্ষও অবাক।

মীনাক্ষী গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, তোর বাবা কোথায় যায় আমাকে কি বলে যায়? আমাকে বলে যাওয়ার তার সময় কোথায়? দেশোদ্ধারের কাজ করতে গিয়ে ঘরটাকে ভুলতে বসেছে। আমার আর ভালো লাগে না হাঁপিয়ে উঠেছি। সূর্যাক্ষ কার পক্ষ নিয়ে কথা বলবে ভেবে পেল না। এ সময় চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ঘরে উঠে এল ওরা। আগে থেকে বিছানা পাতাই ছিল। কী সুন্দর ফুলছাপা একটা চাদর ঘরটায়। চেহারাই বদলে দিয়েছে জ্যোৎস্না রাতের মতো। কোথায় একটা পেঁচা ক্রাঁও ক্রাঁও শব্দে ডেকে উঠল। তারপরে চুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল শুকনো বাঁশপাতার উপর। পাশের বাঁশবাগান থেকে ইঁদুর আর কালপেঁচার ঝটপটানির শব্দ এল! শিরদাঁড়া টান টান করে খাটের একপাশে বসে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকল রঘুনাথ। পেঁচা ধাওড়া পাড়াতেও আছে, এখানকার পেঁচাগুলো বুঝি বেশি হিংস্র।

সূর্যাক্ষ নীরবতা ভঙ্গ করল, পান খাবি?

—পান আমার ভালো লাগে না। রঘুনাথ ঘাড় নাড়ল।

—তাহলে মৌরি?

—ওসব আমার অভ্যেস নেই। রঘুনাথ উসখুশিয়ে উঠল।

সূর্যাক্ষ দুম করে বলে বসল, তাহলে কী খাবি? আমি তো খাওয়ার পরে একটা নাম্বার টেন সিগারেট খাই। না খেলে আমার ঘুম পেয়ে যায়। পরীক্ষা থাকলে দু-চারটে তো খেতেই হয়, নাহলে পাশ করতে পারব না যে।

—তুর বাবা-মা জানে না? বিস্ময়ের বাঁধ ভেঙে গেল রঘুনাথের।

সূর্যাক্ষ দরাজ গলায় হেসে উঠল, বাবা একদিন দেখে ফেলেছিল তবে বকেনি। শুধু বলল—তোমার এখন সিগারেট খাওয়ার বয়স হয়নি। খাচ্ছো যখন বেশি খেও না। ওষুধের মতো পরিমাপ করে খেও।

—তার মানে?

—মানেটা বুঝলি না? সূর্যাক্ষ বেশ মজা করে বলল, বাবা বলেছে—একটা দুটো খেতে। তার

বেশি যেন না হয়। আসলে গরিব পার্টি করে তো। গরিব মানুষের দামি জিনিস বেশি খাওয়া ভালো নয়।

—তোর কাছে বিড়ি আচে? রঘুনাথ সাহস নিয়ে বলে ফেলল কথাটা, কালীপুজোর রাতে 'থাকা' দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিন প্রথম বাঁধের ধারের দুকান থিকে সিকারেট কিনে খাই। বড়ো কড়া মাল। গলায় ধুঁয়ো আটকে গিয়েচিলো। তামুকটা তিতা-তিতা, জিভে লাগলে চড়বড় করে জ্বলে।

সূর্যাক্ষ উঠে গিয়ে বইয়ের তাকটার কাছে দাঁড়াল। বই ভর্তি তাকের ভেতর থেকে সে বিড়ির বান্ডিলটা বের করে আনল। একটা রঘুনাথকে দিল, নে ধরা।

—দেশলাই না দিলে কি হাওয়ায় বিড়ি ধরে?

—ও হো। ভুল হয়ে গিয়েছে। সূর্যাক্ষ বিছানার তলা থেকে লুকোনো দেশলাইটা বের করে দিল। শুধু রঘুনাথ নয়, সে নিজেও একটা বিড়ি ধরিয়ে মৌজ করে টান দিয়ে বলল, বিড়ি হল গিয়ে আয়ুবর্দ্ধক ধূম্র টনিক। যে খেয়েছে সেও পস্তায়, আর যে খায়নি সে-ও পস্তায়। এ হল গিয়ে শাঁখের করাত। যেতে কাটে, আসতে কাটে। দুনিয়া ঘুরে এলে এর তুলনা পাওয়া ভার।

রঘুনাথ অর্ধেক কথা না বুঝে বোঝার মতো মুখ করে তাকাল। তখনই নীচ থেকে ডাক ভেসে এল মীনাক্ষীর। উদ্বেগ ভরা গলা। ব্যস্ত হয়ে উঠল সূর্যাক্ষ, এই রে, মা ডাকছে। মৌরির কৌটোটা কোথায় রাখলাম? বিছানার উপর তো রেখেছিলাম। বিছানার উপরে মৌরির কৌটো ছিল না, ওটা ছিল বইয়ের তাকে। শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেতেই গুচ্ছের মৌরি মুখে পুরে দিল সূর্যাক্ষ, তুই বস। আমি আসছি।

দক্ষিণ খোলা ঘর, হাওয়া এসে অবাধে হাডুডু খেলছে ঘরের ভেতর। পাতলা পর্দা তিরতির করে উড়ছে সেই হাওয়ার আদরে। পাশের বাঁশবন থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে কোঠরা ব্যাঙের ডাক। আশেপাশে কোথাও বুঝি চামচিকির বাসা আছে, বিদঘুঁটে গন্ধে নাক কুঁচকে যাচ্ছে রঘুনাথের।

মিনিট দশেক পরে কাঠের সিঁড়ি কাঁপিয়ে ফিরে এল সূর্যাক্ষ, মা এখনও খায়নি। বাবার ভাত আগলে বসে আছে। আমি কত বললাম খেয়ে নিতে। কিছুতেই খাবে না। পতিভক্তির জ্বলন্ত উদাহরণ। পেটে জ্বালাপোড়া শুরু হলে বুঝবে!

—তুর বাপ কি সবসময় অমন দেরি করে?

সূর্যাক্ষ অন্যমনস্ক হয়ে গেল, বাবার এই এক দোষ। সময়জ্ঞান থাকে না। হঠাৎ বাইরের গেট খোলার শব্দ হল। ঘড়িতে পেন্ডুলাম মাথা ঠুকল বারো বার। সূর্যাক্ষ ঢিল ফেলা পুকুরের মতো চঞ্চল হয়ে উঠল, এই বাবা এল। যাক, বাঁচা গেল। নাহলে এত রাতে মা আমাকে খুঁজতে পাঠাত।

—তুর বাপ যে এয়েচে কি করে বুঝলি? রঘুনাথ নিজেকে চালাক ভেবে প্রশ্ন করল। সূর্যাক্ষ বলল, বাবার গেট খোলার কায়দাটাই আলাদা। গেট খোলার শব্দ শুনে আমি বলে দিতে পারি কে এসেছে।

—ভারী মজার তো! রঘুনাথ সুতোর কাছাকাছি আগুন এসে যাওয়া বিড়ির টুকরোটা নিভিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিল। সূর্যাক্ষ কাঠের চেয়ারটা টেনে নিয়ে তার মুখোমুখি বসল, তোকে একটা কথা বলা হয়নি।

—কী কথা? রঘুনাথ আগ্রহ প্রকাশ করল না।

—থাক, কাল বলব।

রঘুনাথ বইয়ের তাকটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে শুধোল, এই তাকের সব বই তুর? অ্যাতো

বই তুই পড়িস কী করে? এত মোটা মোটা বইতে ছবি থাকে না?

—থাকে। তবে সেই ছবি তোর ভালো লাগবে না। সূর্যাক্ষ এড়িয়ে যেতে চাইল।

—ওই মোটা বইটা দেখব? পড়তে তো পারব না, অন্তত ছুঁয়ে দেখি। রঘুনাথের মোটা ঠোঁটে হিলহিলিয়ে উঠল মলিন হাসি। বইটা টেনে বাইরে আনতে গিয়ে হাত থেকে ঠিকরে পড়ল। বেশ শব্দ হল। বই ছিঁড়ল না কিন্তু বইয়ের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একটা সাদা-কালো মেয়ের ছবি। অপ্রস্তুত সূর্যাক্ষ ছবিটা চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে লুকিয়ে ফেলতে চাইল গেঞ্জির ভেতর। রঘুনাথের মনে দোলা দিয়ে উঠল রোমাঞ্চ, ওটা কি রে? আমাকে দেখাবি না বুঝি? ঠিক আচে, ওটা আর লুকোস নে, ঠিক জায়গা মতো রেখে দে। পড়া-লিখার জিনিস, হারিয়ে গেলে তুর ক্ষেতি হবে। রঘুনাথ কিছু আন্দাজই করতে পারেনি, সে বোকার বোকা, হদ্দবোকা। এবার বন্ধ জানালাটা খুলে দিল সূর্যাক্ষ। সাদা-কালো ছবিটা বিছানার উপর ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল, নে দেখ। আমার লাভার। আমি একে ভালোবাসি।

মানুষের বুকের ভেতর কত কি যে লুকোনো থাকে, মানুষের হৃদয় হল সমুদ্রতল! শুধু জল নয়, সেখানে জীবনও থাকে। রঘুনাথ ভালোবাসা ছাড়া কোনো শব্দেরই অর্থ উদ্ধার করতে পারল না, সে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল, ছবিটা খাট থেকে তুলে নিল হাতে। তারপর নতুন কিছু দেখার মতো সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ছবিটাকে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জড়তা ভেঙে গিয়ে ডিম ফোটা মুরগির বাচ্চার মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল বিষয়টা, সূর্যাক্ষ মুখোমুখি চেয়ার টেনে বলল, মেয়েটাকে চিনলি না তো? ওর নাম দ্বীপী। নিমতলার ধারে ওদের ঘর। আমি রোজ একবার করে ওদের বাড়িতে যাই। গিয়ে গিয়ে নেশার মতো হয়ে গিয়েছে। না গেলে কষ্ট হয়, বুকটা টনটনিয়ে ওঠে, মনে হয় সারাদিনের কোনো একটা কাজ করতে ভুলে গিয়েছি। রঘুনাথ আশ্চর্য হল না, মেয়েটার সাথে বুঝি তুর লটঘট চলচে? তা ভালো। তবে এসব ধ্যাসটুমু করতে গিয়ে পড়াশোনার যেন দফারফা না হয়ে যায়। পীরিত করা বড়ো ঝামেলার জিনিস রে। আমার বুড়াদাদু বলে ভাব-ভালোবাসা হল গিয়ে বুড়িগাঙের বানের জল, এই আচে ওই নেই, তাই ভালোবাসা বুকে বয়ে বেড়িয়ে শরীল খারাপ করার কুনো মানে হয় না।

—দ্বীপীর কথা ভাবলে আমার শরীর খারাপ করে না। ও আমার শ্বাস-প্রশ্বাস। জোর গলায় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল সূর্যাক্ষ, ওর মুখটা একবার না দেখলে বইয়ের সব পড়া কেমন গুলিয়ে যায়। দ্বীপী আমার সবটা জুড়ে বসে আছে। ও আমার সমুদ্র। কিন্তু ও আমাকে কি ভাবে কি চোখে দেখে তা আমার আজও জানা হয়নি।

আবেগের ধারা বিবরণী চলে ক্রমাগত। রাত্রির বয়স বাড়ার সংকেত বুঝতে পারে না কেউ। নীচের ঘরগুলো থেকে নীরবতা ছাড়া কোনো শব্দ ওঠে না। কপোতাক্ষ ঘরে একা আসেন নি, সঙ্গে করে দু-জন অতিথিকে এনেছেন। ওরা রাতে খাবেন। মীনাক্ষী কপালের ফুটে ওঠা বিরক্তির রেখাগুলোকে যথাসম্ভব লুকিয়ে ফেলে আবার ভাতের জল চড়িয়েছেন উনুনে। কপোতাক্ষর এই

স্বভাব বহু পুরনো ব্যাধির মতো, শতবার নিষেধ করেও মীনাক্ষী এর কোনো সুফল পান নি। মানুষটার এই জনহিত করার প্রবণতা বুঝি কোনোদিন অবলুপ্ত হবে না। মীনাক্ষীর বড়ো আশ্চর্য লাগে। কপোতাক্ষকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, এত রাত করে এলে যে?

—রাত হয়ে গেল মীনু। আসলে কী জান, পার্টির কাজ মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেয়েও ঝামেলার। ঘড়ি ধরে এসব কাজ হয় না। কপোতাক্ষ বোঝাবার চেষ্টা করলেন, দেখি কাল থেকে যাতে আর দেরি না হয় সেই চেষ্টাই করব।

—এরা কি খাবেন? সংশয় দ্বিধা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন মীনাক্ষী। খুব হালকা মেজাজে হেসে উঠলেন কপোতাক্ষ, জানি এত রাতে তোমার খুব অসুবিধা হবে তবু তুমি আছো বলেই আমি ভদ্রলোকদের সঙ্গে আনতে সাহস পেলাম। তাছাড়া এত রাতে ওরা গোয়াড়ী ফিরে যেতে পারবে না। বাস নেই। কাল সকালে ওঁরা চলে যাবেন।

—খাবেই যখন তখন একটা খবর পাঠাতে পারতে। মীনাক্ষীর গলা থেকে চুঁইয়ে নামল বিরক্তি।

—বড়ো ভুল হয়ে গিয়েছে।

—এই ভুল তোমার মজ্জাগত। এই ভুল তুমি বারবার করো। কপোতাক্ষ কোনো প্রতিবাদ করলেন না, তিনি জানেন অনেক সময় নীরবতাই সান্ত্বনার মলম।

মীনাক্ষী চলে যাচ্ছিলেন, কী মনে করে ফিরে এলেন, শোন, সূর্যর বন্ধু এসেছে। পারলে রাতেই একবার ছেলেটার সঙ্গে দেখা করে নিও। বড়ো ভালো ছেলে। হলদেপোঁতা ধাওড়ায় থাকে। খাওয়ার সময় ওর মায়ের কথা মনে পড়ছিল বলে ঠিক মতো খেতেই পারল না।

—কী নাম বল তো? কপোতাক্ষ উৎসাহিত হলেন।

—রঘুনাথ রাজোয়ার।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ বুঝেছি। ছেলেটার মুখ দেখলে নিশ্চয়ই চিনব। তবে আমি ওর বাবা আর দাদুকে চিনি। ওরা বড্ড গরীব তবে সৎ। কপোতাক্ষ আনমনা হয়ে গেলেন, ওদের নিয়ে তো আমার সংগ্রাম। জানি না এই অসম লড়াই আমি কতদূর টেনে নিয়ে যেতে পারব। তবে আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব। আমার এই লড়াইয়ে আমি তোমাকেও পাশে পেতে চাই।

—আমি পাশে না থাকলে তোমাকে না খেয়ে শুকাতে হোত। মীনাক্ষী সাদা ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসলেন, হাসতে-হাসতে একসময় গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি, মানুষের জন্য কাজ করো এতে আমি তোমাকে কোনোদিন বাধা দেব না। তবে তোমার কাছে আমার একটাই নিবেদন—পর-উপকার করতে গিয়ে নিজের শরীরটাকে যেন ভেঙে ফেল না। মনে রেখো—শরীরও নদীর পাড়ের মতো, একবার ভেঙে গেলে, ধস নামলে আর মেরামত করা যায় না।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এতো লাখ কথার এক কথা। কপোতাক্ষ মাথা নাড়লেন।

মীনাক্ষীর মনের মেঘ কেটে গিয়েছে, আমি যাই। তুমি একটু ওদের সঙ্গে গল্প করো। রান্না হয়ে গেলে ডাকব।

মীনাক্ষী চলে যাবার পরও একা অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন কপোতাক্ষ। সূর্যাক্ষর সঙ্গে কাল রাতেও তাঁর দেখা হয়নি। তিনি যখন ফেরেন তখন সূর্যাক্ষ ঘুমিয়ে পড়েছে। আর ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে করেনি ওর। সূর্যাক্ষর অভ্যাস রাত বারোটার মধ্যে শুয়ে পড়া। রাত বারোটাতে শুলেও ও সকাল পাঁচটার মধ্যে উঠবেই। পেছনের বাঁশবাগানটাতে পাখির মেলা বসে যায় তখন, বিশেষ করে এক দল কাক বাঁশগাছে বসে দলবদ্ধভাবে ডাকতে থাকে, ওরা বুঝি সকালের আলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে পৃথিবীতে। আর আশ্চর্য, সকালবেলায় কাকের কা-কা ডাকও

শুনতে মন্দ লাগে না সূর্যাক্ষর। পাখিগুলো বুঝি তার ঘুম ভাঙানোর জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হয়ে থাকে। কাক ছাড়াও বাঁশবাগানের ডোবাটায় এক জোড়া ডাহুক আসে প্রতিদিন সকালে। ওদের ডাকটা বড়ো অদ্ভুত। সব সময় ওদের যেন কেউ তাড়া করছে এমন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ওদের ক ক্ক ক ক ডাকে স্পষ্ট। সূর্যাক্ষ বুঝতে পারে ডাহুক হল সব চাইতে ভীতু পাখি। সুন্দর পাখি। একমাত্র ডাহুকই গলায় সাদা মোতির মালা পরে ঘুরে বেড়ায়, ওদের পালকের বিন্যাস, সজ্জা কোনো শিল্পীর দক্ষ হাতের অঙ্কন নয়, স্বয়ং প্রকৃতির, সৃষ্টিকর্তা বহু যত্ন নিয়ে ওদের পালকে রঙ ভরেছেন, তিল তিল করে ওদের তিলোত্তমা করে তুলেছেন।

কী মনে করে কপোতাক্ষ দোতলার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেলেন, কান পেতে কথা শোনার চেষ্টা করলেন। হ্যাঁ, সূর্যাক্ষর গলা পাওয়া যাচ্ছে। গল্প আর বন্ধু পেলে ছেলেটার চোখের ঘুম পেয়াদাদের মতো উধাও হয়ে যায়। কপোতাক্ষর তবু সংশয় ছিল যাবে কি যাব না বলে। কিন্তু বাইরে ঠিকরে পড়া হ্যারিকেনের আলো তার সংকোচকে দূরে সরিয়ে দিল। কাঠের সিঁড়ি ভেঙে তিনি উঠে এলেন দোতলার বারান্দায়। ঘরে না ঢুকেই তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, সূর্য, ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি?

সূর্য সাড়া দিল, না বাবা, জেগেই আছি।

রঘুর হাত থেকে দ্বীপীর ফটোটা কেড়ে নিয়ে সে চকিতে বিছানার তলায় লুকিয়ে ফেলল, তারপর রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা আসছে।

রঘুনাথও নিমেষে শরীরটাকে টানটান করে উঠে দাঁড়াল। সূর্যাক্ষর বাবার সঙ্গে তার আলাপ নেই। আলাপ করার প্রয়োজনও হয়নি। তবে কপোতাক্ষ রোজ শেরপুরের বাঁধ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে কালীগঞ্জের বাজারে যান, ওখানেই তাঁর আসল আড্ডা। প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফেরেন। এ অঞ্চলের ডাকাত-চোর-বদমাশ-লুটেরা-ধান্দাবাজ সব তাঁর চেনা জানা। ফলে রাত করে বাড়ি ফিরলেও কেউ তাঁর পথ আগলে দাঁড়ায় না, বরং চোখাচোখি হলে মুখ নামিয়ে নিয়ে চলে যায়। এই সম্মানটুকু আছে বলেই এখনও কপোতাক্ষ সারাদিন লড়াই করার শক্তি পান।

ঘরে ঢুকেই সবার আগে কপোতাক্ষ রঘুর দিকে তাকালেন, তোমাকে আমি দেখেছি, কিন্তু কথা হয়নি। তোমার বাবার নাম কি গুয়ারাম?

রঘুনাথ ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলেই মাজা নীচু করে হাত বাড়িয়ে দিল কপোতাক্ষর পায়ের দিকে। পা ছোঁয়ার আগেই কপোতাক্ষ রঘুনাথের হাত দুটো ধরে ফেললেন, না-না থাক। প্রণাম করার দরকার নেই। তুমি মনে মনে আমাকে শ্রদ্ধা করলেই প্রণাম করার চেয়েও হাজার গুণ বেশি শ্রদ্ধা জানানো হয়। আর একটা কথা। চট করে লোকের পায়ে হাত দিতে যাবে কেন? মাথা নত করার স্বভাবটা বন্ধ করতে হবে আমাদের। বাবা-মা আর তোমার শিক্ষক ছাড়া কারোর কাছে মাথা নত করবে না।

কপোতাক্ষর কথায় যেন চাপা আগুন উসকে উঠল। একটা তেজ তার কথার মধ্যে ঠিকরে বেরচ্ছিল।

—ঠিক আছে। তোমরা বসো। রাত হল। কাল সকালে আবার কথা হবে। তিনি সূর্যাক্ষর দিকে তাকালেন, মশারি টাঙ্গিয়ে ঘুমাবি। বাঁশ বাগানের মশারা কিন্তু দৈত্য হয়। আমি আসি।

কপোতাক্ষ চলে গেলেন। সূর্যাক্ষ সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, আমার বাবাকে কেমন দেখলি রঘু?

—তুর বাবা বেশ ভালো মানুষ। অমন মানুষ আজকালকার দিনে পাওয়া ভার। রঘুনাথের কথায় খুশি হল সূর্যাক্ষ, প্রসঙ্গ বদল করল সে, কাল তোকে দ্বীপীদের বাড়িতে নিয়ে যাবো।

—আমার লাজ লাগবে, আমি যাব না।

—যাবি না মানে? তোকে যেতেই হবে। জেদ ফুটে উঠল সূর্যাক্ষর গলায়। রঘু বলল, আগে সকাল হতে দে, তারপর দেখা হবেখন।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল রঘুর, জানালা টপকানো রোদ এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। চোখ ডলে নিয়ে সে দেখল চারিদিকে ফুটফুটে আলো হাসির নমনীয় রঙ মেখে নিজেকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। সূর্যাক্ষ কখন উঠেছে তা সে সঠিক জানে না। তবে সূর্যাক্ষ ঘরের এক কোণে হ্যারিকেন নিয়ে মনযোগ সহকারে পড়ছিল। ওর ভোরে ওঠা অভ্যাস, যত রাতে ঘুমাক না কেন ভোর ভোর ঘুম ভাঙবেই। এই অভ্যাসটা মীনাক্ষীই তাকে পাইয়ে দিয়েছেন, ভোর ভোর না উঠলে দিনটা বড়ো ছোট হয়ে আসে। মীনাক্ষী প্রায় দিনই আবৃত্তি করার মতো করে বলেন, আরলি টু রাইজ এন্ড আরলি টু বেড মেকস আ ম্যান হেলদি অ্যান্ড ওয়াইস্। বুঝলি—অনুগত ঘাড় নাড়ে সূর্যাক্ষ। কপোতাক্ষ ঘুমের ব্যাপারে আপোষহীন। দেরি করে ঘুমালে দেরিতে ওঠা তাঁর স্বভাব। বিশেষ দরকারেও সে বিছানা ছেড়ে উঠবে না। আর যদি কোন কারণে উঠতে হয় তাহলে বিরক্ত হয় প্রচণ্ড, দিলে তা ঘুমটা ভাঙিয়ে, ঘুমের কত দাম জানো?

—আমার আর জেনে দরকার নেই। তুমি আগে বাজারে যাও তো। ঘরে কিছু নেই। ছেলেটা কী খেয়ে ইস্কুলে যাবে? মীনাক্ষীর কণ্ঠস্বরে বাতাস-খেদানো ঢেউয়ের ব্যস্ততা।

কপোতাক্ষ মীনাক্ষীর মুখের উপর কোনো কথা বলতে পারেন না। অস্বস্তি হয়। তিনি নিজের চোখে দেখেছেন গোয়াড়ী শহরে মীনাক্ষীদের বাস চলে। আর একটা বাস কৃষ্ণনগর-করিমপুর রুটে। দুটো বাস ছাড়াও ওদের আছে কাপড়ের দোকান। ভাব-ভালোবাসার বিয়ে নাহলে কি মীনাক্ষী কোনোদিন এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসে বসবাস করত। বিবাহ শব্দটা তাই ভাগ্যঘেঁষা।

পিতৃদেব ক্ষীরমোহনের মৃত্যুর ছ মাসের মধ্যেই নীলাক্ষ জমিজমা, বাস্তুভিটে, পুকুর বিল এমনকী বাসনপত্র সব চোখ উলটে ভাগ করে নিলেন। এমনকী ভাগ হয়ে গেল গোয়ালের গোরু-মোষ। নীলাক্ষ যাওয়ার আগে গায়ে চিমটি কাটার মতো কথা বলল, তোর সাথে ইচ্ছে থাকলেও আর থাকা যাবে না। গাঁয়ের মানুষ খেপিয়ে তুই যে কারবার শুরু করেছিস—তা কখনও সমর্থনযোগ্য নয়। ভাবছিস সস্তা রাজনীতি করে চারদিক মাত করে দিবি—তা কিন্তু হবার নয়। মানুষ ফাঁকিটা ধরতে পারে। আর যেদিন ফাঁকিটা ধরতে পারবে তোদের কিন্তু গাঙের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। সময় আসলে আমার কথাটা মিলিয়ে নিস।

—তা বলে তুই ঘর ছেড়ে চলে যাবি? ভ্রূ তুলে জিজ্ঞাসা করল কপোতাক্ষ।

—না গিয়ে উপায় নেই। আমি চোরের সাথে ঘর করব তবু তোর সাথে নয়। মুখ বেঁকে উঠল নীলাক্ষর, তোর সাথে থেকে আমার নিন্দে হচ্ছে। ফলে ঘরের খেয়ে আমি বনের মোষ তাড়াতে পারব না। তাছাড়া তোর ছায়ায় নিজেকে ঢাকলে হাসাহাসি করবে লোকে।

—আর একবার শেষ বারের মতো ভেবে দেখ। কপোতাক্ষ বোঝাতে চাইল, দশের লাঠি একের বোঝা। কথাটা মানিস তো?

নীলাক্ষ চলে যাওয়ার পর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল কপোতাক্ষর। সে এখনও বুঝতে পারেনি কী তার অপরাধ? কেন দাদা তার সাহচর্য ছেড়ে গেল। তবে নতুন জায়গায় নতুন বাড়িতে নীলাক্ষ বেশ সুখে আছে। জমিদারের মতো মেজাজ সে এখনো ধরে রেখেছে নিজের ভেতর।

মীনাক্ষী এসে সকালের চা দিয়ে গেলেন। প্রতিটি সকাল তাঁর কাছে নতুন মাত্রা নিয়ে ধরা দেয়। একটা ভয় পেঁচিয়ে ওঠে বুকের ভেতর। রামনগর সুগার মিলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন

কপোতাক্ষ। মিল-কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর পটল না। শ্রমিক আর চাষিদের দাবী নিয়ে যত অশান্তি। অগ্রভাগে কপোতাক্ষ ঝান্ডা হাতে—জবাব চাই, জবাব দাও। সমস্যা একটা নয়। সাহেবমাঠের আখ বিক্রির সমস্যা ছিল বহু দিনের, সেই সঙ্গে যুক্ত হল পেয়াদাদের সমস্যা। ওরা নূন্যতম বেতনে কাজ করতে আগ্রহী নয়। বেতন বৃদ্ধির জন্য অসন্তোষ দানা বাঁধছিল ওদের ভেতর। মনে অশান্তি নিয়ে মাঠ পাহারার কাজ হয় না। এ কাজে বিপদ সব সময় মাথার উপর খাঁড়ার মতো ঝোলে। মিলের কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে মিল প্রশাসন উদাসীন। ওদের চিকিৎসার ব্যবস্থার আশাপ্রদ নয়, তাছাড়া যাতায়াতের পথঘাট খানাখন্দে ভরা। এসব সমস্যার কথা ভেবে কপোতাক্ষর রাতে ভালো ঘুম হয় না। বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার আগে ঘর সামলে নেবার বড়ো প্রয়োজন। শ্রমিকরা এবার পুজোর বোনাসের জন্য সংঘবদ্ধ হবে। ওদের নেতৃত্ব দেওয়ার মানুষ কোথায়? কপোতাক্ষই চাকরির ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে গেলেন। আলোচনার মধ্য দিয়ে মীমাংসাসূত্র বেরিয়ে আসার কথা ছিল কিন্তু বাস্তবে তা হল না একপক্ষের অনড় মনোভাবের জন্য। কপোতাক্ষর উপর রুষ্ট হলেন কর্তৃপক্ষ। তাকে আত্মসংশোধনের সুযোগ দিলেন ওরা। কিন্তু কপোতাক্ষর মন আতাগাছের ডালের মতো ভঙ্গুর নয়, তিনি পাকা বাঁশের কঞ্চি, মচকাবেন তবু ভাঙবেন না। ফলে একদিন ছাঁটাইয়ের চিঠিটা ধরিয়ে দিলেন অফিসের বড়বাবু। এরকম কোনো অঘটন ঘটবে আগে থেকে আঁচ পেয়েছিলেন কপোতাক্ষ। মীনাক্ষী সব শুনে নিরাপত্তাহীনতায় ডুকরে উঠলেন, এ কী শোনালে গো, এখন আমাদের কী ভাবে চলবে?

—তুমি ভয় পেও না। তিনটে পেট ঠিক চলে যাবে। আমি ক্ষীরমোহন চক্রবর্তীর ছেলে। আশা রাখি আমার মাথার উপর যতদিন দাদা আছে আমার খাওয়া পরার কোনো অসুবিধা হবে না। কপোতাক্ষর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা এবং সহনশীলতার সহাবস্থান, একটা কথা মনে রেখো মীনা, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। ভগবানে আমার কোনো আস্থা নেই। আমার দেবতার নাম মানুষ-দেবতা।

—তুমি কি পাগল হলে? দাদা কেন তোমার সংসার টানতে যাবেন? মীনাক্ষীর চোখ জোড়ায় অশান্তি চিকুর কাটে, তোমার দাদা দেখো কোনদিন আবার পৃথক না হয়ে যান।

—যায় যদি তো যাবে, তাতে আমার কি? কপোতাক্ষর কণ্ঠস্বরে হালকা সুর, এ পৃথিবীতে কেউ কারোর অনুগত নয়। যে যার কর্মের দ্বারা খায়। আসলে প্রতিটি দানায় যে খাবে তার নাম লেখা থাকে। তাছাড়া আমার চাকরি আমার দোষের জন্য যায়নি। বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে আমি ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ত্যাগ করেছি।

মীনাক্ষী সংসারের দাবীর কথা কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারেন না। উল্টে কপোতাক্ষ বোঝান, আমার যদি ডাল ভাত জোটে তোমারও জুটবে। আর তা যদি না জোটাতে পারি তোমাকে কৃষ্ণনগরে রেখে আসব। তুমি খোড়ে নদীর উন্মুক্ত হাওয়া খেয়ে নিজেকে চাঙ্গা রেখো। যদি সম্ভব হয় ভবিষ্যৎ-এর বিপ্লবের জন্য নিজেকে তৈরি রেখো।

—কী পাগলের মতো বকছো! সূর্যর ভবিষ্যৎ-এর কথা ভাববে না? মীনাক্ষী রাগ জ্বালা লুকিয়ে রাখতে পারল না? হতাশায় ডুবে গেল তার সুন্দর মুখশ্রী।

সকালের চা-টা সুন্দর বানিয়েছিলেন মীনাক্ষী। কপোতাক্ষ তার সংগঠনের কর্মীদের নিয়ে বসেছেন বাইরের বারান্দায়। সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে আলোচনা চলছে পূর্ণমাত্রায়। তাদের কথা শোনার কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করল না সূর্যাক্ষ। সে মীনাক্ষীর মুখোমুখি দাঁড়াল, মা, আমি রঘুকে এগিয়ে দিয়ে আসি। আজ আমার স্কুল আছে। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ার পর টিউশানি সেরে ফিরব।

রঘুনাথ বিদায়বেলায় কেমন করুণ মুখ করে তাকিয়ে ছিল মীনাক্ষীর দিকে। সূর্যাক্ষর মা যেন কুমোরপাড়ায় গড়া মা দুর্গা। যেমন ব্যবহার, তেমন কথা-বার্তা, আন্তরিকতা। রঘুনাথের মন ভরে গিয়েছে। মানুষের প্রতি তার ভুল ধারণা অনেকটাই পাল্টে গেছে। ঘরে ফিরে সব কিছু গুছিয়ে বলতে হবে দুর্গামণিকে, যদিও এসব কথা সে আদৌ বিশ্বাস করবে না। রঘুনাথ তক্তাপোষে ঘুমিয়েছে সূর্যাক্ষের পাশে একই বিছানায়। একথা গ্রাম- সমাজে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠার পরিবেশ এখন ডিমের ভেতর ভ্রূণের মতো লুকিয়ে আছে। বিশ্বাস না করলেও সে দুর্গামণিকে গল্প বলবে সব। এ গল্প শুনে চুনারামের কী প্রতিক্রিয়া হবে তা মনে মনে সব যেন দেখতে পাচ্ছিল রঘুনাথ।

মীনাক্ষী স্নেহের চোখে রঘুনাথের দিকে তাকালেন, আবার এসো বাবা। সংকোচ করো না, এ বাড়ি তো তোমার। যখন মন চায় চলে আসবে।

রঘুনাথের ঠোঁট কেঁপে উঠল, থরথরিয়ে উঠল দৃষ্টি। সে বুঝতে পারল আর একটা শব্দও যদি মীনাক্ষী উচ্চারণ করেন তার প্রতি তাহলে সে উদ্গত কান্নার বেগকে সামাল দিতে পারবে না, বাঁধ ভেঙে গিয়ে আবেগের বন্যা আসবে শরীরের নদীতে।

সকালবেলায় নিমতলা ঝাঁট দেয় খোঁড়া হারু। ওর ভূষিমালের দোকান মাত্র বিশ হাত দূরে। শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও হারু একাজটা নিজের হাতে করতে পছন্দ করে। হারু শুধু খোঁড়া নয়, তার উচ্চতা মাত্র তিন ফুট দুই ইঞ্চি। সে তার যৌবনে সার্কাস দলে নাম লিখিয়েছিল, সেখানে সে জোকার সাজত, মুখে রঙচঙ মেখে হাসি-আনন্দ বিলোত দর্শকদের। সার্কাসের জীবন হারুর পছন্দ হয়নি কোনোকালে। সে ম্যানেজারের ক্যাশ ভেঙে পালিয়ে এল তিন বছর পরে। গাঁয়ে এসে ভয়ে ভয়ে সময় কাটাত সে। ছ'মাস পরেও যখন সার্কাসের লোক এল না তার খোঁজে তখন সে সাহস করে নিমতলায় ভূষিমালের দোকান খুলল। হারুর দোকান এ তল্লাটে বিখ্যাত, গাঁ বলে সে দাম গলা কেটে নেয় না, সামান্য লাভ রেখেই সে ব্যবসা করতে পছন্দ করে। এখন কাঁচা টাকার মুখ দেখেছে হারু। সে এখন গরিব দুঃখীদের মহাজন, সুদে টাকা ধার দেয়, গোপনে বন্ধকের কারবার করে।

কপোতাক্ষ হারুকে বারকতক সতর্ক করেছেন, সুদের টাকা থাকে না হারু। তোমার তো অভাব নেই তবু তুমি কেন সুদের কারবার করবে? মানুষের অভিশাপ কুড়িয়ে জীবন কোনোদিন সুখের মুখ দেখে না। তাই বলছিলাম কী হারু, তুমি এসব ছেড়ে দাও। শুধু ভূষিমালের দোকানটা চালাও। ওতেই তোমার মঙ্গল।

হারু সুখী না হলেও ঠোঁটে কৃত্রিম হাসি ঝুলিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। সে জানে কপোতাক্ষর রাগের বাহার। মানুষটা ভালোর ভালো কিন্তু রেগে গেলে মাথায় খুন চড়ে যায়, তখন সাত বুঝিয়েও তাকে সামলানো যায় না।

নীলাক্ষর কাছে হারু খোঁড়া কাঁচুমাচু হয়ে অভিযোগ করেছে কপোতাক্ষর বিরুদ্ধে। সব শুনে দৃঢ় অথচ চাপা কণ্ঠে নীলাক্ষ আউড়েছেন, কপোতের কথা আমার কাছে বলো না। বাবার মৃত্যুর পর আমরা ভিনো হয়ে গিয়েছি। আমাদের হাঁড়ি আলাদা, ঘর আলাদা। এমনকী চিন্তা-ভাবনাগুলোও আলাদা। ওই অমানুষটাকে আমি কিছু বোঝালে বুঝবে না। ও নিজেকে কমরেড মনে করে।

হারু খোঁড়া একথা শোনার পরে দ্বিতীয় কোনো কথা বলার সাহস পায়নি। আপোষের ঢোঁক গিলে সে মন দিয়েছে নিজের কাজে।

এ সময় নিমগাছের ছায়া বড়ো মধুর হয়। নিম হাওয়ায় রোগ-জ্বালা ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। সূর্যাক্ষ জ্ঞান বাড়ার পর থেকে এই গাছটাকে দেখছে। এর বুঝি বয়স বাড়ে না, গতর বৃদ্ধি হয় না, এ যেন জরা নিরোধক ছাল পড়ে কালের প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সূর্যাক্ষ রঘুনাথের দিকে তাৎপর্যপূর্ণ চোখে তাকাল, কি রে যাবি নাকি দ্বীপীদের ঘরে? মন চাইলে বল এখুনি নিয়ে যাবো তোকে।

রঘুনাথ সংকোচ আড়ষ্টতায় ভুগছিল, না, আজ থাক। পরে কুনোদিন আসবখন।

পরের কথা পরে হবে, এখুনি যাই। সূর্যাক্ষ কাতর হয়ে উঠল, জানিস কাল রাতে দ্বীপীর স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন দেখতে-দেখতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। সেই থেকে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। চল মাইরি। সূর্যাক্ষ রঘুনাথের হাত ধরে টানল।

দ্বীপীদের বাড়িখানা পোড়ো বাড়ির মতোন, কতদিন যে চুনকাম হয়নি সময়ই তা জানে। বাড়ির সামনে দু'পাল্লা কাঠের দরজা, তাতে আলকাতরার রঙ বর্ণ হারিয়ে সাদা জামা ঝুলকালিতে বোঝাই হয়ে যাওয়ার মতো দেখাচ্ছে। ঘরের সীমানার পাচিলটাও নোনা- ধরা, বয়স্ক। ফ্যাকাসে লাল রঙের ইটগুলো দাঁত বের করে হাসছে। সূর্যাক্ষ দ্বিধাহীন হাতে বার কতক শেকলের বাড়ি দরজায় মারতেই কে যেন দৌড়ে এসে দরজা খুলে দিল। সূর্যাক্ষর মন প্রজাপতি হয়ে উড়তে লাগল দ্বীপীকে দেখতে পেয়ে। কিছু বলার আগেই দ্বীপী কেমন নরম চোখে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে উঠল, কাল যে এলি না বড়ো, জানিস আমি কি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম তোর সাথে কথা বলব না, রাগ করে থাকব।

সূর্যাক্ষর চোখ দুটো পোষা বেড়ালের চেয়েও অনুগত দেখাল, রাগ করিস না। দেখ আজ আমি কাকে সঙ্গে করে এনেছি।

দ্বীপী ভীতু চোখে লজ্জা মিশিয়ে তাকাল। রঘুনাথের চোখে সে চোখ ফেলতে পারল না। চোখ নিমেষে নামিয়ে নিয়ে ঠাকুর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

সূর্যাক্ষ কৌতুক হেসে বলল, ওকে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। ওর নাম রঘু, রঘুনাথ। ভীষণ ভালো ফুটবল খেলে। বাঁশি বাজায়। সময়-সুযোগ হলে তোকে একদিন বাঁশি বাজিয়ে শুনিয়ে যাবে। কি রে রঘু, বাজাবি তো?

রঘুও নিরুত্তর, দম না দেওয়া ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো স্থির হয়ে আছে। নট নড়ন চড়ন। সূর্যাক্ষ ওর পিঠে থাবড়া মারল, কি রে কথা বলছিস না কেন? বোবা হয়ে গেলি বুঝি?

বিরক্তির সঙ্গে তাকাল রঘুনাথ, কথা থাকলে তো বলব? আমার কুনো কথা নাই। সব কথা মুখে এটকে গেচে।

—কেন রে?

—সামনে যে দাঁড়িয়ে আচে তার জন্য। রঘুনাথ এবার সংযমের বেড়া ভেঙে হেসে উঠল।

দ্বীপী বলল, তোর বন্ধু তো বেশ রগড় জানে। কোথায় বাড়ি রে ওর?

সূর্যাক্ষ কিছু বলার আগেই রঘুনাথ বলল, বাঁধের ধারে বুনোপাড়ায়। হলদিপোঁতা ধাওড়ার নাম শুনেচ?

ঘাড় নাড়ল দ্বীপী, আমরা তো রোজ ওই বাঁধ ধরে ইস্কুলে যাই! স্কুলে যাবার সময়টা আনন্দের চামর বুলিয়ে দেয় দ্বীপীর চোখে-মুখে। বিরক্তি নয় বেশ মজা হয় তার। মজার পাশাপাশি এক

বিমল আনন্দ ছুঁয়ে থাকে তাদের। গ্রাম থেকে ওরা এক সাথে বেরয়। বাঁধের গোড়ায় এসে সূর্যাক্ষ বলবে, দ্বীপী, এবার তুই ক্যারিয়ারের পেছনে ঝপাৎ করে বসে পড়। কত আর হাঁটবি।

প্রথম প্রথম দ্বীপীর লজ্জা লাগত, এখন সেই লজ্জা শরত শিউলির মতো ঝরে গেছে। সাইকেল গড়ালে শুরু হয় ওদের কথামালা। দ্বীপী মুখ তুলে শুধোবে, হ্যাঁরে সূর্য, তোর কষ্ট হয় না আমাকে নিতে?

—ধ্যুৎ তোকে নিতে আমার কষ্ট কি। তুই যা রোগা। বোঝাই যায় না বসে আছিস।.

—হ্যাঁরে, আমি কি এতই রোগা? বল তো আমি কার মতো রোগা? দ্বীপীর চকচকে চোখে দুঃশ্চিন্তা, আমি কি ডমরু ক্ষ্যাপার চেয়েও রোগা নাকি?

ডমরু বিয়ে পাগলা, রোগা খিটখিটে ওর চেহারা, মেয়ে দেখলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে যেন ঠাকুর দেখছে। ওর নামে পাড়ায় পাড়ায় একটা ছড়া ঘোরে।

ডমরু ক্ষ্যাপা, বউয়ের বাবা,/বউ আনতে কবে যাবা।/ বউ গিয়েচে বাপের ঘর। এঁড়ে গোরুর লেজ তুলে ধর।

ডমরুর চেহারাটা মনে পড়তেই হেসে ফেলল সূর্যাক্ষ। দ্বীপীর স্ফুরিত অধরোষ্ঠ কেঁপে উঠল, হাসছিস যে! একদম হাসবি নে। তুই হাসলে আমার একদম ভালো লাগে না।

হাসব না কি কাঁদব? পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় সূর্যাক্ষ।

দ্বীপী সাইকেল থেকে ঝপ করে নেমে পড়ে, ধুলো ছিটিয়ে হাঁটতে থাকে রাগের ঘোরে। সূর্যাক্ষ তার সামনে গিয়ে মুখ ভেংচে বেল বাজায়। এভাবেই পাঁচ পাঁচটা বছর কেটে গেছে ওদের স্কুল যাওয়া আসায়। পাড়াপড়শিরা ভাবে ওরা দুটিতে যেন ভাই-বোন। ভাই-বোন না হলে কি তুই-তুকারি সম্পর্ক হয়।

দ্বীপী একদিন জামা ছাড়ছিল ঘরের ভেতর, সূর্যাক্ষ পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে একেবারে অবাক। দ্বীপীর ছড়ানো পিঠটা একেবারে টকটকে ফর্সা, হালকা লালচে আভা ফুটে উঠেছে ত্বকের উপর। চোখ বটআঠায় আটকে যাওয়া বনি পাখির চেয়েও অসহায়। গলা খেঁকারি দিয়ে কেশে উঠতে পারেনি সে, যদি স্বপ্নটা শেষ হয়ে যায়—ভয় একটাই। দ্বীপী টের পেয়ে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়েছিল সূর্যাক্ষকে। লজ্জায় আরক্ত তার চোখ-মুখ, কী অসভ্য রে তুই?

—কেন কী হলো? সূর্যাক্ষও কম অবাক নয়।

দ্বীপী নাকের ছিদ্র বিস্ফারিত করে বলেছিল, মেয়েরা পোশাক বদলালে সেখানে কি ছেলেদের থাকা উচিত হয়?

—মা তো শাড়ি বদলায়। আমি তো দেখি। —মা তো কিছু বলে না।

—তখন তুই ছোট ছিলিস। ছোটদের চোখে পাপ থাকে না। শিশুদের চোখ তো ফুলের চেয়েও পবিত্র। তুই বইতে পড়িস নি? দ্বীপী কুলকুল করে হেসে উঠল, খবরদার আর কোনোদিন আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবি না। তুই বড়ো হয়েছিস। আমিও বড়ো হয়েছি। এখন এসব ভালো দেখায় না। দ্বীপী হাই ইস্কুলের দিদিমণির মতো বলল কথাগুলো।

—তাহলে তুই যে আমার সাইকেলে বসে যাস, তখন! তখন যদি লোকে কিছু কথা বলে। দ্বীপীর মুখের গোলাপী আভা চিন্তায় মিলিয়ে গেল, লোকে বলতেই পারে। লোক কিছু বললে আমাদের সমঝে চলতে হবে। লোক যা বলবে তা আমাদের মানা উচিত।

—আমি লোকের কথা মানি না। আমি শুধু তোর কথা মানব। বল দ্বীপী, আমার জন্য তোর মন খারাপ করে কি না?

দ্বীপীর কানের লতি লজ্জায় জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠল, তার মুখে কোনো ভাষা নেই,

তার বুকের ভেতর শুশনিপাতার ঢেউ উঠল, কলজেটা গুড়ুল পাখির মতো ডেকে উঠল গুড়গুড়িয়ে, সাবুদানা ঘাম বিজবিজিয়ে উঠল কপাল জুড়ে, কেঁপে কেঁপে উঠল চোখের তারা, ওর সিল্কি মুখে পিছলে যেতে লাগল জীবনের প্রথম রোদ্দুর, কোনোমতে ঠোঁটের কোণটা কামড়ে সে উদাস হয়ে গেল।

সূর্যাক্ষ খপ করে তার হাতটা ধরে মুচড়ে দিল জোর করে, তুই মিথ্যুক, ভীষণ স্বার্থপর। নিউটনের সূত্র বলছে—প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। তাই যদি হয় তাহলে তোর জন্য আমার মন খারাপ করলে তোরও আমার জন্য মন খারাপ করবে। আরে, এ তো এ প্লাস বি হোলস স্কোয়ারের ফরমুলার চাইতেও সোজা। তুই এটাকে ভুল প্রমাণ করবি কি করে?

—আমার হাতটা ছেড়ে দে সূর্য, লাগছে।

—লাগুক। লাগার জন্য তো ধরেছি।

—মেয়েদের হাত আর মন নরম হয় জানিস না বুঝি?

—কথা ঘোরাস না, সোজা কথার সোজা জবাব দে। সূর্যাক্ষ রীতিমতন উত্তেজিত, তুই যদি আমাকে কোনো জবাব না দিস তাহলে আমি আর কোনোদিন তোর বাড়িতে আসব না।

—না এসে থাকতে পারবি তো? আহ্লাদী গলায় প্রশ্ন করল দ্বীপী।

—আমাকে রাগাস না, আমি সব পারি।

—আমিও সব পারি।

—পাক্কা?

—পাক্কা। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে দ্বীপী হাসছিল। ওর রক্তবর্ণ পঞ্চদশী ঠোঁট পাকা তেলাকুচর মতো আহ্বান করছিল সূর্যাক্ষকে। সূর্যাক্ষ সাইকেলটা স্ট্যান্ড করে ডানে বাঁয়ে তাকাল, তারপর দ্বীপীকে পাগলের মতো নিজের কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, তুই আমার সঙ্গে না মিশলে আমি মরে যাবো দ্বীপী, আমি আর একটা লাইনও পড়তে পারব না। তুই আমার পড়া, তুই আমার খেলা, তুই আমার ঘুম সব। আমাকে ভুলে যাস না দ্বীপী। তুই ভুলে গেলে দেখবি আমি ডমরু পাগলার মতো মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—কী ভাবছিস? দ্বীপীর ডাকে হুঁস ফিরে এল সূর্যাক্ষর। এমন ছেলেমানুষী তার ভেতরে মাঝে মাঝে ভর করে। সত্যি দ্বীপী এখন তার জীবনে প্রদীপের আলোর মতো। দ্বীপীকে সে কখনো খারাপ ভাবতে পারে না। দ্বীপীও তাকে নিকট বন্ধুর মতো দেখে সব সময়।

—তোর বন্ধু এল, ওকে ঘরে নিয়ে যাবি না বুঝি? দ্বীপী হাসতে হাসতে বলল, চল, ঘরে গিয়ে বসি। আজ নারকেল মুড়ি খাওয়াব। জানিস ভোরবেলায় গাছ থেকে একটা ঝানু নারকেল পড়েছে। বাবা মন্দিরে যাওয়ার আগে ছাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে ওটা। ভালোই হল নারকেলটা তোদের খাওয়াতে পারব।

দ্বীপী ওদের ঘরে বসিয়ে চলে গেল।

চন্দ্রিকা দ্বীপীর মা। কাঁসার জামবাটি ভরে মুড়ি আর নারকেল নিয়ে এলেন তিনি। রঘুনাথকে দেখে তিনি স্মিত হাসলেন, একটা জামবাটি তিনি রঘুনাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাও বাবা, মুড়িগুলো খেয়ে নাও। আমি দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি দ্বীপীকে দিয়ে। দুধ মুড়ি খেলে পেটে কিছুক্ষণ থাকবে।

চন্দ্রিকা চলে গেলেন। দ্বীপী এল দুধভর্তি কাঁচের গ্লাস হাতে। রঘুনাথের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে সে বলল, আমাদের পোষা গোরুর দুধ। সব মিলিয়ে তিনটে আছে। তিনটেই পালা করে দুধ দেয়।

রঘুনাথ কাচের গ্লাসটা ধরে নিয়ে দ্বীপীর দিকে তাকাল। মানুষ এত সুন্দর হতে পারে তার ধারণা ছিল না। দ্বীপীর মুখের গড়ন অনেকটা বাঁশ পাতার মতন, কথা বললে, হাসলে সুন্দর টোল পড়ে গালে। ঈদের চাঁদের মতো ওর চেহারাটা মেদহীন, পিঠ ছাপানো চুলগুলো ঢেউ খেলানো, অনেকটা কালো দিঘির জলের মতো ধারাবাহিকভাবে সাজানো। কখনোই দ্বীপী রোগা নয় বরং সে সাজানো-গোছানো সোনালি বালির চর।

দ্বীপী ঘরে এসে একটা কাঠের টুল টেনে নিয়ে ওদের মুখোমুখি বসল। খাওয়া থামিয়ে রঘুনাথ বলল, একদিন আমাদের ঘরে এসোখন। আমার মা'র সাথে তুমার আলাপ করিয়ে দেবখন। তুমারে দেখলে মা ভেষণ খুশি হবে। মা তুমার মতন সোন্দর মেয়েছেলে কুনোদিন দেকেনি।

সুতলি দড়ি দিয়ে টাঙানো ছিল দ্বীপীর ঘরের তিনটে জানলার পর্দা। ছাপা শাড়ি কেটে বানানো পর্দাগুলোর রঙ জ্বলে গেছে রোদ-হাওয়ায়, তবু বাতাস এলে ওগুলোই ফড়ফড়িয়ে ওড়ে, ঝলকে-ঝলকে আলো ঢুকে আসে বিনা বাধায়, মন্দ লাগে না দেখতে।

শিবমন্দিরের একমাত্র পুরোহিত হিসাবে বেশ নাম ডাক আছে দেবোত্তরের। তার নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা এবং ব্যক্তিত্ব সবার নজর কাড়ে। তবে পয়সার দিক থেকে মানুষটা একেবারে নুয়ে আছেন। পরপর তিন মেয়ে তাঁর জীবনে হতাশার সৃষ্টি করেছে, সে হতাশার কথা মাঝে মাঝে চন্দ্রিকার কাছে প্রকাশ করে তিনি ধমক খান। চন্দ্রিকা ঠোঁট কামড়ে বিরক্ত হয়ে বলেন, এ যুগে ছেলে-মেয়ের ফারাক দেখতে যেও না। এখন ছেলে-মেয়ে সব সমান, দু-চোখের তারার মতো।

মেয়েগুলোকে মানুষ করার চেষ্টা করেছিলেন দেবোত্তর, কিন্তু শুধু দ্বীপী ছাড়া আর দুটি মেয়ে তার স্বপ্ন পূরণ হতে দিল না। বড় মেয়ে লহরী স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে টেনে-টুনে। সে আর প্রি-ইউনিভার্সিটি পড়তে চাইল না নিজের ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে। একটা পাশ করেই সে স্থিতু হয়ে বসে আছে ঘরে, গ্রাম ছেড়ে বাইরে বেরতে তার তীব্র অনীহা, মাঝেমধ্যে সে দেবোত্তর সঙ্গে শিবমন্দিরে গিয়ে বিড়বিড় করে আপনমনে। দেখতে শুনতে সে মন্দ নয়, চোখ নাক মুখ আকর্ষণীয়, তাই দু-চারটে সম্বন্ধ আসছে এদিক-সেদিক থেকে। পাত্রপক্ষের মেয়ে পছন্দ হলেও বিয়ে হচ্ছে না দেনা-পাওনার জন্য।

ঊর্মি একটু কম কথা বলে, সে পড়াশোনায় ভালো ছিল কিন্তু অসুখ ওর পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটায়। প্রায় দিন সে শারীরিক কারণে স্কুলে যেতে পারত না, স্কুলে গেলেও বাড়িতে এসে তার পড়ার শক্তি থাকত না। ফলে সে বাধ্য হয় লেখাপড়ায় ইতি টানতে। দ্বীপী তিন বোনের মধ্যে সব চাইতে পড়াশোনায় ভালো, ওর স্মৃতিশক্তি প্রখর—একবার পড়লে সব মনে থেকে যায়। সে এবার সায়েন্স নিয়ে ক্লাস টেনে উঠেছে, সূর্যাক্ষ তার সহপাঠী। ওরা এক সঙ্গে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর বায়োলজি পড়ে। দু'জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক সঙ্গে অঙ্ক করে। পড়াশোনায় ওদের অমনোযোগ লক্ষ্য করেনি কেউ। দ্বীপীর খুব ইচ্ছে সে বড়ো হয়ে রিসার্চ করবে কেমিস্ট্রি নিয়ে, তা যদি না হয় তাহলে সে ব্যাঙ্কে চাকরি করতে চায়, কেন না তার মামা প্রায় বলেন, ব্যাঙ্কের মাইনে অন্যান্য সরকারি সংস্থার চাইতে ঢের বেশি। বাবার দুঃখ দূর করতে হলে দ্বীপীর অনেক টাকা দরকার। ইদানীং তার পড়ার চাপ বেড়েছে প্রচণ্ড, সে সময় পায় না তাই ভোরবেলায় উঠে মনোযোগ দিয়ে পড়তে বসে। দেবোত্তর ছোট মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

দ্বীপী লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হলে দুঃখ ঘুচবে দেবোত্তরের। চন্দ্রিকাও দ্বীপীর দিকে তাকিয়ে আছেন। ছোট মেয়েকে নিয়ে তাঁদের কোনো চিন্তা নেই। আর যাই হোক দ্বীপী তাঁদের মনে দুঃখ দেবে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সে সহজভাবে মানিয়ে নেবে। সেই ক্ষমতা তার আছে।

দ্বীপীদের বাড়ি থেকে বেরতে ন'টা বেজে গেল। গাঙধারের আখ খেত থেকে হাঁক ভেসে এল পেয়াদার। এখন খটখট করছে আকাশ, কোথাও এক চিলতে মেঘের দেখা নেই। বাতাস জড়িয়ে ধুলো উড়ছে সর্বত্র। আর কতদিন প্রকৃতিতে ধুলো খেলা চলবে বুঝতে পারল না সূর্যাক্ষ। রোদ বাড়লে স্কুলে যেতে কষ্ট হয়। ছাতা নেওয়া তার পোষায় না। এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল—ক্যারিয়ারে দ্বীপী, এই তিনের সমন্বয়ে খেলাটা বড়ো কঠিন হয়ে যায়, একটু অমনোযোগ হলে দুর্ঘটনা ঘটতে বেশি সময় লাগবে না।

দ্বীপী তার সঙ্গে থাকলে বুকে বল পায় সূর্যাক্ষ। তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি হয়ে গেলে তারা মোকামপাড়ার রাস্তাটা ধরে ফিরতে ভালোবাসে। নির্জন রাস্তা দ্বীপীর খুব পছন্দ। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ও কুটকুট করে কথা বলে। পণ্ডিত বিলের জলে গড়িয়ে যায় তার মাধুর্য-ভরা কণ্ঠস্বর। সূর্যাক্ষ তাকে তাতিয়ে দেবার জন্য বলে, জানিস তো, বিলের বালিহাঁসগুলো তোর চাইতে দেখতে সুন্দর। আমার ওদের ভালোবাসতে ভীষণ ইচ্ছে করে। দ্বীপী রাগে না, শুধু মসৃণ কাঁধটা ঝাঁকিয়ে ঠোঁট ওলটায়, জানিস তো তোর চাইতে আমবাগানের হনুমানগুলো আরও সুন্দর। ওদের পোড়ামুখ ঠিক তোর মতন। তবে ওদের ঝকঝকে দাঁতগুলো তোর মতন হলুদ আর ছাতা ধরা নয়। ওরা তোর চেয়েও ভদ্র।

—তুই এসব আমার নামে বলতে পারলি?

—কেন বলব না, তুই থুতু ছিটালে আমি কি তোকে ফুল ছিটাবো? দ্বীপী গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল, আমি গান্ধীনীতিতে জীবন কাটাতে পছন্দ করি না। আমার আদর্শ সুভাষচন্দ্র। কেউ যদি আমাকে চড় মারে, আমি তাকে অবশ্যই ঘুঁষি মারব।

—কী মেয়েরে বাব্বা! সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল সূর্যাক্ষ।

দ্বীপী তোয়াক্কাহীনভাবে বলল, মেয়ে বলে ভাবিস না চিরটাকাল তোদের কথা শুনব। তুই ঠিকই বলেছিস—আমি হলাম বালিহাঁস! কেন জানিস? বালিহাঁস ভীষণ চালাক। অনেক সময় জাল ফেলেও ওদের ধরা যায় না।

বিলের জল সোজা কোমর দুলিয়ে নাচের মুদ্রায় চলে গিয়েছে জগৎখালি বাঁধ বরাবর। একটা সুইচ-গেট আছে জল এদিক-ওদিক যাবার জন্য। বর্ষায় বিল ভরে গেলে বাঁধের পাহারাদার চাবি ঘুরিয়ে গেট খুলে দেয়। জল তখন ছুটতে থাকে কমলাবেড়িয়ার দিকে। এখন রোদ গায়ে মেখে জলো শ্যাওলা বুকে নিয়ে জল চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আকাশমুখো। নাকছাবির চেয়েও সুন্দর ঘেসো ফুল জড়িয়ে ধরেছে জলের কোমর। কনে সাজানোর মতো যেন সেজে উঠেছে পুরো পণ্ডিত বিল। একবার দেখলে তার দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না।

বেশির ভাগ দিন এ পথ দিয়ে গেলে সাইকেলে বসতে চায় না দ্বীপী। সূর্যাক্ষ কিছু বললে ভ্রূ তুলে তাকায়, এত জল এ তল্লাটে এ সময় আর কোথাও নেই। জলের পাশে হাঁটতে আমার ভালো লাগে, যদিও মা বলে আমার নাকি জলে ফাঁড়া।

সূর্যাক্ষ সকৌতুক হাসে, তুই এসব বিশ্বেস করিস? অমলকান্তি স্যার বলছিলেন গ্রামে বিজ্ঞান সচেতনতার উপর ঘরোয়া একটা অনুষ্ঠান করবেন। আমি বললাম হলদিপোঁতায় করলে কেমন হয়? স্যার ভেবে দেখছেন।

—অমলকান্তি স্যার মনে হয় খুব রাগী। দ্বীপী মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করল, স্যার বলছিলেন আমাদের ভারতবর্ষের অনেক মানুষই নাকি এখনও পেট পুরে খেতে পায় না।

—তোর কোনো সন্দেহ আছে? সূর্যাক্ষ দ্বীপীর চোখের দিকে সরাসরি তাকাল। বাঁধের কাছে এসে সূর্যাক্ষ মন খারাপ করে বলল, এবার আমাকে ঘরে ফিরতে হবে রঘু, তুই এবার একা

চলে যা। যদি সময় পাই বিকেলে তোর সঙ্গে দেখা করব। আর হ্যাঁ, শোন কোনো দরকার হলে তুই আমাকে অবশ্যই বলবি। সবসময় ভাববি আমি তোর পাশে আছি।

রঘুনাথ ঘাড় নাড়তেই সূর্যাক্ষ ফিরে যাচ্ছিল সাইকেল নিয়ে। সেই সময় হঠাৎ মাঠ থেকে ধুতি পরা অবস্থায় উঠে এলেন নীলাক্ষ। রঘুনাথের দিকে তর্জনী উঠিয়ে বললেন, ওই বুনোদের ছেলেটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছো? জানো কি ওর স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। কাল আমার মুখে মুখে তর্ক করছিল পুকুরপাড়ে। তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন, পেটে কালির আঁচড় নেই, কত আর ভদ্র হবে। সূর্যাক্ষ কি জবাব দেবে ভাবছিল। নীলাক্ষ তড়িঘড়ি করে বললেন, ওর সাথে মিশবে না। ওদের সঙ্গে যদি সম্পর্ক রাখতে হয় তাহলে দূর থেকে রাখবে। উপর উপর হ্যাঁ-হুঁ বলে ছেড়ে দেবে। তোমার বাবার মতো আবার গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ো না।

সূর্যাক্ষ বিরক্তি হজম করে তাকাল। কপোতাক্ষর অপমান তার গায়ে ফোসকা ফেলে। অমলকান্তি স্যার তার বাবাকে দেবতার চোখে দেখেন। অথচ তার নিজের দাদা ছোটভাইকে হেয় করছে। এদের যে কী বিচার সঠিক বুঝতে পারে না সূর্যাক্ষ। সে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ততা তৈরি করল, জেঠু, আমি এখন যাই। আমাকে আবার স্কুল যেতে হবে। সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল সূর্যাক্ষ, আর তখনই নীলাক্ষর গলা ফাঁকা জায়গায় গমগমিয়ে উঠল, শোন তোমার এবার কোন ক্লাস হলো?

ঘাড় ঘুরিয়ে পাংশু মুখে সূর্যাক্ষ জবাব দিল, ক্লাস টেন।

—বেশ, বেশ। মাথা দোলালেন নীলাক্ষ, কপালে অবাঞ্ছিত ভাঁজ, শোন, যে কথা বলার জন্য তোমাকে আটকে দিলাম। ওই যে শিব মন্দিরের পুরোহিতটা, কী যেন নাম, ওঃ মনে পড়েছে দেবোত্তর ঠাকুর, ওর মেয়েটার সাথে বেশি মিশবে না। আমি শুনেছি তোমার নাকি ওদের বাড়িতে যাতায়াত বেড়েছে। এটা ভালো কথা নয়। গ্রামে থাকি। সব কথা আমার কানে আসে। তুমি আমাদের বংশের ছেলে। আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়।

খুব অসহায়ভাবে সূর্যাক্ষ বলল, দ্বীপী আমার সঙ্গে পড়ে। ও তো সায়েন্স নিয়েছে। আমার চাইতে পড়াশোনায় ভালো। আমরা দু-জনে একসঙ্গে অঙ্ক করি।

—কেন তোমার বাবা কি তোমাকে মাস্টার দিতে পারেনি? ঝাঁঝালো গলায় অবজ্ঞা মিশল নীলাক্ষর।

সূর্যাক্ষ পরিস্থিতিকে সামাল দেবার জন্য বলল, না তা নয়। বাবা টিউশনি দিতে চেয়েছিল আমারই সময় হয় না। এতদূর থেকে কালীগঞ্জে গিয়ে টিউশানি পড়া পোষায় না। যাওয়া-আসায় অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়।

—তা ঠিক তবে পড়াশোনার প্রতি আরও যত্নশীল হও। তোমার দাদা রুদ্র সেন্ট পল'এ ভর্তি হয়েছে একথা কি তুমি জানো? সন্তান গর্বে নীলাক্ষর চোখ-মুখ ঝকঝকিয়ে উঠল, রুদ্রের মতো ছেলে এ গ্রামে আর একটিও নেই। তুমি চেষ্টা করো দাদাকে ছাপিয়ে যাওয়ার।

—আমার স্মৃতিশক্তি কম।

—বেশি ঘোরাঘুরি না করলে স্মৃতিশক্তি বাড়ে। মনটাকে নিজের ভেতর আত্মস্থ করো। দেখবে তাহলে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। নীলাক্ষ জ্ঞান দেবার ভঙ্গিতে বললেন কথাগুলো। অসহিষ্ণু সূর্যাক্ষ অস্থির হয়ে বলল, জেঠু, এবার আমি যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

যাও, তবে ওই পুরোহিতের মেয়েটাকে সাইকেলে বসিয়ে নিয়ে যাবে না। মনে রাখবে তুমি ওর সহপাঠী, ওর চাকর নও।

মুখটায় হঠাৎ কেউ বুঝি ছিটিয়ে দিল দোয়াত ভর্তি কালি, সূর্যাক্ষ কথা বলার শক্তিটুকুও

হারিয়ে ফেলল নিজের কালিমায় ভরা মুখের কথা চিন্তা করে।

নীলাক্ষর আরও কিছু বলার ছিল। তিনি এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন সূর্যাক্ষের কাছে। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, তিতির বেলডাঙা কলেজে পড়তে যায়। ওর কলেজ যেতে খুব আগ্রহ। আমি শুনেছি কালীগঞ্জের একটা ছেলে ওর পেছনে লেগেছে। ও তোমার দিদি হয়। একটু খেয়াল রেখো। কোনো খবর থাকলে আমার কাছে গোপন করবে না। থানার ও.সি. আমার বন্ধু। আমি ভাবছি বেণীমাধবকে দিয়ে ছেলেটাকে একটু টাইট দিতে হবে। ঘি আর আগুনের কারবার। বলা যায় না তো কখন বিপদ ঘটে যায়!

নীলাক্ষ চলে যাওয়ার পরও হাঁটতে পারছিল না সূর্যাক্ষ। এলোমেলো কথাগুলো বিষাক্ত পোকার মতো দংশন করছে মাথার ভেতর। এত বয়স হল তবু মানুষটার কোনো রুচিবোধ জন্মাল না। একটা সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব তার ভেতরে ঘোলা জলের মতো বিরাজমান। কপোতাক্ষর সঙ্গে এই প্রবীণ মানুষটির কত অমিল। চিন্তাভাবনায়, মন মানসিকতায় দু'জন দুই মেরুর বাসিন্দা। কপাল টিপে দূরের বাঁধের দিকে তাকাল সূর্যাক্ষ। রঘুনাথকে আর এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। রোদের মধ্যে একলা হেঁটে যাচ্ছে রঘুনাথ। সূর্যাক্ষ ভাবল—কপোতাক্ষ কি ওদের মাথায় ছাতা হতে পারবেন?

অশ্বত্থতলায় ভিড় লেগে থাকে সবসময়। পাড়ায় বউ-ঝি'রা এসময় জল আনতে যায় বুড়িগাঙে। কেউ কেউ প্রাতঃকৃত্য সেরে গা ধুয়ে ঘরে ফেরে। এই বুড়িগাঙ আছে বলে অনেকের ভরসা। স্রোত থেমে গেছে, তবু তো গাঙ। বর্ষায় এর দাপট দেখলে ভয় হয়, পিলে চম্‌কে যাবার উপক্রম। দুর্গামণি একবার ভরা বর্ষায় ভেসে যাচ্ছিল স্রোতের তোড়ে। দুলাল ডিঙা নিয়ে গিয়ে তাকে বাঁচায়। তা যদি না হত তাহলে একেবারে মানিকডিহির গাঙে গিয়ে পড়ত দুর্গামণি। ওখানে জলের স্রোত মুখে গাঁজরা নিয়ে ছোটে। বড়ো বড়ো নৌকা পারাপার হয় সব সময়। কেননা নতুনগ্রাম যেতে হলে এ জল পেরতে হবে সবসময়।

রঘুনাথ পাকুড়তলায় এসে দাঁড়াল। একটা ঘোরের মধ্যে কতগুলো ঘণ্টা তার কেটে গেল। সেই আচ্ছন্নতা এখনও হেমন্তের শিশিরের মতো তাকে লেপটে আছে। ঘটনাগুলো ভিড় করে একের পর এক মনে আসছে, আর অমনি তার মনের ভেতরে এক বিরাট পরিবর্তন, বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। এসব অনুভব সে তার মাকেও বলে বোঝাতে পারবে না। দুর্গামণির এত বোঝার ক্ষমতা কোথায়? তার সরল সাদাসিধে মন তো পাকা আতার মতো, একটু চাপ দিলে ভেঙে যায়।

রঘুনাথ দুলালকে দেখতে পেয়ে আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেল, কাকা, তুমার সাথে দাদুর কি দেকা হয়েচে? দাদু তুমাকে পাগলের মতোন খুঁজছিলো।

—আমি খপর পেয়েচি ভাইপো, কিন্তুক এখুনো তার সাথে আমার দেখা হয়নি। মেয়েটাকে লিয়ে আমার এখুন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগলদশা। বিয়ের এত বছর পরে জামাই আবার সাইকিল চাইচে। কুথায় পাবো ভাইপো, তুই তো আমার অবস্থা লিজের চোক্ষে দেকচিস!

রঘুনাথ সমব্যথীর চোখে তাকাল। সহসা তার মনে পড়ে গেল কপোতাক্ষর কথা। ওই মানুষটা পারেন এই বিপদ থেকে দুলালকে উদ্ধার করতে। কিন্তু কী ভেবে রঘুনাথ কোনো কথা বলার উৎসাহবোধ করল না। সে অস্ফুটে প্রশ্ন করল, কাকা, বাবা কেমুন আচে? তার খপর সব ভালো তো?

গুয়ারামের জন্য রঘুনাথের মনটা মাঝে মাঝে উতলা হয়ে ওঠে, ঝড়ে নুইয়ে যাওয়া ধানচারার মতো অবস্থা তখন। দুর্গামণি চুনারামের সামনে গুয়ারামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে না, মনটা কেমন বাঁধো বাঁধো ঠেকে, সংকোচ হয়। একসময় তার মনে হয় মানুষটার সঙ্গে গেলে বুঝি ভালো হত। তাহলে এত চিন্তা মনটাকে খুবলে খেত না। ক'দিন থেকে গুয়ারামের স্বপ্ন দেখছে দুর্গামণি। না জানি কেমন আছে সে। দুলালের সঙ্গে দেখা হলে ভালো হত। দুলালের আসার সংবাদ সে পেয়েছে কিন্তু তার দর্শন সে এখনও পায়নি। দুলালকে খবর পাঠিয়েছে চুনারাম। সময় বের করে সে নিশ্চয়ই আসবে, কথাবার্তা হবে। গুয়ারাম চুনারামের একমাত্র লাঠি যা শেষ বয়েসে হাত ধরে তাকে অনেকটা পথ নিয়ে যাবে।

দুলাল একটা বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে দিল বাতাসে, তোর বাপের খপর ভালোই তবে সে মাঝখানে জ্বরজ্বালায় ভুগল। ওদিককার হাওয়া-বাতাস ভালো নয়রে। গায়ে সয়ে যেতে টেইম লাগবে। তাছাড়া জল বদলের সাথে সাথে মানুষের মনও বদল হয়। জলবদল মানিয়ে নিলেও মনবদল মানিয়ে নিতে সময় লাগে।

—এখুন কেমুন আচে সে? রঘুনাথের চোখে উৎকণ্ঠা গড়িয়ে পড়ল।

—বললাম তো ভালো আচে। চিন্তার কুনো কারণ নেই। দুলাল এত জোর দিয়ে কথাগুলো বলল যেন সে এই প্রশ্নে কিছুটা বিরক্ত।

—তুমি কবে যাবে গো, কাকা?

—দেকি কবে ও দেশের মাটি টানে! ফ্যাকাসে হাসি দুলালের ঠোঁটে ঝুলে রইল, মাটি না টানলে কিচু হবার নয়। মানুষের কি সাধ্যি মাটিকে এড়িয়ে চলে।

দুলাল হঠাৎ-ই যেন দার্শনিক হয়ে গেল।

রঘুনাথ বলল, কাকা, একবার সময় হলে ঘরের দিকে এসো। মা'র সাথে দেকা করে যেও। দাদুও খুব চিন্তায় আচে।

দুলাল রঘুনাথের কথাকে পাত্তা দিল না, পোড়া বিড়িটা ধুলোর ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সে বেজার মুখে বলল, আমারও মনটা ভালো নেই ভাইপো। মেয়েটার জন্যি ভারী চিন্তা হচ্চে। জামাই বাছাধনকে আমার বিশ্বেস নেই। কখন মেয়েটার কী ক্ষতি করে ফেলে! যা যুগ পড়েচে, এখুন কুনো ক্ষতি হয়ে গেলে পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই।

কাজ কামাই করে ঘর আগলে পড়ে আছে দুলাল। ইন্দুবালারও মন সায় দিচ্ছে না কাজে যাওয়ার। বিন্দু তাদের একমাত্র সন্তান। ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসলে সারা জীবন পথে বসে কাঁদতে হবে। তখন চোখের জল মুছিয়ে দিতে কেউ আসবে না। জামাই শ্রীকান্ত বিন্দুকে বড়ো জ্বালায়, খোঁটা দেয় গরীবিয়ানার। বিন্দু এসব সহ্য করতে পারে না, সে অঝোর নয়নে কাঁদে। শ্বশুরঘরে তার চোখের জল মুছিয়ে দেবার কেউ নেই। বিন্দুর এই বিবশতার সুযোগ নিতে চায় শ্রীকান্ত। সে ধাওড়াপাড়া ছেড়ে পালিয়ে যায় শহরে। ওখানে নাকি ওর বন্ধু থাকে। শ্রীকান্তর কথাবার্তা সন্দেহজনক। চালচলনও ভালো লাগছে না বিন্দুর। মানুষটা নিশ্চয়ই খারাপ মানুষের খপ্পরে পড়েছে নাহলে থানা থেকে পুলিশ কেন আসবে তার খোঁজে? পুলিশ আসার পর থেকে শ্রীকান্ত পলাতক। তার নাকি এখন প্রচুর টাকার দরকার। টাকা হলে কেস সব মিটে

যাবে, সে আবার মাথা উঁচু করে গ্রামে ফিরতে পারবে, পুলিশও তার পিছু ছেড়ে দেবে।

এত টাকা কোথা থেকে আসবে দুলাল ভেবে পেল না। তার ভাগ্যটাই ছোট থেকে পোকায় কাটা। ভূষণী তার জন্মদাত্রী মা কিন্তু এই মাকে সে কি কোনোদিন ক্ষমা করতে পেরেছে? নাকি ক্ষমা করা যায়?

ধাওড়াপাড়ার সবাই জানে দুলালের বাপ দয়াল কেমন মাটির মানুষ ছিল। তার ভালোমানুষীর পুরস্কার সে পেয়ে গিয়েছে। ভূষণীকে মন দেওয়ার পর থেকে সে পাগল হয়ে গিয়েছিল ড্যাং-ডেঙে বাস্তুতলার মেয়েটার জন্য। ভাদু পরবে ভূষণী নজর কেড়েছিল তার, ডুরে শাড়ি পরে ঝকঝকে আলোয় ভূষণী যেন বিয়ে বাড়ির ঝাড়বাতি। ভাদু পরবের মেলায় ওদের আলাপ হল, সেই আলাপ গড়িয়ে গেল পুতুলনাচের আসর অবধি। লায়লা-মজুনর পালা দেখে মজনুর জন্য চোখের জল ফেলেছিল ভূষণী, তার কাঁচা মনের পরিচয় দিয়ে বলেছিল, আমারে লিয়ে পেলিয়ে চলো, তুমারে ছাড়া আমি আর থাকতে পারচি নে। এর চেয়ে বেশি ব্যথা দিলে মরে যাবো গো। ভাদুপরবে আলাপ, তার দু-মাস পরে ভূষণীর হাত ধরে গাঁয়ে ঢুকেছিল দয়াল। মেয়েমানুষের রূপ দেখে সেদিন হাঁ হয়ে গিয়েছিল গাঁয়ের মানুষ, কেউ কোনো বিরুদ্ধ রা কাড়ার সাহস দেখাল না। সবাই আড়ালে আবডালে বলল, দয়ালটার বউভাগ্য চকচকে তবে দেখো কতদিন এই সোনা গরিবের ঘরে চকচকায়। মেয়েমানুষ বুড়িগাঙের জলের মতোন, আজ এখানে কাল সিখানে। এরা কোকিলা পাখির মতোন স্থিতু হতে জানে না, শুধু এ-ডালে সে-ডালে উড়ে বেড়ায়। বিয়ের হলুদ ফিকে হতেই দয়াল সকাল হলেই ছুটে যেত জনমজুর খাটার জন্য। না খাটলে পয়সা দেবে কে? মুখ দেখে তো কামাই হয় না। এভাবেই অভাবের সংসার চলছিল গড়িয়ে গড়িয়ে। তিন বছর পেরিয়ে গেল বিয়ের তবু ভূষণীর গতর ভারী হল না। পাড়ার বউরা তাকে পাকুড়তলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বোঝাল, কিরে ভূষণী, এক বেছানায় নিদ যাস তো? তোর বরটা কেমুন রে, এখনও কুনো ফল দিল না। ফুল হবে না, ফল হবে না শুধু শুখাগাছ নিয়ে কী লাভ?

সেই থেকে চিন্তাটা মাথায় ফুট কাটছিল ভূষণীর। কত রাত যে ভোর হল তবু সেই রাতের ফসল শরীরে দৌড়ঝাঁপ শুরু করল না। তাহলে কি তার শরীরটা খরার মাটি, দানা ছড়ালেও ফসল ফলে না? কপালে চিন্তার ভাঁজ, ভূষণী রাতে ঘুমাতে পারে না। নাগরা বাজিয়ে দয়াল ফেরে অনেক রাতে, ফিরেই সে ভূষণীর উষ্ণতা চায়। ভূষণী মুখ ঝামটায়, যাও গান-বাজনা নিয়ে মেতে থাকো গে, আমাকে দেখার তুমার সময় কুথায়। ভাবছি—কাল থিকে আমি তুমার সাথে কাজে যাব। ঘরে আমার মন ধরে না। সময় শিল-নোড়ার মতো বুকের উপর চেপে বসে।

সাহেব মাঠে তখন কাজ চলছে, আখ ঝোরার কাজ। আখ কেটে আলসে সাফ সুতরো করে আঁটি বাঁধা। মিল কোম্পানীর ট্র্যাক্টর এসে নিয়ে যাবে। মিলবাবু নীলকণ্ঠ কাজ দেখাশোনা করে মন দিয়ে। মুনিষ যাতে কাজে ফাঁকি না দেয় সেইজন্য তিনি আলের উপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। কালীগঞ্জ বাজারে তাঁর কোঠাদালান, ঘরে রূপসী বউ সুবর্ণা। বউ রূপসী বলে সংসারে খিটিমিটি লেগে আছে। নীলকণ্ঠবাবুকে সুবর্ণা পাত্তা দিতে চান না, জুতোর শুকতলা বানিয়ে রাখতে চান। নীলকণ্ঠবাবু মেনে নিতে পারেন না এই অত্যাচার। সুবর্ণাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলেন, তোমার মেজাজটা খিটখিটে হয়ে গিয়েছে। যাও না ক'দিন বাবার কাছ থেকে ঘুরে আসো।

সুবর্ণা ভ্রূ-কুঁচকে তাকাল, আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো? যদি যাই তাহলে আর আসব না। পায়ে ধরে ডাকলেও আসব না। আমার বাবা-দাদার সাধ্য আছে আমাকে বসে খাওয়ানোর।

সুবর্ণা মনের জ্বালা মেটাতে চলে গেলেন। বড়ো একা হয়ে গেলেন নীলকণ্ঠ। ঘরে মদ খেতেন

গলা পর্যন্ত। সুবর্ণার অনুপস্থিতি রুক্ষ করে তুলত তাঁর মেজাজ। যত দিন গেল শরীরের ক্ষিদেটা পদ্মানদীর জলের মতো ফুঁসতে লাগল। সুবর্ণাকে চিঠি লিখলেন তিনি, ফিরে এসো। যা হবার হয়েছে। আমি আর পারছি না।

সুবর্ণা এলেন না, জেদ ধবে থাকলেন শহরের মাটিতে।

মিল কোম্পানীর কাজে কামাই করা পছন্দ করেন না নীলকণ্ঠবাবু। রোজ সাইকেল নিয়ে তিনি মাঠে যাবেনই যাবেন। সেদিন কাজ হচ্ছিল পশ্চিমধারের আখক্ষেতে। দয়াল আসেনি, কোন গাঁয়ে তার কীর্তন আছে, সেখানে তাকে ঝাল করতাল বাজাতে হবে। খোলওয়ালা না এলে গলায় ঝুলিয়ে নিতে হবে পোড়ামাটির খোল। সব বাদ্যযন্ত্র দয়ালের হাতে পড়লে পোষা বেড়াল। দয়ালও বাজায় খুব নিষ্ঠা সহকারে। শরীর নিংড়ে সুর বের করে।

ভূষণী আখের ভুঁইয়ে কাজ করছিল। আলের উপর দাঁড়িয়ে ভূষণীর যৌবন দেখছিল নীলকণ্ঠ। একটু আগে সে নেশা করেছে, ফলে ঘোর ঘোর দৃষ্টি। ভূষণীর শরীরের বাঁধন গঙ্গামাটির মতন ঢিলেঢালা নয়, বরং ওর শরীরের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে পুরুষের নোঙর করা মন। সুবর্ণার এত অহঙ্কার কিসের? ওর গায়ের চামড়া ফর্সা বলেই কি? যতই ফর্সা হোক সুবর্ণা, ভূষণীর কাছে সেই রঙ চুনকাম করা দেওয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। ভূষণীর মাজা রঙে লালিত্য মাগুরমাছের ত্বককেও হারিয়ে দিচ্ছে। ও হাসলে বাবলাগাছে ঝুমা ঝুমা ফুল ফুটে ওঠে অজস্র। আর সেই হলুদফুল বাড়িয়ে দিচ্ছে রোদের নম্রতা। নীলকণ্ঠ ভূষণীর দিকে কাঁপা চোখে তাকিয়ে ধরা পড়ে গেল। ভূষণী হাসতে হাসতে বলল, বাবু, তুমার লিশা হয়েচে গো। যাও, ঝাটপট ঘর চলি যাও। ঘর গিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা তেল জেবড়ে আরামে নিদ যাও। আর রোদে রোদে ঘুরোনি।

—ঘর গেলে কি নিদ আসে রে? মন তো মাঠে পড়ে থাকবে। নীলকণ্ঠর কথা জড়িয়ে গেল, সে টলে পড়ল ভূষণীর উপর, আমাকে ধর। ঠেকা দে।

—ঘর যাও বাবু।

—কার জন্য ঘর যাবো বল? সেখানে কে আছে আমার?

—কেনে তুমার বউ!

—তার মুখে লাথি মারি। সে আমার মুখে লাথি মেরে চলে গিয়েছে। চুল চেপে ধরে ডুকরে উঠল নীলকণ্ঠ।

ভূষণী মাতাল মানুষটাকে সামলাতে গিয়ে নিজেই বেসামাল হয়ে পড়ল। নীলকণ্ঠ তাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল ঘাসের বিছানায়। ভূষণীর বুকের উপর চড়ে বসেছে সে, আমাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিস নে ভূষণী। তুই ফিরিয়ে দিলে আমি মরব। কেউ আমাকে ভালোবাসা দেয়নি, অন্তত তুই আমাকে একটু হলেও ভালোবাসার স্বাদ দে। আমি তোকে ঠকাব না রে, তুই চাইলে আমি সব ফেলে তোকে নিয়ে পালিয়ে যাব।

আখের খেতে আলো আঁধারী আলো, কিছু দূরে দিঘিতে ঢেউ উঠেছে জলের, ছোট ছোট আবেগ ভরা ঢেউগুলো সিঁদিয়ে যাচ্ছে জলের শরীরে আলোড়ন তুলে। ভূষণী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, সে ঢেউ হল, জল হল, তারপর ভ্রমরবসা শাপলা ফুলের মতো হেসে উঠল খিলখিলিয়ে, কিছু হয়ে গেলে তার দায় তুমি নেবে তো বাবু? ধোঁকা দিবেনি তো?

—বললাম তো চল পালিয়ে যাই এদেশ ছেড়ে। নীলকণ্ঠ বাধাহীনভাবে ঠোঁট ঘষে ভূষণীর লালচে ঠোঁটে।

ভূষণী দু-হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে পুরুষশরীর। তার আধফোটা চোখ, মলাটহীন দেহাতি

শরীর তিরতির করে কাঁপে, যাব নি গো বাবু যাবনি। এ মাটি ছেড়ে আমি কুথাও যাবনি। ইখানেই বাঁচব, ইখানেই মরব। এত সুখ এই দেশছাড়া আর কুথায় পাবো।

দয়ালের পুরুষক্ষমতা ছিল না যদিও সে সুপুরুষ তবু সে ফসল ফলানোর চাষি নয়। মাত্র তিন মাসেই ভূষণী টের পেয়ে গেল সে মা হতে চলেছে। নীলকণ্ঠ দয়ালকে আগোলদারের কাজ পাইয়ে দিয়েছে সাহেবমাঠে। রাতে সে ঘরে থাকে না। পাঁচ হাত লাঠি বাগিয়ে চলে যায় খেত আগলাতে। তার গলার স্বরে বাতাস কাঁপে, ভুঁই কাঁপে। মাঠ জেগে ওঠে সেই অসুর শব্দে। ঘরে বসে ভূষণী সব শুনতে পায়, নীলকণ্ঠর অপেক্ষায় তার দু-চোখের পাতা এক হয় না, শরীরের নেশাটা গুড়মদের মতো চাগান দেয়, নীলকণ্ঠ এসে তার নেশাকে চূর্ণ করে মোকামপাড়ার বিলপথে ফিরে যায়।

একদিন দয়ালের চোখে ধরা পড়ে গেল ওরা। সেদিন নেশার ঘোরে মারাত্মক বাড়াবাড়ি করে ফেলল দয়াল। পুরো পাড়া জাগিয়ে দয়াল হুঁকরে উঠল, পালা আমার ঘর থিকে পালা। নাহলে চুলের মুঠি ধরে তুরে আমি ঘর থিকে ছুঁড়ে বুড়িগাঙের জলে ভেসিয়ে দেব। কাক-শকুনে খাক তুর যৌবন। তুর এত রূপের গরব। মরবি। মরবি। মরবি।

নীলকণ্ঠ চুপচাপ চলে গেলেও তার ভেতরে অপমানের তুষআগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছিল। সেই আগুন সময়ের প্রশ্রয়ে বেড়ে দাবানলের সৃষ্টি করল। এক মাসের মধ্যে দয়ালের লাশ পড়ে থাকল খেতের আলে। সাত মাসের পেট নিয়ে ভূষণী কাঁদল অঝোর ধারায়। সে চায়নি দয়াল ঝরে যাক তেঁতুলফুলের মতো।

এসব খবর সুবর্ণার কানে পৌঁছে গিয়েছিল লোক মারফত। তাছাড়া এই মুখরোচক সংবাদ নিয়ে চোত-গাজনে বোলান বাঁধল বারোয়ারি পাড়ার দল। তাতে নীলকণ্ঠ আর ভূষণীর প্রেমকাহিনি পেয়েছিল প্রাধান্য। দয়ালের অস্বাভাবিক মৃত্যুটাকে গ্রামের মানুষ ভালো চোখে দেখেনি। ঈর্ষায় কালো হয়ে গিয়েছিল সুবর্ণার ফর্সা মুখ। প্রায় মাসের উপর তিনি ঘরের বাইরে বেরতে পারেননি লজ্জায়। নীলকণ্ঠ তাকে এভাবে হারিয়ে দেবে, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। ভূষণী কি তাহলে তার চাইতেও সুন্দরী? হতে পারে। তাকে একবার চোখে দেখা দরকার। শত্রুকে অত সহজে ছেড়ে দেওয়া নয়। লোকে দুধ-কলা দিয়ে বিষধর সাপ পোষে। আবার সেই সাপের ছোবলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। হিসাব চুকিয়ে না দিলেই সুদে-আসলে বাড়বে। শহরের জলবায়ু সুবর্ণাকে এত বড়ো করেছে। তিনি হেরে যাবেন ওই অশিক্ষিত ভূষণীর কাছে? হতে পারে না, কখনো হতে পারে না। বদলা তিনি নেবেনই, যে করেই হোক। নীলকণ্ঠকে তিনি ছেড়ে দেবেন না। কত ধানে কত চাল হয় এই হিসাব তিনি বুঝিয়ে ছাড়বেন।

সুবর্ণার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন তিনি তিন দিনের ছুটি নিয়ে। মাঠের কাজে দায়িত্ব অনেক, ছুটিছাটা পাওয়া যায় না। অথচ তার ছুটি হয়ে গেল। মাসের পর মাস পেরিয়ে গেল তবু নীলকণ্ঠর দেখা নেই। ভূষণীর প্রতিক্ষারত চোখ পথ দেখতে দেখতে আমড়ার আঁটির চেয়েও কঠিন হয়ে গেল। তবু নীলকণ্ঠ শহর থেকে ফিরলেন না। গ্রামের মানুষ বলতে লাগল মানুষটাকে ওর শালারা গুন্ডা লাগিয়ে মেরে ফেলেছে। তারপর খড়ে নদীর চরে পুঁতে ফেলেছে।

কথাটার সত্যতা ভূষণী এখনও পায়নি। নীলকণ্ঠ মারা গিয়েছে কিনা সে জানে না। নীলকণ্ঠ বেঁচে আছেন এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। তাঁর বেঁচে থাকার প্রমাণ দুলালের মধ্যে জলছবির মতো ফুটে উঠছে। দুলাল তাই ধাওড়াপাড়ার কারোর মতো দেখতে নয়। তার খাটো চেহারায় আভিজাত্য হ্যাজাকের আলোর মতো তাপ ছড়ায়। ভূষণীর দুচোখ জড়িয়ে যায় কান্নায়। ওই মানুষটা তাকে সত্যি সত্যি সুখ দিয়েছিল, কোনোদিনও সে অস্বীকার করেনি এই সম্পর্ককে। সবসময় ভূষণীকে

বুকে জড়িয়ে বলেছে, তুই আর কারোর নোস। তুই আমার। শুধু আমার।

নীলকণ্ঠ নিরুদ্দেশ হওয়ার পরে সুবর্ণা আর কালীগঞ্জে থাকলেন না। কিসের মোহে এখানে পড়ে থাকবেন তিনি? পুরুষের টান সরে গেলে নারী তো ভাঁটার নদী। এই সত্য ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন সুবর্ণা। যত দিন গেল; তত তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। একদিন জমিজমা পুকুর এমনকী দোতলা বাড়িটা বিক্রি করে কৃষ্ণনগরে চলে গেলেন।

ভূষণীর দিন চলছিল কষ্টে। মাঠের কাজে গতর খাটাতে না গেলে তার দিন চলে না। দুলালকে জমির আলে শুইয়ে দিয়ে সে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। ছেলেটা কাঁদে। সেই কান্নার মধ্যে সে শুনতে পায় নীলকণ্ঠের খিলখিলানো দরাজ হাসি। তখন পরিশ্রমকে আর পরিশ্রম বলে মনে হয় না। মনে হয় সব শ্রমই পুজোর ফুল।

দুলাল বড়ো হয়ে হরিনাথপুরের ধাওড়াপাড়ায় বিয়ে করেছে। ইন্দুর স্বভাব, সাংসারিক টান মন্দ নয়, বরের উপর তার ভালোবাসা অটুট আছে। নিজে না খেয়েও সে দুলালকে খাওয়ায়, সব কাজে সে আগে থাকে, তার বিশ্বাস, প্রথম ঝড়টা যেন আমার গায়ে লাগুক। আমি থাকতে তুমার যেন কুনো ক্ষতি না হয়। মা শীতলাবুড়ির কাছে সে সবসময় এটাই কামনা করে।

দুলাল যখন বছর দশেকের তখন গাঁয়ে-গঞ্জে জোর গুজব, লাখুরিয়া কালীগঞ্জের মানুষ ফিসফিসিয়ে বলছে, এবার খেল জমবে। বড়ো ঘরের পাগলী বউটা ফিরে এসেছে। সে তো খালি হাতে যাবে না। শুনছি সে নাকি বুনোপাড়ার দুলালকে সাথে করে নিয়ে যাবে। দুলাল তার বরের শেষ চিহ্ন। ভূষণী তাকে পেটে ধরলেও তার দাবীর চাইতে সুবর্ণার দাবী কম নয়। কেসটা যদি কেসনগরের কোর্টে ওঠে তাহলে খেল জমবে।

এক টানটান উত্তেজনায় ভূষণী ঘুমোতে পারেনি পরপর সাতদিন। গাঁওবুড়া তাকে বলল, হাওয়া খারাপ দেখচি। ছেলেটারে লিয়ে যেদিকে দু-চোক যায় পেলিয়ে যা। ওই বড়োলোকের বিটির সাথে তুই কি কেস লড়ে পারবি? সে তুর কলজের ধনকে লিতে এয়েচে। এ ছেলের উপর তুর যেমুন টান, তারও তো তেমন থাকবে।

ভূষণী শেকড় ছড়ানো গাছের মতো অনড় অবিচল, কেনে পেলিয়ে যাব? আমি কি চোর না ডাকাত? পেটে ধরা ছেলেটা তো আমার, তুমরা সব সাক্ষী আচো। ওঃ, অতো মাগনা নাকি, চাইলেই মোওয়ার মতো হাতে তুলে দিয়ে দিতে হবে। এদেশে কি বেচার নেই? হলেওবা বড়ো ঘরের বিটি, ওর খেয়াল-খুশিতে কি চাঁদ-সূর্য উঠবে নাকি?

ভূষণী পালাল না, মাটি কামড়ে পড়ে রইল গাঁয়ে। পালালে বছর আটেক আগেই সে পালিয়ে যেত যখন তার যৌবন খুবলানোর জন্য চার খেতে আসা মাছের মতো হামলে পড়েছিল শরীরচাটা মাছ। সেই সময় তাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি ভূষণী, লোভের ফাঁদে ডাকপাখির মতো ধরা দেয়নি। নীলকণ্ঠর স্মৃতি আঁকড়ে সে বাঁচতে চেয়েছে বছরের পর বছর। এখন চোখ মুদলে নীলকণ্ঠর গায়ের নিঃশ্বাস তার উদোম বুকে আছড়ে পড়ে, নীলকণ্ঠ তার সরু থুঁতনি নিয়ে গিয়ে আলতোভাবে ঠুসে ধরেছে বুকের ঢালু জলাশয়ে। এই স্মৃতি, এই অনুভব রক্তে পানকৌড়ি পাখি হয়ে সাঁতার কাটে। মানুষটা রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে তার বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে। স্বপ্নে এসে কথা বলে। হাসে, শিস দেয়। খুনসুটিতে জাগিয়ে তোলে ভূষণীর ক্ষুধিত শরীর।

ঝুমুরগানের দিন সুবর্ণা রিকশা নিয়ে সোজা চলে এসেছিল হলদিপোঁতা ধাওড়ায়। তার হাতে একটা নতুন কাপড়, মিষ্টি। দুলালের জন্য জামা-প্যান্ট-খেলনা। অশ্বত্থতলায় রিকশা দাঁড় করিয়ে সুবর্ণা চলে গিয়েছিল ভূষণীর ঘরের দাওয়ায়। ভূষণীকে বলেছিল, আমি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি বোন। ভয় পেও না, আমি রাক্ষুসী বা ডাইন নই যে তোমার ছেলেটাকে কেড়ে

নিয়ে পালাব। তাই যদি আমার মনের ইচ্ছে হত তাহলে আমাকে এখানে আসতে হত না। টাকা ছড়ালে কাক-শকুনের অভাব হয় না। এখন গাঁ-ঘরে শ'টাকায় লেঠেল পাওয়া যায় কিনতে। তোমার ছেলেকে ছলে-বলে কেড়ে নিয়ে যেতে আমার বেশি সময় লাগত না। কিন্তু আমি তা করব না। সেটা আমার ধর্মও নয়। আমি শুধু এসেছি মানুষটার শেষচিহ্ন দেখতে। তোমার ওই ছেলের মধ্যে সে আজও বেঁচে আছে। সুবর্ণা কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, ভূষণীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমাকে বসতে বলবে না? ঠিক আছে আমি দাঁড়িয়েই কথা বলছি। ছেলেটাকে একটু নিয়ে এসো। ওকে আমি চোখের দেখা দেখে চলে যাব। তোমার কোনো ভয় নেই। দিনের বেলায় আমি চুরি করতে আসিনি। ওই দেখো আমার রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। আজ আমি শহরে ফিরব।

ঝুমুর গানের আসর ভেঙে ছুটে এসেছে মানুষ। সবাই মজা দেখার জন্য উদগ্রীব। এত মানুষের ভিড় ঠেলে সুবর্ণা দুলালকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে না। ভূষণী মনের জোর ফিরে পেল। দুলালকে নিয়ে এল। সুবর্ণার কোলে তুলে দিয়ে বলল, এই ছেলেই আমাকে মাঠবাবুর কথা ভুলতে দেয় না। কি করে ভুলি? মানুষটা তো রসের জাহাজ। আমাকে সেই জাহাজে চেপিয়ে কুথায় কুথায় নিয়ে গেল! আমার ঘরের মানুষটা চার বছরে আমাকে যা দেয়নি, বাবু আমাকে চারমাসে তা দিয়েচে। আগে আমি শেয়ালকাঁটা গাছের মতো খড়খড়ে ছিলাম, বাবু আমাকে জলোপাতার মতুন নরম আর সোন্দর করেচে।

—এমনিতেই তুমি খুব সুন্দরী। সুবর্ণা মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন কথাটা, তোমার বাবুর নজর ছিল মানতে হবে। সত্যি বলতে কি—তুমি আমাকে সব দিক দিয়ে হারিয়ে দিয়েছ। আমি হেরে গেছি ভূষণী। ওকে আমি দুলাল দিতে পারিনি। শুধু ঘৃণা আর অবহেলা দিয়েছি। আজ বুঝতে পারছি আমার তাচ্ছিল্য অবজ্ঞা ওকে আজ এপথে নিয়ে এসেছে। আমি যদি ওর প্রতি মনোযোগী হতাম, ওকে যদি সামান্য ভালোবাসা দিতাম তাহলে ও খাঁচা ভেঙে পালাত না। আমি যা দিতে পারিনি, তুমি ওকে তাই দিয়েছ ভূষণী। আমার পালিশ করা রূপের চাইতে তোমার আকাড়া চালের লালআউস ভাত ও অনেক তৃপ্তি সহকারে খেয়েছে। আমি হেরে গিয়েছি ভূষণী।

সুবর্ণা গোপালেব মুখে চুমু খেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। এখনই ছেলেটার মুখের আদলে ছাপ পড়ে গিয়েছে বাবার, জলছবির মতো নীলকণ্ঠ স্পষ্ট হয়ে উঠবে সময়ের সাথে সাথে। ধাওড়াপাড়ার ধুলোমাটি মেখে সে নীলকণ্ঠ হয়ে ঘুরে বেড়াবে। সুবর্ণা অনেক ভেবে নিয়ে সরাসরি প্রস্তাব দিলেন, তুমি চাইলে আমার সঙ্গে যেতে পারো। নীলকণ্ঠর সম্পত্তিতে তোমারও ভাগ আছে আমি মনে করি। তুমি চাইলে এর অর্ধেক আমি তোমার নামে লিখে দেব।

—টাকা-পয়সা, ধনদৌলত আমার দরকার নেই। ভূষণী ঘাড় দোলাল তীব্র অনীহায়। সুবর্ণা বললেন, ঠিক আছে। তোমার কথা আমার মনে থাকবে। এ পৃথিবীটা গোল, এবং যথেষ্ট ছোট। যদি বেঁচে থাকি তাহলে তোমার সঙ্গে আমার আবার ঠিক দেখা হবে। ছেলেটাকে মানুষের মতো মানুষ করো। ও তো শুধু তোমার একার ছেলে নয়, ও ছেলে আমারও। সময় পেলে আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবো। যদিও কালীগঞ্জের বসবাস আমি উঠিয়ে দিয়েছি। পচা সুতোয় কোনো সম্পর্ক বাঁধা যায় না, বাঁধতে গেলে শক্ত ডোর দরকার, নাহলে ছিঁড়ে যায় ভূষণী।

সুবর্ণা চলে গেলে ভূষণী বুক হালকা করে শ্বাস ছাড়ল কিন্তু তার মনের খচখচানিটা কমল না। মাঠবাবু কিসের জন্য তার ছায়া চেয়েছিলেন, যার ঘরে সব সম্পদ গোছানো আছে সে কেন ভিখারি হতে গেল তার মতো দেহাতির কাছে। তাহলে কি ভালোবাসা যুগে যুগে মানুষকে ভিখারি করে দেয়, সময় সেই ধারাকে বয়ে নিয়ে যায় অনন্তকাল।

পাকুড়তলা থেকে রঘুনাথ যখন ঘরে ফিরে এল তখন রোদ টং-টং করছে আকাশে। দুর্গামণি মুখ ভার করে বলল, তুর এখন আসার সময় হলো? বাপের স্বভাব নিয়ে গাঁ ঘুরলে কি দিন চলে যাবে? অত বড়ো ছেলে গতর না খাটালে চলবে কি করে?

দুর্গামণি যে বেজায় রেগে আছে এটা বুঝতে পেরে মুখে কুলুপ আঁটল রঘুনাথ। বুকের ভেতর জমে থাকা গল্পগুলো সে এখন আর হালকা করতে চাইল না। ওগুলো তার সুখের স্মৃতি, যদি হারিয়ে যায় অবহেলায় তাহলে সে ভীষণ কষ্ট পাবে। যে জগৎ তার জানা ছিল না, সেই জগৎ-এ সে পা রেখেছে। সেই অনাস্বাদিত বিশ্বকে সে এবার নিজের মতো করে ভালোবাসতে শুরু করবে। সে থমকে দাঁড়াবে না, আরও অনেকে পথ হাঁটতে হবে তাকে। এই প্রস্তুতিতে রঘুনাথ যেন উজ্জীবিত হয়ে উঠল।

ঘরের কাজ করতে করতে দুর্গামণি বলল, তোর কাকা তুকে ডেকেচে। সে ঘরে আচে। তুকে দেকা করতে বলচে। নূপুর এসেছিল। খপর দিয়ে গেল। বলল—ভেষণ দরকার। যা, একবার তার ঘর থিকে ঘুরে আয়।

লুলারামের মাটির দোতলা ঘরখানায় অনেক রহস্য দানা বেঁধে আছে দীর্ঘদিন ধরে। এ পাড়ার মানুষ গুজব ভালোবাসে, গুজব ছড়াতে পারলে কদমফুলের মতো তাদের মনটা খুশিতে উপচে ওঠে। লুলারাম বরাবরই নিজেকে রহস্যের মোড়কে ঢেকে রাখতে ভালোবাসে, এতে সে এক ধরনের তৃপ্তি পায় যা তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

কঞ্চির বেড়াটা পেরিয়ে এলেই শুরু হয় লুলারামের ঘরের সীমানা। ওর বাবা মুনিরাম গাছের ছায়ায় বসে আছে খাটিয়া পেতে। বসে থাকা ছাড়া ওই বুড়োমানুষটার বুঝি আর কোনো কাজ নেই। বয়স হলে এমনিতেই মানুষ কমজোরী হয়ে পড়ে। তার উপরে যদি শরীরে কোনো অসুখ স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে তাহলে তো আর ভোগান্তির শেষ নেই। কুষ্ঠরোগটা যদিও কোনোও রোগ নয় তবুও এর মন ফালাফালা করার প্রভাব অস্বীকার করতে পারে না মুনিরাম। রোগটা ধরা পড়ার পর এই লুলারামই তাকে মোকামপাড়ার বিলের ধারে রেখে আসতে চেয়েছিল। সে যাত্রায় হাতে-পায়ে ধরে কোনোমতে বেঁচে যায় মুনিরাম। বিপদ কাটলেও বিভিন্ন রকমের ফাঁড়া খাঁড়ার মতো তার কপালে ঝুলছে। প্রায়ই থানা থেকে পুলিশের জিপ আসে পাড়ায়। অশ্বত্থতলায় তারা জিপ দাঁড় করিয়ে ভারী বুটের মচমচ শব্দ তুলে ঢুকে আসে গাঁয়ে। লুলারামের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে খিস্তি উগরে দেয় তারা। তখন দরজা খুলতে দেরি হলে আর রক্ষে নেই। দুমাদুম লাথি পড়বে কাঠের দরজায়, সেই লাথিতে কেঁপে উঠবে পুরো পাড়া। লুলারাম চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে আসার আগেই থানার মেজবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, যাক আজও বেঁচে গেলি! যেদিন ধরতে পারব সেদিন মারের চোটে তোর অন্নপ্রাশনের ভাত বের করে ছেড়ে দেব। এই এলাকায় চুরি-ডাকাতি একদম আমি বরদাস্ত করব না।

মুনিরাম হাতজোড় করে কিছু বলতে গেলে তাকে থামিয়ে দেবেন মেজবাবু, চুপ কর হে, তোমাকে আর আদা ছাড়াতে হবে না। বেশি ওকালতি করতে এলে তুলে নিয়ে গিয়ে জেলের ভাত খাইয়ে দেব।

জেল কী জিনিস তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে মুনিরাম। তাই এখন জেলের কথা শুনলেই তার শরীরটা সিঁটিয়ে যায়। ঢিলি তার স্বামীর কী দোষ বুঝতে পারে না। নূপুর, নোলকের অবস্থাও তথৈবচ। তারা ঘুমচোখে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে। এসব তাদের আর ভালো লাগে না। গাঁয়ের মানুষগুলো দিনেরবেলায় তাদের কত কথা শোনায়। সে সব কথা গায়ে ফোসকা ফেলে মনটাকে ঘা করে দেয়। ঢিলি তাদের বোঝায়, মন খারাপ করবি নে। পাপ বাপকে ছাড়ে না। তুর বাপও পার পাবে না।

মুনিরাম গাছের ছায়ায় খাটিয়া পেতে আরাম করছিল চুপচাপ। এখন ওর শরীরটা রোগ আর বয়সে গুটিয়ে ছোট হয়ে গিয়েছে। বসে থাকলে তাকে এক দলা মাংসের মতো দেখায়। মুনিরামকে পাশ কাটিয়ে যেতে গেলে মুখ তুলে তাকায় সে, কে, কে যায় রে?

আমি গো কচিয়া দাদু! রঘুনাথ দাঁড়াল।

মুনিরামকে সে কচিয়া দাদু বলে ডাকে। এই সম্বোধন দুর্গামণি তাকে শিখিয়েছে ছোটবেলা থেকে।

—কুথায় যেচিস রে দাদুভাই? মুনিরামের প্রশ্নে রঘুনাথ বলল, কাকা আমাকে ডেকেচে!

—ওঃ। ঠিক আচে যা। সময় পেলে টুকে আসিস। গল্প করব। মুনিরামের কথায় বেদনা ছড়িয়ে পড়ল। পাড়ার সবাই এই মানুষটাকে এড়িয়ে চলতে পারলে খুশি হয়। সবাই জেনে গিয়েছে এই মানুষের দ্বারা কারোর কোনো উপকার হবে না। বুড়ো ঘোড়ার কদর কোনোকালেই ছিল না। এটা ঘোড়ারই দুর্ভাগ্য। রঘুনাথ ওখান থেকে সরে এলেও তার মনে একটা প্রশ্ন দানা বাঁধল। বয়স কি মানুষের সব কেড়ে নেয়? কেন নেয়? পাকা তেঁতুল, পুরনো চাল, এমনকী পুরনো ঘিয়ের কদর এখনো কমেনি। তাহলে মানুষের কেন এ হাল হবে? লুলারাম নিজের বাবাকে কোনো গুরুত্ব দেয় না। সে যে একজন বয়স্ক মানুষ, এ সংসারের মাথা এই বোধ তাকে এখন আর তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় না। সে ভাবে—মুনিরাম পৃথিবী ছেড়ে বিদেয় নিলে তার বুঝি রক্ষে। ঝারির সঙ্গে লটরপটর তাহলে জমবে ভালো। টিলিকে সে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়, একটা পাগলীকে এত গুরুত্ব দেবার কোনো অর্থ হয় না। শুধু পথের কাঁটা মুনিরাম সরে গেলেই লুলারাম স্বাধীন, আজাদ পাখি।

নূপুরের সাথে দেখা হল দাওয়ায়। রঘুনাথ কিছু বলার আগেই নূপুর আগ বাড়িয়ে বলল, কুথায় থাকিস রে দাদা? বাবা কত খুঁজল তোকে।

—আমি মানিকডিহি গিয়েছিলাম।

—কেন রে? বাবুদের সাথে বুঝি তুর ভাব জমচে? নূপুর না বুঝেই খোঁচা দিল রঘুনাথকে। রঘুনাথ ম্লান হেসে তাকাল, সূর্যকে চিনিস? ও আমার বন্ধু হয়েচে।

নূপুর অবাক হল না, ভালো কথা। তবে বড়ো মানুষ বড়ো ধড়িবাজ। ওরা যখুন তখুন চোখের পাতা উল্টায়।

—সূর্য অমন নয় রে! রঘুনাথ জোরের সঙ্গে বলল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নূপুর বলল, ভালো কথা। ভালো হলে দেখতে ভালো লাগে। ঠকতে না হলে আরও ভালো। লুলারামের মাটির ঘরখানা অন্ধকারের আখড়া। এই আঁধারে রহস্য শুয়ে আছে চাদরমুড়ি দিয়ে। এ গাঁয়ের সবাই জানে লুলারামের মাটির ঘরে মা লক্ষ্মীর আনাগোনা আর সেই লক্ষ্মীকে কিভাবে খুশি করতে হয়, পূজা দিতে হয় লুলারামের চাইতে এ গাঁয়ের কেউ বেশি জানে না। এককালে লুলারাম ললাটবাবুর লেঠেল ছিল। ললাটবাবুর অঙ্গুলি হেলনে সে উঠত-বসত। তার নির্দেশে লুলারাম কত নিরীহ মানুষের মাথা ফাটিয়েছে, মেরে অথর্ব করে দিয়েছে তার কোনো গোণা গুণতি নেই। টাকার বিনিময়ে সে পারে না এমন কাজ তার দৃষ্টির মধ্যে নেই। ফলে এখন ও গাঁয়ের মানুষ লুলারামের সামনে বেশি তেড়িবেড়ি করে না। সমঝে চলে। কার মনে কী আছে তা জানতে লুলারাম এখন আগ্রহী নয়। তবে নিজের নামটার উপর তার বড়ো ঘেন্না। প্রায় মুনিরামকে বলে, আর নাম পেলে না খুঁজে! আমি কি লুলা নাকি যার জন্যি আমার নাম লুলা রাখলে?

মুনিরাম কোনো উত্তর দিতে পারে না, ভীতু চোখে তাকায়। যা মেজাজ, বিশ্বাস নেই এই পাষণ্ড ছেলে কখন কি করে ফেলে।

কাঁথ দেওয়ালের পাশ দিয়ে হাত পাঁচেকের চওড়া দাওয়া। সেই দাওয়া মাথায় খড়ের ছাউনি নিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়েছে আরও বিশ-বাইশ হাত। দাওয়া যেখানে শেষ হচ্ছে—সেখান থেকে

শুরু হচ্ছে আঁধার ঘরে যাওয়ার সরু পথ। বেশি দূর যেতে হল না, সামান্য গিয়েই রঘুনাথ টের পেল একটা অন্ধকার পুরী তাকে হাঁ করে যেন গিলতে আসছে। আলো থাকলে ভালো হত, আলো না এনে ভুল করেছে সে। একবার ভাবল ফিরে গিয়ে নূপুরের কাছ থেকে লম্ফো চেয়ে আনবে। কিন্তু ফস করে দেশলাই জ্বলে উঠতেই সে অবাক চোখে তাকাল। সেই স্বল্প আলোয় রঘুনাথ দেখল লুলারামের হলদে হয়ে যাওয়া দাঁতগুলো বিকশিত হয়ে পরিতৃপ্তির একটা হাসি উগরে দিচ্ছে। বড়ো জান্তব আর পৈশাচিক হাসি।

রঘুনাথ ভাবছিল এই অন্ধকার কুঠুরীতে লুলারাম কি করছে একা একা। তীব্র গরমে আশপাশ যখন আইঢাই করছে তখন এই গুমোট দমবন্ধ করা পরিবেশে একটা মানুষ একা একা কি করতে পারে ওখানে? চোরাকুঠুরীর গল্প এর আগেও শুনেছে রঘুনাথ কিন্তু কোনোদিনও সাহস করে ওখানে ঢোকার তার স্পর্ধা হয়নি। মুনিরাম, দুর্গামণি মানা করত তাকে। মুনিরাম বলত, দাদুভাই, বিচুটি বনে ঢুকলে যে কুনো সময় ওর জ্বলুনীপাতা গা-গতরে ঘষে যেতে পারে। তখুন চুলকে চুলকে চাকড়া-চাকড়া দাগ হবে সারা গায়ে। সেটা কি ভালো দেখায় দাদুরে! বিচুটি বনের ধারে-কাচে যাস নে। আলো বাতাসে হাত-পা ছড়িয়ে খেল। আন্ধারঘরে মন আন্ধার হয়ে আসে।

গুয়ারামও খুশি হত না রঘুনাথ লুলারামের উঠোনে পা রাখলে। সে বেজার হয়ে বলত, খেলতে মন চায় পাকুড়তলায় চলে যা। কারোর দোরে লাফ-ঝাঁপ খেলা ভালো নয়। সব ঘরেই সব সময় কিছু না কিছু খেলা হয়। সে খেলা ছোটছেলেদের দেকা বারণ।

—কি খেলা বাপ?

—বড়ো হ। বুঝবি? গুয়ারাম এড়িয়ে যেত প্রশ্ন।

এখন রঘুনাথ বড়ো হয়েছে কিনা জানে না তবে চোরাকুঠুরীর অনেক রহস্য গল্প তার কানে এসেছে। ললাটবাবুর সৌজন্যে লুলারাম চোরাকুঠুরীটাকে দিনে দিনে বানিয়ে ফেলেছে গুমঘর। প্রতিশোধ নেওয়ার এমন মনোরম জায়গা আর কোথাও নেই এই গ্রামে। গুমঘরে ধরে এনে কারোর গলা দাবিয়ে দিলে কেউ টের পাবে না। খুন করলেও রক্তের ছিটে নজর এড়িয়ে যাবে। এমনকী আর্ত-চিৎকার হারিয়ে যাবে মাটির দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে। লুলারামের বধ্যভূমি এই চোরাকুঠুরীর গল্পকথা কোনোদিনও শেষ হবার নয়।

রঘুনাথ সত্যি-মিথ্যা জানে না। তবে সে জানে যা রটে তা কিছু না কিছু বটে। চোরাকুঠুরীর মেঝেয় পা রেখে তার শরীরে একটা হিমস্রোত বয়ে গেল। কপালের ঘাম মুছে সে বড়ো বড়ো চোখ মেলে দেখতে চাইল লুলারামকে। দেখতে না পেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় সে ডাকল, কাকা, তুমি কুথায়?

—কেন রে, তুর বুঝি ডর লাগে? অন্ধকার থেকে উড়ে এল লুলারামের কণ্ঠস্বর। ভয় জিনিসটা এই বয়সে অপমান। রঘুনাথ নিজেকে সামলে নিল, ভয় পাবো কেনে? আমি তুমার কাচে যেতে চাই। রঘুনাথ নিজেকে নিজের মধ্যে খুঁজে পাবার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ পরে আবার একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে লুলারাম সামনে এল। তার দু'হাতে রক্ত দেখে চমকে উঠল রঘুনাথ। লুলারাম সেই রক্তমাখা তর্জনী নিজের মোটা ঠোঁটে চেপে ধরে বলল, চুপ। হল্লা করিস নে। জানাজানি হলে হুজ্জোত বাড়বে!

—অতো অক্ত? কী হয়েচে গো কাকা? রঘুনাথ হাঁপাচ্ছিল। সে কিছুটা উত্তেজিত। লুলারাম তাকে শান্ত হতে বলল, ঘাবড়ে যাওয়ার কিচু নাই। এট্টা কালোখাসি ধরে এনেচি মুকামপাড়া থিকে। পণ্ডিত বিলের বেড়ার ধারে চরছিল। দেকে আর লুভ সামলাতে পারলাম না। মনটা টেনে নিয়ে গেল

হুড়হুড়িয়ে। ভাবলাম কত্তো দিন মান্‌সো খাইনি। আর খাবো কি করে? খাসিমান্‌সের যা দাম বেড়েচে। লুলারাম কথা থামাল।

রঘুনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলল, তার মানে চুরি করে এনেচো?

—ও কথা বলতে নেই ভাইপো। লুলারাম দাঁত বের করে হাসল, না বলে আনলে শাস্ত্রে বলচে চুরি করা হয়। তবে শাস্ত্রে এ-ও বলচে-চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ো ধরা। তা আমাকে ধরার মতো কুনো মামু নেই এ-গাঁয়ে। চাইলে যখুন দেবে না তখুন না বলে নিয়ে এলাম। না বলে নিয়ে এলে কুনো দোষ হয় না। বরং মান্‌সের সুয়াদ বাড়ে।

রঘুনাথের মুখে কথা আটকে গেল। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। কাকাকে এ চেহারায় সে কোনোদিন দেখেনি। না দেখলেই বুঝি ভালো হত। লুলারাম বলল, এই ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তুর অতো না ভাবলেও চলবে। শুন, আমি তুকে কিজন্য ডেকেচি। মন দিয়ে শুন। ঢোক গিলে লুলারাম তার রক্ত জড়ানো হাতটা রঘুনাথের কাঁধের উপর রাখল, তুর কুনো ভাই নাই, দাদা নাই। মেয়ে দুটা আর তুই হলি আমার সম্বল। তুকে আমি কিচু গুপ্তবিদ্যে দিয়ে যেতে চাই। বংশের অক্ত ছাড়া তো এসব কাউকে দেওয়া যায় না। ওস্তাদের বারণ আচে। বুঝলি?

রঘুনাথ অন্ধকারে ঘাড় নাড়ল।

লুলারাম উৎসাহ পেয়ে বলল, তুর কচিয়াদাদু চোর ছিল জানিস তো? সে এখুন আর রাত-বেরাতে বেরুতে পারে না। সে আগে ছিল বাঘ, এখুন হয়েচে বুড়াবাঘ। তুই জানিস তো বুড়াবাঘ শিকার ধরতে পারে না। এখুন আমি তাকে শিকার ধরে এনে দিই। তা খেয়ে সে বেঁচে থাকে। আমি না থাকলে বুড়াটা মরে ভূত হয়ে যেত। এ সন্‌সারে কেউ কাউরে দেখবে না। যে যার, তার তার। কপাল চাপড়েও কুনো লাভ নেই। কপাল আমবাতের মতো ফুলবে। তাতে কার লাভ? কারোর নয়। তাই বলচিলাম কি, তুই আমার পথে চলে আয়। আমি তুকে হাতে করে সব শিখিয়ে যাই। এতে আমার স্বার্থ আচে। আমি বুড়া হলে তুই আমাকে শিকার ধরে দিবি। কি রে দিবি তো?

রঘুনাথ হ্যাঁ-না কিছু বলতে পারল না চট করে। অন্ধকারে তার চোখ কুঁকড়ে যাচ্ছিল। শুধু লুলারামের কথাগুলো ছাড়া আর কিছু যেন ঘরের মধ্যে পড়ে নেই। এই অন্ধকার হাতড়ে কি পেতে পারে সে? অন্ধকার শুধু ভয়ের জন্মদাতা। চোরাকুঠুরীতে নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া চামচিকির ডানা ঝাড়ার ব্যস্ত আওয়াজ প্রকটিত হল। লুলারাম অধৈর্য হয়ে বলল, তুর বাপরে আমি পথে আনতে পারলাম না। সে যেটা বুঝবে—সেটাই শেষ কথা। গরিব মানুষের এত গোঁ ভালো দেখায় না। তারে আমি বলেছিলাম আমার সাথে কাজে লেগে পড়তে। সে আমার কতা হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। তাতে কার ক্ষতি হয়েচে? গাঁ-ছেড়ে তাকে তো চলে যেতে হল দূর গাঁয়ে খাটতে। এতে কী লাভ হল বলদিনি বেটা।

লাভ-ক্ষতির কথা নয়, গুয়ারাম মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে। একথা ঠিক তার দুবেলা ভাতের জোগাড় হয় না, দুর্গামণিকে ঝোড়-জঙ্গলের শাক-লতা পাতা খুঁজে আনতে হয়, তবু তারা সম্মানের সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়, পুলিশ এসে তাদের দরজায় লাথি মারে না, ধমকায় না। রঘুনাথ কাকার মুখের উপর একটা কথাও বলতে পারে না, তার আড়ষ্টতাবোধ হয়, সে পাথরচোখে গিলতে থাকে গুমোটবাঁধা অন্ধকার।

বিরক্ত লুলারাম উত্তেজিত হল না, চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, ঠিক আচে, তুই যা ভালো বুঝিস কর। মন চাইলে আসবি না হলি পরে চলি যাবি। সব তুর উপর ছেড়ে দেলাম। লুলারাম আর একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাল, বিব্রত রঘুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, খাসিটা মেরেচি, মান্‌সো লিয়ে ঘর যা। এই বয়সে একা খেতে পারি নে, দিয়ে খেলে কল্যুজের দম বাড়ে।

প্রায় সের দুয়েক মাংস লুলরাম পাতায় মুড়িয়ে ধরিয়ে দিল রঘুনাথের হাতে, তার সতর্ক চোখ-মুখ, গলা নামিয়ে বলল, তুরে যা বললাম-দু কান যেন না হয়। পেটের কথা বাইরে গেলে বেপদ বাঁধে। কলিকালের মানুষরা ভালো হয় না, ওরা কেউ-কারোর সুখ দেখতে পারে না। তুর-আমার কতা আলাদা, অক্তের সম্পর্ক তো!

রঘুনাথ গুমঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘাম মুছল কপালের। চোরাকুঠুরীর ভেতর কুয়া খুঁড়ে রেখেছে লুলারাম। ললাটবাবুর লেঠেল হওয়ার সুবাদে সেই কুয়ায় খুঁজলে এখন হাড়গোড়ও পাওয়া যাবে। এই কুয়োর খবর গ্রামের অনেক মানুষই জানে না। তবে দুর্গামণির সব নখদর্পণে। সে একদিন কথায় কথায় টিলিকে সতর্ক করে বলেছিল, বেঘোরে জানটা কেনে দেবে বুন, চোখ মুদে থাকো, না হলে মানিয়ে নাও। এদের বংশ খুনেবংশ। মদ-মেয়েছেলে নিয়ে ওদের সময় কাটত। আমার শাশুড়ির মুখে গল্প শুনেচি-তার শ্বশুর নাকি মদ খেয়েই চক্ষু মুদল। তোমার বর লুলারে কুনো বিশ্বাস নেই। ও পারে না হেন কাজও নেই। ঝারির জন্যি ও তুমাকে ঝোড়কাটার মতো কেটে চোরাকুঠুরীর কুয়ায় ফেলে দিবে। থানা-পুলিশ পাড়াপড়শি কেউ টের পাবে নি।

দুর্গামণির সতর্কবাণী রঘুনাথের হুড়হুড় করে মনে পড়ে গেল। প্রথমে সে ভেবে ছিল এগুলো হয়ত গল্পকথা, কথার কথা। কিন্তু আজ সে যা নিজের চোখে দেখল বাইরে এসে ভাবতে গেলে হিম হয়ে যাবে গা-হাত-পা। রঘুনাথ একবার ভাবল—সে থানায় গিয়ে সব বলে দেবে; পরমুহূর্তে সে বোঝাল নিজেকে। না, ভালো হবে না। কাকাকে ধরিয়ে দিয়ে তার ক্ষতি বইতো লাভ হবে না। হাজার হোক কাকা, দায়ে-আদায়ে পাশে দাঁড়ায়। কাঁধ দেওয়ারও তো লোক দরকার। তাছাড়া নূপুর, নোলক ওদেরকে সে ভুলবে কি করে? ওরা তো কোনো দোষ করেনি। ওরা ফুলের মতো নরম, দিঘির জলের মতো মৃদুভাষী। বাবার পাপে মেয়েরা কেন ভুগবে?

রঘুনাথ মাংস নিয়ে আপনমনে হাঁটছিল। ঢুলিরামের গল্প সে দাদুর মুখে শুনেছে। বাবার মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে চোখে জল চলে আসত চুনারামের। মানুষ অতীতের কাছে দাস হয়ে থাকতে ভালোবাসে না। চুনারাম ঢেঁকুর তুলে বলত, আর কুনোদিনও মদ খাবো না। মদ মন খায়, শরীল খায়। আয়ু খায় চিবিয়ে-চিবিয়ে।

ঢুলিরাম নেশায় চুর হয়ে থাকত সব সময়। নেশা করলে তার পা টলত, মাথা টলত, মুখ দিয়ে আজেবাজে কথার চাইতে বেরিয়ে আসত টুসুগান। বেশ রগড়ের লোক ছিল সে। গঙ্গামণি প্রায়ই কেঁদে-কেটে বলত, ছেড়ে দাও গো এই সব্বোনাশী নেশা। নিজের শরীলটাকে দেখবা না? কী হয়েচে তুমার চেহারা! একেবারে ঢিংঢিঙা। মনে হয় ফুঃ দিলে উড়ি যাবা।

এই চেহারায় সাহেবমাঠে কাজ করত সে। হাতে লাঠি, হাঁটুর উপর খাটো ধুতি। ধাবড়া নাক, সরু মুখের কপালে জোঁকের মতো শুয়ে থাকত চিন্তার দাগ। ওগুলো দু-মুখো সাপের মতো টনটন করত প্রায়সময়। বর্ষার সময় দিন পনের জ্বরে পড়েছিল সে। জ্বর ভালো হতেই মাঠে গিয়ে দেখল তার জায়গায় অন্য মুনিষ কাজে লেগেছে। বেকার হয়ে গেল ঢুলিরাম। হাতে পয়সা নেই অথচ নেশা করার শখ আছে। নেশা না করলে তার প্রাকৃতিক কর্ম হত না। কাজ না করলে সংসার চলবে কি করে? চুনারাম আর মুনিরাম বেকার। ঘরে চাল নেই, তেল নেই। মাঠে কাজ নেই। গঙ্গামণি কোনোমতে টানছিল সংসার। কোনোদিন কাজ পায়, কোনোদিন আবার কাজ পায় না। একদিন ঢুলিরামই দু-হাত সম্বল করে বেরিয়ে পড়ল ভিক্ষায়। বাঁচতে তো হবে? এই আকাল কবে যে কাটবে শীতলাবুড়ি জানে। ভিক্ষা করা সহজ কাজ নয়। মাত্র পনের দিনেই বুঝে গেল ঢুলিরাম। বামুনপাড়ার মানুষরা বলল, তোমাকে ভিক্ষে দিয়ে কী হবে। চাল বেচে তো তুমি চোলাই খাবে। তার চেয়ে বউরে পাঠাও, তার হাতে আমরা দু'মুঠি চাউল তুলে দেব।

গঙ্গামণির সেই সুযোগ আর এল না। একদিন ভিখ মাঙতে গিয়ে গায়ে গরম বাতাস লাগিয়ে বাঁধের ধার থেকে কটরাব্যাঙের মতো ঠিকরে পড়ল ঢুলিরাম। মরেই যেত, শুধু ভাগ্যের জোরে চোখের পাতা তুলে তাকাল। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে গেল না সে, কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে বলল, বাপ রে ওখানে গেলি পরে মরে যাবো। কড়া কড়া বড়ি আর ইনজিসিন এ গতর লিতে পারবে নি। তার চেয়ে দেহাতি দাওয়াই ভালো।

বাড়ি ফিরে এসে বার দুয়েক বাহ্যি গেল ঢুলিরাম। বাঁধের গোড়া থেকে তার ফিরে আসার কোনো ক্ষমতা ছিল না। শেষ পর্যন্ত গঙ্গামণি তাকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে এল। এভাবে সাত দিন কাটল তবু অবস্থার কোনো উন্নতি নেই। খেজুরপাতার তালাই এ লেপটে গিয়েছে ঢুলিরামের দেহ। চোখের কোল বসা। গাল ঢুকে গিয়েছে শুকনো আমের মতো। ইংরেজি দাবাইয়ের উপর তার কোনো আস্থা নেই, হাসপাতালের কথা উঠলেই সে চিঁ-চিঁ করে বলে, মরি তো এই হলদেপোঁতায় মরব। তুদের হাতে-পায়ে ধরি রে, আমারে আর হাসাপাতালে নিয়ে যাস নে।

ঘরের মানুষটার কাতরতা দেখে গঙ্গামণি পাড়া জাগিয়ে কাঁদে, হা আমার কি হল গো, মানুষটা যে আর বেছানা ছেড়ে উঠতে পারচে না গো! মা শীতলাবুড়ি, মা গো মা, তুমি আর অতো লিঠুর হয়ো না। মুখ তুলে চাও মা। মুখ তুলে চাও। ঘরের মানুষটারে ভালো করে দাও মা। বুকের অক্ত দিয়ে তুমার ধার শোধ করব। দয়া করো মা, দয়া করো।

—মা'র দয়া হবে নি রে; আমার সময় হয়ে এয়েচে। ঢুলিরামের মাথাটা যেন খেতের তরমুজ, আমার কতা শুন। আমার জন্যি চোলাই কিনে আন ভাঁটিখানা থিকে। নেশায় আমার মন টনটন করচে।

—বাহ্যি দিয়ে অক্ত ঝরচে, এ সময় কেউ লেশা করে গো? গঙ্গামণির দৃষ্টিতে কাতর প্রশ্ন।

নেতানো ঢোক গিলে ঢুলিরাম বলল, আমার শেষইচ্চেটা পূরণ করি দে বউ। তুর কাচে এ জীবনে আর কিচু চাইব না।

—আমি বউ মানুষ, কী করে চুল্লু ভাঁটিতে যাই বলো? এতদিন গেল, কুনোদিনও যাইনি। আচ আমার বাঁধো ঠেকচে। গঙ্গামণি তার অক্ষমতার কথা জানিয়ে দিল।

ঢুলিরাম জোর গলায় বলল, তুই যা। আমার হাতে সময় কম।

--যাব যে পয়সা কুথায়?

ঢুলিরাম ফাঁপড়ে পড়া চোখ মেলে তাকাল, আমার শেষ ইচ্চেটা আর পূরণ হল না। বলেই সে গঙ্গামণির হাতটা ধরল। অমনি সরু লিকলিকে রূপার চুড়ি দুটো সরে গেল কনুইয়ের দিকে, আশায় চকচকিয়ে উঠল মন, এই তো পয়সা পেয়ে গিয়েচি। যা বউ, চুড়ি বেচে আমারে মদ এনে দে। আমি তো সোনাদানা চাইচি নে, সামান্য মদ।

গঙ্গামণি রুপোর চুড়ি বেচে দিল স্যাঁকরা দোকানে। টাকা নিয়ে সে দৌড়ে গেল ভাটিখানায়। ব্যস্ত হয়ে বলল, দাদা গো, ঘরে বড়ো বিপদ। ওর জন্যি মদ দাও।

—সাত দিন ধরে অসুক। এখন মদ খাবে? কেমন মানুষ গো তুমার বর। ভাটিখানা মালিকের কপাল কুঁচকে গেল, সব জেনে-শুনে এ পাপ আমি করতে পারবোনি। তুমি ঘুরোন যাও।

—আমি খালি হাতে ঘুরে গেলে সে আর বাঁচবে নি। গঙ্গামণি আঁচলে মুখ ঢেকে ডুকরে উঠল, দাদা গো, মানুষটারে বাঁচাও। মদ ছাড়া যে মানুষটার একদিনও চলে নি, সে যে সাতদিন ধরে কী ভাবে আচে একবার তার কথাটা ভেবে দেখো।

বাটিতে মদ ঢালতে-ঢালতে ভাঁটিখানার মালিক বলল, এট্টা কতা ছিল যদি রাখো। মদ আমি দিচ্ছি ঠিকই কিন্তুক মন আমার সায় দিচ্চে নি। শুনেচি—নেশার জিনিস না দিলে পাপ হয়। সে

আমার পাপ হোক। তুমি ওরে এক ঝিনুক মেপে মদ দিও। এর বেশি দিও না, আমার মাথার দিব্যি।

গঙ্গামণি সাবু ফোটান দিতে চেয়েছিল ঢুলিরামকে। সে হাত দিয়ে বাটি সরিয়ে দিল অনীহায়, আগে মদ দে বউ। মদের ঘেরাণ শুঁকে মাথা ধরা সারাই।।

গঙ্গামণি বাটিটা ধরিয়ে দিলে চুমুক লাগাতে যায় ঢুলিরাম, আঃ, কতদিন পর চেনা ঘেরান পেলাম! পরানটি এক্কেবারে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল রে!

—দাঁড়াও ঝিনুক নিয়ে আসি। গঙ্গামণি পা বাড়াল।

পানসে হেসে ঢুলিরাম বিষাদভরা চোখে তাকাল, কেনে রে, আমি কি কোলের খোকা নাকি? নেশার সময় বাধা দিস নে, চটকে যাবে।

দু' ঢোক খেয়েই ঢুলিরামের হাত আলগা হয়ে বাটিটা পড়ে গেল বিছানার উপর। দু'বার হেঁচকি উঠেই ঢেঁকির কাঠের মতো স্থির হয়ে গেল ঢুলিরাম।

চোখ বুজলেই রঘুনাথ যেন গঙ্গামণির কান্না-দৃশ্য দেখতে পায়। মনটা ঘোলা জলের চুনো মাছের মতো ছটফটায়। বেড়ার কাছে এসে সে দেখে দুর্গামণি বসে আছে তালপাতার আসনে, তার সম্মুখে ঠাকুর হয়ে বসে আছে দুলাল। কী ভেবে রঘুনাথ তাদের সামনে দিয়ে গেল না। অবেলায় মাংস দেখে দুলালের মনে সন্দেহ হবে। হাজারটা প্রশ্ন করবে তাকে। তার সব প্রশ্নের উত্তর কি দিতে পারবে রঘুনাথ। সেই কারণে বুক কেঁপে উঠল। পিছন দিক দিয়ে ঘরে ঢুকে রঘুনাথ শুনল, দুর্গামণি বলছে, ইবার যখুন খাটতে যাবে আমারে সাথে করে লিয়ে যেও। রঘুর বাপ যাওয়ার পর থিকে মনটা আমার ভালো নেই। কুনো মতে বেঁচে আছি গো। বারবার মনে হয়-খাটতে না গিয়ে আমি বুঝি অপরাধ করে ফেলেচি।

—সে তুমি যেও। তবে ইখানকার রাঁধাবাড়ি কে করবে? দুলাল আরও কিছু শোনার জন্য হাঁ-করে তাকাল। একটু ভেবে নিয়ে দুর্গামণি বলল, আমার ঘরের রঘুটা সব পারে। দুটা মানুষের ভাত সে কি ফুটিয়ে নিতে পারবে না?

—বেশ পারবে! তাহলে তৈরি থেকো। দুলাল উঠে দাঁড়াল।

কঞ্চির আগাড় সরিয়ে দুলাল চলে যেতেই দুর্গামণি বিড়বিড়িয়ে বলল, মা শীতলাবুড়ি, তুমি আমার মনোকামনা পূরণ করো। ঘরের মানুষটাকে আমি গিয়ে যেন ভালো দেখতে পাই। ওরে ভালো রেখো মা।

ভালো-মন্দ, থাকা না থাকা সব শীতলাবুড়ির ইচ্ছে। ক' দিনের গরমে দুমাদুম বাষ্প হয়ে যাচ্ছে বুড়িগাঙের জল। পাল খেদিয়ে এখন আর সুখ নেই কারোর। পাঁচ বছর আগে যা সুখ ছিল এখন তা ছিবড়ে। গোরু-মোষ পিছু মুড়ি আর জিরেন-কাট রসের পাটালি দিত মনিব। এখনও দেয় কিন্তু দায়সারা দশা। মন ভরলেও পেট ভরে না। রঘুনাথ হাঁপিয়ে উঠেছে গোরুর পাল খেদাতে গিয়ে। দুর্গামণি তার মনের ছটফটানি লক্ষ্য করে বলল, মাথা গরম করে কুনো লাভ হবে নি। এক কাঠা করে মুড়িই বা কে দেয় এই বাজারে।

—সবাই দেবে। ঝাঁঝিয়ে উঠল রঘুনাথ, ভাবছো মুফতে দেয়, তা তো নয়। গোরু চরাতেও

মেহনতের দরকার হয়। পাল খেদানো মুখের কতা নয়। এট্টু চোখ সরে গেলে কপালে চরম কষ্ট আচে। গোরু এদিক-ওদিক কেটে পড়লে জান ঢিলা হয়ে যাবে। তখুন বদনামের আর শেষ থাকবেনি।

—কুন কাজটা আরামের বল তো? দুর্গামণি অসন্তুষ্ট চোখে তাকাল।

রঘুনাথ মুখ ভার করে বলল, একাজ বড়ো এক ঘেয়েমীর কাজ। আমি হেঁপসে উঠেচি মা। পাল নিয়ে যেতে হলে তুমরা যাও, আমি আর যাবো না। ওসব আমার ভাল্ লাগে না।

—তুর কি হয়েচে বল তো? দুর্গামণির গলায় সন্দেহ প্রকট হল, ওই বামুনপাড়ার ছেলেটাই তুর মাথা খেল। বড়গাছে ভাঁড় বাঁধলে চলবে? নাকি তা শোভা দেয়? রঘুনাথ কপাল টিপে ধরল রাগে, তুমার আর বিদেশে খাটতে গিয়ে লাভ নেই।

—তুর বাপ যে গিয়েচে।

—যাক।

—আমি না গেলে ভালো দেকায়? দুর্গামণি কেমন সহজ হয়ে এল, ইবারটা যাই, আর যাবো না। বয়স হচ্চে—।

—আমি এট্টা কাজ পেয়ে গেলে আর তুমারে খাটতে দিতাম না।

—ছেলের কথা শুনে হেসে উঠল দুর্গামণি, তুর মনটা বড়ো সাফ—সুতরো। তুর উপর রাগ করে থাকতি পারি নে।

শেষ পর্যন্ত পরদেশে আর খাটতে গেল না দুর্গামণি।

সাঁঝবেলায় কীর্তন দলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল চুনারামের। সে ঘাড় উঁচু করে আকাশ দেখছিল তন্ময় হয়ে। খোল করতালের শব্দ তার কানে যেতেই হুঁশ ফিরে এল। দুপুরবেলা সে কালো সুড়সুড়ি পিঁপড়েদের দল বেঁধে যেতে দেখেছে নিরাপদ আশ্রয়ে। পিঁপড়েগুলোর হাঁটা-চলায় অস্বাভাবিকতা পুরো মাত্রায় লক্ষ্য করেছে সে। সুড়সুড়ি পিঁপড়ে সাধারণত চোখে পড়ে না। কারণ ছাড়া ওই জাতের পিঁপড়েগুলো মানুষের চোখের আড়ালে থাকতেই ভালোবাসে। সামান্য হলেও চুনারামের বয়স্ক-মন বৃষ্টি হতে পারে এই আশায় পুলকিত হয়ে উঠেছিল। যদি বৃষ্টি হয়—শুধু মানুষ নয়—গাছপালা প্রকৃতি—সাহেবমাঠ—বুড়িগাঙ সব যেন দম ছেড়ে বাঁচবে।

কীর্তন দলটি নাচের মুদ্রায় হেলে দুলে বাঁধের উপর উঠে যাচ্ছে। বেশ ক'দিন থেকে ওদের আর প্রার্থনার অন্ত নেই। গরম হাওয়ার দাপটে মাঠেঘাটের কাজকর্ম এখন বন্ধ হবার মুখে। এত চড়া রোদে মুনিষগুলোও আর পারছে না। প্রায়ই শোনা যাচ্ছে এ ও জ্ঞান হারিয়ে পড়ছে ঢেলা খেতে।

সন্ধ্যা গাঢ় হয়নি, মেঘ করে এল আকাশ জুড়ে। পাকুড়তলায় জল আনতে গিয়েছিল দুর্গামণি। সে ফিরে এল হড়বড়িয়ে। বাইরে অনেক কিছুই পড়ে আছে। মেঘের যা তর্জন-গর্জন। যে কোনোসময় ঢাললেও ঢালতে পারে। দুর্গামণি ঝুম কালো আকাশের দিকে তাকাল। চিকচিকিয়ে উঠল তার চোখের তারা। এক ফোঁটা বৃষ্টির দানা তার চোখের নীচটাতে পড়ল অশ্রুদানার মতো।

—মা শীতলাবুড়ি মুখ রেখো। আচ মন ভরে ঢালো। ঢেলে ঢেলে সব ভেসিয়ে দাও। জোর পায়ে দুর্গামণি আগড় সরিয়ে ঢুকে এল দাওয়ায়। দু'চারবার চাঁটি মারার মতো বাতাস এসে ফোঁসফাঁস করল কলাগাছের ঝাড়ে, নতুন বেরনো পাতাগুলো কাঁপতে লাগল হাওয়ার শাসনে, সজনেগাছের হলুদপাতাগুলো চুনোমাছের মতো সাঁতরে বেড়াল বাতাসের নদীতে। মাঝ আকাশে বাজ পড়ল কড়কড়াত। বিদ্যুৎ-এর চিকুর ফাটিয়ে দিল আকাশের সিঁথি। অনুরাগ পর্ব শেষ হলে শুরু হল তুমুল বর্ষণ। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো দলবদ্ধ ভাবে নেমে এল পৃথিবীর ধুলোয়। সৃষ্টির আদিম খেলায় মেতে উঠল চরাচর।

রঘুনাথ কালীগঞ্জ বাজারে এসেছিল ঢিলিকে খুঁজতে। হাট করতে এসে গাঁয়ের একজন ঢিলিকে দেখেছে পুরাতন বাজারে ঘোরাঘুরি করতে। নূপুর এসে বলল, দাদা, যা না রে, মাকে ধরে লিয়ে আয়। এখুন গেলে তার সাথে তুর দেকা হয়ে যাবে। তুকে দেখলে সে পেলিয়ে যেতে পারবে না। তুর কথা শুনবে। যা দাদা।

নূপুরের মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট পেয়েছিল রঘুনাথ। ওদের খাওয়া-পরার কোনো অভাব নেই, অভাব শুধু সুখের। সুখ জিনিসটা দূর দেশের পাখির মতো উড়ে গেছে সংসারে ছেড়ে। শান্তি খুন হয়েছে চোরাকুঠুরীর অন্ধকারে।

—ঠিক আচে। যেচ্চি। দেকি কতদূর কী করা যায়। রঘুনাথের কণ্ঠস্বরে ছিল সান্ত্বনা। নূপুর ব্যস্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুই যা। তুই না গেলে মা বাস ধরে দেবগ্রাম-পলাশী পেলিয়ে যাবে। ওখান থেকে টেরেন ছাড়ে। টেরেন চেপে পেলিয়ে গেলে তার হদিস আর পাওয়া যাবে না। নূপুরের ছলছলানো চোখ মন খারাপ করে দিল রঘুনাথের।

কালীগঞ্জে এসে আটকা পড়ে গেল রঘুনাথ। এ বৃষ্টি যে চট করে থামবে না সে হাড়ে-হাড়ে টের পেল। অসুবিধা হলেও এই অসুবিধা মানিয়ে নেওয়া যায়। কদমগাছের ফুলগুলোর জন্য তার কষ্ট হত। ফি-বছর এ সময় ফুল ফোটে, গাছটা আকাশের ঝকমকে তারার মতো সুন্দর হয়ে ওঠে। এ বছর সেই সময় কবে পেরিয়ে গেল। কুঁড়ি ধরেছিল কিন্তু শুকিয়ে তা বেশিরভাগই ঝরে গেল। বুড়িগাঙের শুকনো মুখের দিকে আর তাকানো যেত না, যেন বড়ো ঘরের বিটি হঠাৎ রোগে-শোকে ধূসর মলিন শুকনো। ওর মুখে জলের ছিটে দেবার আর কেউ নেই।

চা-দোকানের শেডের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল রঘুনাথ তবু ত্যাড়াবেড়া জলের ছাঁট ভিজিয়ে দিল তাকে। জলের মোহনী শক্তি প্রবল, রোমাঞ্চিত হল রঘুনাথ। রাস্তায় জল জমে যেতেই বৃষ্টি এবার দম নিল। তবু গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিকণা ঝিরঝির করে ঝরছিল। মাত্র ক' ঘণ্টার বৃষ্টিতেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ধরিত্রী এমনভাবে সে শ্বাস ছাড়ল। উৎকট খরার সেই ভয়াবহতা এখন আর নেই, চারদিক থেকে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা আমেজ। শুধু আমেজ নয়, সুখের গন্ধ পেল রঘুনাথ।

যার জন্য এতদূর আসা, সেই ঢিলিকাকিকে দেখতে পেল না রঘুনাথ। নূপুর আর নোলককে সে কি বলবে? "কাকিকে খুঁজে পেলাম না" এই কথাটা বলতেই তার বাধো-বাধো ঠেকবে। ওরা কাঁদবে না, কিন্তু মন খারাপ করে কষ্ট পাবে। এই মুহূর্তে লুলারামকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারল না। আজ ঢিলিকাকির এই অবস্থার জন্য লুলারামকাকাই দায়ী। ঝারির সঙ্গে কাকার সম্পর্কটা ডালপালা ছড়িয়েছে। লুকিয়ে লুলারাম গিয়ে মাংস দিয়ে এসেছে ঝারিকে। ভিকনাথ সব জানত, সে লোভে পড়ে কোনো নিষেধ করে নি। অভাব মানুষের সব খায়। ভিকনাথকে তার অভাব পুরোপুরি গিলে নিয়েছে। ফলে ঝারির মুখের উপর সে কোন কথা বলার সাহস রাখে না।

পুরাতন বাজারটা ঘুরে রঘুনাথ চলে গেল বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকটায়। ওদিকটা এখন এই দিকটার মতো জমজমাট নয়। দু-একটা মিষ্টি দোকান, সোনা দোকান, কাপড়ের দোকান, সাইকেল দোকান ছাড়া আর কিছু নেই। বাস-স্ট্যাণ্ডের চা-দোকানটায় তখনও বেশ ভিড় দেখতে পেল রঘুনাথ। সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। সেই 'উত্তেজনা'কে ঘিরে রয়েছে আশঙ্কা আর সংশয়।

দুলু কাহারকে এ গাঁয়ের কে-না চেনে। ওর মতো দরাজ মনের মানুষ খুবই কম হয়।

দুলু কাহারের বাপের নাম কুলু কাহার। সে আগে পাল-কোম্পানির টালি-কারখানায় কুড়ুল নিয়ে কাঠ ফাড়ত। শুধু কাঠফাড়া নয়, যখন যা কাজ পেত সে কাজ মন লাগিয়ে করত। গায়ে তাগদ থাকলে মানুষের মনে কর্মভীতি জমতে পারে না। টালি কারখানার কাজ মরশুমি কাজ। বর্ষা-বাদলের দিনে তা হবার নয়। ভেজা কাঠ শুকোবার জন্য রোদ দরকার। কাঁচা কাঠে পোড় জ্বলে না, শুধু

ধোঁয়া উগরায়। কুলু তাই বর্ষা-বাদলের দিনে কুড়ুল ফেলে মোট বইত, মুনিষ খাটত। বিশেষ করে কালীগঞ্জ বাস-স্ট্যাণ্ডে তার সময় কেটে যেত বেশি করে। এখানে টুকটাক কাজ লেগেই থাকে। বাসের মাথার মাল-লোড করা, লরিতে পাট চড়ানো...আরও কত কী কাজ। দিনভর খাটলে ভাত-কাপড়ের অভাব হত না কুলুর। তার তিন বেগমের দু-জন এখন দেশ ছাড়া। শুধু ছোটবিবি তাকে জড়িয়ে আছে সুন্দরী শুঁয়োফলের মতো। দুলু হল বড়ো বেগমের সন্তান। সে বড়ো বাপ ন্যাওটা। কুলুরও ছেলেটার উপর টান কম নয়। ওই ছেলেই তো তাকে খাওয়াবে, পরাবে। ওই ছেলেই তো তার বুড়ো বয়সের লাঠি, সাহারা। ছেলেকে তাই চোখে চোখে রাখত সে।

বয়স বাড়লে শুধু চামড়া নয়, ঢিলেঢালা হয়ে যায় মানুষের মনও। ভেঙে যাওয়া কলসী-হাঁড়ির খোলামকুচির মতো স্বপ্নটাও অর্থহীন, গুরুত্বহীন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ছড়িয়ে যাওয়া স্বপ্নকে নতুন করে মালা গাঁথার মতো আর একত্রিত করা যায় না। কুলু কাহারের ইচ্ছা ছিল সে ছেলেটাকে অন্তত লাখুরিয়া হাই ইস্কুল অবধি পাঠাবে, কিন্তু দুলুর জেদ, গোঁ আর পালিয়ে বেড়ানো স্বভাব তাকে পণ্ডিত বিলের জলের মতো স্থিতু হতে দিল না। ফলে অ-আ ক-খ শিখেই দুলুর পড়া শেষ। গায়ে গতরে বাড়তেই সে-ও কুড়ুল তুলে নিল কাঁধের উপর। একদিন কুলু কাহারের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল কারখানায় কাজ করবে বলে। কাঠ-চেরাইয়ের কাজ মন্দ নয়। এ কাজ করে অনেকেই তো সংসার টানছে।

কুলু কাহারের এখন বয়স হয়েছে, সে আর নিয়ম করে খাটতে যেতে পারে না। তবু সে নিয়ম করে একবার স্ট্যাণ্ডের চা-দোকানটায় আসবেই আসবে। এতদিনের অভ্যাস, বাজারে না এলে তার ভাত হজম হবে না। দুলু হাজার নিষেধ করলেও সে শুনতে চায় না, গোঁসা করে বলবে, বুড়া হয়েচি মানচি—তবু এখুনও তো মাজা পড়েনি, লাঠি ছাড়া চলাফেরা করতে পারি। এখুনও মাল আমি তুলে দিতে পারব বাসের মাথায়।

মনে যত জোর থাক কুলু কাহারকে মোট বওয়াতে মানুষ এখন ভয় পায়। বুড়ো মেরে কেউ পাপের ভাগীদার হতে চায় না।

সংসার চলছিল দুলুর ঘাম ঝরানো মেহনতে। ফুঁকফুঁক করে প্রায়ই সে বিড়ি টানত বন্ধুদের খপ্পরে পড়ে। কাঠ-চেরাইয়ের কাজে মেহনত যেমন আছে—তেমন আছে পয়সা। শক্তি জল হয়ে ঢল নামাত পা-বরাবর। যেমন খাটত তেমন খাদ্য পেত না দুলু। তার যুবক চেহারা ঝাঁপিতে আটকে রাখা জাতসাপের মতো ফুঁসছিল। একদিন বদলা নিল সে-ও। কাশি-কফের সঙ্গে কাঁচা রক্ত উঠে এল সেই প্রথম। কালীগঞ্জের ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলল, তোমার টি-বি হয়েছে দুলু। তোমার এখন আরামের প্রয়োজন। দুধ-ঘি, ভালো-মন্দ নিয়মিত খেতে হবে তোমাকে। যদি নিয়ম করে ওষুধ খাও আর আমার কথা শুনে চলো তাহলে তোমার এই অসুখ মাস তিনেকের মধ্যে পুরোপুরি ভালো হয়ে যাবে।

দুলুর বুকের রোগ ভালো হয়ে গেল, সে এখন সুস্থ মানুষ। তবু ডাক্তারবাবু মানা করেছেন তাকে কাঠ-চেরাইয়ের কাজে যেতে। গাঁয়েঘরে বিকল্প কাজ কোথায়? হালকা কাজ ছাড়া দুলুর চলবে না। শেষপর্যন্ত সে একটা কাজ পেল পালেদের আটা চাকিতে গম-পেষানোর। মাস গেলে মাইনে দেবে পালবুড়ো। এছাড়া জলখাবার, এটা-সেটা।

দুলু আটা চাকির কাজটা মন দিয়ে করছিল। এ কাজে সে বেশ স্ফূর্তিও পেত। হঠাৎ অমনোযোগে তার ডান হাতটা জড়িয়ে গেল ঘূর্ণায়মান বেল্টের সঙ্গে। মেসিনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে অক্ষম হল দুলু। মেসিন তার ডান হাতটা বল প্রয়োগে বিচ্ছিন্ন করে দিল শরীর থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে কাটা হাত আর জ্ঞান হারিয়ে ফেলা দুলুকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল পালবুড়ো।

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, এখনই একে কৃষ্ণনগরে নিয়ে যান। আমি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। যা ব্লিডিং হয়েছে, ইমিডিয়েট ওর ব্লাডের দরকার।

পালবুড়োর চেষ্টায় দুলু প্রাণে বাঁচলেও তার ডান হাতটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। অথর্ব হয়ে গেল দুলু। চোখ ফাটিয়ে কান্না এল তার। কুলু কাহার তার কোঁকড়ানো চুলে স্নেহের হাত রেখে বলল, চোখ মুছ। যা হবার তা তো খোদা করে দেখাল। খোদার উপর আমার কুনো রাগ নেই বেটা। তুর এট্টা হাত নেই তো কি আচে? তুর দুটা পা আচে। যার পা আচে সে তো ভবঘুরে। ইবার থিকে তুই চরে খা। আমি খোদাতালার কাচে তুর লাগি দোয়া মাঙচি।

দুলু সেই থেকে না ভিখারি, না বাউল, না ফকির। তবে তার গলায় চড়া সুরে খেলে বেড়ায় লালন ফকির। গাঁয়ে গঞ্জে, হাটে-বাজারে এমনকী রেলগাড়ির কামরায় সে ভিখ মেঙ্গে বেড়ায় সকাল থেকে সন্ধে। গান শোনানোর পরে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয় হাতের তালু চওড়া করে। কেউ দেয়, কেউ আবার দেয় না। তবু সারাদিনে কুড়িয়ে বাড়িয়ে সে যা পায় তাতে তার দিব্যি চলে যায়। এখন মনে কোনো খেদ নেই দুলুর। কুলু কাহার তাকে বিয়ের কথা বললে দুলু হাসে, আর আমারে বাঁধতে চেও না বাপ। মন আমার বারমুখী হয়েচে। এ ঘর যে কবে পর হয়ে যাবে—সে কতা আমি হলফ করে বলতে পারচি নে। যে ক'দিন আমি সংসারের লতায় জড়িয়ে আচি, সে ক'দিন তুমাদের কুনো অসুবিধে হতে দিব না। জান দিয়ে হলেও তুমাদের আমি সেবা করে যাবো।

সন্ধে সাড়ে সাতটায় বাস থেকে নামল দুলু কাহার। তার গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথার কোঁকড়া চুল ঘাড় ছাপিয়ে কাঁধ ছুঁয়েছে, কপালে খড়ি দিয়ে আঁকা রসকলি, চোখে মুখে ক্লান্তির পাশে অদ্ভুত এক প্রসন্নতা। জমা জলে পা দিয়ে সে কিছুটা বিব্রত। পায়ের চপ্পলটা আর একটু হলে তাকে বেকায়দায় ফেলে দিত, নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে সে আশেপাশে আবেশী চোখে তাকাল। তার ঢুলু ঢুলু উদাসী চোখ হঠাৎই রঘুনাথকে দেখতে পেয়ে প্রফুল্লবোধ করল, কি রে, তুই ইখানে কি করচিলি? ফিরবি নে?

—ঢিলিকাকিকে খুঁজতে বেরিয়েচি। রঘুনাথ এগিয়ে এল সামনে, তুমি তো দেবগ্রাম থিকে ফিরলে, সিখানে কি তার সাথে দিখা হলো তুমার? বাউল-কায়দায় ঘাড় নাচাল দুলু কাহার, তার কাটা হাতের ল্যাকপ্যাক করা জামার কাপড়টা সেই ছন্দে দুলে উঠল, তুর কাকারে বল—একবার বরমপুর বা কেসনগরে লিয়ে গিয়ে ভালো ডাক্তার দেখাতে। শুনেচি ওর তো পয়সার কুনো অভাব নেই। অভাব নেই যখন তখন ওর অতো হাড়-কিপটেমী কেন? টাকা-পয়সা কি সঙ্গে যাবার ধন রে! ওসব হল অলিত্য। নদীর ঢেউ। আজ আচে, কাল নেই।

রঘুনাথ চুপচাপ শুনছিল। সে সব জেনে-বুঝেও এখন কিছু বলতে পারে না। ঘরের কথা বাইরে বলা শোভা দেয় না। লোক হাসবে। নিন্দে করবে। মুখে কুলুপ এঁটে রঘুনাথ দুলু কাহারের দিকে তাকাল, চলো দুলুকাকা। ঘরে গিয়ে আবার খপরটা দিতে হবে।

—খপর দিয়ে কি হবে? তারে তো আমি পেরাই লালগুলা টেরেনে দেখি। দুলু ঠোঁট কুঁচকে আধ্যাত্মিক-মুদ্রায় ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিছুক্ষণ পরে সে নিজের অবস্থায় ফিরে বলল, চল চা খাই। আজ রাতে ঘুম ভালো হবে বুঝতে পারচি। সারাদিন ভেষণ কষ্ট যায়। গান গেয়ে-গেয়ে গলাটা ঘড়ঘড় করে ব্যথায়।

—একটু আরাম করলেই তো পারো।

—তা যায়! কিন্তু সনসার? সনসার যে আরামের কতা বলে না।

বাঁশের বাতা চিরে বানানো হয়েছে বেঞ্চি। লোক বসে-বসে চকচক করছে সেই বাতা। টুকরো

ছিটকাপড় দিয়ে বানানো ঝোলাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বাঁ-হাত দিয়ে কাঁধটা রগড়ে নিল দুলু কাহার, তারপর গর্দান নাড়িয়ে মেয়েলী স্বরে বলল, দুটো চা।

দুলু পেশার সঙ্গে নিজেকে পাল্টে নিয়েছে পুরো মাত্রায়। চলনে-বলনে, পোশাকে-আশাকে সে এখন ভিন্নমানুষ। যারা তাকে বছর পাঁচেক আগেও দেখেছে তারা এখন অবাক হয় দুলুর এই পরিবর্তনে। কুলু কাহার ছেলের এই পরিবর্তনে মাথার চুল চেপে আক্ষেপ করে, হায় খুদা, এ কী করলে গো তুমি? সব দিয়ে কেড়ে নিলে কেনে? আমার দুষটা কুথায়?

বাপের এই হাহাকারকে কোনো গুরুত্ব দেয় না দুলু। সে জানে দু-দিনের এই শরীর জলে ভাসবে, দাঁড়কাকে ঠুকরে খাবে। পচা দেহকে এত ভালোবেসে কি হবে? ধোঁয়া ওঠা চায়ের ভাড়ে চুমুক দিয়ে দুলু কাহার বলল, সামনে বড়ো খারাপ দিন আসচে রে! এমন এট্টা খারাপ দিন আসচে যখন মানুষ মানুষকে চিনবে না। এই দাদা, ভাই, কাকাখুড়োর সম্পর্কগুলো সব রেললাইনের খোয়ার চেয়েও নিরেট হয়ে যাবে। মানুষের মন থিকে দয়া-মায়া সব মুচে যাবে। কপালে ভাঁজ ফেলে অন্যমনস্ক হয়ে গেল দুলু কাহার।

রঘুনাথ আয়েশ করে চা-খেয়ে ঠোঁট মুছে বলল, কাকা, এট্টা কতা বলি তুমারে। রাগ করো না।

—রাগ করবো কেনে? বল, বল।

—তুমি টেরেনে গান গাও, গান শোনাও। কই গাঁয়ের মানুষকে তো গান শোনাও না? রঘুনাথের প্রশ্নে সামান্য হলেও বিচলিতবোধ করল দুলু কাহার, গাঁয়ের মানুষের আগের সেই মন নাই। এখুন হাড়সার খাওয়া ফসল খেয়ে ওদের মন হাড়ের চেয়েও শক্ত হয়ে গিয়েচে। ওদের মনে দয়া-মায়া বস্তুটাই নাই। তাছাড়া ভিখ দেওয়ার সময় ওরা মুষ্ঠি ভরা চালটাও দিতে চায় না। ভিখ না পেলে আমার তো চলবেনি। তাই হররোজ গাঁ ছেড়ে পালাই! কাজ-কম্মো সেরে আবার গাঁয়ে ফিরি। আমার যে টিকি বাঁধা আচে এই গাঁয়ে!

রাতে জাউভাত রেঁধেছে দুর্গামণি। বৃষ্টির পরে তার মেজাজটাও বেশ ফুরফুরে। রঘুনাথকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে, সে জিজ্ঞাসা করল, নিদ লাগচে বুঝি? ভোক লাগলে বল—ভাত বেড়ে দিই।

রঘুনাথ ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, দাদু মনে হয় শুয়ে পড়েচে।

—শুতে দে। দিনভর আরাম পায় না মানুষটা। দুর্গামণির গলা নরম হয়ে এল, দুলাল কাল চলে যাবে। এদিকে আবার ইন্দুমণির জ্বর এয়েচে। দেখ দেকি কেমুন বেপদ! আর ভালো লাগে না।

—কাকা কেনে মুনিষ খাটতে চায় না? রঘুনাথের হঠাৎ প্রশ্নে ঠোঁট ওল্টাল দুর্গামণি, বুক ভরানো শ্বাস ছেড়ে ছেলের মুখের দিকে তাকাল, সবার ভাগ্য সমান হয় না বাপ। কারো কারোর ভাগ্য ভুষো ছাই দিয়ে ওপরওয়ালা লিখে দেয়।

—কাকা কেনে খাটতে যায় না আমি জানি।

—কী জানিস? দুর্গামণির চোখ শক্ত হয়ে উঠল।

রঘুনাথ অকপটে বলল, কাকার স্বভাব ভালো নয়। গাঁয়ের মানুষ কাকাকে লিয়ে অনেক কথা বলে। কাকা চোর। আমার কচিয়াদাদুও চোর।

—চুপ। যা বলেচিস, আর বলবি নে। দুর্গামণি জ্বলে উঠল, ওরা তুর গুরুজন। ওদের লিয়ে কু-ভাবতে নেই।

—কু' কাজ করলে কু-ভাবব না?

—না। তুই ছোট, ছোটর মতুন থাক।

—আমিও তো একদিন বড়ো হবো। তখুন—?

—তখুন কি? চুলায় শুকনো তুষ ছড়িয়ে দিয়ে দুর্গামণি অঙ্গার চোখে রঘুনাথকে দেখল।

রঘুনাথ মায়ের চোখে চোখ ফেলে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, কাকা আর কচিয়াদাদুর মতন আমিও রেতেরবেলায় মুনিষ খাটতে যাবো। রাতেরমুনিষ হলে আমাকে আর বাবার মতন গাঁ-ছাড়া হতে হবেনি।

দুর্গামণির সারা শরীর কেঁপে উঠল রঘুনাথের কথা শুনে, ওসব কথা মনে আনাও পাপ। যা নাক-কান মুল। এই আমার মাথায় হাত রেখে বল—আর কুনোদিন এসব কথা মনে আনবি নে। তুই যদি এসব কথা ভাবিস—তাহলি আমার মরণ হবে বলে দিলাম। কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

রাতভর ঘুমাতে পারল না রঘুনাথ, ঘুরে-ফিরে মায়ের কথাই ভাবছিল সে। তাদের সংসারে অভাব আছে কিন্তু সেই অভাবের কাছে এখনও মাথা বিক্রি করে দেয়নি দুর্গামণি। সে বিপথগামী হবে না, এটাই তার শপথ।

রঘুনাথের মনে পড়ল অনেকদিন আগের একটা ঘটনা। দাদুর সঙ্গে ছাতু তুলতে গিয়েছিল সে বামুনবাড়ির জঙ্গলে। এই এলাকার বালি ছাতু বেশ বিখ্যাত। বর্ষার শুরুতেই শুরু হয়ে যায় ছাতু ফোটা। ছোট ছোট ছাতুগুলো বর্ষার জল পেয়ে বনফুলের মতো মেলে ধরে নিজেদের। অসংখ্য ছাতু যেন ঘাস ফুলের মতো জাহির করে নিজেদের। বামুনবাড়ির কর্তা নীলাক্ষবাবু এইগুলোকে নজরে রাখেন, কাউকে হাত লাগাতে দেন না। চাইলেও একটা ছাতু কাউকে তিনি দেবেন না। নিজের সম্পত্তির উপর তাঁর টান বরাবরের। চুনারাম এসব তথ্য জানত। রঘুনাথকে নিয়ে সে তাই বেরিয়ে গিয়েছিল ভোর-ভোর। আলো ফুটলে মানুষজনের সমাগম বাড়বে। ছাতু তুলতে দেখলে সেই খবর পৌঁছে যাবে বাবুর কানে। বাবু রাগারাগি এবং গালমন্দ করবেন। সেরকম হলে পাকমোড়া দিয়ে কেড়ে নেবেন বেতপালি। তখন সব শ্রমই পণ্ডশ্রম।

প্রাণভরে ছাতু তুলে ঘরে ফিরে এসেছিল চুনারাম। ছাতু তোলার গল্প গর্বভরে শুনিয়ে দিল দুর্গামণিকে। রঘুনাথ ভেবেছিল দাদুর কথা শুনে খুশি হবে দুর্গামণি। কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। সব শোনার পরে রাগে ঝাঁ-ঝাঁ করছিল দুর্গামণির মাথা, ছিঃ, একাজ তো মানুষের কাজ হয়নি। পরের বেড় থেকে ছাতু তুলে আনায় কুনো বাহাদুরী নেই। বাবু যদি দেখতি পেত তাহলি লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যেত।

রঘুনাথ অতিরিক্ত উৎসাহ নিয়ে বলেছিল, বাবু দেখবে কি করে? আমরা যে আলো না ফুটতেই ঘর থিকে বেরিয়ে গিয়েচি।

—কাজটা ভালো করিস নি বাপ। দুর্গামণির কণ্ঠস্বরে হতাশা ঝনঝনিয়ে উঠল, পরের জিনিস না বলে নিলে চুরি করা হয়।

—তাহলে আমরা চোর?

—হ্যাঁ, চোরই তো। দুর্গামণির গলা কঠিন হয়ে উঠল। এরপরে রঘুনাথের আর কথা বলার সাহস হয়ে উঠল না। বউমার রকমসকম দেখে চুনারাম আর কথা বাড়ায়নি। সুড়সুড় করে চলে গিয়েছিল তক্তাপোষের কাছে। দাওয়ার একধারে তক্তাপোষটা সব সময় পড়ে থাকে। চুনারামের ওটাই বিশ্রাম করার জায়গা। বসে পা দোলাচ্ছিল সে। দুর্গামনির কথা ভাবছিল সে। গরিবঘরের মেয়েটার সাহস আছে। অভাবে সে ভেঙে পড়ে না। অন্যায়ের কাছে নিজেকে সে বিকিয়ে দিতে শেখেনি। ধাওড়াপাড়ায় এমন বউ কটা ঘরে আছে? চুনারাম বিড়ি ধরিয়ে আয়েশ করে ধোঁয়া উড়িয়ে দিল

বাতাসে। বউমার জন্য গর্ব হল তার। এ মেয়েই পারবে গুয়ারামকে পথে আনতে। এর হাতে সংসারের রাশ থাকলে সে সংসার খাদে তলিয়ে যাবে না।

দুর্গামণির মুখটাই ঘুমাতে দিচ্ছিল না রঘুনাথকে। সে উঠে গিয়ে চুনারামের বিছানার পাশ থেকে বিড়ির ডিবা আর দেশলাই নিয়ে এল। বিড়ি খেলে ধোঁয়ায় যদি মনটা খোলসা হয়। সাবধানে বিড়ি ধরিয়ে ফুঁসফুঁস করে টানল রঘুনাথ। তবু মন থেকে তার ভয় গেল না। এ পাড়ার সব ছেলেরাই গুরুজনদের সামনে বিড়ি ফোঁকে। এটাই রেওয়াজ। দুর্গামণি রঘুনাথকে সেই সহজ পথে চলতে দেয়নি। চোখ রাঙিয়ে বারবার শাসন করেছে সে, খবরদার কুনোদিন ওসব ছুঁয়ে দেখবি না। যদি কুনোদিন তোকে নেশা করতে দেখেচি সেদিন চ্যালাকাঠ দিয়ে মেরে তুর মাথা ফেটিয়ে দেব।

—রতন, ড্যাবরা যে খায়?

—ওরা গু খায় বলে তুই-ও খাবি? দুর্গামণির জবাবের কাছে মাথা ঝুঁকে গেল রঘুনাথের। সেই থেকে একটা ভয় এবং শ্রদ্ধা তার মনের ভেতর বাসা বাঁধল। মাকে সে কোনো কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারে না। দুর্গামণি প্রায়ই তাকে বলে, শুধু ঘাড়ে-গর্দানে বড়ো হলে মানুষ বড়ো হয় না। মানুষকে বড়ো হতে গেলে বড়ো কাজ করে দেখাতে হয়।

বড়ো কাজ মানে দশের কাজ, সমাজের কাজ। রঘুনাথ ভাবে। এসব কাজে হিম্মত দরকার। চড়াইপাখির মতো বুক নিয়ে এসব কাজ হয় না।

বিড়িটা নিভিয়ে উঠোনে ফেলে দিল রঘুনাথ। পুরো মুখটা তেতো হয়ে গিয়েছে। গলাটা শুকোচ্ছে বারবার। মনটা ছটফট করছে কী জন্য সে ঠিক বুঝতে পারে না। সন্ধের পর থেকে জোর বৃষ্টি হয়েছে। পথের ধুলো এখন কাদা। মাটি থেকে অদ্ভুত একটা সুগন্ধ উঠে আসছে বাতাসে। খরার বাতাস আজ বড়ো অহঙ্কারী। এই শান্ত পরিবেশটা ভালো লাগছিল রঘুনাথের। শীত-শীত আমেজ ছড়িয়ে রয়েছে সাবধানে। বৃষ্টির সময় বুড়িগাঙের জলে খৈ-ফোটার মতো চড়বড় চড়বড় শব্দ হয়। জলের বিন্দুগুলো ভেঙে কাচের মতোন ছড়িয়ে যায় জলের উপর। সামান্য ঢেউ দিলে সেই দৃশ্য অপার্থিব।

রঘুনাথ ভাবল কাকার সঙ্গে তার একবার দেখা করার দরকার। লুলারামের প্রস্তাবটা মনে ধরার মতো। রাতের কাজটা ঠিকঠাক শিখে নিতে পারলে তখন শুধু টাকাই টাকা। গুয়ারাম রগড় করে বলে, টাকা নয় তো যেন চাঁদির জুতা। চাঁদির জুতায় কাঠেরপুতুল হাঁ-করে। বুবায় কতা বলে। মরা মানুষ পিটপিটিয়ে তাকায়।

রঘুনাথের টাকার ভীষণ দরকার। গুয়ারামের ঘর ছেড়ে যাওয়াটা তার মনোপূতঃ হয়নি। পেটের দায়ে মানুষ কেন জন্মভিটা ছাড়বে? মাটি ছেড়ে গেলে মানুষের আর থাকে কি?

লুলারামের বেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে কী ভেবে আগড় থেকে হাত সরিয়ে নিল রঘুনাথ। তার মন বলল, যাসনে রঘু, উখানে যাস নে। পাপের পুকায় কেমড়লে তার বিষজ্বালা বড়ো ভয়ঙ্কর। তুই সইতে পারবি নে, জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবি। তারচে ঘুরোন যা, ঘর যা। লুভের পথ, পাপের পথ তুর নয়।

কী ভেবে অন্ধকার বেড়ার ধার থেকে মাথা নিচু করে এল ফিরে রঘুনাথ। বাঁধের উপর উঠে এসে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। রাতেরবেলায় বাঁধের ধার শান্ত, একেবারে শুনশান। এসময় আকাশ থেকে দেবতারা নেমে এসে বুঝি হাওয়া খায়। বুড়িগাঙের জলে গা ধুয়ে আবার চলে যায় স্বর্গে।

এখন কদমগাছের পাতা নড়ছিল জলো হাওয়ায়। মুখ থ্যাবড়া পেঁচাটার মনে সুখ নেই। ইঁদুরগুলো আজ সব কোথায় পালাল? বসে বসে ঘাড় ঘুরাল পেঁচাটা। যেন ঘাড় নয়—পুরো শরীরটা তার

ঘুরে গেল। এ সময় বুড়িগাঙের জলে কপাত করে ঘাই দিয়ে উঠল মাছ। দূরে কোথাও ক্র্যাও-ক্র্যাও শব্দে ডেকে উঠল রাতপাখির দল। এক-যোগে প্রহর ঘোষণা করে ভেসে এল শেয়ালের চিৎকার।

রঘুনাথ আকাশের দিকে তাকাল। ফিকে জ্যোৎস্না চুইয়ে নামছে পৃথিবীতে। অমাবস্যা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। হয়ত ভোরের দিকে আরও ঝকঝকে দেখাবে চারপাশ। কী ভেবে বাঁধের ঢালু পথ বেয়ে মাঠের দিকে একা একা নেবে গেল রঘুনাথ। তার হাতে লাঠি বা কোনো আলো নেই। সাহেবমাঠের আল সব সময় বিপজ্জনক। ওখানে শামুকভাঙা খরিস সাপের বসবাস। ওরা মাঠেই শঙ্খ লাগে, ডিম পাড়ে, বাচ্চা ফোটায়। ঘাস কাটতে গিয়ে দুপুরবেলায় রঘুনাথ অনেকগুলো খরিসের ছাকে দেখেছিল চরতে। ভয় যে লাগেনি তা নয়। তবে ওদের সে মারেনি। দুর্গামণি খরিসের ছাগুলোকে ড্যাকা বলে। ড্যাকা ওদের চলতি নাম। হাঁটতে হাঁটতে রঘুনাথের ঠোঁটে এক চিলতে হাসি চলকে উঠল। এই মাঠে কমলার সঙ্গে তার কতবার দেখা হয়েছে। যতবারই চোখাচোখি হয়েছে ততবারই চোখ নামিয়ে ভীতু খরগোসের মতো দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছে কমলা। ওর নরম চোখের তারায় ধরা পড়ে যাওয়ার কাঁপুনি। এই কাঁপুনিটা রঘুনাথের বুকের ভেতরে পুরুষমথের মতো ফড়ফড় করে। এই ফড়ফড়ানীর অন্য নাম কষ্ট। সূর্যাক্ষ বলে, কষ্ট নয়রে, ভালোবাসা।

ভালোবাসা কি রঘুনাথ এখনও জানে না। তবে কমলার সঙ্গে তার যেদিন দেখা হবে সে রাতে সে স্বপ্ন দেখবেই দেখবে। ঘুম ভেঙে গেলে সারারাত তার আর ঘুম আসে না। আখখেতের আলের কচি-কচি ঘাস মাড়িয়ে কমলার দৌড়ে যাওয়ার দৃশ্যটা তার মনের ভেতর বায়োস্কোপের ছবির মতো দুলতে থাকে। চোখ বুজে ভাবলে কী আনন্দ, মনটা কদমফুলের মতো ফুটে ওঠে, মৃদু চাপা একটা সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয় বিছানায়।

আজ সেসব কোনো অনুভব রঘুনাথকে ভাবায় না। সে ভাবছে একটাই কথা। সে কোন দিকে যাবে? চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। ধরা পড়লে? মার, অপমান, থানা-পুলিশ কিংবা জেল-হাজত। সে ধরা পড়বে কেন? গুরুবিদ্যা কোনোদিন কি বিফলে যায়? কাকার কাছে কাজ শিখবে সে। কাকা-ই হবে তার ওস্তাদ, গুরু। রঘুনাথ ভেতরে-ভেতরে তাতছিল। দুর্গামণির মুখটা মনে পড়তেই তার উথলে ওঠা আবেগে কে যেন ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিল। আলের উপর পা থেবড়ে বসে পড়ল সে। আবার দোলাচালের দোলনার মতো দুলতে লাগল মনটার। বাঁধের উপর দৌড়ঝাঁপ খেলা পাড়ার কুকুরগুলোর চিৎকার ভেসে এল, রোজ ওরা এসময় পাগল হয়ে যায় কেন? এটা কি কুকুরের স্বভাব? এভাবে চিৎকারে পাড়া মাথায় তোলার কোনো কি কারণ আছে, নাকি এই প্রহর পেরনো সময়ে তারা কী বিশেষ কাউকে দেখতে পায়? রঘুনাথ নিশ্চিত হল যে রাতের সময়টুকু সবার জন্য ভাগ-বাটোয়ারা করা থাকে। চোর কোন সময়টাকে পছন্দ করে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করার জন্য? লুলারামকে একথা অবশ্যই সে জিজ্ঞাসা করবে। সব কাজেরই একটা নিয়ম-নীতি-নিষ্ঠা থাকার প্রয়োজন। এসব যখন রঘুনাথ ভাবছিল তখন বাঁধের উপর দিয়ে চলন্ত একটা আলোক উৎসকে দূর থেকে দেখতে পেল। আলোটা কিসের সেটা অনুমান করার জন্য সে ঘাড় সোজা করে বাঁধের দিকে তাকাল। তখনই তার কানে এল শেষযাত্রার ধ্বনি। বল হরি হরি বোল। কাদের আবার শূন্য

হল সংসার? কার আবার পুড়ল কপাল? শ্মাশানঘাটে যাওয়ার রাস্তাটা বাঁধ ধরে গিয়ে মানিকডিহির গাঁয়ে ঢোকার ঢালুপথ পেরিয়ে আরও অনেকটা। হ্যাজাকের আলো পায়ের গতির সঙ্গে দুলছে। সরে সরে যাচ্ছে জমকালো আলো। রঘুনাথ অনুমান করল হ্যাজাক নিয়ে শ্মশানে যাওয়ার মানে মৃতর বাড়ির অবস্থা মন্দ নয়। আলোটা বেশ কিছুক্ষণ পরে দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই একরাশ বিষাদ-দুঃখ এসে গ্রাস করল রঘুনাথকে। অথচ সে বুঝতে পারল না তার এত কিসের দুঃখ।

রাত বয়স্ক হতে থাকে, মাথার উপর উড়ন্ত রাতপাখির ডাকে রঘুনাথের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়। ঘরে ফেরার তাগিদটা এবার তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এত বড়ো একটা রাত দু-চোখের পাতা এক না করে ফুরিয়ে যাবে ভাবা যায় না। দুর্গামণি বলে, রাত উজগারা ভালো নয়। রাত শুধু ঘুম খায় না, খুনও খায়।

দু-হাতে ভর দিয়ে রঘুনাথ উঠে দাঁড়াতে চাইলে একটা ফিসফিস কথা তার কানের গহ্বরে সিঁধিয়ে যায়। এত রাতে কে কথা বলছে অমন চাপা গলায়? কণ্ঠস্বরটা চেনা মনে হচ্ছে, তবু সঠিক যেন চিনতে পারছে না সে। আগ্রহ আর বিস্ময়বোধে রঘুনাথ টানটান হয়ে বসে থাকল ঘাসের আসনে।

ঘন আখগাছের ভেতরে সম্ভবত দুজন মানুষ কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। এরা কি কথা বলার জন্য আর জায়গা খুঁজে পেল না। আশ্চর্য! রঘুনাথ শুনল একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর উদ্বিগ্ন গলায় বলছে, এ হতে পারে না লুলাভাই। সব বিদ্যার চর্চা দরকার। চর্চা না থাকলে জং ধরবে। আর জং ধরলে কমে যাবে বিদ্যার ধার। তখন এই বয়সে ভেলকি হারিয়ে চোখ হবে সাধারণ হাটুরের মতোন। আমি চাই-হপ্তায় অন্তত দুটা করে কাণ্ড হোক।

—সে তো হবে কিন্তু—। লুলারাম কী বলতে গিয়ে থামল, রোজ রাতে পুলিশ আসে আমার ঘরে। পাকুড়তলায় থানার গাড়িটা থামিয়ে তারা আমার কপাটে লাথ মারে। খিস্তি দেয়। এসব শুনে আমার মেয়েদুটো ভয়ে কাঁপে। তারা কান্নাকাটি করে। আমার আর ভালো লাগে না।

—ভালো না লাগলে চলবে? হাবুলচোর ঝুঁকে পড়ল, বসে খেলে সাগরও শুকিয়ে যায়। মানো তো কথাটা? নাকি মানো না? যাই হোক আমি বলছিলাম কি পুলিশও থাকবে, আবার চোরও থাকবে। এটা সংসারের নিয়ম। হাবুলচোর বড়ো করে শ্বাস টেনে নিল বুকের ভেতর, সেই শ্বাস শরীরে চালান করে লুলারামের মুখের দিকে সংশয় ভরা চোখে তাকাল, মরা পোড়ানো কি একা হয় গো, এরজন্য দল দরকার। বিদেশ-বিভুঁয়ে চুরির কাজে গেলে মানুষের খুব দরকার হয়। হাতে হাত না মিলিয়ে কাজ করলে খুব বিপদ। ধরা পড়ে গেলে ছাল ছাড়িয়ে ডুগডুগি বাজাবে। তবে তুমি থাকলে আমার কুনো চিন্তা থাকে না। তখন রাতকে ধমকাতে মন চায়।

অনেকক্ষণ চুপ করে গেল লুলারাম, একটা বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে, কাজ করতে তো মন চায় হাবুলদা কিন্তুক পেরে উঠি না। ছাতিটা আর আগের মতোন দঢ়ো নেই। বয়স হচ্চে তো—

—এ তুমার ভুল ধারণা লুলাভাই।

—ভুল নয় গো, সত্যিকথা। মনে ভয় ঢুকেচে। ভয় হল গিয়ে উইপুকা। কখুন কুরে কুরে খেয়ে লিবে তুমাকে—টেরও পাবে না। লুলারাম ঘাড়-গর্দান টানটান করল। সামনে সরে এসে হাবুলচোর খপ করে হাত দুটো জড়িয়ে ধরল লুলারামের, ভাই, যে কতা বলচিলাম। মেয়েটার বিয়ে ঠিক হয়েচে। পাত্রপক্ষের দাবি-দাওয়া আচে। টাকার তো দরকার। কাজে না গেলে টাকা আসবে কুথা থেকে। টাকা তো আকাশ থিকে বৃষ্টির মতোন ঝরবেনি।

—তাহলে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেচো? তা কি নাম যেন তুমার মেয়ের?

—পারুল। হাবুলচোর কাশল, কন্যাদায় মহা দায়।

—বুঝলাম। তাহলে কী করতে চাও এখন? লুলারামের কথায় যেন প্রাণ ফিরে এল হাবুলচোরের,

আমি ভাবছিলাম গাঙ পেরিয়ে নয়াগ্রামের দিকে গেলে কেমুন হয়? ওদিকটায় কারোর হাত লাগেনি। আমি খোঁজখবর লিয়ে দেকেছি—মন্মথ মাস্টারের বাড়িটা সব দিক দিয়ে ভালো। ভালো মালকড়িও পাওয়া যাবে। মা শীতলাবুড়ির কেপা হলে বড়োপুজা অব্দি আরামে চলে যাবে।

—সে তো বুঝলাম। কিন্তুক অতো লৌকো কুথায় পাবে?

—সে সব আমি ঠিক করে রেখেচি।

কপালে ভাঁজ ফেলে লুলারাম বলল, আরও ভালো করে খোঁজখপর নাও। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। সামনের মাসের অমাবস্যায় কাজ হয়ে যাবে।

—মাঝে কি তুমার ঘরে একবার আসব?

—আসতে পারো, তবে দিনের বেলায় ভুল করেও এসো না। গাঁয়ের সব মানুষ তুমাকে চেনে, তুমি কি করো সব জানে। লুলারাম সাবধান করার গলায় বলল।

হাবুলচোর কথা মিটে যাওয়ার পর তার কাপড়ের ঝোলা থেকে বের করে আনল দেশি মদের বোতল, কাঁচের গ্লাস, আর ডালমুট, লুলাভাই, তুমার জন্য এনেচি। লোকাল ভাটির মাল নয়, খাস বেথুয়ার জিনিস।

দুটো গ্লাসে মদ ঢালল হাবুলচোর, একটা গ্লাস লুলারামের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এখন আর দেশী খেয়ে জুত পাই না। সব ভেজাল। কী খাবো বল তো? গাঁ-গঞ্জে জুচ্চোর ভরে গিয়েচে।

লুলারাম খোলা পানীয়ে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, মদ খাওয়ার সময় অতো কতা বলো না। নেশা জমতেও ধ্যানের দরকার।

হাবুলচোর মুখ দিয়ে দোষ-স্বীকার করার শব্দ করল, তা যা বলেচো। লাখ কথার এক কথা।

ওদের নেশা জমে উঠতেই রঘুনাথ আর দাঁড়াল না। হাবুলচোরকে সে যে এর আগে দেখেনি তা নয়। একবার পণ্ডিত বিলে টানাজাল ফেলে মাছ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল সে। সেবার তাকে জামগাছে বেঁধে বেদম মারে গ্রামের লোক। পরে থানা থেকে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। প্রায় মাসের উপর লেগেছিল তার সুস্থ হতে। এত মার খেয়েও সে লুলারামের নাম ফাঁস করেনি। রঘুনাথ দেখেছে সেদিন বিলের রাস্তায় লুলারাম ঘোরাঘুরি করছিল বেশ ডাঁটের মাথায়। তার সতর্ক দৃষ্টি ছিল হাবুল চোরের চোখের উপর। দৃষ্টি দিয়ে দূর থেকে হাবুলচোরকে শাসন করছিল লুলারাম।

গুপ্তবিদ্যায় শাসন না থাকলে লাগামছাড়া হয়ে যায় ভাবনাচিন্তা। বাঁধের উপর এসে রঘুনাথ ভাবছিল — হাবুলচোরের মেয়ে পারুলের কথা। মেয়েটাকে সে দেখেছে। বেশ স্বাস্থ্যবতী, শ্যামলা। তবে ওর চোখ দুটো বেশ সুন্দর, কাজলটানা, পদ্মর পাপড়ির মতো। পারুলের চেহারায় একটা মাতৃমুখ ভেসে ওঠে। ওকে দেখে কোনো খারাপ চিন্তা মনে আসে না।

পারুলের ভাবনা যেন কমলার কথা মনে করিয়ে দেয় রঘুনাথকে। হপ্তাখানিক পেরিয়ে গেছে তবু ওর সাথে দেখা হয় নি। রঘুনাথ খবর নিয়ে জেনেছে—কমলা তার মামার বাড়ি গিয়েছিল। কুলবেড়িয়া হাঁটাপথ। ভ্যানরিকশার ঝামেলা নেই। কমলা যে ফিরেছে—এ খবর সে জানে। নোলকের সঙ্গে তার পাকুড়তলায় দেখা হয়েছিল। কী কথায় যেন নোলক বলে ফেলেছে কথাটা।

রঘুনাথ আর বাড়ির দিকে গেল না। কে যেন তাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেল কমলাদের ঘরের দিকে। আজ রাতে তার আর ঘুম আসবে না, আজকের রাত তার ঘুরে বেড়ানোর রাত।

চেনা পথ তবু আঁধারে হাঁটতে রঘুনাথের কেমন ভয় ভয় করে। ভয় তার সুফল ওঝার ছেলে কাশীনাথের জন্য। ছেলেটার বড্ড মাথা গরম। বারদুয়েক স্কুল ফাইনাল দিয়েও সে বেড়া ডিঙাতে পারল না। এখন ঘরে বসে টিউশন পড়ায়। বাপের ওঝা- গিরির ওপর তার আস্থা একেবারে নেই

বললেই চলে। সুফল ওঝা বলছিল, এই মাদুলি শরীলে ছুঁয়ে থাকলে সব পড়া তোর হড়হড়িয়ে মনে পড়ে যাবে। এই মাদুলির নাম—বিদ্যাদেবী সরস্বতী মাদুলি। বৃহস্পতিবারে তুই এটাকে ধারণ করবি। ধারণের দিন নিরামিষ খাবি।

নিষ্ঠাসহকারে ডান হাতের বাহুতে মাদুলিটা ধারণ করেছিল কাশীনাথ, কিন্তু কোনো কাজের কাজ হয়নি। পড়া মনে পড়া তো দূরের কথা, মুখস্থ পড়াও মনে পড়ছিল না ঠিকঠাক। ঘরে ফিরে এসে সুফল ওঝাকে রাগের মাথায় ধরিয়ে দিয়েছিল মাদুলি, এই নাও তোমার যন্ত্র। মগজে কিছু না থাকলে শুধু মাদুলি পরে কিছু হয় না। তোমার জন্য আমি স্কুল ফাইন্যাল পাশ করতে পারলাম না। তোমার এই মাদুলি আমার পড়ার ইচ্ছেটাকে নষ্ট করে দেয়। আমি যে মন নিয়ে পড়ছিলাম, সেই মনটাকে নষ্ট করে দিল তোমার এই মাদুলির চিন্তা। আমাকে দিয়ে তুমি যা করার করলে, খবরদার তুমি এ মাদুলি আর কাউকে দেবে না। আমার মতো আর কারোর সর্বনাশ হোক এ আমি চাইনে।

মুখ শুকিয়ে চুন ফুটেছিল সুফল ওঝার, দৃষ্টি নিষ্প্রভ। গলা কাঁপছিল উদ্বেগ দুঃশ্চিন্তায়। তবু ছেলের সামনে সে তার পেশাকে ছোট করতে পারে না। এতদিন ধরে লালন করা গর্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া কি সহজ? যে কোনো খেলায় জয়-পরাজয় থাকতেই পারে। তা বলে আত্মসমর্পণ কখনো উচিত নয়।

কাশীনাথ বদরাগী ছেলে। সে রঘুনাথের চাইতে বয়সে বড়ো হবে। সরাসরি কুস্তি লড়ে রঘুনাথ হয়তো তার সঙ্গে পারবে না। না পারলে পিছিয়ে সে আসবে না। কমলাকে সে মন দিয়েছে। একথা মিথ্যে নয়। মন দেওয়ার অর্থ নিজেকে অন্যের কাছে বন্ধক রাখা। মন এক জায়গায়, দেহ এক জায়গায়—এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। রঘুনাথ কঞ্চির আগোল সরিয়ে নিকোনো উঠোনে পা দিল। অমনি দাওয়ার শুয়ে থাকা কালো রঙের কুকুরটা ডাকতে ডাকতে ছুটে এল তার সামনে। রঘুনাথ ভয় পেল না। শরীর টানটান করে দাঁড়াল। চেনা মানুষ দেখে ডাক থেমে গেছে কুকুরের। পায়ের কাছে এসে সে লেজ নাড়ছিল আদর খাওয়ার জন্য। রঘুনাথ উবু হয়ে কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বেশ বোঝা গেল রাতচরা গোরুর মতো তার এই জায়গায় যাতায়াত আছে। ইঙ্গিতপূর্ণ তিন টোকায় দরজা খুলে পাটখেতের বুনো হাওয়ার মতো বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কমলা, যেন সে জানত রঘুনাথ আসবে, সে না এসে থাকতে পারে না। তবু অভিমানে কমলার ঠোঁট নড়ে উঠল, এত দেরি হল যে! যাও, ভালো লাগে না। তোমার জন্যি পথ দেখে-দেখে চোখ আমার শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে গেল।

নিজেকে সামলে নিয়ে চাপা গলায় রঘুনাথ শুধোল, কাশীদা কুথায়?

—সে তার ঘরে শুয়েচে। ঠোঁট উল্টাল কমলা। তারপর রঘুনাথকে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে সে খিল লাগিয়ে দিল সতর্কভাবে।

তক্তাপোষের উপর এলোমেলো হয়ে আছে বিছানা। সেই বিছানা যেন রঘুনাথকে আকর্ষণ করছিল। কমলা গরম নিঃশ্বাস ছেড়ে রঘুনাথের দিকে তাকাতেই ওরা দু-জনে দু-জনের উপর ভেঙে পড়ল।

একটা বালিশে দুটো মাথা একে অন্যের দিকে মুখ করে টানটান হয়ে শুয়ে আছে। কমলার বুকের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে রঘুনাথ ফিসফিসিয়ে বলল, মামার ঘরে এতদিন থাকতে পারলে? আমার জন্যি তুমার বুঝি মন কেমুন করে না?

—কে বলল? কমলা রঘুর খোলা বুকে ঠুসে ধরল ঠোঁট, তোমার চিন্তায় রাতে ঘুমাতে পারি না। আমার যে কি হল আমি তা নিজেই জানি না। এভাবে চললে তোমার কাকির মতো পাগল হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হবে। এত কষ্ট বুকে নিয়ে কি বাঁচা যায় গো...।

—তুমার এত কিসের কষ্ট?

—ও তুমি বুঝবে না। ছেলেদের প্রাণ সুপুরির চেয়েও শক্ত হয়। কমলার হাত রঘুনাথের বুকের উপর কিলবিল করে নড়ছে। একটা টানা উত্তেজনা রঘুনাথের পায়ের বুড়ো আঙুলের কাছে এসে থেমে যাচ্ছে। ঘনঘন শ্বাস পড়ছে রঘুনাথের। ভয়ে কাঠ- ব্যাঙের মতো ক্রমাগত লাফাচ্ছে তার বুকটা।

বুকে মুখ গুঁজে কমলা কাতর চোখে তাকাল, এ ভাবে আর পারা যাচ্ছে না, চলো কোথাও পালিয়ে যাই।

রঘুনাথ ফ্যালফ্যাল করে তাকাল, কুথায় যাবো বলদিনি?

—যেদিকে দু-চোখ যায়। কমলা সাহসী হয়ে উঠল।

—তুমার বাপ আমাকে বাণ চালিয়ে মেরে ফেলবে। তার মন্ত্রের বহু জোর। গাঁয়ের অনেক মানুষ তুমার বাপকে ভয় পায়। গলা কেঁপে গেল রঘুনাথের।

—তোমার ভেতর থেকে ভয় আর কোনোদিন গেল না। কমলা আশ্চর্য চোখে তাকাল, সেই প্রথম দিনের কথা তোমার মনে আছে। সেদিনও কাঁটা বের করতে গিয়ে তুমি ভয়ে কাঁপছিলে। তোমার এত ভয় কেন বলো তো?

রঘুনাথ কি জবাব দেবে খুঁজে পেল না। সে কমলার জ্যোৎস্নানরম মুখের দিকে তাকাল। তার মনে হল সে আকাশের চাঁদকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভেসে উঠছে তার শরীর।

সাঁঝবেলায় হাট থেকে ফেরার সময় কাঁটা ঢুকে গিয়েছিল কমলার পায়ে। হাঁটতে হাঁটতে ঝপ করে সে বসে পড়েছিল ধুলোয়। তার অস্ফুট আওয়াজে রঘুনাথ এগিয়ে গিয়েছিল সামনে, কী হয়েচে গো?

সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে কমলা বলেছিল, পায়ে কাঁটা ঢুকে গিয়েছে। কাঁটাটা ভেঙে গিয়েছে। আর বেরুচ্ছে না। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

—আমি কাঁটা বের করতে পারি। কথাগুলো বলে বোকার মতো তাকিয়ে ছিল রঘুনাথ, যদি বলো তো চেষ্টা করে দেখতে পারি।

সংশয়াচ্ছন্ন চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল কমলা, দেরি করো না। খুব ব্যথা হচ্ছে। যা করার তাড়াতাড়ি করো। আমাকে আবার অতটা পথ যেতে হবে।

রঘুনাথ অনুমতি পেয়ে বাজারের থলিটা নামিয়ে রেখেছিল রাস্তার একপাশে।

তারপর হন্তদন্ত হয়ে ভেঙে এনেছিল খেজুরগাছের কাঁটা। মুখের থুতু দিয়ে সে কমলার পায়ের তালু পরিষ্কার করে কাঁটা দিয়ে বের করে দিল কাঁটা। বেশ বড়ো ধরনের বাবলাকাঁটা। ভাঙা কাঁটাটা কমলার হাতে তুলে দিয়ে বলল, নড়ো না। আর এট্টু বসো। আমি হাড়মটমটির রস হাতে পিষে লাগিয়ে দিচ্ছি। অক্ত আর বেরবে না, বিদনাও কমে যাবে।

কমলা অবাক হয়ে সেদিন রঘুনাথকে দেখেছিল। খুব বেশি বয়সের ফারাক হবে না ওদের। বলা যেতে পারে প্রায়ই সমবয়েসী। এই বয়সের ছেলেরা মেয়েদের ছুঁতে ভয় পায়। কমলা সেদিনই টের পেয়েছিল রঘুনাথের শরীরের কাঁপুনি। সেই কাঁপুনিটা রঘুনাথ এখনও বুকের ভেতর বয়ে বেড়ায়। অথচ কমলা সেই কাঁপুনিটাকে থামিয়ে দিতে উদগ্রীব। রঘুনাথের হাতটা বুকে চেপে সে বলে, দেখো, আমি কেমন ঘামছি। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরো তো। আমার ঘামগুলো তুমি শুষে নাও। এই গরম আমি আর সহ্য করতে পারছি নে...।

রঘুনাথের বুকের উপর ভেঙে পড়ল কমলা, কাজলাদিঘির জলের মতো ছড়িয়ে গেল তার কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো মাথার চুল। কমলা উশখুশিয়ে উঠল। ওর সারা শরীর জুড়ে ঢেউ উঠছে, হঠাৎ আসা বন্যায় সে বুঝি ভেসে যাবে, হারিয়ে যাবে। তার ডাকে সাড়া দিতে পারে না রঘুনাথ, একটা অলঙ্ঘনীয় ভয় তার রক্তে পানকৌড়ি পাখির মতো ডুবসাঁতার কাটে, হারিয়ে যায় আবার ভেসে ওঠে, সাঁতরে অবলীলায় চলে যায় শরীরের একপাড় থেকে অন্যপাড়ে। কমলা ফুঁপিয়ে ওঠার আগে হকচকিয়ে তাকাল, কী হলো, ঠাকুর দেখার মতো কি দেখছো আমাকে! তোমার কি কোনো কথা নেই, ভাষা নেই।

রঘুনাথ গাছের মতো স্তব্ধ চোখে তাকাল, ইবার আমাকে ফিরতে হবেখন। রাত ফুরিয়ে আসচে। মনে হয় পোকরাতারা ফুটে উঠেচে আকাশে।

কমলা বিরক্তিতে ভ্রূ-কুঁচকে বলল, এত কষ্ট করে তোমার আসার কি দরকার ছিল বুঝি না। ঝুঁকি যখন নিয়েছো তখন আর একটু ঝুঁকি নিলেই পারতে।

রঘুনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি চাইনে আমার ভুলের জন্য তুমি জীবনভর কাঁদো। তুমাকে দেওয়ার মতো আমার কাচে কিচু নেই।

এবার ফুঁসে উঠল কমলা, ঢং করো না। তোমার কি আছে—তুমি কি তা জানো? কোনো মানুষই জানে না তার আসল শক্তির কথা।

রঘুনাথ ঘাড় নাড়ল, আমি জানি-তুমার ভেতরে কী শক্তি আচে। মেয়েমানুষের ভেতরে নদী থাকে, বন থাকে। তারা মাঠের ঘাস। রাগ নেই, দুঃখ নেই।

একথা শুনে কমলার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এল। ছাড়া চুল খোঁপা করে নিয়ে সে সবিস্ময়ে নিজের দিকে তাকাল, আমার অনেক ভাগ্য যে তোমার মতো ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সবাই যেরকম হয়—তুমি সেরকম নও। তুমি আলাদা।

রঘুনাথ প্রতিক্রিয়াহীন। সে শুধু মুচকি হেসে বলল, আমার মা বলে সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। নাহলে সম্পর্ক পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছাড়ে। তুমার আমার মেলামেশাটা পচা সুতোর বাঁধন নয় যে হুট করে তা ছিঁড়ে যাবে।

—তোমার কি আমার কাছে কিছু চাওয়ার নেই? কমলার সকৌতুক প্রশ্ন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে রঘুনাথ বলল, চাওয়ার কি আচে? না চাইতে তুমি আমাকে সব দিয়েচো। আমার এখন শুধু একটাই চাওয়া। সারাজীবন আমি যেন তুমার মুখের হাসিটুকু দেখতে পাই—।

কমলা ফোটা পদ্মের মতো অপেক্ষায় ছিল ভ্রমরের গুঞ্জন শোনার জন্য। রঘুনাথ সমর্পণের গলায় বলল, ডুবে যাওয়া সহজ কিন্তু ভেসে থাকা কঠিন। আমি সদা সর্বদা তুমার মনে ভেসে থাকতে চাই।

রঘুনাথ জানে কমলার সঙ্গে তার এই সম্পর্ক এ সমাজ কোনোদিনও মেনে নেবে না। এই সম্পর্ক পরিণতির দিকে এগোলে ঝড় উঠবে। এলোমেলো হয়ে যাবে তাদের সংসার। মাটি হারা হয়ে বাঁচতে হবে তাদের। পালিয়ে বাঁচার মধ্যে সুখ কোথায়? তাছাড়া কমলার যদি মোহভঙ্গ হয় তখন? কাঁচা বয়সের ভালোবাসার রঙ পাকা হলেও সেই রঙের স্থায়ীত্ব কলার কষের মতো গাঢ় বা দীর্ঘস্থায়ী নয়। রঘুনাথের বুকের ভেতর তাই ভয়ের উইঢিপিটা একটু একটু করে বাড়ছে।

বারোয়ারিতলার রামযাত্রার আসরে কমলাকে পাঁপড় কিনে দিয়েছিল রঘুনাথ। কাশীনাথ এটাকে ভালো নজরে দেখেনি। রঘুনাথকে বাঁধের ধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধমকেছে, বামুন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়াতে যাস নে। হাত ভেঙে দেব।

—কী যা তা বলচো! রঘুনাথের গলায় ফ্যাসফেসে শব্দ উঠল।

—যা তা নয়, ঠিক বলছি। বাবার কানে কথাটা তুলে দিলে তুই কি ধাওড়াপাড়ায় টিকতে পারবি? কাশীনাথের তিক্তস্বরে বিষ ঝরে পড়ল। এখনও সময় আছে, সাবধান হয়ে যা। বেশি বাড়লে ব্যাঙের ছাতার মতো ফুটুরডুম হয়ে যাবি।

সেদিন কাশীনাথের চোখে জ্বলন্ত আঁচ দেখেছিল রঘুনাথ। সামান্য হলেও ভয় পেয়েছিল সে। সে জানে কাশীনাথের একটা দল আছে গ্রামের মধ্যে। সে দলের সব সদস্যই তার বয়সী। ওদের মাথা গরম, টেম্পার বেশি। ছোট-বড় জ্ঞান ওদের খুব কম। রঘুনাথ ইচ্ছে করেই আর কথা বাড়ায়নি। সে জানত এখানে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ হবে না। সমাজের স্তরগুলো একদিনে ভাঙবে না। ওগুলো ভাঙার জন্য কপোতাক্ষর মতো বেশ কিছু মানুষের দরকার। সূর্যাক্ষর মতো উদার মন না হলে বুড়িগাঙের জলও একদিন সমাজ-সংস্কারের ধুয়োয় কালো হয়ে যাবে।

রামযাত্রার শেষে কমলা রঘুনাথকে খুঁজছিল। কাশীনাথ তার চঞ্চল চোখের তারাকে এক জায়গায় থামিয়ে দিল কথার বাণে, তুই যাকে খুঁজছিস তাকে আমি লাথি মেরে ভাগিয়ে দিয়েছি। ছিঃ কমলা, তোর এতটা নীচে নামা উচিত হয়নি। মনে রাখিস—তুই সুফল ওঝার মেয়ে। তোর বাবার সুনাম দশ গাঁয়ে। তুই যদি ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসিস তাহলে আমাদের আর মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না।

—তুই অকারণে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে ভাবছিস দাদা। কমলার টলটলে চোখে পাপের কোনো স্পর্শ ছিল না, রঘু আমাদের গাঁয়ের ছেলে। ও আমাকে একটা পাঁপড় কিনে দিয়েছে—এতে দোষ কোথায়? ওর সরলতাকে কু-নজরে দেখা উচিত নয়।

—তুই বড়ো হয়েছিস—একথাটা মাথায় রাখিস। কাশীনাথ ভেঙে পড়ল না, রুখে দাঁড়াল, লোক যাতে আঙুল তুলে কিছু না বলতে পারে সেইজন্য তোকে আগে-ভাগে নিষেধ করলাম। মানুষ যখন ভুল করে, সেই ভুলটা সে নিজে ধরতে পারে না। অন্যকে ধরিয়ে দিতে হয়।

—রঘুনাথের উপর তোর কি আগে থেকে কোনো রাগ ছিল?

কাশীনাথ শরীর ঝাঁকিয়ে কুলকুল করে হেসে উঠল, রাগ? ওর উপর রাগ করার আমার সময় কোথায়? ওর সাথে তুই আমাকে গুলিয়ে ফেলেছিস কেন? ও কোথায়,আর আমি কোথায়!

ঠোঁট কামড়ে অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠল কমলা, কে যে কোথায় তা যদি সে নিজে বুঝতে পারত তাহলে তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

—একটা বুনোপাড়ার ছেলের জন্য ওকালতি করে তুই আমাকে ছোট করছিস?

—ছোট তুই অনেক আগেই হয়ে গেছিস। রঘুনাথকে শাসিয়েছিস—সেটা খুব বড়ো মাপের বাহাদুরির কাজ নয়। কমলার স্ফুরিত ঠোঁট ঘৃণায় বেঁকেচুরে গেল। কাশীনাথ সেই রক্তবর্ণ চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না। কমলা এত শক্তি পেল কোথা থেকে? সে শুনেছে প্রেমে পড়লে মানুষ বড়ো একরোখা হয়ে যায়। তখন বর্ষার নদীকে তার মনে হয় মামুলি ডোবা। জলোচ্ছ্বাসকে মনে হয় জলের ছিটে। তাহলে কি কমলা ইতিমধ্যে মন দিয়ে ফেলেছে বুনোপাড়ার রঘুনাথকে। ব্যাপারটা বেশ জটিল এবং উদ্বেগপূর্ণ। এর একটা স্থায়ী সমাধান দরকার। কমলার ঘোরাফেরা, হাবভাব মেলামেশার উপর নজর রাখা দরকার। সুফল ওঝা ঘরে থাকে না। প্রায়ই এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে দৌড়াতে হয় তাকে। তার অবর্তমানে ছেলে হিসাবে কাশীনাথের দায়িত্ব কম নেই। দায়িত্ব এড়িয়ে থাকা যে ভীষণ কঠিন।

কমলাকে ছেড়ে আসতে ভীষণ কষ্ট হয় রঘুনাথের।

আসার সময় কমলাও কেমন ম্লান বিধুর দৃষ্টিতে তাকায়। অনেক কিছু তার বলার থাকে, সে মুখ ফুটিযে বলতে পারে না। সময় তখন ঘোড়ার মতো লাফায়। গুছিয়ে রাখা কথাগুলো সব ছেঁড়া মালার ফুলের মতো এলোমেলো হয়ে পড়ে। অন্য কোনো প্রসঙ্গ এসে গিলে নেয় নির্দিষ্ট সময়।

ইদানীং কলাবতীর পাশে ইচ্ছে করে ঘুমায় না কমলা। অজুহাত দেখিয়ে বলে, অনেক রাতঅবধি আমি রেডিও শুনি। রেডিওর নাটকগুলো কী যে ভালো একবার শুনতে শুরু করলে শেষ না শুনে ছাড়া যায় না। আমি রেডিও শুনলে তোমার ঘুম চটকে যাবে মা। তোমাকে তো ভোরে উঠতে হয়। তোমার কষ্ট হবে।

রঘুনাথ আসবে তাই মিথ্যে কথার জাল বোনে কমলা। ওর জন্য রাত জাগতে কোনো কষ্ট হয় না তার। জানলা খুলে নেশাগ্রস্তের মতো ঠায় বসে থাকে সে। দৃষ্টি নিবদ্ধ ধুলো পথের দিকে। তাঁতশালের মাকুর মতো রঘুনাথেরও আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে সে বুঝতে পারে না। সে জানে—চোরের দশ দিন তো মালিকের একদিন। সেদিনটাতে যে কী হবে শিউরে ওঠে রঘুনাথ। কমলা তাকে সাহস জুগায়, ভয় পেও না। আমি তো আছি। পৃথিবীর সবাই একদিকে গেলেও আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না। তাতে আমার যা হবার হোক। যে নিজের কাছে সাচ্চা, সে কেন অন্যকে ভয় পাবে।

কমলার ভালোবাসা ফুল ছুঁয়ে দেওয়ার মতো সুন্দর।

রঘুনাথ ওর ভালোবাসাকে ছুঁতে পারে, বুঝতে পারে। কমলা দল বেঁধে নাইতে আসে বুড়িগাঙে খরাবেলায়। কখনও সে চলে আসে পাকুড়তলার কলটাতে জল নিতে। এগুলো সব অজুহাত। যদি একবার রঘুনাথের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায় এই আশায়। আশা যে সবদিন পূরণ হয় তা নয়।

রঘুনাথের ঘাস ফড়িংয়ের স্বভাব। সে এক জায়গায় স্থিতু হতে জানে না। ইদানীং ওর বামুনপাড়ায় যাতায়াত বেড়েছে। সূর্যাক্ষ বন্ধুত্ব করেছে ওর সঙ্গে। দেবোত্তর ঠাকুরের বাড়িতে ওর এখন ঘনঘন যাতায়াত। কমলার মনটা অস্থির হয়ে ওঠে দ্বীপীর কথা ভেবে। দ্বীপীর মতো মেয়ে হয় না।

কমলার চোখের চাহনি, চেহারা, কথা বলার ধরন দেখে দুর্গামণির মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে অনেকদিন আগে। রঘুনাথও নিজেকে বদলে নিয়েছে, সে এখন মায়ের কাছে ধোঁয়াশা দূরের জমি।

একদিন বাঁধের গোড়ায় দুর্গামণি ওদের দেখে ফেলে, এমন অন্তরঙ্গ মুহূর্ত গ্রামসমাজে অচল এবং দৃষ্টিকটু। কমলা হেসে গড়িয়ে পড়ছিল রঘুনাথের উপর। নির্বিকার রঘুনাথ প্রতিক্রিয়াহীন। ঘনিষ্ঠতা না থাকলে এমনটা সম্ভব নয়। কিন্তু এই অসম ঘনিষ্ঠতা দুটি সবুজ মনে আগুন ধরায়। সেই আগুন এক সময় তৈরি করে দাবানল। পুড়িয়ে খাক করে দেয় সংসার। ভয়ে দুর্গামণির চোখের তারা কুঁকড়ে ছোট হয়ে আসে। রঘুনাথকে একলা পেয়ে কাছে ডেকে বলে, সুফল ওঝার মেয়েটার কি নাম রে? বেশ বড়ো হয়ে গিয়েচে মেয়েটা। রঘুনাথ মায়ের ভেতরের কথা আঁচ করতে পেরে চুপ করে থাকে। দুর্গামণি গলা চড়িয়ে বলে, ইখনকার ছেলেমেয়েদের কুনো লাজ-লজ্জার বালাই নেই। ওরা যে নিজেদের কী ভাবে তা কে জানে। তা বাপ, তুরে এট্টা কথা বলি মন দিয়ে শুন। ঘরে তুর বাপ নেই। তুর কাকা থেকেও নেই। আপদ-বেপদ কিচু হলে আমি তুরে বাঁচাতে পারব নাই।

—কী বলতে চাইচো তুমি স্পষ্টাস্পষ্টি বলো তো? রঘুনাথের কথায় পোড়া লঙ্কার ঝাঁঝ।

—বলচিলাম কি ওই সুফল ওঝার মেয়েটার সঙ্গে বেশি ঢলাবি না। ওরা বড়ো ঘরের বিটি। ওদের গায়ে চট করে কাদা লাগে না। যত দোষ এই গরিব গুরবোদের—মনে রাখিস। দুর্গামণি আড়ষ্টতা কাটিয়ে বলল, ওর লজর দেখে আমার ভালো ঠেকেনি। মন বলচে তুর উপরে মেয়েটার টান জমেচে।

—সে আমি কি করে বলব? আমি হাত গুনতে জানি না। রঘুনাথ মুখ বেঁকিয়ে এড়িয়ে যেতে চাইল।

দুর্গামণি তাকে ছাড়ল না, সত্যি করে বলতো—কবে থিকে ওর সাথে তুর আলাপ?

—কী যা তা বলচো! রঘুনাথ মায়ের দিকে বেজার চোখে তাকাল।

—যা তা নয় বাপ। ঠিক বলচি। দুর্গামণি জোরের সঙ্গে বলল, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অতো সহজ লয়। আমি মা। আমাকে তুই ফাঁকি দিবি?

রঘুনাথ মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

দুর্গামণি ভাঙা গলায় বলল, বাপরে, এ কাজ তুর ঠিক কাজ হচ্চে না! পথ ছেড়ে দে। মেয়েটারে তুই যেতে দে। ওরে এটকে রাখলে তুর কষ্ট বাড়বে। সে-ও জ্বলবে।

রঘুনাথ বোবাদৃষ্টি মেলে তাকাল, মাকে তার বোঝানোর কোনো ক্ষমতা নেই। মা'র কাছে তাদের সম্পর্কটা যেন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

অন্ধকারে রঘুনাথ হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে। কমলার সঙ্গে দেখা হলে তার মনটা ফুরফুরে কাশফুলের মতো দোলা দিয়ে ওঠে। বুকের ভার কমে গিয়ে হালকাবোধ হয়। ঘরে ফিরে গিয়ে এখন তার ঘুম আসবে।

রাস্তার ধারে ঝাঁকড়া মাথার গাবগাছ অন্ধকারের চাদর জড়িয়ে মূর্তিমানের মতো দাঁড়িয়ে আছে। গাবতলায় এসে দম নিল রঘুনাথ। এভাবে লুকিয়ে-চুরিয়ে কমলার সঙ্গে দেখা করার কোনো অর্থ হয় না। সুফল ওঝা টের পেলে তার সর্বনাশ করে ছাড়বে। সুফল ওঝার রাগী মুখটা মনে পড়তেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেল সে। ওই মুখটাকে সে আর দেখতে চায় না।

দূরে রাস্তার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে আসছে দু-জন লোক। ওদের একজনের হাতে হ্যারিকেন আর অন্যজনের হাতে লাঠি, কোদাল। ওরা শেকড়বাকড়ের খোঁজে পাশের ঝোপে গিয়েছিল। কিছু শেকড় অমাবস্যায় তোলার নিয়ম। নাহলে সঠিক প্রয়োগ ঘটে না। রঘুনাথ কিসের আশঙ্কায় গাছের আড়ালে চলে গেল। দূর থেকে সুফল ওঝার গলাটা সে ঠিক চিনতে পেরেছে। অসময়ে তাকে দেখলে হাজার প্রশ্ন ভেসে আসবে। চোর বলে সন্দেহ করতে পারে। ইচ্ছে করলে রটিয়ে দিতে পারে বদনাম। রঘুনাথ কোনো ঝুঁকি নিতে চাইল না। গাবগাছের আড়ালে গিয়ে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সুফল ওঝার হাতের হ্যারিকেনটা দুলছিল। তার অন্য হাতে চটের থলি। মাটি সমেত শেকড়বাকড় বেরিয়ে আছে বাইরে। এগুলো ধুয়েমুছে সাফসুতরো করে তার ব্যবসা চলবে। ঝাড়-ফুঁক করে অবস্থা ফিরে গিয়েছে সুফল ওঝার। ঘরের খড়ের চাল সরিয়ে টিন দিয়েছে মাথার উপর। সেই টিনের চালে টিনের ময়ূর দোলে হাওয়ায়। দূর থেকে তা দেখতে পায় গ্রামের সবাই। অনেকের চোখ ঈর্ষায় করকরিয়ে ওঠে। সুফল ওঝার সেসব দিকে কোনো খেয়াল নেই। সে নিজের কাজে পাগল। নিজের ব্যবসা নিয়ে মাতাল।

দু-জন মানুষ গাবগাছ ছাড়িয়ে চলে যেতেই স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে বাঁচল রঘুনাথ। তার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

রাতের আঁধারে শেকড় তোলার ঝুঁকি অনেক। ঝুঁকি ছাড়া আজকাল কোনো কাজ হয় না। কমলা

হাসতে হাসতে বলে, ডরেছো কি মরেছো। আমার বাবাকে দেখো এই বয়সেও এ-গাঁ সে-গাঁ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ওই মানুষটার কোনো ভয়ডর নেই।

আজ অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছে রঘুনাথ। ভাগ্যিস সুফল ওঝা রাতকালে ঘরে ছিল না। ঘরে থাকলে বিপদ বাঁধত। বয়স বাড়লে মানুষের ঘুম পাতলা হয়।

রাস্তায় উঠে এসে রঘুনাথের ইচ্ছে করল দৌড়ে বাঁধের ধারে চলে যেতে। কিন্তু বাধ সাধল বৃষ্টি। গুড়গুড় শব্দে রাগ উগরাল মেঘ। হাওয়া এসে মারতে লাগল শপাং শপাং চাবুক। গাছ কেঁপে গেল, উড়ে গেল ধুলো। চোখে হাত চাপা দিয়ে রঘুনাথ ধুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। বৃথা সেই চেষ্টা। দুড়দাড় শব্দে বৃষ্টি নামল। ভোরের বাতাস ভিজিয়ে দিল জলের ধারা। শুধু গাছপালা নয়, রঘুনাথও ভিজে গেল জলের ছাঁটে। ভিজে সপসপে হয়ে ঘরে ফিরল সে।

দুর্গামণি এখনও জেগে আছে রঘুনাথের প্রতীক্ষায়। ছেলেকে বিছানায় না দেখে তার মনে চিন্তা মাগুরমাছের কাঁটা মেরেছে। আর ঘুমাতে পারেনি সে। ছেলেটা রাতকালে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কোথায় যায়, কেন যায়? এঁ-ও কি সেই নেশা? এই সবে ষোল ছাড়িয়ে সতেরোয় পা রেখেছে রঘুনাথ, এর মধ্যেই এত কিছু। দুর্গামণির সব হিসাব ওলোট পালোট হয়ে গেল। নিজের যৌবনকালের কথা মনে পড়ল। তখনও প্রেম-পীরিত সব ছিল। ছিল এক বন্য উগ্রতা। শ্যামের বাঁশি শুনে রাধা কি যায়নি যমুনায়! শুধু রাধা নয়, শ্যামও গিয়েছে ছুটে। তখনও চাঁদ ভাসত আকাশে, সূর্য হাসত পুবের কোণে। তবু দুর্গামণি কোনোমতে মেনে নিতে পারে না। অসহায়ভাবে সে রঘুনাথের মুখের দিকে তাকাল, বেছানা ছেড়ে কুথায় গেছিলিস এত রাতে?

—বাঁশতলায়। নামুচাপ পেয়েছিলো। রঘুনাথ হাত কচলায়।

—মিচে কতা কোস নে। ধমক দিতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠল দুর্গামণির, তুর বাপ ঘরে নেই। এখুন এসব কাজ কি তুর পক্ষে ভালো দেকায়। ধরা পড়লে সারা গাঁয়ে টি-টি পড়বে। তখুন এই পোড়ামুখ নিয়ে বেরতে পারবি?

রঘুনাথ ঘাবড়াল না, দুর্গামণির চোখের দিকে সরাসরি তাকাল, কমলার সাথে দেকা না হলে আমার নিদ হত না। ওর সাথে দেকা করে এয়েচি, এতে পাপ কুথায়?

—পাপ থাকে মানুষের মনে। কার মুখ তুই চাপা দিবি, বাপ।

দুর্গামণির থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে রঘুনাথ বলল, যা সত্যি তাকে আমি চাপা দিব কেন যা সত্যি তার থেকে তো ট্যাক গজায়। সেই ট্যাক থেকে গাছ হয়। গাছ সেই থেকে ফুল হয়, ফল হয়। এসব যদি পাপ না হয়, তাহলে আমারটাও পাপ নয়।

—চুপ কর। ও কথা বলিস নে। দুর্গামণি বর্ষার বাদল মেঘের মতো ভেঙে পড়ল।

ঝমঝমানো বৃষ্টি থামতেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল দুলাল। কাজ ছেড়ে বসে থাকা কাজের মানুষের পক্ষে সব চাইতে বুঝি কঠিন কাজ। চারপাশে জল ঝরে পড়ছিল টুপটাপ। অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছিল চতুর্দিক জুড়ে। ইন্দু চোখ ঘুরিয়ে বলল, হাঁ দেখো গো, মাত্রর ক'দিনের বরষাতে সব কেমুন পাল্টি গেচে। গাছপালাকে চেনা যায় না, প্রথম বে-হওয়া ম্যায়ার মতো লাগচে।

দুলাল ভরসায় চোখে তাকাল, তা যা বলেচো। তারপরই তার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে গেল, এতবার এলাম-গেলাম তবু মনটা ও-দেশে বাঁধা পড়ল না। আমার এই দেশটা কতো সোন্দর গো। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। ভালো করে দেখলে আর চোখ ঘুরানো যায় না।

বৃষ্টি থেমেচে কিন্তু হাওয়ায় ভাসছে জলীয়ভাব। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জলকণা আত্মগোপন করে আছে বাতাসে। ক'দিনে অশ্বত্থগাছের পাতা আরও লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে জলের সোহাগে।

আখ খেতের দিকে তাকালে আর চোখ ঘোরানো যায় না, প্রতিদিনের দেখা আখগাছগুলো যেন স্ফূর্তিতে টগবগিয়ে উঠছে গাঙ পালানো হাওয়ায়। আলোর ঘাসও স্পর্ধা নিয়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

দুলালদের যাওয়ার সময় ভূষণীবুড়ির গলা বুজে আসে কান্নায়। যত না কান্না আসে তার চেয়ে বেশি আসে কাঁপুনি। ছেলে বউ বাইরে থাকার অর্থ ভ্যারেণ্ডা গাছের মতো একা হয়ে যাওয়া। লোক বলে—একা না বোকা, ঠিক কথা। একা মানুষের মনটা সব সময় যেন ডানা ভাঙা পাখি, উড়তে পারে না। শুধু চিন্তা ভাবনার মেঘগুলো হানা দিয়ে কালো করে দেয় মুখখানা। দুলাল চলে যাওয়া মানে কলিজা উপড়ে বুড়িগাঙে ভাসিয়ে দেওয়া। অনেকদিন পরে ভূষণী বুড়ির সুবর্ণার মুখটা মনে পড়ল। সময় নদীর স্রোতের চেয়েও দ্রুতগতিতে বয়ে গেছে। সময়কে আটকে রাখবে এমন বলবান কোথায়? সুবর্ণা ধাওড়া- পাড়া ছাড়ার আগে বলেছিল—সে আবার আসবে। কত বছর চলে গেল, ফি-বছর অশ্বত্থ গাছে নতুন পাতা গজায়, নতুন আলো এসে সেই তেল চকচকে পাতায় চুম্বন এঁকে দেয়, সব কিছুই হয় চারপাশ জুড়ে...শুধু কথা দিয়ে যাওয়া সুবর্ণা আর ফেরে না। সেদিন সুবর্ণাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল, ভূষণীবুড়ির মনে হচ্ছিল সুবর্ণাই নীলকণ্ঠর আসলি জোড়া। এ যেন যেমন হাঁড়ি তেমন সরা, একেবারে মাপে মাপে। বাবুঘরের বিটিদের খেয়াল-খুশি বোঝা দায়। সুবর্ণা যদি হিসাব মতো দুলালের পাশে দাঁড়াত তাহলে ছেলেটাকে আজ মাথায় বোঝা নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে ভিন দেশে খাটতে যেতে হত না। ওদের অনেক ছিল। দুলাল কি তার থেকে কিছু পেতে পারত না? আসলে স্নো-পাউডার ঘষা সুর্বণা যা বলেছিল তা শুধু কথার কথা। একটা দীর্ঘশ্বাস ভূষণী বুড়িকে হারিয়ে দিয়ে মিশে গেল বাইরে। ভূষণীবুড়ি গলার কাঁপুনি থামিয়ে কোনোমতে বলল, শরীলের উপর লজর দিবি। শুধু কাজ কাজ করে শরীলটাকে ধসিয়ে দিবি তা যেন না হয়।

এবার ইন্দু সরে এল ভূষণীবুড়ির সমর্থনে, মা, তুমার বিটা আমার এট্টা কতাও শুনে না। মানা করলে আমারে হুঁকরে মারতে আসে। লোকজন কুনো মানামানি নাই।

—ওঃ, মারবে সস্তা! তুমারে মারতে আসলে তুমিও চড়ে বসবা। ছাড়বা না। ভূষণীবুড়ি উল্টো সুরে রামায়ণ শুরু করল, তুমার শ্বশুরও অমন ত্যাড়াবেঁকা ছিল। নিশা করতে মানা করলে গজরাত। তবে আমিও কম ছিলাম না। দেশী মদের বোতলে আমি কাঁচা তেঁতুল সিজিয়ে মাড় করে রেখে দিতাম। ইবার কত খাবি খা। খাওয়া তো দুরে থাক রাগে শুধু খাবি খেত মানুষটা। অতীত একবার পিছু ধরলে ঘর ফেরে না। ভূষণীবুড়ি ছেলের মাথায় হাত রাখল, মেয়েটার লিয়ে ভাববি না। আমি তো আচি, আমি তো মরে যাইনি। বেশি বেগারবাই দেখলি পরে সে ঢ্যামনারে আমি টাইট দিয়ে ছেড়ে দিব। হারামীর ছানাটা ভেবেচেটা কি। ইবার কিছু হলে কতো ধানে কতো চাল হয় তা আমি গুনে গুনে জামাইবাবাধনকে দেখিয়ে দেব। তুই মন শান্তি করে যা।

গরম দুধ জুড়ানোর মতো মনটা কি সহজে জুড়োতে চায়!

বিন্দুমণিকে নিয়ে দুলালের চিন্তার শেষ নেই। বিয়ের পরে রোজ তাকে চোখের জল ফেলতে হয়। রোজ শ্রীকান্ত তাকে লেবু চিপকানোর মতো চিপকায়। এমনিতে সংসারের যাঁতাকলে ভুষি হয়ে গিয়েছে তার জীবন, তার উপর ঘরের মানুষটার অত্যাচার তার মাথাটাকে বিগড়ে দিয়েছে।

দুবেলা খেতে পেলে কি সুখে থাকে মেয়েরা?

ইন্দু তবু মেয়েকে বোঝাতে কসুর ছাড়েনি। দুলালও তার পাশে ছিল সেই সময়। চোখের জল মুছে বিন্দু তাদের বলেছিল, তুমরা যাচ্ছ যাও। ও বেশি কিছু বাড়াবাড়ি করলে আমি পুঁটলি বেঁধে ঘর ফিরি যাবো। আর আসবো নি। কেনে আসব? আমার পিঠের চামড়া কি মোষের? শুধু পড়ে পড়ে মার খাবো। তুমরা কুনোদিন আমাকে মারোনি। ও কুথাকার কে হরি গো?

বিন্দুর মনের সব ক্ষোভ জ্বালা অশান্তি জড়ো করলে পণ্ডিত বিলের চাইতে আড়েবাড়ে বড়ো হবে। অশান্তির পাঁক আর ঘাঁটতে চায় নি দুলাল। বসন্তপুর ধ্যাওড়ার মুরুব্বির হাত ধরে বলেছে, খুড়াগো, মেয়েটা রইল, ওরে দেকো। ও তুমাদের লাতনির বয়সী গো। ভুলচুক করলে ওরে নিজের ভেবে মানিয়ে নিও। তারপর বেয়াই মশাইয়ের হাত ধরে সে কী বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। বেয়াই মশাই পেছনের মালাইচাকি চুলকে তাকে আশ্বস্ত করে বলল, ভয়ের কিচু লাই, চিন্তার কিছু লাই। সব ঠিক হয়ে যাবেখন। তুমার ঘরের বিটি তো আমার ঘরের বিটি। ওসব লিয়ে ভেবো না। মন হালকা করে যাও। কাজ থিকে ফিরলে আবার এসে দেকা করে যেও।

জামাইয়ের দাবি ছিল সাইকেলের। এ বাজারে একটা সাইকেলের দাম মেরে কেটে মেলা টাকা। এত টাকা আসবে কোথা থেকে? ভাবতে ভাবতে দুলাল যেন বুড়িয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ইন্দুবালাই চিন্তামুক্তির আলোটা দেশলাই কাঠির মতো ফস্ করে জ্বেলে দিল, যে চার কাঠা জমিন আচে ওটা বেচে দাও। মানুষ থাকলে অমন জমিন ঢের হবে।

—দায়ে-অদায়ে শুধু ওইটুকুই তো ছিল! দুলালের চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল।

ইন্দু তাকে বুঝিয়ে বলল, দায়ে-অদায়ে তো প্রয়োজনের জিনিস লাগে গো।

মেয়েটা ভালো থাকলে, ওর মুখে হাসি ফুটলে আমাদের আর বুড়া-বুড়ির কি চাই।

—ঠিক আচে, তুমার মতই আমার মত। দুলাল ঘাড় গুঁজে চলে গিয়েছিল গোঁসাই পাড়ায়। মাঝের গাঁয়ের নীলু বামুন বন্দকী কারবার করে। জমিটার উইল বাঁধা দিয়ে যদি কিছু টাকা দেয়? সুদ যা লাগবে শোধ করে দেবে সে।

বেঁচে থাকলে কারোর টাকা সে মারবে না।

নীলাক্ষ কথা রেখেছিলেন। সব শুনে বললেন, ঠিক আছে টাকা আমি দেব কিন্তু মুনিষ খেটে ফিরে আসার পর আমার টাকা ফেরত দিতে হবে। তখন আমি একদিনের জন্যও টাকা ফেলে রাখতে পারব না।

—সে ভাবতে হবে নি বাবু। গরিবের কতা চট করে নড়চড় হয় না। দুলাল অনুগত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে হাত কচলায়।

লেখাপড়া শেষ হলে টিপছাপ দিল দুলাল। টাকাগুলো গুণে নিয়ে সে আর দাঁড়াল না। সোজা বাঁধ ধরে চলে এসেছিল ঘরে।

বেয়াইঘর থেকে ফেরার সময় তেড়েফুঁড়ে বৃষ্টি এল। বেলগাছের গোড়ায় দাঁড়িয়েও শরীর বাঁচাতে পারল না ওরা। ফাঁকা জায়গায় মাথা বাঁচানো দায়। ভিজে-নেয়ে ওরা ফিরে এল ধাওড়াপাড়ায়। তারপর থেকে শুরু হয় ফেরার মহড়া। বুকের পাথর নেমে যেতে বড়ো খুশি খুশি দেখাচ্ছিল দুলালকে, ইবার শান্তি মনে যেতে পারব। বেয়াই-মশাই আমার গাঁ ছুঁয়ে কথা দিয়েচে—মেয়েটার কুনো ক্ষতি হবে না। আঃ, আজ বড়ো ভাল্ লাগচে গো!

বিদায়পর্ব শেষ হতেই বাঁধে উঠে এল ওরা।

দুলাল মুখ মুছে নিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে পিছন ফিরে তাকাল। অন্তত জনা পনের ছেলে-মেয়ে মাঝ-বয়েসী মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখার জন্য। সাধারণত এপাড়ার খুব কম মানুষ বাইরে যায়। বাইরে যাওয়া বললে ওদের কাছে বড়োজোর দেবগ্রাম—বেথুয়াডহরী নয়ত কালীগঞ্জের হাটে যাওয়া। এই যাওয়াতেও বিচ্ছেদের ব্যথা আছে।

পথের এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখ টান করে বাঁধের দিকে হাঁপুস নয়নে চেয়েছিল ভূষণীবুড়ি। ধীরে-ধীরে ছোট হয়ে আসছিল ওদের দৃশ্যমান শরীর। বাঁক পেরতেই ওদের আর দেখতে পেল না সে। সাদা শাড়ির ময়লা আঁচল দাঁত দিয়ে চিপে শরীর বাঁকিয়ে কেঁদে উঠল সে। এমন সশব্দ

ভগ্ন কান্নার জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউ। সচকিত মানুষ এবার দৃষ্টি ঘোরাল ভূষণীবুড়ির উপর। সহানুভূতি, সমবেদনায় কলকলিয়ে উঠল জড়ো হওয়া গ্রামীণ মানুষ। বাতাস শুধু শুনতে পেল কাতর ভূষণীবুড়ির কণ্ঠস্বর, ইবার আমার কী হবে গো, ইবার আমি কারে লিয়ে থাকবো গো-ও-ও। আমার কলিজার ধন, পরানের টুকরা মুনিষ খাটতে চলে গেল গো-ও-ও-ও।

দু'হাতে ধুলো আঁকড়ে ভূষণীবুড়ি মাটির মা হয়ে উঠল ক্রমশ।

টানা বৃষ্টিতে পুরো নেতিয়ে গিয়েছে কালীগঞ্জের অঞ্চল।

জগৎখালি বাঁধের উপর এখন প্যাচপ্যাচ করে কাদা। চন্দন রঙের ভেজা মাটি পেছল বড়ো। পা টিপে টিপে সাবধানে না হাঁটলে যে কোনো সময় বেসামাল হবে এই শরীর। চুনারাম এখন তাই ভয়ে বাঁধের উপরে খুব কম যায়। নেহাত ঠেকায় না পড়লে সে এড়িয়ে যায় বাঁধ ধার।

এখন বাঁধে দাঁড়িয়ে পুরো পণ্ডিত বিলটাকে দেখতে পায় গাঁয়ের মানুষ। বিল যেন ফুলেফেঁপে সাগর। সেখানে দিন রাত তালডিঙা নিয়ে মাছ ধরছে জেলেবস্তির লোকেরা। শুধু মাছ নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসেছে বিলে। বর্ষার সময় ডাহুক আর মেছো বকের চেহারা বুঝি পাল্টে যায়। গুড়গুড়ি বালিহাঁসগুলোকে যেন চেনাই যায় না। ওরা ডুব দেয়, কিছু দূরে গিয়ে আবার ওঠে। আবার ডুব দেয়, আবার ওঠে...এভাবেই চষে বেড়ায় সারা বিল। ওদের কালো কুচকুচে পাখনা থেকে তেল গড়ায়। চকচক করে পুরো শরীর। ওদের ছানাগুলো মা-বাবার পিঠের উপর চেপে আকাশ দেখে, বিলের জলের শোভা দেখে মোহিত হয়। শুধু মন খারাপ মেছোচিল আর মাছরাঙার। ভরা বিলে মাছের হদিশ পেতে তাদের কালঘাম বেরিয়ে পড়ে। এই বাড়তি জল সমস্যা বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের। জল না মরলে মনের মতো শিকার পাওয়া যাবে না। তখন পোকামাকড় ব্যাঙ গেঁড়ি-গুগলি খেয়ে বাঁচতে হবে।

বৃষ্টি হলে পিছু-নাচানো পাখিগুলোর সুখ ধরে না। ওরা নলখাগড়ার ঝোপে বসে মজা দেখে। কখনও ফুড়ুৎ করে উড়ে যায় জলশোলার বনে। এখন বিল সবুজ হয়ে আছে জলশোলাগাছে। শুধু জলশোলা নয়, কত যে বুনোফুল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নাকছাবির মতো ফুটে আছে বিলের জলে—যার দিকে একবার তাকালে চোখ ফেরাতে পারে না রঘুনাথ। চোখের আর কী দোষ। গত সাত-আটমাস বৃষ্টি হয়নি একফোঁটা। খটখটে মাটি ভাপ ছাড়ছিল হরদম। চারপাশে শুধু পাতা ঝলসে যাওয়ার কুঁচুটে ঘ্রাণ। এখন চারপাশ জুড়ে শুধু সবুজের সুঘ্রাণ বাতাসে ভাসছে, পুরো এলাকাটাই হঠাৎ করে ধনী হয়ে উঠেছে বৃষ্টির জাদুস্পর্শে।

রঘুনাথ খেজুরগাছটার গোড়ায় এসে দাঁড়াল।

এসময় কমলার আসার কথা। লোকমুখে খবর পাঠিয়েছে সে। তার বিশেষ কী যেন দরকার। কী যে দরকার-ভাবছিল রঘুনাথ।

ক'দিন থেকে তার মনের অবস্থাও ভালো নেই, মেঘলা হয়ে আছে সব সময়। দুর্গামণির ভীতু চোখের দিকে সে এখন আর তাকাতে পারে না। ওর মনে ভয় ঢুকেছে। সে ভয় তাড়াবে কে?

দুর্গামণির ধারণা হয়েছে—রঘুনাথকে সুফল ওঝা মেরে ফেলবে। এই অসম প্রেম সে কোনোদিন মেনে নেবে না।

কাশীনাথও মুখিয়ে আছে রঘুনাথকে জব্দ করার জন্য। এক কোপে পেলে সে আর দুকোপে যাবে না। বুনোপাড়ার ছেলে হয়ে তার বোনের হাত ধরেছে, ভাবা যায়? ঘোর অপরাধ। এই জঘন্য অপরাধের চরম শাস্তি হওয়া দরকার। শাস্তি যাতে সঠিক ভাবে দেওয়া যায় সেইজন্য গোপনে প্রস্তুত হচ্ছে সে।

রঘুনাথের এখন সামনে সমূহ বিপদ। তবু সে কমলার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছুটে এসেছে। কতদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। রাতে সে ছটফট করে, ঘুম আসে না। চোখের তারায় কমলার ছবি নড়ে ওঠে সর্বদা। মনের ভেতর কমলা পোষমানা টিয়াপাখির মতো কথা বলে।

আনমনে হাঁটতে গেলে হোঁচট খায় রঘুনাথ। হু-হু করে জ্বলছে বুড়ো আঙুলটা। কষ্ট হজম করে রঘুনাথ রাস্তার দিকে তাকাল। এদিকটা বেশ নির্জন। ফাঁকা ফাঁকা।

হেলেপড়া খেজুরগাছে বসে আছে মাছরাঙা পাখি। পাখিটারও চিন্তা। পাখির আবার কিসের চিন্তা-রঘুনাথ ভাবল। ওদের আকাশ আছে। খাঁচার চাইতে আকাশ কত বড়ো। ওদের গোপন ব্যাধির মতো ছোট জাত বড়ো জাত নেই। ওদের ধনী দরিদ্র নেই। ওরা সবাই মাছরাঙা।

বিলের জলে মুখ ভেঙ্গাচ্ছে সরু সরু ধানগাছ। গাছগুলো জল পেয়ে সব বেড়ে গেছে। ওসব গাছে ধান হবে না। দিনভর শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে খাড়া তীরের মতো। ওরা যে দাঁড়িয়ে থাকে দিনের পর দিন—ওদের কষ্ট হয় না।

জলা ধানগাছগুলোর ভেতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে ঢোঁড়াসাপটা চলে গেল। রঘুনাথ দেখল ওদের গতিময় যাতায়াত। হাসি পেল। যেন অকাজের লোক, বেশি কাজ দেখাচ্ছে। ওদের চাইতে মেটে সাপগুলো ঢের ভালো। গায়ে পা পড়ে গেলেও ফুঁসে ওঠে না, মাটির চেয়েও শান্ত। শুধু ঝামেলা হয়, বুক ধকধকিয়ে ওঠে হঠাৎ ফণা তুলে দাঁড়ানো মাঠ খরিসসাপকে দেখলে। পালাবে না ছোবল মারবে—তা ওদের চোখ দেখে বোঝা যায় না। শুধু শরীর টানটান করে সতর্ক থাকতে হয়। না হলে বিপদ। ওরা তো সাক্ষাৎ যম। রঘুনাথের গা সিরসিরিয়ে উঠল।

দূর থেকে রঘু দেখতে পেল ছাতা হাতে নিয়ে কমলা আসছে, ওর পাশে দশ-বারো বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে। সম্ভবত ওর কাকা-জেঠার মেয়ে। ওর মা পাঠিয়েছে পাহারা দেবার জন্য। যে-ই পাঠাক না কেন, রঘুনাথ আজ ভয় পাবে না। সে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। হুমড়ে পড়া হাওয়া বাচাল শরীরে ছুটে গেল বিলের দিকে। খলবল করে নড়ে উঠল জল। ঢেউ উঠল ছোট-ছোট। রঘুনাথ বুঝতে পারল, ওগুলো ঢেউ নয়, হাসির ঝলক।

প্রেমে পড়লে মানুষ শুকনো গাছে ফুল দেখে। তখন ভূত-ভবিষ্যৎ ভুলে যায়। মাঝ বিলের তালডিঙার মতো প্রেমের ভবিষ্যৎ, এই ভেবে নিশ্চিত হলো রঘুনাথ। কমলা সব ব্যাপারে সাহসী। সংকোচহীন।

সে এসে নুয়ে পড়া খেজুরগাছটার পাশে এসে দাঁড়াল। তার পাশে ঠাকুরের ঘটের মতো দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা। কমলা অস্বস্তি কাটিয়ে বলল, তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। আজ বেথুয়া থেকে আমাকে দেখতে লোক এসেছিল। আমাকে দেখে ওদের পছন্দ হয়েছে। আজই পাকা কথা বলতে চায়। আমি রাজি হইনি। ওরা আবার দশ দিন পরে আসবে।

কমলা মন খারাপ করা চোখে তাকাল, ওর কাঁদো-কাঁদো মুখ। রঘুনাথ বিল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, হঠাৎ করে যে এত বিপদ এসে যাবে ভাবতে পারি নি। কী যে করব, মাথায় কিছু ঢুকচে না।

—তোমাকেই তো ভাবতে হবে। এখন বোবা হয়ে থাকলে বিপদ ঘটে যাবে। কমলার গলা কঠিন হয়ে উঠল ধীরে-ধীরে, আমি আর পারছি না ঘর-বার সামলাতে। তাছাড়া আমার অত শক্তিও নেই। এ সময় আমার পাশে তোমার দাঁড়ানোর দরকার।

—বলো আমারে কী করতে হবে?

কমলা দুঃসাহসী হয়ে উঠল, চলো, আমরা পালিয়ে যাই।

—কুথায় পেলুবো? বড়ো অসহায় শোনাল রঘুনাথের গলা।

—যেদিকে দু'চোখ যায়। এত বড়ো পৃথিবীতে পালাবার জায়গার কি অভাব? শুধু ইচ্ছেটা থাকলেই হবে। জোর করল কমলা।

পাশে দাঁড়ানো মেয়েটা কী ভেবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওকে কিছু বলতে হল না, ও পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল বিলের ধারে। আলোচনার গুরুত্ব বুঝে বোবা হয়ে গিয়েছে মেয়েটা।

ভুল করে শ্বাস ছেড়ে কমলা যেন রুইমাছের মতো ভেসে উঠল, যা বলার এখনই বলো, আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। দোকানে যাচ্ছি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি। তবু মা সঙ্গে বোনকে পাঠাল।

—তুমি যদি সুফল ওঝার মেয়ে না হতে তাহলে আমি আরও জোর পেতাম।

—সুফল ওঝার মেয়ে হওয়া কি পাপের?

—না, তা নয়। রঘুনাথ কমলার মন জুগিয়ে বলল, তুমি যা আমাকে করতে বলবে তাতেই আমি রাজি আচি।

—তাহলে ঘর কবে ছাড়বে?

—যেদিন তুমার মন হবে।

—বেশ। এখন আমি আসছি। কমলা এগিয়ে গিয়ে তার বোনকে ডাকল, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে রঘুনাথকে একবার দেখল। রঘুনাথের দু-চোখে বিছিয়ে গিয়েছে শঙ্কা। এর পরিণতি কোথায় তা সে জানে না। সে শুধু জানে—তার কমলা আছে, কমলা থাকবে। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলে। ঘরসুদ্ধু মানুষ এ বিয়েতে মত দিয়েছে। তার বাবা গর্ব করে বলছে, মেয়ে আমার বড়ো ঘরে পড়বে গো! এই পচা গাঁ ছেড়ে মেয়ে আমার ঢেউনের বাসিন্দা হবে। সবই মা মনসার কৃপা। হাঁড়ির ঝি চণ্ডীর দয়া।

কাশীনাথ কমলার বিয়ে নিয়ে তেমন বেশি আগ্রহী নয়। কেন না কমলা তার মান-সম্মান রেখে কথা বলে না। আজকাল তার ব্যবহার অনেকটাই পাগলের মতো। চাহনিও বদলে গিয়েছে পুরোপুরি। সংসারের কাজে-কর্মে তার মন নেই। সব সময় কী যেন ভাবতে থাকে সে। কোথায় যেন হারিয়ে যায় সে। বোনের এই অন্যমনস্ক মনটাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না কাশীনাথ। হাজার বুঝিয়ে যখন কাজ হল না, তখন হাল ছেড়ে দিয়েছে সে। কমলাও চায় না দাদা গায়ে পড়ে তার সঙ্গে আলাপ করুক।

যার এত অনীহা, সেই কাশীনাথ খুশি হয়েছে পাত্র'র সঙ্গে কথা বলে। মেয়ে দেখে পছন্দ হয়েছে ছেলের মা এবং মামার। ওরা পণ নেবে না, খালি হাতেই বৌ করে নিয়ে যাবে কমলাকে।

কলাবতী এতটা আশা করেনি। কমলাকে আড়ালে ডেকে সে বুঝিয়ে বলল, যাচা অন্ন ছাড়তে নেই মা। পরে তাহলে কপাল চাপড়াতে হয়। কমলা ঠোঁট কামড়ে বলেছিল, এ বিয়েতে আমার মত নেই, মা।

—মত নেই, তার মানে? হাঁ-হয়ে গিয়েছিল কলাবতীর মুখ, এত ভালো ছেলে! এ ছেলেকে না করে দিলে শেষে তোর কপালে কানা-খোঁড়া জুটবে। তাছাড়া তোর মামা এনেছে

সম্পর্কটা। মামার মান-সম্মানের কথা একবার ভাববি নে, মা।

—বিয়েটা সারাজীবনের ব্যাপার। এ নিয়ে আমি কোনো আপোষ করতে চাই না। কমলার গলা থেকে ঝলকে ঝলকে নেমে এল বিরক্তি, আমাকে জোর করো না। জোর করলে এর ফল মারাত্মক হবে।

—তোর বাবাকে আমি কী বলব? মহাফ্যাসাদে পড়ে কলাবতী তাকাল।

—যা হোক একটা কিছু বানিয়ে বলে দাও।

—মিথ্যে কথা বলব?

—মিথ্যে কথা তো তুমি নিজের জন্য বলছো না, আমার জন্য বলছো। মেয়ের ভালোর জন্য মিথ্যে কথা বললে তোমার কোনো পাপ হবে না। কমলা নির্দ্বিধায় বলল কথাগুলো।

বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে সময় নেয় কলাবতী। এ কী শুনছে সে। দিনে দিনে মেয়েটার এ কী হলো? এই কমলাকে সে তো আগে চিনত না। যে মেয়েটা ভালো করে গুছিয়ে কথা বলতে পারত না, তার মুখে এমন কথা কে জুগাল? আর ভাবতে পারছিল না কলাবতী। মাথাটা বড্ড ধরেছে। মনে হয় চোরা গ্যাস- অম্বলের ফল।

মেজাজটা খিটখিটে হয়ে উঠল কলাবতীর, ওই বুনো ছেলেটার সঙ্গে তোর শেষ কবে দেখা হয়েছিল?

কমলা অকপটে বলল, ওর সাথে আমার রোজই দেখা হয়।

—কাজটা ভালো করছিস না, কমলা।

—ভালো-মন্দ আমি জানি না। আমার মন যা চায়, আমি তা করি। কমলা জেদ ধরে দাঁড়াল। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ে সে যেন অবজ্ঞাকে ছুঁড়ে দিতে চাইছিল কলাবতীর মুখের উপর।

কলাবতী আশ্চর্য হয়ে বলল, তুই যে এত বদলে যাবি আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তোর বাবার এত নামডাক। তার মেয়ে হয়ে তুই যদি এসব করিস তাহলে লোকে কি ভাববে?

—কে কি ভাবল তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কলাবতীর মুখের দিকে তাকাল কমলা, তুমি এখন যাও মা। আমার আর কিছু ভালো লাগছে না। তবে একটা কথা, জোর করতে যেও না।

—জোর করব না? কলাবতীর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়, আমি চাই—তোর ভালো হোক। তুই সুখি হ।

—তাহলে আর কেন কথা বাড়াচ্ছ। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।

—তুই এখনও আগুন আর জলের ফারাক বুঝিস না। তোর উপর কি সব ছেড়ে দেওয়া যায়, নাকি তা সম্ভব!

—তা যদি না পারো তাহলে তোমারই কষ্ট বাড়বে। কমলা জোরের সঙ্গে বলল, একটা পাগলও নিজের ভালোটা বোঝে। আমি তো পাগল নই, পুরোপুরি সুস্থ। তাহলে আমি কেন নিজের ভালো বুঝব না?

—যা ভালো বুঝিস কর তবে ভেবে-চিন্তে। পরে যেন কাঁদতে না হয়।

—কাঁদব না মা, আমি তো তোমার মেয়ে। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে কমলা তার কষ্টটাকে বশে রাখার চেষ্টা করল।

কমলা চলে যাওয়ার পর বিলের ধারটা বড়োই ফাঁকা লাগছিল রঘুনাথের। এমন যে ঝড় উঠবে ভাবতে পারেনি সে। মন টলে গিয়েছে বারবার। কমলার যা মানসিক শক্তি, সেই শক্তি রঘুনাথের ভেতরে কেন জন্ম নিল না? কেন বারবার হেরে যাচ্ছে সে। কেন দু'পা এগিয়ে পিছিয়ে আসছে

দশ পা? এ অবস্থায় একবার যদি সূর্যাক্ষর সঙ্গে দেখা হত তাহলে বুক উজাড় করে সব কিছু বলতে পারত রঘুনাথ। সব শুনে সূর্যাক্ষ তাকে সঠিক রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে পারত। অনেকদিন হল মানিকডিহি যাওয়া হয় নি তার। সময়গুলো বুনো খরগোসের মতো ছুটে পালিয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে রঘুনাথের মনে পড়ে গেল হাবুল চোরের কথা। লুলারামও তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিতে পারে। ওদের অভিজ্ঞতার মূল্য তাকে দিতেই হয়। ওরা ঝুরি নামানো বটগাছের মতো।

লুলারামের প্রস্তাব মেনে নিলে টাকার কোনো অভাব হবে না রঘুনাথের। সে জানে—অর্থবল মহাবল। এর কোনো বিকল্প নেই। গ্রামসমাজে চট করে কেউ টাকা দিতে চায় না। অনেকেই টাকাকে ভালোবাসে নিজের চাইতে। সেই টাকার জন্য সে যদি একটু নীচে নামে তাহলে দোষ কোথায়? হাতে টাকা এলে কমলার সব অনুরোধ সে মেনে নিতে পারবে। কমলাকে আর দুঃশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে জীবনযাপন করতে হবে না।

একটা পিটুলিগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রঘুনাথ দু'ভাগ হয়ে যাওয়া রাস্তাটার দিকে তাকাল। একটা রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে হাবুল চোরের বাড়ি, অন্য রাস্তাটা বাঁক খেয়ে ছুঁয়ে দিয়েছে সূর্যাক্ষর ঘর। কোনটা বেশি নিরাপদ বুঝতে পারে না রঘুনাথ। সে যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে নিভে যাওয়া লম্ফ।

ধুলোর পথ টানা বর্ষায় রূপবদল করে চ্যাটচেটে কাদা। সতর্ক হয়ে পা না ফেললে পিছলে পড়ার ভয়। বড়ো ইস্কুলটার কাছে এসে রঘুনাথ শুনতে পেল কাশীনাথ তাকে ডাকছে। আজ কাশীনাথের সঙ্গে কোনো দলবল নেই, সে একা। ফলে রঘুনাথ সাড়া দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। মুখ তুলে শুধাল, কী ব্যাপার কাশীদা?

—তোর সাথে দুটো কথা আছে, দাঁড়া। জোরে পা চালিয়ে কাশীনাথ এগিয়ে এল, তোর কাছে বিড়ি আছে? যদি থাকে, দে। মাথাটা বড্ড ধরেছে। আর ভালো লাগছে না।

রঘুনাথ অবাক চোখে তাকাল কাশীনাথের দিকে। এত নরম কথার অর্থ বুঝতে পারল না সে। শয়তানের ছলের অভাব হয় না। আজ কি উদ্দেশ্য নিয়ে কাশীনাথ তাকে দাঁড় করাল ঠিক বুঝতে পারল না রঘুনাথ। তিতকুঁড়ো ঢোক গিলে রঘুনাথ হালকা গলায় বলল, তুমি আবার বিড়ি খাওয়া কবে থেকে ধরলে?

কাশীনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলল, তাহলে তুই যে খাস? তুই তো আমার চাইতে অনেক ছোট।

পানসে হাসি ছড়িয়ে গেল রঘুনাথের মুখে, বিড়ি খেতে বয়স লাগে নাকি? বিড়ি খেতে গেলে শুধু কলিজার জোর দরকার। এই জোরকে অনেকে বলে 'দোম'। তা বিড়ি যে খাবা—তুমার বুকে দোম আচে তো?

—আছে কী না নিজের চোখেই দেখ।

এবার আর বিড়ি না দিয়ে পারল না রঘুনাথ। শুধু বিড়ি নয়, সেই সঙ্গে ম্যাচিস বাক্সটা সে এগিয়ে দিল।

কাশীনাথ বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে রঘুনাথকে দেখছিল। অস্বস্তি হতেই রঘুনাথ শুধোল, অমন করে কী দেখচো কাশীদা?

—সত্যি কথা বলব? তোরে দেখছি।

—ছ্যাঃ, বেটাছেলে আবার বেটাছেলেকে দেখে নাকি?

—কেন আমি দেখছি। এতে কোনো অন্যায় হয়েছে নাকি? কাশীনাথ ঝুঁকে পড়ল সামনে, কমলা তোর কথা খুব বলে। ও যে কত বোকা তা আমি এখন বুঝতে পারছি। আমার মনে হয় বোনটার মাথার ঠিক নেই। তা সত্যি করে বলতো—ওকে তুই কিছু খাইয়েছিস নাকি?

—এসব কী বলচো? রঘুনাথ ঘাবড়ে গেল, আমার বাপ-ঠাকুরদা ওসব বিদ্যে জানে না। ওসব বিদ্যে তো তুমার বাপ জানে, তাকে গিয়ে শুধোও।

—না, না। তার কোনো দরকার হবে না। কাশীনাথ ঢোক গিলল। প্রসঙ্গ বদলে বলল, কোথায় গিয়েছিলিস অবেলায়?

—দাদুর শরীল খারাপ, জ্বর। সাত দিন হয়ে গেল, ভালো হচ্চে না। রঘুনাথের কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল, বড্ড কাহিল হয়ে গিয়েচে বুড়া মানুষটা। হাঁটতে চলতে পারে না। বসে থাকলেও টলে পড়ে।

—চটা ডাক্তারের পুরিয়া দিস নি? কাশীনাথ প্রশ্ন করল।

রঘুনাথ সহজভাবে বলল, হ্যাঁ দিয়েচি। কিন্তুক তাতে কুনো কাজ হয়নি।

—নেশা ভাঙ করলে পুরিয়া-ওষুধে কাজ হয় না। এর জন্য কড়া-ডোজ দরকার।

সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ল রঘুনাথ।

কাশীনাথ বিজ্ঞের মতো বলল, এখনকার জ্বর-জ্বালা সব আলাদা। এক ওষুধে কাজ হয় না এখন। এসব জ্বর বাগে আনতে গেলে হাসপাতালের বড়ি-ইনজেকশন দরকার।

কাশীনাথের কথাটা ভুল নয়। চুনারামের জ্বরটার মতিগতি বোঝা গেল না সাত দিনে। সেদিন পণ্ডিত বিলে ছিপ ফেলতে গিয়েছিল চুনারাম। রোদ ফোটা দুপুর। বর্ষা ক'দিন ঢেলেই এখন ক্লান্ত। দম নিচ্ছে। কেঁচো খুঁড়ে মালাই চাকি ভরে ঘর থেকে বঁড়শি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল চুনারাম। বাঁশতলার ছায়ায় বসে বঁড়শি ফেলেছিল সে। হঠাৎ ঝেঁপে বৃষ্টি এল। চুনারাম প্রথমে ভেবেছিল—এই বৃষ্টি বুঝি ছাগল তাড়ানোর বৃষ্টি। কিছু পরে তার ভুল ভেঙে যায়। বৃষ্টি থামল না, ঝরল শুধু ঝরল। গোরুর মতো ভিজে গেল চুনারাম। সব বর্ষার জল সমান হয় না। এ বরষার জল গায়ে বসে গেল চুনারামের। এই ফাঁকে একটা দেড়হাত মাপের বাণ মাছ ধরল সে বঁড়শি গেঁথে। জলে বাণ মাছ কেন, চুনো মাছেরও তাগত কম নয়। ছিপে টান ধরতেই সে ভেবেছিল রাক্ষুসী বোয়াল। পরে জলের উপর ছরছর করে উঠতেই শুধু সুচলো লেজটুকু দেখা যায়। চোখের দৃষ্টি কমেছে। ছানি পড়েছে দু-চোখে। ফলে বাণ মাছের লেজকে তার ঢোঁড়াসাপের লেজ বলে ভ্রম হয়। পরে ডাঙায় তুলতে সেই ধন্দ কেটে গেল। খুশিতে ভরে গেল চুনারামের মনটা। বাণ মাছটা তিন পোয়ার কম হবে না। আহা, পেকে হলদে হয়ে আছে মসৃণ দেহ। শুধু শিরদাঁড়ার কাঁটাগুলো করাতের মুখের মতো খ্যাচখ্যাচ করে লাগে। হাতে ঢুকে গেলে যন্ত্রণা শুরু হয়। মাছ ধরার আনন্দে মাথায় জল বসে গিয়েছিল চুনারামের। হুঁশ ফিরল যখন মাথার জল শুকিয়ে গেল মাথায়। প্রথম রাতে খুঁক খুঁকে কাশি, ভোররাতে তেড়েফুঁড়ে জ্বর এল গায়ে। তাকে সামলানো দায়। জড়িবুটি চলছিল ক'দিন। তাতে কাজ হল না। শরীর ঝিমিয়ে গেল ক্রমে ক্রমে। হারিয়ে গেল ভেতরের শক্তি। বুড়াটা যেন আরো বুড়িয়ে গেল চোখের সামনে। জ্বর উঠলে আনশান বকত সে। কখনও গান ধরত চেঁচিয়ে। কখনও কাঁদত সুর করে। দুর্গামণিকে বলত, যাও বউমা, আমার ছেলেটারে ডেকে আনো। যদি না যেতে পারো তাহলে খপর পাঠাও। আমার মন কু গাইচে। কখন চ'ক্ষু বুজে আসবে তা মা শীতলাবুড়ি জানে।

চুনারামের শরীরের অবস্থা ভালো নয়, চটা ডাক্তার তার রোগ সারাতে পারল না। পুরিয়া ফেল মেরে গেল ধুমজ্বরের কাছে। চটা ডাক্তার নিজের মুখে বলল, রঘুরে, তোর দাদুকে কালীগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যা। ওখানকার বড়ো ডাক্তারের হাতযশ আছে। তোর দাদুকে ভালো করে দেবে।

চুনারাম হেঁটে যেতে পারবে না। যেতে গেলে খাটিয়ায় নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য কম করে চারটে মানুষ দরকার। ধাওড়াপাড়ার এখন যা অবস্থা তাতে চারজন কেন দুইজন পাওয়াই মহা ঝামেলার। কে আর হাসপাতালে যেতে চায় হাতের কাজ ফেলে? পুরুষ যারা ছিল বর্ষা পড়ার সাথে সাথে তারা চলে গিয়েছে খাটতে। ধান রোয়া শেষে ধান কেটে ঘরে ফিরবে ওরা। এসব করতে আরও মাস তিনেকের ধাক্কা। ঘরের মানুষ ঘরে না ফেরা পর্যন্ত চলবে অপেক্ষা।

কাশীনাথ চলতে চলতে আচমকা বলল, একটা কথা রাখবি, রঘু? পারলে কমলাকে তুই ভুলে যা। ওতে দু'জনেরই মঙ্গল।

জগৎখালির বাঁধ ইস্কুল ধার থেকে সোজা চলে গিয়েছে বসন্তপুর ধাওড়া এবং সেখান থেকে পাণ্ডবপাড়া, ঘাসুরিডাঙা, এড়েডাঙা ছুঁয়ে একেবারে পলাশী-রামনগরের সুগারমিল। দু-ধারে বিস্তীর্ণ সোনা ফলানো মাঠ এখন আখ আর পাটের সংসার সামলাতে হিমসিম। মাটি এখানকার হারিয়ে দেবে চন্দনের বাহার। খোলা আকাশ বুড়িগাঙের উপর বিছিয়ে দেয় আবরণহীন শয্যা। এমন নৈসর্গিক পরিবেশে কাশীনাথের কথাগুলো রঘুনাথের মনটাকে বাসিফুলের মতো ম্লান করে দিল। সে কী জবাব দেবে কিছু বুঝতে না পেরে কাশীনাথের দিকে অবাক করা চোখে তাকাল, তুমি একথা কেনে বললে ঠিকঠাক বুঝতে পারলাম না। কমলা তুমার বুন হলেও সে তো আমার গাঁয়ের মেয়ে। কমলাকে জড়িয়ে তুমার এমন কথা বলা কি শোভা দেয়?

—কেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছিস, রঘু? তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল কাশীনাথ, তোদের মধ্যে প্রেম চলছে এটা অনেকদিন আগে আমি টের পেয়েছি। কমলাকে আমি চিনি। সে আমার কাছে কোনো কথা লুকাতে পারেনি। আমি ওর চোখ দেখে মনের কথা সব বুঝে গিয়েছি।

—কী ওর মনের কথা? রঘুনাথের কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ফুটে উঠল।

কাশীনাথ ধীর-স্থিরভাবে বলল, তোর জন্য ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। এসব প্রেম-পীরিতি বেশিদিন টেঁকসই হয় না। হলেও টোল খেয়ে যায়। তখন দুটো জীবনই বরবাদ হয়।

—তুমি যেটাকে বরবাদ ভাবচো আমি যদি ভাবি সেটাই আমার জেবন—তাহলে?

—আমার ভাবাভাবি নিয়ে তোদের কি এসে যায়? ঝাঁঝালো সুরে বলল কাশীনাথ, দুটো জীবন নষ্ট হয়ে গেলে আমার খারাপ লাগবে। গ্রাম বলে তোকে এত বোঝাচ্ছি। শহর হলে কবে খালাস হয়ে যেতিস!

—তুমি কি আমাকে জানের ভয় দেখাচ্ছ? রঘুনাথের চোখের তারা কেঁপে উঠল, শুনে রাখো আমার আর জান-প্রাণের কুনো ভয় নাই। মা'র পেট থেকে জন্মেচি যখন মরব তো একদিন। সে যখন মরব তখন দেকা যাবে।

—মনে রাখিস, পিঁপড়ের পাখা গজায় মরবার জন্য। কাশীনাথের শরীর কাঁপছিল রাগে, এখনও নিজেকে সামলে নে রঘু না হলে এর মাশুল তোকে দিতে হবে। সুফল ওঝার কত লম্বা হাত তা তুই জানিস নে। জানলে পরে খরিস সাপের গর্তে হাত ঢোকাতিস না!

—এসব শোনানোর জন্যি কি তুমি আমাকে ডাকলে? অসিহষ্ণু রঘুনাথের আর কিছু ভালো লাগছিল না, কাশীদা, এবার তুমি যাও। আমাকে একলা যেতে দাও। সাপ-আর নেউলে কুনো সম্পর্ক হয় না।

—ঠিক আছে। তোকে যা বলার আমি বলে দিলাম। পরে আমাকে দোষ দিবি না। কাশীনাথ ঘাড় নাড়ল, তুই তোর বাপ-মায়ের এক ছেলে। আর দুটা ভাই-বোন থাকলে কোনো কথা ছিল না। ওরা সামলে নিতে পারত। কাশীনাথ নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে হনহনিয়ে এগিয়ে গেল

সামনে। ইচ্ছে করেই হাঁটার গতি শ্লথ করে দিল রঘুনাথ। কাশীনাথের উপস্থিতি তার কাছে অসহ্য লাগছিল। চোখ কুটকুট করছিল তার। শয়তান মানুষের ছলচাতুরির কোনো অভাব হয় না। কাশীনাথ একরকম শাসিয়ে গেল তাকে। এমনকী প্রাণের হুমকিও দিয়ে গেল। রঘুনাথ মরতে ভয় পায় না। তবে সে যদি মরে, মরার আগে আর দশটাকে মেরে তবেই সে মরবে। কমলার জন্য এ জীবনটা কিছু নয়। এ জীবনটা সে কমলার কাছে বন্ধক রেখেছে যে। তার এবড়ো-খেবড়ো জীবনে কমলাই ফুল ফুটিয়েছে। ফলে তাকে অবহেলা করলে তার পাপ হবে।

হাসপাতালের বড়ো ডাক্তার মাটির মানুষ। রঘুনাথ তাকে যতদূর সম্ভব অসুখের কথা বুঝিয়েছে। রুগী না এলে সাধারণত ওষুধ পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু সদয় হলেন। হাসপাতালের টিকিটের উপর ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন, যাও, কম্পাউন্ডারবাবুর কাছ থেকে ওষুধটা নিয়ে নাও। যেমন বললাম—তেমন খাওয়াবে। যদি দেখ জ্বর তিন দিনের মধ্যে কমল না তখন হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। কথাটা মনে রেখো। হাসপাতালে ওষুধ আনতে গিয়ে অবনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রঘুনাথের। অবনী হাসপাতালের কর্মচারী। ছোটখাটো চেহারার মানুষটার চোখে-মুখে অদ্ভুত এক সরলতা ফুলের সুগন্ধর মতো ছড়িয়ে আছে। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, মোটা ফ্রে'র লোকটাকে দেখে রঘুনাথের হঠাৎ করে তার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। কতদিন হল ঘর ছেড়েছে গুয়ারাম। আজ সে গাঁয়ে থাকলে রঘুনাথকে ওষুধ নিতে হাসপাতালে আসতে হত না। সংসারের প্রথম দফার ঝড়টা সব সময় সামাল দেয় গুয়ারাম। চুনারাম একটা শক্ত খুঁটি। আজ সেই মানুষটাই জ্বরে কাতরাচ্ছে।

আউটডোরের সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে অবনী শুধিয়েছিল, ও ছেলে, তোমার ঘর কোথাও গো? একা এসেচ না সঙ্গে আর কেউ আচে?

রঘুনাথ পায়জামা গুটিয়ে আরাম করে বসে বলেছিল, বাপ গিয়েচে রাঢ় দেশে মুনিশ খাটতে। ঘরে মা আর দাদু আচে। ওরা আসতে পারবেনি। দাদুর গায়ে জ্বর। ওর জন্যি তো ওষুধ লিতে এয়েচি।

লম্বা লাইনটা দেখে অবনী উশখুশিয়ে বলল, দাও তুমার টিকিটটা দাও। যা ভিড়। দেখি ভিতর থেকে বাবুকে বলে ওষুধটা আনতে পারি কিনা।

টিকিটটা নিয়ে অবনী চলে যেতেই রঘুনাথ ভাবছিল—সংসারে মানুষ যে কত রকমের আছে তার কোনো গোনাগুণতি নেই। যেচে আজকাল কেউ কারোর উপকার করে? এমন বোকামানুষ দেশ-গাঁয়ে খুব বেশি পাওয়া যাবে না। কাগজে মোড়ানো দু-রকম বড়িগুলো অবনী রঘুনাথের হাতে দিয়ে বলল, সাদা বড়িটা দিনে তিনবার। সকাল-দুপুর আর রাতে। আর এই লালচে বড়িটাও দিনে তিনবার। বুঝলে? রঘুনাথ ঘাড় নাড়তেই অবনী দাঁত বের করে শিশুর মতো হেসে উঠল, একদিন সময় করে তুমাদের হলদিপোঁতা ধাওড়ায় যাব। গাঁ ঘুরতে আমার খুব ভালো লাগে। গাঁ ঘুরলে মন ফুরফুরে হয়, মনের শান্তি বাড়ে। রঘুনাথ হাঁ করে শুনছিল সব। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা কথা বলতে ভালোবাসে এটা দিব্যি বুঝতে পারল সে। কোনোরকম স্বার্থ ছাড়াই অবনী তার ওষুধ এনে দিয়েছে। রঘুনাথ সংকোচ সরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমাদের ঘর কুথায় গো? নেশ্চয়ই নদীয়া জিলায় তুমাদের ঘর নয়?

—ঠিক ধরেচো। আমরা এ জেলার নই। এ জেলায় আচি শুধু পেটের দায়ে। জমিজমা নেই। চাকরি না করলে যে আমাদের পেটে ভাত জুটবিনি। অবনীর পাংশু মুখ থমথমে হয়ে উঠল।

রঘুনাথ লজ্জা কাটিয়ে বলল, আমাদের গাঁয়ে যেও। চালের উপর পুঁইশাক হয়েচে। কেটে দেবো।

—না বাবা, পুঁইশাকের জন্য নয়। যদি যাই তো শুধু তুমাকে দেখতে যাব। অমায়িক হেসে অবনী

তার খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল, তুমার দাদু ওষুধ খাওয়ার পর কেমন থাকে জানিও। তেমন হলে তুমি আমার সাথে দেখা করো। আমি ডাক্তারবাবুকে বলে ভালো ওষুধ লিখিয়ে নেব। অবনীর কথায় কী জাদু ছিল, যার ছোঁয়ায় রঘুনাথের সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল, সে অবাক করা চোখে অবনীকে দেখছিল। তার মনে হল গুয়ারাম যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দু-চোখে উপছে পড়ছে স্নেহের সমুদ্র।

বেলা বাড়ে। রঘুনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠল, আমি যাই। ঘরে মেলা কাজ পড়ে আচে। আজ দাদুর গা-হাত-পা মুছিয়ে দেব। যাওয়ার সময় বাজার থেকে সাবু কিনতে হবে। সাবু ছাড়া দাদু এখন কিচু খাচ্চে না। মুখে অরুচি হয়েচে।

যাও, যাও। তুমার অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম। খাকি প্যান্ট-জামার ধুলো ঝাড়ল অবনী, তা বাবা, তুমার নামটা তো জানা হলো না। কী নাম তুমার?

—আজ্ঞে, রঘুনাথ রাজোয়ার। পাকুড়তলায় গিয়ে আমার নাম বললেই হবে। সবাই আমাদের ঘর দেখিয়ে দেবে। রঘুনাথের কথাবার্তায় সারল্য ফুটে উঠল।

অবনী অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে উঠল, তুমার মতোন আমারও এট্টা ছেলে আচে। ওর নাম শুভ। বাঁধধারের বড়ো ইস্কুলে পড়ে। এর পরের বার এলে আমার কুয়াটারে এসো। শুভ'র সাথে আলাপ হয়ে যাবে।

রঘুনাথ পাকা রাস্তায় উঠে এলেও অবনীর মুখটা তার মন থেকে মুছে গেল না। কিছু কিছু ছবি থাকে যেগুলো স্মৃতিতেও রক্তমাংসের মুখ। অবনী ছবি নয়, রক্তমাংসের মানুষ। ওর শরীরে হাড়ের চাইতে স্নেহ-দয়া-মায়া বেশি। এমন মানুষ সবার বন্ধু হয়। এমন মানুষ এ সমাজে দুর্লভ।

সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতা বুকে নিয়ে একা পথ হাঁটছে রঘুনাথ।

কাশীনাথকে আর দেখা যায় না, পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে তার স্বাভিমানী চেহারা।

দিনভর বৃষ্টির কোনো বিরাম নেই। গাছের পাতা চুঁইয়ে জল ঝরছে হরদম। মাটি ভিজে নরম হয়ে আছে হলদিপোঁতার মুখখানা। বাঁধের উপর হাঁটতে এখন ভয় পায় দুর্গামণি।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়ে পড়েছে চুনারাম।

দেশ-গাঁয়ে এখন আকাল চলছে কেরোসিনের। চড়া দামে বাজার থেকে কিনতে হচ্ছে কেরোসিন। এর চেয়ে মিঠে তেলের প্রদীপ ঢের ভালো। একবার ধরালে টিমটিম করে চলে অনেকক্ষণ। ঘর আলো নিয়ে কথা।

রঘুনাথ বিছানা নেওয়ার পরেই শুরু করেছে নাকডাকা। ছেলেটা ওর বাপের স্বভাব পেয়েছে। বিয়ের রাতে মানুষটার নাক ডাকার শব্দে ঘুমাতে পারেনি দুর্গামণি। মাস দুয়েক পরে তা মানিয়ে যায়। এই নিয়ে পাড়ার বউদের অনেক কথা শুনতে হয়েছিল তাকে।

—কী ব্যাপার চোখের কোল বসে গিয়ে কাচের গায়ে কালি পড়েচে যে! শরীল সামলে মৌজ-মোস্তি কর। নাহলে মরবি।

ইঙ্গিতটা ভালো নয় তবু হেসে সব হজম করেছিল দুর্গামণি। নাকডাকার কথা সে বলতে পারেনি ওদের। বললে ওরা বিশ্বাসই করবে না। এরও অনেক পরে পেটে আসে রঘুনাথ। স্পষ্ট মনে আছে—বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল দুর্গামণি। শাশুড়ি তার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিল, ভয় পাবে কেন গো বিটি। তুমার নারী জেবন সার্থক হল। গাছে ফল না ধরলে সে আবার কিসের গাছ? যাই, শীতলাথানে গোটা ফল চড়িয়ে আসি। বলেই একটা গোটা পেয়ারা নিয়ে সে খুশি মনে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছে সন্ধের পর থেকে। আজ আর খুশি মনে ঘর থেকে বেরতে পারল না দুর্গামণি। মনের ভেতর পশ্চিমী হাওয়া বইছে তার। বুড়িগাঙের জল বেড়ে বুঝি বান আসবে এখুনি। কোনোমতে নাকে-মুখে গুঁজে সে দুটো খেয়েছে। খাওয়ার সময় রঘুনাথের মুখের দিকে তাকাতে তার কষ্ট হয়েছে। ছেলেটার যে কী হল তা মা শীতলাবুড়িই জানে। যতদিন যাচ্ছে তত যেন ঝিমিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। মনে তার কোনো স্ফূর্তি নেই। আগে গাঙের জলের মতো সে উছলে উঠত কথায় কথায়। এখন উচ্ছ্বাস তো দূরে থাক এক চিলতে হাসিও তার ঠোঁটে দেখা যায় না। সারাক্ষণ কী যেন ভাবছে। কী ভাবছে তা আর অজানা নয় দুর্গামণির। সুফল ওঝার মেয়েটাই তার মাথা খেয়েছে। বড়ো ধড়িবাজ মেয়েটা। পুকুরের চালাক রুইমাছের মতো খেলিয়ে একদিন সে সরে পড়বে। এসব মেয়েরা নিজের ভবিষ্যৎ-এর কথা আগে ভাবে। ওদের কাছে প্রেম-পীরিতি কাঁচা বয়সের শরীরের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। দুদিন গেলেই সেই ভালোবাসার রঙ ফিকে হয়ে আসবে। তখন আম একদিকে আঁটি আর একদিকে পড়ে থাকবে। আমে-দুধে গড়াগড়ি খাবে। রঘুনাথ আঁটির মতো শরীর নিয়ে বেঁচে থাকবে। একবার যদি কেউ মন খুবলে দেয় সে মনের কি দাম থাকল? খুবলে খাওয়া ফল আর খুবলে খাওয়া মন দেবতার ভোগে লাগে না। দুর্গামণির শরীর শক্ত হয়ে গেল চলতে-চলতে।

এখন বাঁধের উপর আঁধার নেমেছে চাপ চাপ। মাত্র বিশ হাত নীচে খলবল করছে বুড়িগাঙ। মাঠ-আগোলদারের গলা ভেসে আসছে বাতাসে। সাঁঝ লাগার মুখেই খেয়ে নেয় চুনারাম। রঘুনাথও দাদুর পাশে বসে পড়ে খাওয়ার জন্য। এসব সেই কবেকার অভ্যাস, চট করে ছাড়তে চায় না। সাঁঝরাতে খেয়ে ভোররাতে ওঠা ওদের স্বভাব।

দুর্গামণি দূরের ঘরগুলোর দিকে তাকাল। টিমটিম করছে ঘরগুলো। বেশির ভাগ ঘরই অন্ধকার। বাঁধ থেকে পাড়ার মধ্যে নেমে এল দুর্গামণি। এসময় বাঁধের উপর লোক চলাচল কম। শুধু যারা কালীগঞ্জে তাস খেলতে যায় তাদের কথা আলাদা। তারা সাইকেলের প্যাডেল ঘোরায়, হাতে দুই ব্যাটারির টর্চ। ঝড়-বৃষ্টিকে ওরা তোয়াক্কা করে না।

আজ ওদের দেখা পেল না দুর্গামণি। নিশ্চিন্তে সে পাড়ার ভেতর ঢুকে এল। ভূষণী বুড়ির ঘরটাতে আলো নেই। তরল আঁধারে ঘরটাকে কেউ চুবিয়ে দিয়েছে। মনসা গাছটাকে পাশ কাটিয়ে দুর্গামণি উঠোনের দিকে এগিয়ে গেল। দু-একটা জোনাকি মাথার উপর পিটপিট করে জ্বলছে। আজ আর জ্যোৎস্না ফুটবে না, আকাশের কপালের টিপ হয়ে হাসবে না চাঁদ। আজ ঘোরতর অমাবস্যা।

আঁধার রাতকে তবু দুর্গামণির শুভ মনে হয়।

আগড় খুলে সে ঢুকে যায় ভূষণী বুড়ির উঠোনে। পোষা কুকুরটা তাকে দেখে লেজ নাড়ে। শব্দ করে কুঁইকুঁই। কুকুরের এই শব্দ ভূষণীবুড়ির কাছে সংকেত পৌঁছে দেয়। বিছনায় সতর্ক হয়ে বসে ভূষণীবুড়ি অন্ধকারের দিকে তাকাল। পায়ের শব্দটা ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। ভূষণীবুড়ি অন্ধকার চিরে গলা ভাসিয়ে দিল, কে, কে গা?

—আমি দুর্গা। নিচু গলায় উত্তর দিল দুর্গামণি।

—ওঃ, শুয়ার বউ। আয়, আয়। তারপর সে অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজতে লাগল দেশলাই, না পেয়ে বিরক্তি উথাল উঠল তার শরীরে, দিয়াসিলাইটা যে কুথায় রেকেচি কে জানে। দাঁড়া বউ, দাঁড়া। খুঁজে দেখি। খুঁজতে খুঁজতে ভূষণীবুড়ি একসময় দেশলাইটা পেয়ে গেল। ডিবরি ধরিয়ে ডাকল, আয় বউ, ভিতরে আয়। পথ দেখানোর জন্য ডিবরিটা উঁচু করে তুলে ধরল সে।

দুর্গামণি মাথা নিচু করে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। বারো বাই বারো হাত মাপের ঘর, মাথার

উপর পচা খড় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ভরা বর্ষায়। রোদ উঠলে এই দুর্গন্ধ আরও বাড়বে।

দুর্গামণি কপাল কুঁচকাল, মাসী গো তুমার কাচে আসতে হল। দিনমানে সময় পাই না, তাই রাতকালে এলাম।

—বল বউ বল, আমায় কি করতে হবে?

—আমার ভারি বিপদ গো।

—কি বিপদ, কিসের বিপদ?

—ছেলেটা মুটে কথা শুনচে না। ওর মতি-গতি বুনো হাওয়ার মতোন, আমি কিচু বুঝতে পারচি না। দুর্গামণি হাঁপ ছেড়ে তাকাল।

—এখন কাঁচা বয়স, অক্ত টগবগ করে ফুটচে।

—তা লয় মাসী। ও মেয়েছেলের খপ্পরে পড়েচে।

—একী সব্বোনাশের কথা রে? ভূষণী বুড়ি নড়ে-চড়ে বসল, তা মেয়েছেলেটার নাম কি? কুথায় থাকে?

—তারে তুমি চেনো। দুর্গামণির উত্তেজনার পারদ চড়ছিল, সুফল ওঝার মেয়ে কমলা গো। সে আমার ছেলের পেচনে লেগেচে। আর ছেলেও চামএঁটুলির মতন ওর গায়ে লেগে গিয়েচে। শুতে বসতে খেতে মেয়েটার নাম না নিলে ও ক্ষ্যাপা হয়ে যায়। এখুন বলচে—তারে ব্যা করবে।

মুহূর্তে ভূষণীবুড়ি ফিরে গেল তার যৌবনে। নীলকণ্ঠর মুখটা ঘাই দেওয়া বোয়ালমাছের মতো নড়ে উঠল তার মনে। দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে সে দুর্গামণির দিকে তাকাল, এই বয়সটাতে ছেলে-মেয়েদের এট্টু উড়ুউড়ু স্বভাব হয়। ভাদুরে কুকুরগুলার মতো ছুঁকছুঁক করে। এটাকে পীরিত করা বলে না, বলে কেচ্ছা। রঘুকে এ পথ থিকে সরাতে হবে। তবে এতে সুফল ওঝার যদি গোপন চাল থাকে তাহলে আমি পারব না। তখন তোরে যেতে হবে বাদকুল্লা। সিখানে মস্ত বড় গুণিন আচে। সে গুরুমারা বিদ্যে জানে। এক ফুঁয়ে পাশার ছক বদলে দেবে।

—আমি অতদূর কি যেতে পারব, মাসী?

—এখুনি তোকে যেতে হবে না। আগে আমি চিষ্টা করে দেখি। আমি ফেল হয়ে গেলে ছেলে বাঁচাতে তুকে সিখানে যেতে হবে। ভূষণীবুড়ির নিরাসক্ত কণ্ঠস্বর, এবার খোলসা করে বল তো কি হয়েছিল?

দুর্গামণি যতটুকু বলা যায় ঠিক ততটুকুই বলল, আমার ঘরের রঘুটা রাতকালে মেয়েটার ঘরে চলে যায়। ভাবো তো ওর মা-বাপ যদি টের পায় ছেলেটাকে কেটে দু-টুকরো করে দেবে। দুর্গামণি কথা শেষ করে ফুঁপিয়ে উঠল, তুমি তো জানো—ওর বাপ ঘরে নেই। এখুন যদি কিচু হয়ে যায়, আমি কি মানুষটার কাচে জবাব দিব।

—ঠিক আচে, মাথা ঠাণ্ডা করে বস। গণনা করে দেখি কতদূর কী করা যায়। মাটিতে খোলামকুচির দাগ কেটে আঁকিবুঁকি করল ভূষণী বুড়ি। তারপর মুখ উঠিয়ে চোখ কপালে তুলে বলল, কেস সুবিধের লয়। ওরে বশীকরণের শিকড়ি খাইয়েচে পানের সঙ্গে।

—রঘু তো পান খায় না। বিস্ময়ে দুর্গামণির চোখ অস্বাভাবিক হয়ে উঠল। ভূষণী বুড়ি বেদম কেশে বলল, আমার গণনা তো ভুল হবার নয়। ঠিক আচে—আমি আবার গুণচি।

আবার মাটির মেঝেতে আঁকিবুঁকি দাগ কাটল ভূষণীবুড়ি, দীর্ঘসময় ধরে গণনা করে বলল, বলচিলাম না, আমার গণনা ভুল হবার নয়। আবার দুয়ে দুয়ে চার হল। সব ঝামেলা মিটে গেল।

—তার মানে? দুর্গামণির অবুঝ চোখে জিজ্ঞাসা।

—তুই কাল সকাল সকাল আসবি। আমি তোকে মাদুলি বানিয়ে দেব।

—মাদুলি?

—হ্যাঁ। অস্ত্র ছাড়া লড়াই হবে কি করে? ভূষণীবুড়ির ঠোঁটে স্বস্তির হাসি খেলে গেল, ওই মাদুলির একুশটা গুণ। ওই মাদুলি ধারণ করলে শুধু কমলা কেন ডাকিনী যোগিনী কেউই ছুঁতেও সাহস পাবে না।

—বল কি? দুর্গামণির গলা কেঁপে উঠল বিস্ময়ে, তাহলে কাল আমি ঠিক সকালে আসব।

—আসার সময় পেছন ফিরে তাকাবি না। পেছন ঘুরে দেখলে হওয়া কাজ হয় না। ভূষণীবুড়ি সতর্ক করল।

দুর্গামণি তাকে পাল্টা চাপ দিল, ফিসফিসিয়ে বলল, আমি যা বললাম এ কথা যেন দু-কান না হয়। তাহলে সুফল ওঝা রঘুর ক্ষতি করে দেবে।

—সুফল তো ছেলেমানুষ, ওর মরা বাপেরও ক্ষেমতা হবে নি। আত্মসম্মানে ঘা লাগতেই চটে উঠল ভূষণীবুড়ি।

শেকড় ছোঁয়ানো ফণা তোলা সাপের মতো ঝিমিয়ে গেল দুর্গামণি, গলা খাদে নামিয়ে কুণ্ঠিত হয়ে বলল, মনে দুখ লিয়ো না। কী বলতে কি বলে ফেলেচি। ছেলের চিন্তায় মাথাটা আমার ঠিক নেই।

—যা বউ, কতা আর বাড়াস নে। কাল সকালে আসিস। ভূষণীবুড়ির কথায় গাম্ভীর্য ফুটে উঠল।

দুর্গামণি ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কিছুটা হলেও তার মনের ভার কমে এসেছে। দয়ালের মৃত্যুর পর ভূষণী ময়ূরভঞ্জ চলে গিয়েছিল। সেখানে বেশিদিন থাকেনি তবু যা শিখে গাঁয়ে ফিরেছে তার দাম নেহাৎ কম নয়। নীলকণ্ঠকে কি সে বশ করেছিল মন্ত্রবলে? যারা নিন্দুক তারা এ কথা আজও রটিয়ে বেড়ায়।

ভূষণী বুড়ির হৈ-চৈ নেই। সে বয়স্ক কুসুমগাছের মতো গম্ভীর আর লক্ষ্যভেদী। তার মন্ত্র সাপের মতো এঁকেবেঁকে নয়, চলে তীরের মতো সোজা। মা শীতলার দয়া হলে রঘুর প্রেমের ঘুড়িটা কমলার মনটাকে কেটে দিয়ে ছেইরে হয়ে উড়বে। তার নাগাল আর কোনোভাবে পাবে না রঘুনাথ। হাওয়ায় ভাসা ঘুড়ি আর চৈত্রমাসের ফাটা শিমুলতুলোর স্বভাব একই।

টানা বর্ষায় ভরে উঠেছে মাঠ-ঘাট।

ফিটকিরি রঙের জলগুলো ফিট ব্যামোর রুগির মতো শুয়ে আছে অসাড়। মাঠপালান হাওয়ায় সেই জলে মাঝেসাঝে সুড়সুড়ি দেওয়ার মতো ঢেউ ওঠে। চার আঙুল উঁচু সেই টেউগুলো গুড়ুলপাখির মতো জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দৌড়োয়। বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে রঘুনাথ এসবই দেখছিল।

বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা পুরোপুরি থেমে যায়, আবার উৎপাত শুরু হয় সাঁঝের পর থেকে। লাল-চা খেয়ে ঘর থেকে বেরনোর সময় দুর্গামণি বলল, অবেলায় আবার কুথায় যাবি বাপ। ঘরে থাক। কখন যে বৃষ্টি হামলা চালাবে তার তো কুনো ঠিক নাই।

রঘুনাথ একবার ভাবল—সে বেরবে না। কিন্তু বিকেল হলে মনটা কেমন ছটফট করে, ঘরে

বসে থাকতে একেবারে মন সায় দেয় না। বাইরে না বেরলে গুমোট হয়ে থাকে মন। এসময় জামতলায় বসে বিড়ি ফুঁকলে এমন সুখ আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

কমলার সঙ্গে বুড়িগাঙের পাড়ে দেখা হয়েছিল রঘুনাথের। ওর শাঁখের মতো মাজা শরীর চিন্তায় নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল। এমন মনমরা, গোড়াকাটা গাছের মতো ঝিমুনিভাব কোনোদিন দেখেনি রঘুনাথ। ফলে এগিয়ে গিয়ে যে কিছু জিজ্ঞেস করবে তেমন সাহস আর হল না। ওদের ঘনিষ্ঠতার খবরটা সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিন ঘরে এসে সুফল ওঝা শাসিয়ে গেল দুর্গামণিকে, ছেলেকে সামলাও। ওর নজর এখন উপরপানে। নিজেকে যদি না বদলায় তাহলে পরে ওর ডিমা দুটা আমি উপড়ে নেব।

কথাটায় কাঁপুনি ছিল, জ্বরো-রুগির মতো কেঁপে গিয়েছিল দুর্গামণি। কাঁচা পয়সার মুখ দেখে সুফলের মাথা ঘুরে গিয়েছে। পয়সার গরমে তার এখন ধরাকে সরাজ্ঞান।

গুয়ারাম ঘরে থাকলে এমন অন্যায় মেনে নিত না। এমনিতে সাত চড়ে রা কাড়ার মানুষ নয় সে। তবু অন্যায় দেখলে তার মাথায় কাঁকড়াবিছে কামড়ে দেয়। পারুক না পারুক সে প্রতিবাদ করবে গলার রগ ফুলিয়ে।

দুর্গামণির অপমান হজম করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। সুফল ওঝা কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে হঠাৎ আসা ঝড়ের মতো মিলিয়ে গেল। সেই থেকে মনের ভেতর তছনছ শুরু হয়েছে দুর্গামণির। একা একা সে জ্বলছে। একথা চুনারাম বা রঘুনাথকে সে বলতে পারেনি। যদি সে বলত তাহলে লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যেত তাদের উঠোনে। সুফল ওঝাকে আর মাথা উঁচু করে সাইকেল নিয়ে চলে যেতে হত না।

দুর্গামণির মনটা থেঁতলে যাওয়া কুমড়োর মতো রস চুয়াচ্ছে সর্বদা। ভয়টা তাকে তাড়া করছে মাঝে মাঝে।

পশ্চিমে সূর্য ঢলে যেতেই রঘুনাথ উঠে দাঁড়াল ঘরে ফেরার জন্য। আজও সূর্যাক্ষর সঙ্গে তার দেখা হল না। আর ক'মাস পরে ওর পরীক্ষা। দ্বীপীর কথা তার মনে পড়ল। দ্বীপী কেমন আছে কে জানে।

রঘুনাথ ধাওড়াপাড়ার দিকে হাঁটছিল। বাঁধের উপরটা প্যাচপ্যাচ করছে কাদায়। এঁটেলমাটির কাদা পা-হড়কে দিতে পারে যে কোনো সময়।

রঘুনাথের পা হড়কাল না, তাকে জ্ঞে'র করে ঠেলা মেরে বাঁধের উপর ফেলে দিল কাশীনাথের দলবল। ওরা তৈরি হয়েই এসেছিল। রঘুনাথের বুকের উপর একজন চড়ে বসে বলল, ঢ্যামনার বাচ্চা। আজ তোর একদিন কী ...আমাদের একদিন। আজ ভাদুপরবের চোলাই তোর পেট থেকে বের না করে ছাড়ব না।

—তুমরা কি চাও? রঘুনাথ জানতে চাইল বহু কষ্টে।

—আমরা চাই তোর টাটকা মাথা। কথা ফুরোল না, আর আগেই চড় কিল ঘুষিতে তৎপর হয়ে উঠল হিংস্র হাতগুলো। রঘুনাথ দেখল মাত্র হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে কাশীনাথ। ওর ঠোঁটে প্রচ্ছন্ন গর্ব। সেই গর্বে কঠিন হয়ে উঠছে ওর ঠোঁট দুটো।

এমন ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না রঘুনাথ। আচমকা আক্রমণে সে কিছুটা কাহিল। পর মুহূর্তে সে গা ঝাড়া দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল হামলে পড়া তিনজনকে। তারপর চিৎকারে বাতাস ফাটিয়ে হুঁকরে উঠল সে, বেধুয়ার ছা'রা আমাকে মারচে, দাঁড়া দেকাচ্ছি মজা। রঘুনাথ বাঁধের গোড়ায় একটা আধলা ইট দেখতে পেয়ে ছুটে গেল ক্ষিপ্র গতিতে। আধলা ইটটা তুলে নিয়ে সে বুনো মোষের

মতো তেড়ে গেল রুদ্ধশ্বাসে। মাটি কেঁপে গেল যেন। যেন ঝড় উঠল। ভেঙে গেল বাঁধ। সজোরে ইঁটটা কাশীনাথের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল সে। পাখিমারা টিপ ব্যর্থ হল না। আধলা ইটের আঘাতে কাশীনাথ 'বাপ রে' বলে ঠিকরে পড়ল কাদায়। চারপাশে ছড়িয়ে গেল কাদাজল। রে-রে করে তেড়ে এল বাদবাকিরা। সামনাসামনি লড়াই হলে রঘুনাথ ওদের সঙ্গে পারবে না। ওরা অবশ্যই তাকে ঘায়েল করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে।

বেড়ার পাশ ধরে বুনো বেগে ছুট দিল রঘুনাথ। হঠাৎ একজনের গরম নিঃশ্বাস তার ঘাড়ের উপর পড়তেই সে পাশের বেড়ার দিকে তাকাল। ঝিঙেলতা জড়িয়ে আছে কঞ্চির বেড়ায়। মাঝেমাঝে হলুদফুল ফুটে আছে ঝিঙেগাছের গয়নার মতো। কিছু দূরে দূরে খুঁটিবাঁশ পোঁতা।

'জয় মা শীতলাবুড়ি।' রঘুনাথ বেড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখের পলকে টান দিয়ে একটা খুঁটি বাঁশ উপড়ে নিল। বাঁশটা আঁকড়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরে বুঝি অপদেবতা ভর করল। মাথার উপর খুঁটিবাঁশটা তুলে ধরে সে বোঁ-বোঁ শব্দে উন্মাদের মতো ঘোরাতে লাগল, আয়। মায়ের দুধ খেয়ে থাকলে এগিয়ে আয়।

মুখের দু'পাশে গাঁজরা উঠে এল রঘুনাথের। সে গো-হাঁপানো হাঁপাচ্ছে। তার বুক কামারশালার হাঁপরের মতো ওঠা-নামা করছে ঘনঘন। খুঁটিবাঁশটা মাথার উপর তুলে সে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।

বিকেলবেলায় স্বাস্থ্যরক্ষার কারণে অমলকান্তিবাবু রোজ হাঁটতে বেরন। তিনি হঠাৎ খণ্ডযুদ্ধের এই দৃশ্য দেখে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলেন। স্কুলের ছেলেরা খোলা বাঁধের উপর নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে এটা কোনোমতে বরদাস্ত করা যাবে না। তিনি দূর থেকে চিৎকার করে উঠলেন, এ্যায়, লাঠি ফেলে দাও। কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমাদের? কেন নিজেদের মধ্যে মারামাবি করছ? অমলকান্তিবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন। অন্ধকার তখনও পুরোপুরি গাঢ় হয়নি। রঘুনাথকে চিনতে পারলেন তিনি, এ্যায় রঘু। বাঁশটা নামাও। মারামারি করলে কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

রঘুনাথ হাতটা শিথিল করতেই খুঁটিবাঁশটা তার পায়ের কাছে পড়ে গেল। মুখের গাঁজরা মুছে নিয়ে রঘুনাথ উত্তেজনায় ভেঙে পড়ল, মাস্টারমশাই, ওরা ভেবেছিল একলা পেয়ে আমাকে গুম করে দেবে। কিন্তু মা শীতলাবুড়ি আমাকে বাঁচিয়ে দিলো।'

—শান্ত হও। মাথা ঠাণ্ডা করো। অমলকান্তি বোঝাবার চেষ্টা করলেন, এ্যায়, তোমরা কারা? কোথায় থাকো? কেন এসব করছো? এসব করে কি সুখ পাও তোমরা?

তিনটে ছেলে হকচকিয়ে তাকাল।

কাশীনাথ মাটি আঁকড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কোনোমতে। ওর সারা শরীর কাদায় মাখামাখি। কপাল চুয়ানো রক্ত গালের দু'পাশে জমাট বেঁধে জোঁকের মতো শুয়ে আছে। তবু ও টলতে-টলতে অমলকান্তিবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল, স্যার, এই রঘু...আমার বোনের সর্বনাশ করে দিয়েছে। আমার বোন—। কথা শেষ করতে পারল না কাশীনাথ, কান্নার ঝড়ে গুমরে উঠল সে।

অমলকান্তিবাবু কাশীনাথের কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন, শান্ত হও। তোমাকে আমি ভালো ছেলে বলে জানতাম। বড়ো হচ্ছো। এখন পথে-ঘাটে মারামারি করা কি তোমাদের শোভা দেয়?

কাশীনাথ মুখ নামিয়ে নিল না; সংকোচ, লজ্জা বা অনুশোচনা কোনোকিছুই তার মধ্যে সংক্রামিত হল না। অমলকান্তিবাবুর চোখে চোখ ফেলে সে বলল, আজ রঘু বেঁচে গেল কিন্তু আজকের দিনটাই শেষ দিন নয়। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন নিয়ে একটা বছর হয়। একটা দিন বরবাদ হলে কিছু যায় আসে না। কাশীনাথ এবার তার সঙ্গীদের দিকে তাকাল, চল। এক মাঘে শীত যাবে না। রক্তের বদলা আমি রক্ত দিয়ে নেব। আমিও সুফল ওঝার ছেলে। যত বড়ো ফণা তুলুক না কেন সাপ—সেই সাপের বাঁচা-মরা সব আমার হাতেই থাকল।

টিপটিপিয়ে বৃষ্টি শুরু হতে ওরা আর দাঁড়াল না, জামতলা পেরিয়ে দৌড় লাগাল গাঁয়ের দিকে। বৃষ্টির শব্দটা কখনও কখনও যুদ্ধের শব্দ বলে মনে হয়।

অমলকান্তিবাবু ছাতার নীচে ডেকে নিয়েছেন রঘুনাথকে, তোমাদের সমস্যাটা কি বলো তো?

রঘুনাথ দ্বিধা সরিয়ে তাকাল, ওর বুনের সাথে আমার ভাব হয়েচে। কিন্তুক ওরা কমলাকে আমার সাথে মিলামেশা করতে দেবে না। আমি ছোট জাত। এই নিয়ে ওদের মনে গুঁজকাটালি।

—মেয়েটা কি সত্যি তোমাকে ভালোবাসে?

রঘুনাথ অবাক চোখে তাকাল, আমার সাথে ঘর বান্‌তে না পারলে কমলা পাগল হয়ে যাবে। এখুনই পাগল হয়ে গিয়েচে। মা-বাপ ওকে অন্য জায়গায় ব্যা দিবে।

সমস্যাটা অনেক গভীরে। কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না অমলকান্তিবাবু। গ্রাম- সমাজের দ্রুত বদল ঘটছে। বর্ণবৈষম্য এখনও গোপন-রোগের মতো ছড়িয়ে আছে গ্রামে-গঞ্জে। খবরের কাগজের পরিসংখ্যান কিংবা সরকারি বিজ্ঞাপন দেখে এর অনুমান করা যাবে না। যতই আলো এসে পড়ুক তবু এই কঠিন চাপবাঁধা অন্ধকার সহজে অপসারিত হবার নয়।

কালীগঞ্জ-লাখুরিয়ায় অমলকান্তিবাবুর অনেকগুলো বছর অতিবাহিত হল। এখনও কুসংস্কারের সব লৌহকপাট তিনি কি ভাঙতে পারলেন? এসব সমাজ সংস্কারের কাজ সফলভাবে করতে গেলে যে শিক্ষার প্রয়োজন হয়, সেই পরিকাঠামো এখনও তৈরি হয়নি।

ধাওড়াপাড়ার কাছে এসে অমলকান্তিবাবু বললেন, তুমি এবার বাড়ি যাও। আমি এখান থেকে ফিরব। আজ যা আবহাওয়ার অবস্থা, আজ বেশিদূর যাওয়া আমার উচিত হবে না।

অমলকান্তিবাবু ফিরে যেতেই রঘুনাথ ঘরের দিকে গেল না। কী মনে করে সে সোজা চলে গেল বুড়িগাঙের কোলে। সারা শরীর কাদা-জলে মাখামাখি। এ অবস্থায় ঘরে ফিরলে দুর্গামণির প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হবে।

নিজের দিকে একবার তাকাল রঘুনাথ, তারপর বুড়িগাঙের পাড় থেকে সে সশব্দে লাফিয়ে পড়ল জলের উপর। অন্ধকারে সাঁতরে সে চলে গেল বহুদূরে। ক্লান্ত হয়ে আবার ফিরে এল পাড়ে। কপালের কাছটা সুপারির মতো ফুলে আছে। এতটাই ফোলা যে দুর্গামণির নজর এড়াবে না। এ ফোলা সহজে মেলাবারও নয়।

ভেজা কাপড়ে বাঁধের উপর উঠে এল রঘুনাথ। তার গা-হাত-পা টলছে। বাতাস লাগা বাঁশপাতার মতো মাঝেমধ্যে কেঁপে উঠছে শরীরটা। একটা শীতভাব এখন ছড়িয়ে আছে চারপাশে। ভোরের দিকে এই শীতানুভূতি আরো তীব্র হয়।

দুর্গামণির মন খারাপ থাকলে মুখের দোক্তা তেতো লাগে। বিড়ি খেলে তখন মগজের চিন্তাগুলো ফাঁসজাল কাটা টুনটুনি পাখির মতো উড়ে পালায়। মাঠে-ঘাটে খাটতে গেলে বিড়ি না হলে তাদের চলে না। নেশার জিনিস কঠিন কাজে সরল গতি আনে। দুর্গামণির মায়ের মা বিড়ি খেত। তার মা বিড়ি না পেলে সংসারে অশান্তি বাঁধিয়ে দিত। শুধু শুকনো নেশা নয়—তরল নেশাতেও তার আসক্তি প্রবল। বিশেষ করে ভেলিগুড়ের মদ পেলে সে মাংসের বাটিও ঠেলে দেবে।

নেশা করার ধারাটা দুর্গামণি ধরে রেখেছে। রঘুনাথ বড়ো হওয়ার পর থেকে নেশা করতে তার বাধো বাধো ঠেকে। তবু মন ছটফটালে লম্ফর আগুন থেকে বিড়ি ধরিয়ে সে সুখটান দেয়। পুরুষের মতো ধোঁয়া ছাড়ে, ধোঁয়া গেলে।

চুলার পাশে গালে হাত দিয়ে তুষজ্বাল ছুঁড়ে দিচ্ছিল দুর্গামণি। আগুনের হলকা চুলার ঝুঁটি ছুঁয়ে দিচ্ছে বারবার। রঘুনাথ দুর্গামণিকে পাশ কাটিয়ে যেতে গেলেই ধরা পড়ে গেল, কুথায় গেচিলিস, এত রাত হলো যে?

মুখ তুলে রঘুনাথের দিকে তাকাতেই সে চমকে উঠল, 'কপালের কাছটা ফুলালি কিভাবে?

—বাঁধের ধারে পা পিছলে পড়ে গেলাম। বড্ড লেগেচে। কাদা-জলে সারা গা-গতর ভরে গেল। বুড়িগাঙে তাই ডুব দিয়ে ফিরলাম। রঘুনাথ আসল ঘটনা লুকোবার চেষ্টা করল।

—মিচে কথা কেনে বলচিস বাপ? দুর্গামণির মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, ভেজা মাটিতে পড়ে গেলে কি কপাল এমন ফোলেরে! তোরে নেশ্চয়ই কেউ মেরেচে। বল, কে মেরেচে তুরে?

—আমাকে মারবে কার ঘাড়ে এত সাহস আচে? রঘুনাথ বুক চিতিয়ে দাঁড়াল, আমার গায়ে হাত তুলার লোক এ গাঁয়ে জন্মায়নি।

তবু মন থেকে সন্দেহ মুছল না দুর্গামণির, এই ছেলেই তার যত চিন্তার গোড়া। ঝিম ধরে বসে থেকে দুর্গামণি তুষ ঠেলে দিচ্ছিল চুলার ভেতর।

কমলা কী চায় সে এখনও বুঝতে পারছে না স্পষ্ট। বয়স্ক মানুষের ঝাপসা দৃষ্টির মতো তার কাছে সব ধোঁয়াশা ঠেকে এখন। ভালোবাসায় শক্তি প্রবল। কিন্তু সেই শক্তি কি কমলার ভেতরে আছে? গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায় অনেকে। কমলা কোন দলে এখনও স্পষ্ট বুঝতে পারে না দুর্গামণি। ফলে ভয় তার মনে তাঁবু গেড়ে আছে।

কলাবতীর সঙ্গে ক'দিন আগে দেখা করতে গিয়েছিল দুর্গামণি। কিন্তু কলাবতী তার উপস্থিতিকে গুরুত্ব দিল না। এমন কী বসতেও বলল না সকালবেলায়। ওর চেহারায় ফুটে বেরচ্ছিল চাপা রাগ।

দুর্গামণি গায়ে পড়ে বলল, দিদি, সবই তো জানো, এখন আমার কী করণীয় বলে দাও।

—আর ন্যাকা সেজো না। ফুঁসে উঠেছিল কলাবতী, ষাঁড় লেলিয়ে দিয়ে আমাকে বলছ গোরু সামলাও? যাও, যাও। আমার কাছে আর নাকে কেঁদো না। আমি তোমার মনের ইচ্ছে সব বুঝে গিয়েছি। আমার মেয়েটার সরল মনের সুযোগ নিয়ে তোমরা জাতে উঠতে চাইছ।

—এ কী বলচো গো দিদি? জাত কি পাকুড়গাছ, যে মন চাইলে উঠে যাব। দুর্গামণি দ্বিধার সঙ্গে বলল, ভুল বুঝো না দিদি। এতে আমার কুনো হাত নাই।

—নেই তো এসেছ কেন? মুখ দেখালে কি ঝামেলা সব মিটে যাবে। কলাবতী ফুঁসছিল, তোমার ছেলের জন্য আমাদের নাওয়া-খাওয়া সব বন্ধ হয়েছে। গাঁয়ে আমি মুখ দেখাতে পারছি না। কী কষ্ট! কলাবতীর ঠোঁট ফুলে উঠল, তারপর সেই ফোলানো ঠোঁট কান্নার রঙে মিশে গেল। হকচকিয়ে দুর্গামণি বলল, কেঁদো না দিদি, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমার ঘরের কমলাকে টুকে ডাকো। ওর সাথে দুটা কতা বলে যাই।

—কী আর কথা বলবে, কথা বলার আছেই বা কি! কলাবতী এড়িয়ে যেতে চাইলেও দরজার আড়াল থেকে নিজেকে বের করে আনল কমলা। একটা বড়ো পিঁড়ি পেতে দিয়ে সে বলল, সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছো, বসো।

—বসতে আসিনি, মা। দুটা কথা বলে চলে যাব।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ বলো। কী বলতে চাও? কমলার কথা-বার্তায় কোনো জড়তা নেই।

দুর্গামণি কমলার মুখের দিকে অদ্ভুত এক মায়ার দৃষ্টি মেলে তাকাল, তুমাকে এট্টা প্রশ্ন শুধাই মা, তুমি যা করচো তা কি বুঝে-শুনে করচো?

কমলা অবিচলিত দৃষ্টিতে নিজের দিকে তাকাল, নিজের ভালোটা ক্ষ্যাপাও বোঝে। আমি ক্ষ্যাপা পাগলা কোনোটাই নই। মন চেয়েছে তাই মনের ডাকে সায় দিয়েছি।

দুর্গামণি মনে মনে খুশি হলেও তার উচ্ছ্বাস বাইরে সে মেলে ধরে না। কলাবতীকে সে আর দুঃখী দেখতে চাইল না।

মাথা উঁচু করে সে বেরিয়ে এল সুফল ওঝার দাওয়া থেকে।

বিয়ে নিয়ে তার মনেও অনেক টুকরো স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বিয়ের পরে প্রথামত ঘরের চালে উঠে গিয়েছিল বরবেশী গুয়ারাম। চাল থেকে সে কিছুতেই নিচে নামবে না। দুর্গামণি কাতর হয়ে ছড়া কেটেছে তাকে নামানোর জন্য।

চাল থিকে নামো তুমি
নিড়ান দিয়ে পুষব আমি।
তুমি ভাতার, তুমি সোয়ামী
সুহাগ দিব অঢেল আমি।
যেও না গো যেও না,
মাথার দিব্যি যেও না।
নেশায় আচে গু-গোবর
খেও না গো খেও না।

কত বছর পেরিয়ে গেল তবু ছড়াটা এখনও মাঝেমাঝে ঢেউ দিয়ে যায় দুর্গামণির মনে। আজ আরও বেশি করে মনে পড়ছে কেন না কমলা যদি তার ঘরের বউ হয়ে আসে সে কোনোদিন তার বরের মন ভেজানোর জন্য এমন ছড়া কাটবে না। কমলার কাছে এই পরিবেশ তেল আর জলের মতো, কোনোদিনও মিশ খাবে না।

দুর্গামণির টানে যুবক গুয়ারাম চলে যেত হরিনাথপুরের কদবেলতলায়। বাঁধের ধারে দুর্গামণিদের ঘরে গিয়ে সে মুখ গুঁজে পড়ে থাকত। দুর্গামণির বাবা-দাদা ওকে কত গায়ে চিমটি কাটা কথা বলত। তবু হুঁশ ছিল না গুয়ারামের। কী কথায় তার দাদা একদিন মারতে গিয়েছিল ওকে। সেদিন মুখ নিচু করে পাড়া থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল গুয়ারাম। যাওয়ার সময় বলে গেল, আর কুনোদিন কদবেলতলা ধাওড়ার মুক দেখবো না।

কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পারেনি। বাঁধের ক্ষ্যাপা জল যেমন বাঁধ ভেঙে দেয় তেমনি ভেসে গিয়েছে তার প্রতিশ্রুতি। তিন দিনের মাথায় আবার ফিরে এসেছে গুয়ারাম, সরকারি টিউকলের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে বলেছে, জান ইখানে, দেহটা কি না এসে থাকতি পারে? জানো, দুর্গা, কাল রাতভর তুমার জন্যি ঘুমোতে পারিনি। আর সে কী কষ্ট, চোখ বুজলেই তুমার মুখ, আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারচি না—তাই তুমার কাচে পেলিয়ে এলাম।

—দাদা দেকলে তুমাকে আবার অপমান করবে। দুর্গামণির অসহায় চাহনি।

—অপমান করলেও আমার কিচু করার নেই। পীরিতির হাঁড়িকাঠে যে একবার গলা দিয়েচে সে কি রেহাই পায় গো?

—এতই যদি সোহাগ-দরদ তাহলে আমারে লিয়ে চলো। আমার আর ভালো লাগচে না।

শেষ পর্যন্ত বিয়ের ফুল ফুটেছিল দুর্গামণির। চুনারাম এসে তার বাপের সাথে কথা বলে দিনক্ষণ সব ঠিক করে যায়। বিয়ে চুকে যাওয়ার পরে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে গুয়ারাম। বছরখানিক সে দুর্গামণিকে ঘুমাতে দেয়নি, শরীর জুড়িয়েছে বিছানায়। দুর্গামণিও প্রথম বর্ষার নদীর মতো শুষে নিয়েছে তাপ-উত্তাপ। সেই বাপের ছেলে রঘুনাথ, তার কাছে বেশি কিছু সংযম আশা করে না দুর্গামণি।

খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকতে সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়।

রঘুনাথের বিছানার পাশে চুপচাপ বসে থাকে দুর্গামণি। গোঁ-ধরা ছেলেটাকে বোঝাবে কার সাধ্যি।

দুর্গামণি কমলার প্রসঙ্গ তুলতে গেলেই রঘুনাথ তাকে থামিয়ে দেয়, কানের কাচে ঘ্যানরঘ্যানর

করো না তো, আর ভাল্ লাগে না। যাও গে, শুয়ে পড়ো।

—ঘুম আসে না রে বাপ, তুর চিন্তায় মরি। আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল দুর্গামণি।

ফোঁপানী এক সময় কান্নায় বদলে যায়। সেই কান্নার ধ্বনি বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে। রঘুনাথ দু'হাতে ভর দিয়ে বিরক্তিতে উঠে বসে বিছানায়। দুর্গামণির মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভেতরটা জ্বালাপোড়া করে ওঠে। দুর্গামণির কান্না যেন শুঁয়োপোকা হয়ে ঢুকে যাচ্ছে তার কানের গহ্বরে। শরীর ঝাঁকিয়ে রঘুনাথ চিৎকার করে ওঠে, তুমি আমার ভালো চাও না, কুনোদিনও ভালো চাও না। তার চেয়ে এট্টা কাজ করো,আমারে বিষডিবা এনে দাও। আমি খেয়ে মরি। আমি না মরা অব্দি তুমাদের কারোর শান্তি হবে না। বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল রঘুনাথ।

—যাস নে বাপ, ফিরে আয়। দুর্গামণির আকুল কণ্ঠস্বর বুড়িগাঙের জলে গড়িয়ে গেল।

সকালবেলায় মেঘের গোমড়া মুখ দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল দুলু কাহারের। কাজে না গেলে মনটা উশখুশ করে হরসময়। লালগোলা ট্রেন তাকে যেন ডাকে। চেনা গাছপালা মাঠঘাট নদী বিল সবাই যেন হাত উঁচিয়ে ডাকে। এক নিঃসীম শূন্যতা খাঁ-খাঁ করে বুকের ভেতর। ঘরে মন না ধরলে দুলু সময় কাটাতে চলে যায় পণ্ডিত বিলে। ওখানে বালিহাঁসের দল এসেছে ডিম পাড়তে। উলের বলের চেয়েও ছোট ছোট পাখিগুলো ভারি অদ্ভুত কায়দায় সাঁতার কাটে। ডুব আর সাঁতার এই হল পাখিগুলোর এগিয়ে যাওয়ার নিয়ম। ওরা ডিম পাড়ে নলখাগড়া অথবা শোলার বনে। একটা দুটো ডিম নয়, সব মিলিয়ে ছটা-সাতটা।

পাখির ডিম নয়, যেন পাখিগুলোকেই ভালোবাসে দুলু। তবে এই বিলের ধারে দাঁড়ালে আগের মতো তার এখন আর মন খারাপ করে না। ডান হাতটা কাটা যাওয়ার পর তার ভাগ্যটা বুঝি কেউ কেটে দিয়েছে ধার ব্লেডে এলোমেলো। পাল কোম্পানি কাটা হাতের কোনো ক্ষতিপূরণ দিল না। অথচ দুর্ঘটনার সময় তারা চাপে পড়ে কথা দিয়েছিলেন, সবরকম আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবেন। দুলু শক্তিনগর হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরেছে। সামান্য কটা টাকার জন্য পালবুড়ার কাছে গিয়েছিল। পালবুড়া মুখের উপর বলেছিলেন, যা দেবার সব দিয়েছি, আর আমার দ্বারা হবে না। একটা অকম্মা মানুষকে সারাজীবন ধরে পোষা কি সম্ভব? যা হবার হয়েছে, এবার আমায় মাফ করো।

হাত তুলে দিলেন পালবুড়া ফলে খালি হাতে ফিরে আসতে হল দুলুকে। বাঁশঝাড়ের কাছে এসে দুলু নিজের দুঃখ না সামলাতে পেরে কাঁদল। একটা হাত না থাকলে মানুষ কি বেকম্মা হয়ে যায়? ভুলে যেতে হয় সেই অসহায় মানুষটাকে? এসব হিসাব দুলুর মাথায় ঢোকে না। মানোয়ারা তার দ্বিতীয় আঘাত।

সবাই তাকে হাসপাতালে দেখতে এসেছে, সে আসেনি। অথচ এই মানোয়ারা একদিন গমকলে না এলে ভাত হজম হত না তার। ঠোঁট উল্টে বলত, বেছানায় শুয়ে আমি আটাচাকির ঘ্যাড়ঘ্যাড় শব্দ শুনি। গায়ে আটা লাগলে মনে হয় সুগন্ধি পাউডার মেখেচি।

কথা শুনে মন ভরে যেত দুলুর। হা করে গিলত মানোয়ারার কথাগুলো। মনের ভেতর শিহরণের ঝড় বয়ে যেত। মানোয়ারা যা পারে অন্যমেয়ে তা বুঝি কোনোদিনও পারবে না।

অথচ এই মানোয়ারা দুলুর হাত ধরে কাতর গলায় বলেছিল, আমাকে ভুলে যাবে না তো? ভুলে গেলে তুমি আমার মরামুখ দেখবে।

মানোয়ারার মিষ্টি হাসি বিষাদে মিলিয়ে যেত ঠোঁট থেকে। ভরা বুকে ছায়া পড়ত শোকের। গায়ে টাইট হয়ে বসে থাকত ঘটিহাতা ব্লাউজ। ছাপা শাড়িটা মানোয়ারাকে চোখের পলকে বানিয়ে দিত পরী। আটাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত সে, তার কথা আর ফুরোত না। দুলু ওর হাতে টাকা ধরিয়ে দিলে খুশিতে উথলে উঠে মানোয়ারা বলত, আজ চাল না কিনে এট্টা আতরের শিশি ঘরে নিয়ে যাবো। চাল তো খাওয়ার জিনিস, আর আতর হল মনের জিনিস।

দুলুর হাত কাটা যাওয়ার পর মানোয়ারা আর আটাকলে আসে না। দুলু যখন সদরে ভর্তি ছিল, সেখানেও সে যায় নি। অথচ দুলু ভাবত আজ নিশ্চয়ই মানোয়ারা আসবে। মুখোমুখি বসে দু-দণ্ড কথা বলে চলে যাবে। মানোয়ারা আসে না। শুধু হতাশা আসে দুলুর মনের বাগানে। ওপরওয়ালা সাজা দিলে তার কি দোষ? সে তো পণ্ডিতবিলের ঢেউ। যে দিকে হাওয়া, সেদিকে তো ঢেউ গড়াবে।

পণ্ডিতবিলের পাড়ে এখন দুলুর সাথে দেখা হলেও কথা বলে না মানোয়ারা। মুখ ধাপিয়ে চলে যায় শামুক-শঙ্কায়। দুলু ডাকলেও সাড়া দেয় না সে। অথচ সে নিজেও বুঝতে পারে না তার কোথায় সমস্যা।

মানোয়ারার আব্বা চাঁদ মহম্মদ মসজিদে কাজ করত। তবু সংসার চালাতে হিমসিম খেত সে। প্রায়ই কাঁধে লম্বা ভিক্ষার ঝুলি ঝুলিয়ে ইনসাল্লা বলে সে বেরিয়ে যেত ঘর থেকে। দেহতত্ত্ব, ঠার-ঠোকর গান গেয়ে সে খুশি করার চেষ্টা করত গ্রামবাসীদের। রূপকাশ্রয়ী গান ভালো লাগত না অনেকের। মেয়েরা গালে টুসকি ফেলে লাজুক স্বরে বলত, ও চাচা, তুমার ফকিরি গান থামাও এবার। দু-চারটে ফাজিল-ফুক্কুড়ি গানের চচ্চড়ি শুনাও। মন ভরে যাক।

হাওয়া বদলাচ্ছে। এখন দরগা, মাজার কিংবা পীরবাবার মেলায় ফকিরি গানের চল কমেছে। এখন ছেলে-বুড়া, ছুঁড়া-ছুঁড়ি সবাই টংটংয়ে গান শুনতে চায়। তাদের বাঁধ ভাঙা আগ্রহ। গানে মন না ভরলে দান দেবে না দর্শক সাধারণ। তাই পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে চাঁদ মহম্মদ গান ধরে,

ও রসের লাগর, যেওনি গো যেওনি
অমন করে চুমা খেলে শরীল যে ভরলোনি!
ভরা শরীলে বাঁধ ভেঙেছে যৌবন হলো কৈ-মাছ
এসো ভোমর, ডাকি তুমারে মধু খেয়ে লড়াও গাছ।
গাছ লড়াও গো, লড়াও গো,
মধু ঝরাও গো, ঝরাও গো!
এ আদি খেলা, সারা বেলা—
চকমকি আর শোলা গো-ও-ও-ও।

শরিফ মেলায় ফকিরি গানের মজলিস বসে সারা রাত। সেই আসরে চাঁদ মহম্মদ হাজির হয় দলবল নিয়ে। ফকিরি গানের পাশাপাশি রঙগানের ফোয়ারা ছোটে। তার বুড়া কণ্ঠা পেরে ওঠে না। শুধু কবি মনটা গর্জায়। চাঁদ মহম্মদ গুনগুনিয়ে ওঠে নতুন গানের কলি ঠোঁটে তুলে,

মক্কা-মদিনা পীরের থান
কেউ কি রুখেছে চাঁদের গান?
এ গানে দেহ কাঁপে, মন কাঁপে, কাঁপে বুকের ধ্বনি
এ গানে প্রেম-মহব্বত, যুগের হাওয়া, উপড়ে নেয় চোখের মণি।

আম্মা ছোট, বিবি বড়ো আব্বাজান হলো চাকর
সিটি মারে লেংড়া রাখাল দেখলে মেয়ে ডাগর।
ঘরের মেয়ে মেম সেজেছে, তুমার আবার ভয় কী—
বগলকাটা বেলাউজ, লাল লিপিস্টিক ইংরিজিতে কয় কি?

দোল খাওয়া স্বর্ণলতার মতো ঝাঁকুনি দিয়ে মানোয়ারা চলে যাচ্ছে বিলের পাড় ধরে ঘরের দিকে। দুলুর বুক ভেঙে যায় টিকটিকি কামড়ানো ডানা ভাঙা মথের মতো। এই মানোয়ারা কখনোই তার চেনা মানোয়ারা নয়। সেই সহজ সরল মানোয়ারাকে তার পাড়ার সাদাত ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে পুরে দিয়েছে স্থায়ী খাঁচায়। পাখি এখন সাদাতের দানা খায়, সে এখন কারোর কথা শুনবে না।

দুলু তবু আশা ছাড়েনি, একদিন কালীগঞ্জ বাজারে সে মানোয়ারার হাত ধরল জোর করে। টানতে টানতে নিয়ে গেল মাছবাজারের পেছনে, ওদিকে লোকজন কম, শান্তিতে কথা বলা যাবে। মানোয়ারার চোখে কোনো অনুশোচনার বুদবুদ ছিল না, বরং সে তৃপ্ত, পলিপড়া মাটির চেয়েও সুখী। দুলু তাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, তুমি যে বলতে আমার সাথে সাদী না হলে মরে যাবে—এ সব কি মিছে কথা? বলো? চুপ করে থেকো না। আজ তুমাকে বলতেই হবে।

—আগে হাত ছাড়ো তারপর যা বলার বলব। ঝ্যানঝ্যান করে উঠল মানোয়ারার গলা, তখন তোমার দু-হাত ছিল, এখন ডান হাতটাই কাটা। এক হাত নিয়ে যে নিজেকে পুষতে পারে না, ভিখ্ মেঙ্গে খায়—সে আবার আমারে পুষবে কি করে? ঘৃণা, বিতৃষ্ণা থিকথিকিয়ে ওঠে মানোয়ারার চোখে, খবরদার তুমি আমাকে আর কুনোদিন ছোঁবে না। শুনে রাখো এখন আমি সাদাতের বেগম হয়েচি। সে আমারে সুখ দেয়, সব দেয়। তুমি আর আমাদের মাঝখানে এসে কাবাবের হাড্ডি হয়ো না। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঠমকে-চমকে চলে গেল মানোয়ারা। ওর শরীর থেকে গড়িয়ে নামা আতরের সুবাসটা বাতাস মাতিয়ে রাখল বেশ কিছু সময়।

দুলু আর কিছু ভাবতে পারল না, মাথার চুল চেপে বসে পড়ল মুথাঘাস ভর্তি মাঠটাতে। হুড়হাড়, দুড়দাড় করে ধসে পড়ছে বিশ্বাসের পাড়। এ দুনিয়ায় ভালোবাসা, প্রেম-মহব্বত বলে কোনো জিনিস নেই দুলুর কাছে। তার এই শুকনো জীবনের কি দাম আছে?

ললাট ওস্তাদের সঙ্গে সেই সময় তার বাঁধের আড়ায় দেখা হল।

সব শুনে ললাট ওস্তাদ মুখ দিয়ে সমবেদনার চুক চুক শব্দ করে মড়ার খুলির ভেতর চোলাই ঢেলে এগিয়ে দিলেন দুলুর দিকে, খা বেটা খা। খেয়ে বাঁচ। এ এমন কারণবারি যা খেলে বুকের ভরা বস্তা সরে যাবে। বড়ো হালকা হয়ে যাবি বাপ। নারী হলো গিয়ে প্রকৃতি, মা। জগৎ-জননী। মহাশক্তি। কালী তারা ব্রহ্মময়ী। তারা ছলনাময়ী, আবার স্নেহময়ী। তারা অসুরনাশিনী, আবার বিপরীত বিহারে কামিনী। তুই ভুলে যা বেটা। তুই সাধক, তুই পূজক। তুই চাঁদ, তুই-ই সূর্য। তুই তাঁর গলায় নর মুণ্ডমালা। যা আজ তোর বাগদীক্ষা হয়ে গেল। আজ পূর্ণিমা। শুধু জপ কর—শব্দ ব্রহ্ম, শব্দ ব্রহ্ম।

ললাট ওস্তাদ নিজেও দুলে দুলে সুরা পান করলেন। তারপর ডান হাত উর্ধ্বে তুলে ঝংকার দিয়ে গান ধরলেন, 'ডুব দে মন কালী বলে/হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।'

সুর সাঁতার কেটে গেল তার ছোট্ট দাওয়ায়। সুরা পান শেষ করে গাঁজার কল্কে সাজল ললাট ওস্তাদ, অবশেষে শিবটান দিয়ে বলল, আজ থিকে আমি ললাট ওস্তাদ নই, ললাট গুরুজী। গুহ্য তত্ত্বকথা আমি যথাসময়ে দেব। নারীর পিছু টান আর তোর ভেতরে থাকবে না। জয় মা তারা। নে টান দে।

গাঁজার কলকেটা দুলুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন ললাট ওস্তাদ, দমে দমে বুকটা ভরিয়ে নে। ভরা বুকে কেউ আর ঢুকতে সাহস পাবেনি। তুই শিমুলতুলার মতো শুধু উড়বি আর উড়বি।

গাঁজার কল্কেয় টান দিয়ে মেজাজটা হালকা হলেও পেটের চিন্তাটা তাকে কোণঠাসা করে দেয়। পালবুড়া তাকে আর কাজে নেবে না। যার ডান হাত নেই, তাকে দিয়ে আর কী কাজ হবে?

দুলু ভয়ে ভয়ে ললাট ওস্তাদের পায়ের কাছে বসল, গুরুজী, এট্টা কথা ছিল। অভয় দিলে বলি—।

—গুরু পিতা সমান। তাঁর কাছে তোর ভয় না পেলেও চলবে। ভ্রূ-তুলে তাকালেন ললাট ওস্তাদ।

ঢোক গিলে দুলু বলল, আমার ডান হাতটা ওপরওয়ালা নিয়ে নিয়েচে। এখুন আমি বাঁচব কি নিয়ে, খাবো কি? ঘরে যে বুড়া বাপ—তারে কি খাওয়াবো?

—জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। ললাট ওস্তাদ মুখ ফাঁক করে বললেন, হাত গিয়েচে, তোর গলার সুর তো যায়নি। কাল থিকে তুই টেরেনে-টেরেনে ভিখ মাঙবি। বাউল, শ্যামা সঙ্গীত, রসগান, টুসু ভাদু সব গাইবি। তোর উপর আমার আশীর্বাদ রইল। গুরু আশীর্বাদ বৃথা যাবে না। আগে আমি এ পথের পথিক ছিলাম। বাদ্যযন্ত্র, একতারা, ঘুঙুর সব আচে। তুই লিয়ে যা। আমি তোরে সব দিলাম।

ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে আখড়া থেকে বেরিয়ে এল সদ্য দীক্ষিত দুলু। বেঁচে থাকার সুতীব্র ইচ্ছাটা তার ভেতরে শেকড় চারিয়ে দিল গোপনে।

দুলু এখন লালগোলা ট্রেনে একতারা বাজিয়ে, পায়ে জোড়া ঘুঙুর বেঁধে সবধরনের গান গায়, হালকা গানের গভীরে মাঝে মাঝে শুশুকের শ্বাস নেওয়ার মতো ভেসে আসে বাউলগানের কলি, 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, আমরা ভেবে করব কি' কিংবা 'গোলেমালে গোলেমালে পীরিত করো না, পীরিতি কাঁঠালের আঠা লাগলে পরে ছাড়ে না'.....ইত্যাদি গানের তালে তালে তার পুরো শরীর দোলে, এমন কী কাঁধের কাছ থেকে কাটা হাতটা শীর্ণ হয়ে তাল ঠোকে সুরের মায়াবী ইশারায়। গান গাওয়ার সময় দুলুর শরীরে কেউ যেন ভর করে, ললাট ওস্তাদ যেন তার কানে কানে বলেন, দুলুরে, আমার ক্ষ্যাপা বেটা, তোর সুরের জালে পুরো জগৎ মোহিত করে দে। একমাত্র সুরই পারে প্রেমিক হয়ে প্রেমিকার কাছে পৌঁছোতে।

দুলু দরদ দিয়ে গায়, ওরে আমার জীবন গেল, যৌবন গেল ... রইল না আর কিছু। সোনার শিকলি গায়ে জড়ালো, সন্‌সার ছাড়লো না পিছু। দয়াল গুরুজী, এখুন আমি যাবো কুথায়?

মানোয়ারার ছিপছিপে গতর ঈষৎ পৃথুলা হয়েছে সুখের ছোঁয়ায়। সুখ ওর সেগুন কাঠ শরীরে পালিশ এনেছে স্বাচ্ছন্দের। এখনও হাসলে ঝকমকিয়ে ওঠে ওর দাঁতগুলো, গলার সঙ্গে লেপটে থাকা রূপোর হারটা মক্কা-মদিনার লকেট সমেত দোলে। কোঁকড়া চুলের নিবিড় রেশমীভাব এখনও লাউআঁকশির মতো পেঁচিয়ে নেমে আসে জুলফি বরাবর। কপালের সবুজ টিপটা দুই ভ্রূ-র মাঝখানে টিয়াপাখির মতো ওড়ে।

দুলু বাউল সাজলেও মানোয়ারার বুনটিয়া রূপের কাছে হার মানে, কোথা থেকে হাহাকার ছুটে এসে ভরাট করে দেয় প্রেমিক-হৃদয়। ঠোঁট-ঠোঁট চেপে কোনোমতে কান্নার বেগকে সামাল দেয় দুলু। পণ্ডিত বিলের ছায়ায় সে আর মানোয়ারার মুখটাকে দেখতে পায় না, বরং একটা লাল কৈ-ফুল বিলের জলে ফুটে ওঠে বাধ্য যুবতীর মতো। দুলু সেই দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থেকে নিজের ঘা নিজে শুকোবার চেষ্টা করে।

ঘা শুকোয় কিন্তু থেকে যায় দাগ।

টানা বৃষ্টিতে শুধু কদমগাছ নয়, রূপ বদলে গেছে পুরো গ্রামের। সব থেকে বেশি বদল ঘটেছে বুড়িগাঙের। বৃষ্টির জাদুছোঁয়ায় বুড়িগাঙ এখন কিত-কিত খেলা কিশোরী। তার জলের রঙ এখন আর মাঠদিঘির জলের মতো কাচবরণ নয়, মাটিগোলা।

কালও হালকা কুয়াশার চাদর সাহেবমাঠ থেকে উঠে এসে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল হলদিপোঁতা ধাওড়ায়। আর মাঝের গাঁয়ের আলিঘাস আর চাপ-ঘাসের শরীরে জড়িয়ে গিয়েছিল শিশির। জলাখেতের ধারে কচুগাছগুলো সারা অঙ্গে সবুজ জড়িয়ে ছটফট করছিল পূর্ণতার জন্য। এ সময় কচুগাছের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ মিশে থাকে। এই গন্ধটা একবারে কচুগাছের শরীর নিঃসৃত, এই সুবাসের সঙ্গে আর কারোর বুঝি মিল নেই। রঘুনাথ হাঁস খোঁজার তাগিদে কালীগঞ্জ বাজারে গিয়েছিল সেই সাত সকালে। অনেক বেলাঅবধি বসে থেকেও হাঁসের খোঁজ সে পেল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। আর ঠিক তখনি দুলু এসে তার ঘাড়ের ওপর হাত রাখল, কি রে, এখানে বসে জু নিচ্চিস—ঘর যাবি নে?

দুলুকে এ সময় দেখে রঘুনাথও কিছুটা অবাক চোখে তাকাল, তুমি এ সময়? কোথা থেকে এলে গো? আজ বুঝি দেবগ্রাম যাওনি?

নিষ্প্রভ হাসল দুলু, না, আজ আর যাওয়া হল না ভাইরে। বাপটার শরীর খারাপ। তারে হাসাপতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এলাম। এখুন যাই, তার জন্যি খাবারের ববস্থা করতি হবে।

—তুমার বাবার কি হয়েচে?

—তার কি রোগ জ্বালার শেষ আচে? বয়স হলে যা হয়। হাজার রোগের ফ্যাঁকড়া বেরয়। দুলু মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল, আল্লা-রহিম, হরি যিশু কুথায় গেলে তুমরা? / একা আমি. একা সে .... করে দিও না গুম্‌রা। দুলু বিড়বিড়িয়ে উঠে মুখ নামিয়ে আনল সহসা, রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে সে বলল, চা খাবি? তোর মুখ দেখে মনে হচ্চে সারা সকাল কিছু খাসনি? রঘুনাথ ইতস্তত গলায় বলল, ভিজে ভাত খেয়ে বেরিয়েচি, তবে চা খাইনি বহুক্ষণ হল। আসলে কী জানো চা খেতে মন হয়নি। তুমি যখন বললে তখন চলো—দু'জনে মিলে চা খেয়ে আসি।

পাশাপাশি হেঁটে ওরা চায়ের দোকানে এসে ঢুকল। অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে জল ফুটছিল টগবগিয়ে। সামনের কাঠের তাকে সাজানো আছে বিস্কুটের বোয়ামগুলো। গোল, চৌকো, রঙিন, ভুসভুসিয়া..... কত রকমের বিস্কুট। দুটো চৌকো বিস্কুট দিতে বলে দুলু ঘনিষ্ঠ গলায় শুধোলো, বল, কালীগঞ্জ বাজারে কি করতে এয়েচিস?

—মনসা পুজোয় হাঁস বলি দেবে। মা মানসিক করেছিল আমার জন্য। রঘুনাথ কথা শেষ করতেই দুলু কেমন বিষণ্ণ চোখে তাকাল, মা-রতন পরম রতন, বুঝবি না রে এখুনি/ফুল বোঝে তার আসলি রূপ পাপড়ি ঝরে যখুনি। দুলু টেনে টেনে আবেশী গলায় বলল, ছোটবেলায় মা মরল, এখুন তার মুখটাই মনে পড়ে না। সব ঝাপসা ঠেকেরে, হাতড়ে হাতড়ে আমি তার মুখটা জড়ো করার চেষ্টা করি। হয় না, সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। আমার গুরুজী ললাট ওস্তাদ বলে—মা হল—জগৎমণি, জগৎজননী,/মা হলো চাঁদ-সূর্য/শৌর্য বীর্য/স্নেহের খনি চোখের মণি/

জগৎ জননী। মা হল মা। এর কুনো বদল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে রঘুনাথ জিজ্ঞেস করল, দুলুকাকা, হাঁস কুথায় পাবো বলতো?

ভ্রূ কুঁচকে দুলু বলল, এ নিয়ে অতো ভাবনা কেনে? কাল রোববার। দেবগ্রামের হাটে চল আমার সঙ্গে। তোরে আমি দেখে-শুনে হাঁস কিনে দেব।

দেবগ্রামের গোরুর হাটে অনেক বেপারী হাঁস-মুরগির ঝাঁকা নিয়ে আসে বিক্রির জন্য। ঝাঁকার মুখে লাগানো থাকে দড়ির ফাঁসজালি। অল্প একটু টান দিলেই ছড়ানো গোলমুখ বন্ধ হয়ে হাতের মুঠোয় চলে আসে। দিনভর হাঁসের প্যাঁক-প্যাঁক ডাক, বেপারী গলা ফাটানো চিৎকারে ভরিয়ে রাখে দেবগ্রামের গো-হাটের বাতাস। হাট নয়তো যেন রোববারের মেলা। বাসে যেতে যেতে রঘুনাথ কত দিন যে দেখেছে এমন দৃশ্য। গোরুর লেজ মুচড়ে দিয়ে বেপারী আর ক্রেতা ছুটছে গোরুর পেছন পেছন। গোরুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার এ এক অভিনব আয়োজন। চা-বিস্কুটের দাম মিটিয়ে দুলু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, বেলা হল এবার তাহলে গাঁয়ের দিকে যাওয়া যাক। তা বাঁধে বাঁধে যাবি, না পাড়া ঘুরে যাবি?

রঘুনাথ হাসল, পাড়া ঘুরে যাওয়াই ভালো। কত কি দেখা যায়—। দুলু পিন ফোটানো বেলুনের মতো চুপসে গেল হঠাৎ। মানোয়ারার পরিবর্তনটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না মন থেকে। লোক মুখে সে খবর পেয়েছে মানোয়ারের বাপ চাঁদ মহম্মদ মোটা টাকা নিয়ে মেয়েটাকে বেচে দিয়েছে সাদাতের কাছে। চাঁদ মহম্মদের টাকার লোভ ছিল এ নিয়ে দুলুর মনে কোনো সন্দেহ নেই। টাকার জন্য সে গান গায়, দেহতত্ত্ব চর্চা ছেড়ে চুটকা গানে মনভরায়। তার কাছে আল্লা রসুল করিম হরি যিশু ভগবানের চাইতে টাকার শক্তি ঢের বেশি মনে হয়। সে এখন মসজিদের দেখভালের কাজে যায় না, ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলে মৌজ করে, মেয়ের গতরখাটা পয়সায় পেট ভরায়। সুখপাখিটা ওর শরীরে এখন বাসা বেঁধেছে। এমন কী নড়ে-চড়ে দানা খেতে চায় না।

কী যুগ পড়ল! মানুষ এত তাড়াতাড়ি চোখ উল্টে নেয় কী ভাবে? তাহলে কি মানুষের চোখের পর্দা খাটো হয়ে আসছে দিনে দিনে? বেইমান, অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে মানুষ জাত। দুলুর সরল চোখের তারা বালি ঢুকে যাওয়ার মতো করকরিয়ে ওঠে, মনে মনে হাঁপিয়ে উঠে চোখ রগড়ে নিয়ে সে দূরের দিকে তাকায়।

রোদ ঝলমল করছে চারপাশে। বড়ো তেঁতুলগাছটার ভেতর থেকে ভেসে আসছে পাখির কিচিরমিচির ডাক অনবরত। পাখির মতো সুরেলা গলায় কথা বলত মানোয়ারা, আটাকলে খদ্দের না থাকলে দুলু মন দিয়ে কথা গিলত মানোয়ারার। পালবুড়া রেগে যেত ওর মুখোমুখি বসে থাকার ধরন দেখে, টিপ্পুনি ছুঁড়ে দিত বুড়োটা, আমার আটাচাকিকে তোরা দেখছি রাধাকৃষ্ণের কদমতলা বানিয়ে ছাড়বি। তা বাপ, যা করো করো আমার বদনাম যেন না হয়। সেদিক পানে এট্টু খেয়াল রেখো।

মানোয়ারা আটাচাকিতে ঢুকলে চট করে আর ঘর যাওয়ায় মন করত না। দুলু কিছু বললে সে ঠোঁট ওল্টাত অভিমানে, গোলাপী গালে টুসকি ফেলে বলত, আমারে খেদিয়ে দিচ্চো, আমি যাবো না যাও। দেখি তুমি কি করতে পারো? অন্ধকারে মুখঢাকা গাছের মতো চুপচাপ বসে থাকত মানোয়ারা, দুলু তাকে ছুঁয়ে দিলে সে জলোচ্ছ্বাস হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত দুলুর গেঞ্জি পরা ঘামগন্ধ ভরা বুকের উপর। আঠা লাগানো সিনেমার ছবির মতো সেঁটে থাকত সে, বিপরীত উষ্ণতায় দুলু টের পেত জীবনের মহার্ঘ্য সুঘ্রাণ। ছাপা শাড়িতে শরীর মুড়িয়ে মানোয়ারা শাহাজাদীর চোখে তাকাত, তুমারে ছাড়া আমি বাঁচব না গো, আমাকে খেদিয়ে দিলে আমি তুমার ঘরের

ছিমুতে ঘুরঘুর করব। আল্লা কসম, আমি তুমার জন্য আমার এই বদন চোখের নিমেষে কুরবানি দিতে পারি। আর শুনো আমারে এড়িয়ে গেলে তুমি আমাকে জ্যাতা কুনোদিন পাবে না। বিলের জলে আমার দেহ দেকবে কৈ ফুল হয়ে ভাসচে।

—তোবা, তোবা। অমন কথা কয়ো না। আমার কলিজা ফাটি যাবে। দুলু শক্ত হাতের বেড়ে পেঁচিয়ে ধরত মানোয়ারার শরীর, গুড়কলের মেসিনের মতো পিষে বের করে আনতে চাইত মনের রসতৃপ্তি, চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিত মানোয়ারার সংরক্ষিত ওষ্ঠযুগল। মানোয়ারার চোখ বুজে যেত অপার্থিব আনন্দে, ঠোঁট ফাঁক করে বিড়বিড় করে বলত, আমারে মেরে ফেল। প্রেম-পীরিতে এত জ্বালা আগে জানতামনি। সেই মানোয়ারা এখন খাঁচা ভেঙে উড়ে যাওয়া বনটিয়া, তাকে দেখা যায় কিন্তু ধরা যায় না। সে এখন সাদাতের বাগানে শিস দেয়, হাসে, খেলে, ঘুরে বেড়ায়। তার চেহারায় ছায়া পড়ে নুরি বেগমের, নুরি বেগম তার মা।

রূপসী নুরি চাঁদ মহম্মদের অভাবকে মানিয়ে নিতে পারল না শেষ পর্যন্ত। চাঁদ মহম্মদ আজান দিতে ভোরবেলায় মসজিদে চলে গেলে নুরি দু'হাত উর্ধ্বে প্রসারিত করে দোয়া মাঙত আল্লাতালার। বিড়বিড় করে বলত, আমারে আজাদ করে দাও রহিম। আমার ঘরের মানুষটা দোজকের কীট। ও আমার জীবন-যৌবন ছারখার করে দেবে। আমি জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবো রসুল। দোয়া করো। আমার জান বাঁচাও।

দশ বছর ঘর করার পর নুরি বেগম পালিয়ে গেল আতিফের সঙ্গে। আতিফের বহরমপুরে কাঁচা মালের ব্যবসা। কাঁচা ব্যবসায় কাঁচা টাকা। তার কাছে নুরি বেগম খরিদ করা বাঁদী।

যতদিন রূপের জৌলুষ ছিল ততদিন কোনো সমস্যা হল না খাওয়া পরার। রূপ ঢলতেই কদর ঢলে গেল ভিন্ন দিকে। আতিফের দু-চোখের বিষ এখন নুরি বেগম। একদিন ঘর থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল আতিফ। তার কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে ভর্ৎসনা করে বলল, আর আমাকে জ্বালাচ্চো কেনে, ইবার ঘাড় থিকে নামো। ঢের হল, আর পারচি নে। ইবার আমারে ছেড়ে অন্য কাউকে দেখো। তা যদি না হয়, চাঁদের ঘরে ফিরে যাও। সে তুমাকে তো তালাক দেয়নি। শুনেছি সে নাকি এখন দয়ার সাগর। মসজিদ ঝাড়পুছ করে। সাঁঝের বেলায় ফকিরি গান গায় মসজিদের চাতালে বসে। আর কিছু না হোক তুমার বুড়া বয়সে টেইম পাশ হয়ে যাবে।

নুরি বেগম আতিফের পা ধরে কাকুতি-মিনতি করে অঝোর ধারায় কাঁদল, ওগো, তুমার দুটা পায়ে ধরি, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। তার চেয়ে ফলিডল এনে দাও আমি খেয়ে মরি।

—ছিঃ ছিঃ, একী কথা! যে মোল্লার দাড়ি আচে, তার কি কুনো গুনাহ করা সাজে? তুমার জন্যি আমি কেনে দোজকের মাটি খরিদ করে রাখব? হাঁড়িচাচা পাখির মতো লালচে দাড়িতে হাত বুলিয়ে সে সজোরে ঝটকা দিয়ে পা'টা ছিনিয়ে নেয় নুরি বেগমের দখল থেকে। ঝড়ের গতিতে ঘর ছাড়ার আগে সে শাসিয়ে যায়, আর এক ঘণ্টা সময় দিলাম ঘর ছেড়ে চলে যাবে। নাহলে কেটে বস্তায় পুরে ভাগীরথীর জলে ভেসিয়ে দেব। তুমার মতন পাপী মেয়েমানুষের মান্‌সো শ্যাল-কুকুরকে খাওয়ানোও পাপ।

নুরি বেগমের আর অপমান সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না। কাঁপতে কাঁপতে রোদ মাথায় সে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। শেষে দশ ঘাটের জল খেয়ে বাস-স্ট্যান্ডের কাছে তার মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়। চাঁচ বেড়ার ঘর, স্যাঁতসেতে, আলো-বাতাস ঢোকে না। সেখানে মুটে বদনার সে দাসী হয়ে বেঁচে আছে।

নুরি বেগমের কথা মাঝেমধ্যে কানে আসে মানোয়ারার। ময়ূরের পেখম ঝরে গেলে কেউ

তার দিকে তাকায় না। বোবা কোকিলকে কে খাঁচায় ভরে পুষবে, দানা খাওয়াবে?

সাদাত তার শরীর নিয়ে জোর করতে চাইলে মানোয়ারা বেঁকে বসে, আগে নিকে হোক, তারপর। অতো তাড়াহুড়োর কী আচে মিঞা। গাছের ফল রয়ে-সয়ে খাও। এ তো ঝরে যাওয়ার জিনিস নয়।

সাদাতের বাহুবন্ধনে যাঁতাকলের মটরদানার মতো পিষ্ট হতে থাকে মানোয়ারা খাতুন। তার মুগ্ধ চোখ দেখতে থাকে সাদাতের আবেগ থরো থরো মুখখানা। দুলু কাহারের কথা মনে করে সে আর কষ্টের পুকুরে ঝাঁপ দিতে চায় না। অতীত তার কাছে সবসময় কাঁটার ঝোপ, বর্তমান তার কাছে খুশবুদার বসরাই গোলাপ। পণ্ডিতবিলের পাড়ে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেল দুলু। পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটা থেঁতলে গেল আধলা ইঁটে। কনকন করছিল নখের চারপাশ। রক্তে মাখামাখি হয়ে বুড়ো আঙুলটাকে মনে হচ্ছিল টোঁড়াসাপের থেঁতলে যাওয়া মাথা। রঘুনাথ তার পাশেই ছিল, হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলে দুলু বিমূঢ়ভাবে তাকাল, তেমন কুনো চোট লাগেনি, যা লেগেচে তা আমি সামলে নিতে পারব। উবু হয়ে রক্ত মুছে দুলু খাড়া হয়ে দাঁড়াল। মাটিতে ঢুকে যাওয়া আধলা ইঁটটা হাতে জোর করে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল পণ্ডিত বিলের জলে। খপাৎ করে শব্দ হল জলের, চারদিকে ছিটিয়ে গেল জল ঢেউ তুলে। আর সাথে সাথে মেঘভরা জলবাহী আকাশের নীচ দিয়ে ডানা মেলে উড়ে গেল কয়েকটা মেছোবক আর মাছরাঙা পাখি। বালিহাঁসগুলো কাতর চোখে তাকিয়ে ডুব আর সাঁতারের নিপুণ কৌশলে পৌঁছে গেল নিরাপদ দূরত্বে। তারপর গলা ফাড়িয়ে ডাকতে লাগল ভয়ে।

নিজেকে সামলে নিয়ে দুলু উদভ্রান্ত স্বরে বলল, শোন রঘু, তোকে এট্টা কথা বলি। তুই আমার ভাইপোর মতো, তোরে আমার ভালো লাগে। এ সন্‌সারে মেয়েছেলে থেকে তফাৎ-এ থাকবি। ওরা হল ছুতোর মিস্ত্রির তুরপুনের মতো। তোর কলিজা ফুটা করে সেখানে উঁইয়ের বাসায় ভরিয়ে দেবে। আর এট্টা কথা। ভালোবাসা আর উঁইয়ের বাসা—দুটাই বড়ো পলকা জিনিস। ম্যাচিস কাঠির মতো পুটপুট করে ভেঙে যায়। আর তখনই সেই খোখলা দিয়ে বেনেজল ঢুকে তোর চৌদ্দগুষ্টির মুণ্ডু চটকে ছেড়ে দেবে।

রঘুনাথ হাসতে গিয়েও হাসল না, হালকাভাবে মুখ মুছে নিয়ে সে দুলুর মুখের দিকে পুলিশ-নজরে তাকাল, কী হলো দুলুকাকা, মনে হতিচে চোট খেয়েচো। আরে ছাড়ো ওসব কথা। আমার দাদু বলে নিজে বাঁচলে বাপের নাম। কার জন্যি ভাববা তুমি। খবরদার, কারোর জন্যি ভেবো না। ভেবে ভেবে দিমাগ তুমার বরবাদ হবে, আসল কাজের কাজ কিছু হবে না।

—এসব বলা সহজ, করে দেখানো কঠিন রে! দুলু বাতাস ভরাল দীর্ঘশ্বাসে, আমার মনের অবস্থা ভালো নেই, গলা দিয়ে গান বেরুচ্চে না। কার জন্যি গাইব। যার জন্যি গাইতাম—সে এখন অন্যের খাঁচায় বুলি বলচে। আমাকে আর চেনেই না।

—সেই মহারানী কে শুনি, কী তার নাম? রঘুনাথ উৎসাহী হল।

—তার কথা না শোনাই ভালো। তার কথা বলতে গেলে আমার জিভ উল্টায় না।

তবু বলি সে মোকামপাড়ার মেয়ে। চাঁদ মহম্মদের বিটি, মানোয়ারা। দুলু দ্বিধাহীন ভাবে কথাগুলো বলে রঘুনাথের মুখের দিকে তাকাল।

রঘুনাথ বিজ্ঞ স্বরে বলল, দুলুকা, এট্টা কথা বলি যদি কিচু মনে না করো।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ বল। উৎসাহিত হল দুলু।

—তুমি মানোয়ারার এট্টা পুতুল বানিয়ে এই বিলের জলে ভাসিয়ে দাও। দেখবা সব হিসাব চুকে বুকে যাবে। তুমার আর কুনো কষ্টই হবে না।

বিলের পাড়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখা যায় বহু দূর। মেঘের মিছিল যেন ঘোড়ায় চেপে মেঘপাহাড়ের দিকে চলে যাচ্ছে টগবগিয়ে। দৌড়ে বেড়ানো মেঘগুলো চোখ ড্যামা ড্যামা করে দেখছে পাগলা ঘোড়ার কসরত। খিরিষগাছের তলায় দাঁড়ালে কোমল স্তর মেঘের তুলোর শরীর দেখা যায়। এ যেন বড়ো হয়ে যাওয়া কোন যুবতীর গোপন রূপবাহার।

রঘুনাথ উদাস হয়ে দেখছিল মেঘেদের ঘরবাড়ি। দুলু থুতনি চুলকাতে চুলকাতে বলল, আজ যাই। আবার হাসপাতালে যেতে হবে ভাত নিয়ে। ঘরে কেউ নেই। আমাকেই এক হাতে সব করতে হবে।

—তুমার অসুবিধা হলে বলো। আমিও তুমার সাথে চলে যাব।

—না, না। তার আর দরকার হবে নি। তবে সাবধানে চলা-ফেরা করবি। গাঁয়ে তোর শত্তুরের অভাব নেই। দুলুর বুকটা ধড়ফড় করে উঠল।

রঘুনাথ হাসতে হাসতে বলল, সে আমি জানি। তবে কেউ আমার কুনো ক্ষতি করতে পারবে নি। আমার ক্ষতি করতে এলে তার নিজেরই ক্ষতি হয়ে যাবে।

—তুই এত মনের জোর কুথা থেকে পাস? দুলু প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

রঘুনাথ ভেবে নিয়ে বলল, আমার শক্তি আমার মা। জানতো আমার মায়ের নাম দুর্গা। দুর্গার দশ হাত। দশ হাতে দশ রকমের অস্ত্র। এছাড়া কপোতাক্ষবাবু, অমল মাস্টার—ওদের আমার ভালো লাগে।

রঘুনাথের কথা শুনে দুলু সশব্দে হাসতে গিয়েও থেমে গেল, অমল মাস্টারের কথা আর বলিস নে। সেদিন আমি না থাকলে এই ভরা বিলে ডুবে সে মরে যেত।

—কেন কি হয়েছিল?

—কি হয়েছিল তা আমি কি জানি। জলকাজ সারতে এসে দেখি—এট্টা মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে বিলে। কোনো কিছু না ভেবেই ঝেঁপিয়ে পড়লাম। এক হাতে সাঁতরে গিয়ে তারে কোনোমতে বাঁচালাম। শেষে দেখি কিনা হাইস্কুলের ছোকরা মাস্টুর। কী সব ভূত নেই, মন্ত্র নেই, বাণ মারা নেই, সভা করে ফিরছিল। কারা তাকে বিলের জলে ঠেলে ফেলে দিয়ে পেলিয়ে গেচে। দুলু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, তবে আমি না থাকলে সেদিন মাস্টুরের দফারফা হয়ে যেত। তাও যা জল খেয়েছিল তা বের করতে আমাদের বাপ-বেটার ঘাম ছুটে যায়।

—এ সব কথা তো জানতাম না। রঘুনাথ অবাক হয়ে বলল।

—সব কথা কি সবার জানা সম্ভব? তুই থাকিস ধাওড়া পাড়ায়, আমি থাকি মোকামপাড়ায়। কথার কি পাখির মতোন ডানা আচে যে উড়ে যাবে?

—তা ঠিক। রঘুনাথ ঘাড় নাড়ল, তারপর কি হলো, মাস্টুরকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে বুঝি?

—তোর কি মাথা খারাপ না পেট খারাপ? হাসপাতালে নিয়ে গেলে আমি যে ফেঁসে যেতাম। দুলু মাথা নাড়ল, জলে ডোবা কেস, পুলিশ কেস। শেষে পুলিশ বলবে আমিই ঠেলা মেরে ফেলে দিয়েচি—তখুন?

—মাস্টার ভালো মানুষ, ও কেনে তুমার নামে মিছে কথা বলবে?

—আমার গুরুজী বলে কালো চুলের ভালো করতে নেই। কালো চুলের ভালো করলে হাড়ে হাড়ে ঠকতে হয়। দুলুর ঠোঁটে সরল হাসির ঢেউ খেলে গেল। রঘুনাথ বলল, মাস্টুরকে আমি কতো বুঝিয়েছি, তবু মাস্টার বুঝবে না। মাস্টুরের ধারণা মন্ত্র পড়ে সাপের বিষ নামে না। ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই। একথা গাঁয়ের মানুষকে বোঝালে বুঝবে কেনে? যারা এসব ভাঙিয়ে করে খাচ্চে তাদের যে বিপদ। তারা কেনে মাস্টুরকে ছেড়ে কথা বলবে? গাঁয়ে থাকতে হলে

গাঁয়ের মানুষের হ্যাঁ-তে হ্যাঁ মেলাতে হবে। নাহলে সাঁঝের আঁধারে বিলের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে এ তো জানা কথা।

—ছোকরা মাস্টুরটার মাথা খারাপ। জিন-পরী নেই একথা বললে মোকামপাড়ার কেউ কি মানবে? কেউ মানবে না। সব ক্ষেপে যাবে। দুলু চুপ করে গেল। রঘুনাথ ঝাঁঝালো গলায় বলল, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ালে জান তো যেতেই পারে। সেই আগের গাঁ কি আর আচে গো? তলায় তলায় গাঁ যে অনেক বদলে গিয়েচে।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। মেঘে মেঘে বেলা অনেক গড়ে গিয়েচে। দুলু কপালে ভাঁজ ফেলে রঘুনাথের দিকে তাকাল।

একটাই পথ মোকামপাড়া সটান চলে এসেছে পণ্ডিত বিলে। পথের ডান দিকে জল, বাঁ দিকে হাড়মটমটি, কচা আর অ্যাঁশশেওড়ার ঝোপ। সেখানে ক্যাচকেচি পাখি থপর থপর করে হাঁটে, সারাটা দিন ওদের কাজিয়ার কোনো কামাই নেই, জীবনটা বুঝি ওদের লড়াই-ঝগড়া করে কেটে গেল। ক্যাচকেচি পাখিগুলোর তবু মিলের কোনো শেষ নেই। গাঁয়ের অনেক মানুষ ওদের সাতভায়া পাখি বলে। সাত ভাই কার অভিশাপে পাখির রূপ নিয়ে বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দুলু মুখ ঘুরিয়ে বলল, বেলা অনেক হল, এবার আমি যাই। তুই যদি কাল দেবগ্রামে যাস তাহলে পরে আমার সাথে দেখা করিস। আমি সাড়ে সাতটার বাসে যাবেখন। তোর মন হলে চলে আসিস। তাহলে দু'জনে মিলে দরদাম করে হাঁসটা কিনতে পারব।

রঘুনাথ আর দেরি না করে বিলধারের পথটায় উঠে এল। এ পথটায় ছায়া আছে গাছের। বৃষ্টি-বাদলা দিনের রোদ কখনও সখনও চাঁদি গরম করে দেয়। গুমোট ভাবটা অসহ্য লাগতেই রঘুনাথ বুকের কাছে হাতটা নিয়ে এল। ঘামে জবজব করছিল হলদেটে গেঞ্জিটা।

আজ অশ্বত্থতলায় শ্রী শ্রী মনসা দেবীর পুজোর সভা আছে। সেখানে পাড়ার সবাই জড়ো হবে। পুজোর খরচ, কে কত চাঁদা দেবে, কে কি কাজ করবে এসবই দশ জনের হাজিরাতে ঠিক করে দেবে চুনারাম। দশের কাজ দশে মিলে সিদ্ধান্ত নিলে ভালো। একার কোনো মত বারোয়ারি কাজে খাটবে না।

ফি-বছর মনসা মায়ের পুজোয় সুফল ওঝার একটা বড়ো দান থাকে। কোনো বছর ফল-প্রসাদ, কোনো বছর মাইকের দাম সে দিয়ে দেয়। ওর দলবল এসে পাকুড়তলায় ঝাপান গায়, মনসামঙ্গলের গান করে। পাড়ার ছেলে বুড়ো বউ-ঝি'রা সেই গান কত ভক্তি সহকারে শোনে। বেহুলার দুঃখে তারাও চোখের জলে বুক ভাসায়। আহারে, বাসর- ঘরে যার সোয়ামী মরল তার জন্য কি দুঃখ হবে না কারোর?

এ বছর নাগপঞ্চমী পুজো পূর্ণিমার ব্রতোপবাস এর ঠিক পাঁচ দিন পরে পড়েছে। ওই দিন গাঙ ধারে মেলা বসবে ওঝা গুণিনদের। বর্ধমান মুর্শিদাবাদ এমন কি বীরভূমের ওস্তাদ গুণিন আসবে সেই মেলায়। তারা খালি হাতে আসা পছন্দ করে না, তাদের সঙ্গে মাদুলি-তাবিজ-এর মতো থাকবে সাপঝাঁপি। সেই সব ঝাঁপিতে মাথা নিচু করে চুপচাপ পড়ে থাকবে বিষধর সাপ। এমন হরেকরকমের সাপ দেখার মওকা বছরে মাত্র একদিনই আসে। আর এই দিনটার জন্য মুখিয়ে থাকে সুফল ওঝা। কত গুণী মানুষের পায়ের ধুলোয় ভরে উঠবে গাঙের ধার। উৎসবের ক'দিন দুলু যাবে না দেবগ্রাম। ললাট ওস্তাদের সঙ্গে সে আসবে এই অভিনব মেলায়। এখানে কবির গানের সঙ্গে লড়াই জমে দেহশক্তির। যে জিতবে সে হবে মেলার সেরা। যার সাপ ফণা তুলবে বেশি, সে হবে সাপেদের ওস্তাদ। এভাবেই দশটা শাখায় নাম উঠিয়েছে সুফল ওঝা।

ফলে তার বিরামের কোনো প্রশ্ন নেই। সব কিছু একবার ঠিকঠাক বুঝে নিলে যে কোনো কাজই সহজ হয়ে ওঠে, গলানো ভাতের চেয়েও সহজ এবং সরল।

সুফল ওঝার এ কয়দিন নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। সে মেলা কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য। তার কথাতেই অনেকে মাথা হেঁট করে। অশ্বত্থতলার সভা শেষ হয় বিনা বিবাদে। চুনারাম খুশি খুশি মুখ করে বলল, ধাওড়াপাড়ায় পুজা হবেনি, এ তো হতে পারে না। তা বাপু, তুমরা যে সব এগিয়ে এলে, ব্যবস্থা করলে এতে আমার মন ভরে গেচে। মা মনসা আমাদের চারপাশে ঘুরঘুর করে। তারে আমাদের খুশ রাখা দরকার। মা খুশ তো, বেটা খুশ। বেটা খুশ হলে আর ভাবনা কী। সমবছর আমাদের ভালো যাবে। মা মনসার রোষ থিকে আমরা সবাই বাঁচব গো। পাকুড়তলায় মাটি দিয়ে পুজোর বেদী বানিয়েছে ধাওড়াপাড়ার উঠতি বয়সের ছেলে ছোকরা। তাদের অনেক দিনের ইচ্ছে এবছর কালীগঞ্জ হরিনাথপুরের মতো প্যাণ্ডেল বেঁধে পুজো হোক। পুজোয় দিনভর বাজুক মাইক।

দেবগ্রামের হাট থেকে মনসামঙ্গলের ক্যাসেট কিনে এনেছে দুলু। চিকচিকিতে মোড়ানো সেই ক্যাসেটটা দুলু রঘুনাথের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এর দাম তোদের দিতে হবে না। এটা মনসাপুজোয় আমার চাঁদা। দেবগ্রাম গোরুর হাটে ক্যাসেটটা বাজছিল। গানগুলো শুনে মনটা ভরে গেল। তাই ভাবলাম—এটা তোদের জন্যি লিয়ে যাই। দুলু তার কাটা হাত নাড়িয়ে শরীর দুলিয়ে হাসল, পুজোর সময় আসবখন। তখন এসে ক্যাসেটের গানগুলো সব শুনে যাবে। আহাঃ, কি গান! মনসা মঙ্গলের সুর কানে ঢুকলে মন জুড়িয়ে যায়। এসব গানের মূল্য আলাদা। তোদের ওই ফোচকামো গানের মতো নয়।

দুলু চলে যাওয়ার পর বেদী তৈরি করার কাজে লেগে গেল রঘুনাথরা। ঝুড়ি ঝুড়ি বুড়িগাঙের মাটি এনে তৈরি হল বেদী। মনসা পুজোর পরেই ভাদ্রমাস চলে আসবে। শুরু হবে করম পুজোর তোড়জোড়। ধাওড়াপাড়ার বউ-ঝিউড়িরা মেতে উঠবে করম পুজোর আয়োজনে। সে সময় ভাদুগান আর করমগানে নড়ে উঠবে মেয়েদের ঠোঁট। কটা দিন সারা পাড়া ঘিরে উৎসবের আয়োজন। রঘুনাথের এসব উৎসব অনুষ্ঠান পরব মেলাখেলা ভালো লাগে। কটা দিন অন্যরকম মনে হয় তার। অভাবী জীবনে এইটুকু সুখ-আনন্দ লটারি পাওয়ার চেয়েও মনোমুগ্ধকর। মাসকলাই হাতে নিয়ে মেয়েরা সুর করে গাইবে, কলাইরে, তুরে আমরা কী করে ভুলাইরে, ক্ষেতেরে, জমিরে ফুলুক শুধু মাসকলাইরে, ঘরে-বাইরে শুধু সুখের কলাইরে, ও মাটি তুর ভুখ কি ভরে রে, ফুল আসুক গোছা গোছা, ঘরদোর সব ঝাড়াপুছা, দেশ দুনিয়ায় ফুল ফুল ফুলুনী, শরীল হেলিয়া দুলিয়া কলাইদানা ঝাড়ুনী, কলাইরে কলাইরে, খেতিবাড়িতে সুখের সাথে ঢলাইরে ঢলাইরে, রক্ষা কর ধরিত্রী মাতা, অঢেল কলাই ফলাইরে ফলাইরে!

পরবে শুধু মানুষ নয়, সুখী হয়ে ওঠে মাঠঘাট পশুপাখি গাছপালা। পরব এলে বদলে যায় রোদের রঙ।

বসন্তপুর ধাওড়া থেকে টেপ নিয়ে এসেছে শ্রীকান্ত। সে ভূষণীবুড়ির নাতজামাই। পুজার ক'দিন সে ভূষণীবুড়ির ঘরে থাকবে। দুপুরে পাত পেড়ে খিচুড়ি খাবে পাকুড়তলায়। রাতে দুর্গামণি তাকে নেমন্তন্ন করেছে খাওয়ার জন্য।

মা মনসার প্রিয় নৈবেদ্য হাঁস। কাঁচা দুধ আর কলা। ভেজানো মুগ কলাই। কাঁচা দুধ না হলে মায়ের পুজো হবে না। সেই সঙ্গে চাই—নকুলদানা বাতাসা ফলফলাদি। পাড়ার মেয়েগুলো সাদা ফুল, লাল ফুল তুলে রেখেছে সাজি ভরে। ফুল তোলায় তাদের কী আনন্দ! ওরা যেন শিশির চুবানো ঘাসের চেয়েও ঝকমকে। মায়ের পুজো নিয়ে রঘুনাথের যেন ব্যস্ততার আর শেষ

নেই। রঙিন শাড়ি দিয়ে ঘেরা হবে বেদী। তার মাঝখানে মা আলো করে বসে থাকবেন। তার শরীরে শাটিংয়ের ঝলমলে পোশাক। মাথায় শোলার মুকুট। হাতে ফণাধারী সাপ, পায়ের কাছে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকবে মায়ের অনুগত সাপ। অষ্টনাগ, ষোল বোড়া..... আরও কতধরনের কত জাতের সাপ। মায়ের মাথায় ছায়া দেবে পঞ্চনাগ। ফি-বছর ঘটপুজো হত, এবার আর ঘটপুজো নয়। প্রতিমার দাম দিয়েছে সুফল ওঝা। এ পুজো সে নিজের ঘরে করতে পারত কিন্তু মনসা পুজোয় ভুল হলে কোনো ক্ষমা নেই। মা প্রচণ্ড রাগী। বদলা না নিয়ে ছাড়বে না। উপায় না দেখে সুফল ওঝা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সারা বছর মা মনসাকে নিয়ে তার কাজ কারবার। মাকে খুশ না করতে পারলে সে যে দুঃখের সাগরে ডুবে যাবে। ফলে ধাওড়া পাড়ার পুজোয় সুফল ওঝার প্রভাব অনেক। সে সরাসরি না থাকলে দূর থেকে কলকাঠি নাড়ে। তবে এ বছর তার মন ম্যাদামারা। আচারের নুন দেওয়া লেবুর মতো চুপসে গেছে। এর কারণ রঘুনাথ। রঘুনাথ তার মেয়ের সঙ্গে লটঘট করছে। বাপ হয়ে কে মেনে নেবে? ছেলেটার বামন হয়ে চাঁদ ছোঁয়ার বাসনা। ধাওড়া পাড়ার অনেকেই রঘুনাথের কেসটা জানে, তারাও মনে মনে খুশি নয়। সকাল থেকে মাইক বাজছে জোর কদমে। কালীগঞ্জ বাজার থেকে মাইক ভাড়া করে এনেছে লুলারাম। মাইকের যাবতীয় খরচাপাতি সব তার। লুলারামের মাথার কোনো ঠিক নেই। সব সময় তার মনে অশান্তি লেগে আছে। ঢিলি কোথায় গিয়েছে তার খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। দুলু কাহারের ঘর গিয়েছিল লুলারাম। তার হাত ধরে বলে এসেছে, তোর বৌদিকে পাওয়া যাচ্চে না। শুনেচি সে নাকি দেবগ্রামের বাসে চেপে কুথায় চলে গিয়েচে। দু-একজন তারে ভিখ মেঙে খেতে দেখেচে। লোকমুখে খবর পাই কিন্তু আনতে গিয়ে দেখি সে সিখানে নেই। তুর কাকি তো আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলচে। আমি আর পারচি নে। হেঁপসে উঠেচি। তুই তো এদিক সেদিক যাস। তোর সাথে দেখা হলে তরে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আয়। আমার মন বলচে তুর দ্বারা এ কাজ সম্ভব হবে।

গাঁ ছেড়ে এত দীর্ঘসময় ঢিলি কোথাও থাকে না। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে এখবর কেউ জানে না। তবে মরে গেলেই বুঝি ভালো হত, লুলারামে গলার কাঁটা নেমে যেত। নূপুর আর নোলক যেভাবে তার দিকে তাকায়—সেই নীরব দৃষ্টি কোনো মতেই সহ্য করতে পারে না লুলারাম। মেয়ে দুটোর চোখে সে অপরাধী হয়ে গেছে। ওরা বড়ো হচ্ছে। ওরা ঝারির ঘটনাটা জানে। সব জানার পরে লুলারামকে তারা ক্ষমা করবে কি ভাবে? নানা কারণে মনে মনে পুড়ে খাক হয়ে গেছে লুলারাম। তবু মনসা পুজোয় মাইক দিতে পেরে সে খুশি। দিন চারেক আগে ঘরে একটা চিতি সাপ বেরিয়েছিল। সামনে মনসা পুজো বলে সাপটাকে মারেনি সে। মা মনসার বাহন পুজোর আগে দেখা দিলে সেই ঘরে দেবীর পুজো আবশ্যক হয়ে পড়ে। লুলারাম ভেবেছিল ঢিলি ফিরে এলে সে পুজোর বন্দোবস্ত করবে। কিন্তু তা আর হয়নি। ঢিলি তার অশান্তিকে হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। পাড়ায় সবার চোখে ধীরে ধীরে অপরাধী হয়ে যাচ্ছে সে। এমনকী ঝারিও তাকে ভালো নজরে দেখছে না। সেদিন তো কলতলায় মুখের উপর বলে দিল, কী পাষাণ গো তুমি? যার সঙ্গে এত বছর তুমি ঘর করলে একবার তার খোঁজ নেবে না? সে তুমার বউ। মেয়ে দুটার মুখ চেয়ে তারে খুঁজে আনা তুমার দায়িত্ব।

ঝারির মুখের উপর লুলারাম একটা শব্দও বলতে পারেনি। ভিকনাথের বউটা আগের চেয়েও জেল্লাদারী হয়েছে। সামান্য আটপৌরে শাড়িতে তার রূপ যেন ফেটে বেরায়। মুখের হাসিটারই দাম লাখ টাকা। এ পাড়ায় বউ হয়ে আসার পর সে একদিনও খাটতে যায়নি। ভিকনাথই নিষেধ করে বলেছে, তুমি ঘরের বউ ঘরে থাকবা। আমার হাত-পা যত দিন সচল আচে, তুমারে আমি

খাটতে যেতে দেব না। আমি চোখ মুঁদলে তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।

—ছিঃ, কী কথা শোনাও সকাল সকাল! অভিমানে ঝারির মুখ ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে খসখসে ডুমুরের পাতা, যা বলেচো—আর কুনোদিন অমন কতা বলবা না। ওকথা শোনার আগে আমার যেন ছাতি ফেটে যায়।

লুলারামের সুখসঙ্গ ঝারি কোনো দিন ছাড়তে পারবে না, তা বলে সে যে তার ঘরের মানুষটাকে অবজ্ঞা করে তা নয়। ভিকনাথ সক্ষম পুরুষ তবু কী ভাবে যে ঝারি লুলারামের উপর ছিনে-জোঁকের মতো লেপটে গেল তা এখন আর সে মনে করতে পারে না। তবে এ ব্যাপারে প্রথম এগিয়ে আসে লুলারাম। ঝারির চাইতে সে বয়সে অনেক বড়ো হবে। বয়স্ক হলেও তার যৌন-আচরণে বয়স্কতার কোনো ছাপ নেই বরং সে অনেক বেশি তরুণ, চনমনে প্রাণ-ভ্রমর। লুলারাম দু-হাত ভরে তাকে অনেক কিছু দিয়েছে। এ পাড়ায় কারোর গলায় সোনার হার নেই শুধু ঝারি ছাড়া। দুটো চোঙা মাইক দুদিকে মুখ করে বেঁধে দিয়েছে রঘুনাথ। বেদীটাকে কে ঘিরে দিয়েছে কমলার কাছ থেকে চেয়ে আনা শাড়িতে। মুখ ফসকে বলার সাথে সাথেই কমলা শাড়ি তিনটে গুছিয়ে ভাঁজ করে রঘুনাথের হাতে দিয়ে দিল, যাক শেষ অবধি আমিও তোমাদের পুজোয় কাজে লেগে গেলাম। শাড়িগুলো যেন ফুটো না হয় সেদিকে খেয়াল রেখো। গত বছর পাড়ার ছেলেরা প্যান্ডেল বাঁধতে গিয়ে আমার একটা শাড়ি ফুটো করে দিয়েছে।

রঘুনাথ তাকে অভয় দিয়ে বলেছে, তুমার ভয় নেই। যেমন শাড়ি তেমনই ফেরত দিয়ে যাবো। আমার উপর তুমি বিশ্বাস রাখতে পারো। রঘুনাথের কথা শুনে কমলা দাঁত দেখিয়ে হেসেছে, তোমাকে বিশ্বাস করবো না তো কি আকাশের তারাকে বিশ্বাস করব? তুমি আমার ধরাছোঁয়ার মধ্যে। বলেই সে হাত চেপে ধরেছিল রঘুনাথের, যাকে মন দিয়েছি তাকে তিনটে শাড়ি দিলে কী হয়? তুমি জানো না, তুমি আমার কোথায় আছো!

শাড়িগুলো লাগাতে গিয়ে বারবার করে এসব কথা মনে পড়ছিল রঘুনাথের।

মাইকে মা মনসার পাঁচালি বাজছে। এ বারের পুজো গেল বারের পুজোকেও ছাপিয়ে গেল। একটা পুজোকে কেন্দ্র করে পাড়ার সব মানুষের এমন প্রাণঢালা যোগদান এর আগে দেখা যায়নি।

রঘুনাথ অশ্বত্থতলা থেকে ঘরে এসেছিল কী যেন কাজে। তাকে দেখে দুর্গামণি বলল, বুড়িগাঙ থেকে ডুব দিয়ে আয়। আজ আর তুকে খেতি দেব না। আজ তুর উপোস।

উপোসে থাকা কষ্টের। তবু রঘুনাথ মায়ের মুখের উপর না বলতে পারে না। কত কষ্ট করে দুর্গামণি হাঁস কেনার টাকা জোগাড় করেছে তা নিজের চোখে দেখেছে রঘুনাথ। গ্রামের কেউ সামান্য কটা টাকা উধার দিতে চায় নি। বর্ষা বাদলের দিনে নগদ টাকা কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। টাকার বদলে চাল গম অনেকেই ধার দিতে চায়। সব সময় চাল-গম দিয়ে কি সংসারের সব চাহিদা মেটে?

মন খারাপ করে খুঁটিবাঁশে হেলান দিয়ে বসেছিল দুর্গামণি। অতগুলো টাকা কোথা থেকে জোগাড় হবে ভাবছিল সে। রঘুনাথের মানসিকটা যে করেই হোক এ বছর শোধ করতে হবে। ছেলেটার অসুখ মা মানসার দয়ায় ভালো হয়েছে। মুখ রেখেছে মা মনসা। দেবী আসছে। তার সেবা যত্ন না করলে সংসারের উন্নতি হবে না। মা মনসাই তো তার ভরসা, আঁধার রাতের বাতি।

তার মন খারাপ দেখে চুনারাম আগ বাড়িয়ে বলেছিল, কী হয়েচে বউমা? মুখ বেজার করে বসে আচো যে!

—রঘুর মানসিকটা এ বছর মনে হয় শোধ হবে না। উত্তর দিয়েছিল দুর্গামণি, হাঁস বলি

দিব বলেছিলাম। কিন্তুক হাঁস যে কিনব তার টাকা কুথায়?

—ওঃ, এই কথা। চুনারাম ফোকলা হেসে বলেছিল, কত টাকা লাগবে তুমার? যেন খাজানার সন্ধান পেয়েছে চুনারাম, সেই ভাঙাচোরা মুখের দিকে তাকিয়েছিল দুর্গামণি। মানুষটা বলে কি, মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো? দুর্গামণির ভাবনা ওলোট-পালোট হয়ে গেল। যে মানুষটার বিড়ি খাওয়ার পয়সা জোটে না সে দেবে টাকা? বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুর্গামণির মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে গেল।

তাকে চমকে দিয়ে ঈষৎ কুঁজো গতর সামান্য সোজা করে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল চুনারাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল হাতে একটা বাঁশের পাঁপ নিয়ে। সেই শুকিয়ে যাওয়া বাঁশের পাঁপটা রঘুনাথের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চুনারাম বলল, এটা আমার লক্ষ্মীর ভাঁড়ার। যা দা নিয়ে আয়। দেকি এর ভিতরে কতো মাল-কড়ি জমেচে। চোখ বিস্ফারিত করে তাকাল দুর্গামণি। সে অপলক তাকিয়ে ছিল তরলাবাঁশের শক্ত-পোক্ত মোটা পাঁপটার দিকে।

রঘুনাথ দায়ের খোঁজে চলে গিয়েছে ঘরের দিকে। চুনারাম একটা বিড়ি ধরিয়ে তরল হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, তুমি চিন্তে করবে না বউমা। তুমার হাঁস কেনার টাকা হয়ে যাবেখন। দু-সাল থিকে ইতে আমি টাকা ভরচি। উঠিয়ে দেখো, কত্তো ভারি। এ পয়সা আমার বহু কষ্টের পয়সা। পেট কেটে এসব আমি জমিয়েচি। এ টাকা আমি গুয়ারেও দিইনি। কিন্তু নাতির কতা, তুমার কতা আলাদা। তুমাদের দুজনার জন্যি আমি আমার সব দিয়ে দিতে রাজি আচি।

দুর্গামণি স্বপ্নাবিষ্টের চোখে তাকাল। মানুষটাকে চিনতে তার ভুল হয়েছিল। মনে মনে অনুতপ্ত হল সে। মানুষ চেনা অত সহজ নয়, মাটি চেনার চেয়েও কঠিন।

গ্রামসমাজে খুঁটিবাঁশে পয়সা জমানোর রেওয়াজ বহু পুরনো। দুর্গামণির বাবাও পয়সা জমাত খুটিবাঁশে। খুঁটিবাঁশে জমালে সেই পয়সা নয়-ছয় বা চুরি চামারী হবার সুযোগ খুব কম থাকে। খুঁটিবাঁশের মাঝখানে পয়সা ফেলবার জন্য ছিদ্র থাকে। সে ছিদ্র বড়ো সূক্ষ্ম। পয়সা ঢুকবে কিন্তু কোনোভাবে বের করানো যাবে না। দিনে দিনে ভরে উঠবে বাঁশের পাঁপ। পাঁপ ভরে গেলে একমাত্র ছিদ্রটাই হবে পয়সা বার করার উপায়। আর ঘরের খুঁটি কাটলে ঘর দাঁড়িয়ে থাকবে কীভাবে? অর্থাৎ কাটা খুঁটি বদলাতে হবে সাথে-সাথে। নাহলে ঘর মুখ থুবড়ে পড়বে মাটিতে। চুনারাম অতশত ঝামেলাবাজির ধার ধারে না, খুঁটি বাঁশ নয়, সে পাঁপ বাঁশেই পয়সা জমাতে ভালোবাসে।

দুর্গামণি অবাক হওয়া চোখে তাকিয়ে আছে সেই পাঁপ বাঁশটার দিকে। চালে গোঁজা দা-টা নিয়ে খুবই ব্যস্ত ভঙ্গিতে চুনারামের সামনে দাঁড়াল রঘুনাথ, দাদু, এই নাও। কাটো- ফাড়ো যা খুশি করো—

—তুই থাকতে আমি কেনে দা-এ হাত দিব? চুনারাম কৌতুক হাসি ছড়িয়ে দিল পুরো মুখে।

দাদুর কথা কোনোদিনও ফেলতে পারে না রঘুনাথ, সে হাত বাড়িয়ে বাঁশের পাঁপটা নিয়ে দায়ের আঘাতে দু-ফাঁক করে দিল চোখের নিমেষে। ঝনঝন শব্দে পয়সা এবং ভাঁজ করা টাকা লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়, যেন টাকা নয়. পয়সা নয় এও যেন নক্ষত্রপতন।

দুর্গামণির ইতস্তত ভাবটি বেড়ে গেল। চুনারাম তা লক্ষ্য করে বলল, পয়সাগুলা বুঝে নাও। লক্ষ্মী চঞ্চলা, এদিক-ওদিক হতে দিও না।

উবু হয়ে পয়সা কুড়াচ্ছিল দুর্গামণি। রঘুনাথ আনন্দের সঙ্গে বলল, মা, কত হল ইবার গুণে ফেলো।

মাথা নেড়ে পয়সা গোণা শুরু করল দুর্গামণি। সব শেষে গা ঝাড়া দিয়ে সে বলল, সব মিলিয়ে

একশ সতেরো টাকা হয়েচে। আমার হাঁস কিনতে অত টাকা লাগবেনি।

—না লাগুক, ও পয়সা তুমার কাচে রাখো বউমা। চুনারাম ভারি গলায় বলল, আমার কাছে থাকলি পরে সব খরচা হয়ে যাবে। তুমি মেয়েমানুষ। তুমাদের চাপা হাত।

পাঁপ-চেরা পয়সায় হাঁস কিনেছে রঘুনাথ। মানসিক শোধ করতে পারলে দুর্গামণিরও খুশি ধরবে না।

পরবের দিনে তার মোটা ঠোঁট দুটো স্ফূরিত হল আনন্দে।

অশ্বত্থ তলায় সাইকেল নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিল কাশীনাথ। কমলার শাড়ি দিয়ে ঘেরা হয়েছে মনসা মায়ের মণ্ডপ। এই দৃশ্য দেখতে গেলে তার চোখের ভেতরটায় কে যেন ছুঁড়ে দেয় কচার রস। করকরিয়ে ওঠে কাশীনাথের চোখ দুটো, এ শাড়ি কোথায় পেলি তোরা, এ তো আমার বোনের শাড়ি।

পাশে দাঁড়ানো রোগা ছেলেটা মিনমিনে স্বরে বলল, তুমার বোনের শাড়ি কিনা জানি না তবে এ শাড়ি রঘুদা চেয়ে এনেচে গাঁ থেকে। পুজো হয়ে গেলে ফের ঘুরিয়ে দিয়ে আসবে।

—এ কী মামার বাড়ি নাকি? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা—। কাশীনাথ ছুটে গেল পাকুড়তলায়। দস্যু হাতে সে পটাপট ছিঁড়ে ফেলল সেলাই।

লম্বা ছেলেটা এগিয়ে গিয়ে বাধা দিতে চাইলে কাশীনাথ তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। একটা মোক্ষম খিস্তি দিয়ে বলল, হিম্মোত থাকলে তোর মায়ের পরনের শাড়ি খুলে নিয়ে এসে পুজো কর। পরের ধনে পোদ্দারী করে কি লাভ?

—দাঁড়াও রঘুদাকে ডাকচি।

—ডাক গে যা তোর বাপকে। কার ঘাড়ে কটা মাথা সব আমার জানা আছে। হুঁকরে আস্ফালন করে উঠল কাশীনাথ।

রঘুনাথকে ডাকতে হল না তার আগেই অশ্বত্থতলায় পৌঁছে গেল সে। কাশীনাথকে মণ্ডপের শাড়ি খুলতে দেখে তার মাথায় বুঝি কাঁকড়া বিছে কামড়ে দিল। হুঙ্কার ছেড়ে দূর থেকে সে বলল, খবরদার কাশীদা, মণ্ডপের গায়ে হাত দিও না। বহু কষ্ট করে সুতো দিয়ে জুড়েচি।

—তুই জুড়েছিস তো আমার কী?

—কী মানে? এটা দশজনের পুজো।

—কমলার শাড়ি কোথায় পেলি? নিঃশ্বাস তেতে উঠল কাশীনাথের।

—তুমার বুন দিয়েচে। পুজা শেষ হলে দিয়ে আসব।

—না, এক্ষুনি আমি শাড়ি খুলে নেব।

—মনসাবুড়িকে তুমি অগ্রাহ্য করতে পারো না।

কাশীনাথ রঘুনাথের নিষেধ না শুনেই পড়পড় করে টানতে লাগল শাড়ি। চারধার ঘেরা মণ্ডপটা ফাঁকা হয়ে গেলে চোখের নিমেষে। সরে গেল আলো-ছায়া পরিবেশ।

নিমেষে মাথায় রক্ত উঠে গেল রঘুনাথের। সে ছুটে গিয়ে বেড়া থেকে উপড়ে আনল খুঁটিবাঁশ। তারপর কাশীনাথকে পেটাতে লাগল সজোরে। কাশীনাথ এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তিনটে-চারটে ঘা ওর পিঠে পড়তেই বাপরে বলে মাটি নিল কাশীনাথ। অশ্বত্থতলার ধুলো ওর মুখের ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেল এক মুঠো। প্রাগৈতিহাসিক পশুর মতো কাতরাচ্ছে কাশীনাথ।

অশ্বত্থগাছের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে মেঘেদের ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছিল, চলমান মেঘের ছায়া ভাসছিল বুড়িগাঙের জলে, সারিবদ্ধ আখক্ষেতে বাতাস আছড়ে পড়ে শব্দ তুলছিল গণ্ডগোলের। মনে হচ্ছিল কোনো জনবহুল বাজার এলাকায় হঠাৎ হামলাকারী আর প্রতিরোধকারীর তুমুল বিবাদ বেধেছে, আর সেই বিবাদের জেরে উৎপন্ন হল্লা স্থানীয় এলাকা ছাড়িয়ে লোকালয়ে ছিটকে যাচ্ছে।

বাঁশের আঘাতে ধুলোয় লুটিয়ে গোঙাচ্ছিল কাশীনাথ।

তার গায়ে যে রঘুনাথ হাত তুলতে পারে—এটা স্বপ্নেও ভাবেনি। অপমান কুরেকুরে খাচ্ছিল তাকে। এভাবে পড়ে পড়ে মার খেলে মৃত্যু অনিবার্য—এই ভেবে মাটিতে দু'হাতের ভর দিয়ে কোনোমতে উঠে দাঁড়াল কাশীনাথ। মুখের ধুলো থুঃ শব্দে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে গ্রামের দিকে দৌড়তে লাগল প্রাণপণে।

পুটুস আর অ্যাশশেওড়ার ঝোপে ছেয়েছিল বাঁধের উল্টো দিকের এলাকাটা। দিনের বেলায় ব্রাত্য থাকে ওই জায়গা, সাধারণত অশৌচ হাঁড়িকুড়ি, গ্রামের নোংরা-আবর্জনা সব ডাঁই হয়ে থাকে ওখানেই। কাশীনাথ টলোমলো শরীর নিয়ে নোংরা মাড়িয়ে ছুটছে। ডগর কাঁসি ঢোল চড়বড়ি বাজনা থামিয়ে পাড়ার ছেলেগুলো রে-রে শব্দ মুখে তুলে পিছু নিয়েছে ওর। মুহূর্তে উৎসবের পাখিটা বিষণ্ণ হয়ে নেমে এল পথের ধুলোয়।

রঘুনাথ বাঁশের মাচায় গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসল। খরানীকালের মুথাঘাসের মতো নিষ্প্রভ হয়ে উঠল তার মুখমণ্ডল। আজ এ কী করল সে? কাশীনাথকে ওভাবে বাঁশ-পেটা করা তার উচিত হয়নি। একথা নিশ্চয়ই কেউ না কেউ সুফল ওঝার কানে তুলবে। গ্রামের বাতাস গুজবের জীবাণুর ধারক এবং বাহক। কমলা শুনলে কী ভাববে তাকে নিয়ে?

রঘুনাথের ভেতরের ঘুমন্ত অসুরটা এভাবেই মাঝেমাঝে জেগে ওঠে, তাকে তখন থামানো যায় না, সংযমের বেড়ায় আটকে রাখা অসম্ভব। এই বুনো রাগ আর জেদ তার সর্বনাশ না করে ছাড়বে না।

কাশীনাথের সাইকেলটার দিকে নজর গেল রঘুনাথের। কোনো সহানুভূতি নয় রাগ এসে বাঘহাতা ঘাসের মতো দখল নিল মনের জমি। রঘুনাথ গা ঝাড়া দিয়ে এগিয়ে গেল সাইকেলটার কাছে। কাশীনাথ তাকে জানে মারতে চেয়েছিল বাঁধের ধারে। অন্ধ একগুঁয়ে রাগ রঘুনাথের ভেতরটা ফোঁপরা করে দিচ্ছে। ভাঙা, চিড় খাওয়া সম্পর্ক বেলের আঠায় জোড়ে না। তাকে জোড়া লাগানোর কথা ভাবাও ভুল।

রঘুনাথ এগিয়ে গিয়ে সাইকেলের হ্যান্ডেলটা ধরে বাঁধের দিকে চলে গেল। এমন পাপী মানুষের কোনো জিনিস ছুঁয়ে থাকাও পাপ। রঘুনাথ হাত উঁচিয়ে সেই লম্বা কালো ছেলেটাকে ডাকল।

ছেলেটা তার সামনে আসতেই রঘুনাথ তার মত বদলে বলল, যা এটা নিয়ে গিয়ে শেরপুরের ভেতরটায় রেখে আয়। এই জিনিস মার বেদীর সমুখে থাকুক এ আমি চাইনে।

ছেলেটা সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে চলে যাচ্ছে শেরপুরের দিকে।

এখন চতুর্দিকে ট্যাড়শ ফুলের চেয়েও নরম রোদ উঠেছে। বৃষ্টি ধোওয়া রোদের আভিজাত্যই আলাদা। এই রোদ মানুষের মন খারাপ সারিয়ে দেয়। আর কিছুক্ষণ পরেই পুজোয় বসবে চুনারাম। এ পাড়ায় ব্রাহ্মণ আনে না বাইরে থেকে। আনার ইচ্ছে থাকলেও ব্রাহ্মণরাই আসতে চায় না। সংস্কারের বেড়াটা তখন কাঁটার ঝোপের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়ায় উভয়ের মাঝখানে। তাই এ পাড়ার কেউ বহুযুগ ধরে বামুনের দ্বারস্থ হয় না। তারা নিজেরাই নিজের হিত-কামনায় পুরোহিত।

দূর থেকে রঘুনাথ দেখল বৃদ্ধ চুনারাম খালি গায়ে তার সোডায় কাচা ধুতিটা পরে হেঁটে আসছে। তার হাতে একটা ভেড়ার লোমের আসন, সদ্যস্নান সারায় তার পাকা চুলগুলো চকচক করছে রোদ-হাওয়ায়। পুরোহিত বেশে চুনারামকে মানাচ্ছে মন্দ নয়। আজ যে পরব, আজ যে শ্রীশ্রী মনসা মায়ের পুজো একথা শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতিও বলে দিচ্ছে বারবার।

দুধের যেমন মাখন, ফুলের যেমন সুবাস, তেমনি মনসা পুজোয় ঝাঁপান না হলে মানায় না। ঝাঁপান নিয়ে সুফল ওঝার নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। ভিকনাথ তার পেছন-পেছন ঘুরছে সকাল থেকে।

শুধু আজ নয়, বেশ কয়েক মাস হল তার মাথায় নেশা চেপেছে—তাকে মন্ত্রবিদ্যা শিখতে হবেই হবে।

ভিকনাথ তার সঙ্গ নেওয়ায় সুফল ওঝার লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি। ভারি থলিটা এখন তাকে আর বয়ে বেড়াতে হয় না। ভিকনাথ বড়ো অনুগত। সুফল ওঝার হাত থেকে থলিটা কেড়ে সে নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেয়। ওস্তাদের মন না পেলে মন্ত্র পাবে না সে।

সুফল ওঝা ভিকনাথকে বলেছে, মন্ত্র তো শুধু মুখের বুলি। সেই বুলিতে শক্তি আর ভক্তি মিশালে তবে গিয়ে মন্ত্র হয়। শক্তি আমি দেব। শুধু ভক্তিটা তোর ভেতর থেকে তৈরি হবে। আর তা যদি না হয় আমি তোর গায়ে মন্ত্র খোদাই করে দিলেও কোনো লাভ হবে না। মনসা মায়ের পাঁচালি হয়ে যাবে তা।

কথাটা শোনার পরে বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে ভিকনাথ। তার মন্ত্র শেখার একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঝারিকে টাইট দেওয়া। বউটাকে উচিত শিক্ষা না দিলে সে যে ডানা মেলে প্রজাপতির মতো উড়ছে। লুলারামের সঙ্গে তার ঢলাঢলি এখন বড়ো চোখে লাগছে ভিকনাথের। পাড়ার লোকে দোষ দিচ্ছে তাকে। অনেকে আবার মুখের উপর বলছে, বউ সামলাতে পারো না তো বিয়ে করেছিলে কেনে? অমন বেবুশ্যে বউ থাকার চাইতে না থাকাই ভালো।

কথাগুলো কানে গেলে ঝিমিয়ে যায় ভিকনাথ। সে তখন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। কথাগুলো সাপের মতো ছোবল মারে বুকে। দশ লোকে যা বলে তা মিছে কথা নয়। এক মুখকে চাপা দিলেও দশটা মুখ তো চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। কলঙ্ক আর কুৎসা বর্ষায় বুড়িগাঙের চেয়েও দ্রুত দৌড়ায়। ভিকনাথ মনে মনে ভেবেছে—অগ্নিবাণ মেরে সে শেষ করে দেবে লুলারামকে। ওর পুরো সংসার ছারখার হয়ে যাবে। ওর বউ পাগল হয়ে উদোম শরীরে ঘুরবে। ওর মেয়েদুটো দেবগ্রামে গিয়ে শরীর বেচে খাবে। ওর বুড়া বাপটার কুষ্ঠ রোগে পাপের পোকা কিলবিলিয়ে নড়বে।

সুফল ওঝাকে সব বলেছে ভিকনাথ। সব শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছে সুফল ওঝা। ভিকনাথ তার পা-দুটো আঁকড়ে ধরে বলেছে, ওস্তাদ, তুমার এই পা দুটা আমার ভরসা। মনে আমি কিচু লুকিয়ে রাখতে পারি নে। আমার মন পাকাটির চেয়েও পলকা। চাপ দিলে পুট-পুট করে ভেঙে যায়। ও হারামীটাকে তুমি জানে মেরে দাও বাণ মেরে। আমি সারাজীবন তুমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। ওর জন্যি আমি রাতে ভালো ঘুমাতে পারি না। ওই হারামীর ছা-আমার সোন্দর বউটাকে ছিনিয়ে নিল।

—সব হবে, শান্ত হও। সুফল ওঝা বিড়ি ধরিয়ে চৈতন্যবকের মতো ঘাড় নাড়ে। ভিকনাথ তবু শান্ত হয় না, মেনিমুখো বেড়ালের মতো তাকায়, তুমি আমারে শান্ত হতে বলচো কিন্তুক আমি কী করে শান্ত হই বলো তো! আমার মাথায় বোলতা কেমড়ে দিয়েচে। তার যন্তনায় আমি জ্বলে মরচি। লুলারাম পয়সা করে আমার সনসারটা ভেন্‌গে দিলো। ঝারি এখন আমার কাচে শুতে চায় না। ওর এখন বড়োলোক হবার মন হয়েচে। তাই বুকে কিল মেরে বোবা হয়ে পড়ে আচি। চোকে সর্ষের ফুল দেখচি।

—অত ভাবিস নে। সব ঠিক হয়ে যাবে। ভিকনাথের ঘাড়ের উপর হাত রাখল সুফল ওঝা, আমি তো আছি, আমি তো মরে যাইনি। তোকে এট্টা কাজ করতে হবে। গুয়ার ব্যাটাটাকে এট্টু টাইট দিতে পারবি? ও কমলার পেছনে লেগেচে। মেয়েটাকে এট্টু বাইরে বেরতে দেয় না। সব সময় চামএঁটুলির মতো জড়িয়ে আচে।

—কী করতে হবে বলো? খুশি না হলেও ভিকনাথ মন রাখার জন্য বলল, ঠিক আচে, কাজটা

কি বুঝিয়ে বলো। যদি আমার দ্বারা হয় তাহলে ঠিক করে দেব।

সুফল ওঝা গা ঝাড়া দিয়ে বলল, কাজ সামান্যই। মেরে ওর পা দুটো উল্টে দিতে হবে। পারবি?

চোখ-মুখ শুকিয়ে ভিকনাথ বলল, ওর গায়ে হাত তুলতে আমি পারবানি। ওর বাপ গুয়া আমাকে অক্ত দিয়েছিল। ধাওড়া পাড়ার কেউ তখন পাশে দাঁড়ায়নি।

—ঠিক আছে, যা ভালো বুঝিস কর। সুফল ওঝা মাথা চুলকে কপট হাসল, তবে লুলারাম ওই ঝাড়েরই বাঁশ। লুলারাম তোর সব্বোনাশ করেচে। তুই তার সব্বোনাশ করতে চাস। গুয়ার ব্যাটাটা কমলার মন বিষিয়ে দিয়েছে। আমিও ওর মন ছ্যারাবেরা করে দেব। সহজে ছাড়ব না আমি। এমন বাণ মারব যে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরবে।

ভয়ে হিম হয়ে গেল ভিকনাথের শরীর, কথা জড়িয়ে গেল তার, না, মানে, ইয়ে...

—থাক আর তোকে তোতলাতে হবে না। আমি তোর মনের ভাব বুঝে গিয়েচি। সুফল ওঝা কঠোর চোখে তাকাল, কত ধানে কত চাল হয় সে হিসেব আমার সব জানা আচে। যার গাল টিপলে এখনও দুধের ঘেরান যায়নি, সে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। মূর্খের হাজার দোষ, বুঝলি কি না?

ভিকনাথ অনুগত ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল, সে আমি বুঝেচি ওস্তাদ। তবে তুমার পায়ে ধরি—তুমি আমার কেসটা ভুলে যেও না। ঝারিকে ঘরে ফিরিয়ে দাও। আমার ভাঙা সনসার জুড়ে দাও। দোহাই তুমার।

ভিকনাথের আকুতি দীর্ঘশ্বাস বাতাসকে বেদনাবিধুর করে তোলে, তার মজাটুকু তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে সুফল ওঝা।

ঝাঁপান উৎসবে তিনদিন আগে সুফল ওঝা কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, এবছর মনে হচ্ছে মায়ের কাছে খালি ঝাঁপি নিয়ে যেতে হবে। ফি-বছর এসময় দু-চারটে জাতসাপ আমার ঝাঁপিতে থাকেই থাকে। এবছর মনে হচ্ছে মায়ের কাছে খালি হাতে যেতে হবে।

ভিকনাথ তার মন রাখার জন্য বলেছিল, অত চিন্তা করো না। মায়ের বাহন মা-ই জুটিয়ে নেবে। তবে যদি শরীল সাথ দেয় তাহলে চলো বিলের ধার দিয়ে ঘুরে আসি। ওদিকের ঝোপ ঝাড়ে তেনারা ঘোরাফেরা করে লোকমুখে খবর পেয়েচি। তা ছাড়া ফি-বছর ওখানেই তো তুমি মনসা পুজার ধরা সাপগুলো ছেড়ে আসো।

—তা ঠিক, তবে তাদের কি এখন পাব?

—পাই না পাই চলো না ঘুরে আসি। ভিকনাথ বোঝাল, জায়গাটা নির্জন। বিলের ঠাণ্ডা বাতাসে সাপগুলা আরাম করে থাকে ওখানে।

কথাটা মনে ধরেছিল সুফলের, ভিকনাথকে সে মুখের উপর মানা করতে পারেনি। মানুষটা বোকা হলেও সরলতা হারিয়ে ফেলেনি। এই সরলতাই ভিকনাথের সম্পদ। ওর সরল চাহনিতে

ওর বড়ো বড়ো চোখদুটো কাঠটগর ফুলের মতো ফুটে থাকে সব সময়। এই সারল্য ওর খাটুনিভরা চেহারাতে ধরা পড়ে।

পণ্ডিতবিলের পাড় ধরে পায়ে চলার পথ। ভিকনাথ তার লম্বা রোগা শরীর দুলিয়ে বাঁক কাঁধে পথ হাঁটে। তাকে পেশাদার বেদের মতো দেখায়। বাঁকের দুদিকে দোল খায় শূন্য সাপঝাঁপি, যা যত্ন করে গোবর মাটি দিয়ে লেপা। ভিকনাথের পরনে ময়লা ধুতি, খালি গা। মাথায় ফেট্টি দিয়ে বাঁধা লাল গামছা। কিছু দূর এসে মোচ নাচিয়ে সে সুফল ওঝাকে শুধোল, ওস্তাদ, আমার মন বলচে আজ খালি হাতে ফিরতে হবে না। এদিকটায় কুনো ওঝা-গুণিনের পা পড়েনি।

খাড়া পথ ঠেঙিয়ে ঝোপের ভেতর ঢুকে এল ভিকনাথ। কাঁধের বাঁকটা নামিয়ে ঘাড় মুছে নিয়ে সে পিছন ঘুরে তাকাল। সুফল ওঝা গামছা পেতে পা থেবড়ে বসেছে মাটিতে। এক মুঠো মাটি খামচে তুলে নিয়ে সে গন্ধ শুঁকে দেখচে বারবার। বিড়বিড়ান মন্ত্রের ধ্বনি কানে আসছিল ভিকনাথের।

এই ফাঁকে শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়িয়েছে সুফল ওঝা। ছোট করে কাটা গোঁফ নাচিয়ে নিঃশব্দে সে ঝোপ-ঝাড়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল। ভিকনাথের কথাটাই ঠিক। এখানে কারোর পায়ের ছাপ পড়েনি। যদি তেনারা থাকে এখানে নিশ্চয়ই শান্তিতে আছে। গত বছর মনসা পুজোর পরে এখানেই চারটে খরিস সাপ ছেড়ে গিয়েছিল সুফল ওঝা। গেল সালে ঝাঁপান পার্টি মা মনসার গুণগান কম করেনি। সুফল ওঝাও পিছিয়ে ছিল না এসব ব্যাপারে। সে হেলে-দুলে গাইছিল, ডালা খুললে কালো মালা নাচেরে, নাচেরে/ও মালা কেমড়ে দিলে কেউ কি তখুন বাঁচে রে? বাঁচে রে?/ওরে অষ্টোনাগ ষোলবোড়া বত্রিশ চিতের বাহার রে/মা মনসার ভোগে লাগে, কাঁচা দুধ, পোষা হাঁসের মান্‌সো রে। গানের তালে তালে মাথা হেলায় দশ জন মানুষ। ওরা সব দোহারকি। ওরা না হলে ঝাঁপান গান জমবে না। গানের তালে তালে চলতে থাকে সাপের খেলা। সুফল ওঝা হাঁটু নাচায়, কখনও গামছা বাঁধা হাত এগিয়ে দেয় সাপের ছোবলের এলাকায়। একাজে ঝুঁকি অনেক, চোট খেলে বাঁচার আশা কম। তখন 'কী সাপে কামড়াইলো বাছারে আমার/মা বলিয়া ডাকিতে দিল না আর...!' বলে কান্নাকাটি করলেও সে আর ফিরবে না। একবার দংশালে বিষ চারিয়ে যাবে রক্তে, মুখে গাঁজরা উঠে নীল হয়ে যাবে শরীর। মৃত্যু এসে টেনে নিয়ে যাবে শ্মশানঘাটে।

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সুফল ওঝা মাটি ঝুরো ঝুরো করে উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ার দিকে। মাটি যে দিকে উড়ে যাবে, সেদিকেই তাদের দেখা পাওয়া যাবে। ঘাস মাটির গন্ধ শুঁকে পথ চিনে কটা মানুষ যেতে পারে। শুধুমাত্র ময়ূরভঞ্জের জানগুরু এ কাজটা করতে পারে। সব বিদ্যা দিলেও গুরুমারা বিদ্যা কেউ দিতে চায় না। সুফল ওঝা কাকুতি-মিনতি করেও জানগুরুর কাছ থেকে এটা আদায় করতে সক্ষম হল না। তবে জানগুরু তাকে অভয় দিয়ে বলেছিল, এক পাতে কি সব খাবি? পাত বদলা। তারপর ভাবব তুই হজমাতে পারবি কিনা। শোন বেটা, সবার পেটে কি ঘি সহ্য হয় রে?

সুফল ওঝা মুখ ঝুঁকিয়ে ফিরে এসেছিল দেশ-গাঁয়ে। মনে তার ইচ্ছে ছিল, সে আর একবার ময়ূরভঞ্জ যাবে। ওটা তার কাছে দেবস্থান। গুরুস্থান। ময়ূরভঞ্জের জানগুরু না থাকলে তাকে আজ হয়ত মাঠে-ঘাটে মুনিষের কাজ করে বেড়াতে হত। গাঁয়ে-গঞ্জে এত সম্মান কি তখন তার থাকত? আজ ঝাড়ফুঁক করে দুটো কাঁচা পয়সার মুখ দেখে সে। মাটির বাড়িখানা তার সবাই টেরিয়ে-টেরিয়ে দেখে। খড়ের মোটা ছাউনি ঘরের গরম ভাবটাকে পুরো শুষে নিয়েছে। মাটির ঘর হলেও তা দোতলা। কড়ি-বর্গা, জানলা-দরজা সব নিম আর কাঁঠালকাঠের। বাড়ির সামনের

শিউলি গাছটায় সমবচ্ছর ফুল ধরে, বিশেষ করে সন্ধের পর থেকে কেউ যেন দামি আতরশিশির ছিপি খুলে দেয়, হুড়মুড়িয়ে সুগন্ধ নাকে এসে আরামের সুড়সুড়ি দিয়ে পালায়। বেড়ার ধারে আকন্দগাছের সারি, ফলার মতো বড়ো বড়ো পাতাগুলোয় চুন বোলানো, মন ভরে যায়। সুফল ওঝার সব চাইতে ভালো লাগে ঘরের পেছনের কদবেল গাছটা। ওর তেল চকচকে ক্ষুদে-ক্ষুদে পাতাগুলো মেয়েদের কপালের কালচে-সবুজ টিপের মতো, সকালের রোদ বাড়লে পাতাগুলো যুবতী মেয়ের ভরাট নিটোল মুখের মতো চমকায়। তখন হাঁ হয়ে যায় সুফল ওঝার চোখ, সদ্য বেরনো বাঁশকোঁড়ার মতো হকচকিয়ে ওঠে চোখ। উঠোনের এক পাশে গোরু বাঁধা, পাতনাগুলো সুখের খনি, গোরুগুলো ঘাস-খড় কুচনো চিবাতে চিবাতে অনুগত ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে। সকালে ওই নীরিহ গোরুগুলো বালতি ভরা দুধ দেয়। আউসের মুড়ি দিয়ে জামবাটিতে দুধ সহযোগে খেতে ভীষণ ভালো লাগে সুফল ওঝার।

এত সুখ তার কপালে লেখা সে কি আগে জানত? এই মন্ত্রই তাকে সব জানিয়েছে, চিনিয়েছে। আর দশটা মানুষের থেকে আলাদা করে দিয়েছে তাকে। দশ গাঁয়ের মানুষ তাকে এখন এক ডাকে চেনে। এই সম্মান সে হারাতে চায় না কোনোমতে। হাইস্কুলের ছোকরা মাস্টার তাকে হেনস্থা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ওর মতন দশটা মানুষ গাঁয়ে থাকলে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে তাকে। সুফল ওঝা তাই কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি। পথের কাঁটাকে পথেই খতম করে দিতে চেয়েছিল সে, কিন্তু ভাগ্যের জোরে মাস্টার বেঁচে যায়। সেদিন যদি হাতকাটা দুলু গিয়ে না পৌঁছাত তাহলে সাঁতার না জানা মাস্টার বর্ষার বিলে বিষ দেওয়া মাছের মতো ভেসে উঠত। কাক-পক্ষীতেও টের পেত না-এর পেছনে কার হাত আছে।

আজ ডাঙাবনের ঝোপের মধ্যে বসে সুফল ওঝা কপাল কুঁচকে রোদের দিকে তাকাল। রোদ বাড়লে তেজ কমে আসে সাপের। ওদের ঘরসংসার তখন গরমগুহা। আইঢাই করে সংবেদী শরীর। উইঢিপি থেকে বেরিয়ে এসে ওরা জলের ধারে ঘুরে বেড়ায়। ব্যাঙ শামুক মাছ যা পায় খায়। না খেলে পেট বাঁচবে কি করে? যাই দেবে অঙ্গে, তাই যাবে সঙ্গে।

বিল ধারের সাপগুলো ফণাধারী, ওদের চোটপাট মন্দ নয়, খর চোখ, তড়িৎ গতি, হিংস্র ভাবনা। ঠিক খেলিয়ে না ধরলে সমূহ বিপদ। সাপের চোখে চোখ রেখে সুফল ওঝার বেঁচে থাকা। চোখ সরে গেলে বিপদ। ঝাঁ-করে নেমে আসবে খাঁড়ার কোপের চেয়েও হিংস্র ছোবল। তখন মৃত্যু অবধারিত।

ঝোপঝাড় চিরে সুফল ওঝা এগিয়ে গেল উইঢিপিগুলোর দিকে। বর্ষায় অমন নিরাপদ আশ্রয় আর কী হতে পারে? ওখানেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকতে পারে খরিস সাপের বংশ।

সুফল ওঝার নির্দেশে বাঁক নামিয়ে উইঢিপি খুঁড়তে লেগে গিয়েছিল ভিকনাথ। ওর কালো শরীর চুঁইয়ে ঘাম আর মাটির মিশ্রণ নামছিল সরসরিয়ে, তবু ওর কোনো ক্লান্তি নেই। একমাত্র সুফল ওঝাই পারবে মন্ত্রের সাহায্যে ঝারিকে সংসারে ফিরিয়ে দিতে এটা তার বদ্ধমূল ধারণা। সুফল ওঝা সব পারে শুধু মরা মানুষ জ্যান্ত করতে পারে না। মাটি খোঁড়ার ঝোঁকে মাথায় বাঁধা লাল গামছা খসে পড়ে মাটিতে। গামছাটা তুলে নিয়ে ভিকনাথ রগড়ে রগড়ে মুখ মুছল, তারপর শূন্য দৃষ্টিতে উইঢিপির দিকে তাকাল, ওস্তাদ, আর কত দূর খুঁড়তে হবে গো? হাতের ডানা দুটো যে ব্যথা করচে।

—কারোর ডানা ভাঙতে গেলে নিজের ডানা তো এট্টু ব্যথা করেই। সুফল ওঝা ছাঁটা গোফ নাচিয়ে হাসল, সাপধরার কাজ ভাত রাঁধার মতো সহজ কাজ নয়। এ কাজে কখন থামতে হবে তা আগাম কেউ জানে না।

উঁইঢিপি খুঁড়ে পাকা খরিস বের করে আনতে গায়ের গেঞ্জি ভিজে সপসপে হয়ে গেল সুফল ওঝার। সাপটার ফোঁসফোঁসানীতে ভয়ে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে ভিকনাথ। চোখের সামনে বিষদাঁত ভাঙা নয়, এমন সাপ সে কি এর আগে দেখেছে? মনে করতে পারল না ভিকনাথ। ভয়ে ঘাম ফুটে বেরল তার শরীরে। লাল গামছায় মুখ মুছে সে সুফল ওঝার চোখের দিকে তাকাল, ওস্তাদ, এটাকে কুথায় রাখবো, ঝোলায় না ঝাঁপিতে।

সুফল ওঝার ঠোঁটে গর্বের চিলতে হাসি, বিষদাঁত না ভাঙা অব্দি ও ঝোলায় থাকবে। যতক্ষণ না বিষদাঁত ভাঙচি, ততক্ষণ ওর জেদ-গোঁ কোনোটাই কমবে নি। কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল সুফল ওঝা, অতীত দিনে হারিয়ে গিয়ে সে আবার উড়ুলমাছের মতো ভেসে উঠল, আজ আমার কেন জানি না বাসুর কথা মনে পড়ছে।

—কুন বাসুগো ওস্তাদ?

—হরিনাথপুরের বাসুদেব। যে বাসুদেব বেলডাঙার রেল-ইস্টিশানে কাজ করত। ওই যে গাড়ি আসার সময় কিংবা টিকিট দেওয়ার সময় হলে ঘন্টা বাজাত—সেই বাসুদেব। বছর তিনেক আগের ঘটনা। সাপের বিষ বের করতে গিয়ে আঙুলটা সাপের মুখের ভেতর ঢুকে যায়। পাকা সাপটা কামড়ে দেয় ওকে। এক্কেবারে বুড়ো আঙুলে। কত চেষ্টা করলাম। দশ গাঁয়ের গুণিন এলো। তবু মানুষটা বাঁচল নি। ভ্যানে চাপিয়ে বাসুরে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হল তখন ওর শরীরে জান নেই। প্রাণ পাখি উড়ে গেছে বহুক্ষণ। সুফলের অশ্রুপ্লাবিত মুখ। বাসুদেবের জন্য তার অন্তরটা কেঁদে উঠল অসময়ে। মানুষটার টাকা-পয়সা জমিজমার অভাব ছিল না। বেলডাঙায় তার নামে রেল কোয়ার্টার ছিল। তবু ফি-মাসে ঘর আসত দেখভালের জন্য।

বাসুদেব বৌ বাচ্চা নিয়ে কোয়ার্টারে থাকত। ওর বউয়ের পাকা ঘরে থাকার ভীষণ সখ। সেই চাকুরিয়া বাসুদেবের একটাই নেশা—মনসা পুজোয় সাপের খেলা দেখানো।

ফি-বছর আসত সে। সে-বছর এসে সে আর ফিরে গেল না। দৈবের লিখন কে খণ্ডাবে?

ডাঙা ঝোপের সাপটার বিষ দাঁত ভাঙল না সুফল ওঝা। একা থাকলে এসব কাজ করা ঝক্কির। আনকোরা লোক দিয়ে এসব ঝুঁকির কাজ হয় না। বিপদ-আপদ ঘটে গেলে সে ঠেকা দিতে অক্ষম। লম্বা কাপড়ের থলিতে সাপটা ঢুকিয়ে নিজের কাছে রাখল সে। তখনো ফোঁস-ফোঁসানী থামেনি সাপটার। এ অবস্থায় ভিকনাথের হাতে সাপটা তুলে দেওয়া উচিত হবে না। হিতে বিপরীত হয়ে গেলে বিপদ।

মান গেল জান গেল তুর কাছে মা বিনতি/সাত সাগরের জল দিয়েছি মান রাখিস এই মিনতি। অশ্বত্থতলায় ডান পা নড়িয়ে হলদে খরিসের খেলা দেখাচ্ছিল সুফল ওঝা, ওর ধূর্ত চোখে যেন সাপের চোখটায় বসানো। একটু অন্যমনস্ক হলেই নিমেষে বিষ ঢেলে দেবে ফণা তোলা সাপ। ভিড় বাড়ছিল রোদ বাড়ার সাথে সাথে। আজ মনসা পুজোয় নতুন জামা আর ধুতি পরেছে সুফল ওঝা। ওর কপালে সিঁদুরের লম্বা তিলক আঁকা। সাপুড়ে নয়, কাপালিকদের মতো দেখাচ্ছিল ওকে।

মনসা পুজোয় জ্যাবজ্যাবে করে তেল মেখেছে সুফল ওঝা। নারকেল তেলমাখা তার ধাতে সয় না। জ্ঞানপড়ার পর থেকেই সরষের তেল মাথায় মাখছে সুফল ওঝা। সরষের তেল নাকি মাথা ঠাণ্ডা রাখে, ঘুম ভালো হয়। যদিও কাল সারা রাত ঘুমাতে পারে নি সে। কমলার ঘটনাটা তাকে বেশ দুঃখ দিয়েছে। মেয়েটা মুখের উপর অমনভাবে বলে দেবে স্বপ্নেও সে আশা করেনি। কমলা দীপ্তকণ্ঠে বলল, বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে রঘুকেই করব। রঘু ছাড়া আমি আর কাউকে আমার স্বামী হিসাবে ভাবতে পারি না।

কমলা অনেক বড়ো হয়ে গিয়েছে না হলে অমন কথা সে বলে কিভাবে? তার লঘু-গুরু জ্ঞান নেই। সে প্রায় উন্মাদ।

সুফল ওঝা হতবাক দৃষ্টি মেলে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল অপলক। কমলা জ্ঞান দেবার ঢঙে বলেছিল, তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাকতে পার বাবা। আমার জন্য ভেবো না, আমি পালাবার মেয়ে নই। যদি পালাবার ইচ্ছে থাকত তাহলে একবছর আগেই পালিয়ে যেতাম।

—কমলা তুই চুপ কর। চমকে উঠেছিল সুফল ওঝা, যত বড়ো মুখ নয়, তত বড়ো কথা তুই বলিস কি করে?

ঝাঁপান গানের সুর যতবার শোনা যায় ততবার যেন পুরনো হয় না। ভিড়টা জমে উঠেছে সাপখেলাকে উদ্দেশ্য করে। ভিকনাথ রঘুনাথকে দেখতে পেয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, শোন রঘু, তুর সাথে কথা আচে। রঘুনাথ পাকুড়গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল, কী কথা?

চারপাশে সতর্ক চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভিকনাথ বলল, সামনে তুর বেপদ নাচচে। সাবধানে থাকবি। কমলার সঙ্গে দেখা-শোনা কম করবি।

—কেনে কি হয়েচে?

—সে অনেক কথা, পরে বলব। ভিকনাথ চোরের মতো ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

প্রীতি ম্যাচে এবার মানিকডিহি খেলতে যাবে দেবগ্রামে। সূর্যাক্ষ সন্ধেবেলায় এসে হড়বড়িয়ে বলে গেল, রঘু, তোকে ব্যাকে খেলতে হবে, তৈরি থাকিস। রঘুনাথ চোখ কপালে তুলে বলল, আমার দ্বারা খেলাফেলা হবে নি বলে দিলাম। তুই অন্য কাউকে দেখ সূর্য। বাবা ঘরে নাই। আমার কাল থেকে মাঠে আখ কাটতে যাবার কথা।

চুনারাম এই বয়সেও মাঠে যায় জনখাটতে। সে না খাটলে সংসার অচল। দুর্গা মাঠে জনখাটতে যাবে বলে অস্থির। চুনরাম তাকে যেতে দেয় না। গলায় জোর খাটিয়ে বলে, তুমি ঘরের বউ, ঘরে থাকবা। আরে আমরা কি মরে গেচি, এ্যাঁ?

রঘুনাথ ঠিক করেছে সেও মুনিষখাটতে মাঠে যাবে। ভিকনাথ তাকে সাথে করে নিয়ে যাবে। ধার করে আখঝোড়ার হেঁসো কিনেছে সে। জনখেটে শোধ দেবে হেঁসোর পয়সা।

রঘুনাথের এই সিদ্ধান্তে চুনারাম খুশি হলেও খুশি হয়নি দুর্গামণি। এই বয়স থেকে ছেলেটা খাটতে যাবে—এটা মন থেকে কিছুতেই মানতে পারছে না সে। গুয়ারাম ঘরে থাকলে রঘুনাথ ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলে খেত, এমনকী চুনারামকেও এই বয়সে জনখাটতে মাঠে পাঠাত না সে।

সূর্যাক্ষ হতাশ হয়ে বলল, তুই যে খাটতে যাবি শেষ পর্যন্ত পারবি তো? তোকে দেখে তো মনে হয় ফুলবাবু।

সূর্যাক্ষ রঘুনাথের হাত চেপে ধরে বলল, তোকে যে করেই হোক কালকের দিনটা উদ্ধার করে দিতেই হবে। তুই না গেলে আমাদের গ্রাম গো-হারা হেরে যাবে। তুই কি চাস আমরা হেরে যাই?

রঘুনাথ ইতস্তত করে বলল, ঠিক আছে আমি যাবো। কখুন যেতে হবে বল? তবে এটাই শেষ। গরিব মানুষের পেটের খেলাটাই আসল খেলা, আর সব খেলা ছেলেখেলা।

ম্রিয়মান হেসে সূর্যাক্ষ বলল, তোর কথাই মেনে নিলাম। এবারটা চ। আর তোকে যাওয়ার জন্য বলব না। কাল বারোটার বাসে আমরা যাব। তুই বারোটার সময় বাঁধের উপর থাকিস। আমি তোকে সাইকেলে করে স্ট্যান্ড অবধি নিয়ে যাব। ফুটবল খেলার শখ ছোট থেকেই রঘুনাথের। গুয়ারাম মেলা থেকে তাকে একটা লাল রঙের রবারের বল কিনে দিয়েছিল। বলটা

এত ছোট যে পা দিয়ে মারতে গেলে লাগত। এর চেয়ে বাতাবীলেবু পেটানো ঢের ভালো। পাকুড়তলায় মাঝেমধ্যে বাতাবীলেবু ম্যাচ হত। কাঁচা বাতাবীলেবু হাওয়ায় পড়ে গেলে গোরু-ছাগলেও খায় না। সেই বাতাবীলেবু নিয়ে বাঁধের উপর পেটা-পেটি খেলা। এই খেলা কি বল খেলার কোনো নিয়ম মানে? তবু রঘুনাথের মজা লাগত খেলতে।

মানিকডিহির মাঠে প্রথম সে ম্যাচ খেলতে নামে। সেদিনও সূর্যাক্ষ তাকে জোর করে নামায়। পরে রঘুনাথ ভেবেছে-কাজটা তার উচিত হয়নি। গায়ে শুধু জোর থাকলে খেলা হয় না। খেলার কায়দা-কানুন জানা দরকার। গোঁয়াড় গোবিন্দরা বরবাদ করে দেয় খেলার মাধুর্য। রঘুনাথ এবার মাঠে নামলে নিজেকে সামলে নিয়ে নামবে যাতে লোক না হাসে।

সারারাত উত্তেজনায় ঘুমাতে পারল না রঘুনাথ, চোখ বুজলেই খেলার শব্দ, ফুটবলের ধুপধাপ আওয়াজ, দর্শকদের চিৎকার চেঁচামেচি তার কানে উড়ে এল। তার উশখুসানি দেখে দুর্গামণি বিচলিত হয়ে বলল, রাত বাড়চে, ইবার শুয়ে পড় বাপ। কাল আবার তুকে মুনিষ খাটতে যেতে হবে।

মুনিষ খাটতে যাওয়া নয় তো যুদ্ধ করতে যাওয়া। ছেলের জন্য ভিজে ভাত, পেঁয়াজ আর আলুচচ্চড়ি রেখে দিয়েছে দুর্গামণি। ভরপেট ছেলেকে না খাইয়ে পাঠালে ভিমরি লেগে পড়ে যেতে পারে। মেহনতের কাজে খাদ্য-খাবারই আসল কথা। এই শিক্ষাটা দুর্গামণি তার বাপ-মার কাছ থেকে পেয়েছে। এখন বদলে যাচ্ছে সময় তবু খিদের স্বভাব পাল্টায়নি। এই পেট হল মহাশত্রু। একে সামলে রাখতে পারলে দুনিয়ার সব কাজ মোটামুটি চলে যায়।

পাশ ফিরে শুয়ে রঘুনাথ অন্ধকারে মায়ের দিকে তাকাল, কাল আমি খাটতে যেতে পারবো নি মা। কাল আমার বল খেলা আচে দেবগ্রাম। সূর্য আমায় সেখানে নিয়ে যাবে।

—সূর্য হল গিয়ে বড়ো লোকের ব্যাটা। তার সাথে কি তুর পাল্লা দেওয়া উচিত হবে? দুর্গামণির কণ্ঠস্বরে ভয় আর বিস্ময় ঘোঁট পাকিয়ে গেল।

রঘুনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল। সূর্য আমার বন্ধু। ওর কথা রাখব নি তো কার কথা রাখব?

—কতা রাখতে গিয়ে তিনটে মানুষের পেটের কতা ভুলে যাবি তা হয় না। দুর্গামণি অন্ধকার চিরে তীক্ষ্ম চোখে তাকাল, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। বল খেলে কি হবে? বল কি তুকে ভাত দিবে?

দুর্গামণির কথাগুলো মন থেকে মেনে নিতে পারল না রঘুনাথ, অথচ মায়ের মুখের উপর তার প্রতিবাদ করা সাজে না। তাই সে গলার স্বর মোলায়েম করে বলল, একদিন কাজে না গেলে যদি হাঁড়ি ঠনঠনায় তাহলে অমন সনসারে হাঁড়ি আঁখায় চড়িয়ে লাভ কি?

—গরিবের কিসে লাভ কিসে ক্ষতি তা যদি বুঝতে পারতাম বাপ? বড়ো জটিল হিসাব। এত বছর ধরে হাঁড়ি ঠেলে মাথা সব গুলিয়ে যায়। দুর্গামণির বুক ছুঁয়ে আক্ষেপের নিঃশ্বাস গড়িয়ে পড়ল।

অভাব ধাওড়াপাড়ায় কার নেই? তবু চরম অভাবের মধ্যে মানুষগুলো শ্বাস নেয়, বুড়িগাঙের জলে ডুব দিয়ে ভাতের প্রতীক্ষায় পাড়ে উঠে আসে। ওদের কাছে যে দিনটা যায় সেদিনটা ভালো। যে দিনটা আসছে, সেইদিনটা চিন্তার।

অনেক রাতে ঘুমালেও ঠিক ভোর ভোর ঘুম ভেঙে গেল রঘুনাথের। কুসুমআলোয় শরীরের স্ফূর্তি ভাবটা শিশির চুবানো ঘাসের চেয়েও চনমনে হয়ে ওঠে। এ সময় কমলার কথা রোজ মনে পড়ে তার। অনেকদিন কমলার সঙ্গে দেখা হয়নি তার। সুফল ওঝা জোর করে মেয়েটাকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। কমলার একদম যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কাশীনাথ তাকে জোর

করে দিয়ে এল মামার ঘরে। দূরত্ব অনেক সময় মনের দুরত্বও বাড়িয়ে দেয়। সম্পর্কের সূক্ষ্ম সুতো ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে দেয়। কমলাকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে সুফল ওঝা বেশ সুখেই আছে। কলাবতীও চিন্তামুক্ত। কাশীনাথ বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ইদানীং নিচু ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের সে দায়িত্ব নিয়ে পড়াচ্ছে। মাস গেলে যা পাবে তাতে ওর হাত খরচ চলে যাবে। তা ছাড়া মাস্টার ডাকটা শুনতে তার মন্দ লাগে না। এই সম্মান টিউশনির অর্থমূল্যের চাইতেও বেশি মূল্যবান।

বেলা বারোটায় বাস ছেড়ে গেল মিষ্টির দোকানের সামনে থেকে। অন্যদিনের তুলনায় আজ বাসে ঠাসা ভিড়। গাঁয়ের ছেলেরা দেবগ্রামে খেলতে যাচ্ছে এটা কি কম গর্বের কথা।

পাশাপাশি সিট পেয়েছে সূর্য আর রঘুনাথ। বাইরের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে ওরা। কামারী পেরিয়ে যেতেই সূর্যাক্ষ বলল, আজ তোর মনে আনন্দ নেই। কেন কি হয়েছে রে?

—না কিছু হয়নি তো! রঘুনাথ এড়িয়ে যেতে চাইলে সূর্যাক্ষ তার চোখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, কী ভাবছিস তুই?

রঘুনাথ বলল, আসার সময় কাকার সাথে দেখা হল। কত রোগা হয়ে গিয়েচে। আসলে কাকি চলে যাওয়ার পর কাকার মনের অবস্থা ঠিক নেই। সারাদিন খালি মানসিক করে বেড়াচ্চে। ঠাকুরদেবতার থানে মাথা ঠুকচে।

—তোর কাকিকে নিশ্চয় তোর কাকা ভীষণ ভালোবাসত।

রঘুনাথ ঘাড় নাড়াতেই সূর্যাক্ষ বলল, আমার মন বলছে সে যদি বেঁচে থাকে নিশ্চয়ই একদিন ফিরে আসবে।

—আমারও মন তাই বলচে।

এ সময় ঢ্যাঁড়শ গাছে ফুল আসে। ফুলগুলো ঘিয়ে রঙের ভেলভেটের মতো, ভেতরে লাল রঙের ছিটে দেওয়া। বর্ষার জল পেয়ে বাঘহাতা ঘাসগুলো কিশোরী মেয়ের শরীরের বাড়কেও হারিয়ে দিচ্ছে।

দেবগ্রাম আসতেই বাসটা ব্রেক কষে ঝাঁকুনি দিয়ে থামল। জনা কুড়ি লোক নেমে এল বাস থেকে। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল গলা চড়িয়ে। ওদের আলোচনার মধ্যে উঠে আসছিল ফুটবল। মোটা মতোন হোমড়া-চোমড়া একজন গলা উঁচিয়ে বললেন, যদি তোমরা আজ জিততে পারো তাহলে আমি খুশি হয়ে তোমাদের একটা খাসী এনে দেব। যদি না জিততে পারো তাহলে ফেরার পথে শুধু চা-সিঙ্গাড়া।

দেবগ্রামের বলখেলার মাঠ স্টেশন থেকে বেশি দূরের পথ নয়। এখান থেকে রেল গাড়ির ঝমঝম শব্দ শোনা যায়। হুইশেল ভেসে আসে বাতাস বিদীর্ণ করে। বলখেলার মাঠটা সবুজ ঘাসে গা মুড়িয়ে অলস শরীরে শুয়ে আছে। একটু পরে তার ঘুম ভাঙিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু হবে। বাঁশি বেজে উঠবে রেফারির। বল ব্যাক-ভলি করে গোলে ঢুকিয়ে দেবে সেন্টার-ফরোয়ার্ড। তখন ব্যাকে যে খেলে তার কিছু করার থাকবে না।

গোলকিপার আর ব্যাকের দায়িত্ব যে প্রচুর এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে রঘুনাথ মানিকডিহির মাঠে। সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার কথা বিস্মৃত হয়নি সে। অবশ্য এর কৃতিত্ব সূর্যাক্ষর। ও পাশে না থাকলে ম্যাচটা মনে হয় হাতছাড়া হয়ে যেত।

আজ ড্রেস পরে মাঠে নামতে গিয়ে একবার মায়ের মুখটা মনে পড়ে গেল রঘুনাথের। এসময় আখের আলসে ছাড়িয়ে মাঠ থেকে তার ফেরার কথা। ঘর ফিরতে রোদ ঝিমিয়ে যাবে। তারপর এক সময় কালচে হয়ে যাবে বুড়িগাঙের ঘোলাজল। বুড়িগাঙে ডুব দিয়ে এলে ভাত বেড়ে দেবে

মা। সঙ্গে শাক ভাজা আর পাতলা ডাল। কোনো কোনো দিন শুধু শাক ভাজা, ডাল জোটে না, কোনোদিন আবার শুধু ডাল, শাক সেঁতলাবার মতো তেলও জোটে না।

বড়ো আশ্চর্য এই জীবন।

গোলের দিকে ধেয়ে আসা বলটাতে রঘুনাথ রাগের মাথায় লাথি ছুঁড়ে দিল। বল গিয়ে পড়ল ঠিক অন্য গোল পোস্টের পেনাল্টি এলাকার মাঝখানে। বাঘের মতো ওৎ পেতে ছিল সূর্যাক্ষ। বলটা বুক দিয়ে নামিয়ে পায়ে খেলাতে খেলাতে সজোরে কিক মারল গোলের দিকে। হেড দিয়ে বলটাকে মাঠের বাইরে বের করে দিতে চেয়েছিল ব্যাকি, কিন্তু তা হল না, বল কোণ ঘেঁষে রকেট গতিতে ঢুকে গেল গোলের ভেতর। জালে জড়িয়ে গেল বল। মানিকডিহি এগিয়ে গেল এক শূন্য গোলে।

যারা খেলা দেখছিল তাদের চক্ষু চড়কগাছ। এ-ও কি সম্ভব? একজন মানুষের পায়ে কত শক্তি থাকতে পারে? এ ছেলে খেলার মধ্যে থাকলে নাম করবে। একে আটকাবে সাধ্য কার?

খেলা শেষ হতেই সূর্যাক্ষ এসে রঘুনাথকে জড়িয়ে ধরল। সেই নাদুসনুদুস ভুঁড়িওয়ালা লোকটা এসে বললেন, সাবাস্, এর আগে আমি তোমার খেলা দেখিনি। আজ তোমার খেলা দেখে মন ভরে গেল!

ক্লাবের মেম্বার তারক তাকে উসকে দিয়ে বলল, এ ছেলের পা নয় তো একেবারে ইস্পাত দিয়ে গড়া। মানুষের পা হলে এত জোরে শট মারা সম্ভব নয়।

এসব কথা রঘুনাথের কানে ঢুকছিল না কিছুই। সে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কী এমন করেছে সে যার জন্য তাকে এত বাহাদুরী নিতে হবে। আখের আলসে ছাড়াতে না গিয়ে সে বল খেলতে এসেছে। এর বেশি সে আর কিছু ভাবতে চায় না।

দেড় ঘণ্টা সময় মাঠের মধ্যে কী ভাবে কেটে গেল কিছুই টের পায় নি সে। মোটা লোকটা এগিয়ে এসে বললেন, আমাদের গাঁয়ে এমন ছেলে আছে আগে আমি জানতাম না। তোমার কি চাই বলো?

রঘুনাথ ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। তার হয়ে কথা বলল সূর্যাক্ষ, পচাদা, ও বড়ো লাজুক ছেলে, মুখ ফুটে কিছু চাইবে না। ম্যাচ খেলতে আসবে বলে ওর আজ মুনিষ খাটতে যাওয়া হয়নি। তুমি যদি ওর একদিনের 'রোজ' দিয়ে দাও তাহলে ভীষণ ভালো হয়।

—সে কথা আর বলতে। এই নাও, ধরো একশ টাকা। পচার থলথলে গাল খুশিতে নড়ে উঠল. টাকা দিয়ে এ খেলার কোনো বিচার হবে না। তবে তুমি যদি বলো আমি কেসনগর স্টেডিয়ামে কথা বলব। ওখানে আমার জানাশোনা আছে। আজ যা দেখালে তার সিকিভাগ যদি খেলতে পারো তাহলে স্টেডিয়ামের মাঠ তোমার দখলে চলে আসবে।

কিছু না বুঝে রঘুনাথ সূর্যাক্ষের দিকে সাহায্যের জন্য তাকাল। সূর্যাক্ষ বলল, রঘু গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না। ঘরে ওর মা একা আছে। ওর বাবা মুনিষ খাটতে গিয়েছে রাঢ় দেশে। দাদুটা বুড়ো।

সামান্য হলেও আবেগে ঘা খেলেন নাদুসনুদুস চেহারার লোকটা। কিছুটা মনোক্ষুণ্ণ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সূর্যাক্ষ বলল, রাগ করো না পচাদা, যা সত্যি আমি তাই বললাম। আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা সুযোগ পায় না। ওরা যদি সুযোগ পেত তাহলে দুনিয়াকে দেখিয়ে ছেড়ে দিত।

—তা ঠিক। তবে আমাদেরও দোষ আছে। পচার আবেগী কণ্ঠস্বর বাস্তবের মাটিতে ফিরে এল।

রঘুনাথের অনেকক্ষণ থেকে জল তেষ্টা পেয়েছে। সে দূরের টিউবওয়েলটার দিকে চাতক চোখে তাকাতেই সূর্যাক্ষ বলল, চল, আমিও তোর সাথে যাই। আমারও তেষ্টা পেয়েছে খু-ব।

জল খেয়ে ওরা যখন ফিরে আসছিল তখনই কু-ঝিক ঝিক রেলগাড়ির শব্দ শুনতে পেল। শব্দ যে গান হয়, সেই প্রথম রঘুনাথ বুঝল।

সূর্যাক্ষ বলল, তুই বুঝি এর আগে কোনোদিন ট্রেন দেখিসনি? রঘুনাথ ঘাড় নাড়তেই সূর্যাক্ষ আফসোস করে বলল, আজ আর সময় হবে না, না হলে আজই তোকে ট্রেন দেখিয়ে নিয়ে যেতাম। ছ'টার বাসটা যে করেই হোক ধরতে হবে। শুনেছি-আজ নাকি সাতটার বাস নেই। দেবগ্রাম আসলে ফেরার এই এক ঝামেলা।

অনেকক্ষণ পরে সূর্যাক্ষর কথা বলার ধরন দেখে রঘুনাথের ঠোঁট পিছলে বেরিয়ে এল হাসি, সশব্দে নয়, সে নীরবে হাসল শরীরে কাঁপন তুলে। ভালোলাগার রেশগুলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল তার সত্তায়। সেই রেশগুলো ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল কোষে কোষে।

ক্লাব সেক্রেটারী মদনদা মানিকডিহি জেতাতে ভীষণ খুশি। আবেগী স্বরে সে বলল, আমাদের এই দলটা সর্বকালের সেরা দল। আমার মন বলছে কেসনগর যদি আমাদের সঙ্গে খেলে তাহলে ওদেরও আমরা হারিয়ে দেব।

পচা বললেন, শুধু মুখে বললে হবে না, করে দেখাতে হবে।

তর্ক করতে করতে ওরা রাস্তার এক পাশ ধরে হাঁটছিল। এ সময় দেবগ্রামের পাকা রাস্তায় লোকজন ছড়ানো-ছিটানো ভাবে দেখা যায়। দত্ত মেডিকেলের কাছে আসতেই দুলুর সঙ্গে চোখাচোখি হল রঘুনাথের।

দুলুর বুকে যেন পাথর চাপা ছিল এতক্ষণ। সেই ভার পাথর সরিয়ে যেন হাঁফ চেড়ে বাঁচল দুলু। কপালের ঘাম তর্জনীতে চেঁচে নিয়ে সে বলল, তোর সাথে দেখা হয়ে ভালোই হলো। যদি না দেখা হত তাহলে আজ নির্ঘাত আমাকে ধাওড়া পাড়ায় যেতে হোত।

দুলুব পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মানোয়ারার বর সাদাত। ওর মুখে কোনো কথা নেই, ও শুধু শুনছিল। দুলু খপ করে রঘুনাথের হাত ধরে বলল, এট্টু আড়ালে চল, তোর সাথে দুটা গোপন কথা আছে।

সাদাত দুলুর ব্যবহারে কেমন ব্যথিত চোখে তাকাল। এ কেমন ভদ্রতা? এমনকী যা মুখ চেনা মানুষের কাছে বলা যায় না। আসলে দুলু সেই কাশিমবাজার থেকে এড়িয়ে চলছে সাদাতকে। সাদাতই তার মানোয়ারাকে ছিনিয়ে নিয়েছে টাকার জোরে। তাছাড়া মানোয়ারার মনে তার উপর কোনো ভালোবাসা ছিল না। মানোয়ারা পালবুড়ার আটা চাকিতে আসত শুধু টাকার জন্য। দুলু টাকা না দিলে তাদের হাঁড়ি চড়ত না।

গোলপোস্টের পেছনে হাত ধরে হুড়হুড় করে টেনে নিয়ে গেল দুলু। ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে চাপা গলায় সে বলল, শোন তোর কাকিকে দেখলাম পলাশী স্টেশনের বেঞ্চির নীচে শুয়ে থাকতে। চেহারা পুরো ধসে গিয়েচে। প্রথমে দেখে চিনতে পারিনি। পরে চিনতে পেরে তার কাছে যেতেই সে আমাকে দেখে প্রাণ বাঁচানোর দৌড় লাগাল। আমি তাকে হয়ত ধরতে পারতাম কিন্তু গাড়ি ছেড়ে দেবে বলে আমি আর ঝুঁকি নিইনি।

রঘুনাথের যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না দুলুর কথাগুলো। ঢিলির সঙ্গে যদি তার দেখা হয়ে থাকে তাহলে সে কেন ছেড়ে এল হাবা-গোবা, পাগল-ছিটেল মেয়েমানুষটাকে। বড়ো অবিবেচকের কাজ করেছে দুলু।

কথাগুলো শোনার পরে মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল রঘুনাথের। সে যে কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। বারবার তার কাকার কথা মনে পড়ছিল। লুলারাম দুলুর হাত ধরে কতবার

বলেছে, তোরে আমি খুশ করে দিব যদি তুই তোর বৌদির খবর এনে দিস। আমি তো গাঁ ছেড়ে বেরুতে পারিনে, কত যে কাজের ঝামেলা!

ভাবতে গিয়ে রঘুর মাথার ভেতরটা ডানা ভাঙা পাখির মতো কাতরে উঠল, উঃ, কী শুনলাম গো! এসব শোনা তো আমার পাপ..।

—পাপ নয় রে, এসব হল গিয়ে কর্মফল। চল রঘু পলাশী থেকে ঘুরে আসি।

রঘুনাথ আবেগে ভাসল না, আমার কাচে নগদ কুনো পয়সা নেই। পলাশী যেতে গেলে হেঁটে যেতে হবে আমাকে।

দুলু অর্থপূর্ণ চোখে সাদাতের দিকে তাকাল, সাদাত ভাই, তোমার কাছে কিছু টাকা থাকলে উধার দাও। কাল সকালে ঘুরোন দিয়ে দিব।

সাদাত বলল, কালই যে ঘুরোন দিতে হবে এমন নয়। তুমি সুবিধা মতো দিও। আমি আমার বিবির মুখে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি।

সাদাতের বাঁশ-চাটাইয়ের ব্যবসা সারা দুর্গাপুর-আসানসোল জুড়ে। যেখানে খনি, সেখানকার ধস ঠেকাতে দরকার হয় চাটাইয়ের। বিনা চাটাইয়ে ধস নামে মাটির। খনির বাঁধ দেওয়া জল হুসহুসিয়ে ঢুকে আসে অন্য খনিতে। তখন সমূহ বিপদ। এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে শুধু চাই চাটাই। মোকামপাড়ায় কারিগর আছে চাটাই তৈরি করার। সেই চাটাই বান্ডিল বেঁধে লোড করা হয় লরিতে। চাটাই ভর্তি লরি রওনা দেয় আসানসোল-দুর্গাপুরের দিকে। আগে ফোনে কথা বলে নেয় মহাজনরা। চাটাই পৌঁছে দিলে নগদ টাকা। তখন খালি লরি নিয়ে ফিরে আসতে হয় সাদাতকে। সাদাত খনি অঞ্চল থেকে কয়লা অথবা কয়লার গুঁড়ো নিয়ে আসে ট্রাকে ভরে। তাতে যা লাভ হয় লরির ভাড়া পুষিয়ে গিয়েও লাভের মুখ দেখা যায়। মোকামপাড়ায় বসে সাদাতের এই ব্যবসা অনেকেরই মাথার মধ্যে ঢোকে না তবে যতদিন যাচ্ছে ততই ফুলে-ফেঁপে উঠছে সে। মোকামপাড়ায় একমাত্র সাদাতেরই পাকা দালান। সারা মোকামপাড়া ঘুরে এলে একমাত্র ওরই আছে একশ দশ সি.সি-র মোটর সাইকেল।

মানোয়ারাকে সাদাত পয়সার টোপ দিয়ে পণ্ডিত বিলের মাছের মতো ডাঙায় তুলেছে খেলিয়ে। মানোয়ারা এখন তার পোষা বেড়াল, সারাদিন মিউমিউ করে আদরের কথা বলে। স্বামী গরবে ইদানীং তার পা পড়ছে না। এমনকী নিজের জন্মদাতা আব্বাজানকেও মানোয়ারা খুব বেশি পাত্তা দেয় না। চাঁদ মহম্মদ মেয়ের এই পরিবর্তন নিজের চোখে দেখছে, কষ্টে বুক ভেঙে গেলেও তার কিছু করার নেই। আসলে রক্তের দোষ যাবে কোথায়? নুরি বেগম ডানা কাটা পরীর মতো দেখতে ছিল, সে-ও তো কাঁচা বয়সে ভুল করে অন্যের হাত ধরে ঘর ছেড়ে পালাল। এখন নুরি বেগমের তেজ কমেছে, রূপ চটা ওঠা ফুটোফাটা মাটির মতো, এখন বহু কষ্টে দিন কাটছে তার। তার দুর্দশার ফিরিস্তি মাঝেমধ্যেই কানে আসে চাঁদ মহম্মদের। তখন বউটার জন্য এই বয়সে মনটা মাখা ময়দার চেয়েও নরম হয়ে যায়। মনে হয় বহরমপুর থেকে ফিরিয়ে আনবে নুরি বেগমকে। কোরানে ক্ষমার কথা বলেছে বারবার। চাঁদ মহম্মদ ধর্ম ছুঁয়ে শ্বাস নিচ্ছে এখনও। নুরি বেগমের বিচ্ছেদ এখনও তার মনে গোস্তকাটা ধার চাকু ঢুকিয়ে দেয়। তখন ছটফট করে পুরো বদন। সেই পুরনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে। মসজিদের নামাজ সেরে ফিরছে চাঁদ মহম্মদ। মনোয়ারা আব্দার ধরেছে সিমাই খাবে। দুধ-সিমাইয়ের পায়েস মেয়েটার ভীষণ প্রিয়। রফিকের দোকান খুলিয়ে সিমাই আর গুঁড়া দুধের ঠোঙা নিয়ে ঘর ফিরছে চাঁদ মহম্মদ। তিন-সাড়ে তিন বছরের মেয়েটাকে দুধের বোঁটা ধরিয়ে দিয়ে এককেতে হয়ে শুয়ে আছে কাঁথাকানির ভেতর নুরি বেগম। যেন সে কোন নারী নয়, আসমানের হুরী, যেন সে কোনো হুরী-পরী নয়, খুশির

বাতাসে নুয়ে যাওয়া ফুলের গাছ, মাতৃত্বের সুগন্ধে ম-ম করছে ঘর। চাঁদ মহম্মদ সেই সুখের বাতাসকে বুক ভরে নিয়ে সারাদিনের রসদ খুঁজে নিচ্ছে নিজের জন্য।

সেই চোখের মণি মানোয়ারা এখন স্বামীর সুখের ঘর পেয়ে ভুলতে বসেছে বাপকে। চাঁদ মহম্মদের দুঃখ হলেও বুক চেপে থাকে সে। নিজের ঘর ছাড়া সে এখন ভুল করেও সাদাতের ঘরের দিকে তাকায় না। মানোয়ারাও পথে-ঘাটে বাপকে দেখলে মুখ নিচু করে চলে যায়, যেন সে চাঁদ মহম্মদকে চেনে না, চাঁদ মহম্মদ তার আব্বা নয়, তার কোনো আম্মাজান নেই বাপজান নেই, সে যেন আকাশ থেকে ঠিকরে পড়া তারা।

চাঁদ মহম্মদ এসব লক্ষ্য করে হায় আল্লা রসুলতাল্লা বলে দীর্ঘশ্বাস উগলে দেয় বাতাসে।'

তুর ভালো হোক বিটি, তুর ভালো হোক। চাঁদ মহম্মদের ঠোঁট এমনকী চোখের তারা কেঁপে ওঠে ঝনঝনানো কাঁসার থালার মতো। ঝাপসা চোখে সে সুখের পৃথিবীটাকে দেখে জটিল কুয়াশায় ঢাকা।

সাদাত পলাশী গেল না, সে কালীগঞ্জের বাস ধরে গাঁয়ে ফিরে গেল। কথা হল সে ধাওড়াপাড়ায় গিয়ে লুলারামকে খবর দেবে। লুলারাম যেন গোরুরগাড়ি নিয়ে হাজির থাকে কালীগঞ্জে। কালীগঞ্জ থেকে শেরপুর ধাওড়া কম পথ নয়। অতটা হাঁটা পথ ঢিলিকে নিয়ে ফেরা মুখের কথা হবে না। তাছাড়া ঢিলির শরীরের অবস্থার কথা কারোরই সঠিকভাবে জানা নেই। এখন তার হাঁটাচলার ক্ষমতা আছে কিনা সেটাও দুলু স্পষ্টভাবে বলতে পারল না। একটা মানুষ প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালাল মানে সে যে পুরোপুরি সুস্থ এমন নয়।

পলাশী নামতেই অন্ধকার ছেয়ে এল চারদিকে। দুলু উশখুশিয়ে বলল, চল, এখন আমরা চা খেয়ে স্টেশনপানে চলে যাই। এখন কুনো ট্রেন নেই। ট্রেন আসবে সেই দশটার সময়।

ফাঁকা প্লাটফর্মে দু-একটা নেড়িকুকুর এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। টিমটিম করে জ্বলছিল স্টেশনের বাতিগুলো। দু'চারজন লোক ছাড়া পুরো প্লাটফর্ম এখন ফাঁকা ফুটবল খেলার মাঠ। গাছতলায় অন্ধকার শুয়ে আছে কল্পনার ডাইনিবুড়ির মতো। মাথার উপর খেলে বেড়াচ্ছে ফর্সা মেঘ। হাওয়ায় মিশে আছে মৃদু মৃদু শীতের কামড়।

দুলু, সূর্য আর রঘুনাথ হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছিল স্টেশনের শেষপ্রান্তে। আর একটু হাঁটলেই শুরু হবে ধানমাঠ। আশে-পাশের ঘর গেরস্থালির আলোগুলো অন্ধকারের সঙ্গে যুঝছে।

কাউকে দেখতে না পেয়ে রঘুনাথ মন বেজার করে বলল, মনে হচ্ছে কাকি ভয়ে কুথাও চলে গিয়েচে। ও মনে হয় আর ঘর ফিরবেনি। যদি ঘরে ফেরার ইচ্ছে হত তাহলে কি অমনধারা পেলিয়ে-পেলিয়ে বেড়াত?

দুলু নিরাশ গলায় বলল, ওই শেডের নীচে তাকে দেখেছিলাম। আমাকে দেখে চিনতে পেরে দে দৌড়..। যেন আমি খুব রাগী দারোগা। ওকে ধরে নিয়ে যেতে এসেচি।

সূর্য বিচক্ষণের মতো বলল, নারে এসব কথা সঠিক নাও হতে পারে। আমার মনে হয় কাকিমা ভীষণ অসুস্থ। কোথাও ঠিক মাথা গুঁজে পড়ে আছে। আড়ালে থাকলে লোকে কম জ্বালাতন করবে সেইজন্য।

—আমি এতদিন ধরে লালগোলা টেরেনে যাতায়াত করচি, কোনোদিন ওর সাথে দেখা হয়নি। আজ জানলা দিয়ে ছেপ ফেলতে গিয়ে দেখি চেনা মানুষ! দুলু শ্বাস নিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল, জানিস রঘু, তখন তোর কাকার মুখটা মনে পড়ে গেল। মানুষটা দেখা হলেই আমাকে বলত—দেখিস তো দুলু, তোর বৌদির সাথে যদি দেখা হয় তারে সাথে করে ধরে আনিস। সব খরচাপাতি আমি তুরে দিয়ে দেব।

সূর্যর কথাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল।

চা-দোকানের পেছনে চট মুড়িয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়েছিল ঢিলি। রঘুনাথই তাকে প্রথম দেখে।

দুলুকে বলতেই সে হেসে উঠল, দুর তোর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে। যা দেখছিলাম সেটা তো মালের বস্তা।

—না গো, দেখো কেমুন এট্টু-এট্টু নড়চে!

—তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েচে। বস্তাকে ভাবছিস তোর কাকিমা! ঠিক আচে চল কাছে গিয়ে দেখি। সন্দেহ মেটাতে দুলুই লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল সামনে। বস্তা ভেবে ঠেলা মারতেই কঁকিয়ে উঠেছিল ঢিলি, ছোঁবে না গো, ছোঁবে না! আমার গায়ে কুঠ ফুটেচে। যে ছোঁবে তারও কুষ্ঠ হবে।

ঢিলির কণ্ঠস্বর চিনে নিতে কোনো অসুবিধা হয়নি রঘুনাথের। তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে কালীগঞ্জ পর্যন্ত ফিরিয়ে আনতেই যা ঝামেলা।

ধাওড়াপাড়ার লোকজন নিয়ে বাস স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিল লুলারাম। সে গোরুর গাড়ি জোগাড় করতে পারেনি তাড়াহুড়োতে, সেইজন্য চারপায়া এনেছে ঢিলিকে নিয়ে যাবে বলে। দড়ির খাটিয়ায় ঢিলি যাতে না পড়ে যায় সেইজন্য গোরু বাঁধার দড়ি এনেছে সঙ্গে। বেশি ছটফট করলে তাকে বেঁধে দেবে চৌ-পায়ায়। পাগলদের কোনো বিশ্বাস নেই। যেন কূলে এসে নৌকো না ডুবে যায় সেইজন্য এই বাড়তি সতর্কতা।

কালীগঞ্জে পৌঁছে চোখ রগড়ে নিয়ে ঢিলি সশব্দে ভেঙে পড়ল কান্নায়। লুলারাম এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরতেই ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল সেই হাত। ধিক্কার জানিয়ে বলল, খবরদার তুমি আমাকে ছোঁবে না। যদি ছুঁতে হয় আমাকে নয়, ভিকনাথের বউকে গিয়ে ছোঁও। তুমার ধ্যাসটোমো আমি সব ধরে ফেলেচি। তুমি আর আমার চোকে ধুলো ছিটোতে পারবে না।

ঢিলি হাত ছাড়িয়ে দিলেও তার শরীরের উত্তাপে ছ্যাঁকা খেল লুলারাম। ঢিলি জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে। ওকে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

লুলারাম ভয় পেয়ে রঘুনাথকে বলল, তুর কাকির গা জ্বরে পুড়ে যাচ্চে। ওরে ধর। নইলে মাথা ঘুরে পড়ে গেলে বিপদ হবে।

লুলারামের ভীতু চোখের দিকে তাকিয়ে রঘুনাথ ঢিলির দিকে এগিয়ে গেল। ঢিলি গর্জন করে উঠল, খবরদার আমাকে ছুঁবিনে। যদি ছোঁস তো তুর হাত আমি মুচড়ে ভেঙে দেব।

—কাকি চুপ করো। মাথা গরম করো না।

—চুপ করব? কেনে চুপ করব? আগুন উগলানো চোখে তাকাল ঢিলি, এই পাপীটাকে কে এখানে আসতে বলেচে? আমি তো বেশ ছিলাম। ও এসে আমাকে তাতিয়ে দিল।

—তুমার গায়ে ধুম জ্বর। তুমি চুপ করো কাকি। রঘুনাথের কথায় কি ছিল শান্ত হয়ে গেল ঢিলি, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, আমি বাঁচতে চাইনে রে, আমাকে মরতে দে। এতদিন ঘরের বাইরে ছিলাম—বেশ ছিলাম। শুধু মেয়েদুটার জন্যি আমার কষ্ট হত। ওরা ছাড়া এ দুনিয়ায় আমার আর কেউ নেই।

ঢিলিকে দেখামাত্রই হাসপাতালে ভর্তি করে নিলেন বড়ো ডাক্তার। আউটডোরের বারান্দায় অপেক্ষা করছিল পাড়ার সবাই। রোগী দেখে এসে ডাক্তারবাবু কথা বলবেন। লুলারামের ভেতরে মাকুর মতো সক্রিয় ছিল চাপা উত্তেজনা।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর মুখে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এলেন। হাতের ইশারায় লুলারামকে কাছে

ডেকে নিলেন তিনি, তারপর চাপা গলায় বললেন, রোগী আপনার কে হয়? তবে সুখবর আছে। রোগী মা হতে চলেছে।

মাথায় বাজ পড়লেও মানুষের মুখ এত পুড়ে যায় না, লুলারাম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সিমেন্ট বাঁধানো মেঝেতে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় কুলকুল করে ঘেমে গেল সে। ঢিলি আবার পোয়াতী হয়েছে কথাটা ভাবতে গিয়ে ঝ্যানঝেনিয়ে উঠল তার সারা শরীর। ঘেন্না এসে চার ঠোকরানো মাছের মতো ঠুকরে গেল তার মনের জমি। এ কু-কাজ কে করল, এ তো তার কাজ নয়। বছরের উপর হতে চলল ঢিলির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। পাশে শোওয়া তো দূরের কথা ঢিলি তাকে ছুঁতেও দেয় না কোনোদিন। হাত ধরলে ঢিলি গাল দিয়ে ভূত ভাগায়, যাও না ঝারির কাচে, আমার কাচে মরতে কেনে এয়েচো! আমি তো তুমার কাচে এখুন কাঠের পুতুল!

কে, কে দায়ী এই দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্য? কার পাতা ফাঁদে জড়িয়ে গেল ঢিলি। তবে কি রেল স্টেশন, ফাঁকা বাঁধ নাকি...। আর কিছু ভাবার ক্ষমতা ছিল না লুলারামের। বাঁ হাতে সজোরে কপাল টিপে সে রঘুনাথকে ডাকল।

রঘুনাথ সামনে আসতেই লুলারাম বলল, তোরা গাঁয়ে ফিরে যা, আমি রাতভর এখানেই থাকব।

—থাকবে তো খাবে কুথায়?

রঘুনাথের প্রশ্নে বিরক্ত হলো লুলারাম, এক রাত না খেলে মানুষ মরে না। যা তোরা যা। আমাকে একা থাকতে দে।

মাথায় আকাশ নিয়ে লুলারাম দাঁড়িয়ে থাকল অন্ধকারে।

সাতদিন পরে হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়ে গেল ঢিলির।

এই সাত দিন দুবেলা ভাত নিয়ে হাসপাতালে যেত রঘুনাথ। হাসপাতালের খাবার ঢিলির মুখ দিয়ে নামতে চাইত না। নূপুর ভাত-তরকারি রেঁধে বেঁধে দিত গামছায়। সেই খাবার পৌঁছে দিয়ে বাইরের সিমেন্টের বেঞ্চিটাতে চুপচাপ বসে থাকত রঘুনাথ। লুলারাম প্রথম দিন ছাড়া দ্বিতীয় দিন থেকে হাসপাতালে আর আসত না। মাচা কুমড়োর মতো মুখ ঝুলিয়ে সে কী যেন ভাবত সবসময়। চিন্তার রেখাগুলো গাঢ় হয়ে ফুটে উঠত সারামুখে। মাঝেমধ্যে মুখ দিয়ে হুঁস করে শব্দ তুলে পাগলের মতো বলত, আমার সব্বোনাশ হয়ে গেল! মা শীতলাবুড়ি—একী করলে গো তুমি।

প্রথম রাতে হাসপাতালে থাকার গোপন উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলে অবনী। তার সেদিন নাইট-ডিউটি ছিল। ফিমেল ওয়ার্ডে রোগীর চাপ না থাকায় অতসী দিদিমণি চেয়ারে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চায়নি চতুর লুলারাম। সে আউট ডোরের বারান্দা থেকে পা টিপে টিপে চলে এসেছিল ফিমেল ওয়ার্ডে। আজ রাত হোক ঢিলির জীবনে শেষ রাত। ও যতদিন বাঁচবে ততদিন জ্বালিয়ে মারবে লুলারামকে। বউটাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শেষ

করে দেওয়া যেত কিন্তু তাতে ঝামেলা বাড়ত বই কমত না। গাঁয়ের মানুষের সন্দেহবাতিক মন। ওরা হাজার প্রশ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওদের ঔৎসুক্যের আর শেষ নেই। ঢিলি পরের ছানা পেটে নিয়ে ঘুরছে। পাগল হলেও ওর চেহারার বাঁধুনী ফুরিয়ে যায়নি। একনজর দেখলে চোখ ফেরানো যায় না, কেননা ওর দিঘির মতো চোখ দুটো সব সময় ছলছলানো আর টানাটানা। থলথলে বুকের সৌন্দর্য অনেকটাই দৃশ্যমান কারণে-অকারণে। পেট কুঁচকে গেলেও গভীর নাভি পথচলতি মানুষের মনে কামের ভাবটা বাড়িয়ে দেয়। বারুদবাতি যে কোনো সময় জ্বলে উঠে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। অন্যের পাপের বোঝা লুলারাম কেন বইতে যাবে বরং তার পাপের ভাগীদার হোক সবাই। ঘুমন্ত ঢিলির কণ্ঠনালী সজোরে টিপে ধরতেই ঘুম ভেঙে যায় ঢিলির। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে সজোরে লাথ ছুঁড়ে দেয় লুলারামের অণ্ডকোষে। কাঠব্যাঙের মতো তখনই ঠিকরে পড়ে লুলারাম। তার পতনের শব্দে ঘুম চোখে ছুটে আসে অবনী। অতসী দিদিমণি ভাবেন- রুগি বুঝি ঘুমের ঘোরে পড়ে গিয়েছে খাট থেকে। দৌড়ে এসে তিনি দেখেন অন্য কাণ্ড।

অবনী রক্তচোখে ধমকাচ্ছে লুলারামকে, তোমাকে মেয়েদের ঘরে কে আসতে বলেছে শুনি? জানো, ডাক্তারবাবুর কানে কথাটা গেলে কালই তোমার রুগিকে ডিসচার্জ করে দেবে। একবার নাম কেটে গেলে ফিরে আর ভর্তি হবে না মনে রেখো।

অতসী দিদিমণি রাগে ফুঁসছিলেন, এদের আর বুঝিয়ে পারা যাবে না, যত সব অশিক্ষিতের দল। ছিঃ-ছিঃ কী কাণ্ড দেখো! এত রাতে মেয়েদের ওয়ার্ডে লুকিয়ে চলে এসেছে। যতসব চরিত্রহীন কারবার।

গলায় হাত বোলাতে-বোলাতে ভয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলেছে ঢিলি। তার মুখে কথা নেই, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই শুধু দু'চোখের কোণ ছাপিয়ে জলের ধারা নামছিল অনর্গল। সে জানে—উপর দিকে থুতু ছুঁড়লে নিজের গায়েই পড়বে। সেটা কারোর জন্য মঙ্গল হবে না। ঢিলি স্পষ্ট বুঝে গিয়েছে লুলারাম তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায়। তার ফিরে আসা লুলারাম সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি।

অতসী দিদিমণি এগিয়ে গিয়ে শুয়ে থাকা ঢিলির কপালে হাত রাখল, তুমি কাঁদ কেন, তোমার কি হয়েছে?

—দিদিমণি গো, আমি আর বাঁচতে চাইনে। ঢিলি ঠোঁট মুখ কুঁচকে কেঁদে উঠল।

—এ্যায়, কেঁদো না, কেঁদো না বলছি। অতসী দিদিমণির কপট ধমকে ঢিলি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কান্না আটকাবার চেষ্টা করল প্রাণপণ, কিন্তু পারল না বরং ঝাঁকুনি দেওয়া কান্নায় কাহিল হয়ে সে নেতিয়ে শুয়ে রইল বিছানায়। অবনী লুলারামের হাত ধরে নিয়ে গেল বাইরে, দিলে তো আজ সবার ঘুম চটকে? পারো বটে ভায়া। তোমার সাহস দেখে আমার বুক এখনও কাঁপছে। লুলারাম ধকধকানো চোখে তাকাল, অবনীর কথাগুলো সঠিক বোধগম্য হল না তার। অবনী কি গলা টিপে ধরার দৃশ্যটা দেখেছে? যদি দেখে থাকে তাহলে অতসী দিদিমণির কাছে সে কেন ঘটনাটা ফাঁস করে দিল না। কেন সে বাঁচাল তাকে? লুলারাম গোঁফ চুলকে সংশয়ের চোখে অবনীর দিকে তাকাল।

অবনী অন্ধকার থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি কী ভাবছ, আমি জানি। ভাবছ—আমি খুব বোকা তাই না?

বুক শুকিয়ে গেল লুলারামের, না, না তা নয়।

—বউটাকে মারতে গিয়েছিলে কেন, ওর দোষ কি? অবনীর চোখে ক্রুর হাসি খেলে গেল।

লুলারাম কাঁপতে কাঁপতে বলল, যার গায়ে ছ্যাঁকা লাগে সে বোঝে। তুমাকে কি আমি বলে

বোঝাতে পারব? তুমি যখুন দেখে ফেলেচো, তুমাকে আসল কথাটা বলি। আমার বউয়ের পেটে যে সন্তান এয়েচে—সেটি আমার লয়।

—তার মানে? আঁতকে উঠল অবনী।

অন্ধকারে মেঘ ডাকার শব্দ ভেসে এল।

গোরুর গাড়িতে চেপে ঘর ফিরছিল ঢিলি। চেনা পথ-ঘাট সব যেন বদলে গিয়েছে কেমন করে। নূপুর আর ঢিলি মুখোমুখি বসে আছে ছৌয়ের ভেতর। হাঁ করে নূপুর দেখছিল তার মাকে। ক' মাসেই যেন পুরো শরীরটা বদলে গিয়েছে মায়ের। আগের চাইতে অনেক রোগা দেখাচ্ছে তাকে।

গত সাত দিনে নূপুরের কত ইচ্ছে ছিল হাসপাতালে আসার, লুলারাম তার ইচ্ছেটাকে থেঁতলে দিয়েছে। ধমক দিয়ে বলেছে—ঘরে থাক। ওখানে কেনে মরতে যাবি? সব খপর তো রঘুর মুখে পাচ্ছিস!

অন্যের মুখে ঝাল খেলে কি নিজের মুখে ঝাল লাগে? নাকি তা ভালো দেখায়? লুলারাম বলেছিল, তুদের সেই আগের মা আর নেই! এখুন যারে দেখবি সে হল তুর মায়ের কঙ্কাল।

কঙ্কাল হোক, যাই হোক মা তো মা-ই। একথা লুলারামকে বোঝাবে কে?

রঘুনাথ সব শুনে নূপুরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, কাকার কথা বাদ দে তো। ওর কথা যত গায়ে না মাখবি তত ভালো।

নূপুর বড়ো হয়েছে। বুঝতে শিখেছে আগুন-জলের মর্ম।

ঢিলি চেয়ে আছে তার দিকে, মুখে কোনো কথা নেই।

রঘুনাথ বলেছিল গোরুর গাড়ির পেছনে পা ঝুলিয়ে বসে সে ধাওড়াপাড়া অবধি আসবে কিন্তু শুভর জন্য তা আর হল না। অবনী রঘুনাথকে চিনতে পেরে ঘর পর্যন্ত নিয়ে গেল। ওখানেই শুভর সঙ্গে অনেক সময় ধরে কথা হল তার। শুভ বেশি কথা বলে না তবু ওর মনে কোনো গুমোটভাব নেই। শরৎকালের সাদা মেঘের মতো ফুরফুরে তুলো তুলো মন। এই মেঘের দিকে তাকালে মন ভালো হতে বাধ্য। সেদিন শুভর সঙ্গে টিকেদারবাবুর ছেলে সবুজও ছিল। ওরা দুজন মানিকজোড় এখনও গুলতি হাতে নিয়ম করে বাঁশঝাড়ে যায় ডাহুক মারতে। ডাহুকের দেখা না পেলেও ওদের কোনো দুঃখ নেই। ঘুরে বেড়ানোর নেশাটা ওদের পেয়ে বসেছে।

সেদিন রঘুনাথ ওদের সঙ্গী হল। শুভর হাত থেকে গুলতি নিয়ে সে মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই শুইয়ে দিল একটা ডাহুকপাখি আর মাঠঘুঘু। পাখি দুটোকে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে দেখে বেজায় মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল শুভর। সবুজ তার হাত ধরে আনন্দ করে বলেছিল, আজ ফিস্ট হবে। রঘুকে আমরা আজ যেতে দেবো না। আজ রাতে ও আমাদের সঙ্গে থাকবে।

অতসী দিদিমণি যত্ন নিয়ে রেঁধে দিয়েছিলেন ডাহুকপাখির মাংস। যদিও পরিমাণে অল্প মাংস কিন্তু স্বাদে ছিল অতুলনীয়। ঘুঘুর মাংসটা আলাদাভাবে আলাদা কায়দায় রাঁধলেন তিনি। নিজে মাংস খান না অথচ তাঁর মাংস রান্নার প্রশংসা না করে পারা যাবে না।

শুভ বলেছিল, পিসি তুমি এত সুন্দর মাংস রেঁধেছ যে জিভের জল আর আটকে রাখা যাচ্ছে না। কোনো কথা শুনব না, আজ তোমাকে আমাদের সঙ্গে খেতে হবে।

অতসী দিদিমণি মিষ্টি হেসে বললেন, মাংস আমি জ্ঞানপাড়ার পর থেকে কোনোদিনও খাইনি। তোরা বড় হ। চাকরি কর। তারপর মিষ্টি আনবি, আমি খাব।

—সে তো অনেক দিনের ব্যাপার। সবুজ বিস্মিত স্বরে বলল, পিসি, আমরা কি চাকরি পাব কোনোদিন? আমার তো মনে হয় না আমরা কোনোদিন চাকরি পাব।

পিসি কিছু বলার আগে রঘুনাথ ভরসার গলায় বলল, কেন চাকরি পাবি না, নিশ্চয়ই পাবি। আমাদের শেরপুর গাঁয়ের দু'জন ছেলে পাশ করে মাস্টুর হয়েচে। ওরা মাস গেলে কড়কড়ে নোট গুণে নেয়।

অতসী দিদিমণি মন দিয়ে শুনলেন কথাগুলো, মন দিয়ে পড়লে নিশ্চয়ই তোরা চাকরি পাবি। শুভ তো পড়াশোনায় বেশ ভালো তবে ওদের ঘরের পরিবেশটা ভালো নয়। আমি তো ওকে বলেছি—এখানে এসে পড়তে। আমার ঘর তো ফাঁকা থাকে।

সে রাতে আর ঘরে ফিরতে পারেনি রঘুনাথ। লুলারাম গিয়ে খবর দিয়েছিল দুর্গামণিকে। দুর্গামণি কপালে ভাঁজ ফেলে চুনারামের মুখের দিকে তাকাল, চুনারাম তাকে ভরসা দিয়ে বলল, ছেলে নিয়ে অত ভেবো না বউমা। তুমার এই ছেলের কেউ কোনোদিন ক্ষতি করতে পারবে না। ওর গলায় আমি শুয়োরের হাড়ের তাবিজ বানিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছি। হাঁড়ির ঝি চণ্ডীর দয়া আচে ওর উপর।

ভোর-ভোর ঘরে ফিরে এল রঘুনাথ।

সে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই দুর্গামণি উদ্বেগ নিয়ে বলল, জানিস বাপ, কাল এট্টা চরম বিপদ ঘটে যেত।

—কী হয়েচে মা? রঘুনাথের তর সইছিল না।

পাশে দাঁড়ানো চুনারাম দাঁতন করা থামিয়ে বলল, কী আর হবেক। যত সব ছোটলুকের মরণ।

—তুমি থাম তো বাবা। দুর্গামণি ধমক দিয়ে চুনারামকে নীরব করে দিতে চাইল।

চুনারাম চুপ করে গেলেও তার ভেতরে কথার খই ফুটছিল। নিজেকে সংযত করে সে দুর্গামণির মুখের দিকে তাকাল। গলা নামিয়ে দুর্গামণি ভয়ার্তস্বরে বলল, কাল রাতে ছোটবউ পেলিয়ে গিয়েছিল আবার। আঁধারে পা হড়কে গিয়ে সে ছিটকে গিয়েছিল বুড়িগাঙে। ভাগ্যিস লুলারাম তখন কি কাজে বাঁধের ধারে ছিল। সে-ই লোক ডেকে ছোটবউকে বাঁচায়। বড়ো ভাগ্য ভালো যে ছোটবউয়ের কুনো ক্ষতি হয়নি।

বেলা বাড়তেই রঘুনাথ শুনতে পেল ঢিলি পা হড়কে বাঁধ থেকে পড়ে যায়নি। সে আত্মহত্যা করার জন্য ঝাঁপ দিয়েছিল বুড়িগাঙে। সেই সময় ঝারির সঙ্গে মিলিত হবার আশায় বাঁধে এসেছিল লুলারাম। একদিন ঝারির সান্নিধ্য না পেলে তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আর ঝারিও বড়ো খিটখিটে হয়ে ওঠে, সে তখন কারোর কথা সহ্য করতে পারে না।

ঝারি আর লুলারামের মেলামেশাটা এখন বাচ্চা-বুড়ো সবাই জানে। নূপুর বুঝতে শিখেছে সব, আড়ালে সে চোখের জল ফেলে। ঝারিকে তার ভালো লাগে না। ঝারির জন্য তাদের সংসারটা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে। অথচ পাড়ার মধ্যে মাথা উঁচু করে ঘোরে বউটা। ওর ভেতর লজ্জা-শরমের কোনো শেকড় নেই। দু-কান কাটার লাজ-লজ্জা বুঝি থাকতে নেই।

শীতটা ধাওড়াপাড়ায় বড়ো কষ্টের।

বেলা ছোট হলে মানুষের মন যে ছোট হবে এমন সহজ সমীকরণ কোথাও লেখা নেই। ক-দিন থেকে গুয়ারামের জন্য মনটা বড়ো ছটফট করছে চুনারামের। শুধু মনে হচ্ছে যদি প্রাণপাখিটা হঠাৎ করে উড়ে যায় তাহলে ছেলের হাতের জল সে আর পাবে না। সবার ভাগ্যে কি এমন সুখ লেখা থাকে? সুখ হল সেই সরলা খিরিষগাছের ফল যা দিয়ে চারা হয়, জ্বালন হয়—ছাই ওড়া দুপুরে যার মর্ম বোঝা আর খাঁ-খাঁ শ্মশানে গিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদা একই কথা। সুখের কোনো আকার নেই, আকৃতি নেই, সুখ হল জলের মতো মদের মতো, নেশা হবে পিপাসা

মিটবে। বড়োজোর খিরিষের আঠার মতো জড়িয়ে থাকবে কিছুক্ষণ।

ছেলের জন্য মন খারাপ চুনারামের আজকের নয়, বহু পুরনো অভ্যাস। এই ছেলের জন্য সে বাবুদের ঘরের কাজ ছেড়ে চলে এসেছিল গাঁয়ে। লাজবতীও থাকতে পারত না তাকে ছেড়ে। প্রায়ই মুখ ভার করে বলত, তুমার সাথে আমারেও লিয়ে চলো। ইখানে একা থাকতি কি ভালো লাগে গো? মন ধরে না, খাঁ-খাঁ করে চারপাশ। আমি হেঁপসে মরি!

লাজবতীর টানে নয়, শুধুমাত্র ছেলের টানে বাবুবাড়ির কাজ ছেড়ে চলে এসেছিল চুনারাম। এখন মাজা পড়া শরীর, পাকা চুল, চোখে ছানি তবু ছেলেটাকে দেখার জন্য মনটা অকবগিয়ে ওঠে! রাতকালে এই চিন্তা আরও গাঢ় হয়। বিদেশ বিভুঁইয়ে ছেলেটা কেমন আছে কে জানে। যত দিন যাচ্ছে তত যেন চিন্তাটা ছোবল মারছে মনের ভেতর।

ভূষণীবুড়ি সেদিন ঘুরতে ঘুরতে তাদের দোর অবধি এসেছিল, একথা-সেকথার পরে বলল, ফাঁকা ঘরে হেঁপসে উঠেচি গো! ছেলে নেই, বউমা নেই, একা একা কী ভাবে যে সময় কাটে বলা দায়। মনে হয় দম এটকে মরে যাব।

ভূষণীবুড়ির কথাগুলো শুনে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল চুনারামের। এ সময় বুড়িগাঁঙের জল স্থিতু হয়ে দম নেয়। আকাশের নীল বুকের ভেতর শুষে নিয়ে সাদা কালো নীল মিশিয়ে বিচিত্র এক আলপনা আঁকে জলের উপর। কদমগাছের ফাঁক দিয়ে কী অদ্ভুত কায়দায় গড়িয়ে নামে রোদ। সেই চুয়ানো রোদ গায়ে লেগে ঘাস হয় গর্ভবতী। নাকছাবির মতো ফুল আসে ঘাসের বুকে। বাসি চারাগুলো শিশির পান করে কিশোরীর টাইট শরীরের মতো টনটনিয়ে ওঠে। এত সুখ তবু সুখের মধ্যে লুকিয়ে থাকা উঁইপোকার মতো অসুখ কুরে কুরে খায় চিন্তার হাজার ফসলি জমি। শীতকালটা চুনারামের কাছে বড়ো বেশি ভয়ের সময়। ক'দিন ধরে যা শীত পড়েছে তাতে হাড় কাঁপে ঠকঠকিয়ে। আমড়াগাছের পাতাগুলো সব ঝরে গেল। কার শোকে ন্যাড়া হয়ে গেল নিমগাছ।

এই শীতের সময় চুনারাম বরফের মাছের মতো প্যাটপেটিয়ে চেয়ে থাকে, মৃত্যু-ভয় তার লোমকূপে এসে বাসা বাঁধে। গেল সালে ধাওড়াপাড়ার চারজন বুড়া সাফ হয় শীতের কামড়ে। বয়স হলে শীত বুঝি কাউকে ক্ষমা করে না। যমরাজকে আয়ুর দক্ষিণ-দুয়ারে নিয়ে এসে দাঁড় করায়।

এ সময় গুয়ারামও কাছে নেই তাহলে মনের জোর শতগুণ বেড়ে যেত চুনারামের। রঘুনাথের উপর ভরসা নেই চুনারামের, নাতিটা গায়েগতরে বাড়ল কিন্তু তার বিচারবুদ্ধি বড়ো কম। কাঁচা বয়সের ভাবনা পাকা আতার মতো, হালকা চাপ দিলেই পেটের ভেতরের মাল-মশলা সব কিছু দেখিয়ে দেয়।

এই শীতটা কাটবে কি? মোটা সুতোর চাদরটা গায়ে জড়িয়ে চুনারাম বাঁধের গোড়ায় এসে দাঁড়াল। প্রায় বছর দশেক আগে কেনা চাদরটা এখন জরাজীর্ণ, সুতোর ফুঁপি বেরিয়ে ঠান-বুড়িদের মতো দশা। রঙ জ্বলে গিয়ে এখন আর আগের চেহারা মনে পড়ে না। সকালের রোদ এসে ঢলিয়ে পড়ছে গায়ে। একটু আরামবোধ হচ্ছে চুনারামের। বেড়ার উল্টো পিঠে খেলা করছে বনিপাখির দল। ক্যাচর-ম্যাচর শব্দে উঠোন যেন হাটতলা। ধসে পড়া কাঁথ দেওয়ালের মাটি বর্ষায় ধুয়ে-গলে প্রায় সমতল। একটা তেল চকচকে ছাগলছানা তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে রোদে। ধসা দেওয়ালের উপর ছাগল নাচলে গৃহস্বামীর অমঙ্গল হয়। চুনারাম রাগের ঘোরে ছাগলছানাটা তাড়াতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল মুনিরামের চোখে।

দেখা মাত্র যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মুনিরাম, কাশতে কাশতে উঠে এল সে বেড়ার ধারে, কুথায় যেচিস রে, টুকে আয় না, কতা বলি।

অনেক বুড়িয়ে গেছে মুনিরাম, অসুখ ওর বয়সটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে আরও বিশ বছর। শরীরে জোর নেই, চোখ ঢুকেছে গর্তে। কথা বলার সময় শ্বাস-কষ্টের রুগির মতো ফ্যাসফেসে শব্দ হয়। চোখের তারা ছিটকে আসার উপক্রম।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাঁড়াতে বাধ্য হল চুনারাম। পিঠাপিঠি দুই ভাই, অথচ দেখা হয় না কতকাল। পণ্ডিত বিলের পাড়ে মুনিরামকে গাছের সাথে বেঁধে রেখেছিল মোকামপাড়ার লোকেরা। সিঁদ কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছিল সে। জামগাছে বেঁধে কী মার-ই না মারল ওকে। সেদিন ভাইয়ের জন্য কষ্ট হয়েছিল চুনারামের। মনে মনে ভেবেছিল এমন ভাইয়ের সঙ্গে যতদিন বাঁচবে যোগাযোগ রাখবে না। প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি। মুনিরামই রাতের বেলায় এসে তার পা ধরে কেঁদে কেটে বলল, দাদারে, তুর মুকে চুনকালি লেপে দিয়েচি। আমারে ক্ষেমা করে দে। যতদিন বাঁচব, আমি আর সিঁদকাঠি ছোঁব না। আর চুরিচামারি নয়, ইবার থিকে আমি বড়ো দানে হাত মারব। মোকামপাড়ার লোকগুলোকে দেখিয়ে দিব—ওরা আমার গায়ে হাত তুলে হেলেসাপকে খরিসসাপ বানিয়ে দিল। আগে ওদের ক্ষতি হত, ইবার থেকে ওদের সব্বোনাশ হবে।

মুনিরাম সিঁদেল চোর থেকে হয়ে গেল ডাকাত দলের সর্দার। তার কালো ঘোড়াটা বাঁধা থাকত বাঁশতলায়। বাঁধের উপর সে বিনা কারণে ঘোড়া ছোটাত। এক শ্বাসে চলে যেত মানিকডিহির গাঙপাড়। অন্য শ্বাসে ফিরে আসত হলদিপোঁতা ধাওড়া।

মুনিরামের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারল না চুনারাম। হাজার হোক ভাই বলে কথা। বয়স বাড়লে সম্পর্কে কেমন ছাতা ধরে। অনেক সম্পর্ক আবার নতুন করে ট্যাক গজায়। মুনিরাম ক' বছর আগেও কথা বলত না টাকার দেমাকে। নিজেকে ভাবত শেরশাহ। গায়ে কুঠ ফোটার পর মাটির ঢেলা থেকে তার মন হয়ে গিয়েছে লতলতে কাদা। এখন সাত চড়ে রা কাড়ে না সে। দিনের বেশির ভাগ সময় ঈশ্বরচিন্তা করে কাটিয়ে দেয়। হাত-পায়ের ঘাগুলোয় শুলোনী উঠলে সে কোঁকায়। ঢিলি তখন তার সেবা যত্ন করে। লুলারাম বিরক্ত হয়। মনে মনে ভাবে মানুষটা কেন মরছে না। এত লোকের বাপ মরছে, তার কেন বাপ মরছে না।

পণ্ডিতবিলের পাড়ে কুঁড়েঘর বেঁধে দিয়েছিল লুলারাম, বাপকে হাত ধরে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল সে। ফেরার সময় বলেছিল, কী করবো বলো, গাঁয়ের মানুষের রায়, আমাকে তো মাথা পেতে নিতে হবে। তুমার অসুকটা তো ভালো নয়। কার মুকে চাপা দেব বলো। যতদিন পেরেচি, লুকিয়ে তুমাকে ঘরে রেখেচি। আর পারলাম না। ইবার থেকে বিলধারেই থাকো। বিলের ঠাণ্ডা বাতাস তুমার শরীলটাকে ঠাণ্ডা করে দিবে। আমি সাতদিন অন্তর এসে তুমারে দেখে যাবো।

চোখের জল সেদিন আটকাতে পারেনি মুনিরাম। এই ছেলেকে হাতে ধরে চুরি বিদ্যার গুপ্তমন্ত্র শিখিয়েছে সে। সে তো শুধু জন্মদাতা বাপ নয়, একাধারে গুরু। দীর্ঘশ্বাস বুকে ঠেলে ওঠার আগেই বিলপাড় থেকে সটকে গিয়েছে লুলারাম।

অসুখ আর রুগী বয়ে বেড়ানো ঝক্কির কাজ। তাছাড়া মুনিরাম ঘরে থাকলে ঢিলিকে খারাপ নজরে দেখতে পারে না লুলারাম। মুনিরামের জন্য ঝারি রাতকালে ঘরে আসতে পারে না। ওর ঘুম খরগোসের চেয়েও পাতলা। খুট করে পায়ের শব্দ পেলে কে-কে বলে চেঁচিয়ে ওঠে। আর তার চেঁচানি শুনে পাড়ার কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

সেদিন লুলারামের ঘর থেকে গভীর রাতে বেরনোর সময় ধরা পড়ে গেল ঝারি। নূপুরই তার পথ আটকে দাঁড়াল। ধিক্কারে বাতাস কাঁপিয়ে বলল, তোমার সাহস তো কম নয়! বাঁধধার

ছেড়ে এবার ঘরে ঢুকেছো, দাঁড়াও দাদুকে আর তোমার বরকে সব বলে দেব।

ঝারি তার হাত ধরে ক্ষমা চাইল কাকুতি-মিনতি করে।

বাবার চাপে পড়ে নূপুর তাকে ক্ষমা করে দিলেও মন থেকে ক্ষমা করতে পারেনি আজও।

মুনিরামের মুখোমুখি দাঁড়ালে চুনারাম আজও কেমন অপ্রস্তুত বোধ করে। মুনিরামের আঙুলে জড়ানো ন্যাকড়াগুলো পুঁজ রক্তে ভরে আছে। ওগুলোর দিকে তাকালে চুনারামের গা ঘিনঘিনিয়ে ওঠে, তার মনে হয় সে-ও বুঝি অচিরে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হবে। লুলারাম তার বাপকে বিলের ধার থেকে ফিরিয়ে এনে ভুল কাজ করেছে। কিন্তু এছাড়া লুলারামের সেদিন কিছু করার ছিল না। থানা থেকে বড়োবাবু লোক পাঠালেন। লুলারামকে জেলে যেতে হবে অন্তত বছর খানিকের জন্য। সে জেলে গেলে মেয়ে দুটোকে দেখবে কে? টিলির উপর তার বিন্দুমাত্র ভরসা নেই। কবে সে ঘর ছেড়ে চলে যাবে একথা আগাম কেউ বলতে অক্ষম। অতএব ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো সেই মুনিরাম। বছর চারেকের মাথায় মুনিরামকে ফিরিয়ে এনেছিল লুলারাম। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে বলেছিল, বাবা ঘরে চলো। আমার টেইম এয়েচে, আমাকে জেলে যেতে হবে। জেলে না গেলে বড়োবাবু আমাকে ছাড়বে না। মাঝ রাস্তায় জিপ থামিয়ে বলবে দৌড়ো। তারপর গুলি করে দেবে। বলবে পেলুতে যাচ্ছিলাম তাই গুলি ছুঁড়ে মেরে দিয়েচে। আইন সব ওদের হাতে। আমি জলে নেমে মগরমাছের সঙ্গে লড়াই করে কি পারব? আমি তো চুনোপুঁটি।

সেই যে ফিরে এল মুনিরাম, আর সে বিলমুখো হয়নি। একলা ঘরে মন বসত না তার, খেতে বসে চোখের জল ভাতের থালায় পড়ত। সাতদিন ছাড়া আসব বলে লুলারাম আসত মাসে একবার। হাত পুড়িয়ে সেদ্ধভাত খেতেই কালঘাম ছুটে যেত মুনিরামের। বউটা সাত তাড়াতাড়ি চলে গেল! সত্যবতী থাকলে তার কপালে এত দুর্ভোগ হত না। রাঁধাবাড়ার কাজটা সামলে দিত বউ। আর কিছু না হোক দুটো কথা বলে তো বাঁচা যেত শান্তিতে। একলা থাকার জ্বালা অনেক। বুকের পাঁজরে শিলপাথর কেউ চাপিয়ে দেয়। লুলারাম জেলে যাবার পর স্বাভাবিক হয়ে গেল টিলি। পাড়ার লোকে আড়ালে আবডালে বলল, বউটা ইবার শ্বাস ছেড়ে বাঁচল। ঘরের মানুষ যদি পরের ঘরে নজর দেয় তাহলে তার নজরে পাপ বাসা বাঁধে। সে মানুষের কুনোদিন কুনো উন্নতি হয় না। ঘরের লক্ষ্মী কানলে বাইরে লক্ষ্মী কি সুখ পায় না সুখে থাকে?

চৌপায়ার এক কোণায় বসে চুনারাম শুধালো, তা কেমুন আচিস?

—কেমুন আচি তা তো তুই নিজের চোকে দেখতে পাচ্চিস। মুনিরাম ঘেয়ো হাতের দিকে তাকিয়ে কেমন বিমর্ষ হযে গেল।

—মনে হচ্চে আগের চেয়েও ভালো।

—ওই ভালো! অন্ধের কিবা রাত কিবা দিন। কুনো মতে বেঁচে আচি। ঢোক গিলে মুনিরাম বলল, সাত সকালে তুই কুথায় যাচ্ছিস? আমারে সাথে করে নিয়ে যাবি? এখুন একা বেরতে ভয় পাই। সব সময় মনে হয় আমার পেছনে বুঝি যম হাঁটচে।

—ও তোর মনের ভুল। চুনারাম জোর দিয়ে বলল, বয়স হলে মরার চিন্তে মনটাকে কাকের মতন ছিঁড়ে খায়। আমারও ক'দিন থিকে মন কু' গাইচে। জানি না এ শীতটা পার হবে কিনা!

—আমি তো যেতে চাই তবু সে যে আমাকে নিচ্চে না। নিলে বাঁচি। আর পচা শরীলটাকে ঘষটাতে হয় না। কথাগুলো বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেল মুনিরাম। চুনারাম বলল, আমাদের চলে যাওয়াই ভালো। আমরা আর কুনো কাজে লাগব না। এখন আমরা হলাম গিয়ে আখের আলসে। গোরুও খাবে না, আর ঘর ছাওয়াও যাবে না। শুধু আগুন ধরালে চোখের পলকে ছাই হয়ে বাতাসে উড়বে।

উত্তরের হাওয়া এসে হঠাৎই ঝাঁপিয়ে পড়ল মুনিরামের গায়ের উপর, শীতে গা-কাঁটা দিয়ে উঠল তার, গায়ের ছেঁড়াখোঁড়া কম্বলটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে সে কেমন করুণ চোখে তাকাল, ঘন্টি বেজে গিয়েচে, ইবার ছুটি হবে। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্চি—সে গটমট করে আসচে। তবে যেতে আমার দুঃখু নেই। শান্তিতে যেতে পারলে বুকের বিদনাটা কমত।

—তুর আবার অশান্তি কুথায়? ধার চাকুর মতো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল চুনারাম। মুনিরাম গলা খাদে নামিয়ে বলল, অশান্তি আচে রে, অশান্তি আচে। বলেই সে কাছে সরে আসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল, বউমা তুকে কিচু বলে নাই?

—না তো!

—সারা ধাওড়াপাড়া জানে অথচ তুর ঘরের বউটা জানে না। কেমন বিকৃত স্বরে মুনিরাম বলল, আমার ঘরের বউটা এট্টা কাণ্ড করে বসেচে। পালিয়ে গিয়ে সে আবার ফিরে এল কিন্তু পেটে করে ছেলে নিয়ে এল। আমার ঘরের লুলাটা মানবে না। সে গরধপটা বলছে—ওটা তার সন্তান লয়। এ সন্তানের জিম্মা নিতে পারব নি।

—হায় কপাল, এ কী কাণ্ড! চুনারাম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, কী শুনালিরে, এ সব না শুনলে বুঝি ভালো হোত!

—এক দিন না একদিন তো তোকে শুনতেই হোত। তুই ঘরের বড়ো। তোকে তো শুনতেই হবে। বড়ো গাছে যে ঝড় লাগে বেশি। মুনিরাম অস্থিরতা কাটিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি এখুন কি করি বলতো? আমার যেতে কাটে, আসতে কাটে। আমি ফাটা বাঁশের ফাঁকে এটকে আচি। তুই আমাকে বাঁচা। না হলে আমি পাগলা হয়ে যাব।

—তুই চুপচাপ থাক।

—তার মানে?

—বুবা হয়ে যা, কুনো কথা বলবি নে। মনে রাখিস বুবার শত্রু নেই। চুনারাম অনেক ভেবে বলল, বউমানুষ আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরলে অমন তো হবেই। সবই ভাগ্যের লিখন। তুই আমি কি করব বল?

নূপুর লাল চা নিয়ে এসেছে দুটো কাচের গ্লাসে। সঙ্গে বাটি ভর্তি আউস-চালের মুড়ি। সকালবেলার রোদ ঢ্যাঙ্গা ট্যাঁড়শগাছের পাতায় গা এলিয়ে দিয়েছে পরম তৃপ্তিতে, ট্যাঁড়শের ছড়ানো পাতা সেই রোদ্দুর গায়ে মেখে সুখী নজর মেলে দেখছে চারপাশ। এ সময় সুখী সাতভায়া পাখির দল বাঁশবাগানে হুটোহুটি খেলে বেড়ায়, যেন পুরো বাঁশবনটা ওদের, ওখানে বনকুয়ারও প্রবেশ নিষেধ। চুনারাম মুখ তুলে দেখল দলবদ্ধ পাখিগুলো যেন গায়ে ছাই মেখে থপর থপর করে হাঁটছে শুকনো বাঁশ পাতার উপর, অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে চতুর্দিকে, আর সেই শব্দের মাধুর্যে এই বয়সেও বাল্যবেলায় ফিরে যাচ্ছে চুনারাম। সাতভায়া পাখিগুলোকে সে ষাট বছর আগে যেমন দেখেছিল পাখিগুলো যেন আজও তেমন আছে। ওদের কোন পরিবর্তন হয়নি। তাহলে একটা পাখির গড় আয়ু কত? পাখিরা কি বৃদ্ধ হয় না, ওদের যৌবন কি তার মতো হারিয়ে যায় না?

সাতসকালে মাথাটা কেমন গুমগুমিয়ে উঠল চুনারামের। কাল রাতে জব্বর শীত পড়েছিল। দুর্গামণি জলঢালা ভাত খেতে দিলে মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে সে বলেছিল, বউমা, এখুন শীত পড়চে। এখুন আর জল ঢালা ভাত দিয়ো না। শীতে জীবন বড়ো কাহিল গো!

বিছানা বলতে ছেঁড়া কাঁথা আর একটা লোমওঠা কম্বল। বাবুরাই দিয়েছিল গায়ে দেওয়ার জন্য। তালাই-মাদুর শ্রী হারিয়ে ঘাটে যাওয়ার অপেক্ষায়। ছারপোকাগুলো আর বসবাসের জায়গা

পায়নি, বেছে নিয়েছে ছেঁড়া কাঁথা আর জীর্ণ মাদুর-তালাইয়ের আশ্রয়। বুড়ো বয়সের জোড়াতালি দেওয়া ঘুম ওরাই বরবাদ করে দেয়। রক্ত চুষে ওরা পেট- ভরানোর পরেই ঘুমের দেবী বিছানায় এসে বিশ্রাম নেয়। তখন রাত গড়িয়ে গিয়ে বয়স বাড়ায় শরীরে। পান-বরজের পাশ থেকে ভেসে আসে শেয়ালের ডাক, শিমুলগাছের ছড়ানো ডালপালার ভেতর থেকে উড়ে যায় হুতোম পেঁচা, ইঁদুরগুলো তখন ভয়ে মরে, ঠকঠকিয়ে কাঁপে জান বাঁচানোর তাগিদে।

মুনিরাম চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে এক খাবলা মুড়ি মুখের ভেতর ছুঁড়ে দেয়, ফোকলা মাড়ি দিয়ে চাপ দিয়ে পিষে দিতে চায় মুড়ির ফোলানো শরীর, মুখের লালায় পিছলে যায় আউস-চালের মুড়ি। শেষে মিইয়ে গিয়ে মিনমিনে স্বর হয়ে বেরয় মুনিরামের কণ্ঠ থেকে, গুয়ারামের কিচু খপর পেলি?

চুনারামের দুর্বল জায়গায় বুঝি পিন ফোঁটাল মুখিরাম, নিঃস্ব চোখে তাকিয়ে বুড়োটা বলল, ছেলেটার খপর বহুৎ দিন হলো পাইনি রে। ছেলেটা পরের দোরে খাটতে যাক এ আমি চাইনি! কিন্তু আজকালকার ছেলেপুলে কথা শুনল না, জেদ দেখিয়ে গেল! ইখানে আমি চিন্তায়-চিন্তায় আধখানা!

—চিন্তা তো হবারই কথা! মুনিরাম কোড়ক লাগা মুরগির মতো গা ঝাড়া দিয়ে বলল, দুব্বো ঘাস যতই সোন্দর হোক সবাই তারে মাড়িয়ে চলে। কেউ তার দিকে ফিরে তাকায় না। বুড়োলুকদের এই মনোভাব আমি কুনোদিন মন থিকে মেনে নিতে পারিনি। চাইলে যখুন দেবে না তখন না বলে নিতে দুষ কুথায়। না বলে নিলে চুরি করা হয়। যারা মানুষ ঠকায় তাহলে তারাও তো চোর। আমি লুলারে বলেছি-দুব্বোঘাস হোস নে বাপ, বাঘহাতা ঘাসের মতো বাঁচ। যতদিন বাঁচবি, মাথা উঁচা করে বাঁচবি। কারো কাচে ছোট হবি নে। বুনো বলে যারা আমাদের ঘেন্না করে তাদের মুখে তুই ছেপ দে।

মুনিরাম কুঁকুড়ে যাওয়া গলায় বলল, জীবনে চুরি করাটাকে আমি কুনোদিন পাপ বলে ভাবিনি। আমি ভেবেচি-ওটাও একটা ধম্মো। শুধু মুনিষ খেটে, গোরু চরিয়ে, ভিখ মেঙে জীবন বাঁচে না। জীবনের জন্যি পয়সা চাই। চাঁদির জুতো হলো এমন জিনিস যা তুরে বাবু-ভদ্দর লুকদের মধ্যিখানে লিয়ে যাবে। যার পয়সা নেই তার পুড়া কপাল। মনে রাখিস চাঁদির জুতোয় কাঠের পুতুল হাঁ-করে।

—আমি এখুন উঠিরে। চুনারাম এই আলোচনায় হাঁপিয়ে উঠছিল, দলছুট বকের মতো সে যেন পালিয়ে বাঁচতে চাইছে অন্য আকাশে। অভাব তাকে কোনোদিন টেনে নীচে নামায়নি, সে আধপেটা খেয়েছে তবু কোনোদিন বিসর্জন দেয়নি ধর্ম।

—কুথায় যাবি সাতসকালে? মুনিরাম অস্থির চোখে তাকাল, আমারে টুকে লিয়ে যাবি? কৎদিন পাকুড়তলায় যাইনি। ওখানে গেলে পরে আমার মনের জোর বেড়ে যায়। পাকুড়তলার বাতাসে কি আচে জানি নে, আমার মনে হয় আমি আরো ঢেরদিন বাঁচব। চুনারামকে চিন্তিত দেখাল সহসা, তুই অতটা পথ হেঁটে যেতে পারবি? তুর কষ্ট হবে না তো?

—কষ্ট হলে আর কি হবে? ঘর যদি বুকে চেপে বসে তাহলে বাইরে গিয়ে বুকের সেই খিল ছাড়াতে হয়। লাঠিতে ভর দিয়ে মুনিরাম বহু কষ্টে উঠে দাঁড়াল।

নোলক এসে তার নড়বড়ে অবস্থা দেখে বলল, দাদু গো, আমি কি তুমার সাথে যাবো?

—দরকার হবে নি। মুনিরাম এড়িয়ে যেতে চাইল।

বেড়ার কাছে এসে আগড় খুলল চুনারাম। শীতের রোঁদ তখনও পথের কাদা সম্পূর্ণভাবে খড়খড়ে শুকনো করে দিতে পারেনি। তখনও ঘাসের ডগায় লেগে আছে শিশিরের ছোঁয়া,

বসাকগাছের পাতা ভিজে আছে শিশির জলে, পাতামাছের মতো বাঁশপাতা হাওয়ায় দুলছে টলোমলো যেন সকালবেলায় তারা চুল্লু টেনেছে ভরপেট।

কাল সকালে থানা থেকে লোক এসেছিল লুলারামকে ডাকার জন্য। জিপে নয় সাইকেলে চেপে এসেছিল মুখ চেনা পুলিশটা। লুলারাম তখন ঘুমোচ্ছিল ঘরে। হাঁক ডাকে চোখ রগড়ে বাইরে এসে দেখেছিল খাকি পোশাক পরে মূর্তিমান দাঁড়িয়ে আছে। দাঁত বের করে বলল, তোমাকে বড়বাবু ডেকেছিল। এক্ষুণি চলো।

—পায়খানা-পিসাব করব না?

—না, সে সময় আমার হাতে নেই। কাল সারারাত ডিউটি ছিল। শরীর আর চলছে না। চলো, এক্ষুণি চলো। পুলিশটার তাড়া ছিল। শরীরে ছিল রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। পোশাকও ঢিলেঢালা। রাজ্যের অলসতায় ডুবে ছিল তার চোখ দুটো।

লুলারাম চেনা পুলিশটাকে অবজ্ঞা করতে পারল না। থানা-পুলিশ-মামলা বড়ো ঝামেলার। বড়োবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন মানে কেস জটিল। কেস জটিল হবারই কথা। ছোট কুলবেড়িয়ায় ডাকাতি করতে গিয়ে লুলারামের গুরু হাফিজ ধরা পড়ে গেল। সেই গ্যাংয়ে লুলারামও ছিল তবে সে অল্পের জন্য বেঁচে যায়। হাফিজকে গোল করে ঘিরে ফেলে গ্রামবাসী। বকুলতলায় চলে গণধোলাই। কেউ তাকে বাঁচাতে আসেনি। গ্রামবাসীদের পুরনো ক্রোধ হাফিজের জীবনদীপ নিভিয়ে দিল।

প্রথমে শাবল দিয়ে মেরে তার পা দুটো ভেঙে দেয়, তারপর হাঁটুর কাছে চাপ দিয়ে উল্টে দেয়। পরে মাথার ঘিলুতে ঢুকিয়ে দেয় বর্শার ডগা। ফিনকি দেওয়া রক্ত আর থামতে চায় না। কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করে হাফিস।

—টুকে পানি দাও গো, টুকে পানি দাও। তার আর্তস্বর বাতাস বিদীর্ণ করে অনেক দূর পৌঁছে যায়। জলের বদলে সে পায় লাঠির বেধড়ক প্রহার। বকুলতলায় লুটিয়ে পড়ে সে। তার মুখে ধুলো-কাদা ঢুকে গিয়ে বীভৎস দেখায়। তাতেও ক্ষান্ত থাকে না মারমুখী মানুষ। শেষমেষ একটা বড়ো বস্তায় ঢুকিয়ে মুখ বেঁধে তাকে চাপিয়ে দেওয়া হয় গোরুর গাড়িতে। গাড়োয়ানকে নির্দেশ দেওয়া হয় কালীগঞ্জ হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে চলে আসতে।

ভোর ভোর গোরুর গাড়ি পৌঁছেছিল কালীগঞ্জের হাসপাতালে। অবনী তখন ডিউটিতে। ধরাধরি করে নামানো হল হাফিজকে। বোরার মুখ খুলে তাকে শুইয়ে দেওয়া হল আউট-ডোরের বারান্দায়। কল-বুক পড়েই সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে এলেন ডাক্তারবাবু। ও.টি.তে নিয়ে গিয়ে আইডিন লাগানোর সময় পেলেন না তিনি। তার আগে চোয়ালের দু পাশে, নাকের ছিদ্রে রক্ত উগলে প্রাণ ত্যাগ করল হাফিজ।

খবরটা সকালবেলায় কানে গিয়েছিল লুলারামের। বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে চোখের জল ফেলল নীরবে। হাফিজ না থাকলে তার এত বাড়বাড়ন্ত হত না। হাফিজ হাতে ধরে তাকে কাজটা শেখায়। কানে মন্ত্র দেয়। আর সতর্ক করে বলে, যে রাতে ঘরের বাইরে পা দিবি—সে রাতে মদের বোতল ছুঁবিনে ভাই। মদ আর মেয়েমানুষ দুটারে এড়িয়ে চলবি। তাহলে দেখবি এ লাইনে সিঁড়ির পর সিঁড়ি। ধনে-মানে তুর জীবন তখন কানায় কানায় ভরে যাবে।

হাফিজ ছিল শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত, খরগোসের চেয়েও চালাক তবু তার এই অন্তিম পরিণতি কোনমতে মন থেকে মেনে নিতে পারে না লুলারাম। তার বুকের ভেতরটা ভয়ে কাটা খাসীর মেটের মতো নড়ে। শুকিয়ে যায় গলা। গুরুর মৃত্যুতে লুলারাম ভেঙে পড়েছিল পুরোমাত্রায়।

একবার চোখের দেখাও দেখতে পেল না হাসপাতালে গিয়ে। ওখানে গেলে তার ঝুঁকি বাড়ত বই কমত না। পুলিশের লোক ঘুরঘুর করছিল সাদা পোশাকে।

কৃষ্ণনগর থেকে ময়নাতদন্ত শেষে ফিরে এসেছিল হাফিজের লাশ। পরের দিন সন্ধেবেলায় হাফিজ ভ্যানে চেপে পৌঁছে গিয়েছিল তার নিজের গ্রাম ছোট-কুলবেড়িয়ায়। তার লাশের উপর আছাড় দিয়ে কাঁদছিল মোতিবিবি। হাফিজের ছোট-ছোট ছেলে দুটো ভ্যালভেলিয়ে দেখছিল, মৃত্যুর কি রূপ সেই ধারণা ওদের মনে স্পষ্টত গড়ে ওঠেনি।

সেদিন গভীর রাতে মোতিবিবির সাথে গোপনে দেখা করে এসেছিল লুলারাম। নগদ কিছু টাকা আর ডাকাতির কিছু সোনাদানা মোতিবিবির হাতে তুলে দিয়ে কাতর হয়ে বলেছিল, ভাবী যদি কুনোদিন দরকার হয় আমাকে খপর দিও। তুমাদের জন্যি সদা-সর্বদা আমার জান-হাজির থাকবে। হাফিজ ভাইয়ের কাচে এ বান্দার জীবন বাঁধা আচে। টাকা পয়সা সোনাদানা দিয়ে এ ঋণ কুনোদিনও শোধ হবে না।

ডাকাত দেখতে কালীগঞ্জ হাসপাতালে দুপুরবেলায় ছুটে গিয়েছিল রঘু। এর আগে সে কোনোদিন ডাকাত দেখার সুযোগ পায়নি। হাফিজ ডাকাতের নাম জ্ঞানপড়ার পর থেকে সে শুনছে। মানুষটা নাকি কাঁড়া-মোষের মতন দেখতে। মাংসখেগো বাঘের মতো নাকি তার রাগ। তেজে খরিস সাপকে সে হরিয়ে দেবে। এমন মানুষের দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা। বাঁধ ধরে পইপই করে ছুটে গিয়েছিল রঘুনাথ। পাকা রাস্তা ধরে নয়, সে গিয়েছিল থানার পাশ দিয়ে। বড়ো পাকুড়গাছটার পাশ দিয়ে ঢালু পথ সোজা নেমে গিয়েছে কামারপাড়ার দিকে। কামারপাড়া শেষ হলে শুরু হয় হাসপাতালের পাঁচিল।

আউট-ডোরের সামনে বুক চিতিয়ে শুয়েছিল হাফিজ ডাকাত। বুনো মোষের মতো পেশিবহুল চেহারা, ভরাট মুখ, চওড়া কপাল। দুটো পা যেন দুটো ইলেকট্রিক খাম্বা। সেই খাম্বা কেউ ভেঙে দিয়েছে জোর করে। চামড়া ফুটো হয়ে বেরিয়ে আছে সাদা হাড়। জমাট বাঁধা কালচে রক্ত চাপ বেঁধে আছে শ্যামলা মুখে, বোজা চোখ ফুলে একেবারে কমলালেবুর কোয়া, থেঁতলানো ঠোঁট চিপসে গিয়েছে দাঁতে। সাদা দাঁতে লেগে আছে ঠোঁটের মাংস। রঘুনাথের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। ঘরে গিয়ে কাকাকে সবিস্তারে বলতে হবে। কাকা পথ চেয়ে থাকবে তার। রঘুনাথ বুঝতে পারল হাফিজের সঙ্গে তার কাকার দহরম মহরম ছিল জব্বর। হাফিজ ডাকাতের মৃত্যুতে বেজায় দুঃখ পেয়েছে লুলারাম।

হাসপাতালের ঘাসে ঢাকা মাঠটাতে ডাকাত দেখার ভিড় উপচে পড়ছে। ভেসে আসছে নানা মানুষের হাজার কথা। রঘুনাথের ঝাঁ-ঝাঁ করছিল কান। ভিড় কোনকালেই পছন্দ নয় তার। শুধু মেলার ভিড় তার যা ভালো লাগে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে শুভ তার হাত ধরল, কখন এলি?

—এই তো। রঘুনাথ চোখ ছোট করে তাকাল, এমন মরণ চোখে দেখা যায় না। আহা রে, এভাবে কাউকে মারতে হয় বুঝি?

—হাফিজ ডাকাত ভীষণ রাগী ডাকাত। ওকে পুলিশও ধরতে পারত না।

—রাগী হলেও মানুষটার মন ভেষণ ভালো ছিল। রঘুনাথ সহানুভূতির সঙ্গে বলল, জানিস, ও আমার কাকার খুব জানাশোনা।

শুভ কি মনে করে ঠোঁটের উপর তর্জনী চেপে রঘুনাথকে সতর্ক করল, চুপ। ওকথা এখানে বলিস না। বিপদ ঘটে যাবে। চল ফাঁকায় দাঁড়াই।

ফাঁকায় দাঁড়িয়ে এই শীতেও ঘামছিল রঘুনাথ। মনে মনে তার ইচ্ছে ছিল সে বড়ো হয়ে ডাকাত

হবে। কেন না ডাকাতদের সবাই ভয় করে। তাছাড়া চোর অপবাদের চাইতে ডাকাত অপবাদ ঢের ভালো।

শুভ বলল, হাফিজ ডাকাত যদি কোনমতে পালিয়ে যেতে পারত তাহলে যারা তাকে ধরেছিল তাদের সে পিঁপড়ের মতো টিপে টিপে মারত।

বুড়ো আঙুল কামড়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল রঘুনাথ। বারবার করে একটা মানুষের লাশ তার চোখে ভেসে উঠছে। হাফিজ ডাকাতের মুখটা সে কিছুতেই ভুলে যেতে পারছে না।

শুভ বলল, এত বেলায় যখন এসেছিস তখন খেয়ে যাবি। চল মাকে খবরটা দিয়ে আসি।

হাসপাতালের কোয়ার্টারগুলো ছোট ছোট, মাটি উঁচু করে পথ বানিয়েছে হাসপাতালের কর্মীরা। বর্ষায় জল জমে যায় এসব পথে, তখন যাতায়াতের অসুবিধা। বড়ো একটা আমগাছ ছাড়া তেমন কোনো গাছ নজরে পড়ে না রঘুনাথের। কোণের দিকের ঘরটার সামনে মস্ত একটা আমড়াগাছ প্রায় ন্যাড়া শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর ক'দিন পরে কচি কচি পাতা গজাবে গাছের ডালে। বেশ রূপবান হয়ে উঠবে গাছটা। রঘুনাথকে দেখে সরস্বতী নরম করে হাসল, কখন এলি রঘু? আয়। বস।

—আমি ডাকত দেখতে এসেচিলাম। শুভর সাথে দেখা হতেই ও ধরে আনল।

—বেশ ভালো তো। সরস্বতী বলল, খেয়ে-দেয়ে বিকেলে যাবি। শুভ তোর কথা খুব বলে। আর বলবে না কেন? তুই কত ভালো ছেলে বল তো?

মনে মনে হাসল রঘুনাথ। সে কত ভালো ছেলে তা সে নিজেই জানে। তার সহজ সরল মুখের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক পরিণত মন। কমলাকে দেখলে সেই মনটা হঠাৎ যুবক হয়ে ওঠে। কমলা তবু গাল ফুলিয়ে বলে, তোমার কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, তুমি বোকার হদ্দ।

শুভদের একটাই ঘর। একটা কমা কাঠের খাট পাতা, অবনী বছর তিনেক আগে কালীপুজোর সময় কিনে ছিল খাটটা। সেই খাটের উপর তালাই যত্ন নিয়ে বিছিয়ে দিয়েছে সরস্বতী। অত বড়ো খাটে অবনী আর শুভ ছাড়া কেউ ঘুমায় না। সরস্বতী খাটে ঘুমালে ঘুম আসে না। সারারাত শুধু বিড়বিড় করে। তারপর একসময় বিরক্ত হয়ে নেমে আসে খাট থেকে। নীচে বিছানা পেতে ঘুমায়। আর ঘুমানোর সাথে সাথে নাক ডাকে। তার নাক ডাকার শব্দে বিরক্ত হয় অবনী, আটা কল চলচে। বাপরে বাপ, কী শব্দ!

দুপুরবেলায় পালপুকুর থেকে গা ধুয়ে এল শুভ আর রঘুনাথ। ডুব সাঁতারে পালপুকুরের অন্য পাড় ছুঁয়ে দিল রঘুনাথ। তাই দেখে শুভর আর বিস্ময় ধরে না, বাপরে, কী দম তোর বুকে পোরা! তোর সাথে কেউ ডুব সাঁতারে পারবে-ই না।

শুভ সাঁতার জানে কিন্তু সেই জানাটা যথেষ্ট নয়। তবে সবুজ বলে, সাঁতার আর সাইকেল চড়া জীবনে কেউ ভোলে না। একবার শিখলে মরার আগের দিন পর্যন্ত মনে থাকে।

রঘুনাথ হাসল। জলে নামলে তার চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে ওঠে। আবার ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিক হয়। তবে সময় লাগে।

পাশাপাশি খেতে বসে শুভ দেখল হাঁসের ডিমের ঝোল বেঁধেছে তার মা। ঝোলটার এত

সুন্দর রঙ যা দেখলে জল চলে আসে জিভে। শুভ আড়চোখে দেখে নিল পাঁচটা ডিম ঝোলে ভাসছে পৃথিবীর বড়ো মোতির আকার নিয়ে। হিসাব মতো চারটে ডিম হলে ওদের সবার হয়ে যাবে। একটা অতিরিক্ত ডিম কিসের জন্য রাঁধল মা। এই প্রশ্নটা প্রশ্নই থেকে গেল শুভর ভেতর। হঠাৎ সে দেখল একটা আস্ত ডিম খুন্তি দিয়ে দু'ভাগ করে তার মা সাজিয়ে দিচ্ছে দু-জনের পাতে। কাটা ডিমের সুঘ্রাণটাই আলাদা, কারোর সঙ্গে মেলে না। এই গন্ধটাই বিশেষ পছন্দ শুভর। তাছাড়া ডিম খেতে তার ভালো লাগে। ভালো লাগার একটাই কারণ—ডিমে কোনো কাঁটা নেই।

বিকেলের আলো গড়িয়ে নামছিল পৃথিবীতে। শীতের বেলা চওড়া উঠোন নয়, হাতের তালুর মতো। শুভর ইচ্ছা ছিল আজও চামগুলতি নিয়ে বাঁশঝাড়ে যাওয়ার। রাজি হল না রঘুনাথ।

চোখ দুটো কুঁচকে সে বলল, এক একজন মানুষ থাকে যাদের দেখলে 'পরে মাথাটা কুদরীলতার মতো ভক্তিতে নুয়ে আসে। আমার মনে হয় হাফিজ ডাকাতও সেরকম মানুষ। আমার কাকা ভালোমানুষের সঙ্গে মিশেছিল। সে যে ভুল করেনি—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। শুভ মুখটা আকাশের দিকে উঠিয়ে অদ্ভুত গলায় বলল, তোর কাকাকে আমি দেখিনি। তবে তার কথা শুনে শুনে আমি তার ভক্ত হয়ে গিয়েছি। একদিন আমাকে নিয়ে যাস, আমি তোর কাকার সঙ্গে আলাপ করে আসব।

রঘুনাথ নীরবে শুভর মুখের দিকে তাকাল, কবে যাবি বল? তুই গেলে আমি তীর-ধনুক নিয়ে মাঠে যাবো গুড়ুল পাখি আর খরগোস মারতে।

কথাটা শুনে ভালো লাগল শুভর। গুরুত্ব সবাই পেতে চায়। গুরুত্বহীন মানুষের কোনো মূল্য নেই এ পৃথিবীতে। রঘুনাথের কথাগুলো তার মনে কদমফুলের পাপড়ির মতো জায়গা করে নিল নিজস্ব ক্ষমতায়।

বিকেলের রোদ সব ঋতুতেই মিঠে।

হাসপাতালের মাঠের মাঝখান দিয়ে পায়ের চড়া ফেলা পথ, পদপিষ্ট ঘাস উঠে গিয়ে শিরদাঁড়ার হাড়ের মতো সরু। শুভ আর রঘুনাথ পাশাপাশি হাঁটছিল, ওদের পায়ে ব্যস্ততা কেন না রোদ ঢলার আগে রঘুনাথকে পৌঁছাতে হবে হলদিপোঁতা ধাওড়ায়। দুপুরে না যাওয়ার জন্য শুধু মা নয়, কাকাও চিন্তা করবে। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায় ততই মঙ্গল।

শুভ সহজে ছাড়ার ছেলে নয়। রঘুনাথ তার চেয়ে বয়সে বড়ো হলেও ওরা দুটিতে বন্ধুর মতো মিশছে। সম্পর্কের জড়তা কেটে গিয়ে ওরা এখন একে অপরের কাছাকাছি।

হাসপাতালের কিচেনটা দূর থেকে দেখতে পেল রঘুনাথ। কাকিমা ভর্তি থাকার সময় কতবার সে এখানে এসেছে। শুভ আর সবুজ কোয়ার্টার থেকে চলে এসেছে গল্প করার টানে। ওদের গল্পের কোনো মাথা মুণ্ড নেই, ওদের কথাগুলো যেন স্বর্ণলতার মূল, যা ফুরোয় না, যার শেষ নেই শুরু নেই—আদি অনন্ত।

রঘুনাথ হাঁ করে শোনে ওদের কথা।

সবুজ অকপটে বলে, মেয়ে দেখলে বুক এখনও ঢিসঢিস করে। মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে তার বায়োস্কোপ দেখার আনন্দ হয়। তার যদি বিয়ে হয়ে যেত তাহলে সে আর বেশি দূর পড়ত না। কয়লার ব্যবসা করত। দুপুরবেলায় ফিরে এসে বউয়ের বাড়া ভাত খেত।

সবুজের কথা শুনে হা-হা করে হাসল শুভ, তুই পাগল হয়ে গিয়েছিস। তোর বাবা যদি এমন কথা শোনে তাহলে মারতে মারতে ঘর থেকে বের করে দেবে।

সবুজ দুঃখী হল না, বরং খুশি হল আরও, ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে আমি বেঁচে যাই। আমার বাবাকে তো চিনিস না—কী জিনিস। বাঁধের এপারে পুঁতে দিলে গাঙের ওপারে গিয়ে গাছ বেরবে।

মাথায় যদি পেরেক ঢুকিয়ে দিস তাহলে স্ক্রু হয়ে বেরিয়ে আসবে।

সবুজের কথা মিথ্যে নয়। টিকেদারবাবুর উপস্থিত বুদ্ধির কাছে এ হাসপাতালের সবাই বুঝি শিশু। এমন কী ডাক্তারবাবুও মানুষটাকে মান্য করে কথা বলেন। সমস্যায় পড়লে ডেকে আনেন টিকেদারবাবুকে।

সবুজের বিয়ে করার ইচ্ছেটা ক্লাস টেন-এ ওঠার পরে প্রবল হয়েছে। মেয়েদের সৌন্দর্য তাকে বানের জলের মতো টানে। মনে মনে সে পাগল হয়ে ওঠে। এটা বানানো নয়, একেবারে রক্তজাত। এর মধ্যে দু-চারজনকে প্রেম নিবেদন করে সে বকা খেয়েছে। সবাই তাকে ক্ষমা করে দিলেও মাধুরী তাকে ক্ষমা করেনি। এক ক্লাস নীচে পড়া মাধুরীর মানসম্মান জ্ঞান যথেষ্ট। সে ফালতু কথা পছন্দ করে না। সবুজকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, বাড়াবাড়ি করবি নে তাহলে তোর বাবাকে আমি সব বলে দেব। পিঠের চামড়া যদি ফাটাতে না চাস তাহলে মুখটাতে গামছা গুঁজে রাখ। তোর মুখ ড্রেনের চেয়েও নোংরা।

—কী করে নোংরা হয়, আমি যে দু-বেলা দাঁত মাজি। সবুজের কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

যাওয়ার সময় সবুজের সঙ্গে দেখা হল না রঘুনাথের, সে পালদের গমকলে গিয়েছে থলি ভর্তি গম নিয়ে। শুভ জানে—একবার গম ভাঙাতে গেলে সবুজ সারা সপ্তাহের হাতখরচ উঠিয়ে নেবে। চাকিতে আটা বেচে দেয় সবুজ। দশ কেজি গমের আটা দশ কেজি হবার কথা। সেই দশ কেজির মধ্যে থেকে দেড় কেজি আটা বিক্রি করে দিলে ঘরে কার বোঝার সাধ্যি আছে। যদি কেউ সন্দেহ করে তাকে অন্যভাবে বোঝানো যাবে। সেসব কাজে সবুজ ভীষণ পারদর্শী। নাটুকে গলায় বলবে, নতুন চাকির আটা, একটু তো কম হবে। যাঁতাই তো কত আটা খেয়ে নেয়। মেশিন না খেলে মানুষ খাবে কি করে?

ফি হপ্তার আটা বিক্রির টাকাটা লুকিয়ে রাখে সবুজ। ইস্কুলে গিয়ে মিঠে বরফ কিনে খায়। মন হলে বেলডাঙার তিলের খাজা গুড়ের নাড়ু কত কি! হাতে যতক্ষণ পয়সা আছে ততক্ষণ সে রাজা। পয়সা ফুরোলে মন বিমর্ষ। তখন মনের ভেতর আবোল-তাবোল চিন্তা উঁকি মারে। সেই চিন্তাগুলো সুঁচলো কুশগাছের মতো মনটাকে খোঁচায়। তখন ক্লাসের মেয়েগুলোকে নিয়ে ভাবনা শুরু করে সে। সকালবেলায় সে সব ভাবনার কথা ফলাও করে বন্ধুদের বলবেই বলবে নাহলে ওর ভাত হজম হবে না।

কিচেনের সামনে দৌড়ে এসে রঘুনাথকে ধরে ফেলল সবুজ। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তোর সাথে খুব দরকারি কথা আছে। আমি ভাবলাম—তোদের পাড়ার আমি জামাই হবো। দেখ না ভাই—চোখে লাগার মতো যদি কোনো মেয়ে থাকে?

রঘুনাথ হাসবে না কাঁদবে বুঝে পেল না। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল, তাকে অবাক করে দিয়ে সবুজ বলল, আমি শুভর মতো ভালোছেলে জীবনে আর হবো না। আমার যা হবার হয়ে গিয়েছে। দ্যাখ না রঘু, আমার জন্য যদি কোনো ব্যবস্থা হয়। বিশ্বেস কর—আমি কোনো পণ নেব না। কথা দিচ্ছি—বুড়োমাতলায় গিয়ে বিয়ে করব। তোরা সব সাক্ষী দিবি। কি রে দিবি তো?

রঘুনাথ অনেকক্ষণ পরে গলা ফাড়িয়ে হাসল। শুভ ব্যাপারটাকে হাল্কা করার জন্য বলল, পাগলের কথা বাদ দে তো! পাগলে কী না বলে—ওসব কথা মনে রাখতে নেই।

সবুজ মনোক্ষুণ্ণ হয়, সত্যি কথাকে তোরা কেন গুরুত্ব দিস না বল তো। জানিস আমার দাদু

পনের বছরে বিয়ে করেছিল। তার পরের বছর আমার বাবা হয়। বলতো কি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ওদের!

ঘরে যাওয়ার জন্য তাড়া ছিল রঘুনাথের, এতটা রাস্তা ফাঁকা বাঁধের ওপর দিয়ে একা যাওয়া মুখের কথা নয়। সাঁঝ নেমে এলে পথঘাট সব শুনশান হয়ে পড়ে, চরসুজাপুর-দোয়েমের রাস্তাটা একলা শুয়ে থাকে আঁধার বুকে জড়িয়ে। দশ দিনও হয়নি সুজাপুরের ঘোষেদের লোকটার সাইকেল কেড়ে নিয়েছিল কারা যেন এই বাঁধের গোড়ায়। শুধু সাইকেল ছিনিয়ে নিয়ে তারা শান্ত হয়নি, মানুষটার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে সর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে গেল। গাঁয়ে-ঘরে এসব ঘটনা এখন আকছার ঘটছে।

রঘুনাথ ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, বেলা মরে গেল, এখুন আমি যাই।

শুভ মন খারাপ করা চোখে তাকাল। তুই চলে গেলে ভাল্ লাগে না। আবার কবে আসবি রঘু?

—সময় পেলেই চলে আসব। রঘুনাথ ওদের কাছ থেকে দ্রুত আলাদা হতে চাইছিল তখনই হাসপাতালের স্টাফ অরূপবাবু কোঁচা দুলিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক গায়ে পড়া নন তবে যেচে কথা বলার স্বভাব, এই যে তোমরা তিনজনে মিলে কী পরিকল্পনা করছো? আচ্ছা সামনে তোমাদের পরীক্ষা না? এখন গুলতানি দেওয়া কি উচিত? মনে রেখো—ছাত্রনাং অধ্যয়নং তপঃ।

শুভ তার বিরক্তি নিজের ভেতর লুকাতে চাইল। সবুজ উশখুশিয়ে উঠে ঘাসের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। রঘুনাথ এসবের ধার ধারে না। লেখাপড়া তার ধাতে নেই ফলে লেখাপড়ার চর্চা হলে তার মাথায় কিছু ঢোকে না, লেখাপড়া সংক্রান্ত আলোচনাগুলো আকাশের পাখির মতো তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়, নিজেকে সে তখন খুব অসহায় বোধ করে এবং হীনমন্যতায় ভোগে। দ্রুত আঁধার নেমে আসা চরাচরে আলোর স্বল্পতা তার চিন্তা উদ্বেগকে আরো ক্ষিপ্র করে তোলে, সে অস্থির হয়ে বেরসিকের মতো বলে, আমি যাই রে, বড্ড দেরি হয়ে গেল!

—এই যে তুমি, আমি তোমাকে বলছি—এই ভর সন্ধেবেলা তুমি কোথায় যেতে চাইছ? অরূপবাবুর টানা টানা, বিকৃত-স্বরের কথাগুলো মোটেও সুখ দিল না ওদের, শুভ মাথা তুলে সাহস করে বলল, কাকু ওর নাম রঘুনাথ। শেরপুর ধাওড়াপাড়ায় থাকে। ও সকালে ডাকাত দেখতে এসেছিল। এখন ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

—ওঃ, দ্যাটস গুড! অরূপবাবু চশমা নাকের উপর ঝুলিয়ে তাকালেন, কি নাম বললে যেন?

—রঘুনাথ। সবুজ ঠোঁট টিপে হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল, অরূপবাবুকে সে একদম সহ্য করতে পারে না। মানুষটার বিকৃত স্বভাব। চিবিয়ে কথা বলার প্রবণতা তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয়। মানুষের মন বোঝার ক্ষমতা বুঝি অরূপবাবু হারিয়ে ফেলেছেন।

রঘুনাথ ওদের সম্মতির তোয়াক্কা না করে হনহনিয়ে হেঁটে গেল হাসপাতালের গেট পর্যন্ত। তাকে চলে যেতে দেখে এক ছুটে শুভও পৌঁছে গেল হাসপাতালের গেটে। রঘুনাথ শুভর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল, আবার আসব রে। ইবার আসলে হাতে সময় নিয়ে আসবখন। তেমন দরকার হলে তোদের ঘরে থেকে যাব।

—এবার যখন আসবি, বাঁশি নিয়ে আসবি। রাতেরবেলায় বাঁশি শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। শুভ রাস্তার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। রঘুনাথ অন্ধকারে দেবদারু গাছের মতো শিরদাঁড়া সোজা করে হেঁটে যাচ্ছে। তার স্বাভাবিক গতিতে অন্ধকার কেটে যাচ্ছে লেবু চিপকানো দুধের মতো।

এক একদিন কুয়াশার দল বুড়িগাঙের জলের উপর ভেসে বেড়ায় মাছের গুঁড়ি গুঁড়ি ডিমের মতো, হাওয়া এলে ওরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, বাতাসে ভাসতে ভাসতে মজাসে চলে যায় বহু দূরে, ওরা জানে রোদ উঠলে ওদের আর কেরামতি সাজবে না।

খুব ভোরে ওঠা দুর্গামণির স্বভাব। উঠোন ঝাঁটাতে গিয়ে তার হঠাৎ নজরে পড়ল ঢিলির উঁচু হওয়া পেটখানা। ঢিলির যে এই উন্নতি হয়েছে ঘুণাক্ষরেও জানত না দুর্গামণি। ফলে সকালবেলায় ঢিলিকে দেখে সে অবাক না হয়ে পারল না।

গোরুর গাড়ির চড়া পড়া পথটা সোজা চলে গিয়েছে গ্রামের ভিতর। সেই পথের পাশ ঘেঁষে কঞ্চির বেড়া। বেড়ার উল্টোদিকে সিঁদুর পড়লে তোলা যাবে এমন ঝকঝকে তকতকে নিকোনো উঠোন।

উৎসাহ আর আগ্রহ চাপতে অক্ষম হল দুর্গামণি, হাতের নারকেল ঝাঁটা মাঝ উঠোনে ফেলে সে এগিয়ে গেল ঢিলির কাছে। ঢিলিও তাকে দেখতে পেয়ে বেড়ার কাছে মুখ উঁচিয়ে দাঁড়াল, হা দিদি গো, কৎদিন পরে আমি তুমারে দেখলাম।

দুর্গামণির উৎসুক্য হারিয়ে গেল। সে শুধু চোখ ভরে দেখতে লাগল ঢিলির বদলে যাওয়া শরীরের গড়ন। এক সময় উৎসাহ চেপে না রাখতে পেরে শুধালো, তুর কি হয়েচে রে ঢিলি, এতদিন কুথায় ছিলিস? ঢিলি হালকা ভাবে হাসল, কুথায় আর যাবো দিদি, মরতে গেচিলাম। তখুন মাথার আমার ঠিক ছিল না। কে যে কখন আমারে বিষ ঢেলে দিল টের পেলাম না। হা দিদি, আমার এমুন পুকাড়ে ভাগ্য যে চিটেধানেও বীজতলায় ফলন হলো। সেই জ্বালায় তুমার দেওর মরচে। আমারে গলা টিপে মারতে চাইল দু-তিনবার। দু-তিনবারই মা শীতলাবুড়ি আমাকে বেঁচিয়ে দিল। নইলে কবে আমি মরে ভূত হয়ে যেতাম! তুমার সাথে আর দেখাই হত না।

—চুপ কর মুখপুড়ী, অমন কতা আর বলিস নে! চাপা গলায় সতর্ক করল দুর্গামণি।

ঢিলি হাসল না, শুধু শরীর ঝাঁকিয়ে কেমন অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠল, কেনে চুপ করব দিদি, কিসের জন্যি? তুমার দেওর আমারে দুনিয়া থিকে সরিয়ে দিতে চায়। ও আমাকে মারবে তারপর দম লিবে। তবে আমিও বুনো-ঘরের ঝি। ওর মনোবাসনা আমি পূর্ণ হতে দিব না।

—চুপ কর, শান্ত হ। দুর্গামণি বড়ো দিদির মতো তাকে বোঝাল, যে এসেচে সে তো তুর সন্তান। অন্যকে সাজা দিতে গিয়ে পেটেরটাকে সরিয়ে দিবি নে। শরীরের ফুল আর গাছের ফুলের মধ্যে শুধু এইটুকুন ফারাক থাকে।

ঢিলি কথা বলতে পারল না, ওর ঠোঁট কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। দুর্গামণির মুখের দিকে তাকিয়ে সে কেঁদে উঠল ঝাঁকুনি দিয়ে, আমি মরব দিদি, মরব। আমি না মরলে ওর হাড়ে বাতাস লাগবে নি যে! ঢিলি চোখ মুছে নিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল।

দুর্গামণি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, লক্ষ্মী বুন আমার, মাথা গরম করিস নে।

ভিকনাথের বউটারে আমি বুঝিয়ে বলব, সে যেন ক'দিন বাপের ঘর থিকে ঘুরে আসে।

—সে ঢেমনী তুমার কথা শুনবে নি। ঢিলি জোর গলায় বলল, লেড়ি কুত্তির লেজ কি কখনো সোজা হয় গো। যতই সোজা করো—সেই লেজ আবার যেই কে সেই।

—তবু চিষ্টা করতে দুষ কুথায়?

ঢিলি পানসে হেসে বলল, না, দোষের কিছু নাই। তবে কি জান দিদি, মেয়ে দুটো আমার পর হয়ে গেল! যেদিন শুনেচে আমার ছানাপুনা হবে সেদিন থিকে কথা বলে না। ওরা আমাকে ঘেন্না করে। নূপুরটা তো মুখের উপর বলে দিল, অমন মায়ের মুখ দেখাও পাপ।

—এসব লিয়ে ভাববিনে। নিজের রক্ত কুনোদিন পর হয় না।

—সে আমি জানি গো তবু মনটা কেমুন কেমুন করে।

দুর্গামণি আন্তরিকতার সঙ্গে বলল,আগড় খুলে ভেতরে আয়। কৎদিন মুখোমুখি বসে তুর সাথে কথা বলিনি—

—যাব না দিদি, মেলা কাজ আচে। পরে আসবখন। হাওয়া যেমন যায় ঢিলি তেমনই চলে গেল।

সংসারের ঝামেলায় ঢিলির কথা ভুলে গিয়েছিল দুর্গামণি, হঠাৎ পাড়া ঘুরে এসে রঘুনাথ দ্বিধার সঙ্গে বলল, জানো মা, কাকিরে আবার পাওয়া যাচ্চে না। কাকারে দেখলাম মুকামপাড়ার দিকে যেতে। আমার সাথে চোখাচোখি হল কিন্তুক কথা বলল না।

—তাব কি মাথার ঠিক আচে বাপ? দুর্গামণি সহজভাবে বলল, ওই মানুষটার মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল দশা। ও বলে এখুনো ঘুরচে-ফিরচে। অন্য কেউ হলে নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যেত।

—কাকা নিজের দোষে নিজে পাগল হয়েচে। কথাগুলো রঘুনাথ ফস করে বলে ফেলল।

অসহিষ্ণু চোখে তাকাল দুর্গামণি, তার চোখে মুখে বিরক্তির ঝাঁঝ ফুটে উঠল, তুই অতোটুকুন ছেলে, তুই কি বুঝিস মানুষের দুঃখ-জ্বালা। হট করে কারোর সম্বন্ধে কুনো কিচু বলা উচিত লয়। সব দিক বেচার-বিবেচনা করে কথা বলতে হয়। নাহলে লুকে তুরে বুকা ভাববে।

এতটা কড়া উত্তর মায়ের কাছ থেকে আশা করেনি রঘুনাথ, জবাব শুনে সে নিষ্প্রভ চোখে তাকাল, কাকি নাকি আর কুনোদিন ভালো হবে না? এসব কথা সত্যি, মা?

—আমি জানি নে যা। দুর্গামণি মুখ ঝামাটা দিয়ে উঠল, ছোট মুকে বড়ো কতা বললে খারাপ শোনায়। তুই আর এসব নিয়ে কুনোদিন কিচু বলবি নে।

রঘুনাথের বুকের ভেতরটায় বুঝি পাখি উড়ছিল, সে ছটফটিয়ে বলল, কাকি যে কুথায় গেল কে জানে।

দুর্গামণি রঘুনাথকে বুঝিয়ে বলল, তুর কাকি যেখানেই থাকুক তার দেখা আমরা ঠিক পাবই পাব। এ অবস্থায় সে বেশি দূর যাবে না। যাওয়া তার পক্ষে সম্ভবও নয়।

রঘুনাথ চলে যাওয়ার পর ঢিলির চিন্তায় দুর্গামণির মনটা অস্থির হয়ে উঠল। বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটা প্রশ্ন তার মনে উঁকি দিয়ে গেল—ঢিলিটা গেল কুথায়? তিন দিন ধরে বুনটা যাবে কুথায়?

তিন দিন নয় সাত দিনের মাথায় ঢিলিকে দেখে জ্ঞান হারাল নূপুর। টিপটিপে বৃষ্টিতে সকাল থেকে মেঘে ছেয়েছিল আকাশ। কাপড়চোপড় শুকানো দায়। একটু রোদ উঠলে আবার শুরু হয় বৃষ্টি। কখনো ঝিরঝিরে, কখনো মোটা দানার বৃষ্টি। আধ শুকনো কাপড় তুলতে এখন নূপুরকে ছুটে আসতে হয় বাইরে। কার এত সময় আছে হাতে যে বারবার ছুটে আসবে।

মাটির ঘরের দোতলা ছাদটা প্রায়ই ফাঁকাই পড়ে থাকে লুলারামের। বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা সামনের জায়গাটা। ফাঁক ফাঁক বেড়ার মতো। হাওয়া-বাতাস খেলে বেড়ায় সেই ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে।

তালগাছ চেরাই করে তাতে আলকাতরা বুলিয়ে চালের কাঠামো তৈরি করেছে লুলারাম। ঢালু হয়ে নামা চালের খড় দাওয়াকে ছায়া দিচ্ছে সবসময়। সেখানে মোটা রশা এ মুড়ো থেকে সে মুড়ো বেঁধে দিয়েছে লুলারাম।

নূপুর সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে উঠে এল ছাদে। দরকার ছাড়া ছাদে তার ওঠা হয় না। কেন ছাদে উঠবে সে? দোতলার ছাদে মোট একটাই ঘর। সেই ঘরে একটা মাত্র ছোট জানলা। পেছনের আমগাছ ডিঙিয়ে যেটুকু আলো আসে সেইটুকু আলোই ঘরের চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট।

দড়িতে কাপড় মেলতে গিয়ে নূপুর কী মনে করে ঘরের দিকে তাকাল। ঝুলন্ত দুটো পা দেখে সবার আগে তার ভূতের কথা মনে হল। দিন দুপুরে ভূত অবিশ্বাস্য। টুকি দিয়ে দেখতে গিয়েই তার গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল আর্তনাদ। 'বাবা গো' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নূপুর।

তার আর্তচিৎকার লুলারামকে উঠিয়ে আনল দোতলায়। নূপুরকে দেখার আগে সে দেখতে পায় ঢিলির লাশ। সায়ার খোলে হাওয়া ঢুকে ঘাঘরার মতো গোল হয়ে আছে চারপাশ। চুল ছড়িয়ে আঁধার পুরো মুখ। ফুলে ফেঁপে যাওয়া সেই মুখ আর চেনা যায় না। ঢিলির গায়ে কোনো জামা ছিল না ফলে তার পৃথুলা স্তন দুটো বরফের চাঁইয়ের চেয়েও শক্ত হয়ে লেপটে আছে বুকের নিচে। বিকৃত মুখ থেকে জিভ বেরিয়ে ঝুলে আছে বাঁ দিকে, সেই জিভের রঙ লালচে নয়, ফ্যাকাসে সাদা। শাঁখা রুলি-পলা সেঁটে গিয়েছে ফুলে ফেঁপে ওঠা হাতে। মাছি উড়ছিল ভনভনিয়ে। চতুর্দিকে নাক ঝাঁঝিয়ে ওঠা দুর্গন্ধ।

এক ঝটকায় লুলারামের বমি বেরিয়ে আসতে চাইল। ধুতির খুঁটে নাক চাপা দিয়ে বাইরে এসে ভেঙে পড়ল সে কান্নায়। ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে দোতলার ছাদটাতে। পাড়ার ছেলে বুড়ো এমনকী বউরা-মেয়েরা এসে জড়ো হয়েছে উঠোনে।

নাকে-মুখে গামছা বেঁধে ঢিলিকে নামানো হল কড়িকাঠের ফাঁস কেটে। ঢিলি তার পরনের শাড়িটাকে শেষ সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছে।

নূপুরের জ্ঞান ফিরতেই তার প্রথম প্রশ্ন, আমার মা কোথায়? ও বাবা, আজ তোমার জন্য আমরা মাকে হারালাম!

নূপুরের এই কান্না শুধু অন্ধ আবেগ নয়, এর মধ্যে অনেক সত্য মিশে আছে। চোরাকুঠুরীতে নিয়ে তার মাকে গুম করে দিতে চেয়েছিল লুলারাম। এই চেষ্টা সে পরপর তিন বার করেছে। তিন বারই মা শীতলাবুড়ি ঢিলিকে শক্তি জুগিয়েছে রুখে দাঁড়াবার।

রুখে দাঁড়ালেও নিজের প্রতি ঘেন্না জন্মেছিল ঢিলির। অমন সোয়ামীর সে আর ভাত খাবে না, অমন সোয়ামীর ঘর সে আর করবে না। সে মরবে।

গুমঘরে লুলারাম তিন ব্যাটারির টর্চ মেরে হন্যে হয়ে খুঁজছিল ঢিলিকে। এমনকী গভীর কুয়োটায় বউটার কোনো অস্তিত্ব নেই। তাহলে গেল কোথায়? যেখানেই যায় যাক,আর না ফিরলেই ভালো! যদি ফেরে তাহলে গুমঘরের মরণকুয়ায় তার শেষ কাজ সম্পন্ন হবে। কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না।

—সাতদিন পরে এ কী বিপদ! লুলারাম কপাল চাপড়ে কেঁদে উঠল। এ কান্না লোক দেখানোর কান্না। এ কান্নার গতি বাড়ল যখন চুনারাম এসে সহানুভূতির হাতটা তার পিঠে রাখল।

—চুপ কর বাপ, মানুষ কি চিরদিন থাকে রে! মানুষ হল গিয়ে কচু পাতার জল, সামলে না রাখলে জল টলমল। চুনারামের কথা শুনে লুলারামের দাঁত লেগে যাবার জোগাড়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে যেন পুরো শরীরটাকে শিমুল তুলোর চাইতে হালকা করে দিল।

শ্মশান থেকে ফিরে বেদম মদ খেয়েছিল ভিকনাথ। হাঁটা চলার ক্ষমতা ছিল না তার। ফিনফিনে

জ্যোৎস্নায় শীত ভেসে আসছিল বুড়িগাঙ ডিঙিয়ে। ঢিলি মারা যাওয়ার পর থেকে ভিকনাথের মনে এক ফোঁটাও শান্তি নেই। সে ঢিলির মৃত্যু চায়নি, সে চেয়েছিল লুলারাম যেন সুফল ওঝার অগ্নিবাণে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়। পাপীকে শাস্তি দিতে গিয়ে কী কাণ্ড বাঁধিয়ে বসল সুফল ওঝা।

চিতা ধরানোর আগে থেকে গলায় মদ ঢালছিল ভিকনাথ। ঘরে ঝারি তার নেশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নাঁকিসুরে আহ্লাদ করে সে বলেছে, আমার আর ইখানে থাকতে মন করচে না। তুমি আমারে বাপের ঘরে দিয়ে আসবে চলো।

ঝারি কেন চলে যেতে চায় ভিকনাথের তা অজানা নয়। ঢিলির আত্মহত্যার কারণ ঝারিও হতে পারে। বিশেষ করে নূপুরের কান্নায় সেই ঝাঁঝ পেয়েছে অনেকেই। ঝারির এখন পাড়া থেকে চলে যাওয়া মঙ্গলের। লুলারামের সঙ্গে লতায়-পাতায় সম্পর্কটা এখন ন'মাসের পেটের মতো স্পষ্ট ভাবে দেখা দিয়েছে সবার চোখে। ভিকনাথ ঝিঁঝি কানা। তাই সে দেখেও কিছু দেখতে পায় না। পাগল হয়ে সে এখন সুফল ওঝার পেছন পেছন ঘুরছে। সুফল ওঝাও কম ঘুঘু নয়, তার হাত দিয়ে ছাই গলে না, সে আবার প্রাণভরে মন্ত্র দেবে কি করে?

চিতা নিভিয়ে ফিরে গিয়েছে শ্মশানযাত্রী।

বাবলা গাছে ঠেস দিয়ে নেশার ঘোরে বসেছিল ভিকনাথ। তার কিছু দূরে হাত-পা ছড়িয়ে বালির উপর শুয়ে পড়েছে মদে ক্লান্ত সুফল ওঝা। মাঝেমাঝেই কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল ওর, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সব ছারখার হয়ে যাবে। এই তো খেল শুরু।

কথাগুলো সহ্য হল না ভিকনাথের। সুফল ওঝার বুজরুকি সে ধরে ফেলেছে। কথায় চিঁড়ে ভিজে না, কথায় শুধু ছলনা।

সুফল ওঝা জড়ানো গলায় বলল, ঢিলিকে শেষ করে দিলাম, এবার লুলাটাকে দেখব। ওর বড়ো বাড় বেড়েচে। ওর বাড় আমি ভাঙব। তারপর বুড়িগাঙে ডুব দিয়ে দায়মুক্ত হবো।

—কেনে মিচে কতা বলচো ওস্তাদ! রাগে চোখের তারা ঠিকরাতে শুরু করে ভিকনাথের, তুমার মুরোদ আমার জানা আচে। তুমি হলে গিয়ে খেলনা বাঘ, হাঁ করলে খড় বিচুলি বেরিয়ে পড়ে।

—কী বললি?

—যা বললাম তা তো নিজের কানে শুনতে পেলে! মাকালফল দেখেচো? দেখতে সোন্দর পারা। কিন্তু ভেতরটায় গু-গোবর পোরা। কুনো সুয়াদ নেই, ঘেরান নেই। তুমি হলে গিয়ে সেই মাকাল ফল। ভিকনাথ মুখের লালা হাতের চেটোয় মুছে নিল।

—তবে রে শালা, যে পাতে খাওয়া সেই পাত ফুটো করা? হাঁপাতে লাগল সুফল ওঝা, তুর অতি বাড় বেড়েচে, ইবার হাতেনাতে তার ফল পাবি। তুর এমন দশা করে ছাড়ব যে ডুবে মরতেও জল পাবি না।

—মেলা ফ্যাচর ফ্যাচর করো না তো? মাথায় রাগ চড়ে গেলে ওস্তাদ বলে রেহাই পাবে না। ভিকনাথ খোলা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। বিড়বিড়িয়ে উঠল তার ঠোঁট, মা গঙ্গাবুড়ি, আমারে শক্তি দাও। হারামীটার হাড় যেন আমি ভেন্‌গে দিতে পারি।

সুফল ওঝা টলোমলো পায়ে এগিয়ে এল ভিকনাথের সামনে। বুক চিতিয়ে সে হুঙ্কার দিয়ে বলল, গুরুর মুখে মুখে জবাব দিচ্ছিস, তুর ভালো হবেনি বলে দিচ্চি। এখনও সময় আচে নিজেকে সামলা। নাহলে পোড়া কাঠের মতুন তুর এই দেহ গাঙ্গের জলে ভেসে যাবে।

দাঁতে দাঁত চেপে রাগে গরগরিয়ে উঠল ভিকনাথ, তারপর বুনো হাওয়ার মতো চোখের

পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুফল ওঝার গায়ের উপর। এত আচমকাই ঘটনাটা ঘটল যে সুফল ওঝা নিজেকে বাঁচাবার আর সময় পেল না।

বালিয়াড়িতে জমে উঠল দু-জন মাতাল মানুষের জীবনমরণ লড়াই। গঙ্গা বয়ে যাওয়ার শব্দ হচ্ছিল কুলকুল। ভিকনাথ আক্রোশে সুফল ওঝার মুখ ঠুসে ধরেছে বালিতে, বল শালা, তুই আমার বউয়ের দিকে কেনে লজর উঠিয়ে দেখেচিলিস? ঘরে তুর বৌ নেই? শালা রাঢুয়া, শালা লুলার ভাই! আজ তুর গুষ্টির ষষ্ঠী পুজো করে ছাড়ব।

—ছাড়রে, ছাড়রে! বালিতে সুফল ওঝার দম আটকে যাবার জোগাড়, সেদিকে কোনো হুঁশ নেই ভিকনাথের। সে চুলের মুঠি ধরে ক্রমাগত মাথা ওঠায়, আবার নামায়। কখনও বা শূন্যে মাথা তুলে পাগলের মতো ঝাঁকায়, আমার বউরে তুই রাঁঢ় রাখতে চাস, দাঁড়া তুর দেখাচ্ছি মজা! মন্ত্রফন্ত্র সব তোর গুহ্যদ্বারে ঢুকিয়ে দেব। মানুষ ঠকিয়ে বড়োলোক হওয়ার বাসনার বেলুনটা আমি বেবুর-কাঁটায় ফুটা করে দেব।

চাঁদ গড়িয়ে যায়, জেলে নৌকো ভাসে গাঙের জলে। জ্যোৎস্নায় চকচক করে বালিচর। দু-জন মাতাল এক সময় গা-হাত-পা এলিয়ে শুয়ে থাকে দু-দিকে, যেন মানুষ নয়, চরে বেকায়দায় আটকে যাওয়া দুটো দিকভ্রান্ত পথহারা বোয়ালমাছ।

সকালের আলো চিকচিক করছিল মোটা দানার বালিতে পড়ে। রোদের নরম কামড়ে গা গরম হয়ে উঠছিল ভিকনাথের। হঠাৎ গাঙের দিকে তাকিয়ে তার ঝারির কথা মনে পড়ল। ঝারি কী চায় তার কাছে। হলদিপোঁতা ধাওড়ার সব চাইতে সুন্দরী বউ সে, পাড়ার অন্য কোনো বউয়ের সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার মেলে না। সে যেন আকাশ থেকে ঠিকরে পড়া নক্ষত্র। তার দীর্ঘদেহ তরলা বাঁশের মতো সুন্দর, মেদহীন। কাচবরণ শরীরে লাবণ্যর কোনো কমতি নেই। মুখখানা এতই কোমল যেন তা বুড়িগাঙের এঁটেল মাটির চেয়েও নরম এবং লতলতে। ভাসা ভাসা চোখ দুটোয় সর্বদা বিছিয়ে থাকে অপার মুগ্ধ বিস্ময়। দীর্ঘাঙ্গী শরীরের ঢেউ তোলা খাঁজ-ভাঁজ সব যেন মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ঝারি তার কাছে কী চায় ভিকনাথ ভাবল। অমনি মনের ভেতরে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চের স্রোত বয়ে গেল তাকে পরাজিত করে। ভিকনাথ বুঝল তার পক্ষে ঝারিকে ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। ঝারি তার হৃৎস্পন্দন। রাতের ঝারি তার সারা দিনের সালসা।

নেশা ছেড়ে যাওয়ার পর শরীর যেন হালকা লাগে ভিকনাথের। দু-হাতে ভর দিয়ে সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। প্রবাহিত গঙ্গার সামনে মানুষ নিজেকে বুঝি আবিষ্কার করে অপার মুগ্ধতায়। যে কোনো জলের একটা অদৃশ্য মন-কেমন করা শক্তি থাকে। সেই অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ভিকনাথের হঠাৎ মনে পড়ল সুফল ওঝার মুখখানা। গত রাতের পরপর ঘটনাগুলো তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল, এক সময় হাঁপিয়ে উঠল সে। বিবেকের তাড়নায় সে সুফল ওঝাকে দেখতে চাইল আশেপাশে। দৃষ্টির চারপাশে সে শ্মশানের হালকা ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। ঠিক মন খারাপ নয়, এক ধরনের শূন্যতা কিংবা নিঃসঙ্গতায় সে কেমন অসহায়বোধ করল নিজেকে। কাল রাতে নেশার ঘোরে অমন কাণ্ড না করলেই বুঝি ভালো হত। হাজার হোক সুফল ওঝাকে সে গুরু বলে মেনেছে। গুরু নিন্দে, গুরুর অপমান-অমর্যাদা ধর্মে সয় না। এ ঘোরতর পাপ।

ভিকনাথ জলের কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। দেশী মদের বাসি ঘ্রাণে মুখটা কেমন বিস্বাদ হয়ে আছে। আঁজলা ভরে জল তুলে নিয়ে কুলকুচি করল সে। ভালোমতন চোখে-মুখে জলের

ছিটে দিল। অতীতকে নেড়ে ঘেঁটে আর বিশেষ লাভ হবে না। অতীত ইঁদুরের গর্তের মতো, একবার ঢুকে গেলে সেই ঘুলঘুলি থেকে বেরনো দায়।

ভিকনাথ হাঁটতে লাগল ঘরের দিকে। ঝারির জন্য তার মন বড়ো অস্থির হয়ে উঠল নিমেষে। ঝারিকে ঘরে একা রেখে আসা উচিত হয়নি তার। ঝারির মন ফুলের চেয়েও নরম, তপতপে। সেখানে যে কেউ পাপের স্পর্শ দিয়ে দিতে পারে। ঝারি তো মাটির মতো। মাটিকে যে কেউ নাড়তে ঘাটতে পারে।

সুফল ওঝার নেশা ছুটে যাবার পর লাল কাপড়ে মোড়ানো পুঁটলিটা বগলদাবা করে নিশ্চয়ই গাঁয়ে ফিরে গিয়েছে। জ্যোৎস্না রাতে ওষুধের জন্য গাছের শেকড় তুলতে বেরয়। রাত জাগা তার অভ্যাস। গুণিন বিদ্যের ঘোরে সে ঝড়ো বাতাসের চেয়েও অস্থির। এই অস্থিরতা কেবল তাকেই মানায়। ভিকনাথ তার পেছন পেছন ঘুরে কি পাবে? ফলাফল শূন্য। ঝারি তাকে বারবার করে বুঝিয়েছে—যেও নি গো। যার পেছনে ঘুরচো সে হল গিয়ে সাহেব মাঠের ভূত-আলো। দুর থিকে দেখতে পাবা, কাছে গেলে কিচু নেই। আলেয়ার পেছনে ঘুরে নিজের শরীল এলিয়ে কী পাবে তুমি?

—আমি ওঝাগিরি শিখে তুরে সুখে রাখব বউ। ভিকনাথের চোখে স্বপ্ন চিকচিকিয়ে উঠল।

সেই স্বপ্ন তাকে নিশি পাওয়া মানুষের মতো টেনে নিয়ে যায় সুফল ওঝার পেছন-পেছন। লুলারামকে বাণ মেরে মারতে পারলে তার বুকের গভীরে উথলে ওঠা ক্রোধের নদীটা কিছুটা হলেও শান্ত হবে। ঝারি তখন পুরোপুরি তার বুকের ছায়ায় চলে আসবে। একটা মন দু-ফাঁক রাস্তার মতন হয়ে গেলে কোন রাস্তাটা যে কার বোঝা দায়। মন যদিও বা দুটো হয়, শরীর তো দুটো হয় না। ভিকনাথের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল হাঁটতে হাঁটতে।

ঝারি তার সঙ্গে বেইমানী করেছে। মাঘ মাসে পরবের সময় বিয়ে হয়েছিল তার। প্রথামত ঘরের চালে উঠে গিয়েছিল ভিকনাথ। ঝারি তাকে গান গেয়ে গেয়ে তোয়াজ করে নামাল, নেমে এসো গো/রেঁধে বেড়ে খাওয়াব গো/ভালোবাসায় নাওয়াব গো/ নেমে এসো নেমে এসো গো, ও আমার প্রাণের নাগর/ভরা যৌবন জিয়োনো কই, বুক হয়েছে ডাগর।

পাঁচুই গিলে টলতে টলতে গান গাইছিল ঝারি, তার সাথের মেয়েরা সুর ভাসিয়ে হাতে হাত ধরে নাচছিল ভাদোর মাসের লকলকিয়া আখগাছের মতন। সেই সুখের দৃশ্য মানুষের জীবনে খুব কম আসে। ভিকনাথ চোখ মুদলেই এখনও শুনতে পায় ঝারির সুরেলা গান। চুল্লুর নেশার চাইতেও বেশি নেশা হয় তখন। সেই ঝারি এমনভাবে বিকিয়ে দেবে নিজেকে লুলারামের কাছে? জীবন থাকতে এসব মেনে নেওয়া ভীষণ কষ্টের। এর চাইতে হাত ঢুকিয়ে বুকের ভেতর থেকে কলজে উপড়ে আনা সহজ কাজ।

নেশা কেটে গেছে তবু যেন পা জোড়া টলতে থাকল ভিকনাথের। লুলারাম তার বুকে শেয়ালকাঁটা গাছ পুঁতে দিয়েছে। ঝারি সেই গাছটাতে জল দেয়। কোনোদিনও চেষ্টা করে না গাছটাকে তুলে ফেলে দিতে। এ কেমন সম্পর্ক কিছুই মাথায় ঢোকে না লুলারামের। ছোটবেলায়, মনে পড়ে তার মামাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশে। কাকে যেন খুন করেছিল মামা। নারীঘটিত কেস। বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি দিয়ে জেলে গিয়েছিল মামা। সে সময় দাদুর জমিজমা এমনকী থালা বাসন ঘটি বিক্রি হয়ে যায় কেস চালাতে গিয়ে। একরকম পথের ভিখারি হয়ে যায় ওরা। এত কিছুর পরেও মামাকে মনে মনে সমর্থন করে ভিকনাথ। মামা সমাধান চেয়েছিল, সমাধান করেই ছেড়েছে। ভিকনাথের বিচারে ঝারিও কম অপরাধী নয়, সে যাত্রাদলের সখীগুলোর মতো নাটুকে

ব্যবহার করছে। রোজ একটু একটু করে সরলতা খুন করছে ঝারি। পাপ আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে সে প্রমাণ করতে চাইছে—কত বড়ো নির্দোষ। ফুলে দাগ লাগলে সহজে তা নজরে পড়ে। ফুলেরও কলঙ্ক থাকে। সেই কলঙ্ক দাগ ফুল না ঝরে যাওয়া পর্যন্ত নিজের অস্তিত্বকে জাহির করে যায়। এমত অবস্থায় ভিকনাথের কি কর্তব্য সে বুঝে উঠতে পারে না। তার মাথা টলে ওঠে। ঝিনঝিন লাগে পায়ে। মনের মধ্যে সমস্যার ঘূর্ণিগুলো দলা পাকায়। চোখের কোণ দুটো কট্‌রা ব্যাঙের মতো কটকটিয়ে ওঠে। চোখ রগড়ে নিয়ে সামনে তাকাতেই সে দেখতে পেল শ্মশানের ডোম হরনাথ লাল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

হরনাথের চোখ জোড়া বলে দিচ্ছিল ঢিলিকে পোড়ানোর পর সে রাতভর ঘুমায়নি। নেশার মধ্যে ডুবে থেকে রাত পার করে দিয়েছে সে। লোকে বলে, মানিকডিহির ঘাট কোনোদিন ফাঁকা যায় না। ঘাট ফাঁকা গেলেও শ্মশান থাকে জমজমাট। শেরপুরের হরনাথকে কে না চেনে এই গ্রামের। দশ গাঁয়ের লোকে জানে তাকে। ঘর সংসার হরনাথের সব ছিল। বানের বছরে ঘর গেল, বউ-মেয়ে দুজনেই চলে গেল। সে বছর পুবে খাটতে গিয়েছিল হরনাথ। বউ-মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে গাঁয়ে এসে সে দেখল শূন্যঘর, নিমগাছের ডালে বসে দুপুরবেলায় কা-কা করে ডাকছে কাক। তাকে দেখে পাড়াপ্রতিবেশীরা ভিড় জমিয়ে শুকনো মুখে বলল, বড়ো দেরি করে এলি রে! কী করব, চারদিকে থৈ থৈ করচে জল। মানিকডিহির শ্মশানেও ডুব জল। উপায় না দেখে পচা লাশ বানের জলে ভেসিয়ে দিলাম।

তাদের হাহাকার বানানো নয়, বুকের গভীর থেকে উঠে আসা। ফাঁকা ঘরে সারারাত কাঁদল হরনাথ। পাশের বাড়ির টগরী তাকে বুঝিয়ে বলল, ও কাকা, কেঁদো না গো, তুমি কান্‌লে আমি আর চোখের জল এটকে রাখতে পারব না! আমিও তুমার সাথে গলা ফাড়িয়ে কাঁনব।

টগরী আর শিউলি মিতে পাতিয়েছিল জুনানপুরের কালীতলায়। জুড়ানপুরের মা কালী বড়ো জাগ্রত। সবাই বলে—ওখানে মিতে পাতালে সে জোড় নাকি কুনোদিনও ভাঙে না।

টগরী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, কাকা গো, আমাদের জোড় ভেঙে গেল গো! শিউলি আমারে বলেছিল, এবার বড়ো পুজোয় দু-জনে মিলে নাগরদোলায় চাপব। আমাদের আর নাগরদোলায় চাপা হল নি গো-ও-ও-ও। টগরী সশব্দে কেঁদে উঠেছিল।

রাতটা কোনোমতে কাটিয়ে পরের দিন বড়ো গঙ্গার পাড়ে চলে এসেছিল হরনাথ। মা গঙ্গার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের ঝাঁকড়া চুল আক্রোশে চেপে ধরে সে অঝোরধারায় কাঁদল। ডুবা শাক খেয়ে পেটের দায়ে মরল তার বৌ আর মেয়ে। ভারতী আর শিউলিকে খাটিয়ায় চাপিয়ে হাসপাতাল অব্দি নিয়ে যেতে পারেনি কেউ। হাসপাতালেও কোমর জল। মালীপাড়ার কাছে বাঁধ ভেঙেছে। জল নামছিল শ'হাতির চেয়েও বেশি চিৎকারে। মালীপাড়া থেকে হাসপাতালের দূরত্ব একটা বিড়িরও পথ নয়। ফলে হাসপাতালের মাঠটাতে জলের তোড়ে কেউ ঢুকতে পারে না ভয়ে। জল থৈ-থৈ হাসপাতালের কর্মচারী আর ডাক্তার চলে গিয়েছেন জীবনের দায়ে নিরাপদ আশ্রয়ে। এই অবস্থায় কে আর ঝুঁকি নিয়ে ওদের পৌঁছে দেবে হাসপাতালে। ফলে সম্পূর্ণ বিনা চিকিৎসায় মারা গেল ভারতী আর শিউলি। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ওদের চিকিৎসায় বাধা হয়ে দাঁড়াল, ভাগ্যের কী পরিহাস মৃত্যুর পরেও মাটি পেল না ওরা। জলে ভাসিয়ে দিতে হল ওদের পচন ধরা লাশ।

এসব ভাবনা হরনাথকে পাগল করে তোলে, বোলতার কামড়ের চেয়েও তীব্র জ্বলনে অস্থির হয়ে ওঠে তার দেহ-মন। টগরীর নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে, আমার শিউলি তোর মধ্যে বেঁচে থাকবে বিটি। কিন্তু তোর কাকিরে আমি আর পাব না। আমার পাপে ওরা চলে গেল। কার জন্যি এ ঘর আঁকড়ে পড়ে থাকব বল? আজ থিকে শ্মশানই আমার ঘর,

শ্মশানই আমার সব। এই বড়ো গঙ্গার জলে ওরা ভেসে গিয়েচে। এই বড়ো গঙ্গায় ওদের শরীল মিশে আচে। যারা শেষবেলায় আগুন পায় না তাদের আমি আগুন দেব। তাদের সৎকার করব। নিজের বউ-মেয়ের তো সৎকার করার ভাগ্য হয়নি। দশের সৎকার করে আমি আমার পাপের বোঝা কম করব।

সেদিন থেকে শ্মশানের কাছে গাঙের পাড়ে কুঁড়ে বেঁধে পড়ে আছে হরনাথ। তার খাওয়া-পরা-শোওয়ার কোনো ঠিক নেই। সারাদিন পথের দিকে সে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে কখন মড়া আসবে, কখন বলহরি হরিবোল ধ্বনি ভেসে আসবে।

দাহ করার কাজে হরনাথের চেয়ে যোগ্য মানুষ এ অঞ্চলে আর দুটি নেই। দাহ শেষ হলে সে কারোর কাছে হাত পেতে দাঁড়ায় না। শ্মশানযাত্রীরা দু'ভাঁড় কাঁচা মদ দিলে তাতেই সে খুশি। সে চায় গ্রামের যত মড়া সব যেন তার হাতে দাহ হয়। মড়া পুড়িয়ে এখন এক ধরনের তৃপ্তি পায় হরনাথ। মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। আনন্দ আর পরিতৃপ্তি গাঙ্গার ঢেউ হয়ে বুকের উপর আছড়ে পড়ে। শিউলি আর ভারতী আগুন আর মাটি পায়নি। আর যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তার জন্য মনে মনে সচেষ্ট থাকে হরনাথ।

মাটির হাঁড়িতে ভাত চাপিয়ে শ্মশানের পোড়াকাঠ সে ঠেলে দেয় তিন মাথার উনুনে। ধোঁয়ার পাশাপাশি লকলকায় আগুন। আর সেই আগুনে নিজেকে কাঁচা মাটির দলার মতো পুড়িয়ে আরও শক্ত করে নেয় হরনাথ। প্রায়ই তার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে। চোখ রগড়ে নিয়ে সে কেমন ঝিমানো চোখে তাকায়। শোক চাম এঁটুলির চেয়েও বেয়ারা, শরীর ছেড়ে যায় না। হরনাথের কালো মহিষ বর্ণ চেহারাটায় রুক্ষতা পাথর কুঁচির মতো মিশে থাকে। কপালে তার অজস্র দাগ, ভাঁজ, কাটাকুটির খেলা। মোটা আর জোড়া ভ্রূ তাকে করে তোলে শ্মশানভূমির অসুর।

হাঁটতে হাঁটতে ভিকনাথ ঘোর সন্দেহের চোখে হরনাথের দিকে তাকাল। একটা মানুষের এত পরিবর্তন সে ভাবতে পারে না। সময় মানুষকে কত বদলে দেয়। সময় বুঝি গঙ্গার ধারার চাইতে বলবান। কোনো কোনো শোক শেকড় চারানো বনস্পতির চেয়েও ক্ষমতাবান—সহজে যাদের উপড়ে ছুঁড়ে ফেলা যায় না। তবু কিছু বলতে হয় এই ভাবনা থেকে ভিকনাথ শুধোল, হরদা, কেমুন আচো গো ইখানে?

—শ্মশানে যেমুন মানুষ থাকে তেমুন। হরনাথের কণ্ঠস্বরে আফসোসের বেহালা কঁকিয়ে উঠল।

ভিকনাথ এরপরে আর কোনো কথা বলার সাহস পেল না। দুটো অকাল মৃত্যু পুরোপুরি বদলে দিয়েছে হাসি-খুশি মানুষটাকে। মনে হয় হরনাথ বুঝি রক্তমাংসের মানুষ নয়, ইঁট-পাথরের মানুষ। সে কখন খায় কখন ঘুমায়—এ সব কেউ টের পায় না। তবে খুব ভোরে ওঠা তার স্বভাব। গঙ্গাস্নান না সেরে সে কোনো কাজ শুরু করে না। তার লম্বা জটাধরা চুলগুলো বটের ঝুরির মতো ঘাড়ের উপর অবহেলায় পড়ে আছে। গোলাকার মুখটার স্বাভাবিক শ্রী হারিয়ে গিয়েছে সেই চেনা মুখ থেকে। এখন হরনাথকে দেখলে ভয় এসে গোপনে ঠুকরায় মনের কোমল অংশ।

হরনাথ ছাতাধরা দাঁত বের করে বলে, লুলার কপালটাও ফোঁপরা। ওর বউটাও অসময়ে চলে গেল! আহা, মনে কত দুঃখ পেলে তবে না মানুষে গলায় ফাঁস নেয়। ভিকনাথ স্বাভাবিক ভাবে হেসে উঠতে পারল না, তার বুকের মধ্যে খচখচ করছে কাঁটা, না, মানে... বৌদির মাথার গণ্ডগোল ছিল ; বুঝতেই তো পারচো!

—সে আমি জানি। গমগমিয়ে উঠল হরনাথের গলা, মাথায় গণ্ডগোল থাকলে সবাই কি গলায় ফাঁস নেয়?

ভিকনাথ অসহায় চোখে তাকাল, অত ভেতরের ব্যাপার-স্যাপার আমি কি করে জানবো বলো?

—না না, তুমার তো জানার কথাই নয়। হরনাথ রহস্যভরা কণ্ঠে বলল, তবে এট্টা কথা, বৌদি পুড়তে বেশি সময় নিল না। ভালো মানুষরা চটজলদি পুড়ে ছাই হয়ে যায়—

ছিপছিপে জল দাঁড়িয়ে আছে আখ খেতের গোড়ায়। সাদা বক আর চৈতন্যবক হাজির হয়েছে মাছ খাবার জন্য। মাছ না পাক অন্তত পোকা তো পাবে এই জমাট বাঁধা আখের খেতে। দু-ধারে চাপ বেঁধে আছে আখের জমি, তার মাঝখান দিয়ে গোরুরগাড়ি যাওয়ার মতো চওড়া পথ। সেই পথে গাঙধার থেকে উঠে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া, শিরশিরিয়ে ওঠে শরীর, তবু ভালো লাগার হালকা ছোঁয়া ছুঁয়ে যায় মনের আগল।

মাঝে মাঝে মন খারাপ করলে হরনাথ কোম্পানীর পাকাদালান পর্যন্ত এসে আবার ফিরে যায়। কাল ঢিলিকে পোড়ানোর সময় ভারতীর কথা মনে পড়ছিল হরনাথের। সেই থেকে চিনচিনে কষ্টটা শরীর জুড়ে রয়ে গেছে। রাতভর ভারতীর মুখটা মনে করে সে কষ্ট পেয়েছে, ঘুমাতে পারেনি এক ফোঁটা। এরকম ঘুম না এলে সে সিধা চলে আসে গোরা সাধুর ডেরায়। গোরা সাধুর আরেক নাম মৌনী সাধু, আসলে সে কারোর সঙ্গে কোনো কথা বলে না, এ পৃথিবীর অনেক কিছুই তার মন থেকে পিছলে যায় কচু পাতার জলের মতো। গোরা সাধু কোন প্রদেশের মানুষ, কী তার মাতৃভাষা—এ সম্বন্ধে কারোর কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই এখনও। তবে গ্রামবাসীরা বলে, গোরা সাধু বানের জলে ভেসে এসে সাহেবমাঠের অশ্বত্থগাছে আটকে গেছে অনন্তকাল। এই গাছের মোহ ত্যাগ করে পৃথিবীর অন্য কোনোখানে গিয়ে সে সুখ পাবে না।

গোরা সাধুর ডেরা হরনাথকে বড্ড টানে। গাঙধারে হরনাথের একমাত্র প্রতিবেশী হল এই গোরা সাধু। দশটা কথা বললে যে মানুষটা একটাও কথার জবাব দেয় না তার সঙ্গে ভাব জমানো কঠিন কাজ। প্রথম প্রথম হরনাথ বিরক্ত হত—এখন আর হয় না।

গোরা সাধুর মনটা গঙ্গামাটির চেয়েও পবিত্র। তার লম্বা শরীর, মেদহীন চেহারা, টানা চোখ, সম্ভ্রান্ত মুখশ্রী .... সেই সঙ্গে শাঁখের চেয়েও ফর্সা গায়ের রঙ এ গাঁয়ের সব মানুষের চেয়ে তাকে আলাদা মর্যাদায় ঠাঁই দিয়েছে। সব চাইতে বড়ো কথা গোরা সাধু নিজের জন্য কখনো কারোর কাছে হাত পাতে না। এত বড়ো বন্যায় সে গাছ আঁকড়ে পনের দিন পড়ে রইল টানা। কপোতাক্ষবাবু পার্টি থেকে নৌকা পাঠিয়েছিলেন তাকে উদ্ধারের জন্য। গোরাসাধু সেই নৌকো ফিরিয়ে দিল। একটা মানুষ টানা পনের দিন না খেয়ে কী ভাবে বেঁচে থাকে এই প্রশ্ন এখনও হাজার প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয় গ্রামবাসীদের। তারা আশ্চর্য না হয়ে পারে না। তারা গোরাসাধুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা স্মরণ করে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। বুড়ো-বুড়িরা ক'কদম এগিয়ে গিয়ে বলে, নদের নিমাই ফিরে এসেছে গো! আহা, বিটা ছেলের এত রূপ, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না! হরি হে মাধব.....! ভিকনাথকে পিছনে ফেলে হরনাথ গোরাসাধুর ডেরায় গিয়ে দাঁড়াল। গ্রামের মানুষরা গোরাসাধুর অশ্বত্থ গাছটাকে সিমেন্ট-ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে যত্ন করে। এতেও সাধুবাবাজী প্রতিক্রিয়াহীন। তার আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। তবু গ্রাম ভেঙে মানুষ আসে কাতারে কাতারে। কেউ আসে রোগ সারাতে, কেউ আসে টাকা বানাতে। কেউ চায় ঘর বাড়ি বিষয় সম্পত্তি।

গোরাসাধু নির্বিকার চোখে চেয়ে থাকে। ঠোঁট নড়ে না, এমন কী চোখের পলকও পড়ে না। মায়েরা তার কাছে হাতজোড় করে বলে, বাবা, আমাদের দয়া করো। ঘরে আমাদের বিপদ। এই বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করো।

গোরা সাধুর কাঁধ ছাপানো চুল হাওয়ায় নড়ে, গলার একমুখী রুদ্রাক্ষটা ঘামে ভিজে যায়, পাথরের মালাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে দিনের আলোয়, লম্বা হাত বাড়িয়ে সাধুবাবা প্রসাদের থালা থেকে উঠিয়ে নেয় একটা ফল। এভাবে সারাদিনে জড়ো হতে থাকে ফলের সম্ভার। এত ফল, একা মানুষ খাবে কী করে? গোরা সাধু অবশিষ্ট ফল হরনাথকে দিয়ে দেয়। হরনাথকে তার বিশেষ পছন্দ। এ গাঁয়ের অনেকেরই ধারণা হরনাথের সঙ্গে সাধুবাবার চরম একটা মিল আছে। ওরা একা থাকলে নাকি কথা বলে।

সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের ভার অন্যের।

হরনাথ গোরা সাধুর সামনে দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে প্রণাম করল। গোরা সাধু পিছন দিকে দৃষ্টি ফেলে কী যেন দেখছিল, হরনাথের উপস্থিতিতে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এক সময় কিছু বলে গোরাসাধু উঠে গেল অশ্বত্থ গাছের ডালে। হরনাথ অবাক হয়ে দেখল গাছের ডালে ভাঁজ করে রাখা আছে কম্বল, একটি ভেড়ার লোমের আসন, রক্তজবার চেয়েও কটকটে লাল বর্ণের কয়েকটি বস্ত্রখণ্ড।

গত রাতে শীতের প্রকোপ আদৌ কম ছিল না তবু শুধুমাত্র এক টুকরো লাল কাপড় গায়ে জড়িয়ে সিমেন্টের বেদীটায় শিরদাঁড়া টানটান করে বসে ছিল গোরাসাধু। তার চোখযুগল অধো নীমিলিত, অদ্ভুত এক দিব্যকান্তি প্রসন্নতা তার শরীর থেকে নির্গত হচ্ছিল যা দেখে হরনাথ মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। তার যাবতীয় দুঃখ-জ্বালা, পাথরের চেয়েও কঠিন মনোকষ্ট সব যেন গলে জলের চেয়েও তরল হয়ে যায় গোরা সাধুর দর্শনে। কী এক যাদু আবেশ হরনাথের সমগ্র শরীরে সঞ্চারিত হতে থাকে। মনে মনে সে পুলকিত হয়ে ওঠে। তখন তার হৃদয় গঙ্গাবক্ষের চেয়েও প্রসারিত হয়, মন খুশিতে কাশফুলের মতো দোলে। এই মানুষটি গঙ্গাধারে আসার পর থেকে এখানকার আবহাওয়া পরিমণ্ডল সব কিছু বদলে গিয়েছে। গ্রামের মানুষের শ্রদ্ধা এবং আবেগ এই মানুষটিকে ঘিরে হাজার গুণ বেড়ে গিয়েছে। যে কেউ গঙ্গাস্নানে এলে গোরা সাধুর দর্শন না নিয়ে গ্রামে ফেরে না। সাধুসঙ্গে আপামর মানুষের হৃদয় পুলকিত হয়ে ওঠে, সংসারে শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য পরিলক্ষিত হয়। সমস্যার গ্রন্থিগুলো এক এক করে খুলে যেতে থাকে। এক আশ্চর্য দৈবশক্তি গোরা সাধুকে যেন তড়িৎ-আবেশের মতো ঘিরে আছে সব সময়।

গতকাল হরনাথ গোরাসাধুর জন্য মাটির পাত্রে মদ এনেছিল বাঁধধার থেকে। সেই মদ গোরা সাধু প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেছে। হরনাথ সময় পেলে মাঝেমধ্যে গোরা সাধুকে গাঁজার কলকে সেজে দিয়ে যায়। সে ভুল করেও সাধুবাবার কলকেতে মুখ দেয় না, সে তার নিজের কলকে ছাড়া অন্য কোনো কলকেতে গাঁজা সেবন করে তৃপ্তি পায় না। এতদিন আসা যাওয়া তবু গোরা সাধুকে হরনাথ চিনতে পারেনি একবিন্দু। তবে এটুকু সে বুঝেছে মানুষটি অসৎ বা ধান্দাবাজ নয়। রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ান আর দশ পাঁচটা সাধুর মতো লোভী বা আত্মকেন্দ্রিক নয়। মনের উদারতায় এই মানুষটি আকাশের কাছাকাছি। এত ভালো মানুষ হরনাথ এই গ্রামে আর একটিও দেখেনি।

এই মানুষটিকে নীলাক্ষবাবুর সন্দেহ হয়। এর জনপ্রিয়তা তাঁকে হীনমন্যতার পুকুরে চোবায়। নিজের অন্তঃস্থলের ঈর্ষাকে চাপা দিতে না পেরে তিনি সরাসরি থানার বড়োবাবুর কাছে গিয়ে বলেছিলেন, আপনি নিশ্চয়ই গোরাসাধুর কথা শুনে থাকবেন। লোকটিকে আমার প্রথম থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলে মনে হয়। তাছাড়া ওর যা চেহারা, কাঠামো, হাবভাব তা দেখে ওকে আমার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বলে মনে হয় না। এই মানুষটি অন্য কোনো রাজ্য থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে। পালিয়ে আসার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। নাহলে পৃথিবীর এত ভালো-ভালো জায়গা ফেলে গঙ্গার ধারে আশ্রয় নেওয়া হল কেন? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো

উদ্দেশ্য আছে। গ্রামবাসীর স্বার্থে আপনাকে সেইটা খুঁজে বার করতে হবে। বড়ো কিছু অঘটন ঘটে যাওয়ার পূর্বেই আপনাকে এখন থেকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

থানার বড়োবাবু নীলাক্ষবাবুর কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছিলেন। সন্দেহ তার মনেও জমাট বেঁধে আছে। সাধারণত এই ধরনের পলাতক মানুষরা খুনী কিংবা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মঞ্চের পক্ষপাতদুষ্ট মানুষ হন। গোরা সাধু কোন দলে অবশ্যই যাচাই করা প্রয়োজন। সাদা পোষাকের একজন পুলিশ প্রায় মাস তিনেক ঘুরঘুর করেছে গোরা সাধুর ডেরার চারধারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে কোনো তথ্যই সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি যা বড়োবাবুকে সগর্বে বলতে পারে। গোরা সাধু স্বাভাবিক মানুষের চেয়েও পরিচ্ছন্ন মনের। তার জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত পরিশীলিত এবং উচ্চমানের। সৌজন্যতা, শিষ্টাচার তার মজ্জাগত। এমন দেবকান্তি মানুষ কোনোদিন খুনী বা দাগী আসামী হতে পারে না।

মৌনী সাধুর গাঁজার কলকে খুব যত্ন নিয়ে সেজে দেয় হরনাথ। আচ্ছন্নতা কাটিয়ে ভরাট হেসে ওঠে সাধুবাবা। তারপর ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে গাঁজার কলকেয় লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া উগরে ঈষৎ লাল চোখে সে হরনাথের দিকে তাকাল। তাতেই সারা শরীরে খুশির বান ডাকল হরনাথের, অদ্ভুত আনন্দধারায় প্লাবিত হল তার খরায় পোড়া মন। যেন এইমাত্র গঙ্গার শীতল জলে সে স্নান সেরে এল—এমন তৃপ্তিময় আনন্দ অনুভূতিতে তার অন্তরাত্মা পুলকিত হয়ে উঠল।

প্রকৃত মানুষের সান্নিধ্য যে কোনো মানুষের ভালো লাগে। রোদের রঙ কড়া হতেই হরনাথ ফিরে এল তার নিজের কুঁড়েঘরে। সারাদিনের অনেক কাজ পড়ে আছে। মাটির কলসীতে গঙ্গার জল ভরে রোজ চিতার বাঁধানো বেদীটা ধুয়ে দেয় হরনাথ। চিতা সাফ-সুতরো রাখলে হরনাথের মনটাও পবিত্র হয়ে ওঠে। মানুষের শেষযাত্রায় শুদ্ধতা যাতে কম না হয় সেদিকে তার খেয়াল পুরোমাত্রায়। গঙ্গা যা পারে মানুষও কি তা পারে না? হরনাথের মন বলল, পারে, অবশ্যই তা পারে।

মাস খানিক পরে সূর্যাক্ষ আর দ্বীপীর ফাইনাল পরীক্ষা। রাত দশটা অব্দি একসাথে পড়ছে ওরা। সূর্যাক্ষর পড়া শেষ হলে দেবোত্তর হ্যারিকেন নিয়ে এগিয়ে দেন তাকে। পথ যদিও সামান্য তবু অন্ধকার শুয়ে থাকে ধুলো পথে। চন্দ্রিকাই জোর করে বলেছেন, যাও না গো, ছেলেটাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসো।

অন্ধকারকে বিশ্বাস নেই চন্দ্রিকার। শুধু অন্ধকার নয়, কাঁচা বয়সকে বিশ্বাস করেন না তিনি। আগুন আর ঘি পাশাপাশি থাকলে যে কোনো সময় হার মানতে পারে যে কেউ। এটা কোনো দোষের নয়, এটাই ধর্ম। তবু সব জেনেও দ্বীপীকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। ছোট থেকে সূর্যাক্ষ আর দ্বীপী এক সাথে স্কুলে যায়। ওদের খেলাধুলা হাসি গল্প দৌড় ঝাঁপ সব কিছু একসাথে। তবু চন্দ্রিকার মনে সন্দেহ ঘোঁট পাকায়।

সূর্যাক্ষকে তিনি মুখের উপর নিষেধ করতে পারেন না। সূর্যাক্ষ না এলে বরং ঘরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। দেবোত্তর মহাদেব মন্দির থেকে ফিরেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবেন, কি গো, আজ বুঝি সূর্য আসে নি?

চন্দ্রিকা তখন সামনে এসে উত্তর দেবেন, হ্যাঁ, এসেছিল গো। কী যেন কাজ আছে ঘরে, তাই আটটার মধ্যে চলে গেল!

—দ্বীপী মন দিয়ে পড়ছে তো? তুমি ওর উপর একটু নজর রেখো।

—আমি নজর রাখব না তো কি তুমি নজর রাখবে? চন্দ্রিকা অসন্তুষ্ট হন। দেবোত্তর বলেন, অ্যাঁ, রেগো না। যা বলছি—মন দিয়ে শোন। মেয়েটা বড়ো হচ্ছে। ওর দিকে খেয়াল তোমারই রাখা উচিত। আমি আর কী করতে পারি। আমি তো সারাদিনই বাইরে বাইরে থাকি।

—বাইরে বাইরেই থাকো। এসব নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। তুমি কি তোমার নিজের মেয়েকে চেনো না? দ্বীপীর মতো মেয়ে এ গ্রামে কটা আছে? চন্দ্রিকা জোর গলায় বললেন, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো। ওরা দুটিতে যমজ ভাই-বোনের মতো মেশে। ওদের জন্য তোমার চিন্তা না করলেও চলবে।

—সেই ভালো। দেবোত্তর দীর্ঘশ্বাস ভাসালেন বাতাসে, মেয়েটাকে একটা টিউশনিও দিতে পারিনি। দেব কোথা থেকে। মন্দিরে যা দক্ষিণা পাই তা তো সংসার খরচে সব শেষ হয়ে যায়। তবু ভালো—ওরা মিলেমিশে পড়ছে। আমি শুনেছি—যারা সায়েন্স পড়ে তারা মিলে-মিশে পড়লে রেজাল্ট ভালো হয়।

চন্দ্রিকা চুপ করে থাকলেন, এসব বিষয়ে তার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। দ্বীপী পড়তে পড়তে উঠে এল হঠাৎ মা, শোন।

চন্দ্রিকা মুখ তুলে তাকালেন, বাবাকে বলো কাল কালীগঞ্জ বাজার থেকে যেন দুটো প্র্যাকটিক্যাল খাতা কিনে আনে। আর তা যদি না হয় আমাকে টাকা দিলে আমি গিয়ে কিনে আনতে পারব। মনে রেখো খাতা দুটো আমার খুব দরকার। তিন দিনের মধ্যে ইস্কুলে জমা দিতে হবে। ওতে স্পেশ্যাল মার্কস আছে।

দেবোত্তর শুকনো মুখে কথাগুলো শুনছিলেন। দ্বীপীর আব্দার সামান্য, কিন্তু এর গুরুত্ব অনেকখানি। দুটো খাতার দাম নেহাৎ কম হবে না। এমনি খাতার চাইতে প্র্যাকটিক্যাল খাতার দাম বেশি। মেয়ে সায়েন্স নিয়ে পড়ছে বলে—এটুকু জেনেছেন দেবোত্তর। কিন্তু এখন জেনেও তিনি না জানার ভান করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

চন্দ্রিকা কী বলবেন কিছু ভেবে পান না। জিনিসপত্রের যেভাবে দাম বাড়ছে তাতে সংসার চালাতে তার নাভিশ্বাস উঠছে। নাহলে চক্রবর্তী বাড়ির দুধ কোনোদিন বাইরে যায়না। পরপর দুটো গোরু দুধ দিচ্ছে। এত দুধ খাবে কে? সূর্যাক্ষকে রোজ বড়ো কাচের গ্লাসে দুধ ভরে দেন চন্দ্রিকা। গাঢ়, ফুটানো দুধ সূর্যাক্ষ খেতে ভালোবাসে। আর তাকে খাইয়ে তৃপ্তি পান চন্দ্রিকা। দ্বীপী দুধ পছন্দ করে না। লহরী পায়েস খেতে ভালোবাসে। ঊর্মি এসবের কোনটাতেই নেই। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বরাবর ও নাক সিঁটকায়। দুধ নষ্ট করতে ভালো লাগে না চন্দ্রিকার। ঘরের জিনিস হলেও বাজারে তার একটা মূল্য আছে। রবি গোয়ালা ঘরে এসে দুধ দুইয়ে নিয়ে যায়। মাস গেলে ও যা টাকা দেয় তা সংসারের অনেক কাজে লাগে। দেবোত্তর দুধ বিক্রির ব্যাপারে প্রথমে আপত্তি করলেও এখন তিনি নীরব থাকতে পছন্দ করেন।

মহাদেব মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব সামলে তার সংসার এখন টলমল। মাথার উপর দুটো মেয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে, ওদের পাত্রস্থ করা আশু-প্রয়োজন। দু-একজন যে দেখে যায়নি

তা নয়। মেয়ে ওদের পছন্দ। কিন্তু দাবীর কাছে নুইয়ে গেছেন দেবোত্তর। এত টাকা গয়না আসবে কোথা থেকে? চন্দ্রিকার গায়ের সামান্য গহনাগুলো খুলে নিলেও এ সমস্যার সমাধান হবে না।

ওদের কথার মাঝখানে সূর্যাক্ষ এসে দাঁড়াল। দ্বীপীকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, কী রে আসি বলে তুই যে কাশী চলে গেলি! চল, ফিজিক্সের অঙ্কগুলো চটপট করে ফেলি। আর দেরি করলে প্র্যাকটিস করার সময় পাব না।

—সে তো বুঝলাম, কিন্তু আমার দুটো প্র্যাকটিক্যাল খাতার দরকার। দ্বীপী খুব গুরুত্ব সহকারে বলল।

সূর্যাক্ষ ওদের বোবা হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে যা বোঝার বুঝে ফেলল, তুই কাল ঠিক খাতা পেয়ে যাবি।

—তার মানে?

—মানেটা খুব সহজ। কাল আমার কালীগঞ্জে কাজ আছে। কাল তোর জন্য ওখান থেকে খাতা কিনে আনব। এবার কথাটা তোর মাথায় ঢুকল তো?

—তোর কিনে দেওয়া খাতা আমি নেব কেন? দ্বীপী ঝাঁঝাল সুরে বলল, তোর বুঝি পয়সা বেশি হয়েছে? দাঁড়া, আমি তোর মজা দেখাচ্ছি।

এবার সূর্যাক্ষ আহত হয়ে চন্দ্রিকার শ্মরণাপন্ন হল, কাকিমা দেখলে তো দ্বীপীর কেমন ব্যবহার! একটু সুযোগ পেলে ওর ঝগড়া করা চাই। অন্য কেউ হলে ওকে একদম পাত্তা দিত না।

—না দিত, না দিত। তাতে আমার বয়ে গেছে। আমি কারোর খাই না, পরিও না।

—খাওয়া-পরার কথা আসছে কোথা থেকে? সূর্যাক্ষর চোখ-মুখ নিষ্প্রভ দেখাল। সে চন্দ্রিকার দিকে তাকিয়ে তার সমর্থন পাবার জন্য বলল, দেখলে কাকিমা কেমন ওর ব্যবহার। যেখানে বিয়ে হবে সে ঘর একেবারে জ্বালিয়ে দেবে।

কথা শেষ হল না, সূর্যাক্ষর দিকে তেড়ে এল দ্বীপী, নিজেকে কী ভাবিস বল তো? ভাবছিস মা'র সামনে মেয়ের নিন্দে করে পার পেয়ে যাবি? মা আমাকে তোর চেয়েও ভালো চেনে বুঝলি?

এবার অসহ্যবোধ হতেই ধমকে উঠলেন চন্দ্রিকা, দ্বীপী, তুই চুপ করবি! বড় ঝগড়ুটে হয়েছিস। কার সাথে কী ভাবে কথা বলতে হয় জানিস না বুঝি? সূর্য তো ঠিক বলেছে। মেয়েদের বেশি তেজ ভালো নয়।

—ছেলেদের সব কিছুই ভালো, তাই না মা? দ্বীপী মুখ বিকৃতি করে হাসল। সূর্যাক্ষ বলল, তুই কি শুধু তর্ক করবি, কাজের কাজ কিছু করবি না? রাত বাড়ছে, আমি কিন্তু চলে যাবো।

দেবোত্তর সূর্যাক্ষর সমর্থনে বলল, যা মা, নিজের কাজ কর। কর্মই ঈশ্বর। কর্মই ধর্ম। ধর্মের পথে থাক। দেখবি তোর অমঙ্গল হবে না।

দ্বীপী থুতনি নাচিয়ে চলে এল পাশের ঘরে। সূর্যাক্ষ তাকে অনুসরণ করল। ঘরে ঢুকে তার জন্য এমন অভ্যর্থনা লুকিয়ে ছিল তা আগাম অনুমান করতে পারে নি সূর্যাক্ষ। তাকে মাথা উঁচু করে ঘরে ঢুকতে দেখে দ্বীপী গম্ভীর গলায় বলল, দাঁড়া। তখন কি যেন বলছিলিস? ওঃ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমার যেখানে বিয়ে হবে সেই ঘর আমি জ্বালিয়ে দেব তাই না?

দ্বীপীর ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে সূর্যাক্ষ ঢোঁক গিলে কিছু বলতে গেলেই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দ্বীপী। চকিতে হাত বাড়িয়ে সে সজোরে চিমটি কাটল সূর্যাক্ষর পেটে। সামান্য চর্বি মুচড়ে যেতেই সূর্যাক্ষর গলা থেকে নিমেষে বেরিয়ে এল 'ওঃ' আর্তনাদ।

দ্বীপী শরীর দুলিয়ে খিলখিল করে হাসল। হাসতে হাসতে সে বলল, তোর সব বাহাদুরী আমার

জানা আছে। একটা রামচিমটিতেই তোর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। যদি আমড়াচিমটি কাটি তাহলে কি হবে তোর?

—মানে? হকচকিয়ে শুধাল সূর্যাক্ষ।

দ্বীপী একটুও দ্বিধা না করে বলল, আমার বিয়ে হয়ে গেলে তুই খুব সুখে থাকবি তাই না? কী নিষ্ঠুর রে তুই? অমন কথা বলতে তোর মুখে বাঁধল না?

—আমি তো ঠিকই বলেছি। একদিন না একদিন তোর তো বিয়ে হবেই।

দ্বীপীর ব্যথিত চোখে চিকচিকিয়ে উঠল জল, এতদিন ধরে তোর সাথে মিশছি, তোকে আমি আজও চিনে উঠতে পারলাম না! সত্যি বলতো আমাকে তুই কী ভাবিস?

—কেন বলবো? সূর্যাক্ষ জেদ ধরল।

—না, তোকে আজ বলতে হবে। যদি না বলিস তাহলে আমি তোর ফিজিক্স বই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেব।

—তাহলে তো বেশ ভালোই হবে, আর কষ্ট করে পড়তে হবে না। সূর্যাক্ষ দাঁত টিপে টিপে হেসে উঠল।

দ্বীপী রাগে কাঁপছে, লাল হয়ে গিয়েছে ওর সুন্দর মুখটা। কিছু বলতে গিয়ে জড়িয়ে গেল ওর কথা। মাথায় হাত দিতেই কাটা দাগটার কাছে আটকে গেল হাত। তখন কোন ক্লাস? সম্ভবত থ্রি। দ্বীপী আব্দার করেছে পাকা কুল পেড়ে দেবার জন্য। ইটের টুকরো সূর্যাক্ষ ছুঁড়ে মারছে গাছে। কুলগাছের নীচে শ্লেট-বই হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে অবুঝ দ্বীপী। হঠাৎ একটা ইটের আঘাতে ফেটে গেল দ্বীপীর মাথা। ব্যথায় শুকিয়ে গেল কচি মুখ। চুলের গোড়া ভিজিয়ে গরম রক্ত কানের পাশ দিয়ে চুঁইয়ে নামল। রক্ত দেখে দারুণ ভয়ে গুটিয়ে গিয়েছে সূর্য। কী করবে, কী করা উচিত—তা তার ছোট্ট বুদ্ধিতে কুলাচ্ছে না। দ্বীপীই হাতের চেটোতে রক্ত মুছে এগিয়ে এল সামনে, তোর কোনো দোষ নেই। আমার নিজের দোষেই মাথা ফেটেছে। কুল খাওয়ার সখ হয়েছিল। সে সখ আমার মিটে গিয়েছে।

দ্বীপী সেদিন এক ফোঁটা কাঁদল না। বরং সাহস দিয়ে বলল, যা, হাড়মটমটির ঝোপ থেকে পাতা ছিঁড়ে আন। রস বের করে আমার ফাটা কপালে লাগিয়ে দে। জানিস তো সূর্য, আমার বাবা বলে—হাড়মটমটির রসে ফাটা কপাল জুড়ে যায়।

সেই দ্বীপী এখন রাগে কাঁপছে থরথরিয়ে, তাকে সামলানো দায়। সূর্যাক্ষ শান্ত হয়ে বলল, দ্বীপী, তোকে একটা কথা শুধাই, জবাব দিবি তো?

দ্বীপী ফাটা দাগ থেকে হাত সরিয়ে গুম হয়ে দাঁড়াল, তোর সাথে আমার কথা বলতেই ইচ্ছে করে না। তুই তো পাথর। পাথরের সাথে কি কথা বলা যায়?

সূর্যাক্ষ হাসল, আমি পাথর হলে তুই পাহাড়। বুঝলি? এই পাথরই একদিন পাহাড়কে বাঁচিয়ে দিল, তোর নিশ্চয়ই মনে আছে কথাটা। যদি মনে না থাকে তো বল—আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি।

দ্বীপী ঠোঁট শক্ত করে ভেংচে উঠল, মনে রাখতে আমার বয়ে গেছে। ওসব ছোট ছোট কথা যত মুছে যায় তত ভালো।

—গঙ্গা স্নান করতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছিলিস মনে নেই? কে বাঁচিয়েছিল তখন?

—তুই যা ভীতু, তুই কি আমাকে বাঁচিয়েছিলিস? দ্বীপীর গলায় ফুটে উঠল অবজ্ঞা।

সূর্যাক্ষ হার মানল না, আমি না থাকলে সেদিন তুই ঠিক পটল তুলতিস।

—কী করে? দ্বীপী বিমূঢ়ভাবে তাকাল।

—কে চিৎকার করে ঘাটের মাঝিদের ডেকেছিল বল? মাঝিরা যদি না আসত সেদিন তো তোর মকরস্নান চিরদিনের মতো হয়ে যেত।

—হয়ে যেত তো হয়ে যেত—তাতে তোর কি? দ্বীপী ঝগড়ুটে বেড়ালের দৃষ্টি মেলে তাকাল, আমি বেঁচেছি আমার আয়ুর জোরে। তোর চেঁচানোর জোরে বাঁচিনি বুঝলি?

দ্বীপী লাল টুকটুকে জিভ বের করে ভেংচি কাটল। এবার সূর্যাক্ষ তেড়ে গেল তার দিকে। দ্বীপীকে ঠেলা মারতে মারতে নিয়ে এল বিছানায়। হুমড়ে ফেলে দিয়ে ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, এবার যদি তোকে আমি কামড়ে দিই কে তোকে বাঁচাবে?

ভয়ে চোখ বন্ধ করে দ্বীপী বলল, আমার ভগবান আছে, সে আমাকে বাঁচাবে।

—তাহলে তোর ভগবানকে ডাক। সূর্যাক্ষ দ্বীপীর গোলাপী গালে গাল রেখে শুষে নিতে চাইল উত্তাপ। এক সময় পাকানো দড়ির মতো মোচড় মেরে উঠল তার দেহ। সূর্যাক্ষকে দু-হাতে ঠেলে দিয়ে সে বলল, তুই একটা অসভ্য, তুই একটা—

—বল, গ্যাপ রাখলি কেন বল। ফিল আপ দ্যা ব্ল্যাঙ্ক।

দ্বীপী চোখ বন্ধ করে বলল, মনে রাখিস আমি এখন বড়ো হয়েছি। আগের মতো যখন তখন আমাকে তুই ছুঁবি না। কেউ দেখে ফেললে আমি লজ্জায় পড়ে যাবো। তাছাড়া লোকে আমাকে ভুল বুঝতে পারে।

—সেই কথাটা তো আমিও তোকে বলতে চাই। আগে তো নিজের ফ্রকের হুক নিজে লাগাতে পারতিস না। আমাকে কেন বলতিস, সূর্য, হুকটা লাগিয়ে দে তো।

—তখন আমি ছোট ছিলাম।

—এখন আমি যদি তোর হুক লাগিয়ে দিই?

—সূর্য, মার খাবি কিন্তু। বড্ড ফাজিল হয়ে গিয়েছিস তুই। দাঁড়া আমি মাকে সব বলে দেব। সূর্যকে ঠেলে দিয়ে বিছানায় উঠে বসে দ্বীপী। সে ঘেমে গিয়েছে। ওর ঘামের প্রতিটি বিন্দুতে লেখা আছে ভালোবাসার কথা। এই ভালোবাসা ভুলে থাকা বড়ো কঠিন।

দ্বীপীকে একবেলা দেখতে না পেলে হাঁপিয়ে ওঠে সূর্যাক্ষ। একটা নেশার মতো কে যেন তাকে টেনে আনে দ্বীপীদের বাড়িতে। দ্বীপীর হাসি মুখটা দেখলেই তার শরীরের সমস্ত ক্লান্তি-অবসাদ দূর হয়ে যায়।

দেবোত্তর ওদের মেলামেশাটাকে মেনে না নিয়ে পারেন নি। ছোট থেকে একসঙ্গে এরা বড়ো হচ্ছে। পিঠাপিঠি ভাই-বোনের মতো ওদের সম্পর্ক। শুধু সম্পর্ক নয় ওদের ইস্কুল, ক্লাস সব এক।

তবু মাঝে মাঝে রাশ টেনে ধরেন চন্দ্রিকা। বেথুয়াডহরীতে দ্বীপীর সিনেমা দেখতে যাওয়ার আব্দার তিনি মেনে নিতে পারেন না।

—ওঃ মা, কেন যেতে দিচ্ছো না আমাকে? আমি কি একা যাচ্ছি নাকি? আমার সঙ্গে তো সূর্য যাচ্ছে। দ্বীপীর ছেলেমানুষী আব্দার চন্দ্রিকার মাথা গরম করে দেয়। ধমক দিয়ে তিনি বলেন, মনে রাখিস এখন তুই আর ছোট নোস। গ্রামের দিকে তোর বয়সী মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়ে ঘর-সংসার হয়ে যায়। লেখাপড়া শিখছিস, এই বয়সে এতো অবুঝ হওয়া তোর সাজে না।

—আমি কী করছি মা যার জন্য তুমি আমাকে এত কথা শোনাচ্ছো? দ্বীপী আর বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না।

মেয়ের কাছ থেকে সামান্য ধাক্কা আসতেই চন্দ্রিকা নিজেকে কিছুটা সামলে নিল, কিছু করা

না করা বড়ো প্রশ্ন নয়। তোর এখন থেকে মনে রাখা উচিত কার সঙ্গে কী ভাবে কতটা মিশবি।

—তুমি কি সূর্যকে নিয়ে কিছু বলতে চাইছো? দ্বীপী সরাসরি প্রশ্ন করল, আমার সঙ্গে সূর্যর রিলেশনটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এটা যে ঠিক কী ধরনের রিলেশন তা আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।

চন্দ্রিকা সামান্য সাহসী হলেন, আমরাও ঠিক বুঝতে পারি না। তাছাড়া সূর্যকে আমি ঘরের ছেলের মতো দেখি।

দ্বীপী গম্ভীর মুখে কপালে ভাঁজ ফেলে নীরব থাকল।

চন্দ্রিকা সামান্য হালকা গলায় বললেন, আমি বললাম বলে তুই কিছু মনে করিস না। আমি মা। আমাকে দশ দিক নজর রাখতে হয়।

এবার ফুঁসে উঠল দ্বীপী, তা বলে নিজের মেয়েকে তুমি ভুল বুঝবে? কালীপুজোর মেলায় পাঁপড় ভাজা কিনতে গিয়ে আমি হারিয়ে গেলাম। সেবার তো তুমি দেখেছো সূর্য আমাকে খুঁজে না পেয়ে কেমন পাগলের মতো করছিল। ওর মতো ছটফটানী, উদ্বেগ আমি বাবার মধ্যেও দেখিনি।

—মনে রাখিস, ওরা বড়োলোক। ওর জ্যাঠা মানুষ হিসাবে ভালো নয়।

—কে কী রকম মানুষ, আমি সেই বিচারে যাব না। আমি শুধু সূর্যকে জানি। ও আমার ভীষণ ভালো বন্ধু। দ্বীপী জোর গলায় কথাগুলো বলে মায়ের মুখের দিকে তাকাল।

চন্দ্রিকা যে অনেকটাই কোণঠাসা তা তিনি হাবেভাবে বুঝিয়ে দিলেন। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তর্কে পেরে ওঠা ভীষণ কঠিন। এ ব্যাপারে গ্রাম-শহর সমানভাবে এগিয়ে। কাজের অজুহাতে তিনি রান্নাঘরে চলে গেলে দ্বীপী তখনও স্বাভাবিক হতে পারে না। হাজার কথার মধ্যে দ্বীপীর একটা কথাই মনে পড়ে। সাহেব মাঠের ভোজপুরী দারোয়ান কিষাণজীর কাছ থেকে বাদশাহী গুড়াখু চেয়ে এনেছিল সূর্য। তার অর্ধেকটা দ্বীপীকে দিয়ে বলেছিল, এই গুড়াখু দিয়ে দাঁত মাজলে তোর দাঁতের ব্যথা সব সেরে যাবে, তোর দাঁত সাদা মুলোর চেয়েও আরও সাদা হয়ে যাবে।

—সত্যি? দ্বীপীর আকাশছোঁয়া আগ্রহ দেখে সূর্য বলল, গুড়াখু দিয়ে দাঁত মাজলে নেশা হয়। মাথা ঝিমঝিম করে। গা পাক দেয়। কারোর আবার বমি হয়। দ্বীপী গুড়াখু মুখে ঢুকিয়ে তর্জনী দিয়ে মাজতে মাজতে বলেছিল, আমার কিস্যু হবে না। সিগারেট খেয়ে আমার মাথা ঘোরা তো দূরে থাক-একটু পা-ও টলেনি।

—এত সাহস ভালো নয়। দ্বীপীকে সতর্ক করেছিল সূর্য, ফেলে দে, ফেলে দে বলছি। মাথা ঘুরে গেলে কে তোকে সামলাবে শুনি।

—কেন, তুই তো আছিস, তুই আমাকে দেখবি না?

সূর্যাক্ষ কোনো কিছু বলার আগে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল দ্বীপী, এক সময় বসে থাকার ক্ষমতাও তার নিঃশেষ হল, সাটপাট হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে নিল সে। সূর্যাক্ষ দেখল দ্বীপীর চোখের কোণে থেঁতো হয়ে যাচ্ছে জলকণা, বড়ো অসহায় দেখাচ্ছে তার সুন্দর মুখখানা।

প্রায় আধ ঘণ্টা এভাবেই কেটে যায়, দ্বীপী ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আবার উঠে বসলে সূর্যাক্ষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দ্বীপী তার বদলে যাওয়া মুখের আদল দেখে বলল, বড্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম তাই না? তবে আমি জানতাম আমার কিছু হবে না। কেন জানিস?

—না। সূর্যাক্ষ ঘাড় নাড়ল।

দ্বীপী সততার সঙ্গে বলল, তুই আমার সঙ্গে থাকলে যমরাজও আমার কিছু করতে পারবে

না। তুই আমার শক্তি, তুই আমার আলো। কথা হারিয়ে দ্বীপী তার নীচের ঠোঁটটায় দাঁত বসিয়ে দিল আনমনে।

সম্পর্কের কদমগাছে কবে যে ফুল ধরেছে একথা কেউ জানত না। জীবনের কোনো এক বর্ষায় ওরা দেখল আষাঢ়ের জলবাহী মেঘ আগামী দিনের স্বপ্ন হয়ে ঝুলে আছে মাথার উপর। জলীয় আবহাওয়ায় এখন কদমগাছের ভরা সংসার। গাঢ় সবুজ রঙের চওড়া পাতাগুলো যেন কোনো এক অদেখা রাজকুমারীর মুখ। ফুলগুলো সব সুখের চিহ্ন হয়ে ঝুলছে। কোনো কোনো ফুলের আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হয়।

তিনদিন পরে পার্টির মিটিং কালীগঞ্জ বাজারে, দেবগ্রাম থেকে মীর মহম্মদ আসবেন ভাষণ দিতে—এসব নানা কারণে কপোতাক্ষবাবুর আর সময় নেই সংসারের দিকে নজর দেওয়ার। দিন রাত ঝোলা কাঁধে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন পার্টির চাঁদা তোলার জন্য। মাইক-লাইট-মঞ্চের পেছনে খরচ আছে। এত টাকা জোগাড় হবে কোথা থেকে? চিন্তায় কপোতাক্ষবাবুর মুখমণ্ডল ভার হয়ে আছে।

ঘর থেকে বেরনোর সময় মীনাক্ষী বেজার গলায় বলেছিলেন, যাচ্ছ যাও, তবে দুপুরে খাবে কী না বলে যেও। রোজ রোজ ভাত নষ্ট করতে গায়ে লাগে। ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে কপোতাক্ষ বলেছিলেন, দশের কাজে গেলে কখন ফিরব আমার সে খেয়াল থাকে না। কাজের সময় খাওয়ার কথাও মনে থাকে না।

—এত দৌড়ঝাঁপ করে কি পাচ্ছ তুমি? গ্রামের মানুষ তো তোমাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখে না। বড়দাও তোমার ওপর অসন্তুষ্ট। তিনি তো মুখের ওপর বলেন ছোট ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছে।

—দাদার কথা বাদ দাও। কপোতাক্ষ সহজ হবার চেষ্টা করলেন, দাদা কি বলল তাতে আমার কিছু যায় আসে না। মানুষ হয়ে জন্মেছি যখন তখন আমার কিছু করণীয় আছে। আমি আমার কর্তব্য করতে চাই।

—বেশ ভালো কথা। তবে তোমার সংসার করা উচিত হয়নি। ঘরে এক পা, আর পার্টি অফিসে আর এক পা এভাবে সংসার চলতে পারে না। আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। তুমি আমাকে কৃষ্ণনগরে রেখে আসবে চলো। মীনাক্ষী দাঁতে দাঁত চেপে কোনোমতে বললেন কথাগুলো।

কপোতাক্ষ ধাক্কা খেলেন। মীনাক্ষীকে এত কঠোর হয়ে উঠতে তিনি কখনো দেখেননি। পার্টির কাজে ডুবে থাকলে সংসারের দিকে আর ফিরে তাকানো সম্ভব হয় না। মীনাক্ষীর দীর্ঘদিনের পুষে রাখা ক্ষোভ আজ প্রকাশ্যে চলে এসেছে নানা কারণে।

কপোতাক্ষ এই উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কীভাবে সামাল দেবেন ভাবলেন। ঘর থেকে যদি বিদ্রোহ শুরু হয় তাহলে তার কিছু করার নেই। অবশ্য মীনাক্ষী একগুঁয়ে নন। সমঝোতার পথে হাঁটতে তাঁর আপত্তি নেই। তবে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে সেই প্রতিবাদকে সামাল দেওয়া যাবে কীভাবে?

কপোতাক্ষ মাথা নেড়ে বললেন, তুমি খামোখা রাগ করছ। আমাদের পার্টি-লাইনের নির্দেশ

আছে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়।

—তুমি পার্টির জন্য তোমার স্ত্রী-পুত্র সব কিছুকে ত্যাগ করেছ। এই ত্যাগ যদি তোমার কাছে ক্ষুদ্রতর ত্যাগ হয় তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই। গোঁজ হয়ে বসে মীনাক্ষী রাগে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

—মীনা, লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোন....।

—তোমার অনেক কথা আমি শুনেছি, আর কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলে মীনাক্ষী তাকালেন, দয়া করে এবার যাও। তুমি আর তোমার ছেলেকে নিয়ে আমি আর পারছি না।

—কেন, সূর্যকে নিয়ে তোমার আবার কি সমস্যা হল? কপোতাক্ষ শুধোলেন।

মীনাক্ষী সহজ হতে পারলেন না, ছেলেটাও তোমার মতো ভবঘুরে হয়েছে। তুমি দেশোদ্ধার করে বেড়াচ্ছো, সে দেশ থেকে কুসংস্কার তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওদের একজন মাস্টারমশাই, কী যেন নাম— তিনি এই দলের পাণ্ডা। শুনলাম কাল প্রাইমারী ইস্কুলে ওদের বিজ্ঞান-সচেতনতার ওপর সভা হবে। কাল মাস্টারমশাই এখানে খাবেন। সূর্য বলে গেল।

—এখন পরীক্ষার সময় এসব ব্যাপারে নাক না গলালে ভালো হত। কপোতাক্ষ বিচলিত চোখে তাকালেন।

মীনাক্ষীর কণ্ঠস্বরে অবজ্ঞা উথলে উঠল, তোমারই তো ছেলে, বাপের সব গুণই পেয়েছে। আমি বোঝালে সে বুঝবে কেন? তার এখন নিজস্ব মতামত দেবার অধিকার জন্মেছে। আমি কিছু প্রতিবাদ করলে সে আমাকে থামিয়ে দেয়। বলে চুপ করো।

—আশ্চর্য তো!

—আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এটাই স্বাভাবিক। মীনাক্ষীর ঠোঁট শক্ত হয়ে উঠল। কপোতাক্ষ আর কথা বাড়ালেন না, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি চমকে উঠলেন। হরিনাথ-পুরের কদবেলতলায় যেতে হবে তাকে। রোদ উঠে গেলে সাইকেলের প্যাডেল ঘোরাতে কষ্ট হয়। হাঁটু দুটোয় ব্যথা হয়। দিনরাত সাইকেল চালানোর দায়ভার হাঁটু দুটো বুঝি নিতে পারছে না।

কপোতাক্ষ সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। প্রতিদিনের মতো আজ আর মীনাক্ষী গেট খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন না। কপোতাক্ষ একবার পেছন ফিরে তাকালেন। মাটির রাস্তায় গাছের জড়াজড়ি ছায়া ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না।

হরিনাথপুরের ব্রহ্মাণীতলা সব সময় জমজমাট। পুরনো বটগাছের ছায়ায় জায়গাটা শীতল হয়ে থাকে। এখন বটের পাকা ফল নজরে না পড়লেও দল বেঁধে টিয়া আর হরিয়াল পাখি এসে বসেছে গাছের ঝাঁকড়া ডালে। বিশেষ করে দুপুরবেলায় ওদের কিচিরমিচির হাট বসে।

সাইকেল চালিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন কপোতাক্ষ। শীতের রোদ নরম হলেও মেজাজ ধানী লঙ্কার মতো। সাইকেলটা স্ট্যান্ড করে কপোতাক্ষ গোবিন্দর চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়ালেন।

গোবিন্দর অদ্ভুত গড়ন, ওর চেহারা সার্কাস দলের জোকারদের মতন। লম্বায় সে চারফুট দুই ইঞ্চি, হাত-পা ছোট ছোট, অনেকটা শিলনোড়ার মতো। এ এলাকায় তার চলতি নাম হল ঘুঁটে। গোবিন্দ ঘুঁটে।

গোবিন্দ ঘুঁটের চায়ের দোকান ব্রহ্মাণীতলার গর্ব। শুধু চা নয়, সঙ্গে টায়েরও ব্যবস্থা রেখেছে গোবিন্দ। সকালে ঘুঘনি, বিকেলে গরম-গরম চপ-পিঁয়াজি হরিনাথপুরের মানুষকে সামান্য হলেও শহুরি ছোঁয়া পাইয়ে দেয়। গোবিন্দ গর্ব করে বলে, আমার চায়ের সাথে পিঁয়াজি সোনার সাথে

সোহাগা। ঘুঘনি-মুড়ি হল গিয়ে খাঁটি সোনা, কোনো ছল-চাতুরী ভেজাল পাবে না।

কপোতাক্ষ গোবিন্দর চায়ের দোকানের বেঞ্চিটায় গিয়ে বসল। কিছু দূরে কদমগাছের পাতায় শীতের রোদ এসে গায়ে পড়া মেয়েছেলের মতো ঢলে পড়ছে। কপোতাক্ষ দোকানীর দিকে চোখ তুলে তাকালেন, আজ কাগজ আসেনি?

—আজ্ঞে না বাবু। গোবিন্দ জড়োসড়ো চোখে তাকাল। এত ছোট দোকান। ফলে খবরের কাগজ রাখার কোনো মানে হয় না। তবু লোক এসে তার দোকানে খবরের কাগজের খোঁজ করে।

বাঁধের ধারে সুনীতি ডাক্তারের চেম্বার। ডাক্তারবাবুর খবরের কাগজটা বাসওয়ালা এখানেই সুতলি বেঁধে ফেলে দিয়ে যায়। সেই কাগজ কুড়িয়ে এনে মন দিয়ে পড়ে গোবিন্দ। তার অবশ্য বিদ্যাবুদ্ধি বেশি নেই তবু সে রাজনীতিটা মন দিয়ে পড়ার চেষ্টা করে।

খাদ্য-আন্দোলনের রেশ শুকিয়ে গেলেও এখনও তার রেশ ছেয়ে আছে দেশগাঁয়ে। এক জেলার চাল আর এক জেলায় যাবে না। জোর কর্ডনিং। পুলিশী হুজ্জোতির কথা প্রায় শোনা যাচ্ছে। হরিনাথপুরে বসে শহর এবং শহরতলির খবর পেয়ে যাচ্ছে গোবিন্দ। তবু এত কড়াকড়ির মধ্যে সন্ধের আঁধারে বস্তা ভর্তি চাল পাখি হয়ে উড়ে যাচ্ছে এক জেলা থেকে আরেক জেলায়। মুর্শিদাবাদের চাল লালগোলা ট্রেনের সিটের তলায় বস্তাবন্দী হয়ে চলে যাচ্ছে শিয়ালদা-কোলকাতায়। রোজ কত নতুন নতুন গল্প জন্ম হচ্ছে খবরের কাগজের পাতায়।

গোবিন্দর চায়ের স্বাদ মন্দ নয়।

সার্কাস দলের জোকার চা-বানানোটা শিখেছে ভালো। চামচ দিয়ে ওর চিনি গোলার কায়দাটা ভারী আজব। যতক্ষণ না ফেনা উঠছে গ্লাসে—ততক্ষণ রেহাই নেই কারোর।

চা-খেয়ে দাম মিটিয়ে কপোতাক্ষ বললেন, আচ্ছা গোবিন্দ, বিদুর রাজোয়ারকে দেখেছো নাকি?

—না বাবু, সকাল থেকে তার দর্শন তো পাই নি! গোবিন্দ অনুগত তাকাল।

কপোতাক্ষ কী ভেবে বললেন, আমি ওর বাড়ি যাচ্ছি। যদি বিদুর রাজোয়ারের সঙ্গে তোমার দেখা হয় তাহলে আমার কথা বলো। বিশেষ কাজ আছে। ও যেন সত্বর বাড়ি ফিরে যায়।

চা-দোকানের এই এক ঝামেলা। গোবিন্দ মনে মনে বিরক্ত হলেও তার প্রকাশ বাইরে প্রতিফলিত হয় না। তথ্যকেন্দ্র না বলে মানুষ কেন যে চা-দোকান বলে একথা গোবিন্দর মাথায় ঢোকে না।

রাস্তা দিয়ে হাজার মানুষ যায়, তাদের হাজার কথা। দোকানেরও নিজস্ব কিছু কথা থাকে। সব কথা এক সাথে মিলেমিশে খিচুড়ির আকার ধারণ করে। তখন আসল কথাটাই ভুলে যায় গোবিন্দ। ভুলে যাওয়ার একটাই অর্থ—ঝগড়া অশান্তি বিবাদ।

গোবিন্দ জ্ঞানত এখন আর কোনো ঝুট ঝামেলায় জড়াতে চায় না। ঝামেলা মনের শান্তি কমায়। আর শান্তি কমলে আয়ু কমে যায় মানুষের।

চারফুট দশ ইঞ্চির খেলায় হায়ার যেত গোবিন্দ। দশ-বারো বছরের বালকদের বিরুদ্ধে পঁয়ত্রিশ বছরের বুড়ো ভাম খেলতে নামত। ওর পায়ে বল পড়লেই গোল। পঁয়ত্রিশ বছরের হাড়ের সঙ্গে বারো বছরের কচি হাড় কি পারে কখনো? ফলে ফুটবল ম্যাচ নিয়ে তীব্র অশান্তি। গ্রামে গ্রামে কাজিয়া-মারামারি। সব শেষে থানা-পুলিশ- হাসপাতাল। এসব শুকনো অশান্তির মূলে গোবিন্দ ঘুঁটে।

পুরঞ্জন ভট্টাচার্যের টালির ঘরটা ব্রহ্মাণীতলায়। তাঁর শ্যাওলা ধরা টালির চালে মাধবীলতার বংশ আরাম করে শুয়ে আছে। বাতাস এসে মাঝে মাঝে তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে যায়।

কপোতাক্ষ পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে পুরঞ্জনের চোখে ধরা পড়ে গেলেন।

—কী হে নেতা, আমাকে যে না দেখেই চলে যাচ্ছো! পুরঞ্জন ভট্টাচার্য সরল হাসিতে কপোতাক্ষর পথ আটকে দাঁড়ালেন, চলো, আমার টালির ঘরে সামান্য জিরিয়ে যাবে। কতদিন এদিকে তো আসো নি। এবার পঞ্চায়েত ভোটে তোমরা নিশ্চয়ই প্রার্থী দেবে?

অমায়িক হাসলেন কপোতাক্ষ, এখনও জেলা পার্টির কোনো সিদ্ধান্ত আমরা জানতে পারি নি। যদি জানতে পারি আপনাকে এসে জানিয়ে যাবো।

পুরঞ্জন বললেন, তোমাদের পার্টি খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ। আমার বিশ্বাস তোমরা এবার যোগ্য- প্রার্থী পঞ্চায়েতে দাঁড় করাবে। আমি চাই লড়াইটা হাড্ডাহাড্ডি হোক। অনেকদিন তো হল—একঘেয়ে ডাল-ভাত খেয়ে চলেছি। এবার একটু মুখ বদলানর দরকার।

পুরঞ্জন ভট্টাচার্য এ এলাকার বিশিষ্ট মানুষ। তাঁর ব্যক্তিত্ব, সততা, মানবপ্রীতি কারোর নজর এড়িয়ে যায় না। এমন দরাজ মনের মানুষ প্রতিদিন সন্ধেবেলায় সিঙ্গিল রিডের হারমোনিয়াম নিয়ে বসেন সংগীত সাধনায়। শ্যামাসংগীত তাঁর কণ্ঠে বেড়ার উপর লতিয়ে যাওয়া ঝিঙেলতার চেয়েও সুন্দর। সন্ধেবেলায় ব্রহ্মাণীতলায় পরিচ্ছন্ন এক আধ্যাত্মিক-ভাবের জন্ম হয়, যার সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং পুরঞ্জন ভট্টাচার্য। কপোতাক্ষর তাড়া ছিল। পুরঞ্জন ভট্টাচার্যের হাতে চাঁদার রসিদটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, দাদা, কালীগঞ্জ বাজারে মিটিং আছে, বাইরে থেকে ডেলিগেট আসবেন, আপনার কিছু সাহায্য দরকার।

—অবশ্যই, অবশ্যই। চাঁদার রসিদটি ধরে তিনি টাকার অঙ্কে চোখ বোলালেন, তুমি একটু বসো। আমি ঘর থেকে টাকাটা এনে দিচ্ছি। তোমাকে চাঁদা কেন দেব জানো? তোমার অ্যাক্টিভিটি আমার ভালো লাগে। আমি পার্টি দেখি না। যে পার্টি মানুষের কল্যাণ কামনা করে, মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ায়—আমি সেই দলকে সমর্থন করি। তুমি একটা নতুন ধারা, নতুন আদর্শের আবির্ভাব ঘটাচ্ছ এই গ্রামে। আমি জানি না-তুমি কতদূর সফল হবে। তবে আমার পূর্ণ সমর্থন তোমার উপর রইল। ভগীরথ মর্ত্যে গঙ্গাদেবীকে এনেছিলেন, তুমি আমাদের গ্রামে এই নতুন আন্দোলনের ভগীরথ। ভাবীকাল নিশ্চয়ই তোমাকে মনে রাখবে।

পুরঞ্জন ভটচার্যের সঙ্গে কথা বলে উৎসাহিত হন কপোতাক্ষ। এমন উদার মনের মানুষ গ্রামসমাজে খুব কমই চোখে পড়ে। এমন মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা হলেও এরা যে যে-কোন গ্রামের মেরুদণ্ড এবং মানদণ্ড এ বিষয়ে কপোতাক্ষর কোনো সন্দেহ নেই।

কদবেলতলা চায়ের দোকানে বিদুর রাজোয়ারের দেখা পেলেন কপোতাক্ষ। সাইকেল ঠেলে সোজা তিনি পাড়ার মধ্যে ঢুকে গেলেন। জগৎখালি বাঁধের ধারে ছোট ছোট ঘরগুলোয় হাজার বিক্ষোভ অবজ্ঞা বঞ্চনা যেন শুকনো বারুদের মতো জমে আছে। বিদুর রাজোয়ারের মতো মানুষ এই বারুদে দেশলাই ঠুকে দিলে যে কোনো মুহূর্তে আগুন ধরে যেতে পারে। তবে আন্দোলনের কাজে বিদুরের সাহসিকতা এবং সংযম সম্ভ্রমের দাবীদার। সে সহসা কারণ ছাড়া উত্তেজিত হয় না, আর উত্তেজিত হলে সহজে তা ঠাণ্ডা হতে চায় না।

ছোট থেকেই বিদুর অভাব, অসাম্য আর বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়ছে। তার এ লড়াই এখনও শেষ হয় নি। নিজের জীবনকে এই লড়াইয়ে বাজি রেখেছে সে। বিদুরের বাবা রামায়ণ ছিল খেতমজুর। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও তার সংসার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলত। আসলে খেতমালিকরা দিনভর খাটিয়ে নিয়ে পারিশ্রমিক দিতে চাইত না। গরিবের হাতে পয়সা তুলে দেওয়ার অর্থ কিছুটা হলেও তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া। স্বাধীনতার এত বছর পরে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। এসব ভেক কথায় মন গলত না রামায়ণের। সে কাজের

বিনিময়ে নগদ অর্থ আশা করত। বাবুরা এই সহজ শর্তে রাজী নয়, ফলে তাদের ধানাই-পানাইয়ের শেষ নেই। ন্যায্যপ্রাপ্তি না হলে সে বাবুদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নেমে যেত। একটা খেতমজুরের এত সাহস আসে কোথা থেকে? পেটে মারলে মাথা ঝিমাতে বাধ্য। আর ঝিমধরা শরীর নিয়ে মাঠের কাজ হয় না।

হতাশা রামায়ণকে কুরেকুরে খাচ্ছিল। গণেশি তাকে বোঝাল, ওভাবে ঝিম ধরে বসে থেকো না। কুঠিয়া গতর উঁইয়ে খায়। বসা দেহে ধসা হয়। কাজের মধ্যি ডুবে যাও গো.. দেখবা কতো আরাম, কতো শান্তি।

—কাজ দিলে তো কাজে যাব! রামায়ণের গলায় হতাশা, বাবুরা সব যুক্তি করে আমাকে ছেঁটে দিয়েচে। আমি কি করব? সব আমার পোকাড়ে ভাগ্য।

—যাও, বাবুদের কাচ থেকে মাফি মেঙে আসো।

—না। উটি আমার দ্বারা হবে নি। গণেশির প্রস্তাবে প্রতিবাদে ভেঙে পড়ে রামায়ণ, না খেয়ে মরব সে-ও ভালো তবু যে ছেপ ফেলে দিয়েচি তা আবার লোতুন করে চাটব না। আমি এক বাপের বাচ্চা....।

ঘরে বসে ভাবনা হয় কিন্তু পেটের দানা জোটে না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—ঘরে বেকার বসে থাকে রামায়ণ। তার বিড়ির নেশা বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে গাঁজার কলকে তার জামার পকেট থেকে খুঁজে পায় গণেশি। বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে ভয়ে। মাঠের কাজ হারিয়ে মানুষটা এখন পাগলপারা। দিন-রাত শুধু খ্যাঁক-খ্যাঁক করে কাশে। দলা দলা কফ ছুঁড়ে দেয় ধুলোয়। একবার কাশি শুরু হলে আর থামতে চায় না। ভ্যাসভেসে আওয়াজ ওঠে বুক কাঁপিয়ে।

কালীগঞ্জ হাসপাতালের ডাক্তার বললেন, কাশিটা ভালো মনে হচ্ছে না। বুকের এক্স-রে করা দরকার।

কালীগঞ্জে এক্স-রে মেশিন নেই ফলে বুকের ফটো তোলা যাবে না। ফটো তুলতে গেলে কৃষ্ণনগরে যেতে হবে। কৃষ্ণনগরে যেতে গেলে টাকার দরকার। ফটো তোলার পয়সা, বাসভাড়া আসবে কোথা থেকে? চিন্তায় গণেশির মুখ শুকিয়ে গেল। অবশেষে গলার হার, হাতের রুলি স্যাকরা-দোকানে বেচে দিল সে।

সদরে গিয়ে ফটো তুলল রামায়ণ। বুকের দোষ হয়েছে তার। ফুসফুসটা কেটে দিয়েছে যক্ষ্মা পোকায়। রোগটা ভালো নয়। ওষুধ খেতে হবে, সেই সঙ্গে পথ্য। ডিম-দুধ-মাছ-মাংস আরও কত কি! খেতে মন চায় কিন্তু টাকা কোথায়? ফলে দিনে দিনে নেতিয়ে গেল রামায়ণ। ফি-কাশিতে কফের সঙ্গে উঠে এল রক্ত। শেষে কোয়াশের দু'পাশে জড়িয়ে গেল চাপচাপ রক্ত।

একদিন দুপুরবেলায় শ্বাস আটকে গেল রামায়ণের। একটা প্রতিবাদের মৃত্যু হল খড়ের ঘরে। বিদুরের তখন জ্ঞান পড়েছে, সে বুক চাপড়ে কাঁদল গণেশির সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

যে যায় সে কিছু না কিছু রেখে যায়।

বিদুর আট ক্লাস অব্দি পড়ে আর ইস্কুলের চৌকাঠ মাড়াল না। মা মুড়ি ভাজবে, তালাই বুনবে, পরের দোরে কাঁথা সেলাই করবে—এসব পছন্দ হত না তার। সে গলা ফাড়িয়ে বলত, কেনে যাবি পরের দোরে? খেজুর পাতার ঝাড়ু বানা। আমি হাটে নিয়ে গিয়ে বেচব।

রামায়ণ রেগে গেলে বলত, পেট কি ঘরে রেখে আসব বাবু! মজুর খাটাবেন, আর মজুরদের পেটের কতা ভাববেন না-তা কি হয়? বিড়ি-মুড়ি দুটোই চাই জলখাবারে। যদি না দেন তাহলে এই আমরা হাত গুটিয়ে আলের উপর বসে রইলাম।

কোদাল চালাতে গিয়ে একবার পা কেটে গিয়েছিল রামায়ণের, বাবু তার চিকিৎসার খরচাপাতি দেবেন না—রামায়ণ এর প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। পরের দিন বাবুর লেঠেল এসে মাথা ফাটিয়ে দিল তার, বিদুর কাঁপা কাঁপা চোখে সব দেখল। বাবু জাতটা তার রক্তে ছুঁচ হয়ে ঢুকে গেল।

গণেশি কাতর হয়ে তার ঘরের মানুষটাকে বলত, ওগো, তুমার দুটা পায়ে ধরি ছেলেটার মাথা আর খেও না। নিজের তো সব্বোনাশ করেচো—ওর আর সব্বোনাশ করো না।

ততদিনে বিদুরের মনের ভেতর ভূমিকম্প ঘটে গিয়েছে। লাঙল যার জমি তার কথাগুলো উড়ে এল বিভিন্ন গ্রাম থেকে। পৃথিবীর সংগ্রামী মানুষ সব এক হও। জোতদারের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও। ইন কিলাব জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ! বাসের হেল্পারি করে বিদুর ভেবেছিল অভাবের রথটাকে থামিয়ে দেবে কিন্তু হল না। অভাবের হাজার থাবা। সে থাবাও বেড়ালের থাবার মতো লুকানো এবং রহস্যে ভরা।

বিদুরের মনে পড়ত বাবার হাতে ধরে নীলকুঠির ধারে বেড়াতে যাওয়ার কথা। বাঁধের একপাশে ইতিহাসের কঙ্কাল হয়ে, দাঁড়িয়েছিল জঙ্গলে ঘেরা নীলকুঠি। রামায়ণ তর্জনী তুলে বলত, ওই দেখ, ওই কুঠিটায় লালমুখো সাহেবরা তোর ঠাকুরদাকে বেঁধে চাবুক মারত। তুই বড়ো হয়ে এই নীলকুঠি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিস। ওর হাওয়া-বাতাসে পাপ মিশে আচে, সাবধান।

বাপের কথাগুলো ওই বয়সে সঠিক বুঝতে পারত না বিদুর, সে শুধু ভ্যালভ্যাল করে তাকাত, তার চোখে ছড়িয়ে পড়ত ক্রোধের আগুন, সে পাগলের মতো হাঁপাত, আর খোঁচা খাওয়া জন্তুর মতো ধুঁকত ক্রমাগত।

রামায়ণ ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেত, কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলত, নিজেকে সামলা। নিজেকে সামলানো বড়ো কঠিন রে! আমি পারিনি, তুই যেন পারিস বাপ।

হরিনাথপুরের আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছিল বিদুর, কৃষ্ণনগরের বাস-লাইনের বন্ধু তাকে পরামর্শ দিল কোলকাতায় পালিয়ে যাওয়ার। প্রথমে প্রস্তাবটা শুনে বিরক্ত হল বিদুর, পরে মন শান্ত হতে সে ভেবে দেখল-কালীগঞ্জের মজুরখাটা জীবন তার জন্য নয়। সবার দ্বারা সব কাজ হয় না। রামায়ণ পারে নি এই সমাজের কিছু মানুষকে মেনে নিতে। ওদের শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল কিন্তু সর্বোপরি ওঁদের কোনো মনুষ্যত্ব ছিল না। মনুষ্যত্বহীন মানুষের সঙ্গে বিবেকবান মানুষের যে সংঘাত, দ্বন্দ্ব থাকবে এ নিয়ে তার কোনো মতান্তর ছিল না। শেষ পর্যন্ত সমাজের যাঁতাকলের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল রামায়ণকে। বাবার এই পরাজয় বিদুর মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। সে দু-একবার প্রতিবাদে মুখর হয়েছে কিন্তু তার সেই প্রতিবাদকে ভোঁতা করে দিয়েছে সমাজযন্ত্র।

গণেশিও ছেলের উপর বিরক্ত। ঘরের মানুষটার মৃত্যু তাকে অসহায় করে তুলেছে দিনকে দিন। কাতর হয়ে সে বিদুরকে বুঝিয়েছে, জলে বাস করে কুমিরের সাথে লড়াইয়ে নেমে তুই পারবি নে, বাপ। তুর বাপ অসময়ে যেত নি, তার জেদ তাকে শ্মশানঘাট অব্দি নিয়ে গেল।

আট-ক্লাস পড়া বিদুর মায়ের মুখের উপর কোনো কথা বলে না। সে জানে মাকে বোঝানো এ জীবনে তার পক্ষে সম্ভব নয়। যে মহিলা সারাদিন মুড়ি ভেজে, ফাইফরমাশ খেটে বেড়ায় পরের দোরে তার পক্ষে স্বাধীনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিছু কিছু রক্ত থাকে যেখানে বশ্যতাকে ভাবা হয় অন্ধকার।

বিদুর তর্কের পথে হাঁটল না, কৃষ্ণনগরের বন্ধুর সাথে সে চলে গেল কোলকাতায়। আর যাইহোক কোলকাতায় তাকে ভিক্ষে করে খেতে হবে না। বড়ো শহরের বড়ো বুক। তার মন সংকীর্ণ নয়, খোলা মাঠ।

একটা চামড়ার কারখানায় বিদুর তার রুজি-রোজগারের সন্ধান পেল। সারা দিন কাজে ডুবে থাকা, সন্ধে হলে বস্তির ঝুপড়ি ঘরে ফিরে আসা। সময় চতুর হরিণের মতো পালিয়ে যেত কোথায়। ট্রামের ঘড়ঘড় আওয়াজ যেন বাঘের গোঁ-গোঁ আর্তনাদ, মানুষের সমুদ্রজোয়ার কোলাহল বিদুরকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত কালীগঞ্জ-হরিনাথপুর-ব্রহ্মাণীতলার রাস্তায়। প্রায়ই মনে পড়ত বাবার কথা। শোষণের কালো হাত, বৈষম্যের চোখ রাঙানী তাকে সরাসরি যুক্ত করে দিল শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে। বিদুর কোথায় থামতে হয় জানত না, তার আবেগই তাকে শেষ করে দিল। পুলিশের ফাঁদে তাকে ধরা দিতে হল শেষে। জেলের মোটা চালের ভাত যে তার জন্য নয়—এটা বুঝতে পেরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে পালিয়ে এল কালীগঞ্জে। কোলকাতায় থাকলে মালিকপক্ষের পোষা গুণ্ডারা তার প্রাণপাখিকে যে কোনো সময় লুটিয়ে দিত রাজপথে।

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে জু'নেওয়া ছাড়া কোনো কাজ রইল না বিদুরের। পুরো নদীয়ায় তখন আন্দোলনের হাওয়া দমকা বাতাসের রূপ নিয়ে এদিক সেদিক উড়ে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় কুশল মাস্টারের সাথে আলাপ হল বিদুরের। মানুষটাকে প্রথম দর্শনেই মনে ধরে গেল তার। তার মূর্খ বাবা যে ঢঙে কথা বলত, শিক্ষিত কুশল মাস্টার সেই কথাগুলোকে অন্যভাবে প্রকাশ করল। ভাষার মানে এক, শুধু পরিবেশন ভঙ্গিটাই যা আলাদা।

পার্টির মিটিং-এ কপোতাক্ষর সঙ্গে পরিচয় হল বিদুরের। মানুষটার মন গঙ্গার জলের চাইতেও পবিত্র। কারোর কাছে মাথা নত করা নয়, বুক ফুলিয়ে মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়াই তার আসল উদ্দেশ্য। তর্ক এবং তথ্যের কচকচানী দূরে সরিয়ে বিদুর নিজের মতো করে পার্টির ভাষাকে বোঝার চেষ্টা করল। পার্টির ভাষাকে শ্রম-শ্রদ্ধা এবং আনুগত্যে সে করে ফেলল হৃদয়ের ভাষা। আর হৃদয়ের ভাষা, যুক্তির স্রোতকে বাইরের কঠিন সমাজ মেনে নেবে কেন? শুরু হল আবেগহীন মানুষের সঙ্গে হৃদয়বান মানুষের সংঘাত।

সেই সংঘাত, দ্বন্দ্ব এখনও অব্যাহত। বিদুর এখন আর একা নেই, তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লাবণি। লাবণি তার শ্বাস-প্রশ্বাস, আন্দোলনের ইন-কিলাব ধ্বনি। নিঃসন্তান লাবণি এই গণ-আন্দোলনকে ধরে নিয়েছে তার সন্তান।

বাঁধের ধারে এই মাটির ঘরখানায় আলো-বাতাস আসে যথেষ্ট। বর্ষায় এই ঘরের দাওয়ায় শুয়ে শোনা যায় ছাড়াগাঙের হুঙ্কার। এখন জল সরে গিয়ে পুরো মাঠ হিল- হিল করছে হাওয়ায়। পুরুষ্ট আখগাছ তার ছিপছিপে শরীর নিয়ে কোমর দোলাতে ব্যস্ত।

শীতের এই সময় ধুঁধুঁলগাছে ফুল আসে। তিতা ধুঁধুঁলের ফুলগুলো গাঢ় হলুদ রঙের। ঘরের চালে ওরা সংসার বিছিয়েছে পরম মমতায়। খরানীকালে এই লতাগাছ শুকিয়ে একেবারে নিষ্প্রাণ বাবুইদড়ি। এখন হলুদ ফুলে সেজে উঠেছে ওর সবুজ দেহ। সেদিকে তাকিয়ে লাবণি আর চোখ ফেরাতে পারে না। কচি-কচি ধুঁধুঁলগুলো তার মনে লোভের জন্ম দেয়।

মিঠে ধুঁধুঁলের তরকারি খেতে বড়ো সুস্বাদু। ঝিঙের যেমন পোস্ত দরকার ধুঁধুঁলের শুধু আলু হলেই কিস্তিমাত। কিন্তু অত সাধ করে রাঁধা রান্নাটা মাঠে মারা গেল। যাকে ভেবেছিল মিঠে ধুঁধুঁল সেগুলো একেবারে তিতার তিতা। ফলে দুপুরবেলা পুরো তরকারিটাকে ফেলে দিতে হল লাবণির।

ওই সুন্দর ধুঁধুঁল গাছটার উপর তার বেশ অভিমান হল। যে গাছ মানুষের উপকারে লাগে না তার কি দাম? মাকালফলে চোখ ভরে কিন্তু মন ভরে না। বিদুর বলেছিল, আহা, গাছটাকে দোষ দিয়ে কী হবে? প্রকৃতি সবাইকে একরকম সাজ পরায় না। এখানে লঙ্কা গাছের পাশে তেঁতুলগাছও থাকবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

লাবণি কি যেন বলতে যাবে ভাবছিল, হঠাৎ সাইকেলের ঘটাং-ঘটাং শব্দ পেয়ে সে মুখ তুলে দেখল কপোতাক্ষ ঘেমে-নেয়ে একসা হয়ে নেমে আসছেন বাঁধের নিচে। হঠাৎ লাবণির কী হল, সে চিৎকার করে বলল, ওগো শুনছো, দেখো কে আসছে! কপোতাক্ষ এগিয়ে এলেন ঘরের কাছাকাছি, সাইকেলটা আমড়াগাছে হেলান দিয়ে বিদুরের দিকে তাকালেন, কেমন আছো বিদুর? অনেক দিন তোমার কোনো খবর পাইনি। তাই আজ কাজ পড়তেই চলে এলাম।

স্বভাব সুলভ হেলে উঠল বিদুর, আপনি এসেছেন ভালোই হল। এ তো আমার কাছে মেঘ না চাইতে বৃষ্টির সমান। তা দাদা বলুন। একটু লাল চা হয়ে যাক। চায়ের অনুরোধে ইতস্ততবোধ করলেন কপোতাক্ষ, এই মাত্র গোবিন্দর দোকান থেকে চা খেয়ে এলাম। তবে তোমার যদি খেতে মন হয় করতে বলো। চায়ে আমার অরুচি নেই। কপোতাক্ষ থামলেন, লাবণিকে বলো ও যেন একটু বাইরে আসে। আমার হাতে সময় কম। কালীগঞ্জে কয়েকটা কাজ সেরে আমি মানিকডিহি ফিরব।

লাবণী এল। পরনের শাড়িটা সে বদলে এসেছে। বাইরের লোকের সামনে অমন ছেঁড়াফাটা শাড়ি পরে আসা যায় না। সঙ্কোচবোধ হয়। কপোতাক্ষ তার অনেক দিনের পরিচিত। তখন প্রায় হরিনাথপুরে আসতেন। লাবণির বাবার সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল। বাবার মৃত্যুর পর কপোতাক্ষ আর লাবণিদের বাড়িতে আসেন নি। আসতে ভালো লাগত না।

খাটিয়ায় বসে কপোতাক্ষ আগামী মিটিংয়ের কথা ওদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। একটা ছাপানো রসিদ বই বিদুরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, চাঁদা না উঠলে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে হবে না। আমি পুরঞ্জন ভটচাযের কাছ থেকে চাঁদা নিয়েছি। তোমার উপর পুরো হরিনাথপুর কালীগঞ্জ কামারী আর অনন্তপুরের দায়িত্ব থাকল। ঘরে বসে থাকলে পার্টির কাজ এগোবে না। আমাদের মানুষের কাছে যেতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে। সবাই যে আমাদের আদর্শকে গ্রহণ করবে এমন নয়। দশজনের কাছে গিয়ে যদি একজন আমাদের আদর্শকে গ্রহণ করে তাহলে সেটাই হবে আমাদের চরম লাভ। বিদুর সঙ্কোচ কাটিয়ে বলল, দাদা, সবই তো বুঝলাম কিন্তু কেউ আমাদের কথা শুনতে চায় না। মানুষের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতার অভাব। সামাজিক বৈষম্য কুরে কুরে খাচ্ছে তবু ওরা নীরব।

কপোতাক্ষ নীরব হাসলেন, ওদের ঘা মেরে বাঁচাতে হবে। ওদের জাগাতে হবে। মানুষকে যদি আমরা সচেতন করতে না পারি তাহলে আমাদের আন্দোলন বৃথা হয়ে যাবে। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের তাদের মতো করে কথা বলা শিখতে হবে। এরা মার্কস লেনিন বোঝে না। এরা মানুষের ভাষা ও মন বোঝে। এদের মনে একবার ঠাঁই করে নিলে আমাদের আন্দোলন আয়ুষ্মান হবে।

—আমি আপনার কথা বুঝি কিন্তু—। বিদুর আশার দৃষ্টি মেলে কপোতাক্ষ দিকে তাকাল, সবাই এখন কিছু কাজের বিনিময়ে প্রাপ্তিযোগ আশা করে। আমাদের দল তাদের কিছু পাইয়ে দিতে পারবে না। সমস্যাটা এখানে বেশি দেখা দিচ্ছে।

—আমি তোমার সমস্যাটা বুঝতে পারছি। কপোতাক্ষ থমথমে গলায় বললেন, পাইয়ে দেবার দল করলে সেই দলের আয়ু বেশি দিন হয় না। আমরা ওপথে হাঁটব না। আমাদের পথ ভিন্ন।

লাবণি বলল, আমি আপনার কথাকে সমর্থন করি। আমরা কাকে কী দিতে পারব, আমাদের সামর্থ্য বা কোথায়? তবু আমরা খাসজমি দখলের লড়াইয়ে নেমেছি। পুলিশ- প্রশাসন আমাদের সমর্থন করেনি। ওরা আমাদের গ্রেফতার করেছে, চালান দিয়েছে। শারীরিক অত্যাচার সত্ত্বেও

আমাদের আন্দোলন থেমে নেই। আমরা মালিকপক্ষকে টলিয়ে দিতে পেরেছি—এটাই আমাদের সফলতা। এটাকে খাটো করে দেখা উচিত নয়।

আলোচনার মাঝখানে সূর্য উঠে গেল মাথার উপর। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কপোতাক্ষ, এবার আমাকে উঠতে হবে। বেলা অনেক হল—।

—সে কী এই দুপুরবেলায় আপনি কোথায় যাবেন? লাবণি আন্তরিকতার সঙ্গে বলল, আজ দুটো ডাল-ভাত এখানেই খেয়ে নেবেন। আমি আপনাকে আসতে দেখে হাঁড়িতে চাল দিয়ে দিয়েছি।

—সেই ভালো, অনেকদিন আপনি এই গরীব বাড়িতে খাননি। বিদুরের হাসির মধ্যে সূক্ষ্ম রসিকতা মিশে ছিল।

কপোতাক্ষ বললেন, খাওয়ার দিন কি পালিয়ে যাচ্ছে? আসা-যাওয়া চলতেই থাকবে। আজ আমাকে যেতে দাও। তোমাদের বৌদি সকালে খুব মাথা গরম করল। আজ আমি যাই, পরে একদিন শান্তিমতো খাবো।

লাবণি আশাহত হলেও তার ব্যবহারে তা প্রকাশ পায় না। কপোতাক্ষর মতো মানুষ এ গ্রামে পাওয়া খুব দুষ্কর। তিনি গরীব মানুষদের কাছে জ্যান্ত ভগবান। তাঁর ব্যবহার ধনী-দরিদ্র সবার জন্য একরকম।

লাবণি এই মানুষটার কাছে চির ঋণী। সে দিনের ঘটনাটা লাবণি কি এই জীবনে ভুলতে পারবে নাকি তা ভোলা সম্ভব? কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ফিরতে সেদিন দেরী হয়েছিল অনেকটা। লালগোলা ট্রেন লেট করল দেবগ্রাম পৌঁছাতে। শেষ বাস চলে গিয়েছে কালীগঞ্জে। চৌমাথার কাছে চলে এসে দিশেহারা লাবণি কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। এদিকে আকাশের অবস্থা ভালো নয়। মহিষবর্ণ মেঘের ভেতর বিদ্যুৎ-এর সাপ ফণা তুলে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে।

দু'বছর কলেজ যাতাযাত হল লাবণির কোনোদিন সে এমন বিপদে পড়ে নি। বাবা বেঁচে থাকলে ঠিক সাইকেল নিয়ে দেবগ্রামে হাজির হত। সেদিন বাবার অনুপস্থিতি সে মর্মে মর্মে টের পায়।

দেবগ্রামে থেকে যাবে তেমন কোনো জানাশোনা নেই। এত বড়ো শীতের রাত সে পার করবে কীভাবে? এদিকে আাকাশের হুঙ্কারে বিদ্যুৎ-এর মধ্যে ঝরে যাচ্ছে অহঙ্কার। বৃষ্টি আজ পাগল হয়ে নাচবে। তার উন্মাদ নৃত্যে ছারখার হয়ে যাবে এ অঞ্চল। এখন একটাই উপায় দেবগ্রাম স্টেশনে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া। স্টেশনমাস্টার তার মুখ চেনা। নিশ্চয়ই তিনি সাহায্য করবেন এই বিপদের কথা শুনে।

ভূত আর অন্ধকারকে ভয় পেত না লাবণি। তার ভয় শুধু বদমানুষকে। হেন কাজ নেই যা মানুষ পারে না।

লাবণি স্টেশনে যাবে কী না ভাবছিল, ঠিক তখনই একটা ভ্যান-রিকশা এসে দাঁড়াল তার সামনে। পাকা দাড়ির বয়স্ক মানুষটাকে লাবণি চিনত আগে থেকে।

ফকির মোল্লা কালীগঞ্জের পাকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলল, দিদিমণি, যাবে নাকি?

—যাব তো, কিন্তু ভাড়া কত দিতে হবে?

—তুমার কাচ থিকে বেশি লিব না গো। যা সবাই দেয় তুমিও তাই দিও।

—কাকা, অত টাকা তো আমার কাছে নেই। এখন যা আছে দিয়ে দেব, বাদবাকিটা পরে দিয়ে দেব।

—ও তুমি উঠো তো, ভাড়া নিয়ে ভেবো না। ফকির মোল্লা অভিভাবকের গলায় বলল,

তুমি আমার বড়ো মেয়ের মতুন গো। তুমাকে আগে ভালো মতুন পৌঁছে দিই, ওতে আমার ধর্ম হবে।

রাত বেশি হয়নি। অন্ধকার চিরে এগিয়ে যাচ্ছিল ফকির মোল্লার ভ্যান-রিকশাটা। হাটগাছা ছাড়িয়ে ভ্যান-রিকশাটা কামারীর দিকে চলেছে, হঠাৎ বাঁ-দিকের আখখেত চিরে যমদূতের মতো উঠে এল দু'জন যুবক। ওদের নেশায় জড়ানো চোখ, পেশিবহুল শরীরে কামরস টগবগ করে ফুটছিল।

ভ্যান-রিকশার সামনে দাঁড়িয়ে ওরা ফকির মোল্লাকে খিস্তি দিয়ে বলল, এ রাস্তা কি তোমার বাপের রাস্তা? যখন খুশি আসবে-যাবে অথচ ট্যাকসো দেবে না—এ হতে পারে না। নামো শালা, আজ হিসাব সব চুকিয়ে নেব।

ফকির মোল্লা কাতর হয়ে বলেছিল, ছেড়ে দাও গো, মেয়েটারে পৌঁছে আসি। আহা দেখছ না—বেচারির মুখ কেমুন শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েচে!

—আমসি! আ হা-হা! এই আমসিই আমরা চুষে খাবো। ভ্যানের উপর ঝুঁকে পড়েছিল একজন। তার মুখে ভকভকানো দেশি মদের গন্ধ পেল লাবণি। ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে সে কী করবে ভাবছিল। তখনই দ্বিতীয়জন তার মুখের উপর তিন ব্যাটারির টর্চ মারল, বাঃ, মালটা তো খাসা! কই এর আগে লায়লাকে কোথাও দেখিনি তো।

—আজ ফিস্টি হবে। বলল অন্যজন।

ফকির মোল্লা বুঝতে পেরেছে ছেলে দুটির মতিগতি ভালো নয়। এতদিন রাত-বেরাতে রিকশা নিয়ে যায় আসে কই এমন ইবলিশের দেখা তো সে পায়নি। তবে এরা কারা? ওরা যে-ই হোক ফকির মোল্লা এদের ছেড়ে দেবে না। জান থাকতে এদের হাতে লাবণিকে সে তুলে দিতে পারে না।

লাবণি ভয়ে কাঁপছিল। টর্চের আলোটা চোখে অসহ্য লাগতেই সে প্রতিবাদ করে বলল, অভদ্রের মতো মুখে লাইট মারছো কেন? তোমরা কে, কি চাও?

—তোমাকে চাই। সুর করে কথাগুলো বলে ওদেরই একজন খপ করে চেপে ধরল লাবণির নরম হাতটা। হ্যাচকা টান দিয়ে লাবণিকে জোর করে টেনে আনল নিজের কাছে। লাবণি মোড়া মারছিল মাজায় বাড়ি খাওয়া খরিস সাপের মতো।

এই নক্কারজনক দৃশ্য সহ্য হল না ফকির মোল্লার। সে হুঙ্কার দিয়ে বলল, ছেড়ে দে কাফের, নাহলে তুদের আজ খতম করে দেব। কী ভেবেছিস কী তোরা? বুড়া হয়েচি বলেই কি ইমানটা আমার বুড়া হয়ে গেচে। ভ্যান-রিকশা গড়িয়ে দিয়ে বুনো মোষের গোঁ নিয়ে তেড়ে গেল ফকির মোল্লা। ছেলে দুটো লাবণিকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে এল সক্রোধে। নিমেষে ওদের একত্রিত পাশবিক শক্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল ফকির মোল্লার উপর। এক সময় রাস্তার উপর শুইয়ে দিল ওকে। বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখানোর শেষ ইচ্ছেটুকু মুখ থুবড়ে পড়ল নির্জন পিচ রাস্তার উপর। গঙিয়ে উঠে বলল, বেটিরে পালা, যেদিকে মন চায় আঁধারে তুই পালা।

লাবণি পালাল না, মাথা সোজা করে দাঁড়াল। ফকির মোল্লার ডান কাঁধে ধারালো চাকু ঢুকিয়ে দিয়েছে ওদের একজন। রক্তে ভিজে গিয়েছে ওর ছেঁড়া গেঞ্জিটা। লাবণি ফকির মোল্লার কাছে ছুটে যেতে গেলে তার পথ আটকে দেয়। শেষে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় রাস্তার পাশের খেতটায়। শুকনো আলসের বিছানায় তাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে শুইয়ে দেওয়া হয় কালো আকাশের নিচে। তারপর পর্যায়ক্রমে শুরু হয় ধর্ষণের মহড়া। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল ততক্ষণ দাঁতে দাঁত টিপে নিজেকে

বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল লাবণি। পরের দিকে নেতিয়ে যাওয়া শালুকফুলের মতো গা-হাত-পা এলিয়ে পড়ে রইল সে। তার সংজ্ঞাহীন শরীরে পর্যায়ক্রমে বিষ ঢেলে দিল সময়।

পরের দিন যখন জ্ঞান ফেরে লাবণির তখন সে দেখে হাসপাতালের সাদা চাদরে জ্বলজ্বল করছে তার শরীরের রক্তদাগ। অসহ্য যন্ত্রণায় থাইয়ের কাছে হাত নিয়ে যেতে পারছে না সে। শরীরের সংযোগস্থল অবশ আর ভার হয়ে আছে। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তার মা তখন চোখের জলে ভাসছে। কপোতাক্ষ নিচুগলায় কথা বলছেন পুলিশ অফিসার আর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে।

চারদিনের মাথায় হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়ে গেল লাবণির। সে তখন আর বাড়ির বাইরে বেরতে পারে না। তার ফর্সা মুখ কালি হয়ে আছে কলঙ্ক দাগে। গ্রামের বউরা তাকে এসে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে একের পর এক। কেউ চাপা গলায় বলছে, ভয় নেই। বিষগুলো সব ওয়াশ করে বের করে দিয়েছে।

কেউ তার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে, মেয়েটাকে এবার পরের ঘরে পাঠিয়ে দাও বৌদি। ওর যখন বাবা নেই কতদিন তুমি আর পুষবে!

পুরোপুরি সুস্থ হতে লাবণির লেগে যায় ছ'মাস। এই ছ'মাসে অন্তত তিনজন পাত্র তাকে দেখে পছন্দ করে গেল। কিন্তু তারা যখন কানাঘুষোয় শুনল লাবণি ধর্ষিতা, তখন তারা আর ওদের ঘরের ছায়া মাড়াল না।

ধীরে ধীরে মন ভেঙে গিয়ে ধুলোয় লুটিয়ে গিয়েছিল লাবণির। মায়ের মুখের দিকে সে তাকাতে পারত না, কষ্ট হত। তার মা আক্ষেপ করে বলত, কেন বেঁচে রইলি, মরে গেলেই বুঝি ভালো হত তোর! তুই চলে গেলে আমিও তোর পিছু নিতাম। এ জ্বালা আর সহ্য হয় না মা-বুড়োমা। দয়া করো গো, দয়া করো।

কৃষ্ণনগরে চেক-আপ-এ গিয়েছিল লাবণি। লেডি-ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বললেন, সরি, তোমার গর্ভধারণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ইডিয়েটগুলো শুধু তোমার সতীত্ব নয়, মাতৃত্বও কেড়ে নিল!

বাস থেকে নামতে গিয়ে পা-টলে গিয়েছিল লাবণির, সারাক্ষণ নিজের সঙ্গে নিজেই যুদ্ধ করেছে সে। এই কঠিন কথাগুলো সে মায়ের কাছে কিছুতেই বলবে না। ভেঙে পড়া মানুষকে টুকরো-টুকরো করে কী লাভ হবে তার? পরাজয় অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়। মৃত্যুই হতে পারে যন্ত্রণা মুক্তির সিঁড়ি।

ব্রহ্মাণীতলায় না নেমে কী ভেবে সে নেমে পড়ল আগের স্টপেজ কদবেলতলায়। এখান থেকে সামান্য পথ হাঁটলেই জগৎখালির বাঁধ। বাঁধের নীচে বুড়িগাঙের ক্ষীণ ধারা। সেই ধারা শেষ হলে শুরু হয় দিগন্ত সবুজ করা আখের খেত। সাহেবদের ভগ্নপ্রায় নীলকুঠিটার চারধারে বুনো আগাছার ঝোপ। সাপখোপ, পোকামাকড়ের রাজত্ব। আজ আর ঘরে না গিয়ে বিষতেলটা ওখানেই খেয়ে নেবে সে। মরবার জন্য এমন উত্তম জায়গা সে আর কোথায় পেত?

হাঁটতে-হাঁটতে নীলকুঠীর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল লাবণি। বিদুর বিড়ি খেতে এসে দূর থেকে

তাকে দেখে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে ঘোট পাকায় সন্দেহ। ভর-সন্ধ্যায় এ পথে তো কোন মেয়ে হাঁটে না। এ পথ দিনের বেলাতেও মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়। তাহলে কী উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে আসছে মেয়েটি? কাদের ঘরের মেয়ে, কী নাম ওর? বিদুর আগ্রহকে সামাল দিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়াল।

লাবণি ঝোপের পাশ দিয়ে সোজা ভয়হীন চিত্তে চলে গেল নীলকুঠীর পেছনে। ওর সাহসকে বাহবা না দিয়ে পারল না বিদুর। পা টিপে-টিপে সেও লাবণিকে অনুসরণ করল।

কিছু দূর এগিয়ে লাবণি চারপাশ দেখে নিয়ে হাতের ব্যাগটা অবজ্ঞা ভরে ছুঁড়ে দিল ঘাসের উপর। তারপর ঝাঁকুনি দেওয়া শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল ব্যাগের কাছাকাছি। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না সে, দু'হাত বিছিয়ে শরীরের ভার আলগা করে বসে পড়ল ঘাসের উপর। ব্যাগ খুলে নতুন একটা কৌটো হাতে নিয়ে সে কাঁদল অনেকক্ষণ। প্রথমে ফুঁপিয়ে, তারপর সশব্দে। অন্ধকার চিরে বাতাস বয়ে আনল তার কান্না। বিদুরের যুবক হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠল নিমেষে। এবার সে স্পষ্ট বুঝতে পারল মেয়েটির নিরালায় আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী।

বিষকৌটোর ঢাকনা খুলে মেয়েটি যখন চরম সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে তখনই বিদুর ছোঁ মেরে কৌটোটা কেড়ে নিয়ে ভর্ৎসনার গলায় বলল, তোমাকে আমি গাঁয়ের সব চাইতে ভালো মেয়ে বলে জানতাম। আজ বুঝতে পারলাম—তোমার যা কিছু ছিল সব লোক দেখানো। আসলে একটা উঁইপোকার যা সাহস আছে—তোমার তা নেই। তুমি একটা ভীতুর ডিম।

—বিদুরদা, তুমি সব জানো না। জানলে একথা বলতে না। চোখের জলে গলার স্বরও আর্দ্র হয়ে উঠল লাবণির।

—আমি সব জানি। দাদা আমাকে সব বলেছেন। বিদুর রাগে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল, তোমার কী হয়েছে যে তুমি মরবে? তোমার যা ঘটেছে, এমন ঘটনা সারা দেশে হাজার হাজার মেয়ের ঘটছে। তা বলে তাদের সবাই তোমার মতো মরতে যায় না। ছিঃ!

লাবণি এই তোড়ের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। সে ঘাসের দিকে মুখ করে নীরবে চোখের জল ফেলে যায়। নিজের স্বপক্ষে তার একটা কথাও বিদুরের ক্ষুরধার যুক্তির কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।

বিদুর আদেশ করা গলায় বলে, চলো, আমি তোমাকে ঘর অবধি পৌঁছে আসি। আজ যা পাগলামি করলে আর কোনোদিন যেন না শুনি এমনকথা।

—আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। তুমি কেন আমাকে বাঁচাতে চাইছ, বিদুরদা?

—মরার মধ্যে এমন কী বাহাদুরী আছে? বিদুর উষ্ণ চোখে তাকাল

সেই উত্তাপে কুঁকড়ে গেল লাবণি, আমি আর ঘরে ফিরতে চাই না।

—কোথায় যাবে তুমি?

—আমি জানি না।

—আর পাগলামী করো না। রাত হচ্ছে। চলো বলছি—। বিদুর ওর হাত ধরে টানল। লাবণি স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আবার ধপাস করে বসে পড়ল মাটিতে। চোখের জলে গাল ভিজে যাচ্ছিল ওর।

বিদুর ব্যথিত। অবশেষে নিরুৎসাহিত হয়ে বলল, তুমি যা ভালো বোঝ কর। আমার কিছু ভালো লাগছে না। আমি ঘরে চললাম—

—দাঁড়াও। কান্নায় গলা বুজে এলেও কোনমতে লাবণি। বলল, আমি তোমার সাথে যাব। আমাকে নিয়ে চলো।

—আমার সাথে যাবে?

—কেন তোমার সাথে গেলে আমার কি হবে?

—তোমার জাত চলে যাবে। সারা হরিনাথপুরে ঢিটি পড়ে যাবে। বিদুর তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, তখন পারবে তো সহ্য করতে?

লাবণির বেতের মতো ছিপছিপে শরীরে একটা ঢেউ উঠল, ঘৃণায় বেঁকেচুরে গেল ওর গোলাপী ঠোঁট, চোখের মোলায়েম ভাবটা সরিয়ে সে রুক্ষ্ম গলায় বলে উঠল, বেঁচে উঠেছি যখন তখন আর আমি মরার কথা ভাবব না। তুমি আমাকে আশ্রয় দাও।

—চাইলেই সবকিছু পাওয়া যায় না, লাবণি। তুমি বড়ো হয়েছ। সব কিছু বুঝতে শিখেছো। এমন পাগলামী করো না। ঘরে চল। নিজের ঘরে ফিরে গেলে তোমাকে আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না। বিদুর সাধ্যমতো চেষ্টা করল বোঝাবার। কিন্তু লাবণির কোনো কথা মাথায় ঢুকল না। এক অস্থির অবুঝ পাগলামী তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ালো।

অবশেষে লাবণির জেদের কাছে হার-মানতে বাধ্য হল বিদুর। সে রাতটা লাবণি বিদুরের ঘরে কাটিয়ে ফিরে গেল তার নিজের বাড়িতে। মাকে সবকিছু বলল সে। তারপর নিজেব জিনিসপত্র নিয়ে চিরদিনের জন্য ঘর ছেড়ে চলে এল সে। তার মা সুর করে কাঁদল। সেই ছোঁয়াচে সুর মন গলাতে পারল না লাবণির। জীবনে অনেক ভুল হয়েছে তার। আর সে ভুলের পথে হাঁটতে চায় না। জাতপাতের পাঁচিলকে সে উপড়ে ফেলবে।

কপোতাক্ষর সামনে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। কোনো মন্দির বা দেবালয় সাক্ষী থাকল না এই বিয়েতে, কেননা ছোটবেলা থেকে বিদুর এসব লোক-লৌকিকতার বাইরে।

লাবণিও সমর্থন করল তাকে।

লাবণি ঘোষ থেকে লাবণি রাজোয়ার হতে ওর সময় লাগে মাত্র দশ মিনিট। কপোতাক্ষ ওদের আশীর্বাদ করেন, সুখী হও তোমরা। সার্থক হোক—তোমাদের যৌথ প্রচেষ্টা।

ব্রহ্মাণীতলার পঞ্চায়েত অফিসে বিদুর প্রায়ই যায় দলবল নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে। সেই দলের একেবারে অগ্রভাগে থাকে লাবণি। দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে তার জঙ্গি মনোভাব গ্রাম-প্রধান ডাঃ সত্যপ্রিয় সান্যালকে বেশ সমস্যায় ফেলে দেয়। তিনি বাধ্য হন মেহনতী মানুষের দাবিকে শ্রদ্ধা জানাতে।

খুব দ্রুত না হলেও একটা চাপা সমর্থন বিদুরের পক্ষে গড়ে উঠেছে। খাসজমি দখলের লড়াইয়ের সময়ে এই সত্যটা আরও বেশি করে প্রমাণিত হল।

সত্যপ্রিয়বাবু সেই প্রথম বিদুরকে চেয়ারে বসার অনুমতি দিয়ে বললেন, এই পঞ্চায়েত আমাদের সবার। এর সম্মান অটুট রাখার দায়িত্বও আমাদের। কোনরকম হঠকারিতায় আমরা যাব না। আমাদের সমস্যা আমরা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেব।

সত্যপ্রকাশবাবু ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। বিহার থেকে তিনি তাঁর ডাক্তারি পাশের রেজিস্ট্রেশন জোগাড় করেছিলেন অধিক অর্থের বিনিময়ে। তা সত্ত্বেও তাঁর চিকিৎসা ব্যবস্থায় গ্রামের সাধারণ অভাবী মানুষ উপকার পেত। তারা দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করত সত্যপ্রকাশবাবুকে। এইভাবেই তার জনপ্রিয়তা সেবার মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছিল শিখরে। সহজে তার আসন টলানোর ক্ষমতা ছিল না বিদুরের। রাজ্য-রাজনীতিতে তখন এক চরম সঙ্কটময় অবস্থা। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ধুঁকছে। শুরু হয়ে গিয়েছে পতনের পর্ব। জাল-জুয়াচুরি আর সন্ত্রাস থাবা মারছে রাজ্যের গ্রাম-শহরে। আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের হানায় ব্যতিব্যস্ত সর্ব শ্রেণীর মানুষ। কপোতাক্ষবাবু এই

সময়টিকে বেছে নিলেন লড়াই করার জন্য। দুর্নীতি আর শাসক দলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তার কণ্ঠস্বর। একটা পরিবর্তনের আলো চারদিক থেকে প্রতিফলিত হল আন্দোলনকারীদের চোখে-মুখে। গ্রাম-প্রধান সত্যপ্রিয়বাবু ভয় পেলেন না। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, আমি চাই সত্য এবং প্রকৃত ধর্মের জয় হোক। রাজনীতির উর্ধ্বে গুরুত্ব পাক মানুষ। আমি থাকব না, হয়ত আমার দলও থাকবে না, তা সত্ত্বেও আমি চাই এই পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা বেঁচে থাকুক। গ্রামের মানুষের স্বার্থে এর প্রয়োজন আছে। আমার বিশ্বাস এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাই পারবে গ্রামকে কুসংস্কারমুক্ত করতে। এবং সুখের কথা একাজ অনেক আগেই শুরু হয়েছে। বিদুর সেই দলের অগ্রণী নেতা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিকে বিদুর তাকিয়ে ছিল অধীর আগ্রহে। কপোতাক্ষও আশা করেছিলেন নির্বাচনের ফলাফল তাদের অনুকূলে যাবে। কিন্তু গ্রামসমাজের শম্বুক-গতি পরিবর্তন তাদের ব্যথিত করল।

লাবণি বিদুরকে বোঝাল, মন খারাপ করো না। আমাদের আরও মানুষের কাছাকাছি যেতে হবে। মানুষের আস্থা অর্জন করতে গেলে আমাদের হতে হবে তাদেরই লোক। নিজের মানুষ না হলে তাদের সমর্থন আমরা পাব কি করে?

ধুঁধুল গাছটা উঠে গিয়েছে কাঁটায় ভরা কুলগাছে। হলুদ আলোর ফুল ফুটেছে সবুজ ঘিরে। বাজারের একদিকটা সব সময় জমজমাট। বাঁধের কাছ থেকে ভেসে আসছে সব সময় গম-পিষানো মেসিনের শব্দ। চরসুজাপুর দোয়েমের মানুষরা ভিড় করে আসে গম পিষাতে। গম-পিষাতে এসে বাজার করে চলে যায়। কালীগঞ্জের মাটির হাঁড়ি-সরা-পাতনা সস্তা। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। দশ-গাঁয়ের মানুষ আসে শাক-সবজি নিয়ে বেচতে। দামেও কম, পাওয়াও যায় টাটকা। এছাড়া সোম-শুক্র দেবগ্রামের ব্যাপারীরা দোকান দেয় ভূষিমালের। কেউ আবার কাপড়ের গাঁট খুলে ছড়িয়ে দেয় বাজারে। রেডিমেড পোশাকও পাওয়া যায় সেখানে। দরদাম করে দেখে-শুনে কেনা যায়।

হাটবারে বাঁধের কাছ থেকে ভিড় লেগে থাকে। বিদুর একটা জলচৌকির উপর দাঁড়িয়ে খালি গলায় বক্তব্য রাখে সেখানে। হাটের মানুষ বক্তব্য শুনতে চায় না, তবু কানে যতটুকু ঢোকে সেটুকুই বা কম কি। রাম একদিনে লঙ্কায় যাবার সেতু বাঁধতে পারেনি। বানরসেনার ভূমিকা সেখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। শোনা যায় কাঠবেড়ালিও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল সেতু বাঁধায়। বিদুরও সেইরকম কিছু একটা করে দেখাতে চায়।

লাবণি সবসময় তার সঙ্গে গাছের ছালের মতো আটকে আছে। অভাব-অনটন তাকে প্রতিজ্ঞা থেকে সরাতে পারে না। সংগঠনের কাজের জন্য সে নিবেদিত প্রাণ। ঘরে বসে খবরের কাগজের উপর আলতা দিয়ে সে স্লোগান লেখে যত্ন সহকারে। জেলা শহর কৃষ্ণনগরে সম্মেলন থাকলে তারা বুকে ব্যাচ লাগিয়ে লালগোলা ট্রেনে চেপে বসে। ট্রেনে গেলে যাওয়া-আসার ভাড়াটা বেঁচে যায়, সেই সামান্য অর্থটুকু বেঁচে থাকার জন্য কাজে লেগে যায়।

বিদুর লাবণির কষ্ট দেখে বোঝায়, সব মিটিংয়ে তোমার না গেলেও চলবে। আমি মিটিং থেকে ফিরে এলে তার সারাংশটা বলে দেব।

লাবণি মৃদু হাসলেও এই প্রস্তাব তার মনে ধরে না, তুমি খেলে আমার যদি পেট ভরে যেত তাহলে পৃথিবীতে হাঁড়ির সাইজ আরও ছোট হয়ে যেত। মিটিং মিছিল সম্মেলনে যে যাই—এতে আমার স্বার্থ থাকে। শীতের দিনে মানুষ আগুন পোহায় শীত লাগে বলে। সব মানুষেরই নিজেকে তাতিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন। ঠাণ্ডা মানুষ মানে তো মৃত মানুষ। এই মিটিং মিছিল

আমার কাছে আগুন পোহানো।

সেদিন কালীগঞ্জ বাজারে বিদুরের সঙ্গে তর্ক বেঁধে গেল শিবনাথবাবুর। তার কাছে চাঁদা চাইতে গিয়েছিল বিদুর। শিবনাথবাবু স্পষ্ট মুখের উপর বলে দিলেন, কোনো ভিখারী পার্টির উপর আমার কোনো সহানুভূতি নেই। তোমরা কি ভেবেছ বলো তো বিদুর? কৌটো ঝাঁকিয়ে চাঁদা তুলে পুরো দেশটাকে কি ভিখারি সাজিয়ে দেবে? যাও ভাই, আমার মাথা গরম করে দিও না।

বিদুর রাগল না, দয়ার চোখে তাকাল, শিবনাথদা, একটা কথা বলি, খারাপভাবে নেবেন না। আমাদের দেশটা তো অনেক আগে থেকেই বিদেশের কাছে ভিখারি সেজে বসে আছে। ফলে আপনি আমি সবাই যে যার মতো ট্রেন্ড-ভিখারি। আমার কৌটো নাড়ানোতে আপনার যদি এত আপত্তি তাহলে নিজের জমিদারীটাকে সামলে রাখার জন্য সচেষ্ট হোন। নাহলে সরকারী নীতির মুখোশ খসে পড়লে আপনারা বিশেষত অসংশোধনবাদী সামন্তপ্রভুরা বিপদে পড়বেন।

—সে যখন বিপদে পড়ব তখন দেখা যাবে। আগে মরি, তারপর তো ভূত হবার প্রশ্ন।

—আপনার বাঁধের ধারে যে জমিগুলো আছে—সেগুলোর দলিল সম্ভবত আপনার কাছে নেই। আমরা ভূমি ও রাজস্ব দপ্তরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি। জেলা স্তরে এ নিয়ে আমাদের আলোচনাও হয়েছে। খুব শিঘ্রি আমরা খাসজমি দখলের অভিযানে নামব। আমরা কৃষিজমির সুবণ্টন এবং সমবণ্টন দাবী করেছি সরকারের কাছে। সরকারের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া না পেলে আমাদের আন্দোলন লাগাতর চলতে থাকবে। বিদুরের কথা শুনে শিবনাথবাবুর মুখের গোলাপী আভা নিমেষে কাশফুলের আকার ধারণ করল। অতিরিক্ত চিন্তায় ধড়ফড়িয়ে উঠল তার বুক, কোনোমতে ঢোক গিলে বললেন, পুলিশ-প্রশাসন সব আমাদের দখলে। একটা ফোন ঘোরালে সব এসে পোষা পাখির মতো শিস দেবে। জানো তো টাকায় আজকাল কি না হয়? টাকায় এমন যাদুশক্তি আছে যা দিয়ে এ দুনিয়ার সব কিছু কেনা যায়।

—সব কিছু কেনা গেলেও মানুষ কেনা যায় না।

—যায় বিদুর যায়। তুমি ছেলেমানুষ। নতুন রাজনীতি করছ। কিচ্ছু বোঝ না। যখন রাজনীতিটাকে হজম করবে তখন তোমার ভেতরে একটা নিজস্ব নীতির জন্ম হবে। সেই নীতি তোমাকে বানের জলে ভাসা কচুরিপানার গাছের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তখন তোমার মিথ্যা আদর্শবোধ ঠাঁই পাবে না। তুমিও ভেসে যাবে। শিবনাথবাবুর কণ্ঠস্বরে জেদ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আর কথা বাড়ায়নি বিদুর, চাঁদা না নিয়ে সে সোজা চলে এসেছিল পার্টি অফিসে। কালীগঞ্জ বাজারে শিবনাথের বন্ধকী কারবার, এছাড়া আছে সোনা-রূপার ব্যবসা। গ্রামের গরীব মানুষরা দায়ে পড়লে তার দারস্থ হয়, চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে চিন্তায় বুড়িয়ে যায় দ্রুত।

শিবনাথের প্রভাব প্রতিপত্তি এ গাঁয়ের অনেক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। টাকার অহংকারে সে এখন মানুষকে মানুষ বলে ভাবে না। সবাইকে ভাবে তার দাসানুদাস। হাসপাতালের টিকেদারবাবুকে কী কথায় একটা চড় কসিয়ে দিলেন সজোরে। অপমানে লাল হয়ে গিয়েছিল টিকেদারবাবুর মুখখানা। চোখে জল এসে গিয়েছিল তার। জলভরা চোখে সে দেখেছিল ফোলা ফোলা গাল নড়িয়ে শিবনাথ বলছেন, চাকরি করে খেতে এসেছ, রাজনীতির কি বোঝো হে। খারাপ ভাল যা বলার আমরা জনগণ বলব। তোমরা সরকারী চাকুরে, সব সময় মাথা ঝুঁকিয়ে জনগণের সেবা করবে। সেবায় গাফিলতি দেখলে পাছায় লাথি মেরে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ভাগিয়ে দেব।

শুভ সেদিন একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল ব্যাগ হাতে নিয়ে, সরস্বতী তাকে বাজার করার জন্য পাঠিয়েছে। এমন মর্মান্তিক দৃশ্যের সাক্ষী না থাকলে বুঝি ভালো হত। এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য যত

তাড়াতাড়ি মন থেকে মুছে যায় ততই ভাল। যে দৃশ্য মনের মধ্যে ভয়ের পেরেক পুঁতে দেয়, সেই দৃশ্য না দেখাই ভালো।

বাজার পাড়ার শিবনাথের সঙ্গে থানার বড়বাবুর ভীষণ জানা-শোনা। প্রায়ই থানার জিপটা এসে তার দোকানের সামনে দাঁড়ায়। বড়বাবু কাঠের চেয়ারে বসে চা খান। চা খাওয়া শেষ হলে লম্বা সিগারেট ধরিয়ে টান দেন। সিগারেট টানা শেষ হলে একটা চটের ব্যাগে খানকতক মদের বোতল ঢুকিয়ে জিপে তুলে দেয় শিবনাথের ছোকরা চাকরটা। আড়চোখে বোতলগুলো দেখে নিয়ে গাড়িটা স্টার্ট দেন বড়বাবু। গাড়িটা ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যাওয়ার পরেও হাঁ-করে তাকিয়ে থাকেন শিবনাথ। মানুষটার কোনো জবাব নেই। আশ্বিনের মেঘের মতো স্বভাব। এই রোদ এই বৃষ্টি, ওই মেঘ উতলা হাওয়া।

শিবনাথের চোখে মুখে বর্ষার ছাতুর মতো ফুটে ওঠে চতুরতা। কারোর সঙ্গে কথা বলার সময় সে নিজেকে বর্ণচোরা গিরগিটি অথবা ধূর্ত শেয়াল ভাবে। এই ভাবনাটা তার অন্যায় নয়। বুদ্ধি হবার পর থেকে তিনি মানুষকে ঠকিয়ে চলেছেন ধারাবাহিকভাবে। একাজে তার শরীরে কোনো মায়াদয়ার জোয়ার-ভাঁটা খেলে না। আপে বাঁচলে বাপের নাম এই সিদ্ধান্তে অচল অনড়। পরের জন্য কাঁদা কিংবা কপাল ফাটানো তার স্বভাবে নেই। বরং আপনা হাত জগন্নাথকে বেশি সমীহ করতে ভালোবাসেন। ফলে কথা বলায় যে তিনি বাজারের এক নাম্বার এই তথ্য ঠারেবারে বুঝিয়ে দিতে কুণ্ঠিত বোধ করেন না।

এত বড়ো বাজারটা তার কথায় ওঠে, বসে। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তার উপস্থিতি আশু প্রয়োজন। তাকে এড়িয়ে বা গোপন করে বাজার কমিটির কোনো কাজ করার সাধ্য নেই।

মাছওয়ালি মাসিটা প্রতিদিন তাকে বাছাই করা মাছটা দিয়ে যায়, যদিও তাকে দাম মিটিয়ে দেন শিবনাথ, তবু প্রায় কথায় মাছের প্রসঙ্গ তুলে তিনি এক বিকৃত অনুভূতির আবেশ নিতে চান। বাজারের সেরা মাছটা ফলটা চালটা তার ঘরে না গেলে তিনি বেজায় রেগে যাবেন।

কালীগঞ্জ বাজারে শিবনাথের কথাটাই শেষকথা।

শুধু বাজার নয়, স্কুলেও তার আধিপত্য যথেষ্ট। অকৃতদার শিবনাথ ভাইয়ের ছেলেকে নিজের ছেলে বলে কোর্ট থেকে লিখিয়ে নিয়েছেন। তাতে কালীগঞ্জ বাজারের বিশিষ্ট দু'জন ব্যক্তির সই আছে।

শুধু সইয়ের জোরে দাদার বড়ো ছেলে তার নিজের ছেলে হয়ে গেল। ইস্কুলের ভোটে দাঁড়াতে গেলে বেশ কিছু শর্ত তাকে পালন করতে হবে লোকলজ্জার ভয়ে। ব্যাপক ভোটে জিতেছেন শিবনাথ। তিনি জেতা মানে সেক্রেটারির পদটা একেবারে তার পাকা।

তিনি ছাড়া অমন রাশভারি পদে মানাবে কাকে? এমনিতে তার পঁচাশি কে.জির শরীরটা বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হয় ভীষণ। বুকের কাছে চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়, হাঁপিয়ে ওঠেন, ঘাম ফুটে ওঠে সারা শরীরে।

এই ইস্কুলে তার পড়াশোনা ফলে এই ইস্কুলের উপর তার আত্মিক টান বেঁচে আছে এখনও। ভাইয়ের ছেলের কাছে প্রতিদিন স্কুলের খবর পেয়ে যান তিনি। সে ছেলে ধানী লঙ্কা। পুটপুট করে হেড্‌মাস্টারের বিরুদ্ধে লাগায় জ্যাঠার কাছে। দুর্নীতির চাপা অভিযোগ হেডমাস্টারের বিরুদ্ধে ঠেলে ওঠে। সব জেনেও না বোঝার ভান করে পড়ে থাকেন কৃপানাথ। যে ছেলেকে হাতে ধরে পড়িয়েছেন শিখিয়েছেন সেই ছেলে এখন একাই একশো। হেড-মাস্টার মশাই প্রশ্ন করলেন, কী ব্যাপার শিবনাথ, হঠাৎ যে তোমার ইস্কুল চত্বরে আসা হল? কোনো কাজ আছে বুঝি?

—না, তেমন কোন কাজ নয়। আমি স্কুলের সেক্রেটারি। মাঝেমধ্যে স্কুলে না আসলে আমার চলবে কি করে। শিবনাথ হেড-স্যারের দিকে বিরক্তির চোখে তাকালেন, আপনাদের হাজিরা খাতাটা একবার আনুন, আমি দেখতে চাই।

হেড-মাস্টারমশাই বাধ্য হন অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টারটা এগিয়ে দিতে।

হাজিরা খাতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে শিবনাথ কপাল কুঁচকে তাকালেন, অমলকান্তিবাবুর হাজিরা খাতায় দুদিন সই নেই। কি ব্যাপার?

—উনি দু'দিন ছুটি নিয়েছেন। হেড মাস্টারমশাই বললেন।

—তাহলে আপনার লিভ মার্ক করা উচিত ছিল। শিবনাথবাবু কড়া গলায় বললেন কথাগুলো।

হেড-মাস্টারমশাই ঢোক গিললেন, উনি তাড়াহুড়ো করে চলে গিয়েছেন। ওঁর বাবা নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছেন। বাইপাস সার্জারি হবে।

—সব ঠিক আছে। তা বলে লিভ অ্যাপলিকেশন না দিয়ে চলে যাবেন? এত সাহস কোথা থেকে পান। আপনি দেখছি সবাইকে মাথায় তুলে রেখেছেন। ভেরি ব্যাড! শিবনাথ তিরস্কার করলেন, এবারের মতো ক্ষমা করে দিলাম। এরপরে যদি এমনটা দেখি তাহলে দুজনকেই আমি অ্যাবসেন্ট করে দেব।

হেড-মাস্টারমশাইয়ের কথা বলার ক্ষমতা ছিল না, তিনি ক্ষুব্ধ, অপমানিত। শিবনাথের ব্যবহার তাকে পীড়া দিয়েছে। গায়ে গতরে বড়ো হয়ে শিবনাথ নিজেকে ভাবছেটা কি?

শিবনাথ সেদিনের মতো চলে গেলেও আবার ফিরে এলেন এক সপ্তাহ পরে। প্রথমে স্কুলের নাইট-গার্ডকে দেখতে পেয়ে মুখে যা না আসে তাই বলে অপমান করলেন। নাইট-গার্ড রামদুলাল তার সামনে থেকে চলে যেতে চাইলে শিবনাথ তাকে বজ্রগলায় ধমকে উঠলেন, দাঁড়াও। পালাচ্ছো কোথায়? আচ্ছা রামদুলাল, তুমি কি ভেবেছ বল তো? স্কুলটা কি তোমার মামার বাড়ি?

—এসব কথা কেন বলছেন বাবু? রামদুলাল বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করল।

শিবনাথবাবু আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, তুমি এই ইস্কুলের নাইট-গার্ড। রাতে ঘুমিয়ে দিনের বেলায় নিজের কাজ করে বেড়াচ্ছো! বাঃ, তুমি তো দেখছি মহা ধূর্ত মানুষ।

শিবনাথ রামদুলালকে সতর্ক করল, এভাবে ফাঁকি দিলে আমি তোমাকে কাজে রাখতে পারব না বলে দিচ্ছি। নাইট গার্ডের কাজ শুয়ে-বসে কাটানোর জন্য নয়। তুমি যদি মনে করো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাইনে নিয়ে চলে যাবে—তাহলে মস্ত বড় ভুল করবে। আমার নজর সবখানে। আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না।

দ্বীপী আর সূর্যাক্ষ নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। সূর্যাক্ষ দূর থেকে শিবনাথবাবুর গলা পেয়ে দ্বীপীকে কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে বলল, এই রে, শেয়ালটা আজ আবার ইস্কুলে এসেছে! আজ আবার হেড্ স্যারের ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যাবে।

দ্বীপী হাসল না, কেমন গম্ভীর চোখে তাকাল, এসব মানুষ আমার পাল্লায় পড়লে আমি একেবারে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতাম।

সূর্যাক্ষ বলল, মানুষ এত শয়তান হয় কী করে বলত? এত সুন্দর মাথায় মানুষ গু-গোবর ভরে নিয়ে কি করে হাঁটা চলা করে বলত?

দ্বীপী আশ্চর্য হল না, এরা হল জন্ম শয়তান। জানিস সূর্য, আমাদের এই সেক্রেটারি হেড-স্যারের ছাত্র ছিলেন। এখন এমন ব্যবহার করেন যে চেনেন না!

—যাদের চোখের পাতা থাকে না কেবল তারাই এমন ব্যবহার করতে পারে। সূর্যাক্ষ বলল।

দ্বীপী ভাবল, কোন জীবের চোখে পাতা নেই বলতো?

—কেন তিমি মাছ। যে সব মাছকে খায়। রাক্ষস! সূর্যাক্ষর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। দ্বীপী এবার আর হাসল না, ঠোঁট কঠিন হয়ে উঠল ওর, তিমিমাছ শুধু মাছই খায় না, মানুষও খায়। ওদের থেকে সাবধান থাকা দরকার। চল, আমরা কেটে পড়ি।

দোতলার করিডোর লাগোয়া সায়েন্স ল্যাব। অমলকান্তিবাবু ব্যস্ত হয়ে ল্যাব থেকে বেরিয়ে আসছিলেন হাতে একটা অ্যাপারাটাস নিয়ে। শিবনাথবাবু দোতলা বেয়ে তরতরিয়ে উঠে এসে অমলকান্তিবাবুকে দেখে হাত উঁচিয়ে ডেকে উঠলেন, এই যে মাস্টারমশাই, এদিকে একটু—

অমলকান্তিবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন, মুখমণ্ডলে সৌজন্যতার সূক্ষ্ম প্রলেপ, নমস্কার।

—হ্যাঁ, নমস্কার! শিবনাথবাবু মুখ বিকৃত করে তাকালেন, আপনার ছুটির দরকার মানছি কিন্তু তা বলে দরখাস্ত না দিয়ে হুটহাট করে চলে যাবেন? ভেরি ব্যাড! আপনাদের দেখে ছাত্ররা শিখবে।

অমলকান্তিবাবুর মুখে ভুসোকালি বিছিয়ে গেল নিমেষে, সরি, হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে আমাকে চলে যেতে হল। বাবা ভীষণ সিরিয়াস হয়ে গিয়েছিল। বুঝতেই তো পারছেন—আমি বাড়ির বড়ো ছেলে।

—না, আমার বোঝার কোনো দরকার নেই। গমগমিয়ে উঠল শিবনাথবাবুর কণ্ঠস্বর। আপনার মামলা আপনিই সামলান। আপনার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার আমার কোনো আগ্রহ নেই। তবে শুধু এইটুকু বলি—কাজটা আপনি ঠিক করেন নি।

—আপনি কি বলতে চাইছেন তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না! অমলকান্তিবাবুর মৃদু গলায় বিস্ময়।

—ন্যাকামী করবেন না। সব বুঝতে পেরেছেন। শিবনাথবাবু টানাটানা গলায় বললেন, মাসখানিক আগের কথা। কালীগঞ্জ বাজারে...সেই যে আপনার সঙ্গে দেখা হল, আপনি হাত নেড়ে নেড়ে আমাকে বোঝাচ্ছিলেন সাপে কামড়ালে মন্ত্র পড়ে রোগী বাঁচানো যায় না...আরও কত কী। এবার মনে পড়ছে? রুমাল বের করে শিবনাথবাবু কলাগাছের মতো মোটা গলার ঘাম মুছলেন।

মুখ ফাঁক করে শ্বাস নিয়ে অমলকান্তিবাবু সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বলুন কি বলতে চাইছেন?

—একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে গ্রামে এসব ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া কি আপনার উচিত হচ্ছে? গ্রামের সহজ সরল মানুষ সাদা কালোর ফারাক বোঝে না, তারা আপনার এসব মহান কথার অর্থ বুঝবে কি করে? শিবনাথবাবুর খোঁচা দেওয়া কথায় অমলকান্তিবাবু নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তাকালেন। প্রসঙ্গটাকে আর বাড়ানো উচিত হবে কিনা ভাবলেন। শিবনাথবাবু মানুষটি সাপের চেয়েও ক্ষিপ্র এবং ধূর্ত। তার সঙ্গে সরাসরি তর্ক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া অনুচিত হবে। অমলকান্তিবাবু নিজেকে সংযমের বেড়ায় আটকে রাখতে চাইলেন, ওসব পুরনো কথা ছেড়ে দিন। বলুন আর কি বলতে চান?

—ছেড়ে দেব মানে? শিবনাথবাবুর চোখ থেকে যেন আগুনের গোলা ঠিকরে এল, আপনি আগুন নিয়ে খেলতে চাইছেন, আর আমি সেখানে হাওয়া দেব—এটা আপনি ভাবলেন কি করে? আপনার স্পর্ধা তো কম নয়।

এবার আত্মসম্মানের দরজায় টোকা নয়, কেউ যেন কুঠারাঘাত করল, অমলকান্তিবাবু শিরদাঁড়া সোজা করে দীপ্ত স্বরে বললেন, সত্যি কথা বলাটা নিশ্চয়ই কারোর স্পর্ধার মধ্যে পড়ে না।

আপনার কাছে যা মিথ্যে বা অবান্তর বলে মনে হয় তা যদি আমার কাছে সত্যি হয় তাহলে আপনার আপত্তি কোথায়?

—এই ইস্কুলের মাস্টার হয়ে আপনি এসব প্রচার করতে পারেন না। শিবনাথবাবু গলা চড়ালেন, মনে রাখবেন আপনি একজন শিক্ষক। একজন শিক্ষকের এই সমাজের উপর অনেক দায়িত্ব থাকে।

—আমি আমার সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছি।

—ঘোড়ার ডিম করছেন। শিবনাথবাবু দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন, আপনি যা করছেন সেটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। গ্রামের মানুষ আপনার উপরে অসন্তুষ্ট। সেইজন্যই ওরা আপনাকে পণ্ডিত বিলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। নিশ্চয়ই ভুলে যান নি—

—ভুলব কেন? মানুষকে বিজ্ঞান-সচেতনতার আলো দিতে চাই। তার বিনিময়ে এরকম কিছু তো আশা করা যেতে পারে। সবাই তো মানুষ হয় না। মানুষের মাঝখানে অনেক ভদ্রবেশী পশুও থাকে। অমলকান্তিবাবু কথা শেষ করে শিবনাথবাবুর দিকে তাকালেন।

রাগে ফেটে পড়লেন শিবনাথবাবু, আপনি আমাকে আকারে-ইঙ্গিতে পশু বললেন, আপনার সাহস তো কম নয়।

—আপনাকে পশু বলার আমি কে? দয়া করে ভুল বুঝবেন না!

—কলকাতার প্যাঁচ মারছেন? আপনাদের বিজ্ঞান মঞ্চ এখানে আর বাঁধার চেষ্টা করবেন না। শিবনাথবাবু হুঁশিয়ার করলেন, বিজ্ঞানের জয়গান করতে সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের বদনাম করবেন না। এখনও গাঁয়ে-গঞ্জে মানুষকে ভূত-প্রেত ধরে। এখনও মানুষ পেতলের ঘড়া ভর্তি জল দাঁতে করে নিয়ে ছুটতে পারে।

—এরও বিজ্ঞান নির্ভর ব্যাখ্যা আছে। আসলে ভূতে ধরাটা একটা সাইকো-ডিজিজ। অমলকান্তিবাবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, শিবনাথবাবু বাঘের মতো হুঙ্কার ছেড়ে তাকে আচমকা থামিয়ে দিলেন, চুপ করুন, আর বেশি বাড়বেন না। অনেক হয়েছে, এবার হিরোগিরিটা একটু কমান। এখানকার মানুষদের তো চেনেন না।

—এখানকার মানুষদের আমি চিনি। শুধু আপনাকেই আমি চিনতে পারিনি।

—তার মানে?

—মানেটা সহজ। সাপকে চেনা যায়, কেননা খোলস ছাড়ালেও সে সাপ থাকে। কিন্তু আপনি? অমলকান্তিবাবুর ঠোঁট জুড়ে বিদ্রুপের হাসি খেলে গেল। রাগে জ্ঞান হারানোর উপক্রম হল শিবনাথবাবুর, ডান হাত উঠিয়ে তীব্র গতিতে তিনি থাপ্পড় কসিয়ে দিতে চাইলেন অমলকান্তিবাবুর গালে।

এমনটা আগে থেকেই আঁচ পেয়েছিলেন অমলকান্তিবাবু, তিনি হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেললেন লোমশ ভারী হাতটা। সজোরে মুচড়ে দিয়ে বললেন, এখন যদি এই হাতটা আমি মুচড়ে ভেঙে দিই তাহলে তিনমাস ছুটি লাগবে আপনার। কিন্তু আমি তা করব না। বরং সাবান দিয়ে আমার এই হাতটা ধুয়ে ফেলব কেননা এর আগে এমন ভয়ঙ্কর পাপী মানুষের হাত আমি কখনো ধরিনি।

কিছুদূরে দাঁড়িয়ে থাকা সায়েন্স সেকশনের ছাত্র-ছাত্রীরা অমলকান্তিবাবুর দুঃসাহস দেখে হাততালি দিয়ে উঠল সজোরে। সেই হাততালির শব্দ কানে এল শিবনাথবাবুর। তার মনে হল এগুলো কোন শব্দ নয় যেন পাহাড়ী মৌমাছির আক্রমণের শব্দ। শুভ, মাধুরী লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছিল, ওরা থেমে গিয়ে উত্তেজিত অমলকান্তিবাবুর মুখের দিকে তাকাল, পরিস্থিতির ভয়াবহতার

আঁচ করে মাধুরী নীচু স্বরে শুভকে বলল, এই, চল, এখান থেকে সরে যাই। যা ঝামেলা হচ্ছে—এক্ষুনি হেড-স্যার এসে পড়বেন। আমাদের একসঙ্গে দেখলে খুব বকবেন।

দেখতে-দেখতে ভিড় জমে গেল চারপাশে। একটা চাপা গুঞ্জন ছড়িয়ে গেল সমস্ত ইস্কুলে। বিজ্ঞানের স্যার অমলকান্তিবাবু শিবনাথবাবুর হাত মুচড়ে দিয়েছেন। অনেকে আবার আক্ষেপ করে বলল, মুচড়ে না দিয়ে যদি ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো হাতটা খুলে দিত তাহলে ভীষণ ভালো হোত।

সবুজ অনেক জানে বলে সবাই তাকে নিউটন বলে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এল ছাদের উপর, শুভকে দেখে তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আজ যা হলো না ফার্স্ট ক্লাস। ওই বদমাশটা আমার বাবার গায়ে হাত তুলে ছিল। অথচ জানিস বাবার কোন দোষ ছিল না। লোকটার টাকা আছে বলে নিজেকে ভাবে শেরশাহ। আজ বুঝতে পারল বাবারও বাবা থাকে।

সবুজ কচি গোঁফের ঘাম মুছে নিয়ে শুভর দিকে তাকাল, জানিস শুভ, ভগবান ওকে ক্ষমা করে দিলেও আমি ওকে কোনোদিনও ক্ষমা করতাম না। আমি ভেবে রেখেছিলাম— চাকরি পেয়ে যে জিনিসটা প্রথমে কিনব তার নাম রিভলভার। আর সেই রিভলভার দিয়ে প্রথম যে গুলিটা বেরত সেটা শিবনাথবাবুর বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিত। যাক আজ আমার রাগটা কিছুটা হলেও শান্ত হলো।

টিচার্স-রুম থেকে একে একে সবাই এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন দোতলার করিডোরে। ঘটনার আকস্মিকতার তারা সবাই হতভম্ব। শুধু বিস্মিত নয় শিবনাথবাবু, তিনি ধুতির কোঁচা সামলে দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, অমলকান্তিবাবু, ইস্কুল প্রেমিসেসে আপনি আমার হাতটা ধরে ভালো করলেন না। এর ফল দেরিতে হলেও আপনাকে পেতে হবে। আমি টাকা-পয়সা সোনাদানার লেন-দেন সব ভুলে যাই কিন্তু অপমানের বদলা নিতে ভুলি না।

মাঠের একপাশে রাখা ছিল শিবনাথবাবু কালো রঙের রাজদূত মোটর সাইকেল। এলোমেলো লাথি মেরে মোটর সাইকেলটা স্টার্ট দিলেন তিনি। পোড়া ধোঁয়ায় ভরে গেল সবুজমহল।

ধুলো আর ধুঁয়ো উড়িয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন অপমানিত শিবনাথ।

স্কুলের উল্টো পিঠে জগতখালির বাঁধ, পোদ্দারদের আখের ভুঁই পেরলে শুরু হবে চর-সুজাপুর-দোয়েম। গুয়েবাবলা গাছের মতো বাঁধের উল্টোদিকের গ্রামগুলো ম্যাড়মেড়ে ছড়ানো ছিটানো। নিত্য অভাব গিলে নিয়েছে ওদের আভিজাত্যের রসদ। তবু এই খাপছাড়া সৌন্দর্যের মধ্যে বিশাল প্রাণ শক্তি খুঁজে পান অমলকান্তিবাবু। প্রায়দিনই অবসর সময়ে তিনি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন গ্রামের ধুলোয়।

মানুষের কাছে গেলে মানুষের মন চওড়া হয়। গাছের ছায়ায় গাছের বাড়বাড়ন্ত না হলেও মানুষের ছায়া ভিন্ন মানুষের উন্নতি কোনোদিন সম্ভব নয়। অমলকান্তিবাবুকে লাখুরিয়া হাইস্কুলের সবাই ভালোবাসে। শিবনাথবাবু চলে যাবার পর ছাত্র-শিক্ষক সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল। সবার উদ্বেগ তাকে ঘিরে।

কেউ বললেন, কাজটা ঠিক হল না মাস্টারমশাই। জাতসাপের লেজে পা দেওয়া মানে নিজের বিপদ ডেকে আনা।

হেড-স্যার বললেন, যা হবার তা তো হয়েছে। এখন গবেষণা করে কোনো লাভ আছে কি? আপনারা যে যার কাজে যান। ওকে একটু বিশ্রাম নিতে দিন।

সহ-শিক্ষকরা টিচার্স রুমে ফিরে গেলেন। দোতলার করিডোরে দাঁড়িয়ে বাঁধের দিকে তাকিয়ে ছিলেন অমলকান্তিবাবু। সবুজ অনেক সময় মনের অস্থিরতায় সর ফেলে দেয়। সর পড়া দুধের মতো মনকে স্থিতু হতে সাহায্য করে। একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনাটাকে ভুলবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন তিনি। হয়ত ভুলেও যেতেন কিন্তু দ্বীপী, সূর্য, মাধুরী, শুভ আর সবুজ তার প্রতিবাদী মনটাকে জিইয়ে রাখল অনেকক্ষণ।

সবার আগে সবুজ বলল, স্যার, আজ আপনি যা করলেন তা ইতিহাস হয়ে যাবে। যে মানুষটাকে সবাই ভয় পেত আপনি আজ তাকে ভয় পাইয়ে দিলেন।

অনেকক্ষণ পরে অমলকান্তিবাবু বললেন, কাউকে ভয় দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়। উনি ক্ষমতার অপব্যবহার করছিলেন, আমি শুধু ওকে থামিয়েছি।

—এটাই বা ক'জন মানুষ করে? শুভর প্রশ্নে অমলকান্তিবাবু স্মিত হাসলেন, তোমরা নিজেদের এইভাবে তৈরি করার চেষ্টা করো। যেখানে অন্যায় দেখবে সেখানেই প্রতিবাদ করবে। প্রতিবাদ না হলে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে না। শুধু তত্ত্বের কচকচানি দিয়ে জীবনটাকে ভরিয়ে দিও না। তাতে জীবনের সমস্যা বাড়ে, জীবন সঠিক পথ খুঁজে পায় না।

সূর্য কিছু বলতে যাচ্ছিল তাকে থামিয়ে দিল মাধুরী, সূর্যদা, স্যার যেটা বলেছেন সেটা সবার আগে আমাদের বোঝার দরকার। আমাদের এই গ্রামে এখনও সুফল ওঝা, চৈতন্যর মা কিংবা শিবনাথবাবুর মতো মানুষ আছে। তাদের সাথে পেরে ওঠা কোনো মানুষের একার কাজ নয়। স্যার কাজটা শুরু করেছেন। তার পাশে আমাদের থাকার দরকার।

মাধুরী কপাল কুঁচকে বলল, সব মানুষের মধ্যে শিবনাথবাবুর মতো একটা মন লুকিয়ে থাকে। আমরা সবাই ক্ষমতা আর কর্তৃত্ব চাই। হিসাব এক চুল না মিললে আমরা বিদ্রোহী হয়ে উঠি। যেন তেন প্রকারেণ কাজটা হাসিল করার জন্য লেগে পড়ি। কথার স্রোত অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছিল। শুভ খুব সতর্ক হয়ে বলল, স্যারের মতো সবাই কি হতে পারে? আমড়াগাছে খেজুর ফলবে আমরা কেউ আশা করি না। প্রতিবাদ আমাদের সবার মধ্যেই আছে কিন্তু আমরা অনেকেই তার প্রয়োগ করতে দ্বিধা করি। অবশ্য এর মধ্যে অনেক কারণ থাকে। ভয় তার মধ্যে একটা।

শুধু ভয় নয় সংকোচও অনেক সময় প্রতিবাদের মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। শুভর মনে পড়ে বছর খানিকের আগেকার কথা। সময়টা শীতকাল। শুভর গায়ে তুষের চাদর। অবনী তাকে সোয়েটার কিনে দেবে বলেও কিনে দিতে পারেনি। অভাব তার সেই ইচ্ছেটাকে গিলে নিয়েছে।

মাস্টারদের মেসে টিউশনি পড়তে এসে শুভর চাদরের কোণাটা সরলামাসীর গায়ে লেগে যায়। এই সরলামাসী মাস্টারদের মেসে কাজ করত। বাসনমাজা থেকে রান্না অবধি সব কাজ করতে হত তাকে। ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় সরলামাসী নোংরা থাকতে পছন্দ করত। ফলে তার পরিধানের কাপড়চোপড় আধময়লা, নোংরা ছেঁড়াফাটা। সেই সরলামাসী শুভর চাদরের কোণা লাগাটাকে মেনে নিতে পারে না। জাত চলে যাবার ভয়ে গর্জে ওঠে সে, দিলি তো আমাকে ছুঁয়ে, যত্তো সব!

শুভর সপ্রতিভ মুখ তখন আঁধার ঢাকা। অপমানের শব্দগুলোয় সব সময় সূঁচ লুকিয়ে থাকে। দাঁতে দাঁত টিপে মুখ নামিয়ে নেয় শুভ মাটির দিকে। সকালবেলায় তার পৃথিবীটা আঁধার হয়ে আসে হঠাৎ।

সরলামাসী একই কথা বারবার আউড়ে গজগজ করতে করতে চলে যাচ্ছিল। অমলকান্তিবাবু ওই অত জনের মাঝখানে তাকে থামালেন, মাসী, তোমার কিন্তু এটা উচিত হল না। শুভকে তুমি বকলে, ও কি দোষ করেছে?

—কী করেনি বলো? সরলামাসী দোক্তা খাওয়া দাঁত দেখিয়ে বলল, সাত সকালে দিলো তো ছুঁয়ে, এই শীতে আমি ঘাটে যাবো কি করে? এটা অত্যাচার নয়?

—যাকে তুমি অত্যাচার বলছো সেটা তোমার পাপ মনের পরিচয়। অমলকান্তিবাবুর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল, মানুষকে ছুঁলে মানুষকে যদি স্নান করতে হয় তাহলে এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে!

—ও তুমি সব বুঝবে না বাবা, পরে আমি সব তোমাকে বুঝিয়ে বলব। সরলামাসীর গলার স্বর নীচু হয়ে এল, আসলে জানো কী বাবা, ওই...তোমাদের ওই শুভ...মানে ওর বাবা...এই হাসপাতালের...।

—চুপ করো মাসী, আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না। তবে একটা কথা শুনে রাখো...মানুষকে ছুঁলে মানুষের কোনদিন জাত চলে যায় না।

—তুমি বিদ্বান ছেলে, মাস্টার হয়েছো, এ তোমার কেমন কথা?

—এটাই আমার মনের কথা।

—তাবলে হাঁড়ি মুচি মেথর যে পারে সে আসবে? সরলামাসীর বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন জেগে উঠল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ সবাই আসবে। শুধু ব্রাহ্মণদের ছেলে-মেয়েরা আমার ছাত্র নয়, আমার ছাত্র সবাই। সবাই আমাকে ভালোবাসে। শ্রদ্ধা করে। অমলকান্তিবাবু থামলেন, ঢোক গিলে বললেন, তোমার যদি কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে তুমি কাজে আসবে না। কাল থেকে আমি আলাদা লোক দেখে নেব—

শুভ সেদিন দেখেছিল সরলামাসীর ফণা তোলা মাথা কাজ হারানোর ভয়ে ঝুঁকে গিয়েছে মাটির দিকে, তার মুখে টুঁ শব্দটিও নেই। সরলামাসীর ছেলে চৈতন্য শুভদের সঙ্গে পড়ে। কিন্তু বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও চৈতন্য কোনোদিন ওদের বাড়িতে নিয়ে যায়নি। কেন নিয়ে যায়নি, কারণটা খুবই স্পষ্ট। শুভ গেলে ওদের কুঁড়েঘরের পবিত্রতা নষ্ট হবে। ছোঁয়াছুঁয়িতে খোয়া যাবে ওদের এতদিনের আগলেরাখা জাত্যাভিমান। তাই বন্ধু হয়েও শুভ এখন ওদের বন্ধু নয়।

বিজয়া দশমীর দিন চৈতন্য ঠোঙ্গায় করে নাড়ু নিয়ে আসে। বন্ধুদের দেয়। শুভ সেই নারকেলের নাড়ু ছুঁয়েও দেখে না। কেন ছোঁবে সে? যারা তাকে ঘৃণা করে তাদেরও সে ঘৃণা করবে। মারের বদলে সে ফিরিয়ে দেবে মার। কারোর দয়া নিয়ে বাঁচবে না। এ ব্যাপারে সে দলে পেয়েছে সবুজ আর রঘুনাথকে। ওই দু'জন তার পাশে থাকলে সে শিবনাথবাবু কেন যে কোন বাবুকেই রুখে দেবে।

প্রতিবাদ সবার দ্বারা হয় না। প্রতিবাদ রক্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শিঙ্গিমাছ। আর তা যদি না হত তাহলে শুধু অমলকান্তিবাবু কেন সেদিন তার বন্ধুরা রুখে দাঁড়াতে পারত সরলামাসীর বিরুদ্ধে। ওরা কেউ ত করেনি, করার প্রয়োজনও বোধ করেনি।

শিবনাথবাবুর মোটর সাইকেলটা সোজা এসে থামল থানার নিমগাছটার গোড়ায়। অন-ডিউটি পুলিশটা তাকে স্যালুট করে বলল, স্যার চেম্বারেই আছেন। যান দেখা হয়ে যাবে।

থানার সঙ্গে শিবনাথবাবুর সম্পর্ক অনেকটা মামা আর ভাগ্নের মতো। থানার বড়োবাবু সুপ্রিয়

চাকলাদার প্রায়ই শিবনাথবাবুর বাগানবাড়িতে গিয়ে নৈশভোজ সেরে আসেন। সেই ভোজে মাছমাংস ছাড়াও থাকে তরল পানীয়। দেশী তরলে এখন মন ভরে না সুপ্রিয়বাবুর। তার জন্য কৃষ্ণনগর থেকে গাড়ি পাঠিয়ে বিদেশী ছাপ্পাব পানীয় আনতে হয শিবনাথবাবুকে। এমন সেবা করার সুযোগ পেয়ে তিনি ধন্য। কেননা বেআইনী সুদের কারবার চালাতে গেলে থানার সঙ্গে হাত রাখার প্রয়োজন। এসব ব্যবসায় সোজা আঙুলে কারবার বাঁচে না, প্রায়ই আঙুল বেঁকিয়ে ঘি তুলতে হয়। লাঠালাঠির চাইতে থানার শাসানীটা অনেক বেশি ফলপ্রসূ। সহজে কেউ শিবনাথবাবুকে ঘাঁটাতে চায় না। গ্রামের সবাই জেনে গেছে থানা মানে বাঘের গুহা। আর বাঘের ছোঁয়া মানে আঠারো আঁচড়, আঠারো ঘা।

অপমানটা মাথার ভেতর বিষপোকার মতো কুটকুট করে কামড়াচ্ছিল, আর তার দংশনে দগ্ধে-দগ্ধে মরছিলেন শিবনাথবাবু, যার কবল থেকে পরিপূর্ণভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া মুখের কথা নয়। অমলকান্তি সেদিনের ছোকরা। এম. এস. সি. পাশ করে তার নিশ্চয়ই ডানা গজায়নি। তা যদি না হয় তাহলে সবার সামনে এমন ঔদ্ধত্য তিনি দেখালেন কোন সাহসে? তবে কি পিঁপড়ের পাখা গজায় মরবার জন্য? হতে পারে। প্রচণ্ড রাগে মাথা ঝাঁকালেন শিবনাথবাবু। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে নিজেকে হালকাবোধ করতে চাইলেন তিনি। সব হালকা হয় কিন্তু অপমানের তীরটা নোঙরের ধাতব ফ্যাকড়ার মতো মনের নরম জমিতে গিঁথে থাকে। অতি বাড় বেড়েছে মাস্টারটার। ওর বাড়বাড়ন্ত একটু ছেঁটে দিতে হবে। তবে এ কাজ নিজের হাতে করবেন না শিবনাথ। সুপ্রিয়বাবুই তার হয়ে বাকি কাজটা করে দেবেন। এতদিন পুকুরের মাছ, গাছের কচি ডাব খাইয়েছেন, এখন তার বিনিময়ে নিশ্চয়ই এটুকু আশা করা যেতেই পারে। এ তো এমন কিছু বেশি চাওয়া নয়, এতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

ভারী পর্দা হাওয়ায় অল্প-অল্প নড়ছিল, এই পর্দাও শিবনাথবাবুর কিনে দেওয়া। নিজের কিনে দেওয়া পর্দা সরিয়ে বড়বাবুর চেম্বারে ঢুকে এলেন তিনি। তাকে দেখে সুপ্রিয়বাবু ঠোঁটে কৃত্রিম হাসি বুলিয়ে বললেন, আরে কি সৌভাগ্য! এ যে দেখছি মেঘ না চাইতে জল।

শিবনাথবাবু দাঁত ঠেলে বেরিয়ে এল হাসি, দায়ে না পড়লে কেউ কি থানায় আসে, স্যার?

—আরে বসুন, বসুন। কথা পরে হবে। আগে বসুন তো—

শিবনাথবাবু তার বিশাল চেহারা নিয়ে একটা চেয়ার জুড়ে বসলেন, তারপর দু-দিকে দুই হাত ছড়িয়ে কাতলা মাছের মতো দম নিয়ে বললেন, আপনি তো আমার বাগানবাড়ির রাস্তাটা ভুলে গেছেন। তা আপনার দৌলতে মাঝে মাঝে আমারও ঢুকুঢুকু হোত, গলা ভিজত, আপনার দয়ায় প্রায় মাসের উপর সেটাও বন্ধ।

—হ্যাঁ, একদম টাইম বের করতে পারছি না। জানেনই তো আমাদের বারো মাসে তের পার্বণ লেগে আছে। সুপ্রিয়বাবু টেবিলের কাচে ভর দিয়ে তাকালেন, তা বলুন, আপনার কি সমস্যা। কাউকে ওঠাতে হবে বুঝি?

শিবনাথবাবু আভিজাত্যে ভরা সিগারেটের পেকেটটা এগিয়ে দিলেন বড়ো-দারোগার দিকে, অমলকান্তি মাস্টারকে চেনেন মনে হয়?

—কে অমলকান্তি? সুপ্রিয়বাবু চোখ কুঁচকালেন, এনি প্রবলেম?

—হ্যাঁ, প্রবলেম একটু আছে বইকি। কলকাতার চ্যাংড়া, গ্রামে এসে বড়ো বেশি ফুটুর ফুটুর করছে।

—ওঃ, এই কথা! যে ফুটুরফুটুর করছে, তাকে ফুটুরডুম করে দিলেই হলো। সুপ্রিয়বাবু বিশ্রী গলায় হেসে উঠে নোংরা চোখে তাকালেন, ওকে চেষ্টা করে মেয়েছেলে কেসে ফাঁসিয়ে দিন।

তারপর বলটা আমার কোর্টে ছেড়ে দিলে ঘুঘুকে ধান খাইয়ে কেসনগর কোর্টে চালান করে দিতে আমার কোনো ঝামেলাই হবে না।

—মেয়েছেলে কেস ছাড়া আর অন্য কোনো কেসে ফাঁসানো যায় না?

—যায়। তবে এটা সব চাইতে সহজ মেথড। সুপ্রিয়বাবু হাসলেন।

শিবনাথবাবু অনেক ভেবে দ্বিধার সঙ্গে বললেন, একটু চমকে দিলে হয় না? বড্ড উড়ছে, একটু ডানাটা মুচড়ে দেওয়া আর কি...

—ডানা মুচড়াব কেন, দরকার হলে ডানা ভেঙে দেব। সুপ্রিয়বাবুর গলা পুলিশী কায়দায় ঝ্যানঝেনিয়ে উঠল।

শিবনাথবাবু বললেন, যাই হোক কিছু একটা করুন। জানেন ও আমার হাত ভেঙে দিতে চেয়েছিল, তা-ও আবার ইস্কুলে।

—তাহলে এফ. আই. আর করছেন না কেন? একবার থানার খাতায় কমপ্লেন লেখান, তারপর দেখুন ওর অবস্থা কি করি? চোখ কটমট করে সুপ্রিয়বাবু ফুঁসছিলেন।

শিবনাথবাবু তাকে শান্ত করলেন, লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিতে আমি চাই না।

—আপনাকে নিয়ে মশাই আর পারা গেল না। শরীরে এত দয়া পুষে রাখলে চলবে? আপনি মশাই বড়ো আজব মানুষ! আপনার ডান দিকে মহাত্মা গান্ধী, বাঁ-দিকে সুভাষচন্দ্র। দেখুন, যেটা ভালো হয় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে বলুন। আমি প্রশাসনের লোক। কীভাবে দুষ্টকে শাসনে রাখতে হয় তার ট্রেনিং আমার নেওয়া আছে। সুপ্রিয়বাবু গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে উড়িয়ে দিলেন ঘরের ভেতর।

ইতিমধ্যে চা-বিস্কুট এসে গিয়েছে শিবনাথবাবুর জন্য। চায়ে চুমুক দিয়ে সুপ্রিয়বাবু বললেন, আপনি বাড়ি যান। কোনো চিন্তা করবেন না। অমলকান্তি আপনার হাত ধরে ভালো কাজ করেনি। আমার এলাকায় কেউ খারাপ কাজ করলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে, দু-দিন আগে আর পরে।

—সে আমি জানি। সেইজন্য তো ছুটে আসা। শিবনাথবাবু গায়েপড়া হাসি হেসে উঠলেন, তাহলে এবার আমি যাই। আপনার জন্য গরীবের দরজা খোলা রইল। যেদিন মন হবে সেদিন নিজের মনে করে বিনাসংকোচে চলে আসবেন, প্লিজ।

কৃষ্ণনগর থেকে কুশলবাবু এসেছিলেন পরশু। উনি বেশিরভাগ সময় রাতের বাসে আসেন, ব্রহ্মাণীতলায় নেমে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে যান—এ সংবাদ কেউ রাখে না। মাঝে বেশ কয়েকবার রঘুনাথ তাকে মানিকডিহির দিকে যেতে দেখেছে। মানুষটার কোনো ভয় ডর নেই প্রাণে।

একদিন রঘুনাথ ঘুরঘুট্টি আঁধারে তাকে বাঁধের উপর আটকালো। নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, মাস্টুর, কবে এলে গো?

প্রথমে তাকে চিনতে পারেননি কুশলমাস্টার, তারপর টর্চের সুইচ টিপে রঘুনাথের মুখর উপর ফেলে বললেন, আরে, তুমি?

—আমি তো ইখানেই থাকি মাস্টুর।

—ওঃ,বেশ ভালো কথা। তা তোমাদের পাড়াটার নাম কি?

—আজ্ঞে, হলদিপোঁতা ধাওড়া।

—বাঃ, বেশ ভালো নাম তো!

—ভালো-মন্দ বুঝি নে বাবু তবে এ গাঁয়ে আমার বাপও জন্মেছিল।

—ওঃ, তাই বুঝি? কুশলমাস্টারের আগ্রহ বাড়ছিল ক্রমশ। এই ছেলেটাকে পার্টির কাজে লাগানো যায়। এদের বিদ্যে-বুদ্ধি নেই। একেবারে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীভুক্ত শ্রমজীবী মানুষের একজন প্রতিনিধি এই রঘুনাথ। বার চারেক এর সঙ্গে দেখা হয়েছে কুশল মাস্টারের।

রঘুনাথ প্রথম দিকে বুঝত না এরা কি চায়, এদের গ্রামে আসার কী উদ্দেশ্য।

সূর্যাক্ষ তাকে বুঝিয়ে দেয়, জানিস রঘু, এরা হলো গিয়ে এসময়ের বিপ্লবী।

—তার মানে? রঘুনাথের সবিস্ময় প্রশ্নে ঘাবড়ে যায় সূর্যাক্ষ, বিপ্লবী মানে বুঝলি না? আরে যারা যুদ্ধ করে। ধ্যুর, যুদ্ধ নয়...যারা লড়াই করে। আরে, ওই যে ক্ষুদিরাম, ক্ষুদিরাম বসু। তুই সেই গানটা শুনিসনি বুঝি? হাসি হাসি...একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

রঘুনাথ ঘাড় নাড়লে সূর্যাক্ষ খুশি হয়, ওই যে যারা দেশের জন্য গলায় ফাঁসি ঝুলিয়ে নিয়েছিল স্বেচ্ছায়। এরাও তাদের মতন। এরা বুর্জোয়াদের খতম করে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে বিপ্লবী রাষ্ট্রযন্ত্রকে তুলে দেবে। এরা সর্বহারাদের সরকার গড়বে—বুঝলি?

রঘুনাথের মুখ আরও বিস্ফারিত হয়, তার কানের পাশ দিয়ে শব্দগুলো ঝাঁ-ঝাঁ করে উড়ে যায়।

সূর্যাক্ষ হার মেনে বলে, তোকে বোঝানো বড়ো কঠিন। আচ্ছা বলতো ইন্দিরা গান্ধী কে? তুই ওর নাম শুনেছিস?

রঘুনাথ এবার আকাশ থেকে পড়ল। সে তার ঠাকুরমার নামটা ক'দিন আগে শুনেছে। লাজবতী। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী নামটা তো শোনেনি। কমলার সঙ্গে দেখা হলে তাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখবে। কমলা অনেক খোঁজখবর রাখে। কাশীনাথ ম্যাট্রিক ফেল—। সে নিশ্চয়ই ইন্দিরা গান্ধীর নাম শুনেছে।

সূর্যাক্ষ বলল, জানিস রঘু, কুশল মাস্টারের কাছে সব সময় চেম্বার থাকে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেদিন চান করতে বাথরুমে গিয়েছিল, হঠাৎ দেখি প্যান্টের পকেট থেকে কালো মতো কী একটা টুকি মারছে। হাত দিয়ে দেখি কী শক্ত! আর ঠিক তখনই আমার জ্যাঠার ছেলে রুদ্রদা এসে আমাকে ওই অবস্থায় দেখে ফেলে। রেখে দে-বলে কী ধমক দিল। আমার পিলে চমকে গিয়েছিল। ওই দিন রুদ্রদাই বলল—এটাকে চেম্বার বলে। নিজের সেফটির জন্য কুশল মাস্টার ওটা সব সময় কাছে রাখেন। বলা যায় না কোথায় কখন পুলিশের লোকের সাথে দেখা হয়ে যায়।

—ওটা দিয়ে বন্দুকের মতো মানুষ মারা যায়? রঘুনাথ বোকার মতো শুধোল।

সূর্যাক্ষ হা-হা করে হাসল, মানুষ কেন রে, বাঘও মারা যাবে।

—অমনটা আমাকে একটা যোগাড় করে দিবি?

—ওটা দিয়ে তোর কি হবে?

রঘুনাথ উত্তেজিত হয়ে বলল, আগে কাশীকে ধসিয়ে দেব। ও ব্যাটা সবসময় আমার পিছে লেগে আচে। আমার এক নাম্বার শত্তুর।

—মাথা গরম করিস নে, শোন। সূর্যাক্ষ গলা নামিয়ে বলল, দেশের সময় এখন ভাল নয়। রুদ্রদা কলেজ থেকে চলে এসেছে। আর কলকাতায় যাবে না। ওখানে নাকি পুলিশ হোস্টেল ঘিরে রাতেরবেলায় ছেলেদের তুলে নিয়ে গিয়ে আলিপুরের জেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সেই ভয়ে সেন্ট-জেভিয়ার্স থেকে পালিয়ে এসেছে রুদ্রদা। একথা গাঁয়ের কেউ জানে না। তোকে শুধু বললাম।

—লোক জানলে পরে কী হোত কী? রঘুনাথের কৌতূহল জেগে উঠল।

—আরে, কি বোকা বলতো তুই! দশ কান হলে পুলিশ সব জেনে যাবে। এখন সাদা পোশাকের পুলিশ গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরছে। ওরা যদি জানতে পারে তাহলে আর রুদ্রদার নিস্তার নেই। পুলিশের জিপ এসে তুলে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণনগরের জেলে পাঠিয়ে দেবে। রুদ্রদা বলছিল—ওর চারজন বন্ধুকে পুলিশ গুলি করে মেরে দিয়েছে। সূর্যাক্ষর গলা ভার হয়ে এল, সেদিক থেকে আমাদের কালীগঞ্জ থানা অনেক ভালো। এখানকার পুলিশ বাড়াবাড়ি করে না। ওরা শুধু ডাকাত ধরে বেড়ায়, ছাত্রদের গায়ে হাত তোলে না।

কুশল মাস্টারের সঙ্গে সে রাতে অনেকটা পথ হেঁটে গিয়েছিল রঘুনাথ। বেলগাছটার কাছে আসতেই সে দেখতে পেল অন্ধকার ফুঁড়ে ঝোপের ভেতর থেকে উঠে এল রুদ্রাক্ষ। হাত উঁচিয়ে অদ্ভুত কায়দায় শরীর ঝাঁকিয়ে সে বলল, কমরেড, লাল সেলাম।

কুশল মাস্টারও হাত উঁচিয়ে একই কায়দায় বললেন, লাল সেলাম। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

রঘুনাথ ফিরে যেতে চাইলে রুদ্রাক্ষই বলল, ফিরে যাবে কেন, আমাদের মিটিংয়ে চলো। ঘাসুরিডাঙা, কামারী, কুলবেড়িয়া, কালীগঞ্জ, শেরপুর থেকে আরও কমরেডরা আসবেন। আজ আমরা পার্টির ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব। সেই সঙ্গে আমাদের পার্টির ভবিষ্যৎ কর্মসূচী গঠিত হবে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরি হয়ে যাবো। শ্রমিক এবং মেহনতী মানুষের জন্য আমরা পুঁজিপতি শ্রেণীর বিনাশ চাইছি, সেই সঙ্গে চাইব—দুনিয়ার শ্রমিক-কৃষক এক হোক।

রঘুনাথের যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তবু রুদ্রাক্ষ'র মুখের উপর সে না বলতে পারল না। নীলাক্ষবাবুর এই ছেলেটি পড়াশোনায় বরাবর ফার্স্ট। তার এই জনদরদী মনের কথা জানত না রঘুনাথ। শুধু কপোতাক্ষবাবু নয় রুদ্রাক্ষও মানুষের সেবায় নেমেছে। তবে সূর্যাক্ষর ভাষায়, কাকা ভাইপোর পথ ও মত সবই আলাদা। ওদেরও নিজেদের মধ্যে লড়াই আছে, সে লড়াই আদর্শের লড়াই। সে লড়াই কোনোদিন মিটবে বলে মনে হয় না।

কুশল মাস্টারের নেতৃত্বে জনা ত্রিশেক মানুষ চাপা গলায় স্লোগান দিল—দুনিয়ার কৃষক এক হও। দুনিয়ার শ্রমিক এক হও। দুনিয়ার মজদুর এক হও। প্রশাসনের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচারী এই সরকার আমরা মানছি না, মানব না। দুনিয়ার কমরেড এক হও। বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র ধ্বংস হোক।

সভায় সিদ্ধান্ত হল আজ রাত থেকেই কালীগঞ্জ বাজারে পোস্টার আর স্লোগানে ভরিয়ে দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে দেওয়ালে দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে আঁকা হবে মাও সে তুঙ-এর মুখ। গোটা গোটা করে লেখা হবে চিনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান, মাও সে তুঙ জিন্দাবাদ ইত্যাদি।

সেইমতো আলকাতরা কেনার জন্য রুদ্রাক্ষ রঘুনাথকে সাইকেলের পেছনে চাপিয়ে নিয়ে গেল কালীগঞ্জের বাজারে। দোকান আর একটু হলে বন্ধ হয়ে যেত। গণেশ বিশ্বাস বিরক্ত হয়ে বলল, বাবু, আলকাতরা নেবে তো, দিনের বেলায় এলে না কেন? রাতের বেলায় কি রঙের কাজ হয়? ঠিক আছে—এসেছ যখন দিয়ে দিচ্ছি। আর কিন্তু এসময় এসো না।

—ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি করো। আবার ফিরতে হবে তো—। রুদ্রাক্ষ ব্যস্ত হয়ে বলল।

সারারাত ধরে চলল তাণ্ডব। খবরের কাগজে লেখা হল স্লোগান। ছাঁচে আলকাতরা বুলিয়ে ফুটিয়ে তোলা হল মাও সেতুঙের মাথা। সাদা দেওয়াল ভরিয়ে দেওয়া হল কালো অক্ষরে। শিবনাথবাবুর দোকানের তালায় কাঠিতে বিষ্ঠা নিয়ে এসে ভরিয়ে দিল। শুধু শিবনাথবাবুর তালা নয় যারা যারা অত্যাচারী, হৃদয়হীন বলে ইতিমধ্যে কুখ্যাতির অংশীদার হয়েছেন তাদের একটা

তালাও অক্ষত রইল না। বহু সময় ধরে ব্যস্ত শিল্পের ছাপ রেখে বাঁধের ধারে ফিরে গেল ওরা। আখখেতের পাশ দিয়ে দিঘিতে যাওয়ার পথ।

দিঘির পাড়ে এসে ওরা শরীর এলিয়ে দিল ঘাসের বিছানায়।

কুশল মাস্টারের সারারাত খাওয়া হল না। রুদ্রাক্ষ সবার জন্য পাঁউরুটিও এনেছে থলি ভরে। দিঘির জলে হাত ধুয়ে ওরা যখন খেতে বসল তখন শেষরাত। মরা চাঁদ ঝিমুচ্ছে আকাশে। বাবলাগাছের ফুলের মতো হলুদ হয়ে এসেছে তার দৃষ্টি। সেই চাঁদের দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে আছে একটা হুতোমপ্যাঁচা।

পাউরুটির কাগজগুলো এক জায়গায় রাখতে বলে রুদ্রাক্ষ বলল, আমাদের আজকের এই অপারেশনের কথা কেউ যেন জানতে না পারে। কুশলদা ভোরের বাসে কৃষ্ণনগর চলে যাবেন। এখানে থাকা ওর পক্ষে রিস্ক হয়ে যাবে। কাল কি রিঅ্যাকশন হবে এখন ঠিক বোঝা যাবে না। তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। শিবনাথবাবু আমাদের টার্গেট। ও বুর্জোয়া। সুদখোর, মানববিদ্বেষী। আমাদের এই মহান বিপ্লবের শত্রু। গ্রামে গ্রামে এদের চিহ্নিত করতে হবে। তারপর হাইকমান্ডের নির্দেশমতো সাফাই অভিযান চালাতে হবে। পুঁজিপতি শ্রেণীর বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই সশস্ত্র রক্তাক্ত বিপ্লব চলবে।

রঘুনাথের জীবনে এ এক অন্য অভিজ্ঞতা, দিঘির জলে আলকাতরার দাগ মুছে সে ফিরে এসেছে ঘরে। তখনও আলো ফোটেনি, পোকরাতারা জ্বল-জ্বল করছে আকাশে। রঘুনাথ ভেবেছিল চুপচাপ ঘরে এসে শুয়ে পড়বে তালাইপেতে। কিন্তু শীতকাল বলে যত ঝামেলা। শুধু তালাইয়ে শীত যাবে না, ভোরের দিকে শীতের দাঁত ছুঁচলো হয়ে ওঠে, কাঁথা-কম্বল ছাড়া এ শীত সহজে যাবার নয়।

কাঁথা নামাতে গিয়ে বেকায়দায় হাত থেকে খসে পড়ল ইটের চেয়েও শক্ত তেলচিটে বালিশটা। দুর্গামণি ছেলের চিন্তায় ঘুমায়নি, তার তন্দ্রামতো এসে ছিল, বালিশ পড়ার শব্দে সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল বিছানায়, কে, কে? কে উখানে?

—আমি রঘু গো মা।

—সারারাত কুথায় ছিলি রে?

—মাঝের গাঁয়ে যাত্রা দেখতে গেছিলাম।

—যাত্রা! দুর্গামণির চোখে বিস্ময়, এখুন আবার কিসের যাত্রা? কেনে মিচে কতা বলছিস বাপ। তুকে না হাজারবার মানা করেচি, কমলার কাচে যাবিনে। ওর দাদাটা এট্টা আক্ষস। ওর বাপ এট্টা চামার। দেখে ফেললে তুর চোখের ডিমা উপড়ে লিবে।

—কেনে মিচিমিচি ভাবচো বল তো? রঘুনাথ বিরক্ত হল, আচ নিয়ে মেলা দিন হলো কমলার সাথে আমার দেকা নেই গো তাকে তো মামার ঘর পেঠিয়ে দিয়েচে ওর বাপ-মা। আমার কথা বিশ্বেস না হলে দিনমানে খোঁজ লিও।

এবার মন কিছু নরম হয় দুর্গামণির, তা গেলি যখন খেয়ে যাবি না? এত বড়ো রাত, না খেয়ে থাকলে কী হয় জানিসনে বুঝি? কেনে বলে গেলে আমি কি তুকে এটকুতাম। দুর্গামণি ছেলের কাছে সরে এল, তুর ভোখ লাগেনি, কিছু খাবি?

—খেয়ে এসেচি মা।

—হুঁ, খেয়ে এয়েচি? দুর্গামণি ভেংচে উঠল, বলি,কে তুর জন্যি ভাত রেন্ধে পাখার বাতাস করছিল শুনি?

—তুমি জানো না, সূর্য'র মা আমাকে কত ভালো পায়।

—অঃ! মন উদাস হয়ে গেল দুর্গামণির, বড়ো গাছে ঢিলি বাঁধা ভাল, তবে দেখিস বাবা—সেই ঢিলি যেন ফুটা না হয়ে যায়। আমার বড়ো ভয় হয় রে! এ জীবনে বড়ো মানুষের কত্তো ছোট কাজ দেখেচি।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায় রঘুনাথের, দুর্গামণি তাকে ঠেলা মেরে জাগিয়ে দিয়ে বলে, আর কত্তো শুবি রে বাপ? রোদ চড়ে গেল মাথার উপর। ইবার চোখে-মুখে জল দিয়ে টুকে বাজারে যা। মনে নেই তুর, আজ সোমবার, হাটবার।

মায়ের কথাগুলো বুকে ঢেঁকির পাড় দেয় রঘুনাথের। কালীগঞ্জ বাজারে আজ না যাওয়া ঢের ভালো। রুদ্রাক্ষ বারবার নিষেধ করেছে। বিপদ কোথায়, কখন ওৎ পেতে থাকে বোঝা যায় না। তাছাড়া শিবনাথবাবুর শকুনের চোখ। বাজারের লোকে বলে, মানুষটা সুদ খেয়ে খেয়ে রাজশকুন হয়ে গিয়েছে। মানুষের চোখের চামড়া যে গণ্ডারের চামড়া হয় কে জানত।

অনেকে শিবনাথবাবুকে বলে, বাঘের ফেউ, বড়বাবুর লেজুড়। এই মানুষটা থানা বগলদাবা করে জলে আগুন লাগিয়ে দেবে। এর কথায় মধু নেই, শুধু বিষ আছে।

তবু মায়ের কথাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না রঘুনাথ। চটের থলিটা নিয়ে সে উঠে আসে বাঁধে। সামান্য হলেও তার পা কেঁপে ওঠে। মনের ভেতর ভয় সুষনিপাতার মতো কাঁপতে থাকে।

থানায় খবরটা পৌঁছে দেয় শিবনাথবাবু নিজে। রাগে তার সারা শরীর রি-রি করে উঠছিল। তিনি কথা বলার অবস্থায় ছিলেন না। এমন কান্ড কে ঘটাতে পারে, কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে?

শিবনাথবাবু কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আপনি কিছু ব্যবস্থা করুন বড়োবাবু, নাহলে আমাদের এই শান্তির গ্রাম কৃষ্ণনগর রানাঘাট হয়ে যাবে। আগুন একবার জ্বলে উঠলে সহজে তা নেভানো যাবে না। এ দেশটা আলসের দেশ। আখের আলসেয় একবার আগুন লাগলে সহজে তা নিভতে চায় না। কথাটা মাথায় রাখলে সবার মঙ্গল হবে।

—আপনি প্রেসারের রুগি। এসব নিয়ে ভাববেন না। সুপ্রিয়বাবু নাক খুঁটতে খুঁটতে বললেন, যে-ই করে থাকুক, তাকে আমরা ধরবই। পেছনে হুড়কো দিয়ে ওর বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব।

—যা করার অড়াতাড়ি করুন। পাখি উড়ে গেলে তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। শিবনাথবাবুর কণ্ঠস্বরে উদ্বিগ্নতার ছাপ।

বড়বাবু সিগ্রেট ধরিয়ে বললেন, আপনার কাকে সন্দেহ হয়?

—বিদুর রাজোয়ারকে চাঁদা দিইনি। ও করলেও করতে পারে।

—ওর অত সাহস হবে? বড়োবাবুর যেন কথাটা বিশ্বাস হলো না। আড়চোখে তাকিয়ে শিবনাথবাবু বললেন, এছাড়া মানিকডিহির কপোতাক্ষর নামটাও আমার মনে আসছে। ওরা গ্রামটাকে নষ্ট করার চক্রান্তে লেগে পড়েছে। আমি সহজে তা হতে দেব না। ওরা যতই লাফাক, ঝাঁপাক, আমি আমার আদর্শে স্থির থাকব।

—স্থির থাকলে হবে মশাই, যুগ পাল্টাচ্ছে। তিক্ত গলায় বলল বড়োবাবু, জানেন গোয়াড়ী বাজারের কাছে একজন ও.সির পেটে ভোজালি ঢুকিয়ে দিয়েছে। শক্তিনগর সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে। খুব সিরিয়াস। ওয়ারলেসে ম্যাসেজটা পেলাম। আমাদেরও এলার্ট থাকা দরকার। কখন কি হয় বলা যায় না তো?

—তা তো বটে। শিবনাথবাবু জোর করে হাসলেন, ওরা আমাকেও শাসিয়েছে। বুর্জোয়া বলে গাল দিয়েছে। মনে হচ্ছে আমি ওদের নেক্সট টার্গেট।

—সেই ছোকরা মাস্টারকে সন্দেহ হয় না? বড়ো দারোগার কথায় নড়েচড়ে বসলেন শিবনাথবাবু।

—ও হারামিটাকে জীবনে আমি কোনদিন ভুলব না। জানেন মশাই আজ অব্দি কেউ আমার হাত ধরার সাহস পায়নি, ও শালা আমার হাত ধরে মুচড়ে দিল। সবাই না এগিয়ে এলে হয়ত ভেঙে দিত। শিবনাথবাবুর গলা শুকিয়ে গেল। অভিযোগের আঙুল তুলে তিনি বললেন, এই সুযোগ বড়োবাবু, এবার ছোকরা মাস্টারকে হাজত ঘরে পাঠাবাব ব্যবস্থা করুন। এমন কেস দিন যাতে জেল থেকে বেরতে দাড়ি পেকে যায়।

—চুপ করে বসুন। দেখছি আমি কী করা যায়।

বড়োবাবুর নির্দেশে চারজন পুলিশ ছুটল চারদিকে।

কদবেল তলা থেকে ধরে আনা হল বিদুর রাজোয়ারকে। লাবণি এল তার পেছন পেছন। সঙ্গে এল হরিনাথপুর আর দাসপাড়া সাধারণ মানুষ। তারা থানায় গিয়ে নিমগাছের তলায় স্লোগান দিতে লাগল। তাদের পুরোভাগে লাবণি।

পুলিশের জুলুমবাজি সইব না, সইব না।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

প্রশাসনের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও।

ভিড়ের মধ্যে থানায় ঢুকলেন কপোতাক্ষ। বড়বাবুর ঘরে শিবনাথকে দেখে তার মাথায় যেন বিছে কামড়ে দিল। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত ছুঁড়ে দিলেন শূন্যে, চোয়াল নাড়িয়ে বললেন, কমরেড বিদুর রাজোয়ার জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

বড়োবাবুর ঘরে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চলল ওদের। শেষ পর্যন্ত কোন ক্লু না পেয়ে ওদের নিঃশর্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন বড়োবাবু।

থানার ছোট দারোগা চন্দবাবু বললেন, স্যার, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। বলব?

বড়োবাবু ওর দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালেন, বলে ফেলো। দেরি করছ কেন?

ছোটবাবু বললেন, স্যার, কালীগঞ্জে সব মিলিয়ে দুটো লোহা-লক্কড়ের দোকান। ওই দুটো হার্ডওয়ার্সের মালিকদের ডেকে পাঠালে কেমন হয়। কাল কারা ওদের দোকান থেকে আলকাতরা কিনেছে তাদের নাম জেনে নিলে ইনক্যুয়ারির সুবিধা হবে।

—ইটস অ্যা গুড আইডিয়া। ইমিডিয়েট জিপ নিয়ে চলে যাও।

বড়বাবুর নির্দেশে ছোটদারোগা জিপ নিয়ে চলে গেলেন। ফিরে এলেন হাসি-হাসি মুখ করে।

বড়োবাবু জিজ্ঞেস করলেন, শেষ পর্যন্ত কি হলো?

—কেস সলভ করে ফেলেছি, স্যার। কাল মোট দুজন আলকাতরা কিনেছে। একজন কুলবেড়িয়ার, একজন মানিকডিহির। ওদের একজনের বয়স আনুমানিক আটান্ন, অন্যজনের বয়স বাইশ। তবে যার বাইশ বছর বয়স তার নাম দোকানদার বলতে পারল না। শুধু বলল মুখ চেনা। দেখলে চিনতে পারবে।

—ওয়েল! তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই। এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে মানিকডিহি চলে যাও। ওরা সতর্ক হওয়ার আগে ফাঁদ পেতে ওদের ধরে ফেল। বড়োবাবু প্রাপ্তির উত্তেজনায় ফুটছিলেন।

রঘুনাথের কানে খবরটা পৌঁছাতে সে আর দেরি করল না। বাজার না করে সে ঘুরপথে ছুটল মানিকডিহির দিকে। থানার গাড়ি পৌঁছনোর আগে সে পৌঁছে গেল রুদ্রাক্ষর কাছে। হড়বড় করে বলল, দাদা গো, পালাও। তুমাকে ধরতে পুলিশ আসচে। দোকানদার তুমার নাম বলে দিয়েচে। দোকানদারও গাড়িতে আচে।

ঘরে ঢুকে টুকিটাকি কিছু নিয়ে ঝোলা কাঁধে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল রুদ্রাক্ষ। বাঁধ পেরিয়ে সে সোজা চলে গেল বড়গঙ্গার ঘাটে। ঘাট পেরিয়ে নয়াগ্রাম হয়ে সে পৌঁছে গেল সালারের

কাছাকাছি। এখানকার গ্রামগুলো তারা চেনা। তবু এসব গ্রামে তার থাকা নিরাপদ নয়। যে কোন মুহূর্তে হামলা হতে পারে পুলিশের।

রুদ্রাক্ষ ভাবল—সে আবার কলকাতায় ফিরে যাবে। কোলকাতা ছাড়া নিজেকে লুকোবার তার আর জায়গা নেই। তবে সবার আগে কুশল মাস্টারকে খবর পাঠানোর দরকার। তিনি যদি ধরা পড়ে যান তাহলে পুরো আন্দোলনটাই মুখ থুবড়ে পড়বে তাদের জেলায়। এল. সি. কলেজের ছাত্রদের জাগাবার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত। এ কাজে তার বিপ্লবী মনোভাব অনেকটা কাজে দিয়েছে। ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছে আন্দোলন। এবার শুধু জোয়ারের অপেক্ষা। সশস্ত্র বিপ্লবের অপেক্ষা।

মনের জ্বালা মেটাবার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। শিবনাথবাবু বড়ো দারোগার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, সবাইকে যখন থানার দর্শন দিলেন তাহলে ছোকরা মাস্টারটাই বা বাদ যায় কেন? এই সুযোগ। দেওয়াল লেখার জন্য রাষ্ট্র-বিরোধী কেস দিয়ে ফাঁসিয়ে দিন মশাই। সবই তো আপনার হাতে।

ভ্রূ-কুঁচকে সুপ্রিয়বাবু বললেন, ভালো কথা বলেছেন। দেখি কী করা যায়—।

কলিং বেল টিপতেই একজন পুলিশ এসে স্যালুট দিয়ে দাড়ালো বড়ো দারোগা বললেন, এক্ষুনি মাস্টারদের মেসে যাও। অমলকান্তিবাবুকে থানায় ডেকে আনো। বলবে—আমি ডেকেছি। আরজেন্ট।

পুলিশটা বেরিয়ে যেতেই শিবনাথবাবু আর সময় ব্যয় করলেন না। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তাহলে স্যার, আসি। আবার দেখা হবে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলেন তিনি, ওঃ, একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ছোকরা মাস্টারের ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন। কাল আটটার বাসে যাতে চালান যায় সেই ব্যবস্থা করবেন।

থানা শব্দটায় সামান্য হলেও এলার্জি ছিল অমলকান্তিবাবুর। তবু ইচ্ছে না থাকলেও তাকে আসতে হল থানায়। চৈতন্যর-মা তার থানায় যাওয়ার কথা শুনে চোখ কপালে তুলে বলল, হেই মা গো, এ আবার কি অলুক্ষুণে কথা! মাস্টার তো ইস্কুলে যাবে, সে আবার কোন দুঃখে থানায় যাবে? কালে কালে আর কত কি যে দেখবো—তা কৃষ্ণ জানে।

বড়ো দারোগা চশমার কাচ মুছে বললেন, বসুন।

অমলকান্তিবাবু তবু বসলেন না, দাঁড়িয়ে থাকলেন।

এবার চোখ পাকিয়ে বড়ো দারোগাবাবু ধমকে উঠলেন, কথাটা কানে গেল না বুঝি? বড়ো বেয়াড়া তো আপনি?

গায়ে পোকা বসার মতো কথাগুলোকে ঝেড়ে দিয়ে অমলকান্তিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাকে ডেকেছেন কেন?

—বিনা প্রয়োজনে কাউকে কি থানায় ডাকা হয়?

—বলুন কি দরকার?

—এত তাড়াহুড়োর কি আছে। সব জানতে পারবেন। গোঁফ নাচিয়ে হেসে উঠলেন বড়ো দারোগা, আপনার নামে কমপ্লেন আছে।

—আমার নামে?

—হ্যাঁ, আপনার নামে। বড়ো দারোগাবাবু থামলেন, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, এই যে এত নাটক করলেন ছেলেদের নিয়ে এর কি কোনো প্রয়োজন ছিল?

—কি বলছেন, কিসের নাটক? আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না। বিস্ময়ে অমলকান্তিবাবুর চোখ কুঁকড়ে গেল।

—ন্যাকামী করবেন না, আপনি সব জানেন। আমার কাছে রিপোর্ট আছে। টেবিলে ভর দিয়ে

উঠে দাঁড়ালেন বড়ো-দারোগা, কাজটা ভালো করেন নি। মানুষ খেপিয়ে আপনার কি লাভ হল মশাই। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। চলুন—

—কোথায়?

—শ্রীঘরে। বড়ো দারোগা মুখ বিকৃত করে হেসে উঠলেন, ছিঃ—ছিঃ, আপনাকে মাস্টার বলে ভাবতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। যখন ভেবেছেন জঙ্গি আন্দোলন করবেন, তখন দেশসেবায় এলেন কেন? এসেছেন যখন তখন এর পুরস্কার তো আপনাকে নিতেই হবে, মশাই। গলা ধাক্কা দিয়ে অমলকান্তিবাবুকে ঠেলে ফেলে দিলেন বড়ো দারোগা, টাল সামলাতে না পেরে কঠিন দেওয়ালে মাথা ঠুকে গেল তার।

অসহায় চোখে অমলকান্তিবাবু তাকালেন, আমার অপরাধটা কি জানতে পারি?

—দেওয়ালগুলো আলকাতরা দিয়ে ভরালেন তখন মনে ছিল না? যান ক'দিন জেলের ভাত খেয়ে আসুন, তখন ঠিক মনে পড়ে যাবে। বড়ো দারোগা হাজতঘরের চাবির বান্ডিলটা একটা পুলিশের দিকে ছুঁড়ে দিলেন, রায়, এটাকে ঢুকিয়ে দাও। মেজবাবুকে বলো পেপার রেডি করতে। কাল যেন সদরে চালান করে দেয়।

ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা থানা ঘেরাও করেও কোনো ফল হল না। হেড-মাস্টারমশাই নিজে এলেন বড়োবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। বড়ো বাবু দক্ষ রাজনীতিবিদের মতো বললেন, সরি মাস্টারমশাই, কিছু করা যাবে না। এরা চিনের চেয়ারম্যানকে নিজের চেয়ারম্যান বানিয়ে দিচ্ছে, এদের হয়ে আপনি আর ওকালতি করবেন না। তাছাড়া আমারও চাকরির রিস্ক হয়ে যাবে। ওপরওলার নির্দেশ, আমি তো অমান্য করতে পারি না।

পরের দিন সকাল আটটার বাসে চালান গেলেন অমলকান্তিবাবু।

খবরটা শুনে সূর্য এসেছিল বাসস্ট্যান্ডে। তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে রঘুনাথ ফিসফিসিয়ে বলল, হায় ভগমান, কার দোষে কে জেল যায় দেখোদিনি। সূর্যাক্ষ চমকে উঠেছিল কথা শুনে, তুই কি বলতে চাইছিস?

রঘুনাথ হাসল, মুহূর্তে টানটান হয়ে দাঁড়াল, ডান হাতের আঙুলগুলো সূর্যাক্ষের সামনে মেলে ধরে বলল, এই দেখ, আমার নখের ভেতর এখুনো আলকাতরার রঙ লেগে আচে। বেতের বেলায় কুশল মাস্টুরের কথা মতন ফটোর মাথাগুলোয় আমি লিজের হাতে আলকাতরা বুলিয়েচি। হা দেখ, ভালো করে দেখ, এখনও শুঁকলে ঘেরাণ পাবি।

সূর্যাক্ষের মুখে কোনো কথা নেই, রঘুনাথের হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল চুনারীদের কয়লা-ডিপোর বেড়ার কাছে, চুপ কর। মরবি নাকি? এখানেও টিকটিকি ঘুরছে।

—টিকটিকি? রঘুনাথ নির্বোধ চোখে তাকাল।

সূর্যাক্ষ তাকে সাবধান করে বলল, যা বলেছিস, আর যেন কোনোদিন না শুনতে পাই। এসব কথা বলা মানে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা। জানিস, রুদ্রদা পালিয়েছে। জেঠিমা কত কাঁদছিল। জেঠুকে আমি কোনোদিন এত গম্ভীর দেখিনি।

—তুর দাদা কুথায় গিয়েচে আমি জানি। কথাগুলো বলে রঘুনাথ বোকার মতো হাসল, তুর দাদা গাঙ পেরিয়ে সালারপানে চলে গিয়েচে। যাওয়ার আগে আমার সাথে দেখা হয়েছিল।

সূর্যাক্ষর মাথাটা যেন কাজ করছিল না এমন ভাবে তাকাল, সেকি রে এর আগে আমাকে তো এসব কথা বলিসনি তুই!

—বলব কী করে? রঘুনাথ প্রশ্নভরা চোখে তাকাল, সেদিন রাত থেকে আমারও কী ছাই মাথার ঠিক আচে? আমিও তো পেলিয়ে পেলিয়ে বেড়াচ্চি। বলা যায় না কখুন কী হয়। এমনিতে কাকার জন্যি আমাদের কতো বদনাম। শেষে আমার জন্যি বদনাম হলে আর কিছু না হোক মা তো গলায় ফাঁস নেবেই নেবে। মাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না বলে দিচ্চি।

সূর্যাক্ষের সাইকেলের পেছনে বসে হলদিপোঁতা অব্দি বাঁধে বাঁধে চলে এল রঘুনাথ। অশোথতলায় এসে সে সূর্যাক্ষকে বলল, তোকে যা বললাম-এসব কথা কাউকে যেন বলবি নে ভুল করে। তবে এট্টা কথা সূর্য, তুর দাদাকে আমার বড়ো ভালো লেগেচে। কত জ্ঞানবুদ্ধি ওর। এক এট্টা কথা বলে হাঁ করে তেকিয়ে থাকতে মন চায়। ওর সব কথায় আগুনপোরা।

—রুদ্রদা আর আসবে না। জেঠিমা বলছিল ধরা পড়লে পুলিশ নাকি তাকে গুলি করে মেরে ফেলবে। সূর্যাক্ষের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল।

রঘুনাথ কি বুঝে বলল, এ হতেই পারে না। এটা কি মগের মুলুক নাকি?

—আমি জানি না, তবে—। সূর্যাক্ষ কথা বলতে পারছিল না। তার দু-চোখ ভরে উঠল জলে, জানিস, অমলকান্তি স্যারের জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। স্যারকে থানায় খুব মেরেছে। দেখলি না কেমন চোখ-মুখ ফুলে গিয়েছে। খবরটা শুনে দ্বীপী তো শুধু কেঁদেই যাচ্ছে। সামনে আমাদের পরীক্ষা। কী ক্ষতি হয়ে গেল বল তো।

—মাস্টুরকে ওরা ধরল কেনে? মাস্টুর তো ওসব দলে ছিলো নি।

—তাহলেই বোঝ, কেমন বিচার। সূর্যাক্ষ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

রঘুনাথ ওর হাত আঁকড়ে ধরে বলল, তুই বললে আমি এর বদলা নিয়ে ছাড়ব। আমি কাউকে ডরাই না।

—কী করতে পারবি তুই? ভয়ে শুধোল সূর্যাক্ষে।

—খুন করে দিব। রঘুনাথের চোখের তারা কেঁপে উঠল, ভালো মানুষের জন্যি এট্টা-দুটা খুন করতে আমার হাত কাঁপবে না। তবে খুন করলে জেলে যেতে হবে। মা'টা বড়ো একা হয়ে যাবে। দিনরাত কেনদে কেনদে আমার মা'টা মরে যাবে।

পনের দিনের মাথায় পুলিশের জিপ গিয়েছিল কুলবেড়িয়ায়। বড়োবাবুর সঙ্গে ছিল রাইফেলধারী আরও দু-জন পুলিশ। কেসের তদন্ত সেরে ফেরার সময় অঘটনটা ঘটে গেল। মাঝ পথে গাছের গুঁড়ি ফেলে জিপ থামাল কারা। ঝোপের আড়াল থেকে আচমকা শুরু হল গুলির বৃষ্টি। প্রতিরোধের কোনও সময় পেলেন না বড়ো দারোগা। পর পর চারটে গুলি তার ইউনিফর্ম ভেদ করে বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গের পুলিশ দুটো গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল ঘাসে। প্রতিরোধের সব চেষ্টাই বিফলে গেল হামলাকারীদের অতর্কিত আক্রমণে। দুটো রাইফেল আরে সার্ভিস রিভলভার নিয়ে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওরা।

থানা-চত্বরে তিনটে লাশ পৌঁছাতেই ওয়ারলেশে খবরটা ছড়িয়ে গেল চতুর্দিকে। এস.পি. এলেন কৃষ্ণনগর থেকে সেই রাতে, সঙ্গে বিশাল পুলিশ বাহিনী। একটা আতঙ্কের পরিবেশ চারদিক জুড়ে।

গুজবের হাজার ডানা।

বাজারে রাষ্ট্র হল মন্ত্রী আসছেন কলকাতা থেকে। খবরটা শোনার পর শিবনাথবাবুর মনের অবস্থা

ভালো নেই। একটা ভয় তার ভেতরে কুয়াশার মতো জমতে শুরু করেছে। সেই ভয়ের কথা তিনি মুখফুটিয়ে কাউকে বলতে পারেন না, ভয়টা মাথার ভেতর ঘুঘরো পোকার মতো ঘুরছে। চোখ বুজলেই বিদুর আর কপোতাক্ষবাবুর মুখটা ভেসে উঠছে। ওরা রাহু-কেতুর মতো তার মনের অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে আছে। যদি কোনো বিপদ আসে এদের কাছ থেকেই আসবে। এখন তার মনে হয় অমলকান্তিবাবুকে জেলে পাঠিয়ে তার কোনো ভালো হয়নি, বরং মৃত্যুভয় সর্বদা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কে বলতে পারে দারোগাবাবুর মৃত্যুর পিছনে অমলকান্তিবাবুর কোনো হাত নেই।

এই গ্রামকে তিনি কি আগে চিনতেন? ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলেন শিবনাথবাবু। গলা শুকিয়ে এল তার। হাওয়া বদলের গন্ধটা তিনি টের পাচ্ছেন। এই গ্রামে যদি তাকে টিকে থাকতে হয় তাহলে তার হাবভাব স্বভাব এমন কী কথা বলার ধরন তাকে পাল্টাতে হবে। নাহলে সমূহ বিপদ।

তিনটে ফুলের মালা অসময়ে জোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে গেলেন শিবনাথবাবু। বড়োবাবু তার নিকট আত্মীয়র মতো ছিলেন। দায়ে-অদায়ে তার কাছে ছুটে গেলে তিনি খালি হাতে ফেরাতেন না। বড়োবাবুর দাপটের জোরে আজ শিবনাথ বাবুর এত রমরমা।

মন্ত্রী আসার খবরটা চাউর হয়ে গিয়েছে পুরো গ্রামে। থানার মাঠে ঢল নেমেছে মানুষের, ঠিক যেন চড়কমেলার অবস্থা। সবুজ আর শুভর হাসপাতালে মন ধরল না। অবনীর সঙ্গে ওরাও চলেছে মন্ত্রী দেখতে।

মাধুরী হাসপাতালের গেটের কাছে বলল, তোরা ছেলে। তোরা কত স্বাধীন। বাবা আমাকে যেতেই দিল না। যা রাগ হচ্ছে না বাবার উপর।

শুভ মন খারাপ করে বলল, মন্ত্রী তো রাস্তা দিয়ে যাবে, তখন তুই দেখে নিবি। আমরা ভাষণ শুনে আসব। এসে তোকে সব বলব।

মাধুরী মিষ্টি করে হাসল, সেই ভালো। তোরা তাড়াতাড়ি যা। না হলে দাঁড়াবার জায়গা পাবি না।

সবুজ কষ্ট পাওয়া থেকে বলল, বড় দারোগার ছেলেটা আমাদের ক্লাসে পড়ে। ভাব তো ওর আজ কী হচ্ছে। এ সময় ওর পাশে আমাদের দাঁড়ানো দরকার।

সবুজ ঘাড় নাড়ল। মাধুরী বলল, বিপদের দিনে কেউ পাশে দাঁড়ালে বিপদ অনেকটা হালকা হয়ে যায়। তবে এ তো তুলোচাপা বিপদ নয়, এ হলো পাথরচাপা বিপদ।

—মানুষ নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনে। সবুজ বিজ্ঞের গলায় বলল, বাজারের লোকে বলে বড়োবাবুর মেজাজ ভালো ছিল না। সবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন। খারাপ মানুষরা বেশি দিন বাঁচে না, তাই না?

কোনো উত্তর না দিয়ে মাধুরী ঘাসের দিকে তাকাল।

সালার থেকে নতুনগ্রাম পৌঁছাতে বেলা গড়ে গেল। তবু ধানমাঠে চুপ করে বসে ছিল একটা হাঁড়িচাঁচা পাখি। ওর জুড়িটাকে আশেপাশে দেখতে পেল না গুয়ারাম। মন খারাপ হয়ে গেল তার। পথ যত ছোট হচ্ছে ততই দুর্গামণির জন্য মনটা টনটনিয়ে উঠছে তার। ছেলের কথা মনে পড়ছে, বাপের কথা মাঝে মাঝে ঝিলিক মেরে উঠলেও দুর্গামণি যেন মাঝ গঙ্গায় ভেসে ওঠা শুশুক। ওই মুখটা মনে পড়লেই গুয়ারামের হাঁটার গতি ঢিমে হয়ে আসে আপসেই।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল, কচার বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে যে শুধোল, গুয়াদা, কী হলো গো তুমার, পায়ে বুঝি বিদনা লাগে?

গুয়ারাম অপ্রস্তুত হাসল, না রে ভাই, পায়ের বিদনা-ফিদনা কিচু না। সত্যি কতা বলতে কি ভাই—আজ তুর বউদির কতা বড্ড মনে পড়চে। ভাব তো কৎদিন পরে আচ তুর বউদির পাশে গিয়ে শুবো।

—ওঃ! দুলাল হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, তা বটে। উপোসী শরীল বড়ো গঙ্গার বান গো। সব ভেসিয়ে লিয়ে যাবে। তা দাদা, রয়ে-সয়ে খেও। গলায় গাবের বিচি এটকে গেলে বিপদে পড়বে।

—না রে ভাই, সেদিন কি আর আচে? গুয়ারাম রসিকতা করে বলল, কাঠের আগুন এখুন ধিকিধিকি তুষের আগুন। শরীল যে তেজ দেখাবে তেমন খাদ্যখাবার জোটে কুথায়? শুধু মনের জোরে এ সব কাজ হয় না রে, এর জন্য জোর চাই।

—তা যা বলেচো! দুলাল এগিয়ে এসে বিড়ির ডিবা খুলে গুয়ারামকে একটা বিড়ি আর দেশলাই বাক্স এগিয়ে দিল, নাও, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দাও। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে মনে তুমার স্ফূর্তি আসবে কোথা থেকে। তা দাদা, বউদি রে বলো-আজ রাতে যেন মুরগি মারে।

গুয়ারাম এবার বিড়ি খাওয়া দাঁত বের করে হাসল। বাবলা গাছের হলুদফুলগুলো তার চোখে মনে হল হলুদগোলাপ। সত্যি, কতদিন পরে আজ দুর্গামণির সঙ্গে তার দেখা হবে। ছেলেটা বড়ো হয়েচে, এখন কি আর এত রঙ্গরস মানাবে তাকে? চুনারামের পাতলা ঘুম। খুট করে শব্দ হলে জেগে ওঠে। গলা খেঁকারি দেয়। তার গলা খেঁকারি জোরে ঘরের কেন পাড়ার লোকেও জেগে ওঠে।

পুরো বিশ জনের দলটা আলপথ ধরে ফেরিঘাটের দিকে চলেছে। আর একটু দেরি হলে মাঝি-মল্লাররা গাঁয়ে ঢুকে যাবে। ডাকাডাকি না করলে তারা আর গঙ্গার ঘাটে ফিরবে না। সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনিতে তারা বিধ্বস্ত, ক্লান্ত।

দুলাল এসব কাজে দলের সেরা। পুরো দলটা তার নির্দেশমত পাঁচ মাস চলেছে। যাওয়ার আগে ভূষণীবুড়ি তাকে বলে দিয়েছিল, মিলে জুলে থাকবি। বিদেশে পরকে আপন না ভাবলে জান বাঁচে না। বিদেশের ছোট বিপদ ফোঁড়া নয় রে বাপ, কারবঙ্কল। সামলে না চললে সেই বিপদ তুর মাথায় চড়ে বসবে।

দুলালের বিচার-বুদ্ধি মন্দ নয়। মন্দ না হবারই কথা। দুলাল যে নীলকণ্ঠবাবুর ছেলে একথা কারোর জানতে আজ আর বাকি নেই। তার যে বিচার-বুদ্ধি নজরকাড়া, হৃদয়স্পর্শী হবে এ নিয়ে কারোর কোনো দ্বিমত নেই। এবার চাষের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি বৃষ্টি। দুলাল দলের প্রত্যেককে বুঝিয়ে বলেছে, বাবুদের খুশি করা হলো আমাদের কাজ। একাজ তো একদিনের নয়, বাবুদের মন জুগিয়ে চললে একাজ আমরা ফি-বছর পেয়ে যাবো। একটা কথা মনে রেখো-মানুষ থাকে না কিন্তু মানুষের কাজটা থেকে যায় বছরের পর বছর। ফলে তোমাদের উপর হলদিপোঁতা ধাওড়ার সুনাম নির্ভর করচে।

ইন্দুবালার সঙ্গে পুকুয়াড়িতে কুঁড়ে বেঁধে ছিল দুলাল। রাতটা কোনোমতে কাটিয়ে দিনের আলো ফুটলে চলে যেতে হোত খেতে। মাটির কাজে শরীর মাটি না হলে সোনার ফসল ফলে না।

সত্যসাধনবাবুর ঘরদোর বেশ ছিমছাম এবং গোছানো। এ বাড়ির গিন্নি যে লক্ষ্মীময়ী এ ব্যাপারে কারোর মনে কোন দ্বিধা বা জড়তা নেই। মুনিষদের সঙ্গেও গৃহকর্ত্রীর যোগাযোগ ছিল সব সময়। অন্য জেলা থেকে খাটতে আসা মানুষগুলোর উপর তার টান কিছু মাত্রায় কম ছিল না। প্রায়ই ইন্দুকে ডেকে এটা-সেটা বাড়তি অনেক কিছু ধরিয়ে দিতেন তিনি। নিকট-আত্মীয়ের মতো বলতেন, কিছু দরকার হলে চেয়ে নিও। আমি সব দিন হয়ত খোঁজ নেওয়ার সময় পাব না, তুমি প্রতিদিন এসে তোমাদের ভালো-মন্দ শুনিয়ে যেও।

গরীবদের উপর যার এত টান তার উপর শ্রদ্ধা যে প্রগাঢ় হবে এই তো জানা কথা। একদিন বিকেলবেলায় ঝমঝমিয়ে শুরু হল বৃষ্টি। সত্যসাধনবাবু তখন ঘরে নেই ব্যবসার, কাজে গিয়েছেন সালার বাজারে। কালো রঙের মোটর সাইকেলটা তার নিত্যসঙ্গী।

এমন সময় গৃহকর্ত্রী ডেকে পাঠালেন দুলালকে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারলেন তিনি। এ কী দেখছেন অবেলায়? মাঠবাবুর জলজ্যান্ত ছবিটা যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ কী চোখের ভুল না কি আলেয়া ধাঁধাঁ? তবু সাহস করে সেই প্রবীণা শুধোলেন, কী নাম গো তোমার?

—আজ্ঞে মা, আমার নাম শ্রী দুলাল চন্দ্র রাজোয়ার।

—কোথায় বাড়ি?

দুলাল নিঃসংকোচে বলল, হলদিপোঁতা ধাওড়ার নাম শুনেচেন, সেখানে। ইটা কালীগঞ্জ থানার মধ্যে।

প্রবীণার চোখের পাতা পড়তে চায় না। শরীর কাঁপছে ঝনঝনিয়ে। ঈশ্বরের কী অপূর্ব লীলা বোঝা দায়। ত্রিশ বছর আগের ঘটনা হুবহু দেখতে পান সুবর্ণা। তখন নীলকণ্ঠবাবুর কণ্ঠলগ্না ছিলেন তিনি। সুন্দরী হিসাবে মাটিতে পা পড়ত না তার। আর নীলকণ্ঠবাবুও তাকে ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্য বাইরে গিয়ে শান্তি পেতেন না।

সাহেব মাঠে ভূষণীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল নীলকণ্ঠবাবুর। ভূষণী সেদিন থেকে তার নিজের মেঠো-রূপটাকে নীলকণ্ঠবাবুর চোখের ভেতর প্রেম-সোহাগে যত্ন নিয়ে এঁকে দেয়। ছবি আঁকা শেষ হলে ভূষণীর জোয়ার আসা বুকে ঢেউ ভাঙে প্রেমকাতর নীলকণ্ঠবাবু। দয়াল তাকে যা দেয়নি, সেই অমৃতসুখ তার শরীরে রোপণ করে দিলেন নীলকণ্ঠবাবু।

সুবর্ণার এখন পড়ন্ত বেলা। তবু পশ্চিমের রোদ্দুর তাকে উদ্ভাসিত করে তোলে আজও। অস্তমিত যৌবনের অস্তিমচ্ছটা তাকে আলোকিত করে কখনো-সখনো। এখন তার কণ্ঠস্বরে সেই উন্মাদনা নেই, ঢিলেঢালা শরীরে বার্ধক্যের শেকড় ঢুকে গিয়েছে। স্থিতু হওয়া মনটা এখন পিছন ফিরে তাকায় বারবার।

সত্যসাধনবাবুকে তখন ব্যবসার কাজে প্রায় যেতে হত কৃষ্ণনগরে। সুবর্ণার দাদাদের সঙ্গে ছিল তার ব্যবসায়িক আত্মীয়তা। বাজার থেকে সম্পর্কটা একদিন ঘরে এসে নোঙর করল।

কথায় কথায় সুবর্ণা জানতে পারলেন প্রায় দু-বছর অতিক্রান্ত হয়েছে সত্যসাধনবাবুর পত্নীবিয়োগ। প্রসবের সময় চিকিৎসা বিভ্রাটের জন্য স্ত্রী এবং তার পেটের সন্তানকে হারালেন সত্যসাধনবাবু। চলতি ব্যবসা মাথায় উঠল শোকে। সেই শোক কাটাতে দু'বছর কোথা দিয়ে যে পালিয়ে গেল! সত্যসাধনবাবুকে প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে গেল সুবর্ণার। তার পুরুষালী চেহারার মাদকীয় আকর্ষণ পুরুষ্টো সেগুনকাঠের চেয়েও আভিজাত্যময়। নীলকণ্ঠবাবু তখনও ফেরার, তিনি যে আর ফিরবেন না এ বিষয়ে একরকম নিশ্চিত ছিল সুবর্ণা।

দাদাদের অনুমতি নিয়ে তাদের ভাঙা জীবন আবার বিয়ের পিঁড়িতে পূর্ণতার আস্বাদন পেল। বিগত বত্রিশ বছর সালারের এই বাড়িটাতে আগলে কিসের মোহে পড়ে আছেন তিনি। সত্যসাধনবাবু তার কোন সুখের অভাব রাখেননি, শুধু সন্তানসুখ ছাড়া আর সব কিছু কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছেন তিনি। এখন সুবর্ণা বয়স্কাদের দলে। তবু তার মনটা সেই প্রথম যৌবনের কথা ভেবে প্রায়ই কঁকিয়ে ওঠে।

সময় চলে যায় কিন্তু স্মৃতি কেন পিছু ছাড়ে না! নীলকণ্ঠবাবুকে আজও, এই বয়সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পান তিনি। ভূষণীর সঙ্গে তার শুধু একবার মাত্র দেখা হয়েছিল। সেদিনের সেই ভূষণীর

মুখটা এখনও কি দেখতে পাচ্ছেন তিনি? সুবর্ণার চোখের তারা কেঁপে উঠল। চোখের উঠোন জলবাহী মেঘের হঠাৎ বৃষ্টিতে স্নাত হলো যেন।

দুলালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন তিনি। তার মাথা টলছে, হারিয়ে যাচ্ছে পায়ের জোর। আর একটু হলে গোড়াকাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়তেন তিনি, দুলাল গিয়ে তাকে দু-হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল।

—মা, আপনার কি শরীল খারাপ করচে? বাবুরে কি খপর পাঠাব? ও মা, কথা বলুন গো। আমার ভেষণ ভয় করচে। দুলালের আকুলতায় ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন সুবর্ণা। অস্ফুটে বললেন, বাবা দুলাল, আমি তোমার মা হই গো, তোমার এই মাকে মনে না থাকারই কথা। তুমি তখন ছোট, আমি তোমাকে দেখতে গিয়েছিলাম হলদিপোঁতায়। সেদিনের কথা তোমার মনে থাকার নয়, তবে বাবা তোমার আসল মায়ের এসব কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। সে আমার সতীন, তবু তার জন্য আমার মন বড়ো কাঁদে। আমরা কেউ-ই মানুষটাকে পেলাম না! শুধু কামড়াকামড়ি করে মরলাম। আজ শেষবেলায় এসে বুঝতে পারছি—যৌবন সব নয়, যৌবনের ওপরে বুঝি সম্পর্ক।

ইন্দুকে দুলাল কথাগুলো বলতেই মুখ শুকিয়ে গেল ওর। অনেক ভেবে বলল, আত্মীয়ঘরে খাটবা, তুমার লাজ লাগবে না? তাছাড়া ওরাও তো তুমার কাছে কুঁকড়ে থাকবে। এভাবে কি কাজ হবে গো? লোক জানাজানি হওয়ার আগে আমাদের এ গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়া দরকার।

—মেয়েমানুষটা বড়ো ভালো গো! দুলালের চোখে থৈ-থৈ করে শ্রদ্ধা।

—সে তো সব বুঝলাম। কিন্তু—। ইন্দুবালার মন সায় দিচ্ছিল না।

দুলাল বলল, তুমার মন না চাইলে আমি ইখানে ভাগাড়ের শকুনের মতো পড়ে রইবোনি। দু'জনা একসাথে এসেচি, যিখানে যাবো একসাথে যাবো। সারারাত ঘুমাতে পারেনি দুলাল। প্রথম মোরগ ডাকার আগে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল সে। ইন্দুবালাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, চলো গো, আর দেরি করা যাবে না। যা আচে-তল্লিতল্পা সব বেন্‌ধে নাও। এখানে সুখের ভাত গলায় কাঁটার মতন বিঁধবে। চলো, সময় থাকতে পালাই...।

বাঁকের দু-দিকে পুরো সংসার। দুলাল আগে, ইন্দুবালা তার পিছু পিছু হাঁটে। একসময় হাঁপিয়ে উঠে বাঁকটা নামায় দুলাল, ঘষটে যাওয়া কাঁধ রগড়ে নিয়ে বলল, সম্পর্ক হলো গিয়ে এমন লতা যারা কুনো মরণ নাই গো! কত সম্পর্ক মরে যায়, সেগুলো কি ঠিক মরে গো?

দুলালের চোখে সংসারের আলো চিকুর কেটে গেল।

গুয়ারাম পোড়া বিড়িটা ফাঁকা ধানমাঠে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, কী রে দুলাল, নেতিয়ে গেলি যে, তুর পা বুঝি আর চলচে না।

দুলাল থতমত খেয়ে তাকাল, তার চোখে তখনও তার দ্বিতীয় মায়ের ছবি শচীমাতার মতো পুত্রবিরহে আকুল হয়ে কাঁদছে। কে তাকে সান্ত্বনা দেবে? দুলালের এত মনের জোর কোথায়? সে তার বাপের মতো বরাবরই আবেগী। অন্যমন সহজে তার মন ছুঁয়ে যায়। এ-ও এক জীবনজোড়া রোগ। এ রোগ যার ভিতরে রয়েছে তার আর বাঁচা নেই।

ফেরিঘাটে এসে নৌকোর উপর বাঁক নামাল দুলাল। আসার সময় মায়ের পা ছুঁয়ে এলে মনের ভারটা নির্ঘাৎ কমত। তা যখন হয়নি তখন তাকে স্মরণ করে একবার অনন্ত প্রণাম করা দরকার।

দুলাল নৌকা থেকে বড়ো গঙ্গার বুকে হাত রাখল। এমনি একটা আনন্দঘন শিরশিরে ভাব উঠে এল তার শরীরে। এত বছর আগের কথা স্পষ্ট তার মনে পড়ে না। তবে ভূষণীবুড়ির মুখে বারবার শুনেছে মাঠবাবুর নামটা। ওই নামটা আউড়ানোর সময় ভূষণীবুড়ি নিমেষে হয়ে যেত মানিকডিহির

বড়ো গাঙ। হাজারবার নীলকণ্ঠবাবুর কথা বললেও ভূষণীবুড়ি একবারও সুবর্ণার কথা বলেনি। তবে কি মায়ের কোনো গোপন রাগ আছে তার উপর?

রাগের কথা মাঠও জানে না, আকাশও জানে না।

নৌকো দুলে ওঠে বৈঠার ছালাৎ ছলাৎ জল-সোহাগের শব্দে। এই শব্দ যেন জাগিয়ে তোলে নীলকণ্ঠবাবুর হাসি। সাহেবমাঠে মাঠবাবু মাজা সোজা করে হেঁটে যাচ্ছেন। জমিতে তার সচলছায়া। সেই ছায়ার ভেতর দুলাল খুঁজতে থাকে নিজেকে।

গত পাঁচমাসে শুধু বুড়িগাঙের জলছাড়া আর সবকিছু যেন বদলে গিয়েছে গুয়ারামের চোখে। সাহেব মাঠের আখগাছগুলো হিলহিল করে নড়ছে, এ বছর আখের চাষ এত বেশি যে টাইম মতো আখ পৌঁছানোর স্লিপ পাচ্ছে না চাষীরা। গুয়ারামের সব চাইতে ভালো লাগে অশ্বত্থতলায় দাঁড়ালে। খোলা হাওয়ায় অশ্বত্থের ঢ্যাঙ্গা পাতা কোমর দুলিয়ে নাচছে।

ঘরে ফেরার আনন্দটা কাউকে বুঝি বলে বোঝানো যায় না। ঘরের মানুষটাকে দেখার পর মুখভার করে আছে দুর্গামণি। সে তার খুশিটাকে জিইয়ে রেখেছে বুকের ভেতর। চুনারাম তখন থেকেই ফটর ফটর করছে। ওর যেন কথার শেষ নেই। পুরো পাঁচমাসের জমানো কথা একেবারে উগরে দিয়ে নিস্তের পেতে চায়।

দুর্গামণি অনেকক্ষণ পরে লাল চা নিয়ে এল কাচের গ্লাসে, নাও, খেয়ে নাও। চা খেলে গা-হাত-পায়ের বিদনা কমবে।

গুয়ারাম দীর্ঘসময় ধরে বউয়ের দিকে তাকাল, পুরনো বউ তবু মনে হল এই সবে দুর্গামণি বউ হয়ে ঘরে এল। চোখের পাতা জুড়ে গুনগুনিয়ে উঠল ভ্রমর। দুর্গামণি লজ্জা পেল কেননা সে এই চাহনির অর্থ বোঝে। আজ সারারাত মানুষটা তাকে ঘুমোতে দেবে না। এই ভাবনায় সুখের পানসিটা দাঁড় বেয়ে চলে গেল বহু দূরে। দুর্গামণির সারা গা শিরশিরিয়ে উঠল, বুক দুটো যেন কুঁকড়ে কুঁচকে শামুকের মতো লুকাতে চাইল নিজেকে। ভেতরের এই বাঁধ ভাঙা আনন্দ-উচ্ছ্বাস দুর্গামণি কারোর কাছে প্রকাশ করবে না। এমনিতে তার চাপা স্বভাব। গুয়ারামের তালে তাল মিলিয়ে সে চলতে পারে না।

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বেশ জোরে রসনাতৃপ্তির শব্দ করল গুয়ারাম, তারপর মুখ তুলে মুগ্ধ গলায় শুধোল, ছেলেটা কুথায়, তারে তো দেখচি নে?

—সে কি ঘরে থাকার ছেলে? পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল দুর্গামণি, ভূষণীবুড়ির জ্বর যে ছাড়চে না, তারে লিয়ে হাসপাতালে গিয়েচে।

ভূষণীবুড়ির অসুখের খবর শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল গুয়ারামের, বয়স হলে মানুষের আর রোগজ্বালা ছাড়তে চায় না। দুলাল এয়েচে এদদিন পরে, মাকে ঘরে না দেখলে তার মনটা কি হবে বলো তো?

—সে তো বুঝচি কিন্তু—? দুর্গামণি কিছু বলতে গিয়ে থামল।

গুয়ারাম তাড়া লাগিয়ে বলল, থামলে যে, কি বলছিলে বলো?

—দুলালের মায়ের মনে হয় কঠিন অসুখ হয়েচে। দুর্গামণি আমতা আমতা করে বলল, জ্বর সেই কবে থিকে হয়েচে, আর ছাড়চে না। রঘু বলল, দরকার হলে কেসনগর লিয়ে যাবে। গোস্বামীপাড়ার কপোবাবু চাঁদা উঠিয়েচে।

—তাহলে তো আমার সিখানে একবার যাওয়া দরকার।

দুর্গামণি তাকে বাধা দিয়ে বলল, যা করার রঘুই করবে, তুমার আর গিয়ে কাজ নেই। ডাল-ভাত রেঁধে দিচ্ছি, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো।

আলুমাখা, কলাইডাল আর বড়িভাজা করেছে দুর্গামণি। কাঁচা সরষে তেলের গন্ধটা জড়িয়ে গেছে গরম ভাতে। ঘরে লঙ্কা ছিল না, দুর্গামণি ডিবরি নিয়ে গিয়ে বেড়ার ধারের গাছটা থেকে লঙ্কা তুলে নিয়ে এল। কাঁচা লঙ্কা চটকে গরম ভাত খাওয়ার অভ্যাস গুয়ারামের দীর্ঘদিনের। ভাতের সঙ্গে বিরিডাল জড়িয়ে গেলে স্বপ্নের এক সুষমখাদ্য তৈরি হয়। দুর্গামণি আগে থেকে সব যেন জানত, তাই ব্যবস্থা করে রেখেছিল আগাম।

খাওয়ার পরে বাপ আর ছেলে মুখোমুখি বসে বিড়ি ফুঁকল তারিয়ে-তারিয়ে। বিড়ির সুতোর কাছে আগুন আসতেই হাই তুলে চুনারাম বলল, নিদ লাগচে, ইবার আমি শুয়ে পড়ব।

গুয়ারাম বলল, তুমি দোক্তা খেতে ভালোবাসো, তুমার জন্যি দোক্তাগুণ্ডি এনেচি—লিবা না?

চুনারাম হাসল, রেখে দে, কাল সকালে নিব।

শীত হাওয়ায় অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল চুনারামের। ফিসফিস কথাগুলো কানে ভেসে এল বুড়ার। দুর্গামণি খিলখিল করে হাসছে। গুয়ারাম টিয়াপাখির মতো কি যেন বলছে বউটার বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে। ডিবরির আলো এসে পড়েছে মাটির দাওয়ায়। দুর্গামণি অনেকক্ষণ পরে মুখের ঘাম মুছে বলল, এবার শীত লাগচে, কপাটটা ভেজিয়ে দাও।

গুয়ারাম আবার হুমড়ে পড়ল দুর্গামণির খোলা বুকে, থুঁতনি ঠুসে ধরে বলল, আমার কাছে জাড় খেদাবার মেসিন আচে।

—সে আমি জানি। আর বাহাদুরী করো না। এবার ঘুমোও। দুর্গামণির সতর্ক কথায় জেদ বেড়ে গেল গুয়ারামের, দু-হাত বাড়িয়ে দুর্গামণিকে বুকের কাছে টেনে এনে বলল, জাড়ের দিন শেষ হল বলে, ইবার তুর-আমার দিন শুরু হবে।

কথার ওমে বয়স বাড়ে রাতের।

লাইন থেকে ফিরে এলে দুলুর শরীর আর চলতে চায় না। পা দুটো ভারী হয়ে থাকে সব সময়। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হলে তখন কথা বলার ইচ্ছেটাই নষ্ট হয়ে যায়। মনে হয় মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেই বুঝি ভালো হত।

বাস স্ট্যান্ডে নেমে সরাসরি বাজারের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল দুলু। স্যাকরা দোকানে মানোয়ারাকে দেখতে পেয়ে তার যে কী হল সে যেন হাঁটাচলার ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলল। বুকের গভীর থেকে কুয়োর জল চুঁয়ানোর মতো চুঁয়াতে লাগল দুঃখ।

এখন মানোয়ারাকে দেখলে তার পুরো দুনিয়াটা ফাঁকা লাগে। কোনো মতে হিসাব মেলে না কেন এমন হল তার জীবনে। এ পাড়ায় সাদাত আছে বহুদিন, অথচ কোনোদিন মানোয়ারা তার দিকে তাকায়নি। হাত কাটার পর তার যে কী হল সেই জটিল হিসাবটা মেলাতে পারছে না দুলু। বারবার ভার হয়ে আসে চোখ, টলটল করে জল।

বাজারের দিকে এগোতে গিয়ে আর এগোতে পারে না দুলু। কাপড় দোকানের পাশ থেকে সে দেখতে থাকে মানোয়ারার হাবভাব। সাদাত তাকে মনের মতো করে রেখেছে। মোকামপাড়ায়

সাদাতের চাটাইয়ের ব্যবসা। প্রায় জনাকুড়ি মানুষ তার হয়ে চাটাই বানায় রোজ। বাঁশ-বাখারি সব সাদাতের। মানুষগুলো শুধু বুনে দিয়ে খালাস।

লরি ভর্তি হয়ে চাটাই যায় রানীগঞ্জ, আসানসোল, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন। ওদিকে বাঁশচাঁচারির চাহিদা প্রচুর। মহাজনরা চাটাই কিনে খনি-অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়। এ ব্যবসায় ধার-বাকি নেই, প্রথম থেকে নগদা-নগদি কারবার। ট্রাক বোঝাই চাটাই নিয়ে গেলে পকেট বোঝাই টাকা আনে সাদাত। এভাবেই প্রায় সাত বছর ধরে তার ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে। মোটা টাকা ব্যাঙ্ক আর পোষ্টাপিসে সুদে বাড়ছে তার।

দুলু দূর থেকে দেখল মানোয়ারা সোনা দোকানে বসে আছে দেবী হয়ে। বিয়ের পরে ওর রূপ যেন ফেটে বেরচ্ছে। যৌবনপ্রভা রাধাচূড়া ফুলের চেয়েও উজ্জ্বল। তাকালে আর চোখ ফেরাতে পারে না দুলু। মানোয়ারাকে মনে হয় স্বপ্নদেশের রাজকন্যা। এই মেয়ের সঙ্গে একসময় তার জানাশোনা ছিল একথা এখন আর মানতে চায় না মানোয়ারা। তার ঠোঁটের হাসি সোনার হারের উপর গড়িয়ে পড়ে আরও উজ্জ্বল দেখায়। মানোয়ারার জন্য চা এনেছে দোকানদার। গোল বিস্কুটে কামড় দিয়ে মানোয়ারা দেবীর হাসি হাসছে। সে যত হাসছে তত বুক ভেঙে যাচ্ছে দুলুর। মনের ভেতর ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে হঠাৎ উদয় হওয়া ঘূর্ণিঝড়ের মতো।

দুলু ভাবছিল অন্য কোনো ছেলে হলে মানোয়ারাকে খুন করে দিত। নিদেনপক্ষে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারত তার গালে। কুৎসিৎ করে দিত সুন্দর মুখের ভূগোল।

দুলু পারেনি। এই না পারাটা তার অক্ষমতা। দুর্বলতা। মানোয়ারাকে সে ইচ্ছে করেই জিতিয়ে দিয়েছে। প্রেমে জোর খাটেনা। প্রেম সেই আজব লেবু যা কচলালে তেতো হয়ে যায়।

দুলু বাঁ হাত দিয়ে চোখের কোণ মুখে নিল। এই স্যাকরা দোকান থেকে সে মানোয়ারাকে রূপোর হারছড়া কিনে দিয়েছিল। সেদিন খুশির ঈদের চাঁদের মতো জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছিল মানোয়ারার হাসি দুলু সেই হাসিতে যোগ দিয়ে বলেছিল, তুমার হাসিটার দামই লাখ টাকা। আল্লাতালা হাসি বিলোবার জন্যি তুমাকে পেঠিয়েচে।

গালে টোল পড়লে মানোয়ারা বেহেস্তের ফরিস্তা। দুলু তখন ওর মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। গলা কাঁপে আবেগ জ্বরে, তুমার জন্যি আমার এই জান বাজি রইল। কবে মরে যেতাম গো যদি না তুমি আমার পাশে থাকতে।

মানোয়ারা আহ্লাদী হয়ে উঠত কথা শুনে, স্ফুরিত অধর নাচিয়ে বলত, আমার জন্ম হয়েছে শুধু তুমার দেখভাল করার জন্যি। তুমি আমার আকাশ গো। তুমার ছায়া থিকে আমাকে খেদিয়ে দিও না কুনোদিন।

মানোয়ারাকে তাড়িয়ে দেয়নি দুলু, মানোয়ারাই চলে গেছে স্বেচ্ছায়। বড়োগাছে হাঁড়ি বেঁধেছে সে। রসে ভরে উঠছে তার ঠিলি। নুরি বেগমের বহুগামিতা স্বভাবটা কী করে যেন ঢুকে গিয়েছে মানোয়ারার ভেতর। শুধু রূপ ভাঙিয়ে শরীর দেখিয়ে দিন চলছে তার। চাঁদ মহম্মদের ঘরে মানোয়ারা এখন আর আসে না। কেন আসবে? দেখা হলে চাঁদ মহম্মদ টাকা চায়। সাদাতের কাছে মেয়েকে এক প্রকার বিক্রি করে দিয়েছে সে।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে এক গোছা টাকা দিয়ে সোনার দোকান থেকে বেরিয়ে এল মানোয়ারা। রূপোর হার খুলে সোনার হারটা পরে নিয়েছে সে। গায়ের রঙের সাথে মিশে গেছে সোনা। দুলু তখনও হাল ছেড়ে দেয়নি। রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে সে হাঁ করে তাকিয়ে আছে মানোয়ারার দিকে। চোখে চোখ পড়লে যদি হেসে ওঠে মানোয়ারা।

চোখে চোখ পড়ল কিন্তু হাসল না মানোয়ারা। বাসি মেটের মতো ঠোঁটের রঙ করে সে কটমটিয়ে

তাকাল। ঘাবড়ে যাওয়া দুলু এই মানোয়ারাকে চিনতে পারে না। কত দ্রুত মানুষ বদলে যেতে পারে! এর ব্যাখ্যা তার জানা নেই। মানোয়ারা এখন সমস্ত ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে।

সাদাতের সঙ্গে হাজারদুয়ারী দেখতে গিয়েছিল সে লালগোলা ট্রেনে চেপে। ফেরার সময় বেলডাঙার কাছে মানোয়ারা আর সাদাতের সঙ্গে দেখা হল দুলুর। দুলুর হাতে তখন গুপিযন্ত্র, পায়ে বাঁধা ঘুঙুর তোড়া। দুলু গলা কাঁপিয়ে গাইছিল : পীরিতি চাল কুমড়োর বিচি/ও নারী কাঁদিস মিচিমিচি/ ডালের বড়ি ঝোলে দিলে গলে গলে পড়ে/ সে বড়ির সুয়াদ ভালো, রাতে খাটিয়া নড়ে। গানটার শেষের দিকের কথাগুলো কানে যেতে লজ্জা পায় মানোয়ারা। সাদাত ঠোঁট টিপে টিপে হাসে। যাত্রী চেঁচিয়ে বলে, ও ভাই, রসের গান আর এট্টা হোক। দুলুর উৎসাহে ভাঁটা পড়ে না, সে গায়; বনের মধ্যে সিংহ রাজা, বনের বাইরে আমি/যতই খাও বাইরে বাতাস, আমিই তুমার স্বামী। গান শেষ হল, পয়সাও পেল দুলু। কিন্তু যার জন্য গান গাওয়া, সে মুখ ফুটিয়ে টুঁ শব্দটিও করল না। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল তার। মানোয়ারা তবু প্রতিক্রিয়াহীন। হাঁ করে সে চেয়ে আছে বাইরের দিকে। ট্রেন চলছে শেয়ালদামুখো কু ঝিকঝিক।

সেদিন ট্রেন থেকে নেমে দেবগ্রামে দুলু দেখতে পেয়েছিল ভূষণীবুড়িকে। জ্বরে ভুগে কাঠি হয়ে গিয়েছে তার দেহ। কথা বলার ক্ষমতা নেই, শুধু চিঁ-চিঁ শব্দ। কিছুটা এগিয়ে যেতেই দুলাল এগিয়ে এল তার সামনে। তার পেছনে দাঁড়িয়েছিল রঘু। সে সামনে এসে বলল, যাক, দুলালকাকা ফাঁড়া কেটে গেল। ঠিক সময়ে এসেছিল দুলাল, না হলে মাকে ফিরিয়ে আনা তারপক্ষে সম্ভব হত না।

রঘুনাথকে এ ব্যাপারে সাবাশ দেয় দুলাল। কাঁধের উপর হাত রেখে বলল, যা কামিয়ে এনেছিলাম সালার থেকে তা সব চলে গেল।

—মা বেঁচে থাকলে অমন টাকা ঢের হবে। রঘুনাথ জোর গলায় বলল, মায়ের মতন সম্পত্তি আর আছে নাকি গো? ও পয়সা-কড়ি নিয়ে খামোখা ভেবো না। দুলাল চুপ করে কথা শুনছিল রঘুনাথের। শুধু লম্বায় বাড়েনি ছেলেটা, তার মগজও বেড়েছে শরীর বাড়ার সাথে সাথে।

কৃষ্ণনগর স্টেশনে সুবর্ণার সঙ্গে দুলালের যে দেখা হবে তা সে নিজেও জানত না। প্যান্ট-শার্ট পরা একজন এসে তাকে বলল, এ ভাই, তোমাকে ওই ভদ্রমহিলা ডাকছেন।

চোখ ঘোরাতেই ধাক্কা খেয়েছিল দুলাল। সুবর্ণা স্টেশনের শেডের নীচে দাঁড়িয়েছিলেন লোক্যাল ট্রেন ধরার জন্য। দুলালের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি, কি ব্যাপার তুমি এখানে?

—মা হাসপাতালে ভর্তি ছিল, আজ তাকে ঘর লিয়ে যাচ্ছি। —কই তোমার মা? সুবর্ণা চঞ্চল হয়ে উঠলেন চোখের পলকে।

ভূষণীবুড়ি সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসেছিল। বসে থাকারও ক্ষমতা ছিল না তার। দুর্বলতায় চোখ ঢুকে গিয়েছে কোটরে। হনুহাড় জাগানো মুখ। বয়স শুধু যৌবন খায় না, আয়ুও খায়। তার প্রমাণ এখন সে।

ভূষণীবুড়িকে চিনতে সুবর্ণার প্রথমে কষ্ট হয়। সেই সুশ্রী মুখটাকে তিনি তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ান। সময়ের পলি জমেছে ভূষণীব চোখে মুখে। সে এখন আর শুধু মহিলা নেই, বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছে।

সুবর্ণা তার পাশে গিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় বসল, আঙুল দিয়ে ঠেলা মেরে বলল, আমাকে চিনতে পারছো?

চোখ রগড়ে অনেকক্ষণ ধরে সুবর্ণাকে দেখল ভূষণী, শেষে চিনতে না পেরে আফসোসের সঙ্গে বলল, কে বটে গো তুমি?

—মাঠবাবুকে মনে আছে তোমার? সুবর্ণা ধার ছুরি ছুঁড়ে দেওয়ার মতো প্রশ্ন করল। চোখ রগড়ে

নিয়ে ঘোলাটে চোখে তাকাল ভূষণীবুড়ি, ফোঁকলা মাড়ি দেখিয়ে হাসতে গিয়ে সহসা গম্ভীর হয়ে গেল সে, এখুন আর চোখে ভালো দেখতে পাই না। চারদিক ঝাপসা হয়ে আসচে। ওপরওলা ইবার দয়া করলে বাঁচি গো!

সুবর্ণা ভূষণীবুড়ির হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে এসে ধরে থাকলেন অনেকক্ষণ, তারপর বিড়বিড় করে বললেন, তোমার সাথে যে আবার দেখা হবে ভাবিনি। দুনিয়াটা গোল। তাই দেখা হয়ে গেল—

ভূষণীবুড়ির কথা বলার ক্ষমতা নেই। তার শরীর থরথর করে কাঁপছে। দুলাল কথা শোনার জন্য ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। রঘুনাথ তাকে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলে হাঁ করে ওদের দু জনের দিকে তাকাল।

মানোয়ারাকে নিয়ে সাদাত লেবেল ক্রশিং গেট পেরিয়ে চলে গেল বটতলার দিকে। ওদের পেছন পেছন যাওয়ার কোনো ইচ্ছে হল না দুলুর। মানোয়ারা আজ তাকে যা দুঃখ দিল, সেই দুঃখের কথা সে কারোর কাছে মুখ ফুটিয়ে বলতে পারবে না। মানুষ এত বদলে ফেলে নিজেকে? নিজেকে বদলে ফেলা সহজ নয়। অথচ মানোয়ারা দিব্যি তা পেরে গেল। সাদাতকে সে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে। না হলে সাদাতই বা কেন মুখে কুলুপ আঁটবে?

একই গাঁয়ে ছোট থেকে মানুষ, অথচ কেউ কাউকে চিনল না—এই কষ্ট হাজার চেষ্টা করলেও মিলিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। দেবগ্রামের মোড় থেকে কালীগঞ্জে যাবার বাস ধরবে ওরা। বাসেও দেখা হবে ওদের সঙ্গে।

রাগে ক্ষোভে মাথাটা ঝিনঝিন করছিল দুলুর। বাপের জন্য তার একটা পাউরুটি কিনে নিয়ে যাওয়ার কথা। এই সামান্য কাজটাও ভারী ঠেকছে তার কাছে। একটা মেয়ে তার জীবনটাকে এভাবে জ্বালিয়ে দেবে, ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার করে দেবে সে ভাবতে পারছিল না।

নিজেকে শক্ত করার কোনো কৌশল দুলুর জানা নেই। যদি তা জানা থাকত তাহলে কঠিন বর্মের ভেতর নিজেকে লুকিয়ে ফেলত সে। হাজার কষ্ট হলেও আর কখনো মানোয়ারার মুখের দিকে তাকাত না সে। কী আছে ওই হারিয়ে যাওয়া মুখে? হারিয়ে যাওয়া মনগুলো দুঃখের খনি, মুখগুলো দোজকের গুনাহ।

ক'দিন থেকে শরীরটা ভালো নেই দুলুর। শরীর ভালো না থাকলে ট্রেনের কামরায় গান গেয়ে বেড়ানো খুব ঝুঁকি হয়ে পড়ে। গেল রোববার রানিং-ট্রেনে উঠতে গিয়ে বাঁ হাতটা পিছলে যাচ্ছিল দুলুর। ভাগ্যিস পাশের হকারটা তাকে ধরে ফেলে না হলে সেদিনই তার শরীর ট্রেনের চাকায় পিষে গিয়ে অক্কা পেত। এই অন্যমনস্কতার পেছনে পরোক্ষভাবে মানোয়ারার হাত রয়েছে। ভুলব ভুলব করেও তাকে যে কিছুতেই ভুলতে পারছে না দুলু। ভোরবেলায় সাদাতের ট্রাক ছেড়ে গেল আসানসোলের দিকে। এখন চার-পাঁচ দিন গ্রাম ছাড়া হয়ে থাকবে সাদাত। চাটাই ব্যবসায় কাঁচা টাকার মুখ দেখা গেলেও বেশির ভাগ সময় থাকতে হয় ঘরছাড়া। মানোয়ারা মানিয়ে নিয়েছে এসব। পুরুষমানুষকে ঘরে আটকে রাখলে চলবে না। সংসারের উন্নতির জন্য টাকা চাই। তা ছাড়া মানোয়ারা এখন আর একা নেই। সাদাতের সন্তান তার গর্ভে বাড়ছে। আর ক'মাস পরে তারা দোকা থেকে হয়ে যাবে তিনজন। মানোয়ারার সব স্বপ্ন পূরণ হয়ে যাবে তখন।

ভোরবেলায় চাটাইয়ের আড়ত অবধি এসেছিল মানোয়ারা। সাদাতের পাশে দাঁড়িয়ে সে বলল, সাবধানে যেওক্ষণ। টেইম মতন ধাবার হোটেলে খেয়ে নিও। তুমি না ফেরা পর্যন্ত আমার চোখে নিদ আসবে নি।

শাদীর পর থেকে রাতের ঘুম প্রায়ই চটকে যায় মানোয়ারার। সাদাতের কোনো সময় জ্ঞান নেই।

ওর মন চাইলেই মানোয়ারাকে জাগিয়ে দিয়ে শরীরী খেলায় মেতে উঠবে। বাধা দিতে গিয়ে পলকা বাঁশের মতো ভেঙে পড়ে মানোয়ারা। এই আত্মসমর্পণের খেলায় এত যে আনন্দ লুকিয়ে থাকে আগে জানত না মানোয়ারা, এখন ভালো লাগার রেণুগুলো তাকে সুখী মানুষের মতো তিল তিল যত্ন নিয়ে সাজায়। সাদাত ঘরে না থাকলে সময় কাটতে চায় না মানোয়ারার। কতক্ষণ আর রেডিও শুনে সময় কাটাবে সে। পাড়া ঘোরার অভ্যাস নেই তার।

সাদাতের পথ চেয়ে পাঁচটা দিন দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়। শেষের দিনগুলো আর কাটতে চায় না মানোয়ারার। জামাই ঘরে না থাকলে মেয়ের টানে চাঁদ মহম্মদ দু-একবার দেখা দিয়ে যায় মানোয়ারাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে মানোয়ারার কোনো হেলদোল নেই। বাপের উপর পুরো আগ্রহটা হারিয়ে ফেলেছে সে।

চাঁদ মহম্মদ অভাবী মানুষ। সাদাতের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা সে বাগিয়ে নিয়েছে মানোয়ারাকে বাজী রেখে। এই খবরটা জানার পর মাথাটা গরম হয়ে আছে মানোয়ারার। বাপকে সে কথা শুনিয়েছে মনের ঝাল মেটাবার জন্য। সাদাতের টাকা তো এখন তার টাকা। এ টাকা নয়-ছয় করা যাবে না। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সামলে রাখার জন্য টাকার যে কত প্রয়োজন সে এর আগে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। ঘর খরচের জন্য রোজ তাকে যেতে হত পাল কোম্পানীর আটা চাকিতে। দুলু তাকে হাতে তুলে যা দিত তাতেই তার সংসার চলত কোনোমতে। সেই সব কষ্টের দিন আজও মনে পড়ে তার। বাপের উপর রাগটা তাই সে আর চেপে রাখতে পারে না। ওই কুঁড়ে মানুষটাকে দেখলে তার মাথায় যেন বিছে কামড়ে দেয়।

ভোর ভোর সাদাতের ট্রাক মোকামপাড়ায় ঢুকে যাওয়ার কথা। দু-এক ঘণ্টা দেরি হলে অস্থির হয়ে ওঠে মানোয়ারা। সে ঘর-বার করতে থাকে। মনে কতরকমের চিন্তা এসে উদয় হয়। আসানসোল অনেক দূরের পথ। দুর্গাপুর পেরিয়ে আরও যেতে হয় অনেকটা।

সাদাতের মুখে গল্প শুনেছে সে ওদিকটার পুরো খনি এলাকা। প্রায়ই ধস নামে গ্রামে। খনির ভিতর আগুন জ্বলে ওঠে কখনও বা। কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় ভরে থাকে আকাশ। জায়গাটা রুক্ষ্ম হলেও প্রাণের স্পন্দন আছে সেখানে।

আসানসোলের বাজার থেকে মানোয়ারার জন্য একটা গোলাপী রঙের শাড়ি কিনেছে সাদাত। এবার ঈদের শাড়িটা মানোয়ারার পছন্দ হয়নি তেমন একটা। দেবগ্রামের বাজারে ভালো শাড়ি খুব কম পাওয়া যায়। বহরমপুর মুর্শিদাবাদ গেলে হয়ত মনের মতো শাড়ি পাওয়া যেত। মানোয়ারার শরীর সায় দিল না। ঈদের বাজার দেবগ্রাম থেকে সারতে হল তাকে। সেই থেকে সাদাতের মনে মনে একটা ইচ্ছে ছিল সুযোগ পেলে সে মানোয়ারার জন্য একটা ভালো শাড়ি কিনে আনবে। মেয়েদের মন পেতে গেলে শাড়ি গয়নার প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না।

পাকা গমের মতো মানোয়ারার গায়ের রঙ। হাসলে সেই রঙের সাথে মিশে যায় গোলাপী আভা। পুরো মুখটা তখন গোলাপের চেয়েও সুন্দর হয়ে ওঠে। মানোয়ারার এই রূপটাই দু'চোখে আঁকা হয়ে আছে সাদাতের। নুরি বেগমের পুরো মুখটাই যেন মানোয়ারার মুখে বসানো। যৌবনে নুরি বেগমের দিকে তাকালে অনেক হাজী-কাজীর বুকে শুরু হত ভূমিকম্প।

মানোয়ারা মায়ের স্বভাব পেয়েছে, তার চোখের তারায় মাঠ পালানো হাওয়ার যাদু-ছোঁয়া। সাদাতের ডর লাগে। বনের পাখি খাঁচার শাসন ভালোবাসে না। যার উড়ে বেড়ানো স্বভাব তার কি ঘরের চার দেওয়াল ভালো লাগে। সাদাতের চোখের সামনে এখনও দুলুর করুণ মুখের অসহায় ছবিটা ভেসে ওঠে। মানোয়ারা তাকে ধোঁকা দিয়েছে। সেই চোট এখনও সামলে উঠতে পারেনি। শরীরের ঘা দ্রুত সারলেও মনের ঘা সহজে শুকোয় না। দুলুর দীর্ঘশ্বাস সাদাতের উপর পড়ছে।

কাউকে কাঁদিয়ে মানুষ যদি সুখের খোঁজ করে তাহলে সেই সুখের শরীরে ঘুন লাগতে কতক্ষণ?

রাত এগারটার পরে লাইনের হোটেল থেকে ট্রাক ছাড়ল সাদাতের। বিল মেটানোর সময় টাকার তোড়াটা বেরিয়ে এসেছিল পকেট থেকে। পাশে দাঁড়ানো ছোকরাটা জীবনে যেন টাকা দেখেনি এমন চোখে দেখছিল। তার চাহনি ভালো লাগল না সাদাতের। কিছু চোখ থাকে যার ভাষা পড়া খুব সহজ। সাদাতের মনে হল টাকাগুলো এত বে-সাবধানীতে না রাখলে ভালো হত। ড্রাইভার রহমান তাকে সাবধান করে বলেছিল, সাদাতভাই, এত কাছাঢিলা হয়ো না। দিনকাল খারাপ। নিজেকে গুছিয়ে রাখতে শেখো। নাহলে পথেঘাটে ঠকবে।

ট্রাক দাঁড়িয়েছিল মেন রোডের ওপর। রহমান হর্ন বাজাচ্ছিল ঘনঘন। হোটেলওয়ালা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, সাদাতভাই, আবার আসবেন গো। খোদা হাফেজ। টাকা গুনতে গুনতে হাতটা কপালে ছোঁয়ালো সে। সাদাত বলল, খোদা হাফেজ। আল্লার মর্জি হলে আবার দেখা হবে বড়ো ভাই। ট্রাকের কাছে সাদাত পৌঁছাতেই রহমান মুখ বেজার করে বলল, বড়ো দেরি হয়ে গেল মালিক। ভাবছি রাতটা এখানে কাটিয়ে ভোর ভোর গাড়ি ছাড়লে কেমন হয়?

সাদাত সজোরে ঘাড় নেড়ে উঠল অনীহায়, ভোর ভোর গেলে পৌঁছাতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। মানোয়ারা বেগম আমার জন্যি ভেবে ভেবে শুকিয়ে তেনা হয়ে যাবে।

—তুমার কথা ভেবেই কথাটা বলেছিলাম। রহমান অসন্তুষ্ট হল। আকাশে চুন ফুটকির মতো তারা ফুটেছে। অসময়ে একটা কালো মেঘ এসে ভিড় করেছে পুব কোণে। এ মেঘে বৃষ্টি হবে না তবু ভয় দেখাতে দোষ কোথায়। সাদাত বলল, মেঘ দেখে কি ভয় পেয়ে গেলে রহমান! কয়লা তো কদমা নয় যে জল লাগলে গলে যাবে।

—আমি সে কথা বলচি নে। রহমান দাড়িতে হাত বুলিয়ে তাকাল, আমার চিন্তা অন্যখানে। তুমার কাছে হার্ড-ক্যাশ আচে। তুমি যে চাটাই বেচে ফিরচো একথা লাইনের সবাই জানে।

—জানবে না কেনে? সাদাত মাথা চুলকে বলল, অতো ভেবে লাভ নেই, ভাগ্যে যা আচে তাই হবে। তুমি গাড়ি স্টার্ট করো। ইনশাআল্লা। খোদা আমাদের সাথে সাথে চলবেন। আমরা যে খোদার বান্দা।

বাম হাতে স্টিয়ারিং ধরে ডান হাতে সিগারেট ধরাল রহমান। ধোঁয়া ছেড়ে ভাবল মুসাফিরের বাছবিচার থাকতে নেই। যেখানে পানি সেখানে সবাই ওজু করে নেই । কার কোথায়, কখন এন্তেকাল কে জানে। তবু মনটা কু'গায় কেন সবসময়?

যে মেঘে বৃষ্টি হবার কথা নয়, সে মেঘে বৃষ্টি হল। রাস্তার ধারে লরি থামিয়ে ত্রেপলটা ভালো করে বিছিয়ে দিল রহমান। ফেরার সময় সাদাত কয়লা নিয়ে যায় ট্রাক ভরে। ওদিকে কয়লার চড়া দাম। আড়তখানায় সাপ্লাই দিলে লাভ নেহাত মন্দ হয় না। এ যেন এক ঢিলে দুই পাখি মারার সমান। খালি ট্রাক ফিরে গেলে তারই ক্ষতি। ট্রাকের ভাড়া তো দিতেই হত। অতএব ট্রাক ভরে নিয়ে যেতে দোষ কোথায়?

বৃষ্টি থামলেও রাস্তা ছিল পিছল। খুব সাবধানে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে ছিল রহমান। বৃষ্টির পরে শীতের কনকনানি বেড়েছে, হাওয়া বইছিল এলোমেলো। গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে সাদাত দূরের দিকে তাকাল। ফাঁকা রাস্তায় হেড লাইটের আলো পড়ে সাপের পিঠের চেয়েও চকচক করছে পিচ। সাদাত রহমানকে বলল, স্পিড তোল। ভয় কি আমি তো আছি।

বেশি দূর নয়, একটা বাঁক পেরতেই লরি থামাতে বাধ্য হল রহমান। সামান্য তন্দ্রামতন এসেছিল সাদাতের। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সে দেখল রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে একটা গাছের গুঁড়ি। কোনোভাবেই সেই গুঁড়ি পেরিয়ে সামনে যাওয়া সম্ভব নয়। ব্যাক-গিয়ারে গাড়ি কতদূর যেতে পারে।

সাদাত কপাল কুচকে বলল, গাড়ি থামাও।

রহমান গাড়ি থামানোর আগেই শুনতে পেল খিস্তি-খেউড়। শাবল হাতে এগিয়ে এল একজন ষণ্ডামার্কা লোক। এর আগে এই লাইনে মানুষটাকে কোনোদিন দেখেনি সাদাত। লোকটা এগিয়ে এসে শাবলটা মাথার উপর তুলে আঘাত করতে চাইল সাদাতকে। সাদাত সরে দাঁড়িয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, মারচো কেনে, কি চাও তুমরা?

—মালকড়ি যা আচে দিয়ে দাও।

সাদাতের গা-হাত-পা কাঁপছিল। কাঁপা কাঁপা চোখে সে দেখল তার চার পাশে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আরও চার পাঁচজন। লাইন হোটেলের সেই ছেলেটাকে সে দেখতে পেল সবার পিছনে। দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁতের মাংস খুঁটছিল ছেলেটা। মুচকি মুচকি হাসছিল সে।

রহমানকে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে ওরা। চাবি কেড়ে নিয়ে নিজেরাই রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে দিল লরি। সাদাতের পাথর বসানো সোনার আংটি দুটো খুলে নিল ষণ্ডামার্কা লোকটা।

ফাঁকা রাস্তায় রাতের ট্রাক ছুটে যাচ্ছে সাঁইসাঁই। শীত হাওয়ার দাপটে বেশির ভাগ জানলা বন্ধ। বিপদ বুঝে সাদাত হাতজোড় করে বলল, টাকা পয়সা যা আচে, সব তো নিলে। এবার গাড়ির চাবিটা দিয়ে দাও। আমরা যাই। যাবি মানে? খিঁচিয়ে উঠল পাশে দাড়ানো লোকটা। গলায় মাফলার জড়িয়ে সে হুঁকরে উঠল, আগে ট্রাক সার্চ হবে, তারপর—

—কয়লাগুণ্ডি ছাড়া ট্রাকে আর কিচু পাবে না। সাদাতের গলা শুকিয়ে আসছিল। প্রগাঢ় অন্ধকারে ভয় চেপে বসছিল ওর বুকের উপর।

তিন ব্যাটারির টর্চ জ্বেলে ড্রাইভার কেবিনে ঢুকে গিয়েছে তিনজন। হন্যে হয়ে ওরা খুঁজচে কিছু পাওয়া যায় কিনা। শেষে মানোয়ারার গোলাপী রঙের শাড়ির প্যাকেটটা হাতে নিয়ে একজন খ্যা-খ্যা করে হাসে। তার হাসিতে যেন বিষ ছিল, সাদাতের সারা শরীর জ্বলে উঠল রি-রি করে। দাঁত বের করে প্যাকেটটা নাচাতে নাচাতে ভুঁড়িওয়ালা লোকটা বলল, শালা হারামী, লুকিয়ে এটা ঘর নিয়ে যাচ্চিল, কী আছে এতে?

—বউয়ের জন্য এট্টা শাড়ি কিনেছিলাম। সাদাত কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, আমরা গাঁয়ে থাকি, ওখানে ভালো শাড়ি পাওয়া যায় না।

—ভালো হয়েছে, এটা আমার বউ পরবে। ভুঁড়িওয়ালা লোকটা জানলা দিয়ে শাড়ির্ প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিল নীচে। সাদাতের কলজেটা মুচড়ে উঠল এক অসহনীয় ব্যথায়, ভাই গো তুমাদের পায়ে ধরি, শাড়িটা নিও না। ঈদে বউটারে ভালো শাড়ি দিতে পারিনি, মনে আমার দুঃখ রয়ে গেচে।

—তোর দুঃখ তুই বোঝ। আমরা তো কুলি নই যে তোর বোঝ বইব।

সাদাতের কাকুতি-মিনতি সব ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো উড়ে গেল। মুহূর্তে খুন চড়ে গেল তার মাথায়। গাড়ির রডটা তুলে নিয়ে সে সজোরে আঘাত করল মোটা লোকটার মাথায়। ঠোঙ্গা ফাটানোর মতো শব্দ হল একটা, তারপর গোড়া কাটা গাছের মতো কেবিন থেকে লোকটা ঠিকরে পড়ল নিচে।

রে-রে করে ছুটে এল আর সবাই। ওদের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা।

—হায়রে, মেরে ফেলেচে গো! লাট্টুদারে মেরে ফেলেচে। কী আস্পর্ধা। ভুড়িওয়ালা লোকটাকে মেরে ফেলতে চায়নি সাদাত অথচ অঘটনটা ঘটে গেল চোখের নিমেষে। কী ভুল করল সে। এবার এদের হাত থেকে পার পাওয়া মুশকিল। সাদাতকে কেবিন থেকে টেনে নামাল ষণ্ডামার্কা লোকটা। অন্ধকারে চোখে আগুন উগরে সে বলল, তোর রক্তের বড়ো তেজ। যা, বাঁচতে চাস তো পালা।

কথাটা যেন বিশ্বাস হয় না সাদাতের। আশেপাশের মাঠগুলোয় শুয়ে আছে নিকষ কালো অন্ধকার। দুধারে ফাঁকা ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ঝোপঝাড়।

ষণ্ডামার্কা লোকটা এবার গর্জে উঠল, যা পালা। বাঁচতে চাস তো পালা। ওয়ান-টু-থ্রি....! পালা।

সাদাত প্রাণ বাঁচানোর দৌড়ে শরীর সামান্য নড়াতেই পিছন থেকে গুলি এসে ফুটো করে দিল তার পাঁজরা। পরপর ছটা। সাদাত লুটিয়ে পড়ল মানোয়ারার গোলাপী রঙের শাড়ির উপর।

চোখ বোজার আগে সাদাতের গলা থেকে বেরিয়ে এল অস্ফুট আর্তনাদ, হায় আল্লা...! তারপর দু-বার নড়ে নিথর হয়ে গেল তার দেহটা।

অন্ধকারে ডুবে রইল সাদাত, শুধু আলোর স্মৃতি হয়ে পড়ে রইল গোলাপী শাড়িখানা।

বিকেলের পরে পুরো কালীগঞ্জ-মোকামপাড়া থমথম করছিল সাদাতের শোকে। থানার ওয়ারলেসে খবর এসেছে অনেক আগে। খবরটা শোনার পর থেকে কথা হারিয়ে দুলু চায়ের দোকানে বসে আছে চুপচাপ। মানোয়ারাকে এমন সংবাদ সে কোনোদিন দিতে পারবে না। আল্লাতালার এ কী নিদান! মাথায় কোনো কিছু ঢুকছিল না তার। জলজ্যান্ত মানুষটা ট্রাক নিয়ে গেল, কপালের কী লিখন, শেষে কিনা সেই ট্রাক বয়ে আনবে তার লাশ।

চা-দোকানী বলল, মন খারাপ করে কী হবে। ঠাণ্ডা পড়চে জব্বর। চা খাও।

হুঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে দুলু বলল, দাও এক কাপ। জানো দাদা, মনটা ভালো লাগচে না গো।

—ভালো না লাগারই কথা। দোকানদার আড় চোখে তাকাল, তার চোখের ভাষা অন্য, তুমার তো ভালো হল, ভাই। পাখি এবার তুমার উঠানে দানা খাবে।

—তার মানে? ভাঁড়ের চা চলকে গায়ে পড়ল দুলুর, হু-হু জ্বালা করে উঠল, শালা দোজকের কীট, কুথায় কি বলতে হয় জানো না বুঝি? কোন আল্লা তুমাকে মানুষ করে পাঠিয়েছিল কে জানে! তুমি তো কাফেরেরও অধম। আগে জানলে আমি তুমার দোকানে বসতামনি।

দুলু চায়ের ভাঁড়টা রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

সাইকেল নিয়ে থানায় গিয়েছিল মানোয়ারার চাচাতো ভাই ফজলু। সে হঠাৎ দুলুকে দেখে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল, খবর শুনেছিস? মানোয়ারার কপাল পুড়ল। সাদাত খুন হয়েছে। আহা রে, বুনটার আমার কি হবে বল তো?

কথা বলার ইচ্ছা করছিল না দুলুর, কী বলবে সে, বলার মতো কিছু বাকি নেই তার। ফজলু তবু ব্যস্ত হয়ে বলল, লাশ রাত আটটায় এসে যাবে। তুই একটু থাকিস।

দুলু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। মাথাটা ভার হয়ে আছে সেই তখন থেকে। কোনো কিছু ভালো লাগছে না তার। মানোয়ারার উপর তার এখন আর কোনো টান নেই। মানোয়ারা নিজের হাতে খুন করেছে এই সম্পর্ক। নিজেকে আড়ালে সরিয়ে নিয়েছে সে। সে তো চাম এঁটুলি নয় যে জোর করে কারোর গায়ে আটকে যাবে।

ঘরে গিয়ে মন বসল না দুলুর, তার কান খাড়া হয়ে রইল একটা শব্দ শোনার জন্য। এত দূর থেকে মানোয়ারার সুর ভাসানো বিলাপ ভেসে এল বাতাসে। সত্যি কপাল পুড়েছে মানোয়ারার

নাহলে গর্ভের সন্তান কেন বাপের মুখ দেখতে পাবে না।

আটটা নয় ন'টার পরে ট্রাক এসে থামল তেঁতুলতলায়। সঙ্গে দু-জন পুলিশ এবং আরো লোকজন। চাঁদ মহম্মদ পাগলের মতো ঘুরছে খবরটা শোনার পর থেকে আর মাঝে মাঝে চেপে ধরছে চুলের গোছা। বুক ভাসানো আর্তনাদে সে যেন খুঁজে পেতে চাইছে শোকের সান্ত্বনা। মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই তার। কেঁদে কেঁদে মেয়েটা তার পাগল হয়ে গেল। এ সময় নুরি বেগম থাকলে মেয়েটাকে সামাল দিতে পারত। ফাঁকা বুকের মাঝখানটা চিনচিনিয়ে উঠল চাঁদ মহম্মদের।

দুলু তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই চিৎকার করে ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁদে উঠল চাঁদ মহম্মদ। কাঁদতে কাঁদতে সে লুটিয়ে পড়ল তেঁতুলতলার ধুলোয়। ততক্ষণে পুরো পাড়া লুটিয়ে পড়েছে সাদাতের লাশের উপর। শ' মানুষের চিৎকারে ডুবে যেতে লাগল মানোয়ারার হৃদয় নিঃসারিত কান্না।

বাঁধের উপর দাঁড়ালে পুরো আকাশ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে দূরের আখ খেতের উপর। ভিকনাথ দূরের দিকে তাকালো। সাহেবমাঠ থেকে ফিরে তার মাথার কোনো ঠিক নেই। ঘরের দরজায় টিপতালা মারা, খাঁ-খাঁ করছে চারপাশ। এই অবেলায় ঝারি গেল কোথায়?

বউটার পাড়া ঘোরার স্বভাব। ঘরে তার মন মোটে তিষ্টুতে চায় না। শুধু বাইরপানে টান। কি যে পায় টো-টো করে ঘুরে কে জানে? ভিকনাথ কত দিন তাকে মানা করেছে, কথা শোনে নি। আজকাল তার স্বভাব হয়েছে বেয়াড়া। ভিকনাথ কোনো কথা বললে এ কান দিয়ে শুনে ও কান দিয়ে বের করে দেয়। বেশি বললে খিলখিল করে হাসে। ইচ্ছে করে বুকের কাপড় ফেলে দিয়ে ফাঁদ পেতে বসে থাকে পাখি ধরার জন্য।

বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে তেষ্টায় গলাটা খড়খড় করছিল ভিকনাথের। টিউকলের কাছে গিয়ে মুখ লাগিয়ে আর জল খেতে মন হল না। বয়স হয়েছে, এখন কি ওসব মানায়?

ভিকনাথ ঢালু পথ বেয়ে নেমে গেল বুড়িগাঙের দিকে। জল এখন শান্ত, কালচে সাপের মতো। সেই হিলহিলানো জলের দিকে তাকিয়ে ভিকনাথ ভাবছিল তার পোকাড়ে ভাগ্যের কথা। বিয়ের সময় তার মা বেঁচেছিল। কত করে মানা করল, রূপের ফাঁদে পা দিস নে বাপ। ফর্সা দেখে ঢললি, এটা কি তুর উচিত হল। মনে রাখিস ফরসা হল গিয়ে গুয়ের মালসা। ওদের যত ঘাঁটবি বদ-ঘেরান বেরুবে। দুর্গন্ধে মরে যাবি বাপ।

মায়ের কথাকে সেদিন কানে তোলে নি ভিকনাথ। ঝারির গালে টোল ফেলা হাসিটাই বারবার করে তাতিয়ে দিল তাকে। বিয়ের আগে ঝারিকে চুমা খেল সে ঝোপের আড়ালে। ঝারিও তাকে কোনো বাধা দিল না। পাখির মতো নরম চোখ তুলে বলল, আবার এসো। এবার এলে রেতের বেলায় এসো। মুরগি মেরে খাওয়াব।

—মুরগি তো আমাদের দেশেও পাওয়া যায়? শুধু মানসোর খাওয়ার জন্য এতদুর কেন আসব?

—তুমার মতলবের কতা বুঝেচি। ঝারি আবার গালে টোল ফেলে হাসল, যা খেতে চাও সব পাবা। তবে তার আগে গাছতলায় আমার কপালটা সিঁদুরে ফেটিয়ে দিও। মধু খেয়ে উড়ে গেলে আমি যে তখুন মরব।

—ছিঃ, অমন কতা বলো না গো, প্রাণে বড়ো বাজে। আমারে যা ভাবো, আমি তেমনধারা নই গো। সময় এলে মিলিয়ে নিও।

এতদিন ধরে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চলেছে ভিকনাথ। কত রাগ মনের ভেতর উথলায়। সব রাগ জল হয়ে যায় ঝারির হাসোন ভরা মুখটা দেখলে। বউটা আগে তো এমন ছিল না। ওই লুলারাম

ওর কচি মাথাটা চিবিয়ে খেল। এটা সেটা দিয়ে মনটাও হাতিয়ে নিয়েছে সে।

ঝারি আগে মাঠের কাজে যেত, এখন আর সে যায় না। কেন যাবে? তার আঁচলের গেরোয় এখন সব সময় টাকা বাঁধা। লুলারাম তাকে লুকিয়ে-চুরিয়ে টাকা দেয়। টাকার বদলে ঝারি তাকে সব দেয়। এখানেই মরমে মরে যায় ভিকনাথ। তার হাত-পা রাগে অসাড় হয়ে যায়। মাথার ভেতর দংশাতে থাকে বিষপোকা।

দু-জনের একজনকে খতম করে দেবে ভিকনাথ। একটা ফুলে দুটো ভ্রমর থাকবে কেন? একটা আকাশে। দুটো চাঁদ কখনও কি হয়? সুফল ওঝা সাথ দিল না। যদি সাথ দিত তাহলে কবে পগারপার হয়ে যেত লুলারাম।

সারাদিন রোদে জ্বলেছে ভিকনাথের শরীর, মাঠের কাজে ঝলসে গেছে রঙ। হাড়মাস কালি হয়ে যাবার যোগাড়। ঘরে এসেও বউয়ের হাতের এক গ্লাস জল পেল না। বউ গিয়েছে শ্যামের বাঁশি শুনে ঢলাতে। মা শীতলাবুড়ি, এ কী যুগ দিলে গো? ভিকনাথের ঠোঁট নড়ে চড়বড়িয়ে। পাগলের মতো সে খুঁজতে থাকে ঝারিকে। হাতের কাস্তেটা সে ফেলে না, শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। এই কাস্তে দিয়ে মাঠে ঘাস কাটতে গিয়ে একটা খরিস সাপের ড্যাকাকে কেটে ফেলেছিল সে। খরিস সাপের ছায়ের তেজ মা-খরিসের চেয়েও বেশি। সেই তেজী বিষধর সাপকে সে যদি কাটতে পারে তাহলে লুলারাম কোথাকার কোন ছার। একবার দেখা হলে এস্পার না হয় ওস্পার। এক কোপের বেশি দু'কোপ নেবে না সে।

আবার রাগটা চলকে ওঠে বুকের ভিতর। মা মাগো শক্তি দাও। মা শীতলা বুড়ি, তুমি এর বিচার করো। মুখের রক্ত উঠিয়ে মারো ওদের। আমার অর্থ নেই, অস্ত্র নেই, কিচ্ছু নেই। আমাকে বিচার দাও মা। না হলে আমি পাগলা হয়ে যাবো। বাঁধের উপর বুক চাপড়ে দৌড়োবো। আমাকে কেউ ধরতি পারবে না। মা গো, মা। আমার মুখ রেখো মা। আবার নড়ে ওঠে ভিকনাথের ঠোঁট। যেন ঢাকের কাঠি চড়বড় করছে চামড়ায়। এবার বাজনা বাজবে। শিব নাচবে। ডাকিনী-যোগিনী সব নাচবে। ভিকনাথ সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আখখেতের আলোর উপর দাঁড়াল।

হতাশ ভিকনাথ একসময় ঘরের দিকে ফিরে আসে। গাই-বাছুরে মিল থাকলে সে কি করবে? হায়রে কলি, আমার বুকে শেল দে। এ পাপ আমি আর হজমাতে পারচি না। হয় আমাকে নে, নয়তো ওদের নে। এ খেলা সাঙ্গ কর। ঢের হল। বেলা গেল। ভিকনাথের আফসোস বাঁধের বাতাসে ডাং গুলি খেলে। খলখলিয়ে ওঠে আখগাছের ঢেউ। বেশির ভাগ আখ কেটে নিয়ে গিয়েছে কোম্পানীর লোক। মিল কোম্পানীর পেয়াদা ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়, রাত কালে ডাক ভাসায়, মাঠের অন্য প্রান্ত থেকে সাড়া আসে, জাগো হে, জাগো জাগো।

এভাবেই বয়স বাড়ে সন্ধ্যার। তৃপ্ত হয়ে ঘরে আসে ঝারি। ভিকনাথ আসে তারও কিছু পরে। জোনাকপোকা টিমটিম করে জ্বালছে আলো। লেবুতলার ঝোড়ে ঝিঁ ঝিঁ পোকার উৎসব বসেছে। আকাশ ভারমুক্ত। তুলোবরণ মেঘ উড়ছে। তিনঝুঁটিয়া চুলায় কাঠের জ্বাল ঠেলে দেয় ঝারি, অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে চা-ফুটেছে টগবগিয়ে, একটা গুনগুনানো সুর ঝারির কমলাকোয়া ঠোঁটে জলের মুখে ফেনার মতো নরম হয়ে বাজে।

ভিকনাথ ঘরে ঢুকেই কটাশ চোখে তাকাল, চা-পাতার ফুটন্ত গন্ধটা বুকভরে টেনে নিয়ে সে কিছুটা নরম হবার চেষ্টা করল, কুথায় গেছিলে সাঁজবেলায়?

—যাবো আর কুথায়। ঘরে জ্বালানি নেই। জ্বাল দেবার কাঠ ঢুনতে গেছিলাম। ঝারির চোখে মিথ্যে ঠেলে উঠল।

—মিচে কথা বলতে মুখে বাঁধল না। ভিকনাথ ধীরে ধীরে তাতছিল।

ঝারি ঠোঁট উল্টে বলল, মিচে বলব কেনে? আমার সাথে ভারতী-বউদি গিয়েছিলো। বিশ্বেস না হয় শুধোও গে যাও।

চুলা থেকে চায়ের বার্টিটা নামিয়ে গুঁড়া দুধ গুলল ঝারি। একটা জোনাক পোকা উড়তে উড়তে তার মাথার চুলে আটকে গেল। অন্য সময় হলে ঝারি ওই পোকাটাকে ধরে দেশলাইয়ে খালি খোলের ভেতর পুরে রাখত। আজ মেজাজ ঠিক নেই, ভিকনাথ তার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে, ঝারি চোরা চোখে ভিকনাথের দিকে তাকিয়ে ভারমুখ ঝুলিয়ে বসে থাকল।

ভিকনাথের নজর এড়াল না এসব, রাতের কথা ভেবে তার গলার সুর চটকানো কলার চেয়েও নরম হয়ে এল, তুমাকে ঘরে না দেখলে মাথায় আমার বোলতা কেমড়ে দেয়। তা ছাড়া দশ লোকে দশ কথা বলে। আমি যে কুনদিকে যাবো ঠিক বুঝতে পারচিনে।

—অতো সন্দেহ নিয়ে বাঁচা যায় না। ঝারি ফুঁপিয়ে উঠল, এত বছর ঘর করচি হর রোজ পাশে শুচ্চি তবু তুমার বিশ্বেস হয় না। বল, কী করলে তুমার বিশ্বেস হবে?

ভিকনাথ ফাঁদে পড়া চোখে তাকাল, তুমাকে আমি ঠিকঠাক বুঝতে পারিনে।

—নিজেকে ঠিক বোঝো তো? চোখ মুছে কোনোমতে বলল ঝারি, কলিজা উপড়ে দিলেও তুমি আমারে বিশ্বেস করবে না। ওই সুফল ওঝা তুমার মাথাটা চিবিয়ে খেয়েচে। জানি নে ওর পিচে পিচে ঘুরে তুমার কি লাভ হয়? এর চেয়ে ঘরের কাজে মন দাও, কাজের কাজ হবে।

কিছুটা কুণ্ঠিত ভিকনাথ ঢোক গিলে ঝারির মুখের দিকে তাকাল, কানবার কি আচে? আমি খেটেখুটে ফিরলাম। ঘর বন্ধ। কোন মানুষটার মাথার ঠিক থাকে?

—তা বলে মুখে যে আসে তাই বলবে? ভাড়া করা মেয়েমানুষকেও কেউ অমন ভাষায় কথা বলে না। আমার কুনো যাওয়ার জায়গা নেই, তাই মুখে কুলুপ এঁটে পড়ে আচি। অন্য কেউ হলে অমন সন্সারের মুখে লাথি মেরে ড্যাং-ড্যাং করে চলে যেত। আমি পারচি নে বলে আমাকে এত সাতাবে। শীতলা মা তুমার ভালো করবে নি।

—চা দাও দিনি, আর মিলা খ্যাজরম্যাজর করো নি। ভিকনাথ স্বস্তি এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতে চাইল ওদের মাঝখানে।

দপ দপ করে জ্বলছিল ডিবরিটা, ময়লা জমেছে সলতেয়। সম্পর্কেও যদি ময়লা জমে তেল পৌঁছাতে পারে না ডগায়। ঝারি হার মানার মেয়ে নয়। সে সাতঘাট চষা মেয়ে। সরু কোমরে হিল্লোল জাগিয়ে বলল, লোকের মুখে ঝাল খেয়ে নিজের মাথায় ঘুঘরো পোকা কেন ঢুকালে বুঝিনে। সত্যি করে বলো তো লুলারামদা আমাদের কি কুনো খারাপ চায়? দায়ে-অদায়ে এগাঁয়ের কেউ তো পাশে দাঁড়ায় না, সে ছাড়া। যে মানুষটা কালো চুলের ভালো করবে তুমি তার পিছে লাগবে? কেমন মানুষ গো তুমি? যে তুমার ভালো করবে তারেই তুমি আছোলা বাঁশ দিবে।

—ওই হারামীটার নাম তুমি আব আমার ছিমুতে নিও না। ওর নাম শুনলে আমার গা চিড়বিড় করে। মুখ বেঁকিয়ে সমস্ত শরীরে একটা অপ্রতিরোধ্য ঘৃণার জন্ম দিল ভিকনাথ, ওর হয়ে ওকালতি করতে তুমার শরম লাগচে না। আমি হলে তো গলায় দড়ি দিয়ে মরতাম। ধাওড়াপাড়ার কেউ ওরে পছন্দ করে না। সব্বাই জানে—ও একটা রাড়ুয়া।

ঝারির বুকের গভীরে মোচড় দিয়ে উঠল ব্যথা, কী যা তা বলচো? কারোর সাথে কেউ কথা বললে খারাপ হয়ে যায় না। এক পাড়ায় গায়ে গা লাগিয়ে থাকি, দেখা হলে তো হাসতে হয়, কথা বলতে হয়। না হলে বনবাদাড়ে থাকা ভালো।

কিছুক্ষণ গুম ধরে থেকে ভিকনাথ অন্ধকারে তাকাল, পেঁচাটা ঘাপটি মেরে বসে আছে চারা

জামগাছের ডালে, ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে আঁধারে। ওই পেঁচাটার মতো লুলারামকে মনে হল ভিকনাথের। ঝারিকে সে ইঁদুরের মতো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। ঝারিও তার পুরুষ-ঠোঁটের ফাঁকে জিভ ঢুকিয়ে তাপ নেয়। জগৎখালি বাঁধের নীচে ওদের প্রায়ই দেখা যায়। লোকে যা বলে—সব কথা কি বানানো? যা রটে তা কিছু না কিছু বটে।

কপালে ভাঁজ ফেলে ভিকনাথ বলল, তুমি ওর সাথে কথা বলবে নি। তুমি ওর সাথে কথা বললে দশ লোকে দশ কথা শোনায় আমাকে।

—তা তো শোনাবেই। নরম মাটিতে যে বেড়াল বাহ্যি সারে গো! ঝারি অদ্ভুত দক্ষতায় মুখে বিষাদ মাখিয়ে হাসল।

ভিকনাথ নিজেকে শুনিয়ে বলল, গাঁয়ে বাস করলে গাঁয়ের মানুষের কথা শুনতে হবে। তুমাকে নিয়ে কতবার বিচার সভা বসল। কই পাড়ায় আর কুনো বউকে নিয়ে তো এসব হয় না।

—আরে কুনো বউতো আমার মতন নজর কাড়া নয়। ঝারি তার কাচবরণ শরীরের দিকে তাকাল। এই শরীরটাই তার কাল হল। সুফল ওঝাও ছিপ ফেলতে চেয়েছিল শরীরের নদীতে। ঝারি তাকে হাসতে হাসতে ফিরিয়ে দিয়েছে। ভরা বুকে জল ছলছল ঢেউ দিয়ে বলেছে, তুমার মেয়ের চাইতে আমি আর ক' বছরের বড়ো হবো গো। আমাকে মেয়ে না ভাবো, বুন ভাবতে দোষ কুথায়?

সুফল ওঝা মনোক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে গিয়েছে। ঝারি আর এই পাপকথা দু'কান করার স্পর্ধা দেখায় নি। বরং নিজেকে বাঁধ দিয়েছে গোপনে। হাজার ঝামেলার মধ্যেও লুলারামকে হারের লকেটের মতো ঝুলিয়ে রেখেছে বুকের ভিতর। সবাইকে ভুলে গেলেও লুলারামকে সে ভুলতে পারবে না কোনোদিনও।

লুলারাম প্রায়ই বলে, চলো আমরা পেলিয়ে যাই। এত গুজুর পুটুর আর ভাল্ লাগে না। এভাবে লুকিয়ে-চুরিয়ে কি বাঁচা যায় গো?

ঝারির সমস্ত শরীব ঝাঁকা দেওয়া কুলগাছের মতো নড়ে উঠেছে, লুলারামের বুকে আঙুলের নিড়ুনি দিয়ে বলেছে, নিজের সুখের জন্য মেয়ে দুটার কথা কি তুমি ভাববে না। বৌদি নেই। সে থাকলে এট্টা অন্য কথা। বৌদির অবর্তমানে মেয়ে দুটাই তুমার সব। ওদের ব্যা-থা হয়ে গেলে তখন এসব আর একবার ভাবা যাবে। এখন এসব মুখে আনাও পাপ।

ঝারির স্পষ্ট কথা শুনে লুলারাম আর দ্বিতীয়বার এমন কথা মুখে আনার সাহস পায়নি। ঝারি তার চাইতে বয়েসে অনেক ছোট তবু ওর কথাবার্তায় যে বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে তা লুলারামকে অবাক না করে পারে না। তবু চিনচিনে একটা কষ্ট ঝারির জন্য তার ভিতরে চোরাস্রোতের মতো বয়ে যায়।

ঢিলির আত্মহত্যা ঝারিকে প্রচণ্ড দুঃখ দিয়ে গেছে। লুলারামের মুখ চেয়ে সে পাড়া ছেড়ে চলে গিয়েছে দু-মাসের উপর। দু-মাস লুলারাম তার বাপের বাড়িতে এসে দেখা করে গেছে, গোপনে সে বাঁচিয়ে রেখেছে অবৈধ সম্পর্কের বিষগাছ।

ঝারি যত বড়ো মুখ করে বলুক না কেন লুলারামের সাথে তার সম্পর্কটা লতিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে গিয়েছে সংসারের গায়ে। তার ঝটকা এসে লাগছে ভিকনাথের অস্থির মনে। সে আরো বিব্রত হয়ে পড়ছে। তার চোখের সামনে সব রাস্তাগুলো অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে।

দু-বেলা দু-মুঠো ভাত ছাড়া সে ঝারিকে আর কি সুখ দিতে পেরেছে। বিয়ের এত বছর পরেও কোল ভরল না ঝারির। ওর শরীরে দোষ আছে, ভূষণীবুড়ি গণনা করে বলে ছিল কথাগুলো। সব গাছে যে ফুল-ফল হয় এমন নয়। ঝারি স্বর্ণলতার মতো একলা, তার চোখ ধাঁধানো রূপ আছে কিন্তু সেই রূপের ব্যবহারিক কোনো প্রয়োগ নেই।

ভিকনাথের তিনকূলে কেউ নেই সেই জন্য খোঁটা খাওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে ঝারি। শাশুড়ি-ননদ থাকলে ওরা খোঁটা দিয়ে কানের পোকা বের করে ছেড়ে দিত। সেদিক থেকে ঝারি এখন ঝাড়া হাত-পা। শুধু লুলারাম আক্ষেপ করে বলে, আষাঢ়ে চাষ করে খেততলা ভরবেনি এ কেমুন কথা গো? চলো, গোয়াড়ী গিয়ে তুমারে বড়ো ডাক্তার দেখিয়ে আনি। আমার যে অনেক দিনের সখ তোমার গর্ভে আমার ছেলে যেন খেলা করে।

—যা হবার নয়, তা বারবার বলে আমায় কেনে দুঃখ দাও? ঝারির বুকের মধ্যে কাঁপুনি দেওয়া তোলপাড় শুরু হল।

লুলারাম তার চওড়া কপালে চাঁদের মতো ছোট্ট চুমা খেয়ে বলল, কেন দুঃখ পাও, তুমার এই শরীলে দুঃখ বড়ো বেমানান। যত দিন বাঁচবা মুখে হাসি রেখে বেঁচো, দেখ না মাছেরা কেমুন বেঁচে থাকে, কখনও কানদে না।

ঝারি কুঁকড়ে গেল, তুমি আমারে এত ভালোবাসো তার প্রতিদানে আমি তুমারে কিচু দিতে পারলাম না। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো। বিথা এ শরীল বয়ে বেড়িয়ে কী লাভ? এর চেয়ে গলায় ফাঁস নেওয়া ঢের ভালো।

কথাটা শোনার পর গভীর বিষাদ আর অনন্ত আক্ষেপে লুলারামের মুখটা উঠে গেল আকাশের দিকে, কী কথা শোনালে গো, এ কথা কানে শোনাও পাপ। তুমি যদি মরার কথা ভাবো আমি তাহলে কী করে বাঁচার কথা ভাবব? তুমার-আমার বাঁচা মরা তো লাঠাই-ঘুঁড়ির সম্পর্ক।

রাত বেড়ে যায় নিজস্ব নিয়মে। জামগাছের পেঁচাটা উড়ে গিয়ে বসে পাশের বাড়ির কুলগাছে। বাসার মধ্যে বসে থাকা পাখিগুলো ঘুম ভেঙে ডেকে ওঠে কিচির মিচির। পেঁচার গায়ের গন্ধে তাদের ভয় বাড়ে বই কমে না।

ভিকনাথ বিড়ি ধরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভাঙনটা সে টের পেয়ে গিয়েছে। ঝারি একটা স্বপ্নের সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। যে কোনো মুহূর্তে টলে ভেঙে যেতে পারে সেই পলকা সাঁকো।

ভিকনাথকে সে বাধা দেয় না, নিশ্চুপ পায়ে সে হেঁটে আসে বাইরে। শীত হাওয়ার দাপটে কুঁকড়ে আছে গাছের পাতা। শেষ রাতে যদি জ্যোৎস্না ফোটে তাহলে ভোরের ফুলের মতো হেসে উঠবে চরাচর। ঝারি এখনও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। সম্পর্কটা স্থায়ী হবার পর থেকে সে নূপুর-নোলককে নিজের মেয়ে ভাবতে শুরু করেছে। সে আপন ভাবলে কি হবে—ওরা তাকে শত্রু ভাবে। হাবভাবে জানিয়ে দেয় ওরা তার ছায়া মাড়াতে নারাজ।

লুলারাম নূপুরের ব্যবহারে তিতিবিরক্ত। মেজাজ হারিয়ে একদিন সে নূপুরের গালে চড় মেরেছিল। সেই আঘাতের দাগ তার কিশোরী গালে রক্তখেগো জোঁকের মতো মোটা হয়ে ভেসে উঠল। লজ্জায় ঘর থেকে দু'দিন বেরয়নি নূপুর। মরমে মরে গেল লুলারামও। ঝারি তাকে রাতের বেলায় কত বোঝাল, কাজটা ঠিক করলে না গো, মা মরা মেয়েকে কেউ অমনধারা মারে?

—মারব না? জানো, ও তুমাকে জড়িয়ে কত গালমন্দ করল। লুলারাম বাঘে খেঁদানো ষাঁড়ের মতন হাঁপায়।

—নূপুর যা বলেচে—তাতে তো কুনো ভুল নাই। ঝারির মনটা কেমন হয়ে গেল, ওদের মা নেই, মা থাকলে অন্য কথা। বাপ আচে, বাপও তো ঘরে থাকে না। ফলে মেয়েদুটার সুখ-দুঃখ কে দেখবে? আমি দেখতে গেলে ওরা তা মেনে নেবে কেন? জানো তো—একগাছের ছাল আরেক গাছে লাগে না।

ঝারির কথার বাঁধনে অদ্ভুত-আশ্চর্য এক সান্ত্বনার মলম লুলারামের অশান্ত বুকে লেপে যায়,

তুমি ঠিকই বলেচো, আমি তো এভাবে ভাবিনি। আমি শুধু নিজের সুখের কথা ভেবেচি।

—নিজের সুখের কথা তুমি ভাববে তবে বেশি নয়। জানোই তো অমৃত বেশি খেলে হজমায় না, বিষ হয়ে যায়। ঝারির ঝিলিক দেওয়া চোখে সান্ত্বনার হাসি চুঁইয়ে নামল।

লুলারাম গদগদ কণ্ঠে বলল, আমার এ জীবনে মেয়ে আমি কম দেখিনি। অনেক মেয়েকে নেড়ে-ঘেঁটে দেখেচি—তারা শুধু মেয়ে, তার বেশি কিছু নয়। তুমি মেয়ে হয়েও কুথায় যেন জ্যান্ত প্রতিমার শক্তি লুকিয়ে রেখেচো। তোমার ওই শক্তিটাকে আমি দণ্ডবত করি। তোমার শক্তির জোরে আমার যদি কিছু বদল ঘটে।

ঝারি ভ্রূ তুলে বলল, মানুষ নিজে না চাইলে তার কুনো বদল ঘটে না। বদলে যাওয়া অত সহজ কাজ নয়। যারা পারে তারা তো অন্য মানুষ।

লুলারাম বলল, আমি বদলে যাব ঝারি, শুধু তুমি আমাকে এট্টুখানি তাপ চাখতে দিও।

—আমার সবটাই তো তুমার?

—তাহলে ভিকনাথ? মুখ তুলে প্রশ্ন করল লুলারাম।

ঝারি হাসল, ও আমার শরীলটাকে পেয়েচে। ও আমার শরীলটাকেই ভালবাসে, এর বেশি ওর কিছু চাওয়ার নেই। তবে শুনে রাখো—আমি মরে গেলে ও আবার কাউকে বিয়ে করবে। বিয়ে না করে ও থাকতেই পারবে না।

অন্ধকারের হাজার রূপ। ঝারি সেই অন্ধকারের ছবি। শুধু ওর চোখ দুটো আলো জ্বেলে রাখে প্রেম-প্রতীক্ষার।

বুড়িগাঙের জলে ঢেউ উঠলে বেড়ে যায় ঠাণ্ডা। তখন আর থাকতে পারে না মুনিরাম, ওর হাতে পায়ের ঘাগুলো রস কেটে টনটনিয়ে ওঠে, অসহ্য যন্ত্রণায় সে আর কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে না, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম' গায়।

শীতের শেষটানটা বড়ো ভয়ানক, ধুলো ওড়া দিনের মতো নয়, শেকড় সমেত উপড়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার দিন। 'এই শীতটা পেরলে হয়' মুনিরাম বিড়বিড়িয়ে ওঠে সব সময়। ইদানীং লুলারাম তার খোঁজখবর নেয় না, সবসময় এটা-সেটা অজুহাতে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। ছেলের এই এড়িয়ে যাওয়া হাড়ে হাড়ে টের পায় মুনিরাম, এবং এর কি কারণ সেটাও তার অজানা নয়।

ছেলে যদি কাছে এসে বসত তাহলে যুক্তি দিয়ে দু-চার কথা বলত মুনিরাম। বলত, দায়ের উপর কুমড়ো পড়লে দায়ের কিছু হয় না, কুমড়োই ফালা হয়ে কেটে যায়। বাপরে, সাবধান হ। তুই যার পাল্লায় পড়েচিস, সে তো কুনো সাধারণ মেয়েছেলে নয়। ওর ভেতরে যোগিনী পোরা। আমি জানগুরুর কাচ থিকে খোঁজ নিয়েচি। ওরা বর-বউ দু'জনে মিলে এই বিদ্যেটা শিখেচে।

—বলো কি? লুলারাম আকাশ থেকে পড়ল।

মুনিরাম ম্লান মুখে বলল, সত্যি কথা তিতা হয় রে! যদি আমার কথা বিশ্বেস না হয় তাহলে তুই পরীক্ষা করে দেখ। যোগিনীর বাঁ-বাহুতে সাপের চোখের চেয়েও চকচকে আঁচিল থাকবে। সেই আঁচিলে হাত ছোঁয়ানো মাত্র ওর শরীলে দশটা হাতির জোর আসবে। ওর কণ্ঠ হয়ে যাবে কোকিলের চেয়েও মিঠে, যা বলবে তাতেই তুই ফাঁদে লটকান ডাহুকের মতন লটকে যাবি।

মুনিরাম যা বলে তার একটাও মিছে নয়। ঝারির কথায় মিছরি গোলা। ওর বাঁ হাতের আঁচিলটায় কতবার যে জিভ ছুঁইয়েছে লুলারাম, যতবারই জিভ ঠেকিয়েছে ততবারই সাপের মতো গা-পাকমোড়া মেরে উঠেছে ঝারি, অমন করো না গো মরে যাব। এ বিদ্যে তোমায় আবার কে শেখাল। তুমার ওই জিভের ডগায় কামদেবতা ভর করেচে। আমাকে পিষে মারো, না হলে আমিও যে ধসে যাবো।

জ্যোৎস্নারাতে খোলা মাঠে শরীর যেন খোলা বিল। নদী পেরনো নারী খেগো বাঘের মতো, দাপড়ে-হাঁপড়ে সাঁতরাতে থাকে লুলারাম। ঝারির আহ্লাদী কথায় পৃথিবী বুঝতে পারে—এবার জ্বালামুখী থেকে নিষ্কাশিত হবে ফুটন্ত অগ্নিধারা, ধনধান্যে ভরে যাবে হলদিপোঁতা ধাওড়াপাড়া। বুড়িগাঙের জলে আবার নতুন করে ঢেউ জাগবে, আর সেই ঢেউগুলো হবে ঝারির বুক জাগানো শরীরী ঢেউয়ের চেয়েও মায়াময় জাগ্রত সুন্দর।

লুলারামের মনে প্রশ্নটা অনেকদিনের। পাড়ার লোক বলে—ডাইনি হয়ে গিয়েছে আটকুঁড়া ঝারি। ওর কোল ভরবে কি, ও যে নিজের কোল নিজে খায়। হেইমা, ও যে সর্পজাতক। ওর ভেতরে মাছের মায়ের স্বভাব। ও ঢিলিকে খেয়েচে। তিন-তিনটা বুড়াকে খেয়েচে। ও ভূষণীবুড়িকে খেতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। দেহ বেঁধে রেখেছিল বুড়িটা। গাঙ বন্ধন, শরীর বন্ধন, মন বন্ধন। কেউ কোথাও নড়বে না, সব যে যার জায়গায় থাকবে। ও মা গো, কী শক্তি গো। প্রকৃতি বাঁচবে তো এই বিপরীত মহাশক্তির কাছে। ঝারি সেই অশুভ শক্তির দাসী হয়ে বেঁচে আছে। ওকে নাড়াঘাঁটা করলে সবার বিপদ।

কথাটা প্রথম দিকে ছিল ফিসফিসানো পর্যায়ের, পরে তা ধুলোর ঘূর্ণির মতো বাড়তে বাড়তে ছুঁতে চাইছে আকাশ। ঝারির বেতের চেয়েও ছিপছিপে শরীরের দিকে তাকিয়ে ভয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ে লুলারাম। সত্যিই কি ঝারি ডাইন হয়ে গিয়েছে? প্রশ্নটাকে হাজার বার হাজার রকম করে দেখতে থাকে সে। ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে যায়। একটা আস্ত রাত ফুরিয়ে যায় চোখের তারায়। ভিকনাথের বউটার চোখের তারায় একটা অস্বাভাবিকত্ব দেখতে পেয়েছে লুলারাম। ভেজা এঁটেল মাটির মতো ওর শরীরের চাকচিক্য এবং নমনীয়তা বেড়েছে ঝারির। পানপাতা মুখটায় কাচবরণ গায়ের রঙ যৌবন্য লালিত্যে আশ্বিনের কচুপাতার মতো টলমল করছে। হাতে প্লাস্টিকের শাঁখা, পরনে কমা শাড়ি, খালি পা তবু ওর দীর্ঘাঙ্গী শরীরের শান্ত কুয়োর চেয়েও গভীর চোখ দুটো ওকে সবার থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। আজকাল ঝারির শরীর থেকে উঠে আসা সুগন্ধটা লুলারামকে পাগল করে দেয় সবসময়।

এত টান ঝারির উপর লুলারামের ছিল না। তখন শুধু শরীর টানত শরীরকে। এখন শরীর মন দুটোই যেন বাঁধা পড়ে গিয়েছে ঝারির কুসুমবনের শরীরে। লুলারাম বুঝতে পারে সে ঝারিকে না দেখতে পেলে পাগল হয়ে যাবে। এক দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে চুম্বু খাওয়া ঘোড়ার মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে।

ঝারির প্রতি এই টান দু-মাস আগেও তার ছিল না। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল ঝারি, সে হাসিতে ঠোঁট ভিজিয়ে শুধোল, কী ব্যাপার পীরিতের আঠাটা যে তুমাকে আর ছাড়চে না। এত টান তো এর আগে দেখিনি? তুমার কি পীরিতের ব্যামো হল নাকি?

ঝারির কথাগুলোয় লুলারাম বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পায়। বছর তিনেক আগে মনসা পুজোর মেলা বসেছিল গাঙের ধারে। সেই মেলার দিনে ঝারি যেভাবে সাজল তার বাহার দেখে চোখ ঘুরে গেল অনেকের। সবাই আড়ালে আবডালে বলল, বউটার রূপ দেখেচো গো, যেন জ্যান্ত মনসাদেবী। আহা, কী শরীরের বাঁধুনি, কী তার চলন বলন। সেদিনই পশ্চিমের গুনিন বলেছিল, বউটার সব ভালো শুধু স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। ওর শরীরে আর এট্টা শরীল ঠাঁই নিয়েচে। দেখচো না ওর তাই কেমন রমরমা।

মেলা থেকে কথাটা চাউর হয়ে গিয়েছে গ্রামে। ঝারির শরীরের ভেতর আর একটা শরীর বাড়ছে। তার আত্মাকে চেপে রেখে আর একটা আত্মা দাপটের সঙ্গে চষে বেড়াচ্ছে তার মন। ঝারি এখন সেই মনের দাসানুদাস। সে ভিকনাথের বউ হলে কি হবে তার দেহ থাকে ঘরে, মন থাকে বাইরে।

এই অবস্থায় তাকে যে ছোঁবে, সে-ই মরবে। বদ আত্মা তাকে ছেড়ে দেবে না।

শেরপুর-হলদিপোঁতায় পরপর পাঁচজন বিছানা নিয়েছে অসুখে। সবার অসুখ কোনো মামুলি অসুখ নয়। এর মাঝখানে ভিন পাড়ার জলজ্যান্ত ছেলে সাদাতও চলে গেল। এসব কার রোষে হয়? ঢিলিকে কে মারল? ওটা তো শুধু আত্মহত্যা নয়, নিশ্চয়ইএর পেছনে বদ আত্মার প্রভাব রয়েছে। কে সেই বদ আত্মা? কোথায় তার ঘরবাড়ি? সে কেন আসে, কেন যায়, কি তার উদ্দেশ্য এরকম অনেক প্রশ্ন হলদিপোঁতার মানুষ ভয়ে নিজের বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখে। তারা ঝারির দিকে তাকালেও তাদের লুকিয়ে থাকা ভয়টা কিছুতেই কাটে না।

রঘুনাথের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হয়েছিল কমলার। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-এর শিহরণ খেলে গেল ওদের দুজনের মনের ভেতর। কমলা আর নিজেকে বেঁধে রাখতে পারেনি। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে সে চলে এসেছিল রঘুনাথের সামনে। তার গায়ে তখন একটা দামী চাদর জড়ানো। গা দিয়ে সুগন্ধি পাউডারের ভুরভুরানো সুগন্ধ বের হচ্ছে। আর সেই সুগন্ধটা রঘুনাথকে প্রেমকাতর চড়াই পাখির চেয়েও উতলা করে তুলছে।

কতদিন পরে কমলা গাঁয়ে ফিরছে কে জানে। কাশীনাথটা হাড় শয়তান। সে কমলার মেলামেশা বন্ধ করার জন্য জোর করে তাকে রেখে এল মামার ঘরে। সেখানে কিছুতেই মন বসছিল না কমলার, প্রায় সময় রঘুনাথের সরল মুখখানা ঘাই দিয়ে উঠত মনের জলাশয়ে।

বারোয়ারী তলার চাতালে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে কমলা আর রঘুনাথ। তার মামাতো ভাই সব্যসাচী তার সঙ্গে এসেছে পাহারাদার সেজে। বড়ো মামা বোনের বাড়িতে আসার সময় পেল না, যা কাজের চাপ। সেই জন্য ছেলেটাকে পাঠিয়েছে মেয়েটাকে দেখে-শুনে পৌঁছে দেবে।

সব্যসাচী গিয়েছে মিষ্টি কিনতে। এই সুযোগটা ছাড়তে চায় না কমলা। রঘুনাথ মন কেমন করা চোখে তাকিয়ে ছিল কমলার দিকে, তার চোখের পাতা পড়ছে না, এক বন্য অস্থিরতা তাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সবসময়। কমলা শুধোল, ঘর যাবা না? চলো একসাথে যাই।

ফাঁপরে পড়া চোখ মেলে তাকাল রঘুনাথ, আমি সাথে গেলে তুমার কুনো অসুবিধা হবে না তো?

ভবাট মুখে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়ল কমলার, না, না অসুবিধা আবার কি হবে? আমার মামার ছেলে আমার সাথে এসেছে। ও অতো সাতে-পাঁচে থাকে না।

তবু যেন স্বস্তি পেল না রঘুনাথ, বেশ কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে সে বলল, তুমি চলে যাবার পর পুরো গাঁ খানা আমার কাছে শ্মশানের মতো মনে হত। দিনটা কেটে গেলেও রাতটা আর কাটতে চাইত না।

—তুমি তো আমার মামার ঘরে যেতে পারতে? প্রশ্নটা করে কমলা ঠোঁট কামড়াল।

—আমি কি ঠিকানা জানি যে যাবো?

—দাদার কাছে ঠিকানা ছিল।

রঘুনাথ আক্ষেপের সঙ্গে বলল, তুমার দাদা আমার সাথে কথা বলে না। ওর সব সময় আমার উপর রাগ রাগ ভাব। মনে হয় আমাকে খুন করতে পারলে ওর বুঝি মন জুড়োত।

—ছাড়ো তো ওসব কথা। কমলা এড়িয়ে যেতে চাইল, আজ রাতে একবার আসবে, তোমাকে একটা জিনিস দেব।

—কি দেবা আগে বলো?

—আগাম তা বলা যাবে না। যদি আসো তাহলে পাবে, নাহলে নয়।

—যা দেবার এখনই দিয়ে দাও। গলায় দাবী ফুটে উঠল রঘুনাথের।

চোখে ঝিলিক মেরে হেসে উঠল কমলা, সবখানে কি সব কিছু দেওয়া যায় গো? আমি দিলে তুমিই বা নেবে কি করে?

রঘুনাথ এ রহস্যের মানে বুঝতে পারল না, সে বোকার মতো তাকাল।

কমলা কি ভেবে ওর গায়ের চাদরটা খুলে দিল রঘুনাথের হাতে, এটা গায়ে জড়িয়ে নাও। আজ বেশ শীত পড়েছে।

—শীত তো সব দিন পড়ে।

—সব দিন তো আমি তোমার কাছে থাকি না। আজ কাছে আছি। আজ আমার কথা রাখো। কমলা ভেতরের উচ্ছ্বাস লুকিয়ে রাখতে পারল না।

গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে রঘুনাথ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কমলা আশেপাশে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, ভাই আসছে, চাদরটা নাও তো, আর দেরি করো না।

—তুমার শীত লাগবে যে!

—গায়ে আমার গরম জামা আছে। তাছাড়া আর কত পোশাক চাই? দেখছ না শীতকালে কেমন মোটা দেখায় আমাকে। কমলা শরীর দুলিয়ে হেসে উঠল।

চাদরটা গায়ে জড়িয়ে পাশাপাশি হাঁটছিল রঘুনাথ। মিহি অন্ধকার নেমে আসছিল চারপাশে। এ সময় পাখ-পাখালির ব্যস্ততা বেড়ে ওঠে, ঘরে ফেরার তাড়ায় ওদের মাথার বুঝি ঠিক থাকে না। বাঁধের নীচের আখখেতে সব সময় বুঝি চড়কমেলার গুঞ্জন। কিছুটা হেঁটে আসার পর রঘুনাথ বলল, জানো, আমার টিলিকাকি গলায় ফাঁস নিয়ে মারা গিয়েচে। পাড়ার লোকে বলচে—কাকি মরত না, শুধু ভিকনাথ কাকার বউটার জন্য মরল।

কমলা আঁচলে দাঁত বসিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল, ফুঁপিয়ে উঠতে গিয়ে নিজেকে বাধা দিল সে, শুনে বড়ো খারাপ লাগছে। আহা অমন মানুষ পাওয়া যায় না। তবে তোমার কাকা বড়ো জ্বালাত। মানুষ সব সহ্য করতে পারে, ভালোবাসা খুন হলে সে আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

সব্যসাচী টেরিয়ে টেরিয়ে রঘুনাথকে দেখছিল, ওর এক হাতে মিষ্টির হাঁড়ি, অন্য হাতে কালো রঙের একটা ব্যাগ। তার দিকে কোনো খেয়াল ছিল না কমলার, হঠাৎ রঘুনাথের ইঙ্গিতভরা চিমটি খেয়ে সে যেন নড়ে চড়ে উঠলো, শোন, এ হল আমার আদরের ভাই সব্য। আমার একেবারে ন্যাওটা। ও আসল বলে তো আমার আজ আসা হল।

রঘুনাথ সব্যসাচীর চোখে চোখ ফেলে হেসে উঠল, আমার নাম রঘু, রঘুনাথ। বাঁধের ধারে হলদিপোঁতায় থাকি। সেই থেকে ব্যাগটা বইছো, ইবার আমাকে ইট্টু দাও।

সব্যসাচী সংকোচ করছিল, রঘুনাথ জোর করে তার হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিল। আগুপিছু করে হাঁটছিল ওরা। সব্যসাচী বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে, রঘুনাথ পাতলা অন্ধকারে কমলার হাতটা চেপে ধরল, এট্টু দেঁড়িয়ে যাও।

কমলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক চোখে তাকাল, কী হল, কিছু বলবে বুঝি?

ভার হয়ে এল রঘুনাথের চোখ-মুখ, আমার কপালে কি আচে আমি জানিনে। জানিনে আমাদের এই সম্পর্ক কতদিন আর বাঁচবে? চারদিকে দশ লোকে দশ কথা বলচে। আমার আর শুনতে ভালো লাগে না। তুমাকে এট্টা জিনিস চাইবো—দেবে?

—কি?

রঘুনাথ কমলার মুখের দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকাল, তারপর দুম করে বলে বসল, তুমি আমার হবে? আমাকে ভুলো যাবে না তো?

—এ তুমি কী বলছো? কমলার গলা কেঁপে উঠল অস্বাভাবিক, তোমাকে ভুলে যাবো, এ তুমি কি করে ভাবলে?

অন্ধকারে কমলার ফুলের মতো শরীরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রঘুনাথ। শরীরও সুগন্ধ ছড়ায় হাসনুহানার মতো। হাওয়া লাগা গাছের মতো কেঁপে উঠল কমলা। মাটি হয়ে তাকে জন্মের মতো আশ্রয় দিতে চাইল রঘুনাথ।

সকালবেলায় মুনিষ গেলে ফিরতে ফিরতে সাঁঝ নামে গুয়ারামের। ক'দিন ধরে শীতের যা কামড় তা বুঝি সহ্য হচ্ছে না কারোর। রঘুনাথের গায়ে রঙচঙে চাদরটা দেখে চোখ কপালে তুলে দুর্গামণি শুধালো, কি রে এটা আবার কুথা থেকে পেলি?

রঘুনাথ ঘাবড়াল না, ঢোক গিলে বলল, দিদিমণির বাগান তেড়ে দিয়েছিলাম, দিদিমণি খুশি হয়ে আমায় এটা দিলো। বলল, নিয়ে যা রঘু, গায়ে দিবি। আমি আর দিদিমণির মুখের উপর না বলতে পারিনি।

—সব ভালো মানুষগুলা কি হাসপাতালে থাকে? দুর্গামণির চোখে সন্দেহ নেচে উঠল, আমারে একবার হাসপাতালে নিয়ে যাবি তো? মানুষগুলাকে চোখের দেখা দেখব।

—কেনে তুমার আবার কি হলো?

—ভালো মানুষগুলার সাথে আলাপ করে আসবখন। দুর্গামণির সারা শরীরে একটা ভালো লাগা ছড়িয়ে পড়ল যা শীতের রোদের চেয়েও চনমনে, আরামদায়ক।

রঘুনাথ বলল, এ আর কী এমন কথা! যবে মন চাইবে, আমাকে বলো। আমি তুমাকে সাথে করে নিয়ে যাবো। তুমার কুনো অসুবিধা হবে না।

সামনে পরীক্ষা বলে সূর্যাক্ষ আর দ্বীপী বাইরে বেরবার সুযোগ পায় না। ওরা জোর কদমে পড়ছে। কপোতাক্ষ বললেন, এখন আর টিউশনি গিয়ে লাভ নেই। যাওয়া আসায় অনেক সময় নষ্ট হয়। তোমরা নিজেরা পড়ো, তাতে অনেক লাভ হবে।

বাবার কথা মন দিয়ে শুনেছে সূর্যাক্ষ। দ্বীপীও অবাধ্য হয় নি। ওরা রাত দশটা অব্দি একসঙ্গে পড়ে। দশটার পরে সূর্যাক্ষ নিজের ঘরে ফিরে যায়। মীনাক্ষী ভাতের থালা আগলে বসে থাকেন ছেলের জন্য। ভালো রেজাল্ট করার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখছে না সূর্যাক্ষ। তার ইচ্ছে বড়ো হয়ে সে সরকারি দপ্তরে চাকরি করবে, যেখানে মন চায় বেড়াতে যাবে, দ্বীপীকে সে অনেক অনেক সুখে রাখবে। বাবার মতো সে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে না, এতে সম্মান বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক বদনামও ভাগ্যে জোটে।

দিনসাতেক আগেও রামনগরে ঝামেলা হয়ে গেল শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে। দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানীর অনড় মনোভাব বিচলিত করেছে তাকে। দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল শ্রমিকপক্ষ। একে অন্যের শত্রু এমন মনোভাব নিয়ে ওরা পরস্পরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। একটা খণ্ডযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হল ওখানে যা ভীষণভাবে মনটাকে নাড়া দিয়ে গেল কপোতাক্ষর। তাহলে কাদের জন্য এ লড়াই? কৃষক ঐক্য, শ্রমিক ঐক্যের চরিত্র হারিয়ে গেলে মিথ্যাচার বয়ে বেড়ানোর দায়িত্ব ন্যস্ত

হয় অগ্রণী নেতাদের ঘাড়ে। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সামনে নেতাদের কি কিছু করার থাকে? এত সভা-সমিতির আয়োজন তাহলে বৃথা। গোপন সভার তাহলে কি প্রয়োজন? মানুষের স্বার্থে যদি মানুষ না এগিয়ে আসে তাহলে গতি পায় না আন্দোলন। স্রোত হারিয়ে নদী তখন চৌবাচ্চার সমান। কপোতাক্ষ চেয়েছিলেন মানুষ বুঝতে শিখুক তাঁর কথাগুলো। ওরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। ওদের প্রাপ্য সম্মান ছিনিয়ে নিক।

শেষ পর্যন্ত কপোতাক্ষ তাঁর নিজের কথাকে, পার্টির ভাবনা এবং আদর্শকে সবার মাঝখানে বিলিয়ে দিতে পারলেন না। তাঁর নির্দেশিত শ্রমিক সংগঠন দু-ভাগ হয়ে দুটি শিবিরে ফুঁসে উঠল। সংসদীয় গণতান্ত্রিক নীতিকে অগ্রাহ্য করে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল নিজেদের মধ্যে। হিংসার ঔদ্ধত্য ছোবল ওদের জখম করে পৌঁছে দিল হাসপাতালে। এমন কী সেই রণভূমি থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না কপোতাক্ষ। মাথায় তিনটে সেলাই নিয়ে তিনিও ফিরে এলেন ঘরে।

মীনাক্ষী আঁতকে উঠেছিলেন তাঁর মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে, কী হয়েছে গো তোমার? কী ভাবে মাথা ফাটালে? আহা, একটু সাবধানে কি চলা ফেরা করতে পার না?

কপোতাক্ষ সেদিন মীনাক্ষীর মুখের উপর একটা কথাও বলেননি, বলা শোভন মনে করেন নি, নিজেদের বিরোধের কথা বলে তিনি নিজেকে ছোট করতে চান নি। গ্রামের মানুষকে তাদের মতো করে তিনি বুঝিয়ে উঠতে পারেন নি, এই অক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। এর দায় তিনি আর কাউকে দিতে নারাজ। সংগঠনের প্রতি তাঁর আরও মনোযোগ বাড়ানোর প্রয়োজন, নাহলে আন্দোলনের অঙ্কুর শুকিয়ে যাবে। চোখের সামনে সংগঠিত আন্দোলনের শ্মশানযাত্রা দেখতে হবে তাঁকে।

পড়ন্ত বিকেলে রঘুনাথ এসে দ্বীপীদের দরজায় কড়া নাড়ল। শীতের বেলা ব্যাঙাচির লেজের মতো তাড়াতাড়ি ঝরে পড়ে। ইতস্ততভাব কাটিয়ে রঘুনাথ দ্বীপীর মুখোমুখি দাঁড়াল। হাতে পেন নিয়ে দ্বীপী বই ফেলে ছুটে এসেছে তার সামনে।

রঘুনাথ ভাবছিল দ্বীপী হয়ত অসন্তুষ্ট হবে তার উপর। পড়াশোনার ব্যাঘাত সে মেনে নিতে পারবে না। রঘুনাথের ভাবনা পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত হল। দ্বীপী সহজ গলায় বলল, কখন এলে? ভালো আছো তো?

মাথা নাড়ল রঘুনাথ, সূর্য কুথায়? ওর সাথে ভেষণ দরকার ছিল।

সে আমি জানি। দ্বীপী কাঁধের দু'পাশের খোলা চুলগুলো নেচে উঠল হাওয়ায়, ভেতরে এসো, আমি সূর্যকে ডেকে আনছি।

সূর্য এসে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, কি রে এতদিন পর উদয় হলি, কোথায় ছিলিস? রঘুনাথ জোর করে হাসল না বরং গম্ভীর হয়ে গেল ওর মুখখানা, কুথায় আর থাকব, পেটের দায়ে ঘুরচি। তোদের মতন আমাদের ভাগ্যে তো আর বাঁধা ভাত নেই।

সূর্যাক্ষ এ প্রসঙ্গে গেল না, কী ব্যাপার হঠাৎ যে এলি? কী দরকার বল? রঘুনাথ আশেপাশে তাকাল, তারপর গলা খাদে নামিয়ে বলল, চল এট্টু বাইরে যাই। ইখানে বলে ঠিক জুত হবে না।

দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন না করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল সূর্যাক্ষ। আলো মরে আসছে পৃথিবীতে। নিমগাছের ডালে জড়ো হয়েছে রাজ্যের পাখি। ওদের কিচির মিচির ডাকে পুরো এলাকাটায় যেন হাট বসেছে পাখিদের। এ সময়টায় গোরুর পাল পায়ের ধুলো উড়িয়ে লেজ দুলিয়ে গোয়ালে ঢোকে। সূর্যাক্ষ বাঁশবাগানের কাছে এসে ঘন ছায়ায় দাঁড়াল, তোর কাছে বিড়ি হবে? দুপুর থেকে অঙ্ক কষে মাথাটা জাম হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে আর চলছে না।

রঘুনাথ কোনো কথা না বলে ঢোলা পায়জামার পকেট থেকে দুটো বিড়ি আর দেশলাই বের করল। দেশলাই জ্বেলে নিজের বিড়িটা ধরিয়ে অন্য বিড়িটা এগিয়ে দিল সূর্যাক্ষর দিকে, নে ধরা।

তবে বেশি টানবিনে। বেশি টানলে কলিজা ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

—বেঁচে কি হবে বলতে পারিস?

রঘুনাথের কোনো উত্তর জানা নেই, বোবার মতো সে তাকাল।

সূর্যাক্ষ বলল, অমলকান্তি স্যারের কথা শুনেছিস? ওর নাকি জেল হয়ে গিয়েছে। রঘুনাথ ঠোঁট দিয়ে ইস্ শব্দ করল, আহারে, অমন ভালো মানুষ আর হয় না। ভালো মানুষের কপালে দেখছি যত কষ্ট।

—হ্যাঁ, তা তো ঠিক। তবে রুখে দাঁড়াতে হবে। সূর্যাক্ষর চোয়াল জেগে উঠল রাগে। রঘুনাথ বিচক্ষণের মতো বলল, তোর বাবার কথা ভাবতো। মানুষটা সারাদিন পার্টি-পার্টি করে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেল। শেষে কিনা পার্টির লোকই তার মাথা ফেটিয়ে দিল।

সূর্যাক্ষ নিরুত্তর চোখে তাকাল। রঘুনাথ স্পষ্ট করে বলল, এতে শিবনাথবাবুর কারসাজি আচে। সে তোর বাবাকে মোটেও সহ্য করতে পারে না। হরসময় গালি দেয়।

—ওর মরণ আমার হাতে লেখা আছে। আগে চাকরিটা পেতে দে। একটা বন্দুক কিনি, তারপর।

রঘুনাথের মনে পড়ে গেল রুদ্রাক্ষের দিয়ে যাওয়া রিভলভারটার কথা। ওটা খড়গাদায় গুঁজে রেখেছে সে। যন্ত্রটা বেশ ভারী আছে। ছুঁলেই শরীরের রক্ত ফুটে ওঠে। দিন চারেক আগেই রুদ্রাক্ষ ভোরবেলায় হাজির হয়েছিল তাদের ঘরে। উদ্দেশ্য ছিল একটা। ওর মা তুঙ্গভদ্রা অসুস্থ। সবসময় তাঁর বুক ধড়ফড় করে। পাড়া-প্রতিবেশীদের বলে বেড়াচ্ছে—তিনি আর বাঁচবেন না। ছেলের চিন্তায় তাঁর মাথার শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে। বিকেলের পরে এখন অসহ্য মাথায় যন্ত্রণা হয় তাঁর। ঘাড়ের কাছটায় কনকনিয়ে ওঠে ব্যথা। হাসপাতালের ডাক্তার বলে দিয়েছেন, নুন খাওয়া বারণ। খাসি-মাংস ছোঁওয়া যাবে না। ছেলের খোঁজে নীলাক্ষ কলকাতায় গিয়েছিলেন। হোস্টেলে রেখে এসেছিলেন হাতচিঠি। সেই চিঠি রুদ্রাক্ষর হাত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। চিঠি পড়ে মন খারাপ হয়ে গেল রুদ্রাক্ষর। মা'র সঙ্গে যে করেই হোক দেখা করতে হবে। মনটা কু গাইছিল।

ময়ের টানে গ্রামে ফিরে এসেছে রুদ্রাক্ষ। কিন্তু দুর্ভাগ্য ও ঘর পর্যন্ত যেতে পারেনি। সাদা পোশাকের পুলিশ ওদের বাড়িটাকে লক্ষ্য রাখছে সবসময়। পুলিসের কাছে খবর আছে—রুদ্রাক্ষ ওর মাকে দেখতে একবার আসবেই-আসবে। সেই সুযোগ নতুন দারোগা ছাড়তে নারাজ। যে কোনো মূল্যে রুদ্রাক্ষকে ধরা চাই। বুর্জোয়া সমাজকে বাঁচাতে গেলে এদের ধরে ধরে জেলে ভরা দরকার। এরা নিজেদের বলে প্রলেতারিয়েত। এরা জোর গলায় বলে—শৃঙ্খল ছাড়া এদের আর হারাবার কিছু নেই। এরা ডাক দিয়েছে—দুনিয়ার মজদুরকে একত্রিত হবার জন্য। এরা সর্বহারাদের পক্ষে বিপ্লবের ডাক দিয়েছে। এরা একনায়কতন্ত্রী সরকার চায়। এরা রক্ত চায়, খুন চায়। এরা বস্তুবাদী জীবের কল্যাণ কামনায় অস্ত্র তুলে নিয়েছে হাতে।

রঘুনাথ পকেট থেকে রুদ্রাক্ষর হাত চিঠিটা বের করে আনল, চিঠিটার দিকে পরম মমতার চোখে তাকিয়ে সে বলল, এই চিঠিটা তোর জেঠিমাকে পৌঁচে দিবি। বলবি—রুদ্রদা ভালো আচে। ওদের যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবে না। সূর্যাক্ষ বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে রইল রঘুনাথের মুখের দিকে, বড়দা, এসেছিল? এটা যেন আমার বিশ্বাস হয় না। ওঃ, আজ ভীষণ হালকা লাগছে। আমি এখন জেঠিমার কাছে যাবো। তুই কি আমার সঙ্গে যাবি?

রঘুনাথ ভাবল, দু'জনে যাওয়া কি উচিত হবে? এক কাজ কর, তুই বরং একা যা। আমি ঘর ফিরে যাই। সাঁঝ নামচে।

হাঁটতে হাঁটতে বাঁধের উপর উঠে এল রঘুনাথ। কাজটা ঠিক সময়ে সারতে পেরে নিজেকে হালকাবোধ হল ওর। আখখেতের পায়ের কাছে অন্ধকার হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পায়ে ধরার জন্য।

গাঙ-পালানো বাতাসে লুকিয়ে ছিল শীতের কষাঘাত। গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে রঘুনাথ পিছনে ছেড়ে আসা গ্রামখানার দিকে তাকাল। আলোর ছোট ছোট ফুটকিগুলো যেন স্বপ্ন হয়ে দুলছে ওখানে। অথচ ধাওড়াপাড়ার সব ঘরে আলো জ্বলে না এখনও। দেশ জুড়ে মজুত খাদ্যের অভাব। কেরোসিন তেল রেশনও অপ্রতুল।

রুদ্রাক্ষ যেদিন এল সেদিনও ঘর আঁধার ছিল ওদের। রেশন-ডিলার জগতের সঙ্গে গুয়ারামের একচোট বচসা হয়ে গেল। মানুষটা কিছুতেই মানবে না নিজের দোষের কথা। দেবগ্রাম থেকে ঘোড়ার গাড়িতে রেশনের মাল আসে ফি-হপ্তায়। জগত ক্যাশ নিয়ে যায় ওখানে। হিসাব চুকিয়ে সে বাসে ফিরে আসার আগেই তার ড্রামের কেরোসিন নিঃশেষ হয়ে যায় কালোবাজারে। ফাঁকা ড্রাম দেখিয়ে জগতের তখন সহানুভূতি আদায়ের বৃথা চেষ্টা।

এই কারসাজিটা গুয়ারাম নিজের হাতে ধরে ফেলে। ট্যাঙ্গাওয়ালাকে মনের সুখে গাল দেয় সে। ট্যাঙ্গাওয়ালা প্রাণের দায়ে আসল কথাটা উগরে দেয়, তুমারা আমাকে ধরে টানাটানি করে কী করবে? গোড়া কেটে ডগায় জল দিয়ে কী ফল হবে? আড়ত থেকে পুরা মাল কিনে নিয়েছে ইসমাইল। টাকা পেয়ে গিয়েছে জগতবাবু। যদি কিছু বলার হয় তো বাবুকে বলো, তবে বাপু আমার নামটা করো না। আমি ট্যাঙ্গাওলা। গরীব মানুষ। দেখো—আমার পেটে যেন লাথ না পড়ে।

সকালে ঝোলা নিয়ে জগতের রেশন দোকানে গিয়েছিল গুয়ারাম। শুধু কেজি তিনেক গম ছাড়া কেরোসিন তেল, চিনি কোনোকিছু আর পাওয়া যাবে না। কথাটা শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গেল গুয়ারামের। প্রতিবাদ করে বলল, এ আমরা মানচি নে, মানব না। দরকার হলে আমি নিজে গিয়ে কপোবাবুকে ডেকে আনব। একি মগেরমুলুক নাকি?

জগত অনেক চেষ্টা করেছিল গুয়ারামকে বোঝাবার কিন্তু ওর গোঁ জগৎছাড়া। গুয়ারামের চিনি না হলেও চলবে কিন্তু কেরোসিন ছাড়া তার চলবে না। বাজারে এখন কেরোসিন হাওয়া। যাও বা মেলে তার দাম অত্যধিক চড়া। ঘরে আলো না জ্বললে মন খারাপ হয়ে যায় গুয়ারামের। অন্ধকারে কেউ কারোর মুখ দেখতে পায় না। সব সওয়া যায় কিন্তু অন্ধকার সহ্য করা যায় না। গুয়ারাম গলা চড়িয়ে বলেছিল, কেরোচিন কুথায়, চিনি কুথায়?

—মাল এবার সাপ্লাই হয়নি। জগতের কুণ্ঠাহীন জবাব।

—কেনে মিচে কতা বলচো? আমি সব জানি গো, আমার চক্ষে ধুলি দিতে পারবে না। গুয়ারাম গলা চড়াল ধীরে ধীরে।

বেগতিক দেখে জগত তাব সঙ্গে আপোষের পথে হাঁটতে চাইল, আরে মাথা গরম করো না, তোমার জিনিস যাতে তুমি পেয়ে যাও আমি সেই ব্যবস্থা করছি। একটু শান্ত হও গো। আমার ব্যবসার পিণ্ডি চটকে দিও না।

—কী, তুমি আমাকে লুভ দেখাবে? ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা। এ আমি কী শুনচি গো। গুয়ারামের কথায় ক্ষেপে উঠল আশেপাশের ভিড়টা। জগত সেই জ্বলে ওঠা আগুনে জল ঢেলে নিভিয়ে দিতে পারল না।

সাইকেল নিয়ে একজন গেল মানিকডিহি গাঁয়ে। এসব মামলায় কপোতাক্ষর জুড়ি নেই। তিনি এর বিহিত করে ছাড়বেন। দরকার হলে দরখাস্ত লিখে পাঠিয়ে দেবেন বিডিও অফিস নতুবা ফুড-সাপ্লাই অফিসে। গণ-স্বাক্ষরের গুরুত্ব সব অফিসারই দিতে চান।

বাড়ি ফিরে এসে রঘুনাথের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ঘরে কেউ নেই, তালা ঝুলছে। নূপুর এসে উদ্বেগভরা গলায় বলল, আঁধারে জ্যাঠার মাথা কেউ ফেটিয়ে দিয়েচে। কী রক্ত, কী রক্ত! জেঠি জ্যাঠারে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েচে। তুমার বুড়াদাদুও গিয়েচে ওদের সাথে।

যার কোন শত্রু নেই, তার এমন আচমকা বিপদে বেশ ঘাবড়ে যায় রঘুনাথ। গুয়ারামের মাথায় কে মারতে পারে লাঠি? কার এত হিম্মোত আছে এ গ্রামে? তার নামটা জানতে পারলে রুদ্রাক্ষর দেওয়া রিভলবারটা কাজে লাগিয়ে দেবে সে। হাতি পুষে শুধু ভুষি খাওয়ানোর দলে সে নেই। সে জানে মারের বদলে মার।

আগে গাঁয়ের লোকে তার দাদুদের ধরে নিয়ে গিয়ে গাছে বেঁধে মারত। কারণে-অকারণে মার খেয়ে খোঁড়া হয়ে ফিরে আসতে হোত ওদের। গাঁয়ের কোন কিছু হারালে যেন ওরাই চোর, ওরাই ডাকাত। বিনা বিচারে চলত বেদম প্রহার। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়ে ছাড়ত। সে কষ্ট চোখে দেখা যায় না। অতীতের গল্প করতে গিয়ে চোখে জল এসে যেত চুনারামের, সেদিন কি পুরাপুরি গিয়েচে দাদুভাই। এখুন ও মানুষকে বিনা কারণে মারে। এখানে যার যত গায়ের জোর তার তত প্রসার। লাঠি যার মোষ তার—এই নীতিতে গাঁ-সমাজ চলচে আজও।

এই সমাজের বদল চায় রুদ্রাক্ষ, কুশল মাস্টার। কপোতাক্ষ তাদের দলে নেই তবে ওর লড়াইও অসাম্যের বিরুদ্ধে। বিদুর রাজোয়ার, লাবণি—ওরাও পিছিয়ে নেই এই চর্চায়।

সবাই বদলের কথা বলে। বদল কখন হবে? রঘুনাথ হা করে শোনে তাদের ভাষণ। ভাষণ শুনে ভরে যায় মন। যারা কেরোসিন খায়, রাস্তা খায়, টিউব-ওয়েলের টাকা খায় তারা কেমন মানুষ? তারা তো রাক্ষস।

ভোরের আলো ফোটার আগে রুদ্রাক্ষ ফিরে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, কমরেড, আবার দেখা হবে। আমরা সাম্যবাদের লাল সূর্যটাকে তোমাদের ধাওড়াপাড়ায় ওঠাব। জগত রেশন-ডিলারের কালো হাত আমরা ভেঙে গুড়িয়ে দেব। আমাদের দীক্ষিত কমরেডরা গাঁয়ে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন চলছে শুধু বুর্জোয়া-চিহ্নিতকরণ পর্ব। চিহ্নিতকরণ পর্ব সমাপ্ত হলে শুরু হবে শুধু রক্তাক্ত সংগ্রাম। রক্তাক্ত সংগ্রাম ছাড়া ভিক্ষে করে জয় আসবে না। মনে রাখতে হবে—আমাদের এই স্বাধীনতা ঝুটা। আমরা প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব। এ বিষয়ে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

রুদ্রাক্ষ চলে যাবার পর মন খারাপ হয়ে গেল রঘুনাথের। ওই মানুষটার কথায় আঁচের আগুন লুকিয়ে আছে। এই আগুনটাকেই ভালো লাগে তার। কিন্তু অভাব তাকে পথ হাঁটতে দেয় না। দুর্গামণির মতো পথ আগলে দেয়, যাবিনে বাপ, ও পথ তোর পথ নয়। বাবুরা যে পথে হাঁটে সে পথ তো আমাদের হাতে বানানো। হাঁসে ডিম পাড়ে, খায় দারোগাবাবুতে। দুর্গামণির চোখে ফুটে ওঠে ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের ভেতর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে অভাবের হিমকালো সাপ। এমন বিষধর সাপ জ্ঞানপড়ার পর থেকে সে আর দেখেনি। এই সাপকে বশ মানাতে গেলে গাছের শিকড়িতে হবে না, এর জন্য চাই চাঁদির জুতো। চাঁদির জুতোয় অভাব অনটন বাপ বাপ বলে গাঁ ছেড়ে পালাবে। তাহলে চাঁদির জুতো আসবে কোথা থেকে? এই প্রশ্নটাই এখন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে রঘুনাথের ভিতরে। লুলারামের প্রস্তাবগুলোর তার মনে পড়ছে। চাইলে কেউ দেবে না, জোর করে নিতে হবে। যার অনেক আছে তার কাছে জোর করলে কোনো পাপ হয় না। না বলে নিলে তা চুরি করা হয়। কিন্তু ..... ? রঘুনাথের মন দোটানায় ঝুলে রইল।

বাঁধের গোড়ায় তার দেখা হয়ে গেল লুলারামের সঙ্গে। কী একটা ভাবতে ভাবতে সে যেন পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইছিল। রঘুনাথ পেছন ঘুরে ডাকল, কাকা? ডাকটা আর্তনাদের মতো শোনাল লুলারামের কানে। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। গলায় মাফলারটা ফাঁসের মতো জড়িয়ে সে বলল কে, রঘু নাকি?

—হ্যাঁ, কাকা।

—অসময়ে তুই কুথায় যেচিস?

রঘুনাথ বুঝতে পারল লুলারাম এখনও অব্দি গুয়ারামের কোনো কথাই শোনেনি। শুনলে সে নিশ্চয়ই এমন প্রশ্ন করত না। দাদার জন্য তার প্রাণটা কঁকিয়ে উঠত। রঘুনাথ কাকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঢোক গিলল, বাবার মাথা কে ফেটিয়ে দিয়েচে বাঁধের গোড়ায়। আমি ঘরে ছিলাম না, মানিকডিহি গিয়েচিলাম। ফিরে এসে দেখি ঘরে তালা মারা। নূপুর আমাকে সব কথা বলতেই আমি এখুন হাসপাতালে যাচ্চি। লুলারাম মরা গাছের মতো দাঁড়াল কিছুক্ষণ তারপর কপাল কুঁচকে বলল, দাদার মাথায় লাঠি মারার মানুষও দেখচি এ গাঁয়ে আচে। হায় ভগবান, আমরা এখুনও কুন দেশে আচি গো.....।

—তুমি ভেবো না। হাসপাতালে গিয়েচে যখুন সব ঠিক হয়ে যাবে। রঘুনাথ ব্যথায় প্রলেপ দিতে চাইল।

কিছুটা বিরক্ত হয়ে লুলারাম বলল, আমি ভাবব নাতো কি গাঁয়ের মোড়ল ভাববে? এইজন্য আমার সাথে কারোর কুনোদিন পটল না। আমি জানি—এরা আমাদের দাবিয়ে চলে, আমাদের মানুষ বলে ভাবে না। ওরা যখন আমাদের মানুষ ভাবে না, তখন আমি কেনে ওদের মানুষ ভাবব। তাই আমি ওদের শত্রু, ওরা আমার শত্রু। বাধ্য হয়ে আজ আমি রাতের-মুনিষ হয়ে গিয়েচি। তোকেও বলেচি, তুই আমার কথাটা ভেবে দেখিস। মনে রাখিস শুধু সাহেবমাঠে মুনিষ খেটে আমাদের পেট ভরবে না। কোনো নেতা মুন্ত্রি আমাদের কথা ভাবে না। নিজেদের কথা নিজেরা না ভাবলে তলিয়ে যাবি। রঘুনাথ মন দিয়ে শুনল কথাগুলো, তারপর বাবার চিকিৎসার কথা ভেবে সে বলল, কাকা, তুমার কাচে কিচু টাকা হবে, থাকলে দাও। পরে আমি তুমাকে ঘুরোণ দেব।

ঢোলা জামার ভেতর থেকে কতগুলো ভাঁজ করা দশ টাকার নোট বের করে আনল লুলারাম, টাকাগুলো গুনল না, মুঠো করা অবস্থায় ওগুলো রঘুনাথের হাতে দিয়ে বলল, এগুলো নে। আরো লাগলে বলবি। আমি আরো দেব। আর শুন—এগুলান যে দিলাম তা ফেরত দেওয়ার দরকার নেই। এসব পরের টাকা, নিজেদের সেবায় লাগুক। রঘুনাথের মুখ হা-হয়ে গেল কথা শুনে। মানুষটা বলে কি—পরের টাকা? পরের টাকা মানে? মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল রঘুনাথের। লুলারাম তার মনের সংশয় দূর করে বলল, এসব টাকা আমার নয়, এ টাকা আমি রেতের বেলায় মুনিষ খেটে পেয়েচি। এ টাকাও আমার মেহনতের টাকা। এতেও আমার ঘাম মিশে আচে। তুই যা রঘু, দাদা কেমুন আচে জানাস।

পরপর তিন রাত ঘুমাতে পারেনি বিশু।

মেয়েটা বিছানায় কাতরাচ্ছে, সে ঘুমাবে কী করে? মমতা অস্থির হয়ে বলল, ওগো, কিছু একটা করো। মেয়েটার এ ছটফটানী আর চোখে দেখা যাচ্ছে না। মমতা কথা বলছিল না, যেন ওর গলা ঠেলে বেরিয়ে আসছিল কান্না। বিশুও সংক্রামিত হল মমতার চোখের দিকে তাকিয়ে। কালীগঞ্জ হাসপাতালের বড়ো ডাক্তার বললেন, ওষুধ দিয়ে দিলাম। পেটের ব্যথা না কমলে আবার নিয়ে আসতে হবে। তেমন দরকার পড়লে কৃষ্ণনগরে পাঠিয়ে দেব।

কৃষ্ণনগরের নাম শুনে মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল মমতার। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছিল না। আঁচলে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে উঠেছিল ডাক্তারবাবুর সামনে।

তার কান্না দেখে বড়োডাক্তারবাবু বললেন, ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। চিকিৎসা চললে আশা করি ভালো হয়ে যাবে।

—তাই যেন হয় ঠাকুর। বিশু হাত কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড়িয়ে উঠেছিল। তখন শীতের দুপুরে রোদ চড়াও হয়ে ঢলিয়ে পড়ছে ঘাসের গতরে। ঝাঁকড়া মাথার খেজুর গাছগুলো আকাশকে ভয় দেখানোর জন্য ব্যস্ত, যেন আকাশের মেঘ নেমে এলে সুঁচলো কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত করে দেবে তাদের দেহ। টগরী কোনো মতে হেঁটে এসেছিল পতাকা তোলার সিমেন্টের বেদী অবধি। ভ্যান রিকশা বা টাঙায় আনার ক্ষমতা ছিল না বিশুর, তাই দড়ির খাটিয়ায় মেয়েটাকে শুইয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত এনেছে সে। এটাই আশেপাশের দশটা গ্রামের নিয়ম।

ওষুধে কাজ দিচ্ছে না—এটা বুঝতে পেরে বিশু কেমন সকাল থেকে মনমরা। মনের কথা সে মনেই চেপে রেখেছে ইট চাপা ঘাসের মতন। কেন না মমতা ঘাবড়ে যায় কথা শুনে, চোখের জল আটকে রাখতে পারে না সে, পাতাঝরা গাছের মতো তাকে তখন উদাস দেখায়। দূরের অনেক কিছু বুঝি দেখতে পায় বউটা।

বিশু মমতার মুখোমুখি দাঁড়াল, নিগূঢ় দৃষ্টিতে বউটাকে দেখে মনটা ম্যাদা মারা হয়ে গেল তার। কোনোমতে বলল, অতো ভাবার কিচু নেই। শরীল থাকলে রোগজ্বালা হবেই।

মমতা যেন কথা শুনছে না এমন ভ্যালভেলানো চোখে তাকাল, ক'দিনে মেয়েটার কেমন দশা হয়েচে দেখো—ওর দিকে তাকানোই যায় না। আহা, কী সোন্দর চেহারা ছিল মেয়েটার। এখন মনে হয় বাজপড়া তালগাছ। বিশু চুপ করে গেল।

মমতা যা বলছে তা বানানো নয়। ও মা। মা'র চোখকে ফাঁকি দেওয়া কি সম্ভব। মনে মনে হাঁপিয়ে উঠছিল বিশু। ভয়ে সে আর হাসপাতালে যায় নি। এবার নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবু নির্ঘাত কৃষ্ণনগরে নিয়ে যাবার কথা লিখে দেবেন। একটা ভয় তাকে কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো ঘিরে আছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই ছোবল খাবার আশঙ্কা।

ভয়টা টাকার জন্য। এত টাকা আসবে কোথা থেকে। যাওয়া-আসার ভাড়া যোগাতেই জান কয়লা হবার অবস্থা। টগরীর অসুখ বলে মুনিষ খাটতে যেতে পারেনি সে। অন্য সময় হলে মমতাই তাকে ঠেলেঠুলে পাঠাত। আশ্চর্য, এ কয়দিন মমতা কোনো জোরই করল না। যেমন যাচ্ছে যাক, শুধু মেয়েটা সুস্থ হয়ে উঠুক, এই তার মা শীলতাবুড়ির কাছে প্রার্থনা। সকাল থেকে টাকার অভাবে কেন্নোর মতো নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে বিশু। লাল চা বানিয়ে মমতা তার কাছে এসে বসল। কাচের গ্লাসটা বিশুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, চা খেয়ে দেয়ে একবার সুফল ওঝার ঘর থিকে ঘুরে এসো। আমার মন বলচে—সিখানে গেলে টগরী আমার ভালো হয়ে যাবে। বিশুর চোখ থেকে তখনও সংশয় পুরোপুরি মেলায় নি। মমতা সামান্য জোর গলায় বলল, হাসপাতালের কড়া কড়া বড়ি-ইন্‌জিসিনে যা না হয় অনেক সময় জড়িবুটি শিকড়িতে তা হয়ে যায়। তাছাড়া সুফল ওঝার ঝাড়ফুঁকে অনেকের ভালো কাজ হয়েচে। ওর জলপোড়া খেয়ে কত লোকের পেটের ব্যামো সেরেচে।

মমতার বিশ্বাসে আঘাত করতে মন চাইল না বিশুর। গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গা-হাত-পায়ের হাড় সশব্দে ফুটিয়ে বলল, সুফল ওঝা কি খালি হাতে ওষুধ দিবে গো, ওরও তো সনসার আচে।

ধার-বাকির কথা বলবে, যদি না শোনে এটা সাথে করে নিয়ে যাও। কাঁসার একটা ছোট থালা বিশুর হাতে তুলে দিল মমতা। বিশুর হাত কাঁপছিল থালাটা নিতে গিয়ে। এই কাঁসার থালাটা টগরীর

মুখে-ভাতের সময় পয়সা জমিয়ে কিনেছিল বিশু। এটাই তার ঘরের একমাত্র দামী জিনিস। আপদে-বিপদে এই কাঁসার থালাটাকে দেখে অনেক শক্তি আর দুর্মর মনের জোর খুঁজে পায় বিশু।

থালাটা ধরল বটে কিন্তু ওর মন চাইছিল না ওটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। তার দ্বিধা দেখে মমতা বলল, দিন এলে অমন থালা ঢের হবে। কালীগঞ্জ বাজারের কাঁসারি দোকান তো আর উঠে যাবে নি। যাও, আর ভেবোনি। দেরি হয়ে যাচ্চে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিশু। বাঁধের গোড়ায় কদম গাছটাকে এ সময় বড়ো মন মরা দেখায় অথচ মাস চারেক আগেও এই গাছটার রূপ-যৌবন কত নজর কাড়া ছিল। এখন গাছটার সেই চোখ ধাঁধানো চেহারা নেই, অনেকটাই বিশুর মতো এলোমেলো দশা।

কদমগাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে ঢোঁক গিলল বিশু, ওর দু-কানে অদ্ভুত একটা শব্দ এসে ধাক্কা মারল। নিজেকে সামলে নিয়ে বিশু দেখল দুলাল হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছে।

পেছন থেকে দুলালকে ডাকল না সে, এতে যাত্রা খারাপ হয়ে যেতে পারে। সেই কারণে সামান্য জোরে হেঁটে দুলালকে ধরে ফেলল সে।

দুলাল হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল, কুথায় যাবিরে?

—গাঁয়ের ভেতর। বিশুর জবাবে দুলাল আশ্বস্ত হয়ে বলল, আমিও তো গাঁয়ে যাচ্ছি, ভালোই হল। চল, এক সাথে যাই—

—কার ঘরে যাবা গো দুলালদা? বিশু ছেলেমানুষের মতো শুধালো। দুলাল একটু থামল, সুফল ওঝার ঘরে যাবো রে, মা'র শরীলটা ভালো যাচ্চে না।

—আমিও তো সুফল ওঝার ঘর যাবো।

—কেনে তুর আবার কি হল?

—টগরীর পেটে ব্যথা। বেশ ক'দিন হয়ে গেল। সারচে না।

—তাহলে তো ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার। দুলালের মুখে চিন্তার রেখাগুলো ফুটে উঠল, পেট বলে কথা, কোনো কিচু তো বাইরে থেকে দেখা যাবে না। দেখা না গেলেই তো যত ঝামেলা রে! ভয় হয়, কিচু আবার হয়ে গেল না তো!

এ কথায় বিশুর ঝিমুনিভাবটা কাটল না বরং বেড়ে গেল। সে আবার ঢোঁক গিলে ভীতু চোখে দুলালের দিকে তাকাল। দুলাল বলল, ভয় পাবার কিচু নেই। রোগ যেমন আচে তেমনি তার অসুধও আচে। এখানে না হলে কাটোয়া-বহরমপুর নিয়ে যা। ওখানে শুনেচি বড়ো বড়ো ডাক্তার-বদ্যি আচে। ওরা পেট টিপে রোগ ভালো করে দেবে।

বিশুর মুখে কোনো কথা নেই, সে এসব কথা অনেক আগে থেকেই জানে। জেনেও সে এখন ঠুঁটো জগন্নাথ। ঘরে টাকা থাকলে সে কি মেয়েটাকে ফেলে রাখত। কবে বাস ধরে চলে যেত শহরে। নিরুপায় বিশুর গলার স্বর বুজে এল, দুলালদা, তুমি তো মুনিষ খাটাতে ভিন দেশে গিয়েছিলে। তুমার কাছে কিছু কি হবে গো?

দুলাল গলা ফাড়িয়ে হাসল না, কেমন দুঃখ-দুঃখ মুখ করে তাকাল, তা গিয়েছিলাম রে ভাই। কিছু টাকা কামিয়ে নিয়ে এলাম আমি আর তোর বউদি মিলে। কিন্তু এমন ভাগ্য—সে টাকা বানের জলের মতো বয়ে গেল। যেদিন ঘরে এলাম ভাই, সেদিন শুনি মা'র অসুক। হাসপাতালে ধুঁকচে। তারে নিয়ে কেসনগর যেতে হল। না হলে বাঁচত নি। শুধুমাত্র টাকার জোরে মা'টারে ঘুরোণ আনলাম।

দুলালের গলা ছুঁয়ে নেমে এল দীর্ঘশ্বাস। আশাহত বিশু আর কোনো কথা বলার সাহসই পেল না। বাঁক পেরিয়ে দুলাল বলল, মাকে নিয়ে আবার আমি ঝামেলায় পড়েচি। কী যে জ্বর ধরেচে,

সে আর ছাড়চে না রে। ভুগে ভুগে মা আমার হাড় লিকলিকে হয়ে গিয়েচে। কেমুন চিঁ চিঁ করে কথা বলে। তার কথা শুনে আমি আর তোর বউদি ভয়ে মরি। মনে হয় মা-রে কেউ ধরেচে।

—ধরেচে মানে? বিশু চমকে উঠল। ওর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল।

দুলাল খুঁকখুঁকিয়ে কাশতে কাশতে বলল, তোর বউদি বলছিল মা'র উপর মনে হয় কুনো আত্মাটাত্মা ভর করেচে নাহলে জ্বর ভালো হবে নি কেন?

—সে কি গো? বিশুর চোখের তারা ভয়ে কুঁকড়ে গেল, তুমার মা তো টুকটাক এসব বিদ্যে জানত। ভূত-প্রেত তো তারে ভয় পায় শুনেচি। তার যদি এমন হয় তাহলে তো ভয়ের কথা।

—সুফল ওঝার কাচে না গেলে এসব সঠিক ভাবে জানা যাবে না। গভীর আস্থায় দুলালের গলা বুজে এল, কোনোমতে সে বলল, দিনকাল খুব খারাপ পড়েচে। এখুন খেয়ে পরে বেঁচে থাকাই দায়। এর মধ্যে যদি অসুখ-বিসুখ করে তাহলে গোদের উপর বিষফোঁড়া। আমি আর পারচি নে রে ভাই, হেঁপসে উঠেচি।

সুফল ওঝার মাটির ঘরখানায় যেন সব সুখ-শান্তি-সমাধান লুকিয়ে আছে। ধাওড়া- পাড়ার মানুষগুলো এখানে এলে বুঝি ভরসার গঙ্গামাটি খুঁজে পায়। মানুষটা বেঁটে-খাটো কিন্তু ওর নাম-যশ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো। ওর কীর্তি কলাপের কথা বলে শেষ করতে পারে না গ্রামের মানুষ। কর্মের সঙ্গে কিছুটা গুজব মিশে সুফল ওঝা মানুষের চোখে হয়ে উঠেছে পরিত্রাতা।

মাটির ঘরের টিনের চালে রোদ পড়ে ঝিলিক মারছে বহুদূর পর্যন্ত। বিশুর মনে হল যেন ঢেউ খেলানো টিন নয়—কেউ আয়না বিছিয়ে রেখেছে ওর ঘরের চালে। সেই আয়নায় রোদে পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে জ্যান্ত চ্যাং মাছের মতো। উঠোনোর উপর কাঠটগরের গাছটার থোকা থোকা ফুলগুলো আকাশের তারার চেয়েও উজ্জ্বল। ওই একটা গাছই উঠোনের শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুণ।

বিশু আর দুলাল উঠোন পেরিয়ে মাথা হেঁট করে দাওয়ায় গিয়ে বসল। আগে থেকেই খেজুরপাতার চাটাই বিছিয়ে রেখেছে সুফল ওঝা। সকালবেলায় লোকজনের ভিড় কম হয় না। আশেপাশের গাঁ থেকেও লোক আসে তার কাছে। এখানে না এলে বোঝা যাবে না—মানুষের এত রকমের সমস্যা আছে। সবার সমস্যার কথা শুনে সাধ্যমত বিধান দেয় সুফল ওঝা। তবে সব কেস নিজের হাতে রাখে না। তেমন বুঝলে কেস চালান করে দেয় ঘাসুরিডাঙার জানগুরুর কাছে। জানগুরু কিছু বলা মানে সেটাই গুরুবাক্য, মহাবাক্য। অতএব বিনা সঙ্কোচে শিরোধার্য।

অনেক আগে থেকেই চাটাই জুড়ে বসেছিল ছ-সাত জন। বিশু দেখল এর মধ্যে চেনা জানা দু-জন মেয়েমানুষও আছে। এদের পাশ কাটিয়ে সে আর দুলাল কিছুটা তফাৎ-এ বসে সুফল ওঝা কোথায় গেল দেখছিল।

লোকজন এলেও সুফল ওঝার আসতে একটু দেরি হয়। রোজ সকালে স্নান সেরে সে কামাখ্যা মা এবং মনসাদেবীকে প্রণাম জানায়। শীতলাবুড়ি তার সঙ্গে সব সময় ঘোরে। হাঁড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞায় তার এই বাড়বাড়ন্ত। দেব-দেবীদের অস্বীকার করলে তার এই মন্ত্রব্যবসা ধোপে টিকবে না। ভক্তির চাইতে ভড়ং বেশি না হলে মানুষের মনে রঙ ধরে না।

'জয় মা চণ্ডী, জয় মা শীতলা, জয় মা কামাক্ষ্যা' বলতে বলতে খাটো ধুতি পরে কাঁঠালকাঠের চেয়ারে এসে বসল সুফল ওঝা। বিশু দেখল ওর কপালে মা কালীর হাড়িকাঠের মতো একটা তিলক আঁকা, গোলা সিঁদুর চকচক করছে কপালের চামড়ায়। ওকে না সাধু, না তান্ত্রিক, না মন্ত্রসাধক কোনো বিশেষরূপে চিহ্নিত করতে পারে না বিশু। ওর সরল, বেদনা ভারাক্রান্ত দুই চোখ যথাসম্ভব মুগ্ধতার রেশ লাগিয়ে দেখতে থাকে অপলক। একটা সাধারণ মানুষ নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিজেকে কি ভাবে বদলে নেয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সুফল ওঝার মতো বুঝি আর কেউ নেই।

দু'জন প্রতীক্ষারত মহিলা তাদের সমস্যার কথা বলে বুক হালকা করে উঠে দাঁড়াল। সুফল ওঝা

তাদের আশ্বস্ত করার জন্য বলল, চিন্তা করো না মা জননীরা, আমি গিয়ে ফুরসৎ মতো তোমাদের ঘরে দেখা করব। তোমাদের আর আমার এখানে কষ্ট করে আসার দরকার নেই।

মহিলা দুটি চলে যাওয়ার পর উশখুশিয়ে পেছন ঘেষড়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল দুলাল। সুফল ওঝা দুলালকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখল, তা বাবা অনেকদিন পরে এলে যে! তা তোমার মেয়ের ঝামেলাটা মিটে গিয়েচে তো? মেয়ে নিশ্চয়ই এখন জামাইয়ের ঘর করচে?

দুলাল কিছুটা অপ্রস্তুত তবু লজ্জিত ঘাড় নেড়ে সায় দিল। সুফল ওঝা কৃতিত্ব নেওয়ার ভঙ্গিতে ডানে-বাঁয়ে নিজেকে আন্দোলিত করে বলল, আমি জানতাম জট খুলে যাবে। বিচুটির বিচি গায়ে রগড়ে দিলে গা কুটকুটায়। তা বাপ তোমার জামাই বাবাজীবনের কুটকুটানির রস আমি মন্ত্রের জোরে শুকিয়ে দিয়েচি। সে শালাকে আমি বেঁধে দিয়েচি। এবার যতদিন সে বাঁচবে, শ্বাস নেবে তোমার মেয়ের পা-চাটা কুকুরের মতো বাঁচবে। আর তা যদি না হয় তাহলে তোমরা এই সুফলের নামে কুকুর পুষো।

দুলাল সর্বশরীর দুলিয়ে পাতা ভরা ডালের মতো হায়-হায় করে উঠল, কী যে বলো, সুফলদা! তুমার দয়ায় আমরা এ গাঁয়ে বেঁচে আচি। তুমি না দেখলে আমাদের কে দেখবে বলো। তুমি আমাদের ভগবান গো...!

সুফল ওঝা এমন তোষামোদের কথা শুনে রে-রে করে উঠল, মারব এক ধাপ্পড়, অমন পাপ কথা মুখে আনবে না। শোন ভাই, আমি কেউ নই গো, আমি কেবল হাঁড়ির ঝি চণ্ডীর সেবক, মা কামরূপ কামাক্ষ্যার আজ্ঞাবহ দাস। তেনারা আমাকে পেঠিয়েছেন মানুষের সেবা করার জন্য। যতক্ষণ এ ধুলোয় আছি, ততক্ষণ ধুলো মেখে যাবো। তা বলো কিসের জন্য এই অধমের কাচে আসা?

দুলাল তার দৃষ্টিকে মাখা ময়দার চেয়েও নরম করে বলল, অনেকদিন হয়ে গেল, মা'র জ্বর ছাড়চে নি! বড়ো ঝামেলায় আচি, মুনিষ খাটতেও যেতে পারচিনে।

—তুমার আর মুনিষ খেটে কী লাভ, যা কামিয়ে এনেচো? সুফল ওঝা দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে হেসে উঠল, তারপর নিমেষে গম্ভীর হয়ে বলল, ও জ্বর ছাড়বেনি, ও কী সাধারণ জ্বর? তোমাদের পাড়া থিকে মেলা লোক আসচে। সবার মুখে ওই এক কথা। কার গোরু মরচে, কার ছাগল মরচে, কার গাছ শুকোচ্চে! আমি কী করব বলতো?

—তুমাকেই তো সব করতে হবে সুফলদা। গায়ে পড়া হাসি হাসল দুলাল।

সুফল ওঝা আরাম করে বসে দুলালকে বলল, তোমাদের পাড়াটায় কু-নজর পড়েচে। পুরা শেষ হয়ে যাবে পাড়া। দাঁড়াও গণনা করে দেখচি, কার বিষ-নজরে এসব হচ্ছে।

চেয়ার ছেড়ে সুফল ওঝা বেরিয়ে এল বাইরে। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গোল চক্কর কেটে চারপাশ দেখে নিল একবার। চোখে-মুখে চতুর হাসি ছড়িয়ে ধুতি গুছিয়ে সে ঝপ করে বসে পড়ল উঠোনের মাঝখানে। খামচা দিয়ে তুলে নিল এক মুঠো ধুলো। সেই ধুলো দিয়ে ছক কাটল উঠোনে। ছকের মাঝখানে আঙুল রেখে বিড়বিড়িয়ে উঠল সে, দেখা দে মা, দেখা দে। ডাকিনী-যোগিনী, প্রেত-প্রেতনী দেখা দে, দেখা দে। দোহাই তুদের দেখা দে। বিড়বিড়ানো মন্ত্রের সাথে সাথে ধুলো ওড়ে। ডানে-বায়ে মাথা ঝুঁকায় সুফল ওঝা।

এক সময় চোখ কপালে তুলে সে থেমে যায়। ধুলো ছুঁড়ে দিয়ে মুঠি করে ধরে রুদ্রাক্ষের মালাটা। মেয়েলি গলায় চিঁ-চিঁ শব্দ করে ওঠে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে রে! আর জ্বালাস নে বাপু, ছেড়ে দে।

দরদরিয়ে ঘাম নামে সুফল ওঝার মুখ আর কপাল চুইয়ে। একটু আগের শান্ত-শিষ্ট মানুষটা বুঝি অশান্ত হয়ে ওঠে। তার চোখের মণি লাটিমের মতো ঘুরতে থাকে। হাঁপাতে থাকে সে। হাঁপানী থামিয়ে এক সময় গর্জে ওঠে সে, পেয়েচি, পেয়েচি তারে। সে তোদের পাড়ার মানুষ রে। বর-বউ

মিলে করচে, মোট দু'জন। উঠোনে জামগাছ আছে। রাতে এট্টা পেঁচা বসে। মুখটা নারকোলের মালাইচাকির মতো, আর চোখ দুটো কাচ-টিপ্পির। সাবধান, ওরা সব খাবে। মানুষ গোরু ছাগল হাঁস মুরগি সব খাবে। শেষে মাটি খাবে, গু-গোবর সব খাবে। সাবধান।

—আমাদের কি হবে সুফলদা? অনেকক্ষণ পরে মুখ খুলল বিশ্বনাথ। সুফল ওঝা অর্ধেক ঘুরে সজোরে তার হাত চেপে ধরল, বিশুরে, গাঁ ছেড়ে পালা। ওরা তোর মেয়েটারে ধরেচে। ছাড়বে নি, ছাড়বে নি। পেটে ব্যথা হয়?

বিশু ঘাড় নাড়ে। সমবেত মানুষের চোখে বিশ্বাসযোগ্যতার আলপনা ভেসে ওঠে। সুফল ওঝা গলা চড়ায়, ভয় পাবি নে। এর চিকিৎসে আচে। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তবে খরচাপাতি করতে হবে। ঘাসুরিডাঙার জানগুরুর কাছে যেতে হবে সত্বর। তার বেচার নিতে হবে। আমি কিছু বলব না। আমি প্রতিবেশী, আমার কিছু বলা সাজে না।

—কার কু-নজর পড়েচে শুধু তার নামটা বলো। বিশু তেতে ওঠে।

দুলাল উত্তেজিত, তোমাকে বলতে হবে সুফলদা। তুমার মেয়ের দিব্যি, না বললে চলবে না। সব রসাতলে যাবে। আমাদের ক্ষতি হোক—তুমি কি চাও? সুফল হাড় ফোটাল মটমটিয়ে, না রে ভাই, না। আমি মাটির মানুষ, মানুষের ভালো হোক এটাই চাই।

সুফল ওঝার স্বাভাবিক হতে আরও আধঘণ্টা সময় লাগে। বিশু গালে হাত দিয়ে হাঁটু মুড়িয়ে বসে আছে দাওয়ায়। দুলালের মুখে কোনো কথা নেই। তাদের পাড়ায় কার উঠোনে জামগাছ আছে? বর-বউ, ঘরে কোনো সন্তান নেই? কে সে? দুলালের মাথাটা গুলিয়ে যেতে থাকে। তার কানের পাশটা ঝাঁ-ঝাঁ করে। কপালটা অতিরিক্ত চিন্তায় ছিঁড়ে পড়তে চায়।

সুফল ওঝা ঢের সময় পার করে একটা বিড়ি ধরায়, গলা খেঁকারি দিয়ে শ্লেষ্মাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় দূরে। হলুদ হয়ে যাওয়া কফটা উঠোনে পড়ে জড়িয়ে নেয় ধুলো। বিশু ঘেন্নায় চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সুফল ওঝার দিকে তাকায়, দাদা গো, কিচু এট্টা বেবস্থা করো। আমাদের বাঁচাও।

—বললাম তো ঘাসুরিডাঙার জানগুরুর কাচে যেতে হবে। এত কঠিন কেস আমাকে দিয়ে হবে নি। সুফল ওঝা বিড়িতে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল। দুলাল তার কাছে সরে এসে বলল, সুফলদা, জানগুরুকে আমরা তো চিনি নে। তার কাছে যাবো, তবে তুমি এট্টা হাত চিঠি লিখে দাও।

—ও সবের কোনো দরকার হবে নি। ওখানে গিয়ে শুধু আমার নাম বললেই হবে। সুফল ওঝা গোঁফ নাচিয়ে নির্ভরতার হাসি হেসে উঠল।

পাড়ায় এসে প্রেতাত্মার খবরটা রাষ্ট্র করে দিল দুলাল। বিশু তার সঙ্গে থাকল। টগরীর চিকিৎসার চেয়ে পাড়া থেকে বদ-আত্মার অপসারণ তার কাছে বেশি গুরুত্ব পেয়ে বসল। সেই দলে বুড়োদের সঙ্গে যোগ দিল লুলারাম কেন না নূপুরও ক'দিন থেকে সর্দি-জ্বরে ভুগে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলেছে।

ঝারি আর ভিকনাথ ভয়ে মরছে কেন না তাদের উঠোনের জামগাছটা গত ক' বছরে লকলক করে বাড়ছে। উঠোনে জামগাছ থাকা নাকি শুভ নয়। দুলাল গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসেছে সব। শুধু লুলারামের ভয়ে সে কথাটা নিজের ভেতর চেপে আছে।

লুলারামের রাগ হলদিপোঁতা ধাওড়ার অনেকেরই জানা। ওর স্বভাব হল সব কিছু চুপচাপ শুনে যাওয়া। তারপর মওকা মতো সব ধারাল তীরগুলো জায়গা মতো ছুঁড়ে দেওয়া। শুধুমাত্র বুদ্ধির জোরে মানুষটা এখনও চাষের কাজে খাটতে গেল না, সে যদি মন করে তাহলে অনেক বাবু-ভাইকে তার নিজের ঘরে খাটাতে পারে। না হলে থানার পুলিশ প্রায় ওর দোরে আসবে কেন? এমন কী দারোগাবাবু পর্যন্ত লুলারামকে সমীহ করে।

নূপুরের অসুখের পর মন ভেঙে গিয়েছে লুলারামের। মুনিরাম খনখনে গলায় বলে, বাপরে এখুনকার জ্বর জ্বালাকে হেলাফেলা করবিনে। হাসপাতালে নিয়ে যা, মেয়েটারে এট্টু ওষুধ-বিষুধ এনে দে।

নূপুর বিছানা নিলে এ ঘরে হাঁড়ি চড়াবে কে? নোলক এখনও হাঁড়িশালে যায় না, ভাত ঝরাতে গেলে প্রায়ই গরম ফেন তার পায়ে পড়ে কাহিল করে দেয় তাকে।

ঘাসুরিডাঙার জানগুরু গৌরচন্দ্র মানুষ হিসাবে মন্দ নয়। তার বিকটদর্শন চেহারাখানা মানুষের মনে প্রথমেই ত্রাসের সৃষ্টি করে। মাঝারি গড়নের জানগুরুর চেহারাটা অল্প মোটা, তবে ডানদিকের গালের খুবলান দাগটা তাকে ভয়াবহতার চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। এক নজর দেখলে অনেকেরই পিলে চমকে যাবার যোগাড়। কালো মানুষটার সারা গায়ে চন্দ্রবোড়া সাপের মতো ছোপ ছোপ দাগ। কালো-সাদার সংমিশ্রণে সে এক বীভৎস চেহারা। শুধু শিশু নয়, এ চেহারা দেখলে বয়স্কদেরও পিলে চমকে যেতে বাধ্য। গৌরচন্দ্র তার কটা চোখের মণি ঘুরিয়ে শুধোল, তুমরা কারা গো, কুন গাঁয়ের লোক?

সাহস করে তার সামনে এগিয়ে গেল লুলারাম, হলদিপোঁতা ধাওড়া থেকে আসচি গো।

—অঃ, তা বেশ, তা বেশ। খয়রেটে চুলে হাত বুলিয়ে বাপের বয়সী গৌরচন্দ্র জিজ্ঞেস করল, তা বেটা, তুর নাম কি?

—আজ্ঞে আমার নাম লুলারাম রাজোয়ার।

—ওঃ বুঝেচি! তুর বাপের নাম মুনিরাম, তাই না? গৌরচন্দ্রের চোখ থেকে সংশয়ের মেঘ সরে গেল। বেশ খুশি খুশি মেজাজে সে দাপনা চুলকে বলল, তুর বাপের সাথে বয়সকালে কতবার হাডুডু খেলেচি তার কুনো গোনা গুনতি নেই। তবে মানতে হবে তুর বাপের মতো খেলোয়াড় এ তল্লাটে আর দুটি ছিল না। তা বাপ, তুদের সেই কালো ঘোড়াটা আচে না বেচে দিয়েচিস?

কালো ঘোড়ার প্রসঙ্গ উঠতেই সিঁটিয়ে গেল লুলারাম। কালো ঘোড়ার গল্প পাড়াগাঁয়ে কার না জানা। মুনিরামের অসুখের জন্য ওই কালো ঘোড়াই যে দায়ী একথা আড়ালে আবডালে অনেকে এখনও আলোচনা করে। পাপের শাস্তি মানুষকে এ জীবনেই পেয়ে যেতে হয়। স্বর্গ-নরক এই ধুলোতেই মিলে মিশে আছে।

যে মানুষটা এত জানে সে নিশ্চয়ই মুনিরামের আর সব গুণের কথা জেনে বসে আছে। তার সম্মুখে বেশি মুখ নাড়ানো উচিত হবে না। কেঁচো খুঁড়তে এসে সাপ বেরিয়ে পড়লে মুশকিল।

গৌরচন্দ্র তার কটা চোখ ড্যামা ড্যামা করে লুলারামের দিকে তাকাল, তা বাপ, তুর কি করা হয় শুনি?

লুলারামের যাবতীয় গাম্ভীর্য লুটিয়ে পড়ার দশা, কোনোমতে মাথা নেড়ে সে বলল, কি আর করবো গো, যখন যা পাই তখন তা করি। এসব করে দিন চলে যায় কুনোমতে।

—কুনোমতে কেন রে, তুর দিন তো বেশ ভালোই যাচ্ছে। তুই এখন অমাবস্যায় চাঁদ দেখচিস। তবে সাবধান। গৌরচন্দ্রের চোখ কঠিন হয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল, যে হরিণের পেছনে তুই দৌড়োচ্ছিস সে তো হরিণ নয়, সে হল বাঘ। তুরে খাবে, তুর সন্‌সার খাবে। সোনা ভেবে যারে তুই আঁকড়ে ধরেচিস সে হল কচা কাঠ।

লুলারাম ঘামছিল। সেয়ানা সেয়ানায় লড়াই জমে ওঠার আগেই বিশু এগিয়ে এল ওদের সামনে, জোড়হাত কপালে ছুঁইয়ে বলল, আমাদের ঘোরতর বেপদ গো, আমাদের বিপদ থেকে বাঁচাও। সুফল ওঝা তুমার কাছে পাঠাল। সে খড়ি কেটে দেখেচে গাঁয়ে নাকি প্রেতাত্মা ঘুরচে--

দাপনায় চটাস করে চাটি মেরে লাফিয়ে উঠল জানগুরু, প্রেতাত্মা ঘুরচে নারে ব্যাটা, দুটা মানুষ

প্রেতাত্মা পুষে রেখেচে। তারা মানুষের সর্বনাশ চায়। তবে তাদের আমি বেশি বাড় বাড়তে দিবোনি। তাদের ডানা আমি ছেঁটে দিব। তুরা যা—

গৌরচন্দ্র তাদের যেতে বললেও কেউ যায় না, সবাই মাটি কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঘাড় নীচু করে। আতঙ্ক ছড়িয়ে গিয়েছে ওদের চোখে-মুখে। কার এত সাহস যে মানুষের ক্ষতি করার জন্য ভূত পুষে রেখেছে।

গৌরচন্দ্র কপাল কুঁচকে বলল, যার ঘরে ভূত-প্রেতের বাস তার ঘরে বাচ্চা-কাচ্চা থাকবেনি। তারা হবে আটকুড়ো, বাঁজা। ঝাড়া হাত-পায়ের মানুষ ছাড়া কার বুকে এত সাহস হবে বল?

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর বেড়ে গেল সন্দেহ। হলদিপোঁতা ধাওড়ায় এমন মানুষ কে আছে যার ছানাপোনা নেই? আটকুড়া, বাঁজা।

বিশু বলল, আমাদের ভিকনাথ গো, ওর তো কুনো ছেলেপুলে নেই!

দুলাল সবিস্ময়ে বলল, ঠিক কথা। তবে—

সন্দিগ্ধভাবে তাকাল লুলারাম, তার মুখে আটকে গেল কথা। জানগুরু গৌরচন্দ্র বলল, কার পেটে কী আচে, আমি ছাড়া আর কে জানবে বাপ। নিজেদের মধ্যে খেওখেয়ি করো না, ঠাণ্ডা মাথায় কাজ নিও। তুমাদের হাতে কুনো প্রমাণপত্তর নেই। থানা পুলিশ হলে তুমরা সব জেলে যাবা। আমাকেও পুলিশ ছেড়ে কথা বলবে না। তাই বলছিলাম কী কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলো, কাঁটার বদলে মুড়ো ঝাঁটাও চলতে পারে তবে ঝাঁটার বদলে যেন খাঁড়া না চলে। মনে রেখো রক্তারক্তি হলে ভুমি নষ্ট হয়। ভূমি নষ্ট হলে শান্তি নষ্ট হয়।

খরাবেলায় ফিরে এসে সাঁঝেরবেলায় সালিশি সভার ডাক দিল হলদিপোঁতার মোড়ল। গায়ে কম্বল জড়িয়ে কোনোমতে সভায় এল চুনারাম। মুনিরামের আসার কোনো উপায় ছিল না। তার ঘা-গুলো থেকে রস কাটছিল অনবরত। সে তার অনিচ্ছার কথা জানিয়ে দিল সবাইকে।

সভা শুরু হতেই হ্যারিকেনের বাতি উসকে লুলারাম বলল, ধাওড়াপাড়ার বেপদ গো। মানুষগুলোকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে।

দুলাল রাগে ফুঁসছিল, ছাগল-গোরু না পুষে মানুষে ভূত-প্রেত পুষেচে। যে পুষেচে তারে গাঁ থেকে পগারপার করতে হবে, নাহলে নিস্তের নেই।

ভূত-প্রেতের প্রসঙ্গ উঠতেই বাকি মানুষ যেন শূন্য থেকে পড়ল, এ কেমুন ধারা কথা গো? মানুষ আবার ভূত-প্রেত পোষে নাকি?

—পোষে, আলবাত পোষে। জানগুরু বলেচে। সুফল ওঝা বলেচে। ওদের কথা ভুল হবার নয়। ভিড়ের মধ্যে থেকে কথাগুলো উঠে এল।

রাতের অন্ধকার ছাপিয়ে ভেসে এল ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক। আতঙ্কগ্রস্থ একদল মানুষ টিমটিমে আলোয় মাথার চুল ছিঁড়তে বাধ্য হল। বুড়িগাঙের জলের চেয়েও কালো হয়ে আছে ওদের মুখ। চোখ থমথমে।

সভার মাঝখানে উঠে দাঁড়াল বিশু, গলা খেঁকারি দিয়ে বলল, আমার মেয়েটার পেটে অসহ্য ব্যথা। সে বেচারী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। দাঁড়াবে কি করে? ওর শরীলে কোনো ওষুধ কাজ দিচ্চে না। যা খাচ্চে সব বমি হয়ে বেরিয়ে যাচ্চে। সচরাচর এমন হয় না। এসব হচ্চে সব কু-আত্মার জেরে।

জানগুরু আর কী বলল তা শোনার জন্য লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল চুনারাম। দুলাল গলা চড়িয়ে বলল, তাহলে শোন—জানগুরু বলেচে—এ পাড়ার কেউ ভূত-প্রেতনী পুষে রেখেচে। সেই ভূত-প্রেতনী গাঁয়ের মানুষের ক্ষতি করচে। রোগ-জ্বালা সেই জন্য কমচে না। যার হচ্ছে আর সারচে না। মানুষ গোরু ছাগল হাঁস মুরগি সব ফলিডল দেওয়া পুকুরের মাছের মতো মরচে। এমন চললে

পুরো ধাওড়াপাড়া সাফা হয়ে যাবে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। চুনারাম কাশি আটকাতে পারল না, মিনিট দুয়েক কাশতে কাশতে তার চোখ থেকে বেরিয়ে এল জল। খড়খড়ে হাতে সেই জল মুছে নিয়ে চুনারাম শুধোল, এ পাড়ায় কার ঘরে ভূত আচে বলে তুমাদের বিশ্বেস।

বিশু কোনো রাখ-ঢাক না করে বলল, জানগুরুর কথা মতো ভূত-প্রেত তো ভিকনাথের ঘরে থাকার কথা। জানগুরু বলেচে—ভূত আচে তার ঘরে যার ঘরে কুনো ছানাপুনা নেই। সভায় উপস্থিত ছিল ভিকনাথ নিজেও। কথাটা শোনার পরে তার সারা শরীর চিড়বিড়িয়ে উঠল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে কী ভেবে সে চুপ করে গেল। সভার মধ্যে গুঞ্জন উঠল ধীরে ধীরে। ঢিল মারা পাহাড়ী-মৌচাকের মৌমাছির মতো ছড়িয়ে গেল মানুষ। সবার ক্রোধী চোখ গিলতে লাগল ভিকনাথকে। এতদিনের চেনা মানুষটা এক নিমেষে শত্রু হয়ে গেল সবার। রাগে-ঘেন্নায় অনুশোচনায় থ' হয়ে গেল ভিকনাথের শরীরখানা।

চুনারাম মুখ উঠিয়ে বলল, সবাই তো শুনলে, কারোর কিছু বলার থাকলে দশের মাঝখানে বলতে পারো। তারপর দশে যা রায় দেবে সভা তা মেনে নেবে। হঠাৎই হল্লা ফুঁসে উঠল, হাতের মুঠি বাগিয়ে বলল, দোষীর শাস্তি চাই। যে দশের সর্বনাশ চায়, আমরা তারও সর্বনাশ চাই।

চুনারাম সবাইকে শান্ত হতে বলে ভিকনাথের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, তুর কিচু বলার থাকলে বল। দশে জেনে-বুঝে যে রায় দিবে সেটা তুকে মানতে হবে। এ ব্যাপারে আমার কুনো রায় নেই। আমি সমাজের দাস, দশের কাছে হাত-পা বাঁধা।

ভিকনাথের কাঁদো কাঁদো চোখ-মুখ, কিছু বলতে গিয়ে গলা বেজায় কেঁপে উঠল তার, নিজেরই পেট চলে না, ভূত-প্রেতনীর পেট পালবো কি করে গো? বিশ্বাস না হয় তুমরা সব্বাই মিলে আমার ঘরে চলো, নিজের চোখে সব দেখে আসবা। কাঁথা-কানি আর দু-চারটে হাঁড়িকুঁড়ি ছাড়া আমার ঘরে কিচু নাই গো।

—তুর বউটা গলায় সোনার হার পরে ঘুরে বেড়ায়, আর তুই বলচিস তুর ঘরে কিচু নাই—এ তো বড়ো তাজ্জব কথা! হাসির ঢেউ উঠল সভা জুড়ে। অসহায় ভিকনাথ বলল, ওটা সোনার হার নয় গো, ওটা গিল্টি-গয়নার। চকচক করলে কি সোনা হয়ে যায়? আমার বাপ-ঠাকুরদা কুনোদিন সোনার আংটি পরে নি। আমার মা'র গায়েও কুনোদিন সোনার কুঁচি ছিল না। থাকবে কি করে, রেজা-কামিনের কাজ করে কি সোনার জিনিস পরা যায়?

চুনারাম বুঝতে পারছিল ভিকনাথের কথার সত্যতা। কিন্তু বুঝতে পারলেও তার যে কিছু করার নেই এটা সে হাবভাবে বুঝিয়ে দিল। এদিকে কেরোসিন ফুরিয়ে এসেছে হ্যারিকেনের, আর মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সব তেল পুড়ে গিয়ে দপদপ করবে আলো। ফিতে পোড়ার গন্ধে নাক কুচকাবে অনেকেই। তার আগেই আলো থাকতে থাকতে কথাটার ফায়শালা হয়ে যাওয়া ভালো। চুনারাম গলা চড়াল, তুমরা সব কি চাইচো গো?

ফিসফিস আলোচনা সেরে ভিড়ের মধ্যে থেকে দুলাল বলল, দোষ করলে সাজা তো পেতেই হবে। যারা দশের কথা ভাবে না, তাদের কথা আমরা কেনে ভাবব। ওদের একঘরে করে দেওয়া হোক।

—সেই ভালো, সেই ভালো। সবাই একবাক্যে সায় দিল।

বিশু বলল, ওরা সরকারি কলে জল আনতে যেতে পারবে নি। পাড়ার কুনো কাজে ওদের ঢোকা বারণ।

ভিকনাথ কাঁটা গাছের মতো সিঁটিয়ে গিয়ে শুনছিল, খুব অসহ্য লাগতেই এবার সে আর্তনাদ করে উঠল, উটি করবেন নি গো, মরে যাবো। পাড়ায় তো আমরা ক' ঘর মাত্তর। আমাদের ভিনো করে দিলে বউটারে নিয়ে আমি যাবো কুথায়?

—তোর বউয়ের কি যাওয়ার জায়গার অভাব? সোঁদর মুখের জন্য তো অনেক কপাট খোলা থাকে। পেছন থেকে কথাটা কে যেন ঢিল মারার মতো ছুঁড়ে দিল। ভিকনাথের কান্না পাচ্ছিল ভীষণ তবু সে কাঁদল না। দম ধরে থাকল অনেকক্ষণ।

চুনারামের মাজাটা কনকন করছিল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার জন্য। সে হাত নেড়ে নেড়ে বলল, হ্যারকেনের কেরোচিন ফুরিয়ে এল। ইবার আমাদের সভাও শেষ। তাহলে এই কথাই থাকল কাল ভোর হওয়ার পর থেকে ভিকনাথ একঘরে হয়ে যাবে। এ কথার যেন নড়চড় না হয়। নড়চড় হলে আরও কঠিন সাজা দেওয়া হবে। কথাটা যেন মনে থাকে।

তালাই গুটিয়ে সবাই যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন ওদের সামনে এসে মা দুর্গার মতো দাঁড়াল ঝারি, এ তুমরা কি করলে গো? এর চেয়ে আমাদের মেরে ফেললে ভালো হত। আমরা নির্দোষ। তুমাদের পায়ে ধরি গো, বুড়িগাঙের ঘাটটা আলাদা করে দিও না। মাঠ আর ঘাট আলাদা হলে মানুষের যে আর কিছু থাকে না।

একঘরে হওয়ার অভিশাপ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল ঝারি। পিঠে-পরবের দিনে হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে বসে ছিল ভিকনাথ। ঝারি তাকে বলল, যাও না গাঁয়ের ভেতর থিকে ঘুরে আসো। গেল সালে তো কত পিঠে গামছায় করে বেঁধে আনলে এ বছর গেলে নেশ্চয়ই কেউ তুমারে ফেরাবে না।

ছোটকাল থেকে গাঁয়ে ঘুরে পিঠে খেত ভিকনাথ। সবাই মন খুশ করে পিঠে দিত। বলত—পেট ভরে খাও, লাগলে আরো দেব। পোড়া-পিঠের স্বাদ আলাদা। সেই পিঠে দশজনে মিলে না খেলে তার স্বাদ বাড়ে না। বোস বাড়ির বউটা হর সাল গুড়পিঠা আর সরুচাকুলি বানায় ভালো। সরাপিঠা আর ভাপাপিঠা মকর-পরবে সবার ঘরে হবেই হবে। সেদ্ধপিঠা আর পুরপিঠাও হবেই হবে। ও পিঠা না হলে মকরসংক্রান্তির আনন্দ যে ফিকে হয়ে যাবে।

ঝারি নিজেও পিঠে খেতে ভালোবাসে। তবু গাছ পুজোয় পিঠে না দিয়ে এলে তার শান্তি নেই। ভিকনাথের মাথা একেবারে পাগল করে দেবে, কই গো, নুয়াচাল আনলে না যে! মকর পরবের আর বেশি দেরি নাই। কাল নারকেল নুয়া চাল আর নলেন গুড় নিয়ে এসো। আর হ্যাঁ মনে করে কাঁচা দুধ এনো। তুমার বাহ্যি হয়েছিল, মানত করেচি ঠাকুরের কাচে। সে ধার এবার শোধ দিতে হবে।

গায়ে গা লাগিয়ে পরবের দিনগুলো বুঝি শেষ হয়ে এল। ঝারি ভিকনাথকে ঠেলা মেরে হু-হু কান্নায় ভেঙে পড়ল। তার চোখের জলে বেরিয়ে এল ঘামের গন্ধ। নিজের ভেতর সে খুঁজতে লাগল ভূতের গন্ধ।

দশদিন কেটে গিয়েছে কাজে যায়নি ভিকনাথ। ঘরে চাল বাড়ন্ত। ঝারির আর হাঁটার ক্ষমতা ছিল না। বাঁধ গোড়ায় অনেকদিন পরে দেখা হল তার লুলারামের সঙ্গে। একটা জড়তা নিয়ে কুয়াশা ঢাকা ছাতারগাছের মতো দাঁড়িয়ে ছিল লুলারাম।

ঝারি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, তুমিও কি মুখ ঘুরিয়ে নেবে এই অসময়? লোকের কথা বিশ্বেস

করে এতদিনের সম্পর্কটাকে নষ্ট করে দিতে পারবে তুমি? অনেকক্ষণ পরে মুখ খুলল লুলারাম. অপরাধীর মতো বলল, আচ তুমাদের এই অবস্থার জন্যি আমি দায়ী। সবাই তোমার-আমার সম্পর্কটার কথা জেনে গিয়েচে। এটা কেউ সহ্য করতে পারে না।

—পারবে না, এতো জানা কথা। ঝারি ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসল।

—লোকের কুনো দোষ নেই। যত দোষ আমার। লুলারাম ঝারির দিকে মায়াবী চোখে তাকাল, ঝারির রূপ তাকে চুম্বকের মতো টানছে, আগুনপোকার মতো নিজেকে কিছুতেই সামলে রাখতে পারছে না লালুরাম, এক উন্মনা অস্থিরতায় বুজে এল তার গলা। পুরুষের এই মুহূর্তটিকে ঝারি খুব ভালোভাবে চেনে। সে যাবতীয় খেদ ভুলে লুলারামের হাত ধরে টানল বাঁধের নীচে। ঝোপের আড়ালে ঘাসের বিছানায় দেহ বিছিয়ে দিল সে। লুলারামকে বলল, শোঁকো, ভালো করে শোঁকো—দেখো আমার গায়ে কুনো ভূতের গন্ধ আচে কি না।

লুলারাম পাগলের মতো শুঁকছিল। শুঁকতে শুঁকতে বহুদিন পরে সে ডুবে গেল আলোর গহ্বরে। তৃপ্তির ডিঙাটা তখন মাছে ঠুকরান ছিপের ফাতনার মতো নড়ছে। সুখের পলির ভেতর নিজেকে সঁপে দিয়ে সে খুঁজতে চাইল জীবনের আসল ঘ্রাণ।

দুটি শরীর দীক্ষা নিয়ে মাটির টানে ফিরে গেল। আকাশের গঞ্জনা শোনার জন্য শুধু জেগে রইল একাকী চাঁদ।

চাপাকলে জল আনতে গিয়ে প্রথম বাধা পেল ঝারি। মুখ বেজার করে কলসিটা নিয়ে পাশে সরে দাঁড়াল সে। মনে মনে ফুঁসছিল সে কিন্তু বাইরে তার কোনো প্রকাশ নেই। এ-গাঁয়ে বউ হয়ে আসার পরই তার ভাগ্যটা গাঙের জলের মতো নানা খাতে বয়ে গেছে। সেই প্রথমদিন থেকে তাকে মাঠের কাজে যেতে দেয়নি ভিকনাথ। মুখ ফুলিয়ে বলেছে, লোতুন বউ তুমি। তুমি খাটতে গেলে লোকে যে আমার মুখে চুনকালি দেবে।

নতুন বউ পুরনো হল তবু ভিকনাথের মন সায় দিল না। ঝারি নিজেও আর গা করেনি মাঠে যাওয়ার। মাঠ-ঘাটের কাজ সবার দ্বারা হয় না। সবাই যা পারে ঝারি তা পারেও না। অবশ্য ভিকনাথও চায় না ঝারি ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াক। মুখে দোক্তাগুণ্ডি নিয়ে এখানে-সেখানে পিক ফেলুক। কিংবা নেশায় টলমল হয়ে ঘর ফিরুক। ঝারির ওসব হ্যাঁপা নেই। সেদিক থেকে ভিকনাথ অনেক সুখী মানুষ। ঝারির মুখের দিকে তাকালে তার পিয়াস মিটে যায়, গাঙধারের ঝাউগাছগুলোর মতো হালকা মনে হয় নিজেকে।

চড়া রোদে আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল না ঝারি। ঘরে ভাত চড়িয়ে এসেছে। চুলার শুকনো কাঠ পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে একসময়। এ সময় এক কলসি জলের বড়ো দরকার ছিল। মানুষটা খেটেখুটে এলে তাকে অন্তত এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিতে পারত সে।

পাড়ার বউগুলো তাকে সরকারি কলটা ছুঁতে দিল না। ঠোঁট উল্টে ভেংচি কেটে বলল, খবরদার এদ্দিকপানে আর আসবা না, এলে পরে তুমার কলসি আমরা আধলা ইটে ভেঙে দেব। মনে রেখো-ধাওড়াসমাজ তুমাদের একঘরে করে দিয়েচে। তুমার সাথে মিশে আমরাও কি মরব নাকি?

ভূত-প্রেতের গল্পটা এখন সারা পাড়াময় চরে বেড়াচ্ছে। জন খাটতে গিয়ে এখন আর শান্তি পায় না ভিকনাথ। আগের মতন ঠাট্টা ইয়ার্কি হাসি মস্করা হয় না মাঠের কাজে। সবাই যেন শামুকের মতো খোলবন্দী করে ফেলেছে নিজেকে। ভিকনাথকে ভাবছে বুঝি বিচুটিগাছ, ছুঁলে যদি গা কুটকুটায়।

এড়িয়ে যাওয়াটা সবার আগে নজরে পড়ে মানুষের। সামান্য ঘাসও বোঝে এড়িয়ে যাওয়ার

মর্মজ্বালা। মাঠে এখন জল নেই, তবু বক উড়ে বেড়ায় সাদা ডানা মেলে। বকের ডানার মতো মানুষের মন কেন সাদা হয় না?

নূপুরের জ্বর ভালো হয়ে গিয়েছে চারদিন আগে। মেয়েটা এখন শীতের পালংশাকের চেয়েও তরতাজা। চিন্তা শুধু টগরীকে নিয়ে। ভিকনাথ আর ঝারি রাতের আঁধারে গিয়েছিল মেয়েটাকে দেখতে। মমতা তাদের বসার কথা বললই না। ওর চোখে-মুখে কেমন রাগ-রাগ ভাব। যেন টগরীর অসুখের জন্য ঝারি আর ভিকনাথই দায়ী।

মনখারাপ করে রাতেরবেলায় ফিরে এসেছিল ওরা। ঘরে এসে ঝারি আর কান্নার বেগকে সামাল দিতে পারল না। ভিকনাথের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে সে অঝোরধারায় কাঁদল। গাঁয়ে অপবাদ নিয়ে মাথা উঁচিয়ে বেঁচে থাকা বড়ো দায়। ভিকনাথ ক্লান্ত গলায় বলল, তুমার যদি ইখানে থাকতে মন না চায়, চলো আমরা ইখান থিকে পেলিয়ে যাই। ইখানে আমাদের আচে কি? না ঘর না জমি কিচ্চু নেই। যেটুকু সম্পর্ক ছিল তাও অপবাদের ঘোলা জলে ভেসে গেল। এ কা একা কি কুনোমানুষ বাঁচতে পারে গো?

—কুথায় যাবে তুমি? ঝারি চোখ মুছে শুধিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে ভিকনাথ জবাব দিল, কেনে বসন্তপুর-ধাওড়া। ও জায়গাটা মন্দ লয়। বড়ো গঙ্গার বাতাস আসে। ওখানে কাজের কুনো অভাব হবেনি।

—ওখানে গিয়ে শান্তিতে থাকতে পারবা? ঝারির চোখে সন্দেহ।

ঢোক গিলে ভিকনাথ বলল, শুনেচি ওখানকার মানুষ ইখানকার মতন নয়। ওরা পরের মুখে ঝাল খায় না, নিজে ঝাল খেয়ে চেখে দেখে।

—ওখানে গেলে ভাবছ বদনাম সঙ্গে যাবে না? ঝারি ধারালো চোখে তাকাল, বদনাম কখনো পিছু হাঁটে না, পিছু-পিছু যায়। তুমি ভাবছ ওখানে গেলে শান্তি পাবে তাই না? সে গুড়ে বালি বুঝলে?

ঝারির কথায় দুঃখ থাকলেও এই কঠিন সত্যটাকে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই ভিকনাথের। মাটি কামড়ে পড়ে থাকার নামই তো বেঁচে থাকা। চলতে চলতে জীবনটা যে হঠাৎ এমন কঠিন হয়ে যাবে সে বুঝতে পারেনি। যখন বুঝতে পারল তখন হাতের বাইরে চলে গিয়েছে নিয়ন্ত্রণ। এরজন্য সে কাউকে দায়ী করে না, দায়ী করে তার পোকায় ধরা ভাগ্যকে।

জলঢালা ভাত খেতে বসে ঝারি বলল, একটা কাজ করলে হয় না।

ভিকনাথ উৎসাহিত হল, কী কাজ?

ঝারি বলল, চলো আমরা জানগুরুর কাছে যাই। ওখানে গিয়ে তার হাতে পায়ে ধরে মত বদল করাব।

—সে মানুষটা সিধা নয়। কুকুরের লেজের মতন তার মনটা বাঁকা। ভিকনাথের ঝড়ে নুয়ানো বিধ্বস্ত গলা।

ঝারি তবু ঘাবড়াল না, সে হোক। তবু আমাদের যাওয়া দরকার। মানুষটার মন ভিজলে আমাদের জীবনটাও ভিজে নরম হয়ে যাবে গো।

সারারাত নানান উৎকণ্ঠা আর চিন্তায় ঘুম হল না ঝারির। এই ঝড় যে কবে থামবে কে জানে। শীতের সকাল দেরিতে মুখ দেখায়। বুড়িগাঙের পাড়ে গাঙশালিকের গলার আওয়াজ ঘরে বসে শুনতে পায় ঝারি। পাখিগুলো সারাদিন ঝগড়া করে, না নিজেদের মধ্যে ভাব জমায় কিছুই বুঝতে পারে না ঝারি। ওরা জন্ম থেকে জোড়ায় জোড়ায় ঘোরে। ওদের ভালোবাসা জল মাটির চেয়েও সত্য।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখে বিড়ি ধরাল ভিকনাথ। কুয়াশার চেয়েও গাঢ় ধোঁয়ার

রাশি ঘর পেরিয়ে দাওয়ায় ঝুলে রইল অনেকক্ষণ। এ সময় হাওয়া সব সাহেবমাঠের দিকে চরতে গিয়েছে, রোদ্দুর তাই হলুদ শরীর নাচিয়ে কিৎকিৎ খেলছে জগৎখালি বাঁধের উপর। রোজ এ সময় অর্জুনগাছের গোড়ায় কামরাঙা ফলের মতো শির-জাগানো কেঠো-ফলগুলো ধুলোয় লুটিয়ে থাকে। অন্যদিন হলে ঝারি যেত ঝুড়ি নিয়ে সেই ফল কুড়োতে। অর্জুনের শুকনো ফলে ভালো আগুন হয়। মাঝে মাঝে ঝারির ঐ একলা গাছটার সঙ্গে নিজের শরীরটাকে মিলিয়ে দেখতে মন চায়। ওর গায়ের রঙের সাথে অর্জুনগাছের ত্বকের রঙও বুঝি মিলে যায়। এত ফর্সা গাছ এ তল্লাটে আর কটা আছে।

ঘর ছাড়তে সামান্য দেরি হলেও ওরা দ্রুত হেঁটে সে দেরিটাকে নিজেদের মতো করে মানিয়ে নেয়। জানগুরুর ঘরের সামনে এসে ঝারি ঢোঁক গিলে বলল, সাহস করে চলে এলাম বটে তবে এখুন বুকটা আমার থিরথির করে কাঁপচে। মনে হচ্চে কাজটা ঠিক হল না।

ভিকনাথ ঝারির মুখের দিকে ভরসার চোখে তাকাল, এসে যখন পড়েচি তখন অত ভেবে আর কি হবে? চলো যাওয়া যাক।

দাওয়ার উপর শিব হয়ে বসেছিল জানগুরু। ঝারি আর ভিকনাথ বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগ না দিয়ে লুটিয়ে পড়ল তার পায়ের উপর। ঝারি তার মোহনী সুরে বলল, গুরুজী, আমরা বহু দূর থেকে বহু আশা করে তুমার কাচে এয়েচি। তুমি আমাদের মেরেচো, ইবার তুমি আমাদের বাঁচাও।

—আমি তুদের মেরেচি। কে তোরা? জানগুরু গৌরচন্দ্র ঊর্ধ্বমুখী তাকাল।

ভিকনাথ গাঁয়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে, হাতজোড় করে সে বলল, বাবা গো, তুমার দিব্যি দিয়ে বলচি, আমাদের ঘরে কুনো ভূত-প্রেত নেই। তুমার রায় তুমি ফিরিয়ে নাও, আমাদের বাঁচাও।

—আমি বাঁচাবার কে? বাঁচাবে যে সে তো উপরে উঠে বসে আচে। সে ব্যাটা তো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অদ্ভুত মুখ করে হেসে উঠল জানগুরু।

ঝারি তার পা ছাড়েনি তখনো, জেদ ধরে বলল, না বাঁচালে আমি তুমার পায়ে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকব। আমি আমার এ জীবন তোমার এখানেই হারাব—

—আরে না, না। বলেই জানগুরু গৌরচন্দ্র ঝারির ফুলেল উন্মুক্ত বাহু দুটো দু হাত দিয়ে চেপে ধরল, অমনি তার মুঠো দুটো ঝারির মাখন শরীরে ঢুকে গিয়ে শরীরে উষ্ণপ্রবাহ বইয়ে দিল। এই এত বয়সেও চার ঠুকরান মাছের মতো অস্থির হয়ে উঠল জানগুরুর শ্যাওলা ধরা মনটা। ঝারির মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে থ হয়ে গেল তার চোখের তারা। ধাওড়াপাড়ায় এমন যাত্রাদলের সখী-চেহারার মেয়ে থাকে? আহা, কতদিন নজরকাড়া সুন্দরীর মুখ দেখেনি সে। বউটা সাত তাড়াতাড়ি পটল তুলে তার যৌবনকে সাপের মাথার মতো থেঁতলে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু সাপ মরল, বিষ রয়ে গেল মনের ভেতর। সেই বিষ দিনে দিনে কাল হল, কাল থেকে হল মহাকাল। কুলবেড়িয়ার বউটার ভূত খেদাতে গিয়ে বদ্ধ ঘরে সবে বউটাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই ভূতে ধরা বউটাই তার মতিগতি বুঝে না চেঁচিয়ে কামড়ে দিল পুরুষাঙ্গে, খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলেছিল, যা ঢ্যামনার ছা, তোরে আমি ক্ষামি করে দিলাম। এবার থেকে যার গায়ে হাত দিবি এই ক্ষামি তোকে বারবার চেতন দেবে। নিজেকে না সামলালে মরবি তুই, মরবি। বলেই লাথ মেরে আছড়ে ফেলে দিয়েছিল কবাটের উপর, ঘন ঘন শ্বাস ফেলে বাঘিনীর তেজে বলেছিল, যা পালা, দেরি হলে তোর পিঠের চামড়ায় গাঁয়ের মানুষ ঢাক বাজাবে। পড়িমড়ি করে দরজা খুলে জান বাঁচিয়েছিল জানগুরু গৌরচন্দ্র।

এমন ঘটনা তার জীবনে প্রথম নয়। ভূষণী বুড়িও তার যৌবনে শিকার হয়েছিল। ঝাঁড়ফুকের নাম করে গৌরচন্দ্র তার উপর চড়ে বসেছিল ষাঁড়ের মতো। চিকিৎসার অঙ্গ ভেবে মুখে কুলুপ এঁটে সব সয়ে নিয়েছিল ভূষণী। পরে শরীরের তাপ শরীর শুষে নিতেই সে টের পায় বাঁধ ভেঙে গেছে দুজনের। সে যাত্রায় ভুষণী রক্ষা পায় ভাগ্যের জোরে। সব বীজে যে ফসল হয় এমন নয়। ভুষণী দয়ালের চোখে সতীত্ব না হারালেও মনে মনে সে নিজেকে একটা নষ্ট মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবত না। দয়াল যখন সরল মনে বলত, তুমি আমার ঘরের নক্ষী গো, তুমি আমার টুসু তুমি আমার ভাদু গো? তখন নাকের সকড়ি টেনে চোখের জলের ছায়ায় উদাস হয়ে যেত ভূষণী। দয়াল তার গায়ে গতরে ভালোবাসার হাত বুলিয়ে দিয়ে বলত, কেঁদো না গো, কেঁদো না, তুমি কাঁদলে আমার দেশ-দুনিয়া আন্‌ধার হয়ে যায়।

ঝারিকে দু-হাতের ভরে মুখোমুখি দাঁড় করাল গৌরচন্দ্র, ওর চন্দ্রিমাভরা মুখের দিকে তাকিয়ে মরাগাঙে জোয়ার আসা গৌরচন্দ্র বলল, তুই ভাবিস নে, ঘর যা। আসচে অমাবস্যায় আমি তোর ঘর যাবো। যা করার গাঁয়ের দশ মাথাকে শুনিয়ে করতে হবে। এখান থেকে আমি রায় তুলে নিলে চলবেনি। মানুষ তা মানবেই বা কেনে?

ঝারি তার চোখের জল মুছে নিয়ে বলল, তাই যেন হয় গুরুজী। যে শেল আমার বুকে বিঁধে আচে, সেই যন্ত্রণা থেকে আমরা যেন সাত তাড়াতাড়ি রেহাই পাই। আমি জানি তুমি ছাড়া আমাকে কেউ এ যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে পারবে না।

—বাঁচাবো রে, বাঁচাবো। ধৈর্য ধর। গৌরচন্দ্র জানগুরু ঝারির মাথায় ভরসার হাত বুলিয়ে দিল।

অমাবস্যার দিনে সভা বসল পাকুড়তলায়। জানগুরু গৌরচন্দ্র তার ঝোলা নেড়ে বলল, আমার কথা নড়চড় হবে নি। আজ আমি হলদিপোঁতায় এয়েচি ভূত নামাব বলে। সবার অনুমতি যদি থাকে তাহলে আমি ভূত খেদিয়ে রাতে রাতেই ঘাসুরিডাঙায় ফিরব।

সবাই হৈ-হৈ করে অনুমতি দেয় গৌরচন্দ্রকে। ভিকনাথ তার ঝোলা বয়ে নিয়ে যায় ঘর অবধি। আঁধার নেমে আসে চারধারে। ভয় এসে ভিকনাথকে ঝাঁকায়। ঝারির শরীরের ভূতটা নাকি ভয়ঙ্কর। অনেকক্ষণ ধরে ঝাড়ফুঁক করার দরকার। ঘরের ভেতর হোম- যজ্ঞ-পূজাপাঠ সব হবে।

গৌরচন্দ্র ঝারিকে ঠেলা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দরজার খিল তুলে দেয়।

চাপা গলায় বলে, আমার দিকে তাকা। লাজ করবি নে।

ঝারি থরথর করে কাঁপছে। বেলকাঠের ধুঁয়োয় ভরে যাচ্ছে ঘর। মাটির ঘরটায় হাওয়া বাতাস খেলার একটাও খিড়কি নেই। কী ভাবে যেন একটা চামচিকি ঢুকে গিয়েছে ঘরের ভেতর, শুধু ফরফর করে উড়ছে, মাঝে মাঝে নেমে আসছে মেঝের কাছাকাছি।

ঝারির চোখে ধোঁয়া ঢুকে বের করে আনছে জল। সম্মোহনী কণ্ঠে গৌরচন্দ্র হুংকার ছাড়ে, আর লয় রে, আর লয়, তুর ইবার চোখ মুদার পালা। চোখ বুজ, চোখ বুজ। চোখ বুজে তালাইয়ের উপর শুয়ে পড়। তুর সব অঙ্গে ভূত লকলকায়, যার জন্যি তুর ছানাপুনা হচ্চেনি, হলে সব মরে যাচ্চে...। আমি ভূত খেদাব, তুই চটপট শুয়ে পড়।

লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ঝারি ছেঁড়া তালাইয়ে বিছিয়ে দেয় তার শরীর। তার মুখের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে জানগুরু। একটানা মন্ত্র আউড়ে সে তীব্র ফুঃ দেয় ঝারির চোখের উপর, চোখ থিকে যা, চোখ থিকে যা। ক্রমাগত চলতে থাকে ফুঁ-য়ের মহড়া। ফুঁ দিতে দিতে গৌরচন্দ্র নেমে আসে ঝারির খোলা বুকে। ঝারি দু-হাত বুকের উপর চেপে লজ্জাকে ডিঙানোর চেষ্টা করে। গৌরচন্দ্র জানগুরু তাকে সেই সুযোগ দেয় না। ঝারির ভড়ন্ত গোলাপী বুকে সে জানোয়ারের মতন লেহন

করতে থাকে জিহ্বা। ঝারি দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যেতে থাকে। কামাতুর হেসে গৌরচন্দ্র ফিসফিস করে বলে, এবার পেলুবে, এবার পেলুবে। তোরে ছেড়ে গেলে সে, আবার গর্ভ ভরবে তুর। শরীরটা নরম কর, আরো নরম কর। যত নরম হবে শরীল, তত ভুসভুসে হবে দেহ। ঝুরো মাটিতে চাষ ভালো হয়। বীজ খেলে রে...তুই আবার কানায় কানায় ভরে উঠবি। কথা ফুরোল না তার আগে জ্বলন্ত বেলকাঠের খণ্ডটা তুলে নিয়ে ঝারির নাভিদেশে একবার ছুঁইয়ে চকিতে তুলে নেয় জানগুরু। বিস্ফারিত নয়নে সে দেখতে থাকে ঝারির গোপন-সৌন্দর্য। কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ঝারি বাঁচার জন্য ঠোঁট কামড়ে ধরেছে নিজের, গুরুজী, ইবার আমাকে ছেড়ে দাও গো, আর পারি নে।

—হেরে যাবি, তুকে পারতেই হবে। এ ক্ষণ আর আসবেনি। পা-টারে ঢিলা ছাড়, আর এট্টু আর এট্টু।

ঝারির মাথার ভেতর পাহাড়ী মৌমাছির মতো বনবনিয়ে ওড়ে অপবাদ। অপবাদ তার জন্মগত। এ শরীর তার নিজের হয়েও নিজের নয়। হায় ভগবান। কেন এত রূপ দিলে গো দেহে। যদিও বা দিলে ধরে রাখার মন্ত্র দিলে না কেন?

ঝারি পা আলগা করে শুয়ে আছে আঁধারে, জানগুরু পা দিয়ে উল্টে দেয় ডিবরিটা। কেরোসিনে ভিজে যেতে থাকে মেঝে। চেনা গন্ধ। এ গন্ধ কি শুধু কেরোসিনের?

ঝারি টের পায় শুধু মেঝে নয়, তার শরীরও ভিজে গিয়েছে পুরুষবর্ষণে। মুষলধারার বৃষ্টিপাতে প্লাবিত হতে থাকে সে। শুধু অমৃত নয়, গরলও উঠে আসে মন্থনে। ক্লান্ত শরীরে পেঁচিয়ে ওঠে ঘৃণার সাপ। তবু চুপচাপ হাত-পা এলিয়ে মাটির মতো শুয়ে থাকে সে। মাটিও মা হতে চায়।

গৌরচন্দ্র ধুতি সামলে বলে, মুখের ঘাম মুছে লে। তোর শরীরের ভূত আমি আমার নিজের শরীরে পুরে নিয়েছি। আজ থিকে তুরে আর এট্টা ভূত তাড়াবে। সে তুরে মা-মা বলে ডাকবে। কেউ জানবে না, শুধু তুই জানবি—সে ভূতটার বাপ গৌরচন্দ্র জানগুরু। একথা দুকান হলে তোরে আবার ভূতে ধরবে।

ঘরের খিলকাঠ আলগা করে দিয়ে ঝারিকে চুলের মুঠি ধরে বাইরে এনে হুমড়ি দিয়ে ফেলে দিল গৌরচন্দ্র জানগুরু, গর্জন করে বলল, আর ভয় নেই, ভূত পেলিয়েচে। পেলবে না মানে? বনের বাঘ জব্দ হয়, আর এতো এগার হাত কাপড়ে নেংটো হওয়া মেয়েমানুষ!

বিশুর মন ভালো না থাকলে ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে চলে যায় সে। গত রাতেও টগরী পেট আঁকড়ে কাঁদল। কাঁদতে-কাঁদতে হোঁক লেগে যাচ্ছিল মেয়েটার। মমতা মেয়ের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে কপাল চাপড়ে বলল, কার যে কু-নজর লাগলো বুঝতে পারচি না গো। মেয়েটার এত কষ্ট আমার চোখে সয় না। ওঃ ভগবান, তুমি ওর কষ্ট আমারে দাও।

টগরী দাঁতে দাঁত চিপে ব্যথা হজম করার চেষ্টায় ছিল। এ কাজে সামান্য সফল হতে সে বলল, মাগো, আজ বড়ো শিউলির কথা মনে পড়চে।

আঁতকে উঠল মমতা, নিমেষে চুপসে গিয়ে বলল, ওর কতা মনে আনিসনে মা। ওর কথা ভাবলে

আমি এখনও শিউরে উঠি। এত কষ্ট নিয়ে মেয়েটা মরল যা ভাবা যায় না।

ছাতিমগাছে ফুল ফুটেছে থোকা থোকা, ফুলগুলোর এমন শোভা যেন সাদা ফুলগুলো হালকা সবুজ জলে চুবানো। ছাতিমফুলের গন্ধটা হাওয়া বইলে বাড়ে। অনেকদূর পর্যন্ত তার যাতায়াত। অন্যসময় হলে এই সামান্য বিষয়টা নজর এড়িয়ে যেত মমতার। আজ যেন সে নিজেকে এর থেকে মুক্ত করতে পারে না। পথের পাশের ঝাঁকড়া মাথার ছাতিমগাছটাকে মনে হয় যেন তার ঘরের মেয়ে টগরী। এতদিন খেলত ঘুরত হাসত ফলে তার দিকে কেউ তেমন ভাবে ফিরে তাকায়নি। আজ বিছানা নেবার পর থেকে টগরীর গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে সবার কাছে।

বিকেলে হরনাথ এসেছিল তার ভিটেবাড়ি দেখার জন্য। গাঁয়ে ঢোকার আগে প্রতিবারই সে চুল্লরসে পেট ভরিয়ে আসে। ফলে কথা বলার সময় মুখ দিয়ে ভকভকিয়ে দুর্গন্ধ বেরয়, সামনে কেউ তিষ্টুতে পারে না। মমতা দূর থেকেই কথা বলছিল, এট্টা কথা বলব দাদা, যদি কিচু মনে না করো।

মমতার লতানে কথায় হরনাথের মনে কোনো দাগ কাটে না, হ্যাঁ-হ্যাঁ যা বলার বলো।

কথা শোনার জন্যি তো গাঁয়ে আসি গো।

সাহস পেয়ে মমতা বলল, শ্মশানে কি মানুষ বাস করতে পারে গো। দু-চার দিন থাকলে এক কথা, মাসের পর মাস কি সিখানে থাকা যায়? তাই বলছিলাম ওসব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে ঘরে চলে আসো। কাঁথ দেওয়াল তো ধসে ধসে পড়চে, আবার নতুন করে দেওয়াল গাঁথো।

—নদীর পাড় ধসে গেলে আবার কি পাড় জোড়া যায় গো? হরনাথের ব্যথাতুর চোখ।

মমতা বলল, লোকের শোক বুকে নিয়ে বয়ে বেড়াতে-বেড়াতে তুমি যে একদিন পাথর হয়ে যাবে। এখনও সময় আছে গাঁয়ে ফিরে আসো। আবার ভাঙাঘর নতুন করে জোড়া লাগাও।

হরনাথ মলিন হেসে জবাব দেয়, তা আর সম্ভব নয়। যে ঢেউ চলে যায়, সেই ঢেউ কি ফেরানো যায়?

টগরী শুয়ে শুয়ে হরনাথকে দেখছিল, যত দেখে তত আজব মনে হয় মানুষটাকে। শিউলি বেঁচে থাকতে এই মানুষটা তাদের মেলায় নিয়ে যেত হাত ধরে। পাঁপড়, শুকনো মিষ্টি কিনে দিত খুশি হয়ে। বলত, তোরা খা। আরও লাগলে আরও দেব। বেলুন নিবি, মা?

—না গো, বেলুন নিবোনি। বেলুন নিলে ফেটে যায়। টগরী ঘাড় নেড়ে বলত, বেলুন ফেটে গেলে আমার খুব মন খারাপ করে। বেলুন ফেটে গেলে বেলুনের জান চলে যায়। তখন কিচু আর ভালো লাগে না।

কথায় কথায় হরনাথ জেনে যায় টগরীর অসুখের কথা। সব শুনে হরনাথের মন খারাপ করলেও সে সাহস দিয়ে বলে, রোগজ্বালা কার নেই? ওসব ঠিক হয়ে যাবে গো। গোরা সাধু ইখানে থাকলে তার হাতে-পায়ে ধরে আমি তুমাদের কাছে ঠিক নিয়ে আসতাম। সে তো খপর না দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। এখন মা গঙ্গাই জানে সে কুথায় আচে। তবে এট্টা কথা বলি গো, ওই মানুষটার জন্যি আমার বুকটা প্রায় দিন হাহাকার করে। খুব মনে পড়ে ওর কথা।

গোরা সাধুর কথা মমতার কানে গিয়েছে, কিন্তু সময় করে তাকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয় নি তার। ওই নির্লোভ মানুষটার কথাতেই অনেক মানুষ আরোগ্যের পথ পেয়ে যেত। কী ভাবে পেত, কেমন করে পেত-এসব তথ্য এখনও অজানা।

হরনাথ টগরীর মুখের দিকে তাকিয়ে আফসোস করে বলল, সবই ভাগ্য! নাহলে তোরই বা কেন এমন হবে। তবে ভাবিস নে মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

টগরী কথা না বলে বোবার মতো তাকাল। হরনাথ শুধালো, বিশুকে দেখচি না তো, সে কুথায় পালালো?

—পালাবে কেন দাদা, সে তার ধান্দায় গিয়েচে। পেট তো কথা শোনে না, তার জন্য যোগাড় তো চাই। ঘরে বসে থাকলে সে জোগাড় হবে কি করে?

—তা ঠিক। তবে—। হরনাথ থামল, টগরীর চিকিৎসার জন্য ভেবো না, টাকা যা লাগে আমি দেব। দরকার পড়লে আমার এই ভিটেবাড়ি সব বেচে দেব। মেয়ে আগে না ভিটেবাড়ি আগে বল তো?

মমতার হাঁ হয়ে যাওয়া দৃষ্টি, দাদা, তুমি আমার মেয়েটারে এত ভালোবাস?

—ও শুধু তোমার বা বিশুর মেয়ে নয়, ও সবার মেয়ে। ও আমার শিউলির জোড়া। ওকে দেখলে আমি শিউলির দুঃখ ভুলে যাই। হরনাথ স্মৃতির পুকুরে ডুব দিল। মেয়েটা আমার ভাগ্যে সইলো না। বড়ো চোট দিয়ে চলে গেল। ওর কথা আমি এখনও ভুলিনি। ও আমার মনটাকে বড়ো দুবলা করে দিয়ে গেল।

হরনাথ চলে যাওয়ার পর মমতা সংসারের কাজে মন দিতে পারে না। টগরীকে নিয়ে তার চিন্তার শেষ নেই। কালীগঞ্জ হাসপাতালের ডাক্তার মুখের উপর বলে দিল, আর দেরি না করে ওকে একবার কৃষ্ণনগরে নিয়ে যাও। গ্রামের হাসপাতালে এর চেয়ে বেশি কিছু করা যাবে না।

বিশু ঘাড় কাত করে শুনল। মমতা বলল, চিন্তা করে আর কী হবে। ডাক্তারবাবু যখন বলচে তখন একবার নিয়ে যাওয়াই দরকার। বাবারও বাবা আচে।

বিশু শূন্য চোখে তাকাল, নিয়ে যাওয়ার কথা আমিও ভাবছি কিন্তু হাত একেবারে ফাঁকা। বাসভাড়া নেই। তাছাড়া আমি একা গেলে চলবে না। সঙ্গে আর কাউকে নিতে হবে। কৃষ্ণনগর মস্ত শহর। সেখানকার আমি কিচু চিনি না।

বাঁধ ধরে ফেরার সময় মমতার মুখে কোনো কথা নেই। ভূত-প্রেতের গল্প এখন ফিকে হয়ে গেছে পাড়ায়। যারা জ্বরে পড়েছিল তারা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়। সবার সব ঠিক হয়ে গেল শুধু টগরীর শরীরটাই যা সারল না।

বিড়ি ধরিয়ে বিশু বলল, টাকার জন্যি কার কাছে যাওয়া যায় বল তো?

অনেক ভেবে মমতা লুলারামের নামটা বলল। কিন্তু খুশি হল না বিশু। লুলারামকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। ওর মতন ধান্দাবাজ মানুষ এ পাড়ায় আর দুটি নেই। ও একটা শয়তানের গাছ। মন্দবুদ্ধিতে ওর সঙ্গে পেরে উঠবে কে? অমন মানুষের কাছে টাকা ধার নেওয়ার অর্থ বিপদকে ঘরে এনে তোলা। বিশু তাই নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলল, লুলারামের কাছে টাকা ধার আমি নিবোনি। ও মানুষ ভালো নয়, মতের মিল না হলে ও আমাকে বিপদে ফেলে দেবে। তখন আমও যাবে, ছ্যালাও যাবে।

—তাহলে হরদার কাচে চলে যাও।

মমতার কথা শুনে খুব অবাক হল বিশু, হরদার কাচে যাবো—তার মানে?

—হরদা নিজে ঘর বয়ে এসে বলে গেল টগরীর চিকিৎসা খরচা সে দেবে। দায়ে অদায়ে তাকে যেন খবর দেওয়া হয়।

তবু ইতস্তত ভাব কিছুতেই ঘুচল না বিশুর। সে শ্বাস নিয়ে কিছু সময় অন্যমনস্ক হয়ে ভাবল। তারপর নিজের মনেই বলল, তুমি যখন বলচো তখন আমি যাব। লুলারামের চেয়ে হরদার মন আরও অনেক বেশি সাদা। ভালো মানুষের কাচে হাত পাতলে প'প হয় না।

—বিপদের সময় পাপ-পুণ্য বিচার করতে যেও না। মমতার অসহ্য লাগছিল বিশুর যুক্তিগুলো, আমরা নিজেরা পাপ না করলেই হল। পরের হাঁড়ির খোঁজ নিয়ে নিজেদের হাঁড়ির তলা ফাঁসানো

উচিত হবে না। মমতা বিশুর সামনে থেকে উঠে গিয়ে টগরীর বিছানার এক কোণে গিয়ে বসল।

টগরী তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দুম করে বলে বসল, মা, তুমরা আমাকে নিযে ভেবো না। আমি ঠিক ভালো হয়ে যাব। আমার মন বলচে আমার খাবাপ কিচু হয়নি।

—তাই যেন হয়। ঠোঁট থরথরিয়ে উঠল মমতার।

হরনাথ তার জমানো টাকাগুলো বিশুর হাতে তুলে দিযে বলল, একদিন এই টাকাব জন্য গাঁ ছেড়ে ভিন দেশে গিয়েচি। এত করেও মেয়েকে, বউকে বাঁচাতে পারলাম না। আমার এই টাকা যদি টগরীর কিচু কাজে লাগে তাহলে আমার চাইতে আর কেউ বেশি খুশি হবে না।

কথাগুলোয় এত দরদ ছিল বিশু আর চোখের জল আটকে রাখতে পারল না, নিজেকে সামলে সে বলল, আগের জন্মে তুমি আমার আপন দাদা ছিলে গো। নিজের দাদা না হলে এভাবে ভাইয়ের বিপদে কেউ এগিয়ে আসে!

হরনাথ বলল, ওসব কথা বলে আমাকে আর লজ্জা দিও না। আমি শ্মশান-ডোম। আমার চিন্তা আর কত ভালো হবে বলো। শ্মশানের ধোঁয়ার চেয়েও কুচুটে আমার মন। তবে কি জানো, মা গঙ্গাবুড়ির দয়ায় আমাদের টগরী ভালো হয়ে যাবে। আর দেরি না করে কালই তুমি ওকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে যাও।

শহরের হাসপাতালটা মস্ত বড়ো। দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বড়ো জায়গায় বড়ো ব্যবস্থা। মমতা বলল, টাকা খরচ হল তো কি আচে? হাতি যেমন খায় তেমন নাদে।

রিপোর্ট দেখে বড়ো ডাক্তার খুশি হয়ে বললেন, ভয়ের কিছু নেই। অপারেশনের দরকার হবে না। ওষুধেই পেটের ব্যথা সেরে যাবে।

হাসপাতালের গেট থেকে বেরিয়ে বড়ো হালকাবোধ হচ্ছিল বিশুর। এতদিনের পাথরচাপা দশাটার যেন মুক্তি ঘটল। মমতা খুশি হয়ে বলল, ডাক্তারবাবু বলেচে—তিন দিন পরে টগরীকে ছেড়ে দেবে। তুমি ঘরে ফিরে যাও। আমি তিন দিন তিন রাত্রি হাসপাতালে কাটিয়ে দেব।

—তা কি করে হয়? ঘরে আমার মন টিঁকবে? যা হয় হোক-আমি এখানেই থাকব। বিশুর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল জেদ।

মমতা তাকে চাঙ্গা করার জন্য বলল, চলো, আজ মাটির ভাঁড়ে চা খাবো। রোজ তো ঘরে চা খাই, আজ দোকানের চা-খেয়ে দেখি কেমুন এর সুয়াদ। মনে মনে খুশি হল বিশু। মমতার এত খুশি খুশি ভাব এর আগে তার নজরে পড়েনি। মানুষ কত ছোট ছোট ব্যাপারে আনন্দ পায়, আর সেই আনন্দের ভাগ সে সবাইকে দিতে পারে। এ যেন অনেকটা ফুলের গন্ধ ছড়ানোর মতো।

চা-খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে গেল স্টেশনের কাছে। রেলিঙ ঘেরা জায়গাটায় ঝকমক করছে আলো। ওরা কেউ এর আগে ট্রেন দেখেনি। ট্রেনের গল্প শুনেছে দুলুর মুখে। সেই রোমাঞ্চকর গল্প গেঁথে আছে মগজে।

শেয়ালদা থেকে লালগোলা ট্রেন এসে থেমেছে কৃষ্ণনগর স্টেশনে। মাইকে সে কথাই বারবার বলছে ঘোষক।

মমতা সেই লাল চুবানো গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল বিস্ফারিত চোখে। বিশুরও অবস্থা তথৈবচঃ। স্টিম ইঞ্জিনের হুসহাস শব্দ রাগী সাপের নিঃশ্বাস হয়ে আছড়ে পড়ছে বাতাসে।

মমতার মন কেমন করে উঠল, ওগো শুনচো, যাওয়ার সময় দেবগ্রাম অব্দি টেরেনে গেলে হয় না?

বিশু ঘাড় নাড়তেই মমতা উৎসাহভরে বলল, মেয়েটা জীবনে কুনোদিন টেরেন দেখিনি। বে-থা

হয়ে গেলে কুথায় গিয়ে পড়বে কে জানে! দু-বেলা খেতে পাবে কি না তাও সন্দেহ!

—তাহলে আমরা যাওয়ার সময় টেরেনেই যাব। নাটকীয় গলা করে হেসে উঠল বিশু। মমতা কোন ফাঁকে তার হাতটা ছুঁয়ে দিয়েছে, খুব মজা হবে তাই না? দুলু বলেছিল—টেরেন গান গায় সব সময়।

মনোযোগ দিয়ে শুনল বিশু, টেরেন যে গান গায় এ আমি প্রথম শুনলাম।

—তুমি বুঝি জানতে না? মমতার শরীর ভার বুক সমেত ঝুঁকে এল, টেরেন যে গানটা গায়—সে গানটা আমার জানা। যাচ্ছি যাবো, যাচ্ছি যাবো। কাঁচা তেঁতুল, পাকা তেঁতুল। কু ঝিক ঝিক করমচা। ভয়ে ওড়ে কাদা খোচা। কু' ঝিক ঝিক করমচা।

মমতার গান শুনে অনেকদিন পরে প্রাণ খুলে হেসে উঠল বিশু। মেঘ সরে গেল তার আকাশ থেকে।

খরার আকাশ যে এমন বৃষ্টির খবর বয়ে আনে কে জানত।

ঝারি শরীরে জাল বিছিয়ে ধরতে চাইছিল সেই সুখের মাছটাকে। মাছটা বারবার ফসকে যায় তার হাত থেকে। একেবারে পালিয়ে না গিয়ে কিছু দূরে গিয়ে সাঁতার কাটে। ঝারি টের পায়, স্পষ্ট টের পায়, তার শরীর জুড়ে সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সেই দুষ্টু মাছটা। এটা কিভাবে সম্ভব—ঝারি বুঝতে পারে না কিছুতে। নিজের শরীরটাকে তার মনে হয় নিজের নয়। আশ্বিনের তুলো মেঘের মতো এই শরীর এখন হালকা তবু তার নজরকাড়া রূপভঙ্গি এক ফোঁটাও কমেনি।

জানগুরু যাওয়ার সময় একলা পেয়ে বলেছিল, তোরে আমি যে সুখ দিয়ে গেলাম সেই সুখ আমার বউও পায়নি। তবে একথাও ঠিক তুই আমারে যে সুখ দিলি আমার বউ আমাকে একদিনের জন্যি দিতে পারেনি। তোর কোল ভরবে, তুই কোলভরা হবি—আমার আশীর্বাদ রইল।

জানগুরু চলে যাওয়ার পর মনটা উদাস হয়ে গিয়েছিল ঝারির। লুলারাম বা ভিকনাথ যা এত বছরে পারেনি জানগুরু সেই জন্মদাগ রেখে গেল অনায়াসে। বদ্ধঘরে ঝারি টের পেয়েছিল তার শরীরে ভূমিকম্প হচ্ছে, মাটি ফাটিয়ে উঠে আসছে অমৃত, সৃষ্টিময় লাভা উদ্‌গীরণে কেঁপে যাচ্ছে সর্বসত্তা। পুরুষ হারে না, নারীও হারে না, এমন দ্বৈরথ এ ভূমিতে খুবই কমই সংঘটিত হয়।

যে ঘৃণা জানগুরুর প্রতি ঝারি জমিয়ে রেখেছিল তা অমৃতমন্থনের অন্তিম মুহূর্তে উবে যায়। ঝারির ক্ষুদ্র জীবন কানায় কানায় ভরে ওঠে, রাতের পদ্মফুলের চেয়েও কোমল হয়ে ওঠে তার তন্বী শরীর। মাটির ঘরে ছড়িয়ে দেয় অপ্রতিরোধ্য সুগন্ধ। তার নির্মেদ রমণীয় শরীর বক্ষদেশের আবরণ ভেদ করে শেষ বর্ষার ছাতুর মতো পুরুষের সুউন্নত বক্ষে লেপটে যায় অনায়াসে। শরীরের কমনীয় কুসুম পাপড়ি মেলে দেয় অজান্তে, এক চৌম্বকীয় ধর্মে সে আকর্ষণ করে পুরুষের আদিম রিপুর তাড়নায় মত্ত হয়ে ওঠা আগুন নদী। দীর্ঘ সাঁতারেও ক্লান্তবোধ করে না জানগুরু। মাটির গভীর থেকে তুলে আনে কামনার জল। ঝারির মুখের কাছে সে মুখ ঘষতে-ঘষতে বলে,এবার তুই মা হবি, জননী হবি। আমি তোকে দেগে দিলাম। তুই তোর নগ্ন স্তনের দিকে তাকলে আমার শরীলের গন্ধ পাবি। আজ থেকে তুই আমার বকুলগাছ।

শরীর ভাঙে না, শরীর গড়ে। ক্রমশ উজ্জ্বল হয় ঝারির দেহশোভা। সেই সুখের দিনটার জন্য শরীরের ঝর্নায় ছিপ পেতে বসে থাকে ঝারি। উন্নত সুগঠিত বক্ষদেশের স্পন্দনে সে অনুভব করে খরার আকাশেও বিন্দু বিন্দু মেঘের সঞ্চার ঘটেছে, সময়ে বৃষ্টি নামবে, ভিজে যাবে কঠিন মাটি, একটি অপাপবিদ্ধ অঙ্কুর মাথা তুলে দাঁড়াবে তার নাভিজুড়ে।

ঝারি বুঝতে পারল তার সাধারণ দেহসৌষ্ঠব আজ অসাধারণ হয়ে উঠছে কিসের যাদু ছোঁয়ায়,

তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে তার এতদিনের শরীর সাধনা। আগুন কি ঘিয়ের দিকে ছুটে যায় নাকি ঘি-ই আগুনকে জড়িয়ে ধরে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ঝারি আরও কয়েক জন্ম নারী হয়ে জন্মাতে চায়।

তার অনুভূতির কথা বিছানায় টের পেয়ে যায় ভিকনাথ। প্রমত্ত বাসনায় অস্থির ঝারিকে সে পাগলের মতো লেহন করতে থাকে, আঁধারে তার হাত থেমে যায় ঝারির নাভির কাছে। ঝারি খিলখিলিয়ে ফুলভর্তি গাছের ডালের মতো হেসে ওঠে, তুমারে এট্টা খপর দিব, তবে এখুন নয়, আরও কিছুদিন পরে, খবরটা শুনে তুমি নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাবে বলে দিলাম।

এ রহস্য ধাঁধার উত্তর জানে না ভিকনাথ, সে অন্ধকার খায়, অন্ধকারে হাতড়ায়। তারপর ঝারির শরীরে নিজের শরীর নোঙর করে বলে, আমার মন বলচে তুমার মরা গাঙে আবার বান আসবে। আমার পুড়া সন্‌সার আবার নতুন করে শ্বাস লিয়ে বাঁচবে।

পরের দিন সকালে ঝারি তাকে টানকে টানতে নিয়ে যায় শীতলাতলায়। তারপর দণ্ডবত করে বলে, মনে মনে যা চাওয়ার চেয়ে নাও। আজ যা চাইবা সব পাবা। শীতলাবুড়ি আজকের দিনে কাউকে খালি হাতে ফেরায় না।

ভিকনাথ বুঝেই ঘোরের মাথায় হাতজোড় করে দাঁড়াল। বিপদ কেটে গিয়ে সুখের রোদ উঠছে। মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে রোদ্দুরের রঙ। রোদ্দুরের রঙ বদল হলে এ শরীরের রঙ বদল হতে কতক্ষণ।

ঝারি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তার প্রায় উন্মুক্ত দেহশোভা প্রকৃতি মুগ্ধ হয়ে দেখল। তৃপ্তি ওদের সারা শরীরে চুঁইয়ে নামছে। এমন সংবাদ গাঁয়ের সবাইকে বিতরণ করা প্রয়োজন। বাতাস মেতে উঠল সেই আনন্দযজ্ঞের একজন যথার্থ সাক্ষী হয়ে।

লুলারাম খবর পাঠিয়েছিল রাতের বেলায় ঝারিকে কদমতলায় আসার জন্য। আসব না আসব না করেও দ্বিধা সরিয়ে চলে এসেছে ঝারি। বুড়িগাঙের সুস্থির জলের দিকে তাকিয়ে তার নিজেকে বড়ো চঞ্চলা মনে হল। চঞ্চল মন, পাপের বন। অনেকদিন পরে ঝারির মনে হল—সে ভুল করছে। এ পথে তার আর না হাঁটাই উচিত। ঢিলি বউদি অভিমান নিয়ে চলে গিয়েছে। ভিকনাথও অভিশাপ দিয়ে চলে যাক সে চায় না। আত্মশুদ্ধির অনেকপথ এখনও তার জন্য খোলা আছে।

লুলারাম নেশায় টলতে টলতে অন্ধকার চিরে এগিয়ে এল। কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল ওর। ঝারির হাত ধরে জোরে চাপ দিয়ে বলল, আমি মরে যাব, আমি মরে যাব। তুমারে না পেলে আমার জেবন খড়ের চেয়েও শুকনা হয়ে যাবে। ঝারি, আমি তুমার পায়ে ধরি। চলো ইখান থিকে আমরা পালিয়ে যাই। ইখানে থাকলে বেচারা ভিকনাথ অঘোরে আমার হাতে মারা পড়বে। ঝারির শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল। স্তনাভারে ন্যুব্জ হয়ে বলল, এ গাঁ ছেড়ে আমার আর কুথাও যাওয়া সম্ভব নয়। বুড়িগাঙ কী কুথাও গিয়েচে যে আমিও যাবো?

খুব অবাক হল লুলারাম, তুমার জন্যি ঢিলিকে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম পাগল বানিয়ে। বউটা আমার জন্যি মরল। তার মরণের জন্য তুমিও দায়ী।

—আমি কেনে দায়ী হতে যাবো। ঝারির চোখ থেকে রাগে তারা খসে পড়ল, সে তুমার পাপে মরেচে। আমি নিজে ভিখারী হয়ে তুমাকে রাজা সাজিয়েচি। রাজার ধর্ম তুমি রাখো নি। মানুষের ধর্মও তুমি রাখোনি। তুমি পাপী। তুমার ছায়ায় আমার এখন দাঁড়ানো উচিত নয়।

—মাগী, তুর এত বড়ো কথা? অন্ধকারে পশুর মতো হাঁপায় লুলারাম।

ঝারি তাকে দু'হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে গড়িয়ে দেয় বুড়িগাঙের পায়ের নীচে। অন্ধকারে সেগুন কাঠের খুঁটির মতো গড়িয়ে যেতে থাকে লুলারাম। তবু তার মুখে কোনো চিৎকার নেই। লোকলজ্জার ভয়টা তাকে বোবা করে দিয়েছে। বোবারা যদি ভয় পায় সেই ভয় মনের গহীনে শেকড় চালিয়ে দেয় আমৃত্যু। নিকষ আঁধারে লুলারাম খুঁজতে থাকে মৃত্যুর আদি রঙ।

এক ফোঁটা চোখের জলের মূল্য বুঝতে পারে না অবনী, মন কেমন করা চোখে সে তাকিয়ে থাকে দূরের দিকে যেন সে কিছু দেখছে না, তাকে দিয়ে জোর করে কেউ কিছু দেখিয়ে নিচ্ছে। ইচ্ছে না থাকলেও অনেককেই অনেক কিছু দেখতে হয়, চিনতে হয় পৃথিবীর ধুলো মাটি, আলো-আঁধার, ঘাসফুল অথবা বিঁছুটিলতার জ্বলন। জ্বলার বুঝি শেষ নেই! জ্বলতে জ্বলতে ওড়ে অঙ্গার, ছাই ওড়া দুপুরের মতো মন একবার হাহাকার করে ওঠে, হয়ত বা হাট্টি-ট্টি পাখির মতো গলা ফাটায়, ফিরে আয় রে, যাস নে, বাছা। এ ঘর ছেড়ে কোথায় যাবি? ফেরার জন্য পথে পা বাড়ায়নি শুভ। একথা অবনী ভালো মতন জানে। চৌদ্দ বছরে পা দেওয়া ছেলেটা এই টুটাফাটা হাড়জিরজিরে সংসারটাকে মনে করে বুড়ো ঘোড়া, যে দৌড়োতে পারে না, আর দৌড়ালেও কিছুটা গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, লাল ঝরায় মুখ দিয়ে, ড্যামা ড্যামা দু-চোখে ফুটিয়ে তোলে খরায় শুকিয়ে যাওয়া পুকুরের দুঃখ-দীনতা। অবনী তবু আনমনে বলে, যে দিনটা যায়, সে দিনটাই ভালো। দিনকে ভালো না বেসে উপায় কি। সে এক অক্ষম মানুষ। তার আর কিছু করার নেই। দু-মুখো সাপের মতো মনটা শুধু মোড়া মারে, ধড়ফড় করে। একটা ভয় এসে খামচে ধরে বুক। শুকিয়ে আসে গলা। বারবার ঢোঁক গিলেও স্বস্তি মেলে না। ক'দিন ধরে অবনীর যে কী হয়েছে তা সে বুঝে উঠতে পারে না। সব কিছু হচ্ছে, তবু না হওয়ার একটা বোধ বা অনুভূতি কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। মন বসছে না কাজে-কর্মে। ঝাঁট দিতে গিয়ে ময়লা ফেলে ভুল করে চলে যাচ্ছিল, ডলি দিদিমণি রুক্ষ স্বরে বললেন, অবনী কাজটা তোমার ঠিক হচ্ছে না। কাজ যখন করবে মন দিয়ে করবে। কাজে ফাঁকি দিলে তুমি আমার সঙ্গে ডিউটি নিও না।

অতসী দিদিমণি সহজে কঠিন কথা বলেন না। রাগেনও না চট করে। তবে রেগে গেলে আর রক্ষে নেই। যতক্ষণ না রাগ পড়ছে-ততক্ষণ কেবল মনের ভেতর গজ গজ। আসলে সাদা মনের মানুষগুলোই এইরকম। অবনী চুপ করে থাকলেও তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ভালো মানুষদের চটিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া এই বয়সে আর রাগঝাল মানায় না। রাগ করবে কার উপর? দায়ের উপর কুমড়ো পড়লে কুমড়োই কেটে দু-ফাঁক হয়ে যায়। কোথায় দিদিমণি আর কোথায় সে! আসমান জমিন ফারাক। অবনী হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে এল হাসপাতালের মাঠটা। এই সময় চাড় বেঁধে আছে ঘাস। ঘাসমুখে ফুল এসেছে নাকছাবির মতো। কত অজস্র ফুটে আছে। কেউ দেখে, কেউ দেখে না। কিন্তু এসব চোখ এড়ায় না অবনীর। ঘাসকে মনে হয় লতায়-পাতায় আত্মীয়। কত বছর ধরে এরা বেঁচে আছে সাক্ষী থাকছে মানুষের বেঁচে থাকার। আহা, কি মমতায় মাটি আঁকড়ে রেখেছে তাদের। দেখলে আর চোখ ফেরান যায় না। কী ভেবে মাথা নীচু করে অবনী মাটির দিকে তাকাল। শুয়ে থাকা মাটি যেন উঠে বসল, বলো, ডাকছ কেন?

শুভটা কোথায় গেল বলো তো? অবনীর চোখের কোণ আর্দ্র হয়ে উঠল। বেলা তখন কত হবে, বড়ো জোর বারোটা। শীতের রোদ দুধদাঁতের কামড় ছেড়ে রাগী কুকুরের দাঁতের মতো কামড়াচ্ছে গতর। আজ যে বাতাসে কি ছিল কে জানে—অবনীর মনে হল আজ বড়ো আনন্দের

দিন। সকালে কলতলায় ছাই দিয়ে দাঁত মাজতে গিয়ে সে দেখেছিল দুটো শালিক ঘুরঘুর করছিল হেলেঞ্চা ঝোপের পোকা খাওয়ার জন্য। রোজই আসে শালিক দুটো। খুব ভাব ওদের মধ্যে। সামনের ছোট্ট মাঠটাতে চরে বেড়ায়, কখনও উড়ে যায় পালপুকুরের পাড়ে। ওদের দেখলে শুভর শরীরে খুশির দেবতা বুঝি ভর করে। হাত নেড়ে, চোখ নাচিয়ে গলা ফাটিয়ে সে বলবে, মা, দেখে যাও দুই শালিক।

সরস্বতী বাইরে বারান্দায় এসে টুকি মেরে দেখবে সত্যিই তো দুটো শালিক পাশাপাশি চরছে। ওরা কত সুখী। তারা কেন শালিক পাখি দুটোর মতো পাশাপাশি থাকতে পারে না। অবনী এমনিতে শান্ত, হাবাগোবা। তার শরীরে রাগ বলে যে কোনো বস্তু আছে এটা খুব কমই টের পায় সে। তবে যারা রাগে না, হঠাৎ রেগে গেলে তাদের রাগ আর চট করে নামানো যায় না। এ-ও এক অসুখ। সরস্বতী ছেলের আবদার মেটাতে ড্যাবডেবানো চোখে দেখে জোড়া শালিক। জোড়া শালিকের মাহাত্ম্য তার মগজে ঢোকে না। সে মুখ্যু মানুষ। পড়া লেখা শেখেনি। নাম সই করতে পারে না। শুভ তাকে হাজার চেষ্টা করেও নাম লেখা শেখাতে পারেনি। হাল ছেড়ে দিয়ে সে বলেছে, মাত্র তো কটা অক্ষর, তাও ঠিক করে লিখতে পার না?

—লেখা কি মুখের কথারে, বাবা! এর চেয়ে নক্সা বড়ি দেওয়া আর জিলিপি ভাজা সহজ।

কী যে সহজ কী যে কঠিন—তা বোঝার বয়স হয়নি শুভর। সে শুধু পড়াশোনা ছাড়া আর কিছু জানে না। মনের মধ্যে একটা জেদ এসেছে, জেদটা উঁইঢিপির মতো নয়, একেবারে পাথরের মতো শক্ত। সে হারবে না। মন দিয়ে লেখাপড়া শিখবে। তাকে বড়ো হতে হবে। মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। এই এক অস্ত্র যার সঙ্গে সে যেতে পারবে অনেক দূর। ভয় পেলে, ঘাবড়ে গেলে চলবে না। লেখাপড়া শিখে যে করেই হোক তাকে একটা ভালো চাকরি পেতেই হবে। যাদের টাকা-পয়সা নেই, গরীব মানুষ—তাদের এ ছাড়া আর কী থাকতে পারে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য। পাতলা গোঁফের রেখা ফুটলেও শুভ বুঝে গিয়েছে—লেখাপড়ার কোনো বিকল্প নেই তার জীবনে। খুব অল্প বয়স থেকেই দারিদ্রের দাঁত খিচুনি তার ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে সে। এই তো, মাত্র ক'দিন আগে, বাবা তাকে অঙ্ক খাতা কিনে দিতে পারেনি। পারেনি তারজন্য কোনো আক্ষেপ নেই মানুষটার। শুভ লক্ষ্য করেছে—তার বাবার মুখখানা। কোনো আক্ষেপ বা দুঃশিন্তা নেই। বরং গলা উঁচিয়ে বলেছে, দাঁড়া, হাসপাতাল থেকে সাদা কাগজ এনে দেব। তখন লিখবি।

—এনে দেবো বলো। দাও না তো? শুভর মুখের দিকে তাকাতে পারে না অবনী, নিজের ছায়াকে যেন ভয় পায় সে। বুঝতে পারে—লেখাপড়া শেখা চোখ আগুনে তাতানো তীরের চেয়েও মারাত্মক। স্যাট করে মাথা নামিয়ে নেয় সে। শুভও এই সুযোগটা নিতে কোনো কসুর করে না, ধাতব শব্দ বের করে দেয় গলা থেকে, সুবীরকাকুর সঙ্গে তুমি বারান্দায় বসে কি খাচ্ছিলে আমি সব দেখেছি।

—কি দেখেছিস তুই? অবনী ফুঁসে উঠতে চাইল। সে ভেবেছিল তার গলার জোরে ভয় পাবে শুভ, এবং চুপ করে থাকবে। কিন্তু তা হল না। শুভই যেন ছিটিয়ে দিল কাদা, বোতলে কী ছিল ভাবছ কেউ বুঝি জানে না। আমি মাকে সব বলেছি। মা বলেছে ডাক্তারকাকুকে বলবে। তখন দেখবে তোমার কি হয়! ছেলেকে খাতা কিনে দিতে পার না, আর বসে বসে মদ খাও, তোমার লজ্জা করে না?

—মারব তোকে। ফুঁসে ওঠে অবনী।

শুভ হার মানতে শেখেনি। মুখ বাড়িয়ে দেয় সে, মারো। মেরে শেষ করে দাও। আমি একটুও

কাঁদব না। আমি মরে যাব। আমি আর বাঁচতে চাইনে।

শুভর চোখের জল আজ কী করে সব উথলে উঠছে অবনীর চোখে। দুপুরবেলায় এমন কাণ্ড না ঘটালেই তো পারত। সেই কবে থেকে শুনছে—সোমবার রেজাল্ট বেরবে। রেজাল্ট বেরনোর পর আবার দশদিনের জন্য ছুটি হয়ে যাবে স্কুল। ছোলাগাছে ফল এসেছে এখন। আর শীতটাও আছে জব্বর। খড়কুটো জড়ো করে গাছছোলা পুড়িয়ে খাবে বন্ধুরা মিলে। অবনী বলেছে, রেজাল্ট বেরলে দেশ যাব।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সরস্বতী প্রতিবাদ করেছে, দেশ যাব বললে তো আর যাওয়া হয় না! দেশ তো তোমার দেবগ্রাম নয় যে বাসে চড়লেই পৌঁছে দেবে! দেশ যাওয়ার জন্য গাড়ি-গাড়ি টাকা দরকার। কোথায় পাবে তুমি?

হাওয়া খুলে দেওয়া সাইকেল টিউবের মত চুপসে যায় মুখ, মিনমিনে গলায় অবনী যুক্তি দেখিয়েছিল, পয়লা তারিখ বেতন হয়ে যাবে। বাবু বলেছে! বেতন হয়ে গেলে আর চিন্তা কি!

—বেতন কি ঘর অব্দি আসবে? সরস্বতীর গলায় ঠেলে ওঠে বিদ্রুপ, তোমাকে আমি চিনি নে। তুমি হলে ধার মাস্টার। চালের দোকান থেকে নিয়ে একেবারে মাছ-দোকান...সবখানে তোমার ধার।

—ধার কার নেই বলো তো? ধার আছে বলেই তো পৃথিবী সবার। কেমন বোকার মতো হাসতে থাকে অবনী। সরস্বতীর বদ্ধমূল ধারণা হয়—মানুষটা বোকার বোকা। ঘটে একফোঁটা বুদ্ধি নেই। ওর থেকে ছেলেটার বুদ্ধি হাজার গুণ ভালো। ভালো হলে কি হবে, ও তো কারোর কথা শুনবে না। মূর্খ মানুষের গোঁ শিং উচানো মহিষের গোঁ-এর চেয়েও মারাত্মক। কালিদাসের গল্প শুনেছে সরস্বতী। সেই লোকটা যে ডালে বসে আছে, সেই ডাল নাকি কাটছিল। আঃ, মরণ! অনেকদিন পরে জোড় মিলেছে মানুষটার। সরস্বতী বুঝে পেল না সে কাঁদবে না হাসবে! শুধু কপালে করাঘাত করে ডুকরে উঠল, এর পাল্লায় পড়লে আমার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। আমাকে কিছু করতেই হবে। না হলে নিস্তার নেই।

খাকি ফুলপ্যান্টের উপর অবনীর হাতকাটা সাদা জামা। নীল বড়ি ছোপ ছোপ লেগে আছে তাতে। সরস্বতী কলপাড়ে গিয়ে বল সাবানে ঘষে ঘষে ধুয়েছে। এসব কাজে তার জুড়ি মেলা ভার, শুধু মুখটুকু যদি একটু মিঠে হত। মিষ্টি কথায় আজকাল কি না হয়। আসলে সরস্বতীর মুখের ভাষাটাই বুঝি নিম-তেতো। জন্মের সময় ওর মা-বাবা বুঝি ওর মুখে নিমপাতার রস ঢেলে দিয়েছে, নাহলে অমন হবে কেন? বউটার শরীরে তার জন্য একটুও কি দয়া-মায়া নেই। কী নিষ্ঠুর বাপরে, বাপ! পারলে যেন গলা টিপে ধরে, দম আটকে মারে। আজই তো হয়ে যাচ্ছিল দফারফা। প্রোগ্রেস কার্ডটা নিয়ে শুভ যখন খুশিতে টগবগিয়ে ঘরে ঢুকল তখন হাসপাতাল থেকে ফিরে মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়েছিল অবনী। খোলা জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছিল তার পিঠের উপর। মন্দ লাগছিল না। আরামে জুড়ে এসেছিল চোখ। ঠিক সেই সময়, শুভ এল বিশ্ব জয় করে, খুশিতে ডগমগিয়ে বলল, বাবা, ওঠো। এই দেখ আমি সেকেন্ড হয়েছি।

মুখের পাশটা হাতে রগড়ে নিয়ে উঠে বসেছিল অবনী, চোখ ডলে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিল সে। আসলে জড়িয়ে যাওয়া ঘুম, আর জড়িয়ে যাওয়া শুঁয়োফল চট করে শরীর থেকে বিদেয় হতে চায় না। তবু অবনী আড়মোড়া ভেঙে নিজেকে স্বাভাবিক করে বলল, কই দেখি, তোর রেজাল্ট দেখি।

ভাঁজ করা রির্পোট কার্ডটা এগিয়ে দিল শুভ, বাবা, আমি বলেছিলাম ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের মধ্যে হবো—হয়েছি। তুমি বলেছিলে যদি স্ট্যান্ড করতে পারি সাইকেল কিনে দেবে। এবার কিন্তু

তোমাকে কিনে দিতেই হবে। আমি আর কোনো কথা শুনব না।

বাইরের কুলগাছে বসে কাক ডাকছিল তারস্বরে। বাঁধের ওদিকে ঝগড়া বেঁধেছে বুড়িগাঙে মাছ ধরা নিয়ে। কড়া এবং অশ্লীল শব্দ বয়ে আনছিল বাতাস। অবনীর ম্যাজমেজানি স্বভাবটা শুধু শরীরে নয়, মনেও স্থায়ী তাঁবু গেড়েছে। অকারণে হাসপাতালে ডিউটি গিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে গালিগালাজ শুনতে হল। দোষটা তার নয়, দোষটা যে 'নাইট ডিউটি' করেছে তার। প্রমথ পাশের গ্রাম কুলবেড়িয়া থেকে আসে সাইকেল নিয়ে। তার জমিজমা আছে ফলে ব্যস্ততার শেষ নেই। মন দিয়ে ডিউটি করাটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় নাহলে প্রায় সে ভুলে যায়। দু-নৌকোয় পা দেওয়া মন আজও ভুল করেছে কাজ। কথা ছিল আউটডোরটা ঝাঁট দিয়ে ময়লাগুলো ফেলে আসবে পাঁচিলের ওপিঠে। সেটা সে করেনি। রাউন্ড দিতে এসে প্রথমেই এটা লক্ষ্য করেন ডাক্তারবাবু, তাঁর মাথায় তখন রাগের কাঁকড়াবিছে কামড়ে দেয়। এ হাসপাতালের সর্বময় কর্তা তিনি। তার কথার অবাধ্য হওয়া মানে নিয়মশৃঙ্খলা রসাতলে যাওয়া। এটা কোনমতেই মেনে নেওয়া যায় না। বেতন নেবার সময় কেউ এক পয়সা কম নেয় না। পয়সা যখন কেউ কম নেবে না—তখন কাজ বুঝে নিতেই হবে। কাজে অবহেলা একটা মহা-অপরাধ। ধারেকাছে কাউকে না পেয়ে ডাক্তারবাবু অবনীকেই ডাকলেন হাতের ইশারায়। বেশ চড়া স্বরে বললেন, আউটডোরের সামনেটা ঝাঁট দিতে বলেছিলাম, ওটা আজও হল না কেন? সামান্য ঘাবড়ে গিয়ে অবনী বলেছিল, নাইট ডিউটির স্টাফ ঝাঁট দিয়ে যায়, বাবু। প্রথম বলেছিল ঝাঁট দিয়ে যাবে, হয়ত ভুলে গেছে। ঠিক আছে আমিই দিয়ে দিচ্ছি।

—সব কাজে তোমাদের একটা অজুহাত তৈরিই থাকে। যত সব রাবিশ। গট-মট করে ফিমেল ওয়ার্ডের দিকে চলে গিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। তার রাগটা যে কার উপর সেটা সঠিকভাবে বুঝতে পারে না অবনী। তবে তার মন খারাপ হয়ে গেল। রাগও হল প্রমথর উপর প্রচণ্ড। বড্ড কামচোর ছেলে। খালি ঘর যাবার ধান্দা। চাকরিটা ওর কাছে খেতের শাক তুলতে আসার মতো। এ নিয়ে অনেকবার কথা কাটাকাটি হয়েছে ওদের। অন-ডিউটির দিদিমণিরাই আবার মিটমাট করে দিয়েছেন। এক জায়গায় কাজ করতে গেলে ঠোকাঠুকি তো লাগবেই।

আউটডোরের সামনের দিকটা শান বাঁধানো। রোগীদের বসার জন্য সিমেন্টের বেঞ্চি আছে দু-পাশে। রবিবার ছাড়া সপ্তাহের বাদবাকি দিন গ্রামের মানুষের ভিড় লেগে থাকে। কালীগঞ্জ ছাড়া আশেপাশের দশটা গ্রামে কোনো হাসপাতাল নেই। রুগীর চাপ তো থাকবেই। একা কুম্ভের মতো ডাক্তারবাবু একাই যেন একশ। টিকিটের উপর ঘ্যাসঘ্যাস করে ওষুধ লেখেন। ট্যাবলেট। মিক্সচার, ইনজেকশন আরও কত কী! ডিউটিতে এসে সব দেখেছে অবনী। মানুষটার ধৈর্যের কাছে মাথা নত করে সে। আসলে ধৈর্যটাই বড়ো কথা। ধৈর্য না থাকলে মানুষ বড়ো হতে পারে না। শুভর মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝে মধ্যে সে এমন স্বপ্ন দেখে বইকি। শুভই তার স্বপ্ন দেখা উসকে দিয়েছে। কুঁজোরও তো মন হয় চিৎ হয়ে শোওয়ার জন্য। এমন সখের মধ্যে দোষের কোনো গন্ধ নেই।

সকালের ঝামেলাটা মাথা থেকে যায় নি তখনও। শুধু শুধু কেউ কথা শোনালে এ বয়সেও রাগ হয়। সরস্বতী ঘর সামলাতে ব্যস্ত। সে এসবের ধার ধারে না। এক কাপ চা চেয়েছিল সরস্বতীর কাছে, মাথা ধরেছে বলে। সে দেয়নি। উল্টে মুখ ঝামটা দিয়ে বলেছে, ছেলেটা না খেয়ে ইস্কুলে গেল। ঘরে দুটো বিস্কুটও তো আনো না।

—আনব কি করে, এ সংসারে আগুন লেগেছে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পশুর মতো হাঁপাচ্ছিল

অবনী। সরস্বতী তার রাগের পারদ চড়িয়ে দিল, অমন কাছা খোলা মানুষ জীবনে আমি দেখিনি, বাপু। হাড়-মাস জ্বালিয়ে খেল।

—চুপ কর। শুয়োরের মতো চেল্লালে দাঁত ভেঙে দেব।

—কই ভাঙো? এক বাপে জন্ম হলে ভাঙো। তোমার মায়ের দিব্যি রইল। ভাঙো। ধেয়ে আসা ঝড়ের মতো সরস্বতী আছড়ে পড়ল অবনীর নিঃশ্বাসের এলাকায়। চুলের মুঠি ধরতে চেয়েছিল অবনী, কিন্তু ধরল না। এ তো রোজকার নাটক। অভাবের সংসারে এর চেয়ে আরও কত কী ঘটে যায়। খুনখারাপি যে ঘটে না তা নয়। মেজাজ তেতো হয়ে গেলে হাতের সামনে যা পায় তাই দিয়ে রাগ শান্ত করতে চায় অনেকেই। অবনী সে পথে হাঁটল না। শুধু ঢোঁক গিলে বলল, আমার সংসারের ভাত তোমার কাছে তেতো লাগছে বুঝতে পারছি।

ঠোঁট মুখ বেঁকিয়ে সরস্বতী বলল, শুধু তেতো নয়, গলা দিয়ে বমি ঠেলে উঠছে। দাঁড়াও আর বেশিদিন নেই, যেদিন তোমার সংসারে লাথ মেরে চলে যাব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও। তুমি গেলে আমি মা বুড়োমার কাছে পুজো দেব। অবনী কথাগুলো বলল বটে, কিন্তু বলতে গিয়ে বুকের কাছে তার খচ্ করে উঠল। সরস্বতী চলে যাওয়ার অর্থ এ সংসারের প্রদীপ নিভে যাওয়া। এর আগে একবার ঝগড়ার জের ধরে ফলিডল খেয়েছিল সে। সে যাত্রায় ডাক্তারবাবু তাকে বাঁচিয়ে দেন। হাসপাতালের বেডে শুয়ে সরস্বতী কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, বাবু, আমি বাঁচতে চাইনে। আমাকে এমন ওষুধ দিন যা খেয়ে আমি মরে যাই।

—তোমার ছেলে আছে। তার মুখ চেয়ে তোমাকে বাঁচতে হবে। ধমকের সুরে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, যে ভুল করেছ তা আর দ্বিতীয়বার করতে যেও না। স্টমাক-ওয়াশ করার ঝামেলা কত তা তো নিজের চোখে দেখলে। প্রায় দশ-দিন হাসপাতালে কাটিয়ে সরস্বতী যেদিন ছাড়া পেল, সেদিন ডাক্তারবাবু অবনীকে ডেকে বলেছিলেন, দাঁত থাকতে যারা দাঁতের মর্ম বোঝে না তাদের আমি কী করে বোঝাব। মেয়েমানুষ ছাড়া ঘর-সংসার অচল। বুঝলে অবনী, মেয়েদের শ্রদ্ধা করতে না পারো তবু অবহেলা করো না। এবারের মতো সরস্বতী বেঁচে গেল ভাগ্যের জোরে। মনে রেখো—ভাগ্য সবসময় সঙ্গ দেয় না। তখন কিন্তু সারাজীবন কপাল চাপড়াতে হবে!

কোন সংসারে অশান্তি নেই। ভাত যখন ফোটে তখন আগুন আর উত্তাপ তো থাকবেই। তবু মানিয়ে নেওয়াই মানুষের ধর্ম। সরস্বতী মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে বারবার হেরে গেছে। অবনীর মন কুকুরের লেজের মতো কখনও সোজা হতে চায় না, সোজা করলে কখন যে আবার বেঁকে বসে বোঝার সময়ও দেয় না। এসব কোনো কিছুই চোখ এড়ায় না শুভর। জ্ঞান হবার পর থেকে সে যেন ঘোরের মধ্যে ঘুরছে। হাসপাতালের টাইপ-ওয়ান কোয়ার্টারটাকে তার মনে হয় জেলখানা। এখানে ঢুকে এলেই তার যাবতীয় উৎসাহ, উদ্যম শ্বাসকষ্টের রোগীর মতো ছটফট করে। সরস্বতী সব বুঝেও চুপ করে থাকে। ছেলের মাথায় স্নেহের স্পর্শ দিয়ে বলে, বড়ো হ। বড়ো হওয়ার আগে মনটাকে সবার আগে বড়ো কর। ব্যাঙাচির কলজে নিয়ে বেশিদূর যাওয়া যায় না। শুভ বুঝতে পারে মায়ের এই কথাগুলোয় খুবই সূক্ষ্মভাবে হলেও বাবার প্রতি একটা কটাক্ষ লুকিয়ে আছে। এটা কতটা প্রয়োজনীয় বা আবশ্যিক তা জানা নেই শুভর। এ সম্বন্ধে সে জানতেও চায় না। বড়োদের মাঝখানে তার উপস্থিতি খুব প্রয়োজন আছে?

দুপুরে শুভ যখন এল তখন ঝগড়াটা থিতিয়ে গেছে। অবনী মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছিল সব কিছু। কিন্তু এসব তো আর শ্লেটের ওপর দাগ নয় যে জল ন্যাকড়ার সাহায্যে তা মুছে যাবে সহজে। মনের দাগ কলার কষের চাইতেও ভয়ানক। সেই টানা- পোড়নে কিছুটা ধ্বস্ত

অবনী। ডাক্তারবাবুর ধমক তাকে বেশি দুঃখ দিয়েছে। কেন হঠাৎ এত নিষ্ঠুর হতে গেলেন ডাক্তারবাবু। এর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? কারণ কোনো কিছুই নেই সেটা বারবার নিজেকে বোঝাতে চাইল অবনী। শুভ ঘরে ঢুকে এল মাথা উঁচু করে, আনন্দ আর গর্বে চকচক করছে তার কচি-কিশোর শ্যামলা মুখখানা। মুহূর্তে অবনীর মনে হয়েছিল ঐ মুখ যেন আঁটি না হওয়া কাঁচা হিমসাগর আম। ভালো লেগেছিল তার। শুভ যখন বলছিল, বাবা, আমি সেকেন্ড হয়েছি। এবার আমি ডাক্তারকাকুর মেয়েকেও হারিয়ে দিয়েছি। মাধুরীর চেয়ে আমি ছাব্বিশ নাম্বার বেশি পেয়ে সেকেন্ড হয়েছি।

যে সাড়া, আবেগ ও উত্তাপ অবনীর কাছ থেকে আশা করেছিল শুভ তা না পেয়ে বেশ কিছুটা বিমর্ষ দেখাল তাকে। অবনীর নীরব থাকার কারণ তার কাছে রহস্যময় ঠেকল। অবনী ভাবছিল সে যা কোনোদিনও পারবে না, শুভ ঠিক সেই কাজটা করে ঘরে এসেছে। ডাক্তারবাবুর মেয়েকে হারিয়ে দেওয়া মানে ডাক্তারবাবুকে কিছুটা হলেও হারিয়ে দেওয়া। মাথার উপর সব সময় যার ছড়ি ঘোরানোর অভ্যাস তিনি কি এই পরাজয় মেনে নেবেন? পরীক্ষার ফলাফলের খবর ডাক্তারবাবু কি আগে থেকে জানতে পেরেছিলেন? হতেই পারে। বড়ো মানুষদের লম্বা হাত। এ গ্রামের সব শ্রেণীর মানুষই তো ডাক্তারবাবুর জানাশোনা। তার পক্ষে আগেভাগে রেজাল্ট জানা কোনো কঠিন কাজ নয়।

খাঁচা ভাঙা পাখির মতো চোখ মেলে দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল সরস্বতী, যা শুনেছে তা মেনে নিতে কোথায় যেন বাধো বাধো ঠেকে। ডাক্তারবাবুর মেয়েকে হারিয়ে দেওয়া মুখের কথা নয়। মেয়েটা শুধু পড়াশোনাতেই নয়—দেখতেও চমৎকার। সপ্তাহে একবার হলেও সে এখানে আসবেই। ডাক্তারবাবুই বলেছেন, লেখাপড়া কনসান্ট করে পড়লে ব্রেন খোলে। একা না বোকা।

মাধুরী আসত। শুভও যেত। মাধুরীর সব বই কেনা আছে। শুভ পাঠ্যপুস্তক কিনলেও 'মানে' বইগুলো কিনতে পারেনি। মাধুরীই বলেছে, তুই আমার কাছ থেকে নিয়ে পড়বি যখন যা দরকার নিয়ে যাবি।

অবনী পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে হাত চেপে ধরল শুভর, ভালো করে পড়। সেকেন্ড হয়েছিস, এবার তোকে ফার্স্ট হতে হবে।

—সে আমি হবোখন। শুভর কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাস, স্ট্যান্ড করলে আমাকে সাইকেল কিনে দেবে বলেছিলে। কথাটা মনে আছে তো?

কেমন ভ্যাবাচেকা খাওয়া চোখে তাকাল অবনী, ঢোক গিলে বলল, স্ট্যান্ড করা মানে?

—ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের মধ্যে হওয়া। আমি হয়েছি। এবার তুমি আমাকে সাইকেল কিনে দাও। আমি আর পরের সাইকেল চালাব না। শুভ আশার চোখে তাকাল।

অবনী ছেলেকে আশ্বস্ত করতে পারল না, বরং ভোল পাল্টে গেল তার, বললাম তো ফার্স্ট হ, ফার্স্ট হলে কিনে দেব। এখন সাইকেল চালাতে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে। তোর আর পড়া হবে না তখন!

—তাহলে দেবে না?

—বললাম তো দেব।

—মিথ্যুক। শুভর চোখ জলে ভরে এল অভিমানে। সরস্বতী নীরব দর্শক। ঘরে চাল নেই সেদিকে খেয়াল নেই অবনীর। অথচ কথা ছিল চাল এনে দিয়ে সে বাজারে যাবে। পরীক্ষার ফল বেরবে, আজ মাছের ঝোল খেয়ে যাবে শুভ। মনে মনে এমনই একটা ইচ্ছে ছেলেটারও ছিল। কিন্তু যে এসব করবে—সেই মানুষটি যে নির্বিকার। তার নিঃস্পৃহতায় মনে মনে দুঃখ পেয়েছে সরস্বতী। অভাবের ঘরে টাকা হল চাঁদের আলো। যার টাকা আছে, তার জ্যোৎস্না আছে। কোনো কিছুই ব্যবস্থা করতে পারেনি সরস্বতী। সময় নষ্ট না করে ইস্কুলে চলে গিয়েছিল শুভ।

অবনী হাঁ- করে তাকিয়ে আছে শুভর মুখের দিকে, কি বললি তুই, আমি মিথ্যুক?

মাথায় রক্ত উঠে যাওয়া শুভ বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ তুমি মিথ্যুক। তোমার কথার কোনো দাম নেই। কথার দাম থাকলে আমাকে ঠিক সাইকেল কিনে দিতে।

শুভর হাতটা ধরে রাগের ঘোরে মুচড়ে দিল অবনী। ঠেলা মেরে বলল, বেরো আমার ঘর থেকে। মা'র রক্ত পেয়েছিস, তাই অমন জানোয়ার হচ্ছিস। বাঁচতে চাস তো পালা। নাহলে মেরে তোর হাড় সার বানিয়ে দেব।

কি বলছ তুমি? পাগল হলে নাকি? সরস্বতী ছেলের সমর্থনে রুখে দাঁড়াল, লজ্জা করে না শিক্ষিত ছেলের গায়ে হাত তুলতে?

—আহা রে, কী আমার শিক্ষিত। ঠোঁট-মুখ উল্টে অবনী বলল, ক লিখতে কলম ভাঙে সে আবার শিক্ষিত। ছ্যা!

কঠিন শব্দগুলো বোলতার মতো তাড়া করে শুভকে। কালবিলম্ব না করে শুভ প্রোগ্রেস রির্পোটটা দল্লা পাকিয়ে ছুঁড়ে দেয় তক্তপোষের উপর। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে এক ঝলক সে মায়ের মুখের দিকে তাকাল। তারপর তীরের মতো ছুটতে লাগল বাঁধের দিকে।

জগৎখালির বাঁধ কোথায় যে গিয়ে শেষ হয়েছে তার শেষমুড়ো আর দেখা হয়ে ওঠেনি শুভর। তবে ভূগোলের মাস্টারমশাই সুদামবাবু একদিন ক্লাসে বলেছিলেন, জগৎখালির বাঁধ যদি কোনোদিন ভেঙে যায় তাহলে নদীয়া বর্ধমান আর মুর্শিদাবাদ জেলার বহু গ্রাম ভাগীরথীর জলে তলিয়ে যাবে। সে দৃশ্য চোখে দেখা যাবে না। মানুষের হাহাকার চাপা দিয়ে দেবে পাখির কলকাকলি।

কথাগুলো শুনতে শুনতে চোখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল শুভর। বুনোপাড়ার রঘুনাথের সঙ্গে তার এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রঘুনাথ বলেছে, দাঁড়া, একটা সাইকেল কিনি তারপর তোকে সাইকেলে চাপিয়ে বাঁধের কোথায় শেষ দেখিয়ে নিয়ে আসব। তবে আমি এই বাঁধ ধরে পলাশী মনুমেন্টের কাছ অব্দি গিয়েছি। আঃ, কি সুন্দর জায়গা রে, দেখলে চোখ ভরে যায়! তুই যদি যেতে চাস তোকেও নিয়ে যেতে পারি।

রঘুনাথের কথাগুলোয় খোঁচা ছিল কিনা, তা বুঝতে পারে না শুভ। তবে একটা সরল বিশ্বাস থেকে সে যে এই কথাগুলো বলেছে তা অনুভব করতে পারে সে। যতদূর তার ধারণা রঘুনাথের মনে এত মার প্যাঁচ নেই, সে দেবদারু গাছের মতো সহজ-সিধা। কোনো উপর চালাকি নেই বলেই সে বোমভোলা শিবের মতো দেখতে। শিবঠাকুরের থানে মানত করে ছিল দুর্গামণি, ব্যাটাছেলে হলে ঢাকঢোল বাজিয়ে ঘটা করে পুজো দেবে। মানত করার বছর না ঘুরতেই রঘু পেটে এল। শুকিয়ে যাওয়া সংসারে আবার নতুন করে প্রাণ এল, রোদে পোড়া গাছগুলো বর্ষার

জল পেয়ে যেমন তরতাজা হয়ে ওঠে তেমনই চনমনে আর স্ফূর্তিবাজ হয়ে উঠল গুয়ারাম। হাসি মস্কারা মেরে বলেছিল, মরা ডালে ফুল এয়েচে গো, এবার নের্ঘাৎ ফল হবে।

আপদে-বিপদে যে বাঁশি সাথ দেয় রঘুনাথের সেই বাঁশিকে চালে গুঁজে রেখে এসে সে শান্তি পায় না। মন খারাপের সময় এই বাঁশি তাকে সান্ত্বনার সুর শোনায়। চুনারাম যেন সুর হয়ে তার সারা অঙ্গে অদ্ভুত একটা যাদুছোঁয়া দিয়ে যায় যা ভাষায় সে প্রকাশ করতে অক্ষম। জ্যোৎস্না থকথকে রাত রঘুনাথের বাঁশির সুর হাওয়ায় ভর দিয়ে পৌঁছে যায় শুভর কানে। এত ভালো বাঁশির সুর সে রেডিও ছাড়া আর কোথাও শোনেনি। পড়া থামিয়ে বাইরে এসেছিল শুভ। সুরের টানে পৌঁছে গিয়েছিল হাসপাতালের বারান্দায়। যেখানে পনেরই আগস্ট, ২৬শে জানুয়ারি পতাকা তোলা হয় —সেই সিমেন্ট বাঁধানো বেদিতে বসে বাঁশিতে এক নাগাড়ে ফুঁ দিয়ে চলেছে রঘুনাথ। জ্যোৎস্নার আলোর মতো সুর যেন গড়িয়ে নামছে ঘাসের পালঙ্কে। শুভ গিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছে, রঘুনাথের তা খেয়াল নেই। বাঁশি থামতেই চোখাচোখি হল ওদের। শুভ দেখল রঘুনাথ তার চাইতে বছর দু-তিনেকের বড়ো হবে। তবে তার পেটা চেহারায় মেহনতী মানুষের সব লক্ষণগুলো পরিস্ফুট। শুভই প্রথম বলেছিল, ভারী চমৎকার বাঁশি বাজাও তো তুমি। রঘুনাথ এ কথাকে তেমন পাত্তা না দিয়ে বলেছিল, আমি বাঁশিতে গান বাজাতে পারি। শুনবে?

সেদিন একটা শ্যামা সংগীত শুনিয়েছিল রঘুনাথ। সব শোনার পর শুভর মুখে কোনো কথা নেই। আবেগতাড়িত স্বরে সে বলেছিল, একটা কথা বলব, রাখবে?

—বলে ফেলো।

—আমাকে বাঁশি বাজানো শিখিয়ে দেবে।

—বাঁশি বাজানো শেখানো যায় না, রঘুনাথ নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে বলেছিল, রক্তে যদি সুর থাকে তাহলে তা বাঁশি বা গলা ফুঁড়ে বেরবে। কেউ তাকে আটকাতে পারবে না। তবে সবার আগে তোমার একটা বাঁশি থাকা দরকার। আগে জানলে তোমার জন্য একটা বাঁশি সংগ্রহ করে রাখতাম। তা যখন হয়নি, তখন একটা কাজ করতে পারো।

—কি কাজ?

—তোমার বাবার বেতের বাঁটের ছাতা থাকলে নিয়ে এসো, আমি বাঁশি বানিয়ে দেবো।

সত্যি সত্যি বাঁশি বানিয়ে দিয়েছিল রঘুনাথ। বাঁশিতে ফুঁ দেওয়াও শিখিয়ে দিয়েছিল তাকে। শুভ চারা আনা আটআনা যখন যা পারত রঘুনাথকে দিত। রঘুনাথ ইতস্তত করলে সে বলত, আমি তো তোমার বন্ধু। বন্ধু কিছু দিলে নিতে হয়। না করতে নেই।

—নেব, কিন্তু তার আগে চলো সই পাতাই। রঘুনাথ জোর করে হাত ধরে ছিল শুভর, চলো, আমরা জুড়ানপুরের মা কালীকে সাক্ষী রেখে মিতে হই। তাহলে আমাদের সম্পর্ক কেউ জ্বালিয়ে দিতে পারবে না। কান ভারি করতে গেলে সবাই ভয় পাবে।

সই পাতানোর পরে এ-ওর হাত ধরে ঘুরেছিল মন্দির চাতালে। শুভ বলেছিল, আজ থেকে আমাদের তুই-তোকারির সম্পর্ক। চল, আজ আর ঘরে যাবো না। তোর সাথে ঘুরব। যেখানে মন চায় যাব।

—তোর মা যদি খোঁজে।

—খুঁজুক। কিছু হবে না। শুভর কণ্ঠস্বরে জেদ। এ পৃথিবীকে সে যেন নতুনভাবে দেখতে চায়। রঘুনাথ তার চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়ে দেয়। শক্ত মুঠোর মধ্যে শুভর হাতটা চেপে ধরে

বলে, এতদিন তুই একা ছিলিস। এবার আমি তোর পাশে থাকব। কিছু হলে আমাকে তুই ডাক পাড়বি। আমি ঠিক চলে আসব।

—তোকেও বলা থাকল। তোর আপদে-বিপদে যেন দৌড়ে যেতে পারি। সেই সুযোগ যেন ভগবান আমাকে দেয়।

শুভর কথাগুলোয় আবেগ থাকলেও এ তার মনের কথা। রঘুনাথকে তার মনে ধরেছে। এ গাঁয়ে তার বন্ধুর অভাব নেই, তবু রঘুনাথ যেন সবার চাইতে আলাদা। বছর পাঁচেক আগে তার সাথে আলাপ হলে কী ভালোই যে হত। রঘুনাথ পারে না এমন কোনো কাজ নেই। সে গাছে উঠে পাখির বাচ্চা ধরে আনতে পারে, দ্রুত গতিতে চলে যাওয়া হেলেসাপের লেজ বনবন ঘুরিয়ে দিতে পারে অনায়াসে। এক নিঃশ্বাসে ডুব দিয়ে সে মাটি তুলে আনতে পারে পালপুকুরের। খেপা শেয়ালকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে গ্রামের বাইরে বের করে দিয়ে আসে। এত যার সাহস, সেই রঘুনাথের নাম 'রঘুবীর' হওয়া উচিত ছিল। গত দু-বছরে রঘুনাথ শুভর অনেক কাছাকাছি। সময় পেলে শুভ হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় ওদের বাড়ি। কিন্তু হাজার ডাকলেও রঘুনাথ আসতে চায় না তাদের কোয়ার্টারে। একটা ভয়, সঙ্কোচ তার ভেতরে সবসময় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু রঘুনাথ কেন, তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এই একই রোগে আক্রান্ত। শুভ বুঝিয়ে বললেও কথাগুলো বুঝি বোধগম্য হয় না।

এত দূরে চলে এসেছে সে। এখান থেকে হাসপাতালের কোয়ার্টারগুলো ধোঁয়ায় ডুবে থাকা ছবির মতো দেখা যায়। আজ যেন পাগল হয়ে গিয়েছে হাওয়া। গাঙ-পালানো বাতাস যেন ভরপেট মদ খেয়ে মাতলামি করছে রোদেব সংসারে ঢুকে। ওই টালমাটাল বাতাস ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে খেজুরগাছের ঝাঁকড়া মাথা। যতবারই এদিকটাতে এসেছে ততবারই আনন্দে মন ভরে গেছে শুভর। কোনোবারই তার মনে হয় না একই দৃশ্য দেখছে। পট পরিবর্তন ঘটেছে ঋতু আর দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে। এবছর আমের শাখায় মুকুল এসেছে সাত তাড়াতাড়ি, ফলে সুগন্ধে ম-ম করছে বাঁধের চারধার। আর সেই সুগন্ধ ধীরে ধীরে শরীরে ঢুকিয়ে নিচ্ছে তিরতিরে স্রোতের মৌরলা মাছের মতো রূপো চকচকে জলের বুড়িগাঙ।

শুভ কী করবে ভাবছিল, চেনা-জানা কারোর সঙ্গে এসময় দেখা হলে সে যে সমস্যায় পড়ে যাবে এই ভাবনা কিছুটা হলেও তাকে কাবু করে ফেলেছে। আজ ইস্কুলে রেজাল্ট আউট হবার পর সবাই কেমন তার দিকে ভ্যালভ্যাল করে দেখছিল। সে তো পড়াশোনায় ভালো, তবু, অমন করে ড্যামাড্যামা চোখে তাকে দেখার কি আছে—বুঝতে পারেনি সে। তবে একটা কথা তার আনন্দের প্রদীপটাকে ফুঃ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছে। সুপ্রিয় পোদ্দার তাদের ক্লাসেই পড়ে, সে পড়াশোনাতে ভালো, ওর বাবার রেশন-দোকান আছে বাজারে। অবস্থা ভালো বলে একটা প্রস্ফুটিত অহঙ্কার তাকে শিমুলফুলের মতো রাঙা করে রাখে। মাস্টারমশাই, দিদিমণিরা তাকে বিশেষভাবে তোয়াজ করেন কেননা শিবশঙ্কর পোদ্দার এই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার। সেই সুপ্রিয় মাধুরীকে বলছিল, একটা মেথরের ছেলের কাছে হেরে গেলাম। ও কি করে এত নাম্বার পেল জানি না। নিশ্চয়ই কিছু লণ্ডভণ্ড হয়েছে।

কথাটা শোনার পর মাধুরীর মুখের রঙটাই পাল্টে গিয়েছিল সহসা, কী উত্তর দেবে ভেবে পায়নি সে। অস্বস্তিতে ঘেমে উঠেছিল মাধুরী। নখ খুঁটে পায়ের দিকে তাকিয়ে সে ঠোঁট কামড়ে ধরল অজান্তে। কিছু শোনার জন্য সুপ্রিয় মাধুরীর ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়াল। মাধুরী নিজেকে সামলে নিয়ে ঢোঁক গিলে বলেছিল, তোর এত ছোট মন, আমার জানা ছিল না। ভালো জামা কাপড় পরলেই মানুষ যে ভালো হয় তা নয় দেখছি! শুভ আমাদের বন্ধু। ও পড়াশোনা করে সেকেন্ড হয়েছে। ওকে হিংসে করলে আমরা কেউই মহান হয়ে যাব না।

সুপ্রিয় হার মানার পাত্র নয়, এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মাধুরীকে সে উচ্চ কণ্ঠে বলল, তোর থেকে কেউ বেশি নাম্বার পাক এটা আমি সহ্য করতে পারি না। আমার যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে আমি তোকে একশোর মধ্যে একশ দিয়ে ফার্স্ট করিয়ে দিতাম।

—এতে তোর কি লাভ হোত?

মাধুরীর প্রশ্নে সুপ্রিয় ঢোঁক গিলে বলল, সে তুই বুঝবি না। কথাগুলো বলে মুখ নীচু করে দাঁড়াল সুপ্রিয়। সেও ঘামছিল কোনও কারণে, মনে মনে চাইছিল মাধুরী তাকে সমর্থন করুক। মুখ ফুটিয়ে না হোক অন্তত চাহনিতে তা প্রকাশ পাক। তেমন কোনো কিছু প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুট হল না মাধুরীর হাবভাবে। সে গভীর কুয়োর মতো দৃষ্টি মেলে চলে যেতে চাইল ক্লাস রুমে। সুপ্রিয় তাকে বাধা দিল, এখন যাস না, একটু থাক। তুই কাছে থাকলে আমি শক্তি পাই।

—আজেবাজে বকিস না। বিন্দু দিদিমণিকে বলে দেব তাহলে। যা, সরে যা। আমাকে যেতে দে। বিরক্তি উথলে উঠল মাধুরীর চোখে। সুপ্রিয়কে পাশ কাটিয়ে সে দেখল থামের আড়ালে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে শুভ। সব কথা শুনেছে হয়ত, নাহলে কেন ছলছল করছে ওর চোখ জোড়া। এইরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে মাধুরীর কি করা উচিত ভেবে পেল না। ক্লাসরুম থেকে চিৎকার-চেঁচামেচি বাইরে ছুটে আসছে। এখনও রেজাল্ট হাতে পায়নি কেউ। ঘন্টা পড়লে ক্লাস-টিচাররা প্রোগ্রেস-কার্ড নিয়ে যে যার ক্লাসে ঢুকে যাবেন। প্রথানুযায়ী প্রেয়ারের লাইনে হেড-মাস্টারমশাই যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে তাদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ হবার পরেই 'জনগণমন'। এই সোরগোলের পিছনে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক প্রতিত্রিয়া প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে যা আজকের দিনে স্বাভাবিক।

ক্লাস এইটের ক্লাস-টিচার মাথুরবাবুর আসার সময় হয়ে গেল। মাধুরী কিছু ভেবে না পেয়ে বোকার মত শুভর মুখোমুখি দাঁড়াল। সে কিছু বলার আগে শুভ চোখ রগড়ে নিয়ে বলল, আমি সব শুনেছি। যা সত্যি সুপ্রিয় তো তাই বলেছে। অমন কথা শুনে শুনে আমার আর এখন কোনো কষ্ট হয় না। আসলে কি জানিস, এত কষ্ট পেয়েছি—এগুলো আর কোনো কষ্ট বলে মনে হয় না। শুভ'র চোখ চঞ্চল হয়ে উঠল সামনের দিকে তাকিয়ে, চল, মাথুর স্যার আসছেন।

মাধুরী ফ্যাকাসে চোখে শুভকে দেখছিল, তুই এত মনের জোর কোথায় পাস?

—অভাবই আমাকে বলবান করেছে। তুই দেখিস—আমি হারব না। আমাকে বড়ো হতেই হবে। শুভ লম্বা লম্বা পা ফেলে ক্লাস-রুমের দিকে এগিয়ে যেতেই মাধুরী তাকে অনুসরণ করল।

যার মনে এত জেদ, এত সহজে তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলা কি উচিত হয়েছে? সব ঘরেই কিছু না কিছু অশান্তি লেগেই থাকে। সবার মন-মেজাজ সব সময় এক থাকে না। বাবার সামান্য কথায় ধৈর্য হারিয়ে ফেলা উচিত হয়নি শুভ'র। এমন ব্যবহার যাদের পেটে বিদ্যে-বুদ্ধি নেই তারা করলেই শোভা পায়। লগি ঠেলে ঠেলে, পাঁকমাটি ঘেঁটে শিক্ষার নৌকো নিয়ে এগোচ্ছে শুভ। এ সময় এত উতলা হলে, আত্মকেন্দ্রিক ভাবনায় মগ্ন হলে চলবে না। লোকে তাহলে বলবে স্বার্থপর। অবনীর দুঃখটা ছেলে হয়ে সবার আগে তার বোঝা উচিত ছিল। সেকেন্ড হয়েছে বলে তো সে সুন্দরবন থেকে বাঘ মেরে আসেনি! সে শুধু একটা ভালো ছাত্রের দায়িত্ব পালন করেছে। অভাব কারোর কোনোদিন মাদুলি-তাবিজ হতে পারে না। বাবার প্রতি অভিমানে ঘর ছেড়ে এসে সে যে খুব বাহাদুরির কাজ করেনি—যত সময় যায় তা যেন হাড়ে হাড়ে টের পায় সে। মা'র দুঃখী মুখখানা চোখের তারায় ভেসে ওঠে। তারও তো দুঃখ কম নেই। সকাল থেকেই কথার বাণ সহ্য করতে হচ্ছে তাকে। যেন ক্লাসে সেকেন্ড হয়ে সে অপরাধ করে ফেলেছে। আজ তার এই সাফল্যের পেছনে বিন্দু দিদিমণির হাত আছে। শুভ স্কুলে টেরি কেটে ইস্কুলে গিয়েছিল। খারাপ বখাটে ছেলেগুলোর চাইতেও তাকে বাজে দেখাচ্ছিল। বিন্দু দিদিমণির ক্লাসে

পড়া পারেনি সে। ডাস্টার দিয়ে ফোলানো টেরি ইস্ত্রি করে দিয়েছিলেন তিনি। সাবধান করে বলেছিলেন, সব ছেলের যা মানায় তোকে তা মানায় না। তোকে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ হয়ে উঠতে হবে। লেখাপড়া শিখে তোর বাবার হাতের ঝাড়ুটা তোকে কেড়ে নিতে হবে। এরজন্য কঠোর সাধনার দরকার। চুলের টেরি কেটে সময় নষ্ট করা তোর চলবে না।

কথাগুলোর বুঝি আত্মশুদ্ধির অ্যাসিড ছিল, পুড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল খাঁটি সোনা। সেদিনের পর থেকে সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল শুভ। পড়া ছাড়া তার মনে আর কোনো চিন্তা নেই। কটা তো মাত্র বই, বারবার পড়ে আত্মস্থ হতে হবে। হাঁপিয়ে গেলে চলবে না। দম ধরে আরো ছুটতে হবে, আরো...আরো।

পরিশ্রমের ফল হাতেনাতে পেয়েছে সে। বিন্দু দিদিমণির কথা সে রাখতে পেরে খুশি। রেজাল্ট হাতে পেয়ে সে সবার আগে বিন্দু দিদিমণির কাছে গিয়েছিল। দিদিমণির পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই, তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, এই শুরু হল। আমি এর চেয়ে আরও অনেক বেশি কিছু দেখতে চাইছি। তোর চোখ বলছে, তুই তা পারবি।

বিন্দু দিদিমণি কথা শেষ করে শুভ'র হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটা নতুন জ্যামিতি বক্স।

সাইকেলের প্রতি শুভ'র ঝোঁক জ্ঞানপড়ার পর থেকে। অতসীপিসির ফুলবাগানে জল দিয়ে দিলে পেসেন্ট-পার্টিকে বলে সাইকেলের ব্যবস্থা করে দেন তিনি। সাধারণত বিকেলবেলায় সাইকেল চালাতে শুভর খু-উ-ব মজা লাগে। তখন রোদ পড়ে আসে, পাখির ক্লান্ত ডানায় ঘরে ফেরার আকুতি। এই সময়টাতে জোরে সাইকেল চালালেও হাঁপিয়ে পড়ে না শুভ। যার সাইকেল তিনিও বিরক্তিবোধ করেন না। অতসীপিসিকে তোয়াজ করে চললে তার রুগীর যত্নআত্তি ভালো হবে। তাছাড়া অতসীপিসির ব্যবহারটাই ব্যতিক্রমী। তার পোষা কুকুরের নাম বাঘা। অবিকল বাঘের মতো দেখতে। পিসি একা থাকেন বলেই তাকে পাহারা দেয় বাঘা। বাঘা বাগানের ফুল ছিঁড়তে দেয় না কাউকে। সে সব সময়ের পাহারাদার। রোজ বিকেলে মনটা চনমনিয়ে ওঠে শুভর। যেন শান্ত নির্জন পুকুরে কেউ ঢিল ছুঁড়ে পালিয়েছে, ঢেউ...ক্রমাগত ঢেউ...এমন অনুভূতিময় মনের অবস্থা। কেউ যেন তাকে জোর করে টেনে আনে হাসপাতালের সামনে। অতসীপিসির ইভিনিং ডিউটি থাকলে একেবারে সোনায় সোহাগা। ডিউটি রুমের সামনে শুভ গিয়ে দাঁড়ালে পিসির যতই কাজ থাক, প্রচ্ছন্ন স্বরে বলবেন, আয় বোস। স্কুল থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া করেছিস তো?

শুভ ঘাড় নাড়লে অতসী পিসি বলবেন, আর একটু পরে পেসেন্ট-পার্টির সবাই চলে আসবে। তখন তোর ঠিক সাইকেলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এমন কোনোদিন যায়নি যেদিন হাসপাতালে এসে সাইকেল না চালিয়ে ফিরে গেছে শুভ। আজ যে কত কথা মনে ভিড় করে আসছে কে জানে। শুভ ভাবল ওভাবে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা তার উচিত হয়নি। বাবা কিছু বললেও মা তো তাকে কিছু বলেনি। সে তো রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছিল ছেলের গর্বিত মুখখানা দেখবে বলে। কিন্তু তা আর হল কই? সব কিছু মুহূর্তের মধ্যে কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। সরস্বতীর কিছু করার ছিল না, সে শুধু কাঠের পুতুলের

মতো হাঁ-করে দাঁড়িয়ে থাকল এক পাশে। একটা ঝড়ো হাওয়ার মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শুভ। ছেলের এমন অপ্রত্যাশিত ব্যবহার তাকে সামান্য হলেও ধাক্কা দিয়েছে। কই এর আগে শুভ এমন ব্যবহার তো করেনি।

রঘুনাথদের ঘরখানা শুভর মনে হয় ঠাকুরমার ঝুলির ঘরগুলোর মতো। বাঁধের পা ছুঁয়ে বয়ে যাওয়া নদীটাকে মনে হয় স্বপ্নে দেখা কোনো এক শান্ত নিরীহ নদীর মতো। নদী আছে বলে বাতাসও কত ভদ্র। এক রাশ শীতল বাতাস মানুষের ক্লান্তি দূর করার জন্য সব সময় বুঝি মুখিয়ে আছে। শুভ চোখ মেলে তাকাল দূরের দিকে। নদীর জল ডিঙিয়ে তার দৃষ্টি চলে গেল আখ খেতে। এত আখ চাষ এ এলাকা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো প্রান্তে হয় কি? জানা নেই শুভর। সে শুধু ভাবল—আর ক'দিনের মধ্যে আখ কাটা শেষ হয়ে যাবে। আখগাছে ফুল এলে হালকা হয়ে যায় আখ, অনেক সময় কমে যায় তার মিষ্টতা।

রঘুনাথদের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে শুভ ডাকল, এই রঘু, রঘু।

ভরদুপুরে চেনা কণ্ঠস্বর শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুর্গামণি। তার পরনে এক ফেরতা শাড়ি, গায়ে ব্লাউজ নেই, খোলা চুল পেঁপে রঙের পিঠের উপর ঢেঁকির পাড় দিচ্ছে হাওয়ায়। সে এসে অবাক করা চোখে শুভর মুখের দিকে তাকাল। মা-মন নিয়ে আঁচ করতে চাইল এ সময় আসার কারণটা কি। কিছু অনুমান করতে না পেরে অমায়িক আত্মীয়তার গলায় বলল, বসো বাবা, বসো। রঘু তো ঘরে নাই। দুর্গামণি শুভর চিন্তাভরা মুখের ভাষা পড়তে চাইল। কী বুঝে বলল, তুমি বসো। আমি তুমার জন্য টুকে ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসি।

ঠাণ্ডা জল আনতে গেলে চাপা কলের জল আনতে হবে। চাপাকল আছে সেই অশ্বত্থতলায়। যেতে আসতে কিছু সময় তো যাবেই। শুকনো ঢোক গিলে শুভ বলল, দরকার নেই, মা। ঘরে যা জল আছে তাই দাও। আমি বেশিক্ষণ বসব না। ফিরে যাবো।

—সে কি গো, বাছা! দুফুরবেলায় এলে। না খেয়ে গেলে রঘু যে আমার মাথা খেয়ে নেবে। দুর্গামণি পেতলের গ্লাসে জল ভরে এনে শুভর পাশে বসল।

সই-পাতানোর পর থেকে শুভ তাকে মা বলে ডাকে। আর এই মা ডাক শুনলে তার বুকের ভেতরটা গর্বে ভরে যায়। শুভর গায়ে মাথায় পিঠে জললাগা হাত বুলিয়ে দুর্গমণি বলল, এসেছো যখন না খাইয়ে যেতে দেব না। তুমাদের ঘরে গেলে রঘু আমার কত কি খেয়ে আসে। তা বাছা, তুমরা হলে গিয়ে বড়োলোক মানুষ। মাস গেলে তুমার রাবা কত্তো টাকা মাহিনা পায়। আর আমাদের কথা বলোনি গো, কুনদিন হাঁড়ি চড়ে, কুনদিন আবার আঁখা জ্বলেনি।

শুভ সব জানে, এসব কথা তার কাছে কোনো নতুন নয়। তবু সে দুঃখী চোখ মেলে তাকায় দুর্গামণির দিকে, সরলতায় ভরা এ মুখখানার দিকে তাকিয়ে সে শুধায়, মা, রঘু কোথায় গিয়েছে?

—জনমজুর খাটতে গিয়েচে, বাছা! বেলা না গড়ালে সে তো ফিরবে নি—

—অতক্ষণ আমি থাকতে পারব না। আমাকে যেতে হবে। ঘরে অনেক কাজ। শুভ আরো কিছু অজুহাত খাড়া করতে যাচ্ছিল দুর্গামণি তাকে থামিয়ে দিল, হাজার কাজ থাকলেও মায়ের কাচে এসে ছেলে কি খালি পেটে ফিরে যায় বাছা! আমি তেল-গামছা দিই। তুমি ভুস করে ডুব দিয়ে আসো লদী থেকে। ততক্ষণে রঘু, রঘুর বাপ,-সব্বাই এসে যাবে। রোদ মাথায় তো এলে। রোদ না গড়লে আমি তুমাকে যেতে দিবোনি।...

কী অদ্ভুত মমতায় দুর্গামণি তাকিয়ে আছে শুভর কুচকুচে মণির দিকে। শুভর সারা শরীরে অদ্ভুত একটা শ্রদ্ধার লহর বয়ে গেল, মা, আজ আমার পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। আমি পাশ করেছি।

কার্পাস তুলোর মতো খুশিতে উথলে উঠল দুর্গামণি, আমার ছেলে পাশ হবে নি তো কি ফেল হবে? তাবপরই কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল তার চোখ জোড়া, আমার ঘরের রঘুটা শুধু চার ক্লাস অব্দি পড়ল, তারপর আর ইস্কুলে গেল না। ওর বাপ বলল—পড়া- লিখা শিখে আর কাজ নেই। জনমজুরের কাজে লেগে যা। আমি আর একা সনসারের হাল টানতে পারচি নে। তুই আমার সঙ্গে কাঁধ দে। ব্যস, পড়া ছেড়ে গেল রঘুটার! গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ছুঁয়ে বেরিয়ে এল দুর্গামণির। তবু তার দুঃখে ভরে ওঠা চোখ দুটো শুভর মধ্যে যেন খুঁজে পেতে চাইল রঘুনাথের সার্থক পরিণতি। খিদে ছিল তবু খাওয়ার প্রতি কোনো মন ছিল না শুভর। দুপুর তাতছে শীতের রোদে। বাতাস ভারী হয়ে আছে এখনও। ক'পা হাঁটলেই তো বুড়িগাঙ। বিঘার পর বিঘা আখ খেতের দিকে তাকিয়ে আখের খসখসে পাতার মতো তার বুকের ভেতরটাও জ্বালাপোড়া করে ওঠে। রঘুনাথ তার চেয়ে ক'বছরেরই বা বড়ো হবে, তবু সামান্য জ্ঞানপড়ার পর থেকে তাকে উপার্জনের পথে হাঁটতে হচ্ছে। সেদিক থেকে শুভ অনেক ভাগ্যবান। দেশ-গাঁয়ে থাকলে তার অবস্থাও রঘুনাথের মতো হত। হাসপাতালের কোয়ার্টারগুলোয় বিদ্যা অর্জনের একটা চাপা প্রতিযোগিতা আছে। এদের স্বচ্ছলতা না থাকলেও শিক্ষার প্রতি আগ্রহটা অনেক বেশি। সরস্বতী মনে প্রাণে চায় শুভ লেখাপড়া শিখে বড়ো হোক। তার জন্য যত কষ্ট স্বীকার করতে হয় সে করবে।

না খেয়েই বাঁধের উপর উঠে এল শুভ। রঘুনাথের সঙ্গে দেখা হলে হাল্কা হত মনটা। অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। মাঝে মাঝে বারোয়ারি তলার বাজারে রঘুনাথের দেখা পেয়ে যায় সে। মেহনতী শরীরের প্রায় সবখানেই লেগে থাকে ধুলোমাটির চিহ্ন। শুভ কিছু জিজ্ঞাসা করলে পায়ের কাছে হাতের কোদালটা নামিয়ে রেখে রঘুনাথ বলত, বিলমাঠে ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান তুলতে গিয়েচিলাম। জানিস মিতে, আজ বরাত মন্দ তাই বেশি ধান পাইনি। তবে আজ একটা ধেড়ে ইঁদুর ধরেচি। ঘরে গিয়ে ভাবচি পুড়িয়ে চাখনা করে খাবো।

ঘেন্নায় শিঁটকে ওঠে শুভ, কী বলিসরে, ইঁদুরও খাবি? কোনো কিছু বাদ দিবি না বুঝি?

—ইঁদুর আমরা আজ থেকে নয়, বহুকাল আগে থেকে খাই। রঘুনাথের সরল হাসির মধ্যে কোনো পাপ নেই। এখানে জাতিতে জাতিতে খাদ্যাভাস বদলে যায়। শুভ ঘাড় তুলে বেলা পরখ করার চেষ্টা করে। দুটোর বাসটা ছাড়ার সময় হয়ে এল। বাসের হর্ন বাজাচ্ছে সিটে বসে থাকা ড্রাইভার। যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার এই এক ফন্দি।

যত বেলা বাড়ছিল ততই দুঃশ্চিন্তার মধ্যে হাঁপিয়ে উঠছিল অবনী। মুহূর্তের ভুলের জন্য তার এই হেনস্থা। হাসপাতালের মাঠটা কম বড়ো নয়, গাছগাছালিতে ভরা। বিশেষ করে খেজুরগাছগুলো ঝাঁকড়া মাথার পাহারাদারদের মতো দাঁড়িয়ে। এই শীতে এখনও ঘাসগুলো সতেজ। তবে রোদ উঠলে ঘাসফুলগুলো মুড়ি মিয়ানোর মতো মিইয়ে যায়। তখন মনে হয় ওদের বুঝি অসুখ করেছে।

এতক্ষণ যা করেনি, শেষ পর্যন্ত তাই করল অবনী। গলা ফাড়িয়ে সে ডেকে উঠল। মাঠ ফিরিয়ে দিল প্রতিধ্বনি। এবড়ো-খেবড়ো চেহারার খেজুরগাছগুলো যেন দাঁত বের করে বিদ্রুপের হাসিতে ফেটে পড়ল।

বার দশেক ডাকার পরেও সাড়া পেল না অবনী। টিকাদারবাবুর কোয়ার্টারের কাছে সরকারি কল। সেখানে এসে অবনী গো-হাঁপান হাঁপায়। বালতিতে জল ঢেলে স্নান করছিলেন টিকেদারবাবু। তাঁর বেঁটেখাটো চেহারাটা গোল করে কাটা মাখনের মতো। তিনি যে চোখে লাগার মতো বেঁটে এখন আর কাউকে বলে দিতে হয় না। সবুজ তার ছেলে। শুভর সঙ্গে পড়ে। খেলা পেলে

সে শুভর ধারে কাছে যায় না, তখন পড়াশোনা সব শিকেয় তুলে দিব্যি টো-টো করে ঘোরে। এই ফালতু ঘুরে বেড়ানো পছন্দ করেন না টিকেদারবাবু। গলা সপ্তমে তুলে বলেন, যে সময়ের হিসাব বুঝে নেয় না তার জীবনে কষ্ট আছে। সময় হল ভগবান। তাকে প্রতিক্ষণে স্মরণ করা উচিত।

অবনী জল খাবার জন্য কলপাড়ে দাঁড়াতেই গায়ে জল ঢালা অবস্থায় সরে দাঁড়ালেন টিকেদারবাবু, জল খাবে? আসো। আমি কল টিপে দিচ্ছি।

জল খাওয়া শেষ হলে টিকেদারবাবু অবনীর মুখের দিকে তাকালেন। হালকা হাসিতে ঠোঁট ভরিয়ে বললেন, তোমার ছেলে তো মারভেলাস রেজাল্ট করেছে অবনী। ক্লাসের মধ্যে সেকেন্ড হয়েছে, এ কী কম কথা।

ফার্স্ট-সেকেন্ডের কিছু বোঝে না অবনী, তবু টিকেদারবাবুর কথাগুলো তার ভালো লাগল। টিকেদারবাবু বললেন, ছেলেটা যতদূর পড়তে চায়, পড়িও। ওর পড়াশোনা বন্ধ করে দিও না। আমার মন বলছে এই ছেলে তোমার দশজনের একজন হবে। জলভরা বালতিতে মগ ডুবিয়ে গায়ে ঢালছিলেন টিকেদারবাবু, তা সত্ত্বেও তার কথাগুলো যে বানানো নয় তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল অবনী। এক ধরনের অপরাধবোধ বিপন্ন করে তুলল তাকে। ঝোঁকের মাথায় ছেলেটা আবার কিছু করে বসল না তো। এই ভাবনাটা মনে আসতেই আঁতকে উঠল সে।

কলপাড় থেকে অবনীর কোয়ার্টারটা ছবির মতো দেখা যায়। সরস্বতী পেঁপেগাছটার পাশে এসে হাঁ করে তাকাল অবনীর দিকে। কথা বলারও ইচ্ছে নেই, কেমন একটা বিতৃষ্ণা। একটা ঘৃণার স্রোত ঠেলে উঠছিল তার চোখে-মুখে। আপাত শান্ত এই মানুষটাকে সে কি বুঝতে পেরেছে এখনও? হঠাৎ এমন সব কাণ্ড করে বসে লোকটা যা মেনে নেওয়া যায় না। তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে মুখ নীচু করে হেঁটে এল কলতলায়। আজকের আনন্দের দিনটা মাটি করে দিয়েছে ওই লোকটা। ওর জন্য শুভ না খেয়ে ঘর থেকে চলে গেল। কথা ছিল পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করলে সার্কাস দেখার পয়সা দেবে সরস্বতী। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল অবনীর উপর, তোমার কি কোনোকালে বিবেক বুদ্ধি হবে না? ছেলেটাকে ওভাবে কেউ দুপুরবেলায় তাড়িয়ে দেয়? অবনী শুধু একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। তার মুখে কোনো উত্তর নেই। সে জানে আগুনে ঘি ঢাললে আরও আগুন বাড়বে।

সরস্বতী কথার সূত্র ধরে বলল, যাও, যেখান থেকে পার শুভকে খুঁজে আন। ওকে সঙ্গে না নিয়ে এলে আমি তোমাকে ঘরে ঢুকতে দেব না। জেদে ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে সরস্বতীর শ্যামলা মুখখানা। ভেতরে ভেতরে সে যে কতটা উত্তেজিত তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

টিকেদারবাবু গায়ে জল ঢালা থামিয়ে ওদের দু'জনের দিকে তাকালেন, কি হয়েছে, তোমরা ঝগড়া করছ কেন? শুভ কোথায় গিয়েছে? তবে যেখানেই যাক, খাওয়ার সময় ঠিক ফিরে আসবে। পেটে টান ধরলে তখন দেখবে সব মান-অভিমান কর্পূরের মতো উবে গেছে।

অবনী একথায় কান দিল না, সে শুধোল, বাবু আপনাদের ঘরের সবুজ কোথায়?

টিকেদারবাবু তাচ্ছিল্য মিশিয়ে বললেন, ও আর যাবে কোথায়? ঘরে গিয়ে দেখো-খাচ্ছে। যতক্ষণ ঘরে থাকে শুধু খা-খা করে বেড়ায় ছেলেটা। আগের জন্মে বুঝি রাক্ষস ছিল। টিকেদারবাবু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তাঁর মনের কথাটা বললেন, ছেলেটার উপর অনেক আশা ছিল। ছেলে আমার সব আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। শুধু ভয় হয়, পড়াশোনা না করলে ওদের ভবিষ্যৎ জীবন চলবে কি করে? আমি তো আর চিরদিন থাকব না। এখন থেকে নিজেই যদি নিজেরটা না বোঝে তাহলে অন্ধকারের মধ্যে পড়ে যাবে। তখন আর পথ খুঁজে পাবে না।

অবনী শুভর ফেরার পথের দিকে তাকিয়ে ছিল। টিকেদারবাবুর মুখের উপর সে কোনো কথা বলার সাহস পায় না। মানুষটা রাশভারী। রেগে গেলে আর রক্ষে থাকে না। সেই ডাকাবুকো মানুষটি খেদের সঙ্গে বললেন, দুটো ভালো মাস্টার দিলাম তবু দেখো কেমন বিশ্রি রেজাল্ট করল। বলতে গেলে টেনেটুনে পাশ। হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে বাজারে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি সাবধান করে বললেন, ছেলেটার দিকে নজর দিতে। ওর একদম পড়াশোনায় মন নেই। ওর মাকে বললে ছেলেটাকে শাসন করে না। শুধু বলে, বয়স হলে ঠিক হয়ে যাবো দেখা যাক কি হয়?

বেলার দিকে তাকিয়ে অস্থির হচ্ছিল সরস্বতী, অবনীকে কনুই দিয়ে ঠেলা মেরে বলল, শীতের বেলা ঝটপট ফুরিয়ে যাবে। যাও একবার ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকে ঘুরে এসো। বলা যায় না, ওখানেও যেতে পারে। আজ যেন রোদের ভীষণ চড়া মেজাজ। পায়ের চড়া পড়া পথে রোদ হাওয়ার সে কি চিরন্তনী খেলা। হাসপাতালের মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গোরু চরছে, রাখালের গলা শোনা যাচ্ছে মাঠের কোণ থেকে। অবনী দ্রুত পায়ে হাঁটছিল। ডাক্তারবাবুর বাড়িটা বাসরাস্তার কাছাকাছি। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে প্রশ্ন করল অবাক মাধুরী, কাকু, বাবাকে কি ডেকে দেব?

না। আমি শুভকে খুঁজতে এসেছি।

—কেন শুভ আবার গেল কোথায়? মাধুরীর বিস্ময়ভরা গলা, এক সাথে তো ঘরে ফিরলাম। সঙ্গে আরো অনেকেই ছিল। জান কাকু, আজ শুভ আমাদের হাসপাতালের নাম বাড়িয়ে দিয়েছে। হেড-মাস্টার মশাই ওর প্রশংসা করছিলেন। আমার এত ভালো লাগছিল যে তোমাকে ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। মাধুরীর লাবণ্য ভরা মুখখানা কথা বলার সাথে সাথে ভোরের শিউলি ফুলের মতো তরতাজা হয়ে উঠল। হা-করে তাকেই দেখছিল অবনী। তার মনে হল মা দুর্গার জীবন্ত কিশোরী ছায়া তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বনশ্রী ভেতর থেকে শুনছিলেন তাদের কথাবার্তা। ঘরের ভেতর থেকে তিনি মাধুরীকে প্রশ্ন করলেন, কে এসেছে রে, মাধুরী?

—অবনী কাকু।

—বসতে বল, আমি যাচ্ছি।

ঘর গুছিয়ে বনশ্রী যখন বাইরে এলেন, তখন অবনীর বুকের ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠছিল শুভর জন্য চিন্তা করে। শুভকে খুঁজে না নিয়ে গেলে সরস্বতী যে পাড়া মাথায় তুলে তার সঙ্গে ঝগড়া করবে এ বিষয়ে সে একশ ভাগ নিশ্চিত।

বনশ্রীর নজর এড়াল না অবনীর অস্থিরতা, কি ভাবছ অবনী? কোনো সমস্যায় পড়েছ নাকি?

—না, তেমন কিছু নয়। আমি বাবুর কাছে এসেছিলাম একটা দরকারে। অবনী হাত কচলে গদগদ চোখে তাকাল।

বনশ্রী বললেন, তোমার ছেলের রেজাল্টে আমরা গর্বিত। তোমার বাবু বলছিলেন, ওর মধ্যে ট্যালেন্ট আছে। একটু নজর রেখো।

একটা কাঠের টুলের উপর বসেছিল অবনী।

বনশ্রী বললেন, তুমি বসে বসে মাধুরীর সঙ্গে গল্প করো। আমি গিয়ে ওকে ডেকে দিচ্ছি। আর একটা কথা। আজ বিকেলে তোমাদের কোয়ার্টারের দিকে যেতে পারি। সরস্বতীকে বলো—

মিনিট দশেক পরে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে বারান্দায় এলেন ডাক্তারবাবু। ফর্সা, টুকটুকে চেহারা। প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা। ডাক্তারবাবুকে দেখে টুল থেকে উঠে দাঁড়াল অবনী।

মাধুরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, কাকু, এবার তুমি বাবার সাথে কথা বলো। আমি যাই—। মাধুরী ঘরে ঢোকার আগেই তুলে রাখা পর্দাটা নামিয়ে দিল।

একটা চেয়ার টেনে আরাম করে বসলেন ডাক্তারবাবু। সিগারেট ধরিয়ে বললেন, কি ব্যাপার, কোনো দরকারে এসেছ বুঝি?

অবনী ঢোক গিলে ইতস্তত স্বরে বলল, ছেলেটার রেজাল্ট বেরিয়েছে। আমার শ'পাঁচেক টাকা ধার চাই। তিন মাসে শোধ করে দেব।

ডাক্তারবাবু সিগারেটে টান দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন, এতগুলো টাকা নিয়ে কি করবে, বই কিনবে বুঝি?

অবনী প্রশ্রয় পেয়ে সত্যি কথাটা বলল, না বাবু বই আমি পরে কিনব, আগে ওর একটা সাইকেল কেনার দরকার।

—কেন এত আর্জেন্ট কিসের? ডাক্তারবাবু বাঁকা চোখে তাকলেন। অবনী পানসে হেসে বলল, ছেলেকে কথা দিয়েছিলাম, ভালোভাবে পাশ করলে একটা সাইকেল কিনে দেব। ছেলে তো শুধু পাশ করেনি, সেকেন হয়েছে। সেইজন্য টাকাটা দরকার। বাজারের সাইকেল দোকানী নিখিল পোদ্দারকে বলেছি, সে বলেছে কমসম করে একটা নতুন সাইকেল দিয়ে দেবে।

—বেশ ভালো কথা। ডাক্তারবাবু বাক্যহারা চোখে তাকালেন, তার মনের গভীরে যে ঝড় উঠছে, সেই ঝড়কে সামাল দিতে তিনি অপারগ। সামান্য ঝাড়ুদারের ছেলের কাছে মাধুরী এমনভাবে হার স্বীকার করে নেবে যা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। এ গ্রাম কেন, আশেপাশের দশটা গ্রামে তাঁর একটা মানসম্মান আছে। সেই মানসম্মানে সামান্য হলেও টোল খেল। পরীক্ষার ফলাফল তিনি দু-দিন আগেই শুনেছেন। মাথুর স্যার হাসপাতালে ওষুধ নিতে এসে ক্লাস এইটের রেজাল্ট সব বলে গিয়েছেন। মাধুরী মাত্র চার নাম্বার কম পেয়েছে শুভর থেকে। শুভ এই চার নাম্বার বেশি পেয়েছে অঙ্কতে। শুভ কেন বেশি পাবে এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না ডাক্তারবাবু। তাই একথা সে কথার পর তিনি একটা অনুরোধ রেখেছিলেন মাথুর স্যারের কাছে। বড়ো আজব আর স্পর্শকাতর সেই অনুরোধ। ডাক্তারবাবু খুব অসহায় স্বরে বলেছিলেন, মাস্টারমশাই, একটা অনুরোধ আছে। আমি এই হাসপাতালের ডাক্তার। অবনী এই হাসপাতালের ঝাড়ুদার। শুভর কাছে মাধুরী যদি পিছিয়ে পড়ে সেটা কখনও ভালো দেখায় না। আমার মান সম্মান নিয়ে টানা হিঁচড়া হয় তাহলে। তাই বলছিলাম—একটু যদি এদিক ওদিক করা যেত, তাহলে মনে হয় সাপও মরত, আর লাঠিও ভাঙত না।

—আমি ঠিক বুঝলাম না ডাক্তারবাবু? মাথুর স্যার বিস্মিত চোখে তাকালেন।

—এটা খুব সিম্পল ব্যাপার। ডাক্তারবাবু জোর করে হাসলেন, আপনি ওদের ক্লাস-টিচার। শুধু ক্লাস-টিচার নন, অঙ্কেরও স্যার। আপনি চাইলে মাধুরীর পাঁচটা নাম্বার বাড়িয়ে দিতে পারেন। এতে কোনো রিস্ক নেই, লিক হবারও চান্স নেই।

—তার মানে? কঠিন চোখে তাকালেন মাথুর স্যার, আপনি যা বলছেন তা মেনে নেওয়া যায় না। আর তাছাড়া, এভাবে মেয়েকে স্ট্যান্ড করিয়ে আপনার কি লাভ হবে? মাধুরী যেমন আপনার মেয়ে, তেমনি শুভও আপনার ছেলের মতো। ওর বাবা আজ ভাগ্যদোষে ঝাড়ুদার পোস্টে এসেছে। তাছাড়া, ঝাড়ুদারের ছেলে যে কোনোদিন স্ট্যান্ড করতে পারবে না এমন কথা কোথাও কিন্তু লেখা নেই।

—না, আমি তা বলছি না। আমি জাস্ট বলছিলাম...যদি...

—যদির কথা নদীতে ফেলে দিন ডাক্তারবাবু। আগে পয়সা দিয়ে ডাক্তারীতে ভর্তি হওয়া

যেত, এখন আর তা যায় না। এখন বুদ্ধি আর মেধার দরকার। মাথুর স্যার বললেন, আমি আপনার অন্যায় অনুরোধ রাখতে পারলাম না বলে দুঃখিত। তবে যাওয়ার আগে আমি একটা কথা বলে যাই। যুগ বদলাচ্ছে। যুগের সাথে আপনার মনটাকেও বদলান। দেখবেন-এসব সমস্যা কোথায় চলে গিয়েছে। মাথুরবাবু হনহনিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, ফিরে এসে বললেন, যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই। আমি কেন, কোনো শিক্ষকই আপনার এই প্রস্তাব মেনে নেবেন না। আর যদি কোনো শিক্ষক লোভে পড়ে মেনে নেন, তাহলে সেটা হবে তাঁর আত্মহত্যার সমান। তবে আপনার এই প্রস্তাবটি আমি হেড- মাস্টারমশাইয়ের কানে তুলে রাখব। তাতে তাঁর মানুষ চিনতে সুবিধে হবে।

অবনীর মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয় ডাক্তারবাবুর। তিনি শ্লেষের সঙ্গে বলেন, হ্যাঁ, শুনেছি— তোমার ছেলে সেকেন্ড হয়েছে। বেশ আনন্দের কথা। গর্বে আমার বুকের ছাতি ফুলে যাচ্ছে। তোমারও অনেক গর্ব হচ্ছে বুঝতে পারছি। তবে মনে কিছু করো না, একটা কথা বলি। সেকেন্ড হয়েছে বলেই যে তাকে সাইকেল কিনে দিতে হবে তার তো কোনো মানে নেই। আজ সাইকেল চাইছে, কাল হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে বলবে, বাবা, এরোপ্লেন কিনে দাও—তখন পারবে তো ছেলের সখ মেটাতে?

এমন কঠিন উত্তর প্রত্যাশায় ছিল না অবনীর, তবু সে জোরের সঙ্গে বলল, যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে অবশ্যই এরোপ্লেন কিনে দেব। ছেলের জন্য কিনব—এতে তো আমার গর্ব হওয়া উচিত।

—এত যখন গর্ব বুকে তখন আমার কাছে হাত পাতছ কেন?

—আপনি বড়োলোক। জানতাম—দয়ালু। সেইজন্য—

—ঠিক আছে সন্ধেবেলায় এসে টাকাটা নিয়ে যেও। ডাক্তারবাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, আর আমি বকবক করতে পারছিনে। এবার তুমি যাও। ফিরে আসার সময় অবনী দেখল, ঈষৎ পর্দা ফাঁক করে ছলছল চোখে তাকিয়ে আছে মাধুরী। তার জোড়া চোখে সহানুভূতির বান ডেকেছে। বোবা থেকে সে যেন অনেক না বলা কথা বলে দেয়। অবনী কার উপর অভিমান করবে? একটা ডাল শুকিয়ে গেলেও অন্য ডালে তো ফুল এসেছে। ফুল এসেছে যখন সুগন্ধ তো ছড়াবেই।

ফেরার সময় ডলি দিদিমণির সঙ্গে দেখা হল কিচেন ঘরের সামনে। অবনী দেখল তাঁর পরনে এখনও ডিউটির পোষাক। ক্লান্ত পায়ে তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন ঘরের দিকে। অবনীকে দেখে তিনি থামলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন হাওয়ায়, দুপুরবেলায় কোথা থেকে ফিরলে গো অবনী? বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে! কি হয়েছে?

—কই, কিছু হয়নি তো? গলা ঝেড়ে নিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করতে চাইল সে। ডলি দিদিমণি মিষ্টি করে হাসলেন, তোমার কাছে একটা খাওয়া পাওনা থাকল। শুভ সেকেন্ড হয়েছে শুনেছি। ওকে বলো পরের বছর ওকে ফার্স্ট হয়ে দেখাতে হবে।

—ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হবে। অবনী আকাশের দিকে মুখ করে তাকাল, তারপর মুখ নামিয়ে এনে বলল, আপনাদের সবার আশীর্বাদ থাকলে ও ঠিক পারবে। আমি তো মুখ্যু মানুষ। ক-লিখতে কলম ভাঙে।

—গাদা গাদা বই পড়ে কি শিক্ষিত হওয়া যায় নাকি? ডলি দিদিমণি বললেন, মানুষ হতে গেলে কেতাবী শিক্ষা না থাকলেও চলে। মানবতা যে পাঠশালায় পড়ানো হয়, তার নাম হৃদয়। হৃদয় শুধুমাত্র পাঠশালা নয়, সেখানে ফুলের বাগানও থাকে। সুগন্ধে ম-ম করে মনের উঠোন।

কদবেল তলার পাশ দিয়ে বাজারে যাওয়ার পথ। আশে পাশের টালিখোলায় কাজ চলছে পুরোদমে। দু-একটা কুকুর ছন্নছাড়া মনোভাব নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। বাঁশবাগানে হাওয়ার

শনশনানী। শুকনো পাতাগুলো শূন্যে ঘুরপাক খেতে খেতে নেমে আসছে মাটিতে। এ সময় সব থেকে বেশি পাখি ডাকে মনে হয় অবনীর। দুপুরবেলায় ঘুঘুর ডাক তার ক্লান্তিকে আরও যেন প্রকট করে তোলে।

বারোয়ারিতলা শুনশান। একটা কুকুর পেট থেবড়িয়ে শুয়ে আছে। তার গায়ে মিহি রোদ এসে পড়েছে। চারধার খুঁজে ক্লান্ত অবনীকে হতাশ দেখাচ্ছিল খুবই, বুকের ভেতরটা জ্বালাপোড়া করছিল অস্থিরতায়। বুক হালকা করে যে কথা বলবে—তেমন কাউকে খুঁজে পেল না। উল্টে একটা ভয় এসে ছোবল মারতে লাগল তাকে। শুভ যেন কিছু না করে বসে। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠছে। আর এখানে দেরি করা উচিত হবে না। বেলা ক্রমশ বাড়ছে। এবার ঘরে ফেরা দরকার।

পিচ রাস্তায় ধুলোর পুরু আস্তরণ, যেন কেউ মেটে রঙের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে কালীগঞ্জ থেকে হরিনাথপুর। একটু হাওয়া দিলেই ধুলোগুলো সব প্রাণ পেয়ে উড়তে শুরু করে। সেইরকম একটি ঘূর্ণায়মান ধুলোর বৃত্তে অকস্মাৎ ঢুকে গিয়ে আঁকুপাকু করে অবনী। সর্বাঙ্গে ধুলোর স্পর্শ তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। তবু হাঁটতে হাঁটতে তার মনে পড়ে ডাক্তারবাবুর নিষ্ঠুর কথাগুলো। মানুষটাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে মনে মনে তিনি এত বিষ ধরে রাখেন। সকালে আউটডোর ঝাড়ু করার ঘটনাটাও অন্যায়। অন্যের পাপ তাকে কেন খণ্ডন করতে হবে? শুভকে নিয়ে ঈর্ষার আগুন ডাক্তারবাবুর চোখে ধিকিধিকি করে জ্বলছে। ছেলেটার সাফল্য তিনি সহ্য করতে পারছেন না। এত বড়ো মাপের একজন মানুষকে হঠাৎ করে এমন বেঁটে দেখাবে—একথা স্বপ্নেও যে ভাবা যায় না।

পথ শেষ হয়ে আসে কোয়ার্টারের সামনে।

অবনীর পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সরস্বতী। মানুষটার বিধ্বস্ত, ক্লান্ত চেহারা দেখে তার দয়া হল। সরস্বতী কাছে এসে নীচু স্বরে বলল, শুভ ঘরে এসেছে। তুমি যাও চাপা কল থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আসো। আসার সময় এক বালতি জল এনো।

—ও কোথায় গিয়েছিল? অবনী ঝুঁকে পড়ল সরস্বতীর দিকে।

—ওসব আমি পরে বলছি। এড়িয়ে যেতে চাইল সরস্বতী।

কথা না বাড়িয়ে বালতি নিয়ে চলে গেল অবনী। কিছু পরে সরস্বতীও চলে এল কলতলায়। চারপাশ দেখে নিয়ে বলল, সবুজ আমাকে খবর দিল শুভ আমতলায় শুয়ে আছে। আমি গিয়ে দেখি আমগাছের ছায়ায় দুহাত মাথায় দিয়ে ও ঘুমাচ্ছে। কিছুতেই আসবে না। জোর করতেই কেঁদে ফেলল। তার সে কী কান্না, আমিও আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি।

—যা হয়েছে সব ভুলে যাও। অবনীর গলা কেঁপে উঠল অনুশোচনায়। সেই কখন থেকে সে পুড়ছে, আর পোড়াতে চায় না নিজেকে। এবার মলমপট্টি করা দরকার।

শান বাঁধানো মেঝেতে পাশাপাশি খেতে দিয়েছে সরস্বতী। ছ্যালার উপর ফুল তোলা আসন। সুতো দিয়ে আঁকা লাল ফুলগুলো যেন সুগন্ধ ছড়াচ্ছে ঘরের ভেতর। খেতে বসেও শান্তি পায় না অবনী। আজ নানা কারণে তার বাজারে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ঘরে কি ছিল কে জানে!

অভাবের সংসার তো তলা ফুটো নৌকো, কখন ভুস্ করে ডুবে যাবে কে জানে। আজকের এই বিশেষ দিনে পোয়াখানিক মাছ আনা তার উচিত ছিল। তা যখন হয়নি তখন আর কি করা যাবে! মুখ নীচু করে সে সরস্বতীর জন্য অপেক্ষা করছিল। রান্নাঘর থেকে দুটো থালায় ভাত বেড়ে আনল সরস্বতী। কাঁসার থালায় তরকারি সে সাজিয়ে দিয়েছে। শুধু ডালের বাটিটা পাতের গোড়ায় বসিয়ে সরস্বতী বলল, খাও, বেলা অনেক হল।

পাশাপাশি বসে খাওয়া শুরু করল ওরা। খেতে খেতে আড়চোখে ছেলের দিকে তাকাচ্ছিল অবনী। এত কাছে আছে তবু যেন মনে হয় কত দূরের সম্পর্ক! তার যেন ভয় করছে ছেলের

দিকে তাকাতে। ছেলের জন্য যে গর্ববোধ এতক্ষণ তার বুকে জোয়ারের ঢেউয়ের মতো বয়ে যাচ্ছিল তা হঠাৎ এক জায়গায় থেমে যেতে সে কেমন অসহায় চোখ-মুখ করে তাকাল।

আজ ডাল দিয়ে খাওয়া সাঙ্গ করতে হবে এমন যখন ভাবছে অবনী তখন ডিমের ঝোল নিয়ে এল সরস্বতী। ডিমগুলো বেশ বড়ো বড়ো। বোঝা গেল হাঁসের ডিম। অন্যদিন হলে এই হাঁসের ডিমের জন্য সে ঝগড়া বাঁধিয়ে বসত, আজ তার ঐ ডিমটাকে মনে হল আকাশের তারা। হাঁসের ডিম খেলে নাকি বাতের ব্যথা বেড়ে যায়, শরীরের গাঁটগুলোয় যন্ত্রণা শুরু হয়। আজ আর কোনো যন্ত্রণা বা ভয় নয়—অবনী আলতো আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দিল ডিমটা, আর সঙ্গে সঙ্গে ভালো লাগার অনুভূতিগুলো বসন্তের হাওয়া লাগা পলাশগাছের মতো তাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। খেতে খেতে অবনী শুধাল, ডিম কোথায় পেলে, ঘরে ছিল বুঝি?

সরস্বতী জানত অবনী এই প্রশ্নটা করবে, তাই বিনা সঙ্কোচে বলল, পাশের কোয়ার্টার থেকে চেয়ে এনেছি। শুভ যে আমিষ ছাড়া খেতে পারে না।

বুক ভরে একটা শ্বাস নিল অবনী। বুকের ভেতর একটা তিরতিরে সুখের স্রোত বয়ে যাচ্ছে টের পেল সে।

খাওয়া শেষ করে উঠে যাওয়ার সময় সরস্বতী বলল, শোন, ডাক্তারবাবুর মেয়ে মাধুরী এসে পাঁচশ টাকা দিয়ে গেছে। দুপুরবেলায় এসেছিল সে। বসতে বললাম এত করে, বসল না। চলে গেল।

পর্দার আড়ালে সেই ছলছলে চোখ দুটোর কথা মনে ভেসে উঠল অবনীর। সত্যি, এ পৃথিবীতে কত কি যে খেলা চলে বোঝা মুশকিল।

শীতের রোদ যতই নম্র হোক তবু তারও একটা জ্বলন আছে। জানলা খোলা থাকলে এ ঘরে রোদ্দুর সরাসরি এসে হা-ডুডু খেলে বেড়ায় মেঝেয়। নানা ধরনের চিহ্ন, প্রতিকৃতি তৈরি হয় এই রোদ খেলায়। তক্তপোষে শুয়ে হা-করে সেই সবই দেখছিল শুভ। সরস্বতী কাঁথায় ফোঁড় তুলতে যাওয়ার সময় বলেছে, খেয়েছিস দেয়েছিস, এবার একটু ঘুমো। বিকেলে একবার মাধুরীদের ওখানে যাস। কেন পাঁচশ টাকা দিয়ে গেল-সেটা জিজ্ঞেস করা দরকার।

শুয়ে শুয়ে ঘাড় নাড়ল শুভ। এ ঘরে তেমন দামী কোনো আসবাবপত্র নেই, কমা কাঠের তক্তপোষের উপর ছেঁড়া কাঁথাগুলো যত্ন নিয়ে পেতে দিয়েছে সরস্বতী। একটা তোষক কেনার কথা ভাবলে স্বপ্ন বলে মনে হয় শুভর। সরস্বতীর এতে কোনো আক্ষেপ নেই। সে জোর গলায় বলে, যা আছে তা নিয়ে মানুষকে সুখে থাকতে হয়। যতটুকু সুখ আমার প্রাপ্য ততটুকু আমি তো পাবই। আমার ভাগেরটা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

সুখ কাকে বলে জানে না শুভ। জানার চেষ্টাও করেনি কোনোদিন। তবে তাদের ক্লাসের সুপ্রিয় পোদ্দারকে দেখে তার মাঝে মধ্যে ভীষণ মন খারাপ করে। ওদের টাকা-পয়সার অভাব নেই, তবু ব্যবহারে ওকে কেমন গরীব বলে মনে হয়। ডাক্তারবাবুর মেয়ে মাধুরী ওকে একটু ভয় পায়, তাই সাবধানে এড়িয়ে চলে। সেদিন ইস্কুলে সুপ্রিয় বলেছিল, শুধু পয়সা থাকলে হয় না, তা খরচ করার মতো মনও থাকতে হয়।

তার এই হালকা কথায় অহঙ্কারের ছোঁয়া ছিল। তিলের খাজা বিক্রি করতে আসা সহদেব ওই অতটুকু ছেলের কথা শুনে তাজ্জব। পরে সুপ্রিয় চলে যাবার পর সহদেব সতর্ক গলায় বলেছিল, এ ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যার বাবা কেরসিন তেল ব্ল্যাক করে তার ছেলে আর কত ভালো হবে। কাঁটা বাঁশের কঞ্চিতেও বিষকাঁটা থাকে।

সুপ্রিয় পোদ্দার যে গ্রামের ছেলে এটা তার চেহারায় কথাবার্তায় বোঝা যায় না। সে রোজই আলাদা-আলাদা জামা-প্যান্ট পরে ইস্কুলে আসে। এসব জামা কাপড় তার মা বহরমপুর, কাটোয়া বা কৃষ্ণনগর থেকে কিনে আনে। ফলে সে যে ব্যতিক্রমী তা তার চেহারায় ফুটে ওঠে। মাধুরী একেবারেই পছন্দ করে না সুপ্রিয়কে। এই বয়সে এত উপর চালাকি কার-ই বা ভালো লাগে। তবু সুপ্রিয় গায়ে পড়ে বলবে, আজ আমাদের বাড়ি গেলে তোকে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাব।

আগ্রহ প্রকাশ পায় না মাধুরীর কণ্ঠস্বরে, তবু সে বলে, কি দেখাবি কি?'

—আমার দাদুর আমলের একটা হাতির দাঁত আছে। আহাঃ, কী সাদা ধবধবে। একবার দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারবি না। সুপ্রিয়র কথায় মাধুরীর চোখের তারা কালো আঙুরের মতো চকচকিয়ে ওঠে না। সে বরং অমনোযোগী শ্রোতার মতো চুপ করে থাকে। বেশি বিরক্ত করলে সে সরাসরি সুপ্রিয়কে ধমকায়, আমাকে নিয়ে তোর এত না ভাবলেও চলবে। তুই নিজের চরকায় তেল দে।

তক্তপোষে শুয়ে থাকলে পুরনো রেডিওটার সুইচ অন করে দেয় শুভ। রেডিও শোনা তার কাছে একটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছে। কখনও সখনও তা বাড়াবাড়ি মনে হয় সরস্বতীর কাছে। সে নানা ধরনের গান শুনতে পছন্দ করে। প্রতি রবিবার যে নাটকটা হয়—সেই রেডিও-নাটক শোনার জন্য সারা সপ্তাহ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে সে। এখানে সময় কাটতে চায় না কিছুতেই। সব কোয়ার্টারে রেডিও ছিল, শুধু তাদেরই ছিল না। হাজারবার বলার পর অবনী এটি কিনে এনেছে কালীগঞ্জ বাজার থেকে। এ সংসারের কোনো জিনিসই তার কিস্তি ছাড়া কেনা হয়নি। ক'টাকাই বা মাইনে পায় সে। যা পায় তা ধার মেটাতেই চলে যায়। ফলে টানাটানি লেগেই থাকে। নিজের চোখে সব দেখে দেখে শুভর কেমন বিতৃষ্ণা জন্মায় এই বেঁচে থাকার উপর। স্বচ্ছলতা শব্দটার সঙ্গে তার এখনও পরিচয় হল না—এটাই আক্ষেপ।

রেডিওতে খেয়াল শুরু হতেই সুইচ অফ করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল শুভ। খেয়ালের সে কিছু বোঝে না, তাই শুনতেও ভালো লাগে না।

এক গাদা পুরনো কাপড়ের পোঁটলা বগলদাবা করে ঘরে ঢুকল সরস্বতী। শুভ তখন পারা চটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। বাবার সঙ্গে সেই থেকে কোনো কথাবার্তা হয়নি, সে নিজেই ইচ্ছে করে কথা বলেনি। বাবা তার কাছে দুর্বলতম জায়গা—এটা বুঝতে পারে সে। বাবার প্রতি অভিমান হলেও তা যেন ঝড়ো মেঘের মতো অপসৃয়মান হয় যে কোনোসময়।

সরস্বতী পুরনো কাপড়গুলো তক্তপোষের নীচে নামিয়ে রেখে বলল, কোথায় যাচ্ছিস? যেখানেই যাস না কেন, আগে মাধুরীর সঙ্গে দেখা করে যাবি। সে বেচারি দুপুরবেলায় এসে টাকা দিয়ে চলে গেল। বসতে বললাম, বসল না। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল খুব চাপের মধ্যে আছে।

এতটুকু মেয়ের আর কী চাপ থাকতে পারে? মনে মনে ভাবল শুভ। যাদের কোনো অভাব নেই, অর্থকড়ি আছে—তারা সবরকমের চাপ মানিয়ে নিতে পারে। শুভর ঠোঁটে নিশ্চুপ হাসির আভা ফুটে উঠল, সরস্বতী ছেলের হাবভাব লক্ষ্য করে বলল, সন্ধে লাগার আগে ঘরে ঢুকে যাবি। যদি সময় পাস তাহলে তোর অতসী পিসির বাগানের কাজগুলো আজ করে দিস। দিদি বারবার করে বলছিল—

শুভ ঘাড় নেড়ে বাইরে এল।

শীতের বিকেল বেশ রমণীয় হয়ে উঠেছে মোহনী আলোয়। এ এলাকায় সন্ধে নামার আগে শীত চলে আসে। একটা হাফ হাতা সোয়েটারে সেই শীত কাটতে চায় না। অবনী বলেছে, একটা তুষের চাদর কিনে দেবে বেতন পেয়ে। পুরনো মাফলারটার রঙ উঠে গিয়ে এখন কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে দেখায়। গলায় জড়াতে ভালো লাগে না শুভর।

মাধুরী হয়ত তার অপেক্ষায় ঘুরঘুর করছিল বারান্দায়। লম্বা বারান্দায় ঠিক মাঝখানে চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন ডাক্তারবাবু। কলার মোচার মতো মুখটা ঝুঁকে আছে সেন্টার টেবিলের দিকে। ডাক্তারবাবু ঘরে থাকলে শুভর গলার স্বরে ভয়জনিত জড়তা প্রকাশ পায়। ওই রাশভারি মানুষটার কাছে সে সহজ হতে পারে না। যা বলার নয়, মুখের উপর তাই বলে দেন ডাক্তারবাবু। মনে কষ্ট পেলেও চুপ করে থাকতে হয় তাকে। মা তাকে বলেছে, বড়োদের মুখের উপর তর্ক করতে নেই। বড়োরা যা বলে তা বুঝে-শুনেই বলে।

ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎবেগে চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয় শুভ। মাধুরী তার অস্বস্তির কথা জানত। সহজ হেসে বলল, চল, আমরা ঘরে গিয়ে বসি। এখানে বকবক করলে বাবার অসুবিধা হবে।

খবরের কাগজ সরিয়ে বাঁকা চোখে তাকালেন ডাক্তারবাবু, গল্প করে তো আজ এত নীচে নেমে গেছো। বেশি গল্পগুজব করলে পড়ার ক্ষতি হয়। রেজাল্ট যাতে আরো ভালো হয় সেই চেষ্টা করা উচিত।

মাধুরী খুশি হল না বাবার কথায়, সব সময় যে স্ট্যান্ড করতে হবে তার কোনো মানে নেই। তাছাড়া পরীক্ষার সময় আমার জ্বর হয়েছিল। আমি ঠিক মতো পড়তে পারিনি।

—ঠিক আছে, আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। সশব্দে পেপার ভাঁজ করে ডাক্তারবাবু শুভর দিকে তাকালেন, কীভাবে পড়তে হয় শুভর কাছে থেকে জেনে নে। ওর টিউশনির মাস্টার নেই, তবু তোকে ডাউন দিয়ে ছেড়ে দিল।

মাধুরীকে তর্ক করার নেশা পেয়ে বসেছে, মাস্টার না থাকল তো কি আছে, ব্রেন তো আছে। ও একবার পড়লেই মনে রাখতে পারে সব। ওর সঙ্গে আমার কোনো তুলনা চলে না। প্রতিভার সঙ্গে পরিশ্রম মিশলে শুভর মতো রেজাল্ট হয়।

—তর্ক না করে চেষ্টা কর। বিরক্তিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তারবাবু, শুভ যদি পারে, তুই কেন পারবি না? ওকি তোর মতো ভালো-মন্দ খেতে পায়? ওর বাবার সামর্থ কোথায় কিনে দেবে?

শুভর কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ায়। মনে মনে ভাবল টেনেটুনে পাশ করলেই বুঝি ঠিক হত। সেকেন্ড হয়ে সে অনেকের বিষনজরে পড়ে গিয়েছে।

মাধুরী শুভকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে শুধাল, তুই কি ঘর থেকে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলি কথা বলবি না বলে, তাহলে এলি কেন?

মাধুরীর চোখে অভিমান। আশাপ্রদ ফলাফল না করার জন্য তার উপরে কম ঝড় বয়ে যায়নি। মা ছাড়া আজকের দিনে তার পাশে কেউ নেই। শুভ সব বোঝে। ধীর গলায় সে বলল, রেজাল্ট নিয়ে এত ভাবনার কি আছে? এখনও নাইন-টেন-ইলেভেন পড়ে আছে। আসল লড়াই তো সেখানে।

—তুই সায়েন্স না আর্টস নিবি? মাধুরী ঝুঁকে পড়ল শুভর দিকে।

—আমার ইচ্ছে সায়েন্স পড়ার। বায়োলজি ফোর্থ সাবজেক্ট রাখব। হেড-মাস্টারমশাই

বলেছেন, যারা অঙ্ক আর বিজ্ঞানে এইটটি পারসেন্ট পেয়েছে কেবল তাদেরই সায়েন্স দেবেন।

মাধুরী মুখ শুকিয়ে বলল, তাহলে তো মাত্র পাঁচজন সায়েন্স পাবে। ধ্যাৎ তা হতে পারে না। সায়েন্স যদি ইস্কুলে রাখতে হয় তাহলে অন্তত কুড়ি জনকে তো সায়েন্স দিতে হবে। আর তাই যদি হয় তাহলে দেখবি আশি থেকে শতকরা পঞ্চাশে নেমে এসেছে নাম্বার।

শুভ অনেক ভেবে ঘাড় নাড়ল, তা ঠিক। তবে সায়েন্স পড়তে গেলে খরচ আছে। আমি ভাবছি—বাবা কি পারবে আমাকে পড়াতে? যা বইয়ের দাম। বই-ই কিনে দিতে পারবে না।

—তুই এত ভাবছিস কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। মাধুরীর চোখে বিশ্বাসের রেণু। শুভর কপালে ভাঁজ পড়ল, সব মানুষ যদি তোর মতো হত তাহলে আমার পড়াটা ঠিক হয়ে যেত। সত্যি বলছি—আমিও তোর মতন এত সুন্দর মন পাইনি।

লজ্জায় রাঙা গালে টোল পড়ল মাধুরীর, আমরা ক'টাই বা মানুষ দেখেছি। আমাদের বয়সই বা কত! ভালোমানুষ সব যুগে ছিল, এখনও আছে।

—হয়ত আছে।

আমি এখন আসি। উঠে দাঁড়াল শুভ।

মাধুরী হাত ধরে বসাল তাকে, বস না, কোথায় যাবি? মাকে বলি আচারের তেল আর মটরশুটি দিয়ে মুড়ি মেখে দিতে। পিঁয়াজ কুচি দিতে বলব তো?

শুভ কোনো উত্তর না দিয়ে মাধুরীর মুখের দিকে তাকাল। নিষ্পাপ সরল মুখখানা মেঘহীন নীল আকাশের মতো।

বনশ্রী মুড়ি মেখে নিয়ে এলেন দুটি বাটিতে। শুভকে দেখে হাসলেন, এবার তোর রেজাল্ট শুনে খুশি হয়েছি। এর থেকেও ভালো রেজাল্ট করতে হবে। ভাব তো তোর বাবা কত কষ্ট করে পড়াচ্ছে। আমরা তো সবার কাছে তোর কথা বলি।

শুভ মনে মনে ভাবল, কাকিমা বললেও ডাক্তারকাকু নিশ্চয়ই তার কথা কারোর কাছে বলে না। আত্মগরিমার আঁচে যে মানুষটা সবসময় পুড়ে আছে—তার কাছ থেকে এসব সৌজন্যতা আশা করা ভুল।

শুভ জোর করে হাসবার চেষ্টা করল। মাধুরী বলল, মায়ের কথাটা মনে রাখিস। মা তোকে ভীষণ ভালোবাসে।

—সেটা আমি জানি।

—জানিস যখন তখন এলেই পালাই পালাই করিস কেন? আসবি চুপচাপ বসে থাকবি। আমি না বলা পর্যন্ত কোথাও যাওয়ার নাম করবি না।

শুভ অন্যমনস্ক চোখে তাকাল, একটা কথা সত্যি করে বলবি?

—কি কথা শুনি?

—আগে বুড়োমা ঠাকুরের দিব্যি দে, তারপর বলব।

—আমি চট করে বুড়োমার দিব্যি কাটি না।

—তাহলে থাক।

—না তোকে বলতেই হবে। জোর করল মাধুরী।

শুভ নিস্তেজ গলায় বলল, মায়ের কাছে যে পাঁচশ টাকা দিয়ে এলি ওটা কার টাকা, কিসের টাকা?

—টাকাটা কাকুকে দিয়েছি আমি। মাধুরী বলল, কাকুর দরকার। বাবার কাছে ধার চাইছিল। বাবা হয়ত দিত। কিন্তু আমার মনে হল কাকুর ওটা আজকালের মধ্যে দরকার। তাই আমার কাছে ছিল দিয়ে এলাম।

—কাজটা কিন্তু ভালো করিসনি। শুভ বোঝাতে চাইল, বাবা-মাকে না জানিয়ে তোর এতগুলো টাকা দিয়ে আসা উচিত হয়নি। তাছাড়া, এত টাকা তুই কোথায় পেলি? কাকু জানলে—আমাদের ভুল বুঝবে। ভাববে—আমরা পটিয়ে পাটিয়ে তোর থেকে টাকাগুলো নিয়ে নিয়েছি।

—তুই বাবাকে এত খারাপ ভাবতে পারলি? মাধুরীর চোখ ছলছলিয়ে উঠল, বাইরে থেকে বাবাকে যতটা কঠিন বলে মনে হয়—আসলে বাবা তা নয়। বাবার স্নেহ-ভালোবাসা অনেকটাই ফল্গু নদীর মতো।

শুভ আর কথা বাড়াল না।

মাধুরী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, টাকাটা আমি চুরিচামারি করে দিই নি। আমার জমানো টাকা থেকে দিয়েছি।

—তাহলে ফেরত দিলে নিতে হবে।

—সে আমি নেব। অত চিন্তা করিস না তো। তোদের এখন টাকার দরকার।

তবু যেন মন থেকে মেনে নিতে পারে না শুভ। ঢোঁক গিলে বলল, আমি বাবাকে বলব-কাকুকে সব বলতে।

—খবরদার, তা যেন করতে যাস না। আমি তাহলে অসুবিধায় পড়ে যাবো। মাধুরী কাঁচুমাচু চোখে তাকাল।

শুভ বলল, ঠিক আছে, আজ আমি আসছি। স্কুল খুললে বুক-লিস্ট দেবে। বাবার মাইনে হলে আমি বই কিনতে কৃষ্ণনগর যাবো।

—হাসপাতালের গাড়ি যাবে, তখনই যেতে পারিস। মাধুরী বুঝিয়ে বলল, আসা-যাওয়ার ভাড়াটা বেঁচে যাবে। বাবা বলছিল—আমাকেও সঙ্গে করে বই কিনতে নিয়ে যাবে। ক্লাস নাইনের বই, বুক-লিস্ট না থাকলেও কেনা যায়। সিলেবাস তো সব এক।

—গাড়ি কবে যাবে, জানাস তাহলে? শুভ দূরের দিকে তাকাল, বই কেনাও হবে, খোড়ো নদীও দেখা হবে। জানিস, খোড়ো নদীর যা রূপ, একবার দেখলে নাকি চোখ ফেরানো যায় না। রেল-ব্রিজ আর বাস-রাস্তা পাশাপাশি। লালগোলা ট্রেন যখন যায় ঝমঝম শব্দ হয়। রেল-কামরার জানলা দিয়ে তাকালে কত নীচে জল, বুক হিম হয়ে যায় ভয়ে।

—তুই অনেক কিছুই জানিস। আমি তো কিছুই জানি না এসব। মাধুরী নিজের দোষ খণ্ডন করে নিয়ে বলল, আমার বাইরে বেরনো হয় না। দাদুর বাড়িতে যাওয়ার সময় ব্রিজটাকে আমি দেখেছি। খোড়ো নদীর বুকের হাড়-পাঁজরার মতো মনে হয়।

শুভর মনে পড়ে যায় কত কথা।

দেশ বাড়িতে যাওয়ার সময় অবনীর মাথাটা বুঝি খারাপ হয়ে যায়।

কোথাও যেতে গেলে অন্তত একমাস আগে থেকে তার প্রস্তুতি শুরু হয়। সবার মাথা খারাপ করে দেবার মতো অবস্থা, ব্যাগ গোছানো শুরু হয় ডাক্তারবাবুর সম্মতি পাওয়ার পর থেকে। ছুটি মঞ্জুর হলে মন আর তখন কালীগঞ্জে থাকে না তার। ঐ অজ পাড়াগাঁয়ে কী মধু যে রাখা আছে তার জন্য সরস্বতীও বুঝতে পারে না। গড়িমসি করলে অবনীর কাছে বকা খায় সে। বিড়ি থেকে গামছা—সব নেওয়া চাই সঙ্গে। নদীয়া-নবদ্বীপ বলে কথা। দেশের মাটিতে পা দিলেই জ্ঞাতিকুটুমরা বলবেন, কই গো মুরুব্বি, গটে লদীয়ার বিড়ি দাও। পুণ্যধামের বিড়ির নেশা হয়ত বহুত জোর হবে।

বান্ডিল খুলে সবাইকে একটা-একটা করে বিড়ি ধরিয়ে দেয় অবনী। নিজে আর নদীয়ার বিড়ি খায় না। ওসব বিড়ি খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেল। সেও হাত বাড়িয়ে দেয় আত্মীয়তার, দাও

গো, আমাকে একটা এগরার বিড়ি দাও। আমিও মুখ বদল করি।

শুধু বিড়ি নয়, চা পাতা গুঁড়ো দুধ আর চিনি সঙ্গে করে নিয়ে যেত অবনী। গাঁ- ঘরে এসব জিনিস চট করে পাওয়া যায় না। চিনি পাওয়া গেলেও চা আর গুঁড়ো দুধ তখন বিলাসিতার সামগ্রী। সকালে চা না খেলে তার পেট খোলসা হবে না, মাথা ধরে যাবে গ্যাসে, পেটের ভেতর ভুটভাট আওয়াজ আর অস্বস্তি। বড়ো জামবাটিতে চা ফুটছে টগবগিয়ে। সবাইকে চা-করা শেখাচ্ছে অবনী। গর্বে বুকের ভেতরে খোল করতাল বাজছে সরস্বতীর। গ্লাসে গ্লাসে বিলি হয়ে যায় ধোঁয়া ওঠা চা। গরম চা-য়ে চুমুক মেরে 'আঃ' শব্দের যে অলৌকিক উচ্চারণ তা যেন দেশ-গাঁয়ের একঘেয়ে বাতাসকে ধনী করে তোলে। ছুটির দশ-পনেরটা দিন অবনীর যেন দম ফেলবার ফুরসত নেই। গাঁ-ভর্তি আত্মীয়কুটুম। সবার বাড়িতে একদিন করে গেলে আরও যে কত ঘর বাকি থেকে যায়, তার কোনো গোনাগুনতি নেই। সময়হীনতার অজুহাতে অভিমানের পারদ বাড়ে। কেউ আবার আক্ষেপের সঙ্গে বলে, মোর ঘরে কেনে যাবা গো দাদা, মোর মেনে গরীব মানুষ। খাইতে পরতে দিতে পারবানি। তুমি চাকুরিয়া মানুষ। তোমাদের সম্মান কি আমি রাখতে পারি। যা হউক, ভালা থাক সব। গাঁয়ের ধুলো বুঝি ধুলো নয়—সোনা। যে ভাষায় নদীয়ায় কথা বলে অবনী সে ভাষা আমূল বদলে যায় মেদিনীপুরের মাটিতে পা ছোঁয়ালে। শুধু অবনী একা নয়, সরস্বতীও তখন সঙ্গ দেয় ও ভাষায়। নদীয়া-মেদিনীপুরের হৃদয়ের শব্দ মিলেমিশে হয় একাকার।

এত আনন্দ তবু এর ভেতরেও শীতকালের বিষাক্ত সাপের মতো চুপচাপ শুয়ে থাকে দুঃখ আর হতাশা। ফি-বছর দেশ আসার সময় অবনীর পকেট মার হবেই হবে। শিয়ালদা থেকে হাওড়া-এই পথটা কিছুতেই যেন শেষ হয় না। সবাই যেন ওঁৎ পেতে বসে থাকে অবনীর জন্য। অবনীরও সতর্কতার শেষ নেই। টাকাগুলো সে কোমরে বেঁধে রাখে শক্ত করে যাতে কেউ কেটে নিতে না পারে। ট্রামে-বাসে যেখানেই যাক অবনীর টাকা হারাবেই হারাবে। বাস থেকে নেমে টাকার শোকে বুক চাপড়ানো কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। আর তখনই গালিগলাজ শুরু করবে সরস্বতী, মর মর, মুখে রক্ত উঠে মর। গরীবের টাকাগুলান কেড়ে নিলি—তোদের ভালো হবে না। যে হাত দিয়ে টাকা উঠালি, সেই হাতে তোর কুষ্ঠ হবে। মা বুড়োমা, যে নিয়েছে সে যেন ধড়ফড়িয়ে মরে। তার গায়ে যেন পোকা হয়।

দেশ যাওয়া আর আসা নিয়ে এরকম গল্প শুভর স্মৃতিতে ভরে আছে। বছরে অন্তত দু-বার মেদিনীপুরের মাটিতে পা না দিলে অবনী হাঁপিয়ে ওঠে, একেবারে পাগলের মতো ব্যবহার করে সে।

অতসীপিসি অবনীকে বোঝালে অবনী ডাঁয়ে-বাঁয়ে ঘাড় নাড়িয়ে বলবে, আপনি জানেন না দিদি, দেশের টান যে কী টান! এদেশে খেতে-পরতে পাই, তবু যেখানে জন্মেছি সেখানকার কথা কি ভোলা যায়? চোখ বুজলে রোজ আমি আমার গাঁয়ে যাই। এগরা পার করে মাঠে মাঠে আমি যেন পৌঁছে যাই রুক্মিনীপুরে। পুকুরের পাড়ে গিয়ে দাঁড়াই। মাছের ঘাই মারা দেখি। চেনা মানুষগুলো আমার বুকের পাথরটা সরিয়ে দেয়।

অবনী যে আত্মীয়তা তার দেশ-গাঁয়ের জন্য অনুভব করে তার সিকি ভাগও শুভর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার ঝড় তোলে না। এর পেছনে কারণটা যে কি তার সূক্ষ্ম হিসাব বা সূত্র টের পায় না সে।

অবনী গম্ভীর হয়ে বলে, বড়ো হ, তারপর বুঝবি? দেশের মাটি না হলে জীবনের কোনো পুজোই তো ঠিক মতো হয় না।

বই কেনা হয়ে গেলে এবারও দেশে যাওয়ার তোড়জোড় করবে অবনী। সে কথা সে শুনিয়ে

রেখেছে সরস্বতীকে। কেউ বাধা দিলে তুমুল অশান্তি বাঁধবে ঘরে। একরোখা অবনী তখন কারোর কথা শুনবে না।

'কিচেন' অব্দি শুভকে এগিয়ে দিয়ে গেল মাধুরী। এ সময় প্রতিদিন হাসপাতালের মাঠজুড়ে নরম আলো খেলা করে। ঝরাপাতা বিছিয়ে যায় ঘাসের বিছানায়। রসকাটা গাছি তার মাটির হাঁড়িগুলো নিয়ে গুছিয়ে রাখছে কাঁঠালগাছটার গোড়ায়। খেজুরের গাছ কেটে ঠিলি বেঁধে সে তার কুঁড়ে ঘরে ফিরে যাবে সাঁঝবেলায়। শুভকে দেখতে পেয়ে গিয়াস বলল, আজ কই সাইকেল চালাতে দেখলাম না তো?

শুভ হাসল।

—পিসির আজ ডিউটি নেই।

—তাতে কী হয়েছে! তুমি আমার সাইকেলটা নিয়ে চালাতে পার। গিয়াস বলল, আমি জানি—সাইকেল চালানোর নেশাটা কী রকম।

শুভ বলল, আজ আর চালাব না। পিসির বাড়ি যেতে হবে। ওখানে বাগানের কাজ আছে।

—ঠিক আছে যাও। রস খেতে মন হলে কাল ভোরে চলে এসো। জিরেন কাট রস খাওয়াতে পারব। গিয়াস তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে দূরের দিকে তাকাল, এবছর তেমন আর শীত পড়ল কই? শীত না পড়লে খেজুরগাছ রস ঝরাতে চায় না।

মাধুরী পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। খেজুরের রস খাওয়ার থেকে তার গন্ধটা ভালো লাগে তার। গিয়াস দু-একবার যে তাদের বাড়িতে রস পৌঁছায়নি এমন নয়। তার মা খেজুরের রস খেতে ভালোবাসে। ডাক্তারবাবুকে রস খাইয়ে হাতে রাখতে চায় গিয়াস কেন না আগামী বছরও সে যদি গাছকাটার চুক্তিটা পায় তাহলে তার অভাবের সংসারে একটু গুছিয়ে নিতে পারে। তবে গিয়াসের ব্যবহার ভালো, সে এই হাসপাতালের সবার মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করে।

গিয়াস মাধুরীকে তুষ্ট করার জন্য বলল, কাল সকালে তোমাদের ঘরে রস দিয়ে আসব। ভোর ভোর ওঠো তো তোমরা?

মাধুরী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে যেতেই গিয়াস খুশি হয়ে বলল, অত বড়ো মানুষের মেয়ে, দেখো মনে কোনো অহঙ্কার নেই। আসলে শিক্ষা, শিক্ষাই মানুষকে মানুষ করে তোলে।

হাতে কাজের কোনো কমতি নেই, গিয়াস হড়বড়িয়ে চলে গেল। আজ বছর দুয়েক থেকে এই মানুষটাকে দেখছে শুভ। কাজের মধ্যেই ডুবে থাকে সারাক্ষণ, কাজই যেন তার আল্লা। গেল বছর গাছঝোড়ার সময় একটা ক্ষরিস সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল খেজুরগাছের মাথায়। আর একটু হলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যেত গিয়াসের, সে যাত্রায় বুদ্ধির জোরে সে বেঁচে গেল। হাতের ধার হেঁসো দিয়ে সজোরে একটা কোপ মেরেছিল সাপের শরীর লক্ষ্য করে। এতেই কাজ হয় মোক্ষম। দ্বিখণ্ডিত সাপটি রক্তশরীর নিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে। নিজে বেঁচে কিন্তু সাপটার জন্য সে হা-হুতোশ করে কাঁদছিল কপাল চাপড়িয়ে। বারবার করে বলেছিল, আল্লা রহিমের কী খেলা! একটা জান বাঁচাবার জন্য আর একটা জানকে কুরবানী দিতে হল!

সেই কাটা সাপটা দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছিল হাসপাতালের ছেলে-মেয়েরা। ভয়ে দশ হাত পিছিয়ে গিয়ে তারা মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছিল যে যার মতো। অবনী গিয়াসের কাছে গিয়ে তার ঘর্মাক্ত পিঠে হাত রেখে বলেছিল, শোক করে কি হবে ভাই? যা হবার তা হবেই। যা হয়েছে তা তো তোমার ইচ্ছায় হয়নি। এসব আগে থেকে উপরওয়ালার কাছে লেখা ছিল।

গিয়াসের স্বাভাবিক হতে সময় লাগছিল, গামছায় মুখের ঘাম মুছে সে আতঙ্কিত গলায় বলেছিল, তুমি ঠিকই বলেছো দাদা, এসব আগে থিকে লেখা থাকে। নাহলে এত গাছ ঝুড়ছি—কই কোনো গাছে তো সাপ বেরয় নি!

সেদিন একটা বিড়ি দিয়েছিল অবনী, তারপর পাথরপোরা লাইটারটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, মন খারাপ করো না। বেঁচে থাকতে গেলে এরকম কত ঘটনার সাক্ষী হতে হবে। ভেঙে পড়ো না ভাই। নিজের কাজ নিজে করে যাও। তার মধ্যে সব শান্তি তুমি খুঁজে পাবে।

শুকনো পাতা, খড়কুটো জোগাড় করে আগুন ধরিয়েছিল অবনী। সেই দাউ দাউ আগুনে সাপটাকে লাঠিতে করে ছুঁড়ে দিয়েছিল সে। ধোঁয়ারকুণ্ডুলী পাকিয়ে উঠতেই হঠাৎ একটা শব্দ হল। ভয়ে পিছিয়ে গেল বাচ্চাকাচ্চার ভিড়। অবনী সবাইকে সতর্ক করে বলল, তোরা সব সরে দাঁড়া। বিষের থলি ফেটে গিয়ে ছড়িয়ে যেতে পারে, আর কারোর যদি গায়ে লাগে তাহলে আর রক্ষে নেই!

শীতের বিকেলে অভিমান বড়ো তীব্র হয়।

শুভ হাঁটতে হাঁটতে কিচেন পেরিয়ে চলে এসেছে অনেকটা। এই হাসপাতালের চেনা পরিমণ্ডল তাকে যেন পাগল করে দেয়। অভাব আছে এখানে, ক্ষতি নেই। ভালোলাগা যা আছে তার দাম কি পয়সা দিয়ে মেটানো যায়? আজ হঠাৎ তার মনে পড়ছে রঘুনাথের কথা। রঘুনাথ তার চেয়ে বয়সে বড়ো তবু বন্ধুত্ব গড়তে কোনো অসুবিধা হয়নি। ছেলেটার মন জলের মতো সরল। রঘুনাথকে দেখলে শুভর বুঝি আকাশ দেখা হয়ে যায়। এই বয়সে কত কি জেনেছে সে। সে যত পাখির নাম জানে তার অর্ধেক নাম এ গাঁয়ের অনেকেই জানে না। রঘুনাথের বাঁশি শুধু সুর তোলে না, চোখে জল এনে দেয়। বাঁশিটা ওর কাছ থেকে শিখতেই হবে। বাংলার মাস্টারমশাই বলেছেন, কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ভালো বাঁশি বাজাতে পারতেন। রঘুনাথ বলেছে, মিতে, তোর জন্য বাঁশি কেন আমি আমার কলিজা উপড়ে দিতে পারব। তোকে একটা কথা বলি—আমি বড়ো ভালোবাসার কাঙালরে! এ গাঁয়ের কেউ আমাদের ভালো চোখে দেখে না। সবাই ভাবে কী গরীব হলে বুঝি চোর হয়।

রঘুনাথের বুকের ভেতরটা জ্বালাপোড়া করছিল কথাগুলোকে উগরে দেবার জন্য। বাবুসমাজে তাদের সেরকম ঠাঁই নেই। আবার তাদের সেবা না নিলে বাবুদের চলেও না। ওরা গাঁয়ের একধারে পড়ে আছে. ওদের যে কেউ দেখেও দেখে না। শুধু ভোটের সময় খাতির বেড়ে যায় ওদের। টিন টিন গুড় পচানো মদ এনে বুনোপাড়ায় বিলানো হয়। কেউ তখন একটা প্রতিবাদও করে না। আসলে মানুষগুলোর প্রতিবাদ করার মতো ভাষা নেই, ভাষা থাকলেও সাহস নেই। কেউ যে মাজা সোজা করে দাঁড়াবে, দু-চারটে কথা বলবে—তেমন মানুষও পাওয়া ভার। রঘুনাথ হাতের মুঠি পাকিয়ে বলে, তোদের হাসপাতালের অতসী নার্স ছাড়া আর কেউ তেমন একটা ভালো নয়। সবাই দেখছি গা এড়িয়ে ডিপটি করছে। উগীদের উপর কারোর কোনো দায় নেই। সব আসে যায় মাহিনা পায়, ব্যাস!

গুয়ারাম যখন ভর্তি ছিল তখন পরপর বেশ কয়েকদিন রাত জেগেছে সে। কারা যে গুয়ারামের মাথাটা ফাটিয়ে দিল সে রহস্য এখনো আলোয় আসেনি। তবে রঘুনাথ তক্কে তক্কে আছে, নামটা জানতে পারলে তার বাপের শ্রাদ্ধ দেখিয়ে ছেড়ে দেবে।

আউটডোরের সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে রঘুনাথ সুর তুলত আড়বাঁশির, আর সেই সুরে আকৃষ্ট হয়ে আগুন পোকার মতো হাজির হত শুভ। চোখে মুখে ছড়িয়ে যেত অদ্ভুত জ্যোৎস্না মাখা সারল্য। আন্তরিকতা বাড়ার পর শুভই বলেছিল, আমাকে বাঁশিটা শিখিয়ে দিতেই হবে।

—বাঁশি যে শিখবি, তোর বাঁশি কোথায়? রঘুনাথের মোটা ঠোঁটে রোদ লাগা বনআলু পাতার মতো হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল।

অপেক্ষা শেষ হতেই সে দেখতে পেয়েছিল বাঁশি হাতের রঘুনাথকে। সদ্য তৈরি করা বাঁশিটা

শুভর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে বলেছিল, এই নে তোর বাঁশি। এই বাঁশি বানাতে গিয়ে আমি পুড়ে গেলাম। গনগনে লোহার শিকের ছ্যাঁকা খেলাম।

শুভ হা-করে তাকাল রঘুনাথের দিকে, বাঁশি তৈরি করতে গেলে বুঝি ছ্যাঁকা খেতে হয়?

রঘুনাথ তার সন্দেহ কাটিয়ে দেবার জন্য বলেছিল, আগুন আর লোহা না হলে বাঁশিতে ফুটো হবে কি করে? কাঠ কয়লার আগুনে লোহার শিক ফেলে রেখে তাতাতে হয়। শিক লাল হলে সাঁড়াশিতে ধরে ছাতার বাঁটে গুঁজে দাও। সামান্য ধোঁয়া বেরনোর পরে ছিদ্র হয়ে যাবে। এভাবে ছ'টা ছ্যাঁদার দরকার। নাহলি যে সুর খেলবে নি। আর হ্যাঁ, ফুঁঃ দেবার জন্য আর এট্টা বড় ছ্যাঁদা চাই। মোট সাতটা ছ্যাঁদা না হলে বাঁশি যে বাজে না। রঘুনাথ তৃপ্তির হাসি হাসল। শুভর হাত থেকে বাঁশিটা কেড়ে নিয়ে উদাসী ফুঁঃ দিয়ে সুর ভাসাল বাতাসে। মুহূর্তে পাল্টে গেল হাসপাতালের রূপ ও চেহারা। খিলখিলিয়ে হেসে উঠল বাতাস। কোথা থেকে ছুটে এল সুগন্ধ ঘ্রাণ। আকাশের চাঁদ বুঝি ঝরিয়ে দিল জ্যোৎস্নাস্রোত।

মুগ্ধ বিস্ময়ে শুভ চেয়ে থাকল রঘুনাথের দিকে। সাধারণ চেহারায় কী অসাধারণ জ্যোতি বের হয় তখন। ঝাঁকড়া চুলের রঘুনাথ যেন কৃষ্ণ অবতার। তার পেশীবহুল চেহারায় কদমের কচি পাতার লাবণ্য। কালো কুচকুচে চোখ দুটো যেন আভা ছড়িয়ে দেয়। জোড়া ভ্রূর নীচে কিছুটা চ্যাপ্টা নাক তাকে জেদি করে তোলে আজন্ম।

খুশিতে টগবগ করে শুভর হৃদয়, বড়ো পকেটের ভেতর থেকে সে বের করে আনে মুঠো মুঠো মুড়ি। মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মুড়িগুলো পকেটে ভরে নিয়েছে সে। মা জানতে পারলে কোনো ক্ষতি ছিল না। ধরা পড়ে গেলে সে বলত, রাস্তায় যেতে যেতে খাবো।

মুড়ি আর পাটালি গুড় পেয়ে রঘুনাথের খুশি আর ধরে না। সারাদিন তার খাওয়া দাওয়ার কোনো ঠিক ছিল না। গুয়ারাম হাসপাতালে ভর্তি হবার পর চাল আসেনি ঘরে। চুনারাম জ্বর শরীর নিয়ে ভিক্ষে করতে গিয়েছিল গ্রামের ভেতর। ভিক্ষার চালগুলোতে এতগুলো লোকের পেট ভরেনি। তবু দুর্গামণি নিজে না খেয়ে এক জাম বাটি ফেনভাত দিয়েছিল তাকে। রঘুনাথ মায়ের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝে যেন খেল না। দুর্গামণি খাওয়ার জন্য জোর করলে রঘুনাথ আত্মবিশ্বাসী গলায় বলেছিল, আমার খাওয়ার জন্য তুই ভাববি নে, মা। আমার জন্যি খাওয়া নিয়ে হাসপাতালের লোক বসে আচে। হাসপাতাল থিকে যা ভাত দেয়, বাপ অত ভাত খেতি পারে না। বাপের খাওয়া হয়ে গেলে সেই ভাতগুলো আমি খেয়ে নিই। এছাড়া বাড়তি ভাতও ঠাকুরমশাই আমাকে দিয়ে দেয়। একটা তো পেট। কত আর খাবো মা!

গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলে তৃপ্তি পায় রঘুনাথ। এত সরল, সাদাসিধে গেঁয়ো মেয়েমানুষকে বুঝিয়ে শান্ত করে দিতে বেশি সময় লাগে না রঘুনাথের। ছেলের প্রতি এত বিশ্বাস যা বলবে তা মেনে নেবে দুর্গামণি।

মুড়ি আর পাটালি গুড়ের আলাদা গন্ধ আছে। খাওয়ার শব্দও আলাদা। তবু শুভর মনে হয়—মুড়ি চিবানোর শব্দের সঙ্গে কলিজার ধকাস্ ধকাস্ শব্দের বহু মিল আছে।

রঘুনাথ মুখ ভরে মুড়ি খায় আর প্রতি কামড়ে ভেঙে নেয় পাটালি গুড়। শুভ চেয়ে চেয়ে দেখে।

রঘুনাথ বলে, এ বছর এই প্রথম পাটালি গুড় খেলাম। এখন যা পাটালির দাম—তুই না আনলে কবে যে খেতাম কে জানে।

রঘুনাথ জল খাওয়ার জন্য মাঠের কলটার কাছে হেঁটে গেল। রোগীদের জল খাওয়ার জন্য সরকার থেকে কলটা বসিয়ে দিয়ে গেছে। হাসপাতালের এই চাপা কলটার জল ভীষণ ঠাণ্ডা।

হ্যান্ডেল দাবিয়ে জল বের করে আনছিল শুভ, ঈষৎ ঝুঁকে আঁজলা ভরে জল খাচ্ছিল রঘুনাথ। এ সময় যে অতসীপিসি ডিউটি ছেড়ে বাইরে এসে যাবে ভাবেনি তারা। শুভ আর রঘুনাথ দু'জনেই ভ্যাবাচেকা খাওয়া চোখে তাকাল। অতসীপিসি হাসি ছড়িয়ে দিলেন ঠোঁটে, শুভকে শুধোলেন, কি ব্যাপার, এত রাতে কি করছিস এখানে? তোর পড়াশোনা নেই?

শুভ দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলেছিল, রঘুনাথের বাবা ভর্তি আছে হাসপাতালে। জান, পিসি রঘুনাথ ভালো বাঁশি বাজায়। এই দেখ—এই বাঁশিটা ও আমার জন্য তৈরি করে এনেছে।

অতসীপিসি বাঁশিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, খুশি হলেন তিনি। ঘাড় তুলে রঘুনাথের দিতে তাকালেন, কী নাম তোমার?

—আজ্ঞে, রঘুনাথ!

—থাকো কোথায়?

—হলদিপোঁতা ধাওড়ায়।

অতসী পিসি উৎসাহিত হলেন, তুমি বাঁশি বাজাতে জানো বুঝি? বাঃ, ভীষণ গুণী ছেলে দেখছি। আচ্ছা, এখন একটু বাঁশি বাজাও না, আমার শুনতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

জড়তা কাটিয়ে রঘুনাথ বাঁশি তুলে নিল হাতে, ফুঁঃ দিয়ে মনের মতো সুর না ওঠায় বাঁশিটাকে ভিজিয়ে নিল জলে। বাড়তি জলটুকু ঝেড়ে সে আবার ফুঁঃ দিল বাঁশির মুখে। ভারী হয়ে সুর উঠল বাতাস পেঁচিয়ে। শুভর মনে হল —সুর যেন আর কিছু নয়, কঞ্চি বেড়ায় পেঁচিয়ে ওঠা শিমলতা, যাকে ছোঁয়া যায়, ধরা যায় আর আদর করা যায়। শুভ মনে মনে ভাবল বাঁশি তাকে যে করেই হোক শিখতে হবে। বাঁশি শেখায় তেমন কোনো খরচ নেই। সাঁঝবেলায় রঘুনাথের ঘরে চলে গেলেই হল। সে গেলে রঘুনাথ খুশিই হবে।

অতসী পিসি ডিউটি রুমে চলে যাবার পর, পকেট থেকে দু-টাকার একটা নোট বার করে আনল শুভ। রঘুনাথের হাতে দিয়ে বলল, নে। এটা তোর।

—তোরা খুব বড়োলোক, তাই না? রঘুনাথ বোকার মতো প্রশ্ন করল। হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না শুভ। এই পৃথিবীতে অন্তত একটা মানুষের চোখে সে বড়োলোক—এই ভেবে তার গর্ববোধ হল। আসল সত্যটা আড়াল করে শুভ বলল, আমার কাছে দু-টাকা যোগাড় করা কোনো ব্যাপার নয়। শুভ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, অতসীপিসির বাগানে কাজ করে দিলে টাকার কোনো অভাব হয় না। অতসীপিসি দু-হাত ভরে টাকা দেন। ওরকম মনের মানুষ এ হাসপাতালে আর দুটি নেই।

রঘুনাথ ঝিম ধরে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর দুঃখী গলায় বলল, এত বড়ো গাঁ, কেউ দুটা পয়সা ভিখ দিতে চায় না। অথচ, দেখ-সবার কত কি আছে?

—দুঃখ করিস না। দুঃখ করলে দুঃখ বাড়ে। শুভ বোঝাতে চাইল, সব ঠিক হয়ে যাবে। যারা সৎ পথে চলে, ভগবান তাদের ফেরায় না। আমার মা কী বলে জানিস—এই কষ্ট পাওয়ার মধ্যে কোথাও সুখ আছে।

—তোর এই কথাগুলো আমি মানি না। রাগে গর্জন করে উঠল রঘুনাথ, ভগমান বড়োলোকের ঘরে পাত পেড়ে বসেচে, আমাদের ঘরে সে কী পাবে—খুদকুঁড়া ছাড়া তো কিচু জুটবে না তার কপালে।

আজ আর বাগানে কাজ করতে দিল না অতসীপিসি।

মন খারাপ করে শুভ যখন ফিরে যাবার কথা ভাবছে তখন অতসীপিসি তাকে বলল, ঘরে এসে বস। দরকার আছে।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে এল শুভ। এ ঘরে তার কোনো বাধা নিষেধ নেই, যেখানে খুশি সে যেতে পারে। অতসীপিসির যখন নাইট ডিউটি থাকে তখন সবুজকে নিয়ে বড়ো খাটটাতে ঘুমায় সে। আবার সকাল হলে যে যার বাড়িতে চলে যায়। সবুজ সঙ্গে থাকলে তার পড়াশোনা একদম হয় না। বড়ো ফাঁকিবাজ ছেলে সবুজ। শুভ তাকে বুঝিয়েও পারেনি। সবুজ সব কিছুকে হালকা করার জন্য বলে, গাছের পাতা কি লেখাপড়া শেখে? শেখে না তো! তাহলে আমি সবুজ হয়ে কেন পড়ব? দিনরাত পড়তে আমার বয়ে গেছে। ছোটখাটো সবুজ রাতদিন খালি বাঘার পেছনে লেগে আছে। ওদের কোয়ার্টার পাশাপাশি, তাই বাঘা কুকুর আর সবুজের দেখা হয় ঘন ঘন। অতসীপিসি ডিউটিতে চলে গেলে বাঘা ছাড়া থাকে, কেউ বাগানের ফুল বা বেড়া ভাঙতে এলে বাঘা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাবে বলখেলার মাঠ পর্যন্ত। দেশী কুকুর যে এত বিক্রমশালী হয় তা বাঘাকে না দেখলে বোঝা যাবে না। পলাশী হাসপাতাল চত্বরে ছোট্ট বাঘাকে প্রথম দেখেন তিনি। উলের বলের মতো নরম তুলতুলে তাঁর শরীর। কী সুন্দর, ফুটফুটে চেহারা। মায়ের পেছন পেছন ঘুরঘুর করছিল সে। আর ঠিক তখনই তার মনে হয় একটা কুকুর পুষলে মন্দ হয় না। তাঁর একাকিত্ব ঘুচবে। বাঘার সঙ্গে অন্তত কিছুটা সময় কাটানো যাবে।

সেদিনের বাঘাকে কোলে করে নিয়ে এসেছিলেন অ্যাম্বুলেন্সের কাছাকাছি। ড্রাইভার চিত্রভানু দিদিমণিকে কুকুরের বাচ্চাকে এত ভালোবাসায় কোলে নিতে দেখে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, কোলে যখন নিয়েছেন তখন এটাকে নিয়ে কোয়ার্টারে চলুন। আপনি তো একা থাকেন, পুষবেন। আপনার একঘেয়েমি দূর হবে। পোষার ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু মা কুকুরটা হাসপাতালের গাড়ির কাছাকাছি চলে এসে এমন ছলছলে চোখে তাকাচ্ছে, যা দেখে অতসী দিদিমণির মনটা বেজায় খারাপ হয়ে যায়। তিনি ভাবছিলেন বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে দেবেন অন্তত মা কুকুরটার মুখ চেয়ে।

কী মায়ায় বাধ্য বালিকার মতো গাড়িতে উঠে বসেছিলেন অতসী দিদিমণি। ডিউটিতে এসে এই প্রথম তার অন্যধরনের অনুভূতি। সেই অনুভূতি এখন অনেকটাই তার অন্তর জুড়ে ছেয়ে আছে। বাঘা বড়ো হয়েছে, ওকে না দেখলে অতসী দিদিমণির বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে। 'বাঘা'-'বাঘা' ডাকতে ডাকতে গ্রামে চলে যান খুঁজতে। পেয়েও যান। বকাঝকা করে ফিরিয়ে আনেন বাঘাকে। তিনি যেভাবে, যে ভঙ্গিতে বাঘার সঙ্গে কথা বলেন, অনেকে ভাবেন—বাঘা বুঝি তার সন্তান।

বিকেলের আলো যত কমে আসছিল ততই শীত পড়ছিল জাঁকিয়ে। শেষ ডিসেম্বরের এই সময়টাতে কুয়াশারা হামাগুড়ি দেওয়া ভেড়ার বাচ্চার মতো ধীরে ধীরে ঘাস মাটি আর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের জলীয় মুখে শুধু শীতবন্দনা।

শীত শীত অনুভূত হচ্ছিল শুভর, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাবার ইচ্ছাটা তাই প্রবল হচ্ছিল মনের ভেতর। অতসীপিসি চুল আঁচড়াচ্ছিলেন বড়ো আয়নার সামনে বসে। হাঁটু অব্দি লম্বা চুল বাগে আনতে হিমশিম খাচ্ছিলেন তিনি। বেশির ভাগ দিন চুল বাঁধার জন্য হাঁক পেড়ে ডেকে

নেন সরস্বতীকে। ছুটি কিংবা রেস্ট-ডে থাকলে অতসীদিদিমণি কেশ চর্চার দিকে লক্ষ্য দেন। আজ অবেলায় চুল বাঁধতে দেখে কিছুটা অবাক হয় শুভ, মাকে কি ডেকে দেব পিসি?

—না থাক। অতসী পিসি অজান্তে হাসলেন, শুভ তার সুন্দর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকল অপলক, জান পিসি, তোমার মতো এত ভালো চোখ এ হাসপাতালে আর কারোর নেই। তুমি যেমন দেখতে ভালো, তেমনি তোমার মনটাও ভালো। আমার মা বলে, তুমি না থাকলে আমাদের সংসারটা ভেসে যেত।

অতসীপিসি অবাক হয়ে শুনলেন শুভর কথা, নারে বোকা, তা নয়। তোর মায়ের মধ্যে এখনও গ্রামের সদ্‌গুণগুলো হারিয়ে যায়নি। আর তাছাড়া, তোদের যেখানে দেশের বাড়ি-তার মাত্র মাইল খানিক দূরে আমার বাপের বাড়ি। তোর বাবাকে আমার বাবা-দাদা সবাই আগে থেকে চিনত। আমিও হয়ত তোর বাবাকে দেখেছি ছোটবেলায়। এখন ঠিক মনে করতে পারি না। অবনী দেশে গেলে হাজার কাজ থাকলেও একবার সে আমাদের বাড়িতে যাবেই যাবে। আমার দাদা ওকে ভীষণ ভালোবাসে। কী বলে জানিস? বলে অবনীর মতো ভালো মনের মানুষ সারা দেশ-গাঁ ঘুরে এলে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শুভ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে অতসীপিসির সামনে। সারা ঘরে ভুরভুর করছে নারকেল তেলের গন্ধ। ঘরও যে মন্দির হয়ে ওঠে এটাই বুঝি তার উৎকৃষ্ট নমুনা। চুল বেঁধে খুবই সুখী ভঙ্গিমায় গা-হাত ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অতসীদিদিমণি। শুভর দিকে স্নেহের চোখে তাকালেন, আর তাতেই শুভ যেন টের পেল একটা অদৃশ্য শক্তি তার শরীরে ঢুকে তাকে বলবান আর জেদী করে তুলছে।

—পিসি, এবার আমি যাই। সন্ধে হয়ে এল বলে।

অতসীদিদিমণি শুভর মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তোর রেজাল্টের খবর আমি শুনেছি। এই হাসপাতালের প্রত্যেককেই আমি তোর উদাহরণ দিই। যারা পড়াশোনা করে না, ফাঁকি মারে তাদেরকে বলি তোর মতো হওয়ার জন্য। কেন বলি—জানিস? তোর উপর আমার বিশ্বাস আছে। অতসীদিদিমণির চোখের তারা চকচকিয়ে উঠল কিসের ভরসায়, ঈষৎ কণ্ঠস্বর দুলে উঠল তার, মোহাবিষ্ট স্বরে বললেন, তুই আমার দেশের ছেলে। তোকে প্রমাণ করে দিতে হবে—তুই মাধুরীর চাইতে কোন অংশে কম নয়। সেদিন কথায় কথায় ডাক্তারবাবু অনেক বাজে কথা শোনালেন আমাকে। আমি সেসব কথার প্রতিবাদ করেছি। বলেছি—প্রতিভা আর পরিশ্রমের কাছে প্রাচুর্য মাথা নত করতে বাধ্য। ডাক্তারবাবু আমার কথাটা মানেনি। তোকে সেটা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে হবে। আমি যদি না মরে যাই হঠাৎ করে তাহলে তুই আমার স্বপ্নটাকে সত্যি করে দেখাস। আমার তো ছেলেপুলে নেই। তোরাই আমার সব।

অতসীপিসি উবু হয়ে খাটের তলা থেকে বের করে আনলেন একটা কাপড়ের প্যাকেট। একটা লাল রঙের সোয়েটার সেই প্যাকেট থেকে বের করে অতসীপিসি বললেন, এটা তোর জন্য কৃষ্ণনগর থেকে কিনে এনেছি। হাসপাতালের গাড়ি গিয়েছিল, আমিও গিয়েছিলাম সেই গাড়িতে। ওখানে গিয়ে মনে হল—তোর জন্য একটা সোয়েটার কেনার দরকার। তোর তো ভালো সোয়েটার নেই। এবার থেকে এটা পরবি—

—আমি নেব না। মা যদি কিছু বলে। সোয়েটারটা হাতে ধরে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে ছিল শুভ।

শুভ বলল, পিসি, এটা থাক।

—কেন থাকবে? আমি বুঝি তোদের কেউ নই? অতসীপিসি কোনো কথা শুনলেন না, বরং

জোরের সঙ্গে বললেন, ক্লাস নাইনের বই কেনার ক্ষমতা তোর বাবার নেই। ঘরে থাকলে তোর বাবাকে একবার পাঠিয়ে দিবি তো?

শুভ ঘাড় নেড়ে বাইরে আসার চেষ্টা করলে অতসীপিসি তার হাত ধরল, যাবি তো, এত তাড়া কেন? মিষ্টি এনেছিলাম, খেয়ে যা।

অতসী পিসির আন্তরিকতার কোনো সীমা নেই।

শুভ টেবিলের উপর কাচ বাঁধানো একটা পুরুষালি ফটো দেখে বলল, এটা কার ফটো পিসি?

—আমার এক আত্মীয়ের।

—এখানে কোনোদিন আসেননি তো?

—খুব ব্যস্ত মানুষ। আসার একদম সময় পায় না। অতসীপিসির গলা বুজে এল আবেগে। কিছু একটা ঘটনা তিনি লুকাতে চাইছেন সযত্নে। শুভ শুধালো, পিসি, ওঁর বাড়ি কোথায়?

শুভর অতিরিক্ত কৌতূহল দেখে বিরক্ত হলেন অতসীপিসি, তোর এত খোঁজ খবর নিয়ে কি লাভ? তুই কি সেখানে যাবি নাকি?

বিব্রত শুভ মুখ নামিয়ে নিল লজ্জায়।

খোলা জানলা দিয়ে অন্ধকারের রেণু ঢুকে আসছে গুঁড়ি গুঁড়ি। সন্ধে নামতে আর বেশি বাকি নেই। শুভ দেখল সবুজ পর্দা সরিয়ে চোখের ইশারায় ডাকছে তাকে।

শুভ বাইরে এসে বড়ো করে শ্বাস নিল।

সবুজ চাপা গলায় বলল, রঘুনাথ এসেছে। তাড়াতাড়ি চল। অনেক কথা আছে। সবুজের চোখ-মুখ বলছিল কিছু একটা ঘটতে চলেছে। এ সময় বাঘা থাকলে তার ঘরে ঢোকার সাহস-ই হত না।

হাতের সোয়েটারটা নিয়ে সমস্যায় পড়ল শুভ। এত কিছু নিয়ে রঘুনাথের সঙ্গে দেখা করতে ভালো লাগবে না। রঘুনাথ তার কাছে যত হম্বিতম্বি করুক এমনিতে সে মুখচোরা।

শীতের দাপটে চারপাশ মাথা ধরা রুগীর মতো বেজার হয়ে আছে। আজ সারাদিন শুভরও কম ধকল গেল না। এখনও বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি। অভিমানের পাঁচিলটা এখনও কোনো তরফে কেউ ভেঙে দেয়নি।

শুভ আর সবুজ রাস্তায় এসে দাঁড়াল। হামাগুড়ি দেওয়া অন্ধকার এবার যেন মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। শনশনানো হাওয়ায় শীত খামচে দিয়ে যায় গায়ের চামড়া। সবুজ শীত সামলাতে তৎপর। হাফহাতা সোয়েটারের উপর সে চাপিয়েছে ফুল-হাতা সোয়েটার। গলায় হাতে বোনা মাফলার। তবু সে জড়োসড়ো হয়ে বলল, যতদিন না বুক-লিস্ট বেরয় ততদিন আমি বই ছোঁব না। বাবা আমার কি করবে? আমার পাশ করা নিয়ে কথা। প্রতিবছর আমি ঠিক পাশ করব।

শুভ এ কথার কী উত্তর দেবে বুঝে পেল না।

গা জড়াজড়ি কোয়ার্টারগুলো থেকে হ্যারিকেনের আলো এসে পড়েছে রাস্তায়। রাস্তার দু-ধারের ঘাসগুলো শিশির জলে মুখ ধুয়ে তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে।

শুভ অতসীপিসির বেড়ার শেষ প্রান্তে এসে বলল, তুই এখানে দাঁড়া, আমি অনেকক্ষণ ঘর থেকে বেরিয়েছি। মার সঙ্গে দেখা করে আসি।

—চল, আমিও তোর সঙ্গে যাব।

ইচ্ছে না থাকলেও সবুজকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এল শুভ।

সরস্বতী খুশি হল না সবুজকে দেখে, তুই আবার শুভর সঙ্গে মিশছিস, তোর বাবা দেখতে পেলে আমাদেরই গালিগালাজ দেবে।

—তুমি থাম তো কাকিমা। সবুজ কিছুটা উত্তেজিত, তোমাদের কি ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে যে আমি তোমাদের সঙ্গে মিশব না। শুভ আর আমি এক ক্লাসে পড়ি। এক জায়গায় থাকি। বাবা বললেই কি আমাদের মেলামেশা বন্ধ করে দিতে পারবে! এ ব্যাপারে বাবা যদি জোর করে, গালমন্দ দেয় তাহলে দেখবে তোমরা—একদিন আমি ঠিক ঘর ছেড়ে পালাব। ওরা তো আমাকে চেনে না, যেদিন চিনতে পারবে, সেদিন কপাল চাপড়াবে।

এত কথার পরেও সরস্বতীর মুখখানা কেমন বিবর্ণ দেখায়। চাপা গলায় সে বলল, তোর মনে কোনো ঘোলা জল নেই, তুই তো সাফসুতরো কলের জল। কিন্তু তোর বাবা—মুখের উপর যা না আসে তাই সবার সামনে বলে দেয়। তখন মনে হয় বেঁচে থেকে আমাদের আর কোনো লাভ নেই, এর চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভালো। সবুজের ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে ওঠে লজ্জা আর অস্বস্তিতে। সে কাঁচুমাচু গলায় বলে, কাকিমা, আর কিছু বলো না। এসব শুনতে কার ভালো লাগে বলো। তবে আমি যতটুকু বুঝি—বাবার এসব বলা উচিত নয়। লেখা-পড়া জেনেও বাবা যদি মূর্খের মতো ব্যবহার করে তাহলে কার আর কি করার থাকতে পারে?

সোয়েটারটা তক্তপোষের উপর রেখে শুভ যখন বেরিয়ে আসবে ঘর থেকে তখন তার পথ আগলে দাঁড়াল সরস্বতী, রাত হচ্ছে, এখন যাবি কোথায়? ঘরে থাক। যা ঠাণ্ডা পড়েছে—

শুভ এসব কথা কানে নিল না, মা, বাবা কোথায়?

—সে কোথায় যায়, আমাকে কি বলে যায়! সরস্বতীর গলায় অভিমান ধরা পড়ল, মানুষটা চিরকালই বাহিরমুখী। আমাকে কোনোকালেই সে পাত্তা দিল না। আজ যদি সে আমার কথামতো চলত তাহলে এ সংসারের হাল আজ এমন হত না।

সরস্বতীর চোখ হঠাৎ চিকচিকি কাগজে মোড়ান নতুন সোয়েটারটার উপর পড়ল, উবু হয়ে সোয়েটারটা হাতে নিয়ে সে দেখল, পছন্দ হল তার, এটা কোথায় পেলি রে, শুভ?

—পিসি দিয়েছে।

সরস্বতীর চোখ-মুখের চেহারা বদলে গেল নিমেষে, গদগদ গলায় সে বলল, তোর পিসির দেখছি সব দিকে নজর আছে। শুভ ব্যস্ত হয়ে উঠছিল রঘুনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্য, মা, আমাকে যেতে হবে। রঘুনাথ এসেছে। সে একা আছে হাসপাতালের মাঠে।

—তাকে এখানে আনতে পারতিস।

দরজার কাছে এসে আঁবার থমকে দাঁড়াল শুভ, মা, মুড়ি আর পাটালি গুড় এই চিকচিকি কাগজে ভরে দাও। রঘু সারাদিন খেয়েছে কিনা কে জানে। ওর সঙ্গে দেখা হলে ভীষণ মন খারাপ করে শুভর। সে এতদিন জানত—তারাই সব চাইতে গরীব কিন্তু তার থেকেও আরও অনেক গরীব মানুষ আছে এ সমাজে এটা তার বিশ্বাসই হত না। রঘুর সঙ্গে আলাপ হবার পর তার ধারণাটাই বদলে গিয়েছে। এই শীতে রঘুর গায়ে দেবার মতো গরম-পোষাক নেই। একটা পাতলা ফিনফিনে গেঞ্জির উপর গামছা জড়িয়ে সে চলে আসে হাসপাতালে।

ভাঁজ করা দু-হাত মুখের কাছে ধরা। উত্তরের হাওয়ায় সে ঠকঠক করে কাঁপে। তাকে দেখে মায়া হয় শুভর।

সরস্বতীকে বলল, মা আমার তুষের চাদরটা খুঁজে দাও তো।

—গায়ে দিবি নাকি?

—না ওটা আমি রঘুকে দেব।

—দিবি মানে? তুই তাহলে কি গায়ে দিবি? অসন্তুষ্ট চোখে তাকাল সরস্বতী, আগে নিজে বাঁচ, তারপর অন্যের কথা ভাববি।

—একথা তুমি আমার মা হয়ে বলছো? শুভ তীরবিদ্ধ চোখে তাকাল। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠতেই সবুজ বলল, তোর আর চাদর দিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং আমি একটা ঘর থেকে এনে দিচ্ছি। আমার দিদি তো পুরনো চাদর গায়ে দেয় না। আমি বরং দিদির চাদরটা চুপচাপ নিয়ে চলে আসি, কেউ টেরই পাবে না।

—সেটা ঠিক নয়। শুভ বোঝাল, যদি কিছু দিতে হয় তাহলে সবাইকে বলে তুই দিবি। নাহলে দেওয়ার কথা ভুলে যা.....

শুভর জেদের কথা সরস্বতী সব জানে না। বেশি সময় ব্যয় না করে সে কাপড়ের পুঁটলিটা নামাল তাক থেকে। পুঁটলি খুলে বের করে দিল মেটে রঙের তুষের চাদর। হাসির ঢেউ থেকে গেল শুভর চোখে, যাওয়ার আগে সে বলল, বাবাকে কিছু বলবে না। বাবা শুধালে বলবে, আমি মাধুবীদের বাড়ি গিয়েছি।

এখনও বিদ্যুৎ-এর আলো আসেনি এ হাসপাতালে। শুধু হাসপাতাল কেন, সারা গ্রাম ডুবে আছে অন্ধকারে। এখন কেরোসিন তেলের আকাল চলছে। ডিলাররা ব্ল্যাকে চড়া দামে বেচে দিচ্ছে তেল। ধরা পড়ে হেনস্থা হচ্ছে কেউ কেউ। তবু শিক্ষা হচ্ছে না কারোরই। খবরের কাগজ পড়ে কত জেনেছে শুভ। এই হাসাপাতালে ডাক্তারবাবুর বাড়িতেই খবরের কাগজ আসে। তাও এ গ্রামে পৌঁছতে দশটা-এগারটা বেজে যায়। শুভ সময় পেলেই ডাক্তারবাবুর বাড়িতে এসে খবরের কাগজ পড়ে যায়। প্রথম পৃষ্ঠায় যে কার্টুনটা ছাপা হয় সেটাই তার প্রিয়। শুভ তার বোর্ড বাঁধানো সাদা খাতায় রোজকার ব্যঙ্গচিত্রটি টুকে রাখে। এভাবেই ব্যঙ্গচিত্র এঁকে তার তিনটে খাতা শেষ হয়ে গেছে,আগের তুলনায় রেখাগুলো আরও জোরালো হয়েছে, আরও ভালো হয়েছে তার উপস্থাপন ক্ষমতা।

আলো-আঁধারীর পথ শেষ হয় কলতলায় এসে। বড়ো আমগাছটা গোলাকার অনেকটা জায়গাকে ছায়া দেয়, হলুদ আমপাতা মাঝে মধ্যেই বিছিয়ে দেয় ঘাস উঠে যাওয়া মাটির বুকে। দুপুরবেলা এই আমতলা বড়ো লোভনীয়। শুভ এখানে কাচের গুলি খেলতে আসত। প্রায়ই ঝগড়া লেগে যেত পাড়ার ছেলেগুলোর সঙ্গে। হাতাহাতিতে সবুজের জোড়া মেলা ভার। চোর-চোট্টামী সে একদম সহ্য করতে পারে না। খুব অসহ্য লাগলে কিল-চড়-ঘুষি চালিয়ে দেয়। একবার ডাংগুলি খেলায় সে চোখ ফাটিয়ে দিয়েছিল পাড়ার একটি ছেলের। সেই নিয়ে কত অশান্তি আর বিচার সভা। টিকেদারবাবু নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল সবুজের কর্মকাণ্ডে। পাড়ার ছেলেটার সম্পূর্ণ চিকিৎসার খরচ বহন করতে হয়েছিল টিকেদারবাবুকে। আজ আমতলায় এসে বিনা কারণে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল শুভ আর সবুজ। আর তখনই এক ঝাঁক জোনাকপোকা টিপিরটিপির আলো জ্বেলে উড়ে গেল খেজুরঝোপের দিকে।

হাত উঠিয়ে সবুজ বলল, রঘুটাকে নিয়ে আর পারা যাবে না। ও এতদূর এল, আর কোয়ার্টার অব্দি যেতে পারল না। এত জড়োসড়ো হয়ে থাকলে আজকের দিনে কি চলে?

শুভ অন্ধকারেই হাসল, আসলে তা নয়। রঘু খুব সাদা মনের ছেলে। আমরা ওর বন্ধু, তবু ও আমাদের সঙ্গে মিশতে দ্বিধাবোধ করে।

জন্মগত জড়তা একদিনে কাটবে না। এগুলো দূর হতে সময় লাগবে। ততদিন আমাদেরই এগিয়ে যেতে হবে। বন্ধুর জন্য এটুকু ত্যাগ তো আমাদের করতেই হবে।

সবুজ আর কথা বাড়াল না, চুপচাপ হেঁটে এল ফুটবল মাঠের শেষ প্রান্তে। মাঠ যেখানে শেষ, সেখান থেকে শুরু হয়েছে সরকারি পাঁচিল। পাঁচিলের হাত পাঁচেক দূরেই পচা জলের ডোবা। দিনরাত মশা ভনভন করে সেখানে। একটু হাওয়া দিলেই দুর্গন্ধ ছোটে চারদিকে।

সবুজ জোনাক-জ্বলা মাঠের দিকে তাকিয়ে নাক টিপে ধরল জামা দিয়ে। শুভ সেসব কিছু করল না তবে রঘুনাথের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, অসময়ে তোর না আসলেও চলত। বল কিসের জন্য এসেছিস? কিছু বলার আগে রঘুনাথ হাতকাটা জামার পকেট থেকে বের করে আনল বিড়ির ডিবা, একটা নিজে ধরিয়ে শুভকে জিজ্ঞেস করল, চলবে নাকি?

শুভ কপাল কুঁচকে বলল, এগুলা তুই আবার কবে থেকে খাওয়া ধরলি?

—খাই লেংটো কাল থিকে, তবে তোর সামনে খেতাম না। রঘুনাথ ফিঁচেল চোরের মতো হাসল, তুই ভালো ছেলে। জীবনে এসব ছুঁবি না। কিন্তু আমার মতো ছেলে-ছোকরাদের এসব না খেলে পেট চলে না। জন খাটতে গেলে বিড়ির ধোঁয়া সালসার কাজ করে।

—তুই যে বিড়ি খাস, তোর বাবা তোকে বকে না।

—আগে বকঝকা করত—ফুসফুসটা ঝাঁঝরা হয়ে যাবে রে। খাওয়ার বয়স কি পেলিয়ে যাচ্ছে নাকি? রঘুনাথ বড়ো করে শ্বাস টেনে নিয়ে তাকাল, মজুর খাটতে গেলে জলখাবার মুড়ি না দিলে চলবে, কিন্তু বিড়ি না দিলে পেট ফুলে যাবে নেশায়। এই দেখ, আমি এট্টা পাথরপোরা খ্যাচাকল কিনেছি। দেখ কেমন আগুন উগলায়।

বুড়ো আঙুলে চাপ দিয়ে রূপো রঙের লাইটারে আগুন বের করে দেখাল রঘুনাথ। শুভ অবাক করা চোখে দেখছিল। লাইটার সে এর আগেও দেখেছে, তার বাবার আছে।

বিড়ির গন্ধে হারিয়ে যাচ্ছে বাতাসের ঘ্রাণ। হঠাৎ শুভর মনে হয় রঘুনাথ যেন পচা ডোবা। যতই আতর ছেটানো যাক—এর দুর্গন্ধ যাবে না। 'মিতে' পাতিয়ে তার সম্বন্ধে এ কী ভাবছে সে? এ তো অপরাধ। বন্ধুর দোষ-ত্রুটি সামনাসামনি বলে দেওয়া ভালো। এতে ভুল বোঝাবোঝি কমে। সম্পর্ক ভালো থাকে।

শুভ হঠাৎ হাত ধরল রঘুনাথের, কিছু বলতে যাওয়ার আগে সবুজ আগ্রহ ভরে বলল, জানিস রঘু, আজ আমাদের রেজাল্ট বের হয়েছে। আমরা পাশ করেছি। পাশ করার জন্য আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। ফেল করা ছেলে যদি ভালভাবে পাশ করে যায়, তাহলে আনন্দ হবে না বল?

রঘু ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিল।

সবুজ সময় নষ্ট না করে বলল, আজ এই আনন্দের দিনে বিষ দিলেও আমি খেয়ে নেব। দে, আমাকে একটা বিড়ি দে। বিড়ি খেলে কেউ খারাপ ছেলে হয়ে যায় না। খাওয়ার জিনিস খাবো, তাতে দোষ কোথায়?

রঘুনাথ শুভর দিকে কাঁপা চোখে তাকাল, তোরা বাবু ঘরের ছেলে। বিড়ি খেলে, নেশা করলে তোদের বদনাম হবে।

—লোকের কথায় আমার কি এসে যায়? সবুজ রঘুর জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল, জোর করে বিড়ির ডিবাটা বের করে এনে বলল, বাঃ, সুন্দর তো বিড়ির কৌটোটা; এটা তো নস্যির কৌটো। তুই কোথায় পেলি?

বিড়িটা কায়দা করে আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে নেশাখোর মানুষের মতো সবুজ বলল, দে, তোর লাইটারটা দে। বিড়ি টানা আমার অভ্যেস আছে। আগে কুমড়োর শুকনো লতা কেটে বিড়ির

মতো ধরিয়ে টান দিতাম। তাতে গলগল করে ধোঁয়া বেরত। আর কি আনন্দই না হত।

হাওয়ায় লাইটার জ্বালতে অসুবিধা হচ্ছিল সবুজের, বিরক্ত রঘুনাথ তার হাত থেকে লাইটারটা কেড়ে নিয়ে বলল, বিড়ি খাওয়া যে সে লোকের দ্বারা হয় না। বিড়ি খেতে গেলে বুকের ছাতিতে দম থাকা দরকার। তোর তো চড়ুইপাখির মতো ছাতি। এতে আর কতটুকু দম পাবি?

রঘুনাথের কথায় হীনমন্যতায় ডুবে গেল সবুজ, গলার রগ টানটান করে বলল, অত কথা না বলে বিড়িটা ধরিয়ে দে।

আমগাছের আড়ালে গিয়ে হাওয়া আটকাল রঘুনাথ। ফস ফস করে বার দুই-বিড়িটা টেনে সে ধরিয়ে দিল সবুজের হাতে, সতর্ক করে বলল, ধীরে ধীরে টান দিবি। তাড়াহুড়ো করতে গেলে শ্বাসনালীতে ধোঁয়া আটকে মরবি। তখন আর কাশি থামবে না।

সবুজের সতর্কবাণী শোনার সময় নেই। আজ তার জীবনে এক অন্য অভিজ্ঞতার সূচনা হতে চলেছে। ভারী কথায় এই মুহূর্তটাকে সে নষ্ট হতে দেবে না।

বার দুই বিড়িতে টান দেবার পর কাশি ঠেলে উঠল সবুজের গলায়। ঝ্যানঝ্যান করে আওয়াজ হল বুকের পাঁজরায়।

আমগাছের গোড়ায় মুখোমুখি বসেছে ওরা তিনজন।

শুভ তুষের চাদরটা রঘুনাথকে দিয়ে বলল, এটা আমি তোর জন্য এনেছি। পুরনো চাদর। তবু তুই নে। না করিস না।

—কেন দিতে গেলি? গলা কেঁপে উঠল রঘুনাথের।

—যা শীত পড়েছে, এই ভয়ানক শীতে আমার শুধু তোর কথা মনে পড়ে। পৃথিবীতে কত গরম পোষাক, অথচ তোর একটাও নেই। শুভ রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা খসে পড়া দেখল। অমনি ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। রঘুনাথ কেমন কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে আছে অন্ধকারে। বিড়বিড় করে বলল, মনে আছে তো বাঁশির মোট ছ'টা ফুটো, ফুঁঃ দেওয়ার জন্য আর একটা ফুটো। মোট সাতটা ফুটো না হলে সুর বেরয় না। প্রতিটি ফুটোয় এক সমুদ্র সুর। আমার গুরু বলে সাতটা ছিদ্রে সাত সমুদ্রের সুর। যে বাঁশি বাজায়, সে পানকৌড়ি পাখির মতো ডুব দেয় সুরের গঙ্গায়। তবে না বাতাস ভরে সুর ওঠে। সুর না উঠলে সব দুধ জল হয়ে যায়। বাঁশি শেখানোর দক্ষিণা আমি মিতের কাছ থেকে নিতে পারিনে। তুই এটা ঘুরোন নে—

—না নিলে অনেক কষ্ট পাবো।

—এত করে বলছিস যখন দে। তিতকুড়ো ঢোঁক গিলে ঠোঁট কামড়ে ধরল রঘুনাথ। কিসের কষ্টে সে নিজেকে স্বাভাবিক করতে পারছিল না। যা কঠিন সময় এসেছে, একটা মাস কেন, একটা দিনও কাটতে চায় না। সোনার বাংলায় এখন ভাতের বড়ো আকাল। গাঁয়ের মানুষ আটা খাচ্ছে—স্বপ্নেও ভাবা যায় না এমন দৃশ্য। ট্রাক বোঝাই হয়ে মাইলো আসছে। বগলাহাটের খিচুড়ি দিচ্ছে ইস্কুলে। গমচুর খেয়ে মানুষের তলপেটে দরকচা মেরে গেল। গুয়ারাম এসব দেখে দুঃখ করে বলে, গাঁ ঘরে গরীবগুরবো মানুষ আর বাঁচবে নি গো! গেঁড়িগুগলি থেকে বনকচু কিছুই পাওয়া যায় না যে সিজিয়ে খাবে। এমন চললে মানুষ আর ক'দিন বাঁচবে?

বেশিদিনের কথা নয়, তখনও গোরুপালন প্রথা চালু ছিল গাঁয়ের ঘরে। গোরু চরানোর জন্য দিনভর ব্যস্ত থাকতে হত গুয়ারামকে। রঘুনাথও তার বাবার সঙ্গে মাঠে যেত গোরুর পাল নিয়ে। গ্রামের যত গোরু ঘর ঘর গিয়ে গোয়াল থেকে খুলে আনত গুয়ারাম। সকাল থেকে এ কাজে তার ব্যস্ততার শেষ নেই। পঞ্চাশ-ষাট ঘর থেকে গোরু আনা কি মুখের কথা! গোরুর পাল খেদিয়ে জঙ্গলের ধারের মাঠটাতে হাজির হত তারা। দুর্গামণি প্রতি ঘর থেকে মুড়ি গুড় চিড়ে

চেয়ে আনত সারাদিনের খাওয়ার জন্য। কেউ দিত, কেউ আবার দিত না। কেউ বলত, কাল নিও... ইত্যাদি। দশ জনের দয়ায় দিন চলছিল হাওয়ার মুখে পানসির মতো তরতরিয়ে। গোরু চরানোর মজাটাই তখন আলাদা। এ এক নেশা। এই নেশার জন্য স্কুলের পথে বেশি দূর পা বাড়াল না রঘুনাথ। মোষের পিঠে চড়ে, সবুজ ঘন বনের দিকে তাকিয়ে বাঁশি বাজানোর যে আনন্দ—সেই আনন্দ কি স্কুলের চার দেওয়ালের মধ্যে পাওয়া যায়? তাই স্কুলের কথা শুনলে হাঁপিয়ে উঠত সে। দুর্গামণির কাছ ঘেঁষে বসে থাকত চুপচাপ। গোরুর পাল-এ যাওয়ার অর্থ রোজ বনভোজন। মাটির ঠিলিতে পাল পুকুরের টলটল জল ভরে নিয়ে যেত দুর্গামণি। বেতের ধামা ভর্তি মুড়ি। সঙ্গে আখের গুড়। তিন জনে মিলে, জল দিয়ে মুড়ি ভিজিয়ে গুড় সহযোগে খাওয়া চলত ভর পেট। রোদ ঢললে গোরু মোষ গুণে নিয়ে ঘরে ফেরার তাড়া। যার গোরু তার তার গোয়ালে পৌঁছে না দিলে দশটা কথা শোনায় গোরুর মালিক। লোকের মুখ ঝামটা দেওয়া কথা ফোস্‌কা পড়ায় গুয়ারামের মনে। মাঝে মধ্যে সে আক্ষেপ করে রঘুনাথকে বলে, লেখাপড়াটা শিখে লে ব্যাটা। আজকাল যুগ পাল্টেচে। পড়া লিখা শিখলে টুক করে চাকরিটা পেয়ে যাবি।

বামুনে মন্ত্র পড়ে, পাঁঠার চামড়া শোনে। রঘুনাথ এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিত কথাগুলো। একদম ভালো লাগত না গুয়ারামের ঘ্যানরঘ্যানর ভাষণবাজি।

সবুজের বিড়িটা টানের জোরে হাতে ছ্যাঁক লাগার মতো অবস্থা। অন্ধকারে বিড়ির সুতো ছোঁয়া আগুনে ছ্যাঁকা খেল সে। উঃ শব্দ বাতাসে মিশতেই হাসি পেল রঘুনাথের, দেখে-শুনে খা। অমন হাভাতের মতো নেশা করলে মরবি কেশে কেশে।

সবুজ তর্কে না গিয়ে বলল, বিড়িতে যে এত দম লাগে আগে জানতাম না। শুভ বলল, চল, এবার আমরা ফিরে যাই। রঘুকে পাকা রাস্তা অব্দি এগিয়ে দিয়ে ঘর ফিরে যাব।

রঘুর সায় ছিল না, সে নিমতেতো স্বরে বলল, আমাকে নিয়ে ভাবিস না। আঁধারে বেড়ালের মতো আমার চোখ জ্বলে।

শুভ মজা করে বলল, তুই কি চোর নাকি?

মনোক্ষুণ্ণ রঘুনাথ সামলে নিল নিজেকে, চোর হলে তো বেঁচে যেতাম। দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পেতাম। সাধু হয়ে যত ঝামেলা হয়েচে। এক পা জলে, এক পা ডাঙায়, এভাবে কি মানুষ বাঁচবে? রঘুনাথ নিজেকেই যেন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, এত অভাবে নিয়ে বাঁচা যায় বলত? বুড়া দাদুটা টাইমে খেতে না পেলে চেল্লায়। বাপ-মা তুলে গাল দেয়।

অভাবের ধারালো নখ শুভ দেখেছে তাই সে চুপ করে থাকল। রঘুনাথ উসখুসিয়ে বলল, তুই ঘরে গেছিলিস, কোনো কথা আছে নাকি?

সকালের কথাগুলো এখন আর রঘুর কাছে বলতে ইচ্ছে করল না শুভর। উপর দিকে থুতু ছুঁড়লে নিজের গায়ে পড়ে। সেটা কি ভালো দেখায়? ঢোক গিলে শুভ বলল, আজ রেজাল্ট বেরল। তাই তোর কাছে গিয়েছিলাম সুখবর দিতে। দেখা হলে ভালো লাগত। কিছু সময় হয়ত বাঁশিটা শিখে নেওয়া যেত।

—দূর বোকা, বাঁশি যখন তখন শেখা যায় না। রঘুনাথ সতর্কগলায় বলল, আমাকে গুরু মানা করেছে—দুপুরবেলায় বাঁশিতে যেন ফুঁঃ না দিই। দুপুরে ফুঁঃ দিলে সুরের ছাতি ফাটে। বাঁশি কাঁদে।

এসব গূঢ় কথা কিছুই বুঝতে চায় না শুভ।

সবুজ ঠাট্টা করে বলল, গাঁ-ঘোরা সন্ন্যাসীদের মতো কথা বলিস নে! কথায় যদি হেঁয়ালি থাকে সে কথা তো পাথরচাপা।

—তর্ক থামা। শুভ দু'জনকেই থামিয়ে দিতে চাইল, তোরা চুপ করবি?

কিছু দূরে শুয়ে আছে ঝোপঝাড়। হাড়মটমটি আর পুটুসের ছড়াছড়ি। একটা শেয়াল আড়চোখে তাকিয়ে দ্রুত ঢুকে গেল বাঁশবাগানে। রঘুর মনে পড়ে গেল ধানমাঠে শেয়ালের বাচ্চা ধরার কথা। ফুটফুটে রোদে বাচ্চাটা গর্ত থেকে বাইরে এসে বিপদে পড়ে গিয়েছিল। দূর থেকে তার নরম শরীরটাকে দেখে ফেলে রঘুনাথ। ছুটে গিয়ে দখল নেয় শেয়ালছানার। খুশি আর ধরে না তার চোখে-মুখে। ভয়ে জড়োসড়ো শেয়ালের বাচ্চা নিয়ে সে ছুটে এসেছিল ঘরে। মায়ের কোলের কাছে শেয়ালের বাচ্চাটা নামিয়ে রেখে বলেছিল, হ্যাঁ দেখ মা, কী সোন্দর শেয়ালের ছা! এটা আমি পুষব।

ঠোঁট ভরিয়ে হেসে দুর্গামণি বলেছিল, ছ্যাঁ, শেয়ালের ছা আবার কেউ পোষে নাকি? যা এটারে যেখান থিকে ধরে এনেচিস, সিখানে ছেড়ে আয়। ঘরে শেয়াল পুষেচি শুনলে এ ঢিপেয় আর কেউ পা দিবেনি।

পায়ের চড়া পড়া দাগে পাশাপাশি হাঁটছিল ওরা তিনজন।

চাদর বিছানোর মতো হিম পড়ছে সর্বত্র। অল্প হাঁটলেই মাথার চুল স্যাঁতসেতে হয়ে ওঠে। টুপটুপিয়ে হিম ঝরে গাছের পাতা চুঁইয়ে। ক'দিন হল ঠাণ্ডাটায় শুলোনী ভাব আছে। রাতে শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না রঘুনাথের। পাতলা কাঁথাকানিতে ঘুমের বারোটা বেজে যায়। তবু কাউকে বলা যায় না এই দুঃখের কথা, মুখ বুজে পড়ে থাকতে হয়। হঠাৎ তারা খসে পড়ল মাঝ আকাশ থেকে।

তারা খসে পড়ার সংকেত শুভ নয়।

কিছুটা আসার পর ওদের পথ আটকে দিলেন এই হাসপাতালের স্টাফ অরূপবাবু। ভালো করে তিনজনকে জরিপ করে অরূপবাবু বললেন, এটাকে তো চিনলাম না। কোথায় বাড়ি ছেলেটার? রাতের বেলায় হাসপাতাল চত্বরে কেন এসেছে? ডাক্তারবাবু জানলে রাগারাগি করবেন।

অরূপবাবুর পোশাক-আশাক বড়োই বিচিত্র। ফিনফিনে ধুতির সঙ্গে ফুল-পাঞ্জাবী পরেন তিনি। সেই পাঞ্জাবীর বুক পকেটে আটকান থাকে সোনালী মুখোটির দামী একটা কলম। শুধু দামী কলম নয়, অরূপবাবুর চশমাখানাও খাসা, সোনালী ফ্রেমের উপর বিদেশী কাচ তার চোখজোড়াকে দিয়েছে আলাদা এক দর্শন ক্ষমতা। ধুতির কোঁচা পাঞ্জাবীর পকেটে ঢুকিয়ে অরূপবাবু কবির চোখে তাকালেন, তোমরা আমার সন্তানের মতো, তোমাদের একটা কথা বলি—অল্প বয়সে নেশা-ভাঙ করা অনুচিত। এতে দৈহিক মানসিক-দু'দিক থেকেই শরীরের প্রভূত ক্ষতি হয়। তোমরা এ দেশের ভবিষ্যৎ। তোমরা যদি বিপথগামী হও, তাহলে এত বড়ো দেশটা চালাবে কে?

সবুজ বাহাদুরী নেবার জন্য এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, এ কথা কেন বলছেন, কাকু? আমরা কি কোনো অপরাধ করেছি?

—করছো তো! অরূপবাবু বেশ ক্রোধের সঙ্গে গর্জে উঠলেন, তোমার বয়স কত, কোন ক্লাসে পড়ো? বলো—এই বয়স থেকে তোমাদের কি ধূমপান করা উচিত? তোমরা হয়ত বুঝতে পারছ না—যে তোমাদের মুখ দিয়ে বিড়ির দুর্গন্ধ বেরচ্ছে। সেই দুর্গন্ধে যে কোনো ভদ্রলোকের নাসিকা কুঁচকে যেতে বাধ্য।

অপ্রস্তুত শুভ মুখ নামিয়ে নিল মাটির দিকে।

অরূপবাবু এই হাসপাতালের সুপারভাইজার। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তার হৃদ্যতা এখানকার সব স্টাফই লক্ষ্য করেছেন। ইংরেজিতে অনার্স এই ভদ্রলোক একটু শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে ভালোবাসেন। ইংরেজি তাঁর প্রিয় বিষয় হলেও বাংলায় আধিপত্য কম নেই, সুযোগ এবং অবসর

সময় পেলে তিনি কাগজ কলম নিয়ে বসে যান কাব্যসাধনা করতে। তাঁর কবিতায় সমস্যার চাইতে প্রকৃতি বন্দনা বেশি, আকাশ জল মাটি ফুল নদী এসবই তাঁর কাব্যভাবনাকে ঋদ্ধ করে।

এই মানুষটির উপর অবনীর শ্রদ্ধা অসীম, সে প্রায়ই আলোচনার সময় বলে, অরূপবাবুর মতো গুণী মানুষ এ হাসপাতালে আর দুটি নেই। যখন কোনো দরখাস্ত লেখার প্রয়োজন হয়, ডাক্তারবাবুর মতো মানুষও এই মানুষটার দ্বারস্থ হন।

জ্ঞানের প্রাচুর্য মানুষকে সরল দেবদারু গাছের চেয়েও সুন্দর করে তোলে। অরূপবাবু চশমার ফাঁক দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে সবুজের দিকে তাকালেন, তুমি তো টিকেদারবাবুর ছেলে, তাই না? কী যেন নাম তোমার? বড় পিকিউলার তোমার নামটা। এই মুহূর্তে মনে পড়েছে না!

—ওর নাম সবুজ। ঝটপট জবাব দিল শুভ।

এই ফাঁদ থেকে ওরা তিনজনই চাইছিল মুক্তি পেতে। কিন্তু মুক্তি কি অত সহজ নাকি? মুক্তি তো ছেলের হাতের নাড়ু নয় যে চাইলেই পাওয়া যাবে।

অরূপবাবু কোঁচা দুলিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, কয়েকটা কথা বলছি মন দিয়ে শোন। ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা হল পড়াশোনা করা। যারা জেলে—তাদের তপস্যা হল মাছধরা। যারা চোর—তাদের চুরিবিদ্যায় পারঙ্গম হতে হয়। না হলে মানবজীবনে সফলতা আসে না। তাই বলছিলাম—নেশা-ভাঙ ছেড়ে দিয়ে মন দিয়ে বিদ্যাভ্যাস করো। মা সরস্বতীর আরাধনা করবে, মা সরস্বতী তাহলে তোমার জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করে দেবেন। আমি প্রতি বছর বাগদেবীর শ্রীচরণ বন্দনা করি। আমার বিশ্বাস—এর দ্বারা আমার জ্ঞানের গভীরতা, স্মৃতিশক্তি এই বয়সেও পূর্বের ন্যায় উজ্জ্বল আছে। আর একটি কথা—মা সরস্বতীকে পূজা অন্তে কখনই বিসর্জন দেবে না। এতে মা মনদুঃখে ভোগেন। আশীর্বাদের বদলে তাঁর দীর্ঘশ্বাস আমাদের উপর বর্ষিত হলে এই মনুষ্যজীবনে আমাদের পক্ষে একা একা কতদূর যাওয়া সম্ভব? কথা সমাপ্ত করে অরূপবাবু থানার দারোগার মতো বললেন, তোমরা আমাকে অনুসরণ করো নাহলে আজ তোমরা এই বয়সন্ধিক্ষণে যে পাপ করেছো—তার শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে। আমার কথার অবাধ্য হলে আমি তোমাদের পিতা-মাতার কাছে তোমাদের যাবতীয় গুণাবলী বিশদভাবে বলব। এতে ফলাফল কী হবে তা তোমাদের অজ্ঞাত নয়।

শুধু শুভ কেন, সবুজের মুখ শুকিয়ে পাটের দড়ির মতো বিবর্ণ দেখায়। ভাষাহীন, বাক্যরহিত রঘুনাথ ভাবছিল—এ কী ফ্যাসাদে পড়া গেল! এর থেকে সহজে উদ্ধার পাওয়া যাবে তেমন কোনো অলৌকিক আলো সে দেখতে পেল না।

পাঁচিলের ধারে একেবারে শেষ কোয়ার্টারটি অরূপবাবুর। এদিকে মানুষজন কম আসেন। সামনের মাঠটাতে বেশির ভাগ সময় গোরু-মোষ চরে, রাখালরা ডাংগুলি খেলার উপযুক্ত জায়গা পেয়ে সব সময় হৈ-চৈ বাঁধিয়ে রাখে। বিরক্ত অরূপবাবুর কাব্যচর্চায় ওইসব হই-হট্টগোলের শব্দ কোনো নতুন কবিতার জন্ম দিতে পারে না। ফলে তিনি এই কোয়ার্টার পেয়ে দুঃখী। নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য মনের মতো পরিবেশ তিনি আজ পর্যন্ত পেলেন না। এই আক্ষেপে—তিনি স্ব-উদ্যোগে, স্ব-হস্তে তৈরি করেছেন একটি অভিনব পুষ্প-উদ্যান। এই পুষ্প-উদ্যানের তিনি নাম রেখেছেন—"মনোরমা"।

মনোরমা তাঁর প্রথমপক্ষের স্ত্রী, অকালে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়, সেই শোকে অধীর অরূপবাবু তাঁর জীবনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, সেই কাব্যগ্রন্থের নাম রাখেন, 'মনোরমা'। লাখুরিয়া ইস্কুলের বাংলার শিক্ষক তমালবাবু 'মনোরমা' কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতার প্রথম পাঠক। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই উদ্যানে চেয়ার সাজিয়ে, হ্যারিকেনের আলোয় চলত কাব্য-সাধনার নিরলস মহড়া। হরিনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফজলু শেখ আসতেন এই মহতী সান্ধ্যবাসরে

যোগ দিতে। তার একটি মার্ড-গার্ড খোলা সাইকেল, সঙ্গের থলিতে পাম্পার, টায়ার-লিভার, সলিউশন ডিবা, ধার কাঁচি ইত্যাদি যন্ত্রপাতি মজুত থাকত। কোনো কারণে টিউব লিক হয়ে সাইকেল তার ভার বহন করতে অক্ষম হলে ফজলু মাস্টারমশাই তার যন্ত্রপাতি সহযোগে অসুস্থ সাইকেলের রোগ সারিয়ে চাঙ্গা করে তুলতেন। নিজের হাতে এসব কাজ করার জন্য গর্ববোধ করতেন ফজলু শেখ। মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলতেন, পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবনধারণ করা পাপের। মহাত্মা গান্ধীর মতন মহামানবও নিজের ঘরদোর নিজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন। আমি সেই মহাত্মাকে শ্রদ্ধা করি বলেই—নিজের সব কিছু নিজের হাতে করার চেষ্টা করি। এতে আমার আত্মবিশ্বাস মজবুত হয়। আমি আল্লার প্রতি আরও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে পড়ি।

এদের তিন জনের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে শুভর। সে ভালোভাবে লক্ষ্য করেছে—তিনজন আলাদা মানুষ হয়েও কোথাও একটা মিল রয়েছে এঁদের মধ্যে। এঁরা তিনজনই সাহিত্যমনস্ক এবং সাহিত্যপ্রেমী। এঁদের আলোচনার অধিকাংশ সময় জুড়ে থাকে বাংলা এবং ইংরেজি সাহিত্যের দিকপালদের নিয়ে বিশদ আলোচনা।

ফজলু শেখ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হলেও তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ., পি. এইচ ডি করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর চেহারা, সাজ-পোশাক দেখে অনেকেই হয়ত ভাববেন তিনি বড়ো জোর বি ডি ও অফিসের একজন কেরানী নয়ত কোনো ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যকর্মী। যে যাই ভাবুক—ফজলু শেখ এসব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামান না, তিনি তাঁর মৌলিক লেখালেখি আর পড়াশোনা নিয়ে মগ্ন হয়ে আছেন, তাই কলেজের শিক্ষকতার প্রস্তাবও হাসি মুখে ফিরিয়ে দেন। বিনীতভাবে বলেন, সৃজনশীল কাজ করতে গেলে টাকার পেছনে দৌড়ালে চলবে না। দু-বেলা ভাতের যোগাড় হয়ে গেলে মানুষের আর বিশেষ কিছু দরকার হয় না। প্রাইমারি স্কুলে আমি ভালো আছি। এখানে কোনো দুঃশ্চিন্তা নেই, শিশুদের সঙ্গে মিশে মনটাকে শিশুদের মতন করার চেষ্টায় আছি। মনের পাঁকে যদি পদ্মফুল না ফোটাতে পারি তাহলে আমি কিসের শিক্ষক হলাম?

ফজলু শেখের পরিচিতির শেষ নেই, তিনি ছ'ফুট দুই ইঞ্চি লম্বায়, মাথায় সাদা টুপি পরেন শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায়। তার চেহারা অনেকটা তরলা বাঁশের মতো সাদাসিধে, ছাত্ররা তাকে আড়ালে আবডালে বলে লগাঁ মাস্টার। লগা মাস্টারের অনেক গুণের মধ্যে নির্ভুল রবীন্দ্র-সংগীত গাওয়া অবশ্যই পড়বে। তাঁর তেমন বোদ্ধা শ্রোতার প্রয়োজন হয় না। ক্লাস থ্রি-ফোরের ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি গান গেয়ে শোনান, তার মানে বুঝিয়ে দেন। আর উদাত্ত কণ্ঠে বলেন, আমাদের রবীন্দ্রনাথ আছেন, নজরুল আছেন। তোমরা বড়ো হয়ে বড়ো মানুষদের কথা পড়বে।

তিন মাথা যেখানে মিলিত হয় সেটাই বুঝি ত্রিবেণী!

অরূপবাবুর মনোরমা উদ্যানের প্রবেশপথটি ইট বিছানো, তার দু-পাশে শীতের ফুল সুগন্ধ ঢালছে বাতাসে। বেশ গর্বিত মেজাজে অরূপবাবু বললেন, ফুল আর শিশু যারা ভালোবাসেন না তারা মানুষ নন। ঐ দেখ, পাড় বাঁধানো জলাধার। ওখানে পদ্মগাছ এনে লাগিয়েছি। ভালো করে দেখ—কুঁড়ি এসেছে। আজকালের মধ্যে ফুল ফুটবে।

শুভ দেখল পদ্মপাতা টলটল করছে চার হাত ব্যাসের জলাধারের মধ্যে। অতি আগ্রহে মাথা তুলে দেখার মতো দুটি কুঁড়ি জলশয্যা ছেড়ে মুখ তুলে তাকিয়েছে বাইরের আলোয়।

অরূপবাবু আফসোস করে বললেন, রাতেরবেলায় বাগানের আর কী শোভা দেখবে? দিনেরবেলায় এসো—সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব। ইট-বিছানো পথ যেখানে শেষ তার হাত দুয়েক দূরে সবুজ ঘাসের জঙ্গল। ঘাসগুলো লম্বা লম্বা, অনেকটা ধান গাছের পাতার মতো খসখসে। অরূপবাবু একটা পাতা ছিঁড়ে এনে শুধোলেন, বলো তো এটা কি পাতা?

শুভ পাতাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। নাম জানে না ফলে ওটা সবুজের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইল সে।

সবুজ চোখ কাচের গুলির মতো শক্ত করে বলল, দেখতে তো ধানপাতার মতো, তবে এর নাম জানি না।

সব শেষে রঘুনাথের কাছে হাত মাপের পাতাটা গিয়ে পৌঁছল। রঘুনাথ পাতার ডগাটা দু-আঙুলে চাপ দিয়ে গন্ধ শুঁকল। তারপর আত্মবিশ্বাসী গলায় বলল, এটা স্বরভঙ্গ গাছের পাতা। কারোর গলা বসে গেলে এই পাতার রস গরম জলে ফুটিয়ে খেলে গলা চাঙ্গা হতে বেশি সময় নেয় না।

অরূপবাবুর আবেশী গলা, ভেরি গুড! যথার্থ বলেছ। কী নাম তোমার?

ভ্যাবাচেকা খেয়ে রঘুনাথ বলল, আজ্ঞে, আমার নাম রঘুনাথ।

—বাড়ি কোথায়?

—বাঁধের ধারে থাকি! ধাওড়াপাড়ায়। রঘুনাথ বেশি কথা বলতে চাইছিল না। শুভ তার পক্ষ নিয়ে বলল, কাকু, এবার আমাদের ফিরতে হবে। রাত হয়েছে। ঘরে না গেলে মা চিন্তা করবে?

—ভেবেছিলাম তোমাদের দু-চারটে কবিতা শোনাব। ঠিক আছে, সময় যখন নেই তা পরে হবে। অরূপবাবুর গলায় আফসোস ধ্বনিত হল, তোমরা কেউ কিছু লিখলে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি মন দিয়ে শুনব। প্রয়োজন হলে কারেকশান করে দেব। শুভর মনে পড়ে গেল তার নিজের কথা। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে নিয়ে সে লিখেছিল জীবনের প্রথম কবিতা। হেড-মাস্টারমশাই সেই সৃষ্টিটাকে বাতিল করে দিলেন। উৎসাহের বদলে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, কার দেখে টুকে মেরেছ? এটা কি ক্লাস এইটের ছেলের ভাষা? আবার কোনোদিন যদি দেখি অন্যের কবিতা টুকে এনে আওড়াচ্ছ তাহলে প্রেয়ারের সময় নীল ডাউন করে রেখে দেব।

হেড-মাস্টারমশাইয়ের সেই রুদ্র মূর্তি, অঙ্গার ভরা চোখ এখনও ভুলতে পারেনি শুভ। সেদিন ভীষণ অপমানিতবোধ হয়েছিল নিজেকে। নির্দোষ প্রমাণ করার হাজার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিল সে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তার প্রিয়তম কবিদের একজন। তাঁর কবিতা পড়ে শুভ অনুপ্রাণিত হয় বারবার, তার মনে হয় বেশিরভাগ কবিতা বুঝি তাদের মতো মানুষের দুঃখ কষ্ট নিয়ে লেখা। তমালবাবু বাংলার ক্লাসে এই কবিকে নিয়ে অনেক অজানা কথা বলেছেন—যা শুনে চোখের জল আটকে রাখতে পারেনি শুভ।

তমালবাবু তাকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, তোমার আবেগটাকে কাজে লাগাও। আজকাল মানুষের হৃদয় থেকে আবেগ নামক শব্দটি মুছে যাচ্ছে। তোমাদের মতো নরম মনের ছেলেরাই পারবে—মাতৃভাষার কমনীয়তা রক্ষা করতে। তমালবাবু আরও বলেছিলেন, ভেবেছি, একটা দেওয়াল পত্রিকা বের করব। তোমরা সবাই লেখা দিলে কাজটা আমার পক্ষে সহজ হবে।

কিছু লিখতে বসলেই বাংলার মাস্টার তমালবাবুর মুখটা মনে পড়ে যায় শুভর। এ পৃথিবীতে

এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁদের বুকের গভীরে ঝর্না নদী এবং সমুদ্র আছে। তমালবাবু সেই মানুষ যাঁর মনে পাঁক নেই, কেবলই পলিমাটি।

—কী ভাবছ? শুভ'র কাঁধের উপর আলতো হাত রাখলেন অরূপবাবু। তোমার কথা আমি তমালবাবুর মুখে শুনেছি। এত বড়ো ইস্কুলে তোমরা ক'জন মাত্র লেখালেখি কর—সে খবর আমার জানা। তবে যাওয়ার আগে একটা কথা শুনে যাও। যারা সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করেন তাঁরা আমার প্রাণ, আত্মার আত্মীয়। তাই তোমাকে বলছি—যখন খুশি চলে এসো। আমার দরজা তোমার জন্য খোলা থাকবে।

সবুজ যেন গেট পেরতে পারলে বাঁচে এমন লম্বা লম্বা পা ফেলে সে হেঁটে এল কিচেনের সামনে। আর তখনি ছাদের উপর উড়ে এসে বসল একটা পেঁচা। পালক ফুলিয়ে কর্কশস্বরে ডেকে উঠল পেঁচাটা। শুভ ভয় পেল সেই ডাক শুনে।

মাঠের দিকে তাকাতেই তার চোখের সামনে ছায়া শরীর নিয়ে ঝাঁকড়া মাথা দুলিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল সারিবদ্ধ খেজুরগাছ। গিয়াস জিরেন কাট রসের জন্য গাছ কেটে বেঁধে দিয়ে গিয়েছে মাটির কলসী। সারারাত রস চুঁইয়ে অর্ধেকের উপর ভরে যাবে কলসীগুলো। সকালবেলায় শিশির চুবানো ঘাসে পা দিয়ে খেজুরগাছের কাছে এসে দাঁড়াবে গিয়াস। তার পরনে চেক লুঙ্গি, এই তীব্র শীতে পাতলা ফিনফিনে একটা জামা। শীতে কম্পমান শরীর নিয়ে তবু সে স্বপ্ন দেখা ছাড়েনি। রাতভর তার পরিশ্রমের অন্ত নেই। রসের ঠিলি চুরি করার লোকের অভাব হয় না। ওরা রস খায়, ঠিলি ভাঙে। গাছের গোড়ায় ভাঙা হাঁড়ির চিহ্নগুলো যেন তার স্বপ্নকে পা দিয়ে থেঁতলে দিয়ে চলে যায়। এই শত্রুতার কবে যে শেষ হবে—জানা নেই গিয়াসের। হাতে বাঁশের লাঠি, গিয়াস এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে বেড়ায় গাছ পাহারা দেবার জন্য।

তিন জনকে এক সাথে দাঁড়াতে দেখে লাঠি হাতে এগিয়ে এল গিয়াস। শুভ আর সবুজকে দেখে ভুল ভেঙে গেল তার, কী ব্যপার, রাত করে যে বাইরে আছো? হিম পড়ছে। চটজলদি ঘর যাও, ঠাণ্ডা লেগে গেলে ভোগান্তির আর শেষ থাকবে না।

গিয়াসের কথায় আন্তরিকতার ছোঁয়া পায় সবুজ। মনে মনে সে ভাবে দুটো পয়সার জন্য মানুষটা সারারাত ঘুমাতে পারে না। দূরের গাঁয়ে তার বউ-বাচ্চা আছে। তাদের কাছে যে যাবে—সময় কোথায়? মাথায় কাজের চিন্তা থাকলে ঘরও অনেক ক্ষেত্রে জেলখানা হয়ে যায়। হাসপাতালের গাছগুলো ঠিকে নেবার জন্য এবারও মকবুল এসেছিল কথা বলার জন্য। গাছ পিছু চার কেজি নয়, পাঁচ কেজি গুড় দেবে—এমন কথা জোর গলায় বলেছিল ডাক্তারবাবুকে। সেই কথার ফাঁদে পা দেননি ডাক্তারবাবু। সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মকবুলকে, গিয়াসের সঙ্গে অনেক আগে থেকে কথা হয়ে আছে। তাছাড় প্রতিবছর ও গাছগুলো ঝুড়ে দেয় যত্ন নিয়ে। ও রস ভালোবাসলেও, গাছকে কম ভালোবাসে না। ওর হাতের ছোঁয়ায় কী যাদু আছে তাই প্রতি বছর খেজুরগাছগুলো তরতরিয়ে বাড়ছে।

—তাহলে ফি-বছর গিয়াস-ই গাছ ঝুরবে? আমরা কি তাহলে আঙুল চুষব, ডাক্তারবাবু? মকবুলের চোখের তারায় আগুন ঠিকরায়, ঠিক আছে, আমিও দেখে নেব। আপনি গাছ না দিলে কী হবে, খোদাই আমাকে গাছ পাইয়ে দেবে। সবুর করুন, নিজের চোখে সব দেখতে পাবেন।

নতুন কলসী কিনে গাছে বেঁধেছিল গিয়াস। সাতদিনের মাথায় কলসী সব ভেঙে খোলামকুচি বানিয়ে দিল কেউ। গিয়াস সেই দুঃখ ভুলতে পারেনি, হাউ হাউ করে কেঁদেছে। হাসপাতালে সেদিন ছেলে কাঁখে করে ওষুধ আনতে এসেছিল—তার বিবি নাফিজা। মানুষটার কান্না দেখে সেও কাঁদল গলা ফাড়িয়ে। সেদিন পাশে দাঁড়িয়ে মকবুল দেখছিল সব প্যাটপেটিয়ে। অবশেষে

সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, আজকাল মানুষের চেয়ে পোকামাকড়ের সংখ্যা বাড়ছে। মানুষের মন সব পাথর হয়ে গিয়েছে। নাহলে লোতুন ঠিলিগুলো কেউ ওভাবে ভাঙতে পারে? আমি যদি জানতে পারি কে ভেঙেছে, আল্লা- কসম আমি তার ঠ্যাং ভেঙে রোদে শুকাতে দেব। মকবুলের এই আস্ফালন ভালো চোখে নেয়নি গিয়াস। লোকে যে বলে চোরের মায়ের বড়ো গলা—এক্ষেত্রে সেই হিসাব বুঝি কড়ায় গণ্ডায় মিলে যায়। মানুষকে বিশ্বাস করে এত পথ হেঁটেছে গিয়াস। অবিশ্বাস তার জীবনধারায় খুবই কম।

নানাকারণে মকবুলকে তার অবিশ্বাস করতে মন চাইল। চোখে মুখে যে মানুষটি মিথ্যা কথা বলে তার ছায়া মাড়ানোও উচিত নয়। গাঁয়ে ঘরে বদ মানুষ হিসাবে মকবুলের দুর্নাম আছে। হাসপাতালের গাছগুলোকে দখল নেবার জন্য সে সবরকম চেষ্টা করেছিল। ব্যর্থ হতেই বেড়ে যায় তার প্রতিহিংসা। গিয়াসকে সে বেইজ্জত না করে ছাড়বে না। তাতে যা হয় হোক। অতি সন্তর্পণে সে গিয়াসের বুকে থাবা মারার জন্য এগোচ্ছে। তার নিখুঁত অভিনয় সবাই বুঝতে পারে না সহজে।

গিয়াসকে কব্জা করতে না পেরে নাফিজার সঙ্গে গায়ে গা মিলিয়ে মিশতে চাইছে মকবুল। নাফিজাকে হাত করতে পারলে মকবুলের অভিযান অনেকটাই সফল হবে।

গ্রামের মেয়ে নাফিজা মকবুলের চোখা কথায় মজেছে। ছেলেকে আড়ালে দুধ ধরিয়ে দিয়ে নাফিজা লাজুক চোখে চেয়ে থাকে মকবুলের দিকে। লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট-জামা পরলে মকবুলের বয়স অর্ধেক কমে যায়। গোঁফ-দাড়ি কামালে সে যেন এ গাঁয়ের নবাব। নাফিজা তাকে দুধ-চা বানিয়ে দেয়। দাওয়ায় বসতে বলে। মকবুল মিঠে মিঠে কথায় তার মন ভেজানোর চেষ্টা করে, একা থাকার দুঃখটা আমি বুঝি গো ভাবী। কি করবে, উপায় তো নেই।

নাফিজা চুপ করে থাকলে, আনমনে একটা সিগারেট ধরায় মকবুল, গলগলিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, না খাটলে বিড়ি-সিগারেটের পয়সাই উঠবেনি। এই আমার কথা ধরো। দিনরাত সাইকেল নিয়ে ঘুরছি টো-টো করে, দুটো পয়সার জন্য। কোনোদিন ব্যবসা জমে, কোনোদিন আবার জমে না। যাইহোক না কেন বেরতে তো হয় ঘর ছেড়ে।

নাফিজা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

মকবুল উৎসাহিত হয়, যতদিন এই হাত দুটো আছে ততদিন পেটের ভাতের চিন্তা করি না আমি। গিয়াসভাই যে বিদ্যা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে সেই বিদ্যা দিয়ে আমি সারা জীবন ভাত-কাপড়ের যোগাড় করে নেব। জানলে ভাবী, একটা মেয়েমানুষকে পটানো সহজ কিন্তু কাঁটা বোঝাই খেজুরগাছ থেকে মিঠা রস বের করা অত সহজ কথা নয়। গিয়াস ভাই খোদার আপন-বান্দা। তাই তার হাতের ছোঁয়ায় খেজুরগাছে রস বেশি চুঁয়ায়। মকবুলের মন পটানো কথায় ভালো লাগার তিরতিরে স্রোত নাফিজার মনের উঠোন ভিজিয়ে সেখানে ভালোবাসার বীজ বপন করে দেয়। গিয়াসের অনুপস্থিতিতে মকবুল হয়ে ওঠে তার অন্তরঙ্গ-জন।

যা রটে তা কিছু না কিছু বটে। খবরটা গিয়াসের কানে গিয়েছিল। ঝিমিয়ে যাওয়া গিয়াস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল নাফিজাকে। বউটার পরিবর্তন এসেছে কথাবার্তায়, চোখেমুখে। মিথ্যার আশ্রয় নিতে শিখেছে সে।

গিয়াস বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, আমি তুমাকে সিখানে লিতে এয়েচি, চলো। সিথায় আমার বড়ো ঝামেলা। সময়মত দানাপানি জোটে না। তুমি গেলে দুটা চাল ফুটিয়ে দিতে পারবে। আমার কাজে হাত লাগাতে পারবে।

—তা তো বটে! নাফিজার শুকনো হাসি, কিন্তু সিখানে যে যাবো—আমার এই ঘর সনসার

কে দেখবে? দু-চারটা হাঁস-মুরগি পুষেছি, তারা আন্ডা দেয়। আমি গেলে পরে তাদের কে দেখভাল করবে।

—ও নিয়ে ভেবো না, ওগুলা জবাই করে খেয়ে লিবো। গিয়াস কথাগুলো বলে নাফিজার অস্বস্তিভরা মুখের দিকে তাকাল। নাফিজা উদ্ধার পাবার জন্য বলল, কাঁখের ছেলেটারে কে দেখবে। হাসপাতালে সাতজাতের মড়া এক হয়। বাতাসে জিন-পরী ঘোরে। সিখানে বদ-হাওয়ার ছড়াছড়ি। বাছার আমার গায়ে যদি কু-বাতাস লাগে—

বিরক্ত হল গিয়াস, যদির কথা নদীতে ফেলে দাও।

—তুমার কি হয়েচে বলদিনি?

—কিচু হয় নাই। তুমাকে আমার সাথে যেতে হবে। আমার মাথার ঠিক নাই। বেশি কথা কইতে পারবোনি। খপখপ তৈয়ার হয়ে নাও। গিয়াস নাফিজার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে হিড়হিড়িয়ে টেনে নিয়ে যায় মাটির ঘরের ভেতরে। চ্যাংদোলা করে শুইয়ে দেয় মেঝেয়। আবছা আলো আঁধারিতে নাফিজা ড্যাম ড্যাম করে তাকায়, একটা রহস্যভরা হাসি তার পাতলা ঠোঁট নাড়িয়ে বেরিয়ে আসে, মাথায় খুন চড়েচে আগে বলবা তো! তারপর বিড়বিড়িয়ে বলল, খুন তো চড়ার কথা, কৎদিন ঘরে আসো নি বল তো? আমারও ভাল্ লাগে না—

গিয়াস তার মুখে হাত চাপা দেয়, রাগে-উত্তেজনায় গরম বাষ্প বেরয় নাক-মুখ দিয়ে, নাফিজার ভরন্ত বুকের উপর ঝুঁকে হা করে দেখতে থাকে নাফিজাকে, মানুষ কত বদলে যায় গো। আজ শীতকাল তো পরশু বসন্তকাল। চোখের ছিমুতে কত কী যে দেখলাম। পুরুষের গাঢ় দীর্ঘশ্বাস নারীর বুক কাঁপিয়ে দেয় সহসা। শুধু বুক কাঁপে না, শরীরের জমিও কাঁপে। জোয়ার আসা খালের মতো নাফিজা ভিজিয়ে দিতে চায় গিয়াসকে। কাঁপা কাঁপা স্বরে সে আউড়ায়, গাছি জিরেনকাট রসের কারবারি। গাছে নলি না গুঁজে দিলে টাটকা রস যে ঠিলিতে পড়ে গাছের শরীল ভিজিয়ে দেবে।

সতর্ক গিয়াসের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়, বিড়ি ছোপ ধরা দাঁত দিয়ে সে ঠোঁট বুক থাই.... এমনকি সারা শরীর কামড়াতে থাকে জলাতঙ্ক রুগীর মতো। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকা নদীর মতো বাক্যহীন পড়ে থাকে নাফিজা। দাঁড় বেয়ে জল কেটে শরীরের নদীতে নৌকো ভাসায় গিয়াস। নাফিজা পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে খুঁড়ে দেয় ঘরের মাটি। হাত-পা এলিয়ে সে যখন কামারশালায় ক্লান্ত হাঁপর তখন গিয়াস তার ঘর্মাক্ত মুখমণ্ডল হাতের চেটোয় মুছে নিয়ে শুধায়, এট্টা সত্যি কথা বলবে, আমার কী নেই যা মকবুলের আচে?

আকাশ থেকে পড়ে নাফিজা। দম ধরে থাকে। কাপড় সরে যাওয়া পিঠের ঘামে বিশ্বাসের মাটি উঠে আসে। বিষণ্ন ঝিঁ-ঝিঁ পোকার মতো সে বলল, সন্দেহ রোগটা একবার যদি মনে ঢোকে তাহলে হাজার কবিরাজেরও সাধ্যি নেই—সেই শেকড়কে তুলে হিঁচড়ে বের করে আনে। মনে যা এসেচে, তা ঠিক লয়। ওসব মুছে ফেল।

—মন তো সিলেট নয় যে জল-তেলায় মুছে দেব। লাল চোখ মেলে তাকাল গিয়াস, গাঁ-ঘরের লোক যা বলে সব কি মিছা? আমার কাচা খোকাটার গায়ে হাত দিয়ে কিরা কাটো তো? অপ্রস্তুত নাফিজা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মায়াবী পথে উদাসীন ঘোরে। কাঁচা খোকার মাথায় হাত দিয়ে 'কিরা' কাটা কি ঠিক হবে। ছেলেটা জন্মাবার পর থেকে ভুগছে। একদিন ভালো থাকে তো দশ দিন ভোগে। হাতটা কাঁচা খোকার দিকে নিয়ে যেতে গেলে তীব্র গতিতে নাফিজার হাতটাকে সরিয়ে দেয় গিয়াস, দোজকের কীট, তা না হলে কেউ ঝুটমুট পেটে ধরা ছেলের মাথায় হাত দেয়। বুঝেচি, আমি সব বুঝেচি। তুমার সারা শরীলে যে মকবুলের ঘ্রাণ সেটা আমি আগেই টের পেয়েছি। আজ একেবারে নিশ্চিত হলাম।

নাফিজা ফুঁপিয়ে ওঠে।

গিয়াস একটা বিড়ি ধরিয়ে লুঙ্গিতে গিঁট মেরে বেরিয়ে আসে বাইরে, নিজেকে না শুধরালে মরবে গো। আমার কি! আমি তো তিনবার তালাক বলে দিয়ে পিছুপানে আর তাকাব না। নাফিজার কথা বলার ক্ষমতা নেই, সে শুকনো গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বেড়া থেকে সাইকেলটা টেনে নিয়ে গিয়াস ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে ধুলোর পথে নেমে আসে। ধুলোর ঝড় তার বুকের তুফানকে সামাল দিতে পারে না।

পেট-পাতলা নাফিজা ছেলে কাঁখে নিয়ে হাটের দিকে চলে যায় মকবুলকে খবর দিতে। ঘরের মানুষটা সব জেনে গিয়েছে, তাকে আর শরীরের নাড়ু দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। পাগলা ষাঁড় কখন যে কি করে বোঝা যায় না তো! চোট খাওয়া পুরুষ তো দাওলি দিয়ে কোপ মারা ষাঁড়ের মতো। মকবুলকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভীতু ডাহুকির মতো কেঁপে ওঠে নাফিজা, আমার বেপদ ঘটে গেছে গো! হাঁড়ি ফুটা করে সে ভাতে ধুলো মাখিয়ে চলে গেল গো। এখন আমার কি হবে?

—কি আর হবে? মকবুল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তুমি যা চাও তাই হবে। যদি বলো—পাগলা ষাঁড়কে খোয়াড়ে ঢোকাতে হবে—সেই ব্যবস্থাও আমি করে দেব। আমার সবরকম ওষুধ—মলম জানা আচে।

—যা ভালো বোঝ কর। নাফিজা আঁচলে চোখের জল মুছে নিল, আমি দু'কুল চাই। আমি চাই—দুজন আমাকে বাঁধ দিক। সুখ দিক। ওর ভিটে ছেড়ে আমি কুতায় যাবো গো। সারা গাঁয়ে যে টি-টি পড়ে যাবে।

—সে তুমাকে ভাবতে হবে না। আমি রোগ বুঝে ওষুধ দেব। মকবুল চুরুক দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসি ছুঁড়ে দিল নাফিজার দিকে, ঘর যাও। খাওয়া-দাওয়া কর। রাতে কবাটটা খুলে রেখো। আমি আসব। হিসাব যা হবার তখনই হবে। নাফিজার গালে টুসকি মেরে মকবুল সিগারেট ধরিয়ে চলে গেল।

রঘুনাথকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে এল শুভ আর সবুজ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে পাশাপাশি হাঁটছিল ওরা। শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া এখন আর কিছু শোনা যায় না চরাচরে। হাসপাতালটাও ডুবে আছে অন্ধকারে, ওর আবছা চেহারাটা দূর থেকে শুধু অনুমান করা যায়। গ্রামের হাসপাতাল, রাত ন'টার পরে যেন আর বসতে পারে না, অপেক্ষায় ঝাঁপ বন্ধ করে ঢুলতে থাকে।

সবুজ বলল, মড়িঘরের রাস্তাটা ধরে গেলে ভালো হবে। বরাত ভালো থাকলে দু-চারটে গোলাপায়রা ধরা যাবে। এবছর তো আর ফিস্ট হল না!

—এখনও সময় পেরিয়ে যায় নি। শুভ অন্ধকারে সবুজের মুখের দিকে তাকাল, গোলা-পায়রা ধরতে পারলে ভালো হবে। কাল তাহলে তুই-আমি ফিস্ট করে খাবো।

মড়িঘরে জ্ঞানত কোনোদিন মড়া থেকেছে একথা মনে করতে পারল না শুভ। তবু ঐ ঘরটার দিকে তাকালে বুকটা কেমন ভয়ে মোচড় দিয়ে ওঠে। হাসপাতালের একেবারে শেষপ্রান্তে ঘরটার যে কী প্রয়োজন এখনও তা ভালোভাবে জানে না শুভ। তবে মড়িঘরের পেছনে ময়লা-আবর্জনা, নোংরা গজ-ব্যাণ্ডেজ তুলো ফেলে অবনী। ওগুলো যাতে হাওয়ায় উড়ে গিয়ে মাঠ নষ্ট না করে তার জন্য মাঝে মধ্যেই দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দেয় সে। সেই বিষাক্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ধারে-কাছে কাউকেই যেতে দেয় না সে। পাশেই কোদাল দিয়ে গর্ত করেছে অবনী। পোড়া ছাই সেই গর্তে ফেলে দিয়ে দায়িত্ব সারে সে। মড়িঘড়ের চারপাশটা ঘন জঙ্গলে ভরা। এখনও মাঝে মধ্যে গভীর রাতে শেয়ালের ডাক শোনা যায়, আর তখনি ভয়ে পাশ ফিরে শোয় শুভ। মনে মনে সে ভাবে মড়িঘরটা না থাকলে ভীষণ ভালো হত। ভয় বলে কোনো জিনিস থাকত না

তার মনে। তবে একটা অসুবিধা হত। গোলাপায়রা কোথায় পেত তখন? পায়রাদের সাহস কি মানুষের চেয়ে বেশি? তা না হলে ওরা মড়িঘরে থাকতে ভয় পায় না কেন? ওরা দল বেঁধে থাকে—সেজন্যই বুঝি ভয়ডর ওদের শরীরে কম। তাছাড়া ওরা শুধুমুধু ভয় পাবে কেন, ওদের ডানায় তো আকাশ ছোঁয়ায় ক্ষমতা আছে। ভূত-পেত্নী যাই আসুক ওরা ডানা ঝাপটিয়ে নিজেদের বাঁচিয়ে নিতে পারবে। মানুষের সেই ক্ষমতা কোথায়? শুভ ভাবল। সবুজ বলল, পায়রার মাংস কী ভীষণ লাল। একেবারে জবাফুলের মতো। সেবার অতসীপিসি মাংস রেঁধে দিয়েছিল। ভারী চমৎকার সেই রান্না। এখনও মনে পড়লে জিভে জল চলে আসে। ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল সবুজ, আজ যদি দুটো পায়রা ধরতে পারি তাহলে কাল সারা দিনটা আনন্দ করা যাবে। অতসীপিসির কি ডিউটি থাকবে কে জানে। মর্নিং ডিউটি থাকলে রান্না করে দেবার সময় পাবে না।

—তারও উপায় আছে। শুভ হাসল, তখন রাতে পায়রার মাংস খাবো। তবে একটা কথা কি জানিস? পিসি পায়রার মাংস খায় না—সেইজন্য তাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে না।

—এছাড়া আর উপায় কি বল? সবুজ কনুই দিয়ে ঠেলা মারল শুভকে, ফিসফিসিয়ে বলল, একটা ছোট টর্চ লাইট থাকলে ভালো হত। পায়রাগুলো লাইট ফেলে দেখে নেওয়া যেত। তখন আর অন্ধকারে পাগলের মতো হাতড়ে বেড়াতে হত না। সবুজ বলল, টর্চ যখন নেই তখন আর চিন্তা করে কী হবে? চল তো আগে চেষ্টা করি। ধরতে পারলে ভালো, না ধরতে পারলেও কোনো ক্ষতি নেই।

মড়িঘরের ঘুপচিগুলোয় বাসা বেঁধেছে পায়রা। ওরা সকাল-সন্ধেয় ওখানে বকম বকম সুর তোলে। তবে ওখানে যে সাপ থাকে এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। মড়িঘরের ফণা তোলা সাপের কথা সে বাবার কাছ থেকে শুনেছে। সেই গল্পকথা সবুজও জানে। ভয় যে করছে না তা নয়! তবু ভয়কে জয় করে এগোতে হয়। নাহলে শুধু হার-ই হার। কেন হারবে সে, কেন?

অন্ধকারে ডুবে আছে চারপাশ। দূর থেকে ভেসে আসছে বাঁশবনের শনশন শব্দ। এই অন্ধকার বুঝি সব কিছু গিলে খাবে। ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে কাঠচোখে তাকিয়ে থাকল শুভ। রঘুর কাছে তার অনেক কিছু শেখার আছে।

মড়িঘর ছাড়িয়ে এলে ঘাসে ভরা মাঠ।

সবুজের মতিগতি বুঝতে পারল না শুভ। শুধু বিস্ময়ে মুখ ফাঁক করে বলল, পায়রা ধরবি না? তাহলে এত দূর যে এলি—

—মন চাইছে না। চল ফিরি।

—তোর আবার কী হল? সবুজ শুধোল, ভয় করছে বুঝি? দূর, ভয় আবার কিসের! আমি ভূত-প্রেত মানি না।

—আমিও। কেমন আত্মপ্রত্যয়ী চোখে তাকাল শুভ। এক কঠিন প্রতিজ্ঞা তার চোখের তারায়। রঘুনাথকে মনে হল এই ঘাসে ভরা সহিষ্ণু মাঠ। অন্ধকার, আলো, ঝড়, বৃষ্টি, খরা-বন্যা.... সব তার কাছে এক। এই ঘাসমাঠ বুঝি হারতে শেখেনি। আহা, সবাই মাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়, আবার মাথা তুলে দাঁড়ায় ঘাসের সংসার।

কুচকুচে অন্ধকারে শুভ দেখল অদ্ভুত এক দৃশ্য। অন্ধকার ছাপিয়ে পাশাপাশি ফুটে থাকা ঘাসফুলগুলো হাসছে। ঘাসফুলের আলোয় আবার নতুন করে জেগে উঠছে পৃথিবী। চিকচিকিয়ে উঠছে শুভর চোখের তারা। ওই ফুলগুলোর মতো আলো ছড়িয়ে দিতে চায় সে, অন্ধকারে, টুটি টিপে সে প্রকাশ্যে বের করে আনতে চায় আলোর ভোর। ঘাসফুলের হাসি।

মানুষের স্বভাব হল নদীর মতো বদলে যাওয়া।

অবনী সরস্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবল কথাগুলো। খুব দ্রুত নিজেকে বদলে ফেলেছে সরস্বতী। সে এখন বাবুদের বউগুলোর সঙ্গে নিজের তুলনা টেনে আনে। গাঁয়ের হংসী স্বভাব, লাজুক ভাবখানা তার মধ্যে এখন আর নেই। এখানে আসার পর অনেকটাই বদলে গেছে সে। সেই পাল্টে যাওয়াটা আজ বেশি করে চোখে পড়ছে অবনীর।

শুধু কি সরস্বতী বদলে গেছে, সে বদলায় নি? প্রশ্নটা মনের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে অনবরত। বামুনবুড়ির ছেলে বিমল ডাক্তার না থাকলে তার আজ এখানে আসা হত না। মানুষ বান-বন্যার জলের মতো। কোথাও এক ছটাক জল রেখে যায় কারোর জন্য। সেই জলটুকুই ভালোবাসা, শ্রদ্ধা কিংবা মমতা। কেউ তাকে যদি আশ্রয় বলে তাতে ভুল কি। যদিও ভুলে ভরা এই জীবন। তবু জীবন ঘুরঘুর করে ভুলের চারধারে। এক কাপ চায়ের আব্দার করা কি ভুল হয়েছে অবনীর? হাজারবার প্রশ্ন করেও বুঝতে পারে না সে। তবু দাঁত মুখ বিকৃত করে ঝাঁঝিয়ে ওঠে সরস্বতী, দুপুরবেলায় চা করে দিতে পারব না। চা খেতে মন চায় তো হাসপাতালের গেটে চলে যাও। এখনও দোকান খোলা আছে।

আশাহত অবনী নিরুত্তর চোখে তাকাল। এক কাপ চায়ের ভাগ্য করে সে আসেনি। সরস্বতীর কঠোর শাসন মাঝে মাঝে তার অসহ্য লাগে, তবু বোবা হয়ে থাকতে হয় নাহলে অশান্তির আগুন দাউদাউ জ্বলে উঠবে সংসারে। বোকার মতো দু'দণ্ড সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে থেকে গা-হাত-পা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল অবনী। শীতের বেলা ছাগল বাঁধার দড়ির চেয়েও ছোট হয়।

এ সময় হাওয়ায় থাকে ক্ষুর। সারা শরীর বাতাস চাটতে থাকে তার খসখসে জিভ দিয়ে। তেল না মাখলে গায়ের খড়ি ফোটা চিহ্নগুলো আর মুছতে চায় না। ঘর থেকে বেরিয়ে অবনী ভাবল শীতকালটা কেন আসে। ওটা না এলেই বুঝি ভালো হত। রোদ ঢালছে পৃথিবী তবু শীত হাওয়া এর মধ্যে চালের কাঁকরের মতো লুকিয়ে থাকে। চা দেয়নি বলে সরস্বতীর উপর রাগে গজগজ করে সে। বউটা নিজেকে যে কী ভাবে কে জানে। একটু দেখতে ভালো-এর জন্য দেমাকে বুঝি পা পড়ে না। হাসপাতালের অনেকেই চোখ নাচিয়ে বলে, অবনীর বউ ভাগ্য ভালো। তবে বউটা বড়ো মুখরা। 'ভালো কি মন্দ' হাড়ে হাড়ে তা এখন টের পাচ্ছে অবনী। এর চাইতে বিয়ে না হলেই বুঝি ভালো হত। ভাগ্য চিরকাল তার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। কখনও হাত ধরে বলেনি, মন খারাপ করো না, আমি তোমার সঙ্গে আছি।

কেউ সঙ্গে থাকে না, সঙ্গ ছেড়ে যায় পুরনো পলেস্তারা খসে যাওয়ার মতো। যে যেদিকে যায় যাক। আর কারোর কাছে হারবে না সে। প্রথমপক্ষ কুমকুম গত হল, সেই দুঃখ কি এখনও বুকে বেঁধে না তার! ক'দিনেরই বা জীবন তবু অনেক কিছু দিয়ে গেছে সে। তার ঋণ এ জীবনে শোধ করা যাবে না। দাউদপুরের কথা মনে পড়লেই কুমকুমের হাসি মুখটা মনে পড়বেই। মনের আর কী দোষ। মন তো হাওয়ার বেগে দৌড়োয়। সরস্বতী কি এসব অভিসন্ধির কথা টের পায়? কুমকুমের কথা সে বিয়ের পরে শুনেছে। সব জেনেশুনে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে সে। এখন পোকা চেবানোর মতো মুখ করলে কেউ তাকে সমবেদনা জানাতে আসবে না। বরং লোকে

বলবে, সরস্বতী, তুমি ভাগ্যবতী। চাকরি করা বর পেয়েছ—এ যুগে কটা মেয়ের ভাগ্যে এমন সুখ জোটে বলো। ওর দিদিও সেই একই কথা বলে, দাঁত থাকতে দাঁতের যত্ন নে, না হলে পরে কাঁদবি। সংসারে সঙ সাজ ক্ষতি নেই, কিন্তু সাজতে গিয়ে নিজের আসল রূপটাই ভুলে যাবি তা যেন না হয়। অবনীর মতো ছেলে হয় না, একথা আমি দশজনের মাঝে জোর গলায় বলতে পারি। তুই ঠকে যাসনি, তোর জিতই হয়েছে।

হার-জিত বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল সুখ।

অবনীর খাঁকি প্যান্টের ফুঁপি বেরনো সুতোগুলো উড়ছে শীতের হাওয়ায়। এক কাপ চা না পাওয়ার দুঃখ ভীষণভাবে বুকে বিঁধছে। কী এমন রাজকাজে ব্যস্ত ছিল যারজন্য এক কাপ চা করে দেওয়া যেত না। আসলে সরস্বতী ভালোবাসে না তাকে। অবজ্ঞা, অবহেলা যতদিন যাচ্ছে গাঢ় হচ্ছে তার মনে। ঘা-মন নিয়ে অবনী একা একা আর কত পথ হাঁটবে। এ জীবনের প্রতি ঘেন্না ধরে গেছে তার। মাঝে মধ্যে মনে হয় সংসার ছেড়ে দিয়ে কোথাও চলে যেতে। তখন সরস্বতী বুঝবে কত ধানে কত চাল হয়।

হাসপাতালের মাঠে দল বেঁধে চরছিল গোরু। প্রতি বছর শীতের সময় মাঠের ঘাস বিক্রি করে দেন ডাক্তারবাবু। গোরু চরানোর জন্য এত বড়ো সবুজ মাঠ আর এ গাঁয়ে কোথাও নেই। এবারের ঘাসমাঠ কিনে নিয়েছে পাল-কোম্পানীর মালিক, ওদের হড়েগড়ে খানত্রিশেক গোরু।

খুব দ্রুত অবনী হাসপাতালের মাঠ পেরিয়ে এল। রাগ কেটে কুচিকুচি করতে চাইছে মনের মাংস। চোখের সাদা জমি লাল হয়ে উঠছে উত্তেজনায়। ফলে ঘামের বিন্দুগুলো মাছের ডিমের চেয়ে বড়ো হয়ে মিহিদানার মতো ফুটে উঠছে শরীরে। তার কেন এমন হয়? কেন সে মানিয়ে নিতে পারছে না সরস্বতীকে? এক হাতে কি তালি বাজে? কখনও নয়। দোষী তাহলে সে একা নয়? ঝগড়ার কলকাঠি নাড়ছে বউটা। বিয়ের পর থেকে একদিনও সে ভালোভাবে কথা বলেনি। তার প্রতিটি শব্দে থাকে কাঠ-পিঁপড়ের জ্বলন। বিষমাখা দৃষ্টিতে থাকে বর্শার খোঁচা। এত সব অগ্রাহ্য করে জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়া বড়ো কষ্টের। এই কষ্টের কথা কি কোনোদিনও বুঝবে না সরস্বতী? তাহলে কি চায় সে? ভাবতে ভাবতে হাঁপিয়ে ওঠে অবনী।

এ যেন এক কঠিন অঙ্ক। কিছুতেই উত্তর মিলতে চায় না। ঝুরঝুর করে ঝরে যাচ্ছে বিশ্বাসের মাটি। রগরগে বালি আঁকড়ে জীবনযাপনের চাষ-আবাদ হবে কী ভাবে। এক সময় অবনীর মনে হয় এই চেনা মাঠ মাটি গাছপালা কোনোকিছুই তার নিজের নয়। এমন কি শুভ সরস্বতী কেউ নয়।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে যেন পালিয়ে আসতে চাইল তার চেনা পৃথিবী ছেড়ে। চা-দোকানের কানু তার ঘাবড়ে যাওয়া চোখ-মুখ দেখে বলল, অবনীদা বসো। কোথা থেকে এলে গো? মনে হচ্ছে খুব চিন্তায় আছো—।

অবনী কিছু না বলে নিরুত্তাপ চোখে তাকাল। হাঁপিয়ে ওঠা শরীরটাকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল সে, এ পৃথিবীটা বড়ো কঠিন জায়গা ভাই। গায়ের রক্ত দিলেও কারোর তুমি মন পাবে না।

—তা যা বলেচ। কানু মন বোঝার চেষ্টা করল অবনীর, চা বানাই।

—হ্যাঁ, কড়া করে বানাও।

—টাটকা পাউরুটি আছে। সেঁকে দেব?

খিদেটা অনেকক্ষণ ধরে জানান দিচ্ছিল পেটে, অবনী ঘাড় নাড়তেই গোটা পাউরুটি আধফালা করে সেঁকতে বসে গেল কানু। সামান্য জিরিয়ে নিয়ে একটা বিড়ি ধরাল অবনী। ফসফস করে

ধোঁয়া ছেড়ে সে ভাবল, আজ আর ঘরে ফিরে যাবে না। যে ঘরে কোনো টান নেই সে ঘর তো শুধু চুন-সুরকির ঘর। ছাদ একটা। মন হাজারটা। এরকম তো চলতে পারে না। যা হবার আজ ফায়সাল্লা হয়ে যাক।

বিড়িটা যেন খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল।

হতাশ গলায় অবনী বলল, চা-টা তাড়াতাড়ি দাও। বাজারের দিকে যাব ভাবছি। অনেক কাজ পড়ে আছে।

কানু কাচের গ্লাসে তাড়াতাড়ি চামচ দিয়ে চিনি গুলে কড়া লিকার দিয়ে ধরিয়ে দিল অবনীর হাতে, নাও অবনীদা, দেখ সব ঠিকঠাক আছে কিনা!

গ্লাসে চুমুক দিয়ে অবনী বলল, পাউরুটি দাও। চায়ে ডুবিয়ে খাই। আজ যে কখন ভাত জুটবে কে জানে!

কোনোদিনও সময়মতো ভাত জোটে না অবনীর। প্রতিদিন কোনো না কোনো অশান্তি তার নাওয়া-খাওয়া ভেস্তে দেয়। বিষণ্ন মনে সে তখন পাগলের মতো এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। কোনোকিছু ভালো লাগে না। ভালো কথাও তেতো মনে হয়।

চা-পাউরুটির দাম মিটিয়ে অবনী আর সময় ব্যয় করল না। আজ সরস্বতীকে উচিত শিক্ষা দেবে। রোজকার ঝামেলা আজ সে মিটিয়ে নেবে। যদি না পারে সিধা চলে যাবে রঘুনাথদের দোরে। ওখানে দিনদুয়েক কাটিয়ে সে অন্য কোথাও চলে যাবে।

পাকা রাস্তায় উঠে এসে অবনী একবার বাজারের দিকে তাকাল। ভরা দুপুর খাঁ-খাঁ করে গরম শ্বাস ছাড়ছে। এসময় শুভ কোথায় আছে ভাববার চেষ্টা করল সে। পরপর তিন দিন তার স্কুল ছুটি। ছেলেটা এখন তিন দিনের রাজা। এই মায়ের জন্য একসময় সে কান্নাকাটি করত। মায়ের কথা ভেবে-ভেবে বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছিল ছেলেটা। ওর মামা গঁড়ার একদম মত ছিল না শুভ নদীয়ায় যাক। সেই মতো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল তাকে। কিন্তু শুভই বাধ সাধল এ সবে। তেলবুড়া কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, যার ছেলে তার কাছে দিয়ে আয়। এক গাছের ছাল আরেক গাছে লাগে না।

কথাটা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি পার্বতী। শুভ আর কেতোর মধ্যে সে কোনো ফারাক দেখে না। তবু একরকম বাধ্য হয়ে সেজ-কর্তাকে চিঠি লিখতে হয়েছিল তাকে। চিঠি পেয়েই দেশ গিয়েছিল অবনী। সরস্বতীই তাকে জোর করে পাঠাল।

—আমি জানতাম ও ছেলে থাকবার নয়। দেখতে হবে তো কার ছেলে?

খোঁচাটা অবনীকে উদ্দেশ্য করে। এ কথায় ঝগড়া বাঁধতে পারত, আগুন জ্বলতে পারত তবু অবনী সব কিছুকে নিভিয়ে দিয়েছে তার সহজাত সহ্য ক্ষমতায়। নিজের ছেলেকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করা ভালো। দূরে থাকলে হাজার চিন্তার ডালপালা ক্ষত-বিক্ষত করে সহজ-সরল মন।

অবনীর সঙ্গে কেতোও এল ক'দিন। আসার পর থেকে ছেলেটা শুধু ভুগছে। জল-হাওয়ার পরিবর্তন মানিয়ে নিতে পারছে না। মানিয়ে নিতে সময় লাগে। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, ছেলেটাকে খুব সাবধানে রেখো অবনী। জ্বর হলে ওর আর ছাড়তেই চায় না।

সরস্বতীও নিজের কানে শুনেছে সব। অবনীর উপর বিরক্ত হয়ে বলেছে, ছেলে যা বলবে তাই এনে দেবে! গোছা গোছা বরফ খেলে জ্বর না হয়ে যাবে কোথায়? এখানকার জল-বাতাস নতুন। চোখে চোখে না রাখলে বিপদ ঘটে যেতে কতক্ষণ।

শুভ একটু চঞ্চল প্রকৃতির। দামাল ছেলেকে সামলে রাখা সহজ নয়। এ বয়সে সব ছেলেরাই

দুরন্ত হয়। এটাই স্বাভাবিক। তবু সরস্বতী তার দোষ ধরবেই। কাঠগোড়ায় দাঁড় করাতে পারলে তার যে তৃপ্তি হয় তা বুঝি অন্য আর কোনো কিছুতে খুঁজে পায় না সে।

রাগে চিনচিন করে অবনীর শরীর। কিছুতেই নিজেকে সে বোঝাতে পারে না— তার দোষটা কোথায়। দোষ যাই হোক, সরস্বতী তাকে উস্‌কে দেবার জন্য মুখিয়ে আছে। এটা তার কেমন বিচার কিছুতেই বুঝতে পারে না অবনী। রাগে উত্তেজনায় শরীর কাঁপছে অবনীর, কানের গহ্বরে অনায়াসে ঢুকে যাচ্ছে শিস-হাওয়া। খেজুরগাছের কাঁটা যেন বিঁধছে মনের ভেতর। কই এত যন্ত্রণা তো আগে ছিল না। আগে অভাব ছিল কিন্তু সামান্য হলেও শান্তি ছিল। এখন চষা জমির মতো এবড়ো-খেবড়ো মন দু'জনার। যেন শত্রুশিবির, শত্রুপক্ষ। কাল নাইট ডিউটিটা ভালো যায়নি। বিষ-খাওয়া রোগী এসেছিল। বউয়ের উপর রাগ করে ব্যাটাছেলেটা পাটে দেওয়ার বিষ খেয়েছে। সাত তাড়াতাড়ি পাইপ ঢুকিয়ে বমি করাতে না পারলে লোকটা বাঁচত না। ঘরের সব লোক এসেছে হাসপাতালে কিন্তু যার আসার কথা সে আসেনি। বউটা গুম ধরে পড়ে আছে ঘরে। সে কি ভাবছিল তা যেন স্পষ্ট অনুমান করতে পারে অবনী। বউটা কি তার স্বামীর মৃত্যু প্রার্থনা করেছে? সে কি মনে মনে কামনা করেছে লোকটা যেন আর ঘরে না ফিরে আসুক। সে শাঁখা ভেঙে, সিঁদুর তুলে বিধবা হয়ে বাঁচবে। একা বাঁচায় কি সুখ অনেক?

এসব ভাবনার সঠিক কোনো উত্তর অবনীর জানা নেই। সারা রাত ধরে যমে-মানুষের টানাটানিতে লোকটা শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল। ধাতস্থ হতেই তাকে শুধিয়েছিল অবনী, মরতে যদি মন চায় তাহলে কড়া বিষতেল খেলে না কেন? এমন বিষ খেয়েছো যাতে নিজের কষ্ট আরও দ্বিগুণ হল। তোমার মতো বোকা মানুষ আমি আর দুটি দেখিনি। ডলি দিদিমণি কত বোঝাচ্ছিলেন লোকটাকে, সব কথা হয়ত বুঝতে পারেনি সে, তবু যে কটা শব্দ তার কানে গিয়েছিল তাতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল লোকটা, দিদিমণি গো, আমার বউ চায় না আমি বাঁচি।

—বেঁচে গেলে, এবার কি হবে? দিদিমণির চোখের বিস্ময় জোড়া ঠোঁটে, মরে যাওয়া সহজ, কিন্তু সংঘর্ষ করে বেঁচে থাকা কঠিন।

—আমি যে বউয়ের বিষকথা সহ্য করতে পারিনে। ও আমার মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। কাঁকড়াবিছার বিষে আমি পুড়ি গো। তখন আর বাঁচতে মন চায় না, মনে হয় মরে যাই।

বিষ খাওয়া রোগী এলে রাতভর দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না অবনী। অন-ডিউটি দিদিমণিরও তাই অবস্থা। ওই অত রাতে কল-বুক পাঠিয়ে ডাক্তারবাবুকে কোয়ার্টার থেকে ডেকে আনতে হয় অবনীকে। সেরকম সিরিয়াস হলে খবর পাঠাতে হয় থানায়। পুলিশ আসে। চলে তদন্তের কাজ। মাঝরাত হয়ে ওঠে কোর্টচত্বর।

কাল রাতে এত সব হ্যাঁপায় যাননি ডাক্তারবাবু।

রুগীর চোখ দেখে বলেছিলেন, এখন থানায় মেমো দেওয়ার দরকার নেই। দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয়। আমার মন বলছে ট্রিটমেন্টে সাড়া দেবে। এখনও চোখের দৃষ্টি ঘোলা হয়নি। নানান কাজের ফাঁক-ফোঁকরে একটুও দম নেবার ফুরসত পায়নি অবনী। যে রাতটা খারাপ যায় তার পরের দিনটাও ভালো যায় না। সকালে ঘরে কিছু কাজ থাকে। সেগুলো তাকে করতেই হয়। তার কাজ অন্য কারোর দ্বারা হবার নয়। সংসারের জন্য এত করেও তার কোনো নাম নেই। শুধু ওই একজন মহিলা, যাকে সে সিঁদুর পরিয়ে ঘরে তুলেছিল বউ হিসাবে, তার কাছে হেরে যেতে বাস্তবিক কষ্ট হয়। এ যে কী কষ্ট তা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না।

অনেকক্ষণ পরে চড়া রোদে অবনীর বুকের ভেতরটা ডুকরে উঠল। কপাল ভিজিয়ে ঘাম নামছিল দ্রুত। আর তাতেই অস্বস্তি বাড়ছিল অবনীর। মাথা হেঁট করে সে কদমগাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। হলুদ পাতা ছড়িয়ে আছে কদমতলায়, হাওয়ায় ফরফর করে উড়ছে সেই পাতা

যেন কোনো হলুদ মাছ ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে ছড়ছড় করছে। টালি কারখানার পোড়ের কাঠ ছড়িয়ে আছে ইতস্তত। একটা বড়ো গাছের কাটা গুড়ির উপর গিয়ে বসল অবনী। এখান থেকে হাসপাতালের মাঠ, কোয়ার্টার, মড়ার-ঘর সব দেখা যায়। এখানে বসে থাকা নিরাপদ নয় ভাবল সে। কেন না সরস্বতীর কানে সংবাদটা কেউ পৌঁছে দিলে মায়ের হাত ধরে শুভ এখানে আসবেই আসবে। সরস্বতী রাগের ঘোরে কারোর কথা শুনবে না। গলা ফাড়িয়ে গালমন্দ করবে, প্রয়োজন হলে সে ডাক্তারবাবুর বাসায় গিয়ে নালিশ জানিয়ে আসবে অবনীর নামে।

ঘাম শুকিয়ে আর সময় ব্যয় করল না অবনী। তবে সে বাজারের দিকে গেল না এত বেলায়। পাল-পুকুরের পাড় ধরে সে চলে গেল সোজা দাসপাড়ায়। এমন হতছিন্ন জনবসতি যা দেখে প্রতিবারই মন খারাপ হয়ে যায় অবনীর। দাসপাড়ায় এসে তার নিজের গ্রাম নানকাহাতিদার কথা মনে পড়ে। রাজ্যের অভাব বুঝি তাদের ছোট্ট গ্রামটাতে। বর্ষার সময় পুরুষমানুষরা মুনিষ খাটতে যায়। অন্যসময় হাতে কাজ থাকে না, অভাব খুবলে খায় বেকার মন। সময় আর পেরতে চায় না, কঠিন পাথরের মতো চেপে বসে বুকের উপর। চেনা মানুষগুলোর মুখ মনে পড়ে অবনীর। বিশেষ করে ব্যাঙা আর সঁপড়ির কথা সে ভুলতে পারে না। ওদের জন্য কিছু করতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু তার মতো সামান্য মানুষের কী বা করার আছে অন্যের জন্য। তবু সে ডাক্তারবাবুকে বলেছে হাসপাতালে ব্যাঙার একটা চাকরি করিয়ে দেবার জন্য। ডাক্তারবাবু মুচকি হেসেছেন। অবনীর সরলতা মুগ্ধ করেছে তাকে।

পাল পুকুরের পাড় ছাড়িয়ে এলে শুরু হয় ঘন বাঁশবন। এত ঠাসাঠাসি বাঁশগাছ যে রোদ ঢোকে কম। আগে প্রায় বিকালে ডাহুক মারতে আসত শুভ, তার হাতে থাকত চামগুলতি আর পকেটভর্তি পোড়ান ভেঁটুল। ওর হাতে এম্ আছে। প্রায়ই এটা সেটা মেরে আনে।

দুপুরের আলোয় একটা মোহনী মনোমুগ্ধকর লুকোচুরি খেলা চলে প্রকৃতিতে। সেই আমেজটুকু ধরার চেষ্টায় ছিল অবনী। কিন্তু ঠিকঠাক বুঝতে না পেরে সে হতাশ চোখে বাঁশঝাড়ের দিকে তাকাল। এত আলোছায়ার খেলা এ তল্লাটে আর কোথাও নেই। দুপুরবেলায় বাঁশঝাড় যেন বিছানা পেতে রাখে ঘুমানোর জন্য। অনেকদিন পরে অবনীর বামুনবুড়ির কথা মনে পড়ল। তার স্নেহ যেন বাঁশতলার ছায়া। অথচ সরস্বতী বামুনবুড়িকে সহ্য করতে পারে না, দাঁত বের করে বলে, ভারি তো একটা চাকরি করে দিয়েছে তার জন্য অত! তোমার ভাগ্যে ছিল তাই হয়েছে। ও নিয়ে অত ভেবে মাথা ফাটিয়ে কি লাভ? যার কাজ সে করে এতে আবার বাহাদুরি কী!

কথা বাড়ায় না অবনী। কথা তো আগুনের হল্কা। পুড়ে যাবে, ছারখার হয়ে যাবে। তাই বোবার শত্রু নেই। মুখে তার কুলুপ আঁটা। হাঁটতে হাঁটতে ঢেলায় হোঁচট খায় অবনী। আর একটু জোরে লাগলে বুড়ো আঙুলের ডগা ফেটে রক্ত ঝরত। এখন নীলচে হয়ে আছে জায়গাটা। বেশ টন টন করছে ব্যথায়। রক্ত জমে গেলে অমন হয়। ঠাণ্ডা জল দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু ঠাণ্ডা জল পাবে কোথায়? পুকুরের জল তেতে আছে রোদে। পুকুরের কাছে গিয়ে কোনো লাভ নেই, তার চেয়ে পদ্মর কাছে যাওয়া ঢের ভালো। পদ্ম নামটায় বুঝি সুবাস ছড়িয়ে যায়, পাখনা নাড়িয়ে উড়ে আসে মৌমাছি। অবনীর চোখে বাড়তি একটা রঙ ধরে। নিজেকে সে নতুনভাবে আবিষ্কার করে। তার যে এত দুঃখ আছে ভুলে যায় নিমেষে। পুরনো সব জ্বালা-যন্ত্রণা ধুয়ে মুছে সে নতুন অবনী হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। সময় তো সব কিছু বদলে দেয়। মাত্র ক'বছরে কত কি পাল্টে গেল। আগে সে ধুতি ছাড়া পরত না। এখন খাকী প্যান্ট পরা একজন মানুষ। যার মাথায় কোঁকড়া চুল, হাসি ভরা মুখ। অদ্ভুত এক ছেলেমানুষী সারল্য। এই সারল্যটুকুই তার সম্পদ, মাধুর্য।

কঞ্চির বেড়া ঘেরা বাগানটা পেরিয়ে এলেই পদ্মর খড়ের ঘরখানা চোখে পড়ে। চালের উপর

একটা কাক ডাকছে কা-কা। বড়ো বিশ্রী সেই আওয়াজ। একেবারে বিষিয়ে দিচ্ছে দুপুরের সরপড়া শান্ত পরিবেশ। আর থাকতে পারে না অবনী। রাগে গা রি-রি করে। পায়ের কাছ থেকে একটা মাটির ঢেলা তুলে নিয়ে তাক করে মারে কাক-এর উদ্দেশ্যে। এলোমেলো ঢিল খড়ের চাল ছাড়িয়ে লুটিয়ে পড়ে বহুদূরে। ঢিল গুঁড়ো হয়ে ধুলো উড়ছে। ওগুলো যেন ধুলো নয়, অবনীর হতাশা। আজ অব্দি কোনো কাজে সে সফল হল না। সব কাজে পিছু টান, হেরে যাওয়া।

পদ্ম খুঁটিবাঁশ ধরে খিলখিল করে হাসছে তাকে দেখে। হাসি নয় তো যেন জুঁইফুল ফুটেছে জ্যোৎস্নারাতে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সুগন্ধ। চোখ ভরে এ দৃশ্য দেখতে থাকে অবনী। দেখতে দেখতে সে ভাবে পদ্ম নয়-খুঁটি বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে আছে সরস্বতী। ঠোঁট নাড়িয়ে আদর করে বলছে, আসো, অনেকদিন পরে এলে! রোদ মাথায় এলে যে—বসো, বসো। কাঁসার গ্লাসে জল এগিয়ে দেয় পদ্ম। মেঝেয় হা করে তাকিয়ে বসে আছে তার পাঁচ বছরের ছেলে রকেট। সারা গায়ে ছোপ ছোপ ময়লা। গায়ে কোন জামা নেই। এমন কি উদোম পেছন।

এদিকে কোনো খেয়াল নেই পদ্মর। সে পেটের ভাতের যোগাড় নিয়ে ব্যস্ত। না খাটলে চলবে কি করে? কেউ তো তার চাঁদমুখ দেখে পয়সা দেবে না। স্বামী খেদিয়ে দিয়েছে ঘর থেকে, নিজের দাদা-বৌদিরাও দেখে না, এ অবস্থায় তার চলবে কি করে? একার পেট তো নয় যে চালিয়ে নেবে। দু-দুটো পেট ভরানো কি মুখের কথা! পদ্ম ঘামছিল। ওর ড্যামা-ড্যামা চোখে বিস্ময়। হা-করে দেখছে অবনীকে। মনে মনে কি ভাবছে তা নিজেই জানে। দেশী মদ বেচতে গিয়ে তার আবার নেশা হল না তো! ঘোর কাটাতে ছেলের হাত ধরে বলল, যা কলপাড় থেকে চান করে আয়। আমি তোকে ভিজে ভাত আর পেঁয়াজ কেটে দেব।

ছেলেটা কি বুঝল খুশি হয়ে চলে গেল টিউবকলটার দিকে। কেউ না কেউ পাম্প করে দেবে জল। আহা, ছোটছেলে বলে কথা। পদ্মর সেসবে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সামান্য গলা চড়িয়ে সে বলল, দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না চাকুরিয়া?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসব। বসার জন্য তো এসেচি। অবনী ঘোর কাটিয়ে বাঁশবাতার বেঞ্চিটায় গিয়ে বসল, পা নাচাতে নাচাতে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল সে, এদিকটায় অনেকদিন আসিনি। আজ যখন এসেছি, ভালো করে দাও, খাই—

—খাবে? কাকে?

যেন হুঁশ ফিরল অবনীর, ভুল শুধরে বলল, প্রথমে এক গ্লাস। পরে পারলে আরো খাবো। আজ খাওয়ার মন নিয়ে এসেছি।

—সে তো ভালো কথা। পদ্ম চোখ নাচিয়ে নদী হয়ে গেল, ভেসে যাবে, সাঁতার জানো তো? বৌদি যদি টের পায়, তাহলে তোমাকে আর ঘরে ঢুকতে দেবে না।

—আমি আর ওসব নিয়ে ভাবি না। অবনী অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, ঘর কাকে বলে জানো? ঘর না তো কবর। সারাদিন খালি ঘ্যানর ঘ্যানর, আমি আর পারি না। এর চেয়ে কাঁটার বনে বাস করা ঢের ভালো।

—বৌদি জানতে পারলে রাগ করবে। পদ্মর ভাঁটা পড়া গলা। তেতে উঠছে অবনী, কেউ রাগ করলে আমার করার কি আছে? যেমন কর্ম তেমন ফল। দাও দেরি করিয়ে দিও না।

পদ্ম গ্লাসে দেশী মদ ঢালে, নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে থাকে অবনী। পৃথিবীতে এমন সুখের দৃশ্য বুঝি কম দেখা যায়। এমন সুন্দর মেয়েমানুষটাকে কী ভাবে খেদিয়ে দিল তার বর? সে কি মানুষ না পশু? তার কি চোখ নেই, মন নেই? শরীরে কোনো তাপ নেই? পদ্মর কালোজাম চোখের তারায় ফাঁদে লটকান ঘুঘু পাখির মতো ছটফট করতে থাকে অবনী। সে আর তাকাতে পারছে না, বুজে আসছে চোখ। পদ্মর ঠোঁটে লেপটে থাকা মিহি হাসি ধার চাকুর মতো কাটছে

তার মন। আজ কি হল? কেন এই দুর্বলতা, বাঁধ ছাপানো আবেগ। এ সবের জন্য দায়ী সরস্বতী। একটা দিনের জন্য তাকে ভালোবাসা দিল না। শুধু ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারল শক্ত কথার ইট-পাথর।

কাচের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আনমনা হয়ে গেল অবনী। পদ্মকে প্রথম কোথায় দেখেছিল মনে করার চেষ্টা করল সে। হাসপাতালই তার বৃন্দাবন। ভিড়ের মাঝে পদ্মকে দেখে তার চোখ ফসকে যায় নি। আউটডোরে শ্লিপ হাতে বোকার মতো দাঁড়িয়ে ছিল পদ্ম। অবনী আগ বাড়িয়ে বলল, ওষুধ নেবে? পদ্মর হাত থেকে ডাক্তারবাবুর লেখা শ্লিপটা কেড়ে নিয়ে সে এগিয়ে গিয়েছিল ওষুধ আনার জন্য।

একথা সে কথায় ভাব আলাপ। ঘনিষ্ঠতা।

—কোথায় থাকো?

—দাসপাড়ায়।

—তোমার ঘরের মানুষ? অবনীর প্রশ্নে হা-করে তাকিয়েছিল পদ্ম।

—সে নেই। মরেচে। কথাগুলো শেষ না হতেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল পদ্ম।

—ছিঃ, তার সিঁদুর পরে অমন কথা বলতে নেই। অবনীর গলা বুজে এসেছিল, তোমার অনেক দুঃখ আছে। দুঃখকে সামলে রাখতে হয় নাহলে দুঃখরা ডিম ফুটে আরো দুঃখের জন্ম দেয়। আমার কথাটা মনে রেখো।

—আমি নিজেই দুঃখের পুকুর। পানসে হাসিতে পদ্মর ঠোঁট নড়ে উঠল।

—আমিও। অবনী মন খারাপ করা চোখে তাকাল।

—কেন, তুমি তো চাকুরিয়া, মাস গেলে মাহিনা পাও, তোমার আবার দুঃখ কিসের? পদ্মর প্রশ্নে চালাকি ছিল না, ছিল সমবেদনা।

সেই প্রথম আলাপ। তারপর এখানে সেখানে দেখা হত পদ্মর সাথে। রোদের মতো ওর চেহারার আকর্ষণ। সময়ের সাথে সাথে বদলায়। এই চড়া, এই কড়া, আবার কখনও মিয়ানো।

একদিন পদ্ম কোয়ার্টারে এল ঝুড়ি মাথায়। ঝুড়িতে পাকা কলা। কাতর হয়ে বলল, সারাদিন ঘুরে ঘুরে হাঁপিয়ে গেলাম তবু কাজের কাজ কিছু হল না। কলাগুলো রাখো গো, কম করে দেব।

—এত কলা নিয়ে কী করব? পচে যাবে যে—!

—পচার আগে খেয়ে নিও।

তার আদিখ্যেতা ভালো চোখে দেখেনি সরস্বতী। কলাগুলো কিনে নিয়ে বিদেয় করেছিল তাকে। পদ্মর ছায়া সরে যেতেই সরস্বতী মুখ ঝামটে বলেছিল, মেয়ে দেখলে লুলিয়ে ওঠো দেখছি। খবরদার ওই বউটার সাথে যদি কথা বলেছ—তোমার চোখ আমি গেলে দেব। মনে থাকে যেন কথাটা।

—কথা বললে কি মানুষ খারাপ হয়ে যায়?

—সে আমি জানি নে। তবে তুমি ওর সাথে কথা বলবে না। সরস্বতীর গলা শক্ত হয়ে এল, বউটার স্বভাব ভালো নয় দেখে মনে হচ্ছে। ভাতার খেদানো মেয়েমানুষ আর কত ভালো হবে। দেখছিলে না চোখ দুটোতে খালি খাই খাই ভাব।

হাসপাতাল চত্বরে পদ্ম এলেই সতর্ক হয়ে যেত সরস্বতী। তার চিল-নজর পরিমাপ করতে চাইত কাল্পনিক এক সম্পর্কের গভীরতা। ভুল ভেঙে যেত তার। অবনী ওসবের সাতযোজন দূরে। কারোর চোখের দিকে তাকিয়ে তার কথা বলার সাহস নেই। এমন ভীতু মানুষ সম্পর্কের সেতু গড়বে। আপনমনে হেসে উঠেছে সরস্বতী। বোকা, বোকার হদ্দ!

এক গ্লাস পেটে পড়তেই অবনী আচমকাই চেপে ধরল পদ্মর নরম হাত, গলা বুজে এল

কথা বলতে গিয়ে, তোমার কাছে এসেছি অনেক দুঃখ নিয়ে। গত-জন্মে তুমি আমার কেউ ছিলে গো! বোঝাতে পারব না, তোমার জন্য আমার কেন কষ্ট হয়। সেই প্রথম যেদিন দেখলাম, সেদিন থেকে। হাতটা ছাড়িয়ে নিতে পারে না পদ্ম। অবনীর দু-চোখ বেয়ে টসটসিয়ে জল ঝরছে। এই অশ্রুদানার নাম বুঝি ভালোবাসা। পদ্মর বুকটা চিতল মাছের পাখনার মতো থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। ঘামছে সে। শরীর বুঝি দিঘি হয়ে যাবে ঘামে-ঘামে। এই স্পর্শ, উষ্ণতা সেও তো জীবনে পায়নি। এই প্রথম সে বুঝতে পারে-তারও কারোর জন্য বেঁচে থাকার দরকার আছে। পরপর তিন গ্লাস মদ টেনে ধুলো পথে শুয়ে পড়েছে অবনী। এমন বেহেড মাতাল এর আগে সে হয় নি। আজ যেন সব ছাপিয়ে গিয়েছে। আজ যেন ভেঙে গেছে জগৎখালির বাঁধ। হু-হু করে ঢুকছে ঘোলা জল। বিড়বিড় করে সে বলছে, কেউ ভালোবাসেনি আমাকে। শুধু ঘেন্না করেছে। ভেবেছে-আমি একটা কুকুর। আমার মন নেই, দুঃখ নেই। কিসসু নেই। কিসসু নেই যখন, তখন এ দুনিয়ায় আমার কোনো দরকার নেই।

—তুমি চুপ করো, চাকুরিয়া। পদ্ম তার মাথার কাছে গিয়ে বসল।

—আমার ঘুম পাচ্ছে। তোমার মদে কি ঘুমের বড়ি মেশানো ছিল, নাকি তুমিই নিজে ঘুমের বড়ি?

পদ্ম ধমক দিতে পারে না, শুধু বলে, চুপ করো।

ভারী পুরুষ-শরীরটাকে সে কোনোমতে শুইয়ে দেয় চাটাই পেতে রাখা তক্তপোষে। ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে থরথরিয়ে, একটা অজানা ভয় বুকের ভেতর শুরু করে হামা দিতে। চাকুরিয়া তার কাছে কেন আসে, কি চায় সে? পদ্মর কি ক্ষমতা আছে তাকে সব দেওয়ার। অথচ ধরা দিতে মন চায়। এক পা এগোতে গেলে শ' পা পিছিয়ে আসে কেন? এ কেমন অসুখ। বুকের ভেতর খলখল করে কান্না। কথা আটকে যায় গলায়। কোনোমতে উবু হয়ে সে তার মুখটা নামিয়ে নিয়ে যায় অবনীর বুকের কাছে। হাতটা বুকের কাছে রাখতেই চমকে ওঠে অবনী। এ কার ছোঁয়া, এত শিহরণময়? সরস্বতীর ঘৃণা আজ পদ্মর ছোঁয়ায় ভালোবাসা হয়ে সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। আঃ; কী শান্তি! অবনীর মনে হয় সে মরে যাবে আনন্দে। নেশা করলে এত আনন্দ হয়-কই আগে তো সে টের পায়নি। গরম নিঃশ্বাস আছড়ে পড়ছে বাতাসে। অবনী হাতবাড়িয়ে পদ্মকে ফুলের ডাল নামানোর মতো নামিয়ে আনে বুকের উপর। পদ্ম কুঁকড়ে গিয়ে সরে যায়, যেন তার মনে কুঠ ফুটেছে, এই মন দিয়ে কাউকে ছুঁতে নেই। ছুঁলেই বাঁধ ভেঙে যাবে। পাপের না প্রেমের না পরাজয়ের?

শীতের বেলা তাড়াতাড়ি ফুরোয়।

খিদেয় আনচান করছিল সরস্বতীর শরীর। নদীয়ায় এসে তার মনোকষ্ট আরও বেড়েছে। তবে হারবে না সে, হারতে শেখেনি। মানুষটা ভেবেছে'টা কি? বোবা হয়ে ঘুরবে সারাদিন। শুধু ডিউটিটুকু ছাড়া সে আর কি করে? দিদিমনির বাসায় বসে চা খায় কুঁড়ের মতো। এর-ওর ফাইফরমাস খাটে। বিরক্তিতে শরীর জ্বলে সরস্বতীর। গাঁয়ে থাকতে বামুনবুড়ির পেছন ছাড়ত

না সে। বাইরে এসে সে-স্বভাব আর গেল না। না যাক। এতে সরস্বতীর কোনো কিছু আসে যায় না। সে ভেবে রেখেছে এবার দেশ-গাঁয়ে গিয়ে আর ফিরে আসবে না। কেন আসবে? দুবেলা, দুমুঠো খাওয়ার জন্য কি জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখা। এর বাইরে বুঝি জীবনটার কোনো আলাদা মানে নেই? সরস্বতী ঘেমে উঠছিল, টনটন করছিল তার কপালের শিরা।

সেই কখন বাবার খোঁজে ঘর ছেড়েছিল শুভ। ঘন্টা দেড়েক পার করে ফিরে এল শূন্য মনে। বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে বলল, বাবাকে কোথাও দেখতে পেলাম না মা। মনে হচ্ছে বাবা শেরপুরের দিকে চলে গেছে। হলদিপোঁতা ধাওড়া যেতে তার ভালো লাগে। আমি কি একবার রঘুদের ঘর থেকে ঘুরে আসব?

—ওখানে কি ওর বাপ-ঠাকুরদা থাকে? চকিতে ঝাঁঝিয়ে উঠল স্বরস্বতী, চোখের কোণ মুছে স্বাভাবিক হয়ে বলল, আমাকে জ্বালিয়ে মারল লোকটা। এভাবে বেশিদিন বাঁচা যায় না। তোর বাবা মনে হয় আমার মরা-মুখ না দেখে শ্বাস নেবে না। শুভ হত- চকিত। তার কিছু বলার নেই। সে কথা শুনে থরথর করে কাঁপছে। একটা ভয় খামচে ধরছে তার মন। এ সময় অবনী কোথায় থাকতে পারে এটা তার অজানা। পুরো কালীগঞ্জ বাজার খুঁজেছে সে, কোথাও তার দেখা নেই। বারোয়ারীতলায় মাঝে মাঝে শুয়ে থাকে মনের দুঃখে, আজ বারোয়ারীতলাও ফাঁকা। শুধু দুটো পথের কুকুর শুয়ে আছে বিক্ষিপ্ত ভাবে।

সরস্বতী হার মানার মেয়ে নয়, সে দম না নিয়ে বলল, তুই ঘরে থাক, আমি আসছি। যাব আর আসব। ভয় পাবি না।

—কোথায় যাবে মা?

—মরতে। সরস্বতীর চোখ ছলছলিয়ে উঠল, আমি মরলে তোর বাবার শান্তি হয়। দেখবি, আমি একদিন ঠিক মরব। মরে ওকে শিক্ষা দিয়ে যাব। ভেবেছে টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে। আমাকে জব্দ করবে। তা আমি হতে দেব না।

গজগজ করতে চলে গেল সরস্বতী।

হাসপাতালের মাঠ পেরলেই পাকা রাস্তা। দুটোর বাস সেই কখন চলে গেছে দেবগ্রামের দিকে। এখন মরা সাপের মতো শুয়ে আছে শীর্ণ কালো পথ। দু-পাশের ধুলো ছড়ছড় করছে হাওয়ায়। চা-দোকানটাও অবেলায় বন্ধ। না হলে চা-দোকানীকে শুধাতে পারত সে।

ফাঁকা রাস্তায় দুটো গোরু হেলতে দুলতে চলে গেল। শীতের বেলায় আর ঘাসে মুখ দিতে মন করছে না ওদের। আলিস্যি ভর করে আছে হাওয়ায়।

সরস্বতীর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে হাঁটছে তো হাঁটছে।

মনে ভয় ঢুকেছে তার। কেউ যদি হারিয়ে দেয় তাকে। যদি ছিনিয়ে নেয় অবনীকে?

এত অবহেলা নিয়ে যে মানুষটা বেঁচে আছে তার অন্য দিকে ঢলে পড়তে বেশি সময় লাগবে না। ঠিকঠাক আশ্রয় পেলে মাথা গুঁজে দেবে-এ আর নতুন কি। সরস্বতীর চোখের তারা কেঁপে উঠল। দূর থেকে সে দেখতে পেল সনাতন মুদি-দোকানীকে ব্রহ্মানীতলার পাশ দিয়ে আসতে। চাপড়া গাঁয়ে ঢোকার ওই একটাই রাস্তা। সনাতন মুদি দোকানীকে দু-চার বার সে দেখেছে। মানুষটা ভালো। কালীগঞ্জের কেউ যখন সাহস করে ধারে ভুষিমালপত্তর দিল না, তখন ঐ মানুষটাই বলেছিল, মাসকাবারী আমার দোকান থেকে নিও, তবে বেতন পেয়ে মাসে-মাসে সব মিটিয়ে দিও। আমার পুঁজি অল্প। ধার-দেনা রাখলে ডুবে যাবো।

অবনীর হাত ধরে শুভ যেত চাপড়ায় মাসকাবারি বাজার করতে। হিসাবের খাতায় যোগ ঠিক আছে কিনা দেখতো সে। অবনী তখন গর্বিত চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত

অপলক। ছেলে শিক্ষিত হলে আর কেউ ঠকিয়ে নিতে পারবে না। দিন বদলের ইংগিতটা তখনই ধরা দিত তার চোখে।

সনাতন মুদি সরস্বতীকে দেখতে পেয়ে সাইকেলের ব্রেক মেরে দাঁড়াল। টানা সাইকেল চালিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। কিছুক্ষণ দম নিয়ে বলল, অবেলায় কোথায় যাচ্ছ গো শুভ'র মা? তা খবরাখবর সব ভালো তো?

সরস্বতী অপ্রস্তুত। কিছুটা লজ্জিত। কপালের কুঁচো চুলগুলো সরিয়ে সহজ ভাবে তাকাল, শুভর বাবা ঘরে আসেনি। তাই খুঁজতে বেরিয়েছি।

সনাতন মুদি দম ধরে থাকল কিছু সময়। অবনীকে সে দেখেছে পদ্মর দাওয়ায় তক্তপোষে শুয়ে থাকতে। ভর পেট নেশা করেছে সে, দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু এই অপ্রিয় সত্যটি কি সরস্বতীর কাছে বলা যাবে? বলার পরে কী প্রতিক্রিয়া হবে বউটার বোঝার চেষ্টা করল সে। দোনো-মোনো দৃষ্টি মেলে সে চেয়ে আছে সরস্বতীর দিকে। একই দৃষ্টিতে স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে সরস্বতী। তার ডাগর চোখে সব সময় যেন কাজল পরানো। সব চাইতে ওর চুলের বাহার দেখার মতো। একেবারে কালো কুচকুচে কোঁকড়ান চুল। সিঁথিতে গুঁড়ো সিঁদুর পরলে দেবীর মতো দেখায়। এক নজরে সবাই তাকে বলে সুন্দরী। যেমন গায়ের রঙ তেমন চোখ-মুখের গড়ন। ভগবান ওর চেহারায় আভিজাত্যের বার্নিশ লাগিয়ে পাঠিয়েছে।

সনাতন মুদি চোখ কুঁকড়ে তাকাল। মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, অবনীকে দাস পাড়ায় দেখে এলাম। বেশ নেশা করেছে মনে হল। তবে এর আগে ওকে আমি নেশা করতে দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম।

আঁচলটা তর্জনীতে জড়াতে জড়াতে পাথরের মূর্তি হয়ে গেল সরস্বতী, গলার কাছে ঢেলার মতো জমতে থাকল কান্না। এসব দুঃখ ক্ষোভের কথা কাকে বলবে সে। কে শুনবে তার জ্বালা-যন্ত্রণার ইতিহাস। উপর দিকে থুতু ছুঁড়লে নিজের গায়ে পড়ে। তবু শরীর জুড়ে জোয়ার আসা কাঁপুনীকে প্রতিহত করতে চাইল সে। পরপুরুষের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়লে কী ভাববে লোকে? অবনী যে বিপথগামী হচ্ছিল তার আঁচ পেয়েছিল সে। পদ্মর স্বভাব ভালো নয়। সে তো টোপ দিয়ে মাছ ধরবে। তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দাঁতে দাঁত টিপে সরস্বতী আগুন চোখে তাকাল। আজ একটা হেস্তনেস্ত হযে যাক। সবাই দেখুক ভালো মানুষটার পরিণতি! আজ খুলে যাক মুখোশ...মানুষটাকে চিনুক সবাই।

হেঁটে নয়, একরকম দৌড়ে দাসপাড়ায় এল সরস্বতী। হাঁপাচ্ছিল সে। ভিতরটা কাঁপছিল রাগে। পদ্মকে দেখতে পেলে নখ বসিয়ে দেবে তার বুকে। পাপড়ি ছিঁড়ে উড়িয়ে দেবে বাতাসে। ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার করে দেবে তাকে। এতদূর স্পর্ধা স্বামী খেদানো বউটার? কলপাড়েই পদ্মর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সরস্বতীর।

চোখে চোখ পড়তেই পদ্ম বলল, দিদি, তুমি!

—হ্যাঁ, আমি। সে কোথায়?

—কে? কার কথা বলছ?

—ন্যাকামী করো না। বলো, শুভর বাবা কোথায়?

—কে কোথায় যায় আসে আমাকে কি বলে যায়? পদ্মর মোটা ঠোঁটে চলকে উঠল পাতলা হাসি, ঘরের মানুষটাকে মদের ঠেক অব্দি পৌঁছে দিয়েছ, কাজটা ভালো করনি, দিদি। এর ফল তোমাকে ভুগতে হবে। আমাকে ভুল বুঝো না, তোমাকে জানিয়ে দিলাম।

পদ্ম যেন শিক্ষা দিতে চাইল সরস্বতীকে।

কিছুটা বিপর্যস্ত সরস্বতী নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, পুরুষমানুষকে তো আর আঁচলের চাবি গোছার মতো বেঁধে রাখা যায় না। ওরা খাঁচার পাখি নয়, বনের পাখি। যেখানে দানা পাবে সেখানে স্থিতু হবে।

—তা হলে তোমার এত চিন্তা কিসের? পদ্ম ঝুঁকে পড়ল সরস্বতীর মুখের উপর। তার তাতা নিঃশ্বাস কাঁপিয়ে দিল সরস্বতীর চটকে যাওয়া কলিজাটাকে। কাঁদবে না ভেঙে পড়বে কিছুই বুঝতে পারল না সে। শুধু নিজের প্রতি চরম ক্ষোভে গাছের মতো নীরব হয়ে গেল সে। বেশ ঘাবড়ে গিয়ে সরস্বতী বলল, ও এলে ওকে আর মদ দেবে না।

—কেন দেব না? খদ্দের আমার কাছে লক্ষ্মী। পদ্ম কঠিন চোখে তাকাল। তার সেই চাহনিতে মাথা নীচু হয়ে এল সরস্বতীর। তার গোছানো শরীরের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল এমন বিধ্বস্ত দেখাল তাকে।

পদ্ম বুক নাচিয়ে বেপরওয়াভাবে বলল, মদ না বেচলে আমার দিন চলবে না। যে আসবে সেই আমার খদ্দের। বুঝলে? পদ্ম জল নিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিছুটা গিয়ে পিছন ফিরে বলল, একটা কথা বলি দিদি যদি কিছু মনে না করো। তোমার ঘরের মানুষটা হল কাঁচা সোনা, তাকে যেমন খুশি গড়া যায়। সোনাকে কাদার তাল ভেবে দূরে ঠেলে দিলে একদিন ধুলো পথে বসে তোমাকে কাঁদতে হবে। সেদিন আমি কেন, কেউ তোমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে আসবে না। আজ ইচ্ছে করলে আমি ওকে হারিয়ে দিতাম, কিংবা নিজেই হেরে বসে থাকতাম। শুধু তোমার মুখ চেয়ে আমি ও-পথে পা বাড়াই নি। এর পর যদি তোমার পাখি বুকের খাঁচায় না আটকে রাখতে পারো তাহলে কোনো অঘটন ঘটে গেলে আমাকে দোষ দিও না। তোমার রূপের দেমাগ আছে শুনেছি। রূপ দিয়ে অন্যকে পোড়াও। নিজেই যদি নিজের রূপের আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাও তাহলে কেউ তোমাকে বাঁচাতে আসবে নি। এখনও সময় আছে চোখ জোড়া থেকে ঘেন্নাব পাঁকমাটিগুলো সরিয়ে ফেল। নিজের মানুষকে নিজের করে কাছে টেনে নাও।

পদ্মর মুখের উপর কোনো কথা বলার ছিল না, শুধু বুকের ভেতরটা তছনছ হয়ে গেল সরস্বতীর। নিজেকে বদলে ফেলার সময় এসেছে তার, না হলে সে হেরে যাবে। পায়ের তলার মাটি সরে গেলে সে দাঁড়াবে কোথায়? মাটি হারানো মানুষের যে কোথাও জায়গা হয় না। মাতাল অবনীর হাত ধরতে আর ঘেন্না হল না তার।

অনেকদিন পরে গভীর রাতে তক্তপোষ থেকে নেমে এল সে। শুভ বেঘোরে ঘুমাচ্ছে, কোনো সাড়া নেই।

সরস্বতী নিশ্চুপ পায়ে অবনীর মাথার কাছে গিয়ে বসল। শরীর টানটান হয়ে আছে উত্তেজনায়। বাইরে হিম পড়ছে টুপটাপ। হিম নয় যেন ফুল ঝরে পড়ছে। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার মিহি সুরে আজ এক অন্য উন্মাদনা। সরস্বতীর চোখের তারা কাঁপছিল নতুন বউয়ের মতন। বহু সংকোচে অবনীর খসখসে কপালে হাত রাখল। হয়ত জেগে ছিল অবনী। হঠাৎ সে চোখ মেলে তাকাল।

সরস্বতী অভিমান ভরা গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, তুমি আমাকে এত বড়ো শাস্তি দিতে পারলে? তোমার হাত ধরে এতদূর এসেছি। এবার যমের দুয়ার অব্দি ঠিক পৌঁছে যাবো। আমাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বলল অবনী। কাঁপা হাতে সরস্বতীকে টেনে আনতে চাইল নিজের নিঃশ্বাসের আওতায়।

স্বর্ণলতার মতো বহুদিন পরে সরস্বতী নিজেকে ভেঙে ছড়িয়ে দিল বিছানায়।

একটা ভোরের জন্য মুখিয়ে ছিল শুভ। শীতকালটা তার কোনো সময়ে প্রিয় সময় নয়। এ সময় খসখস করে গায়ের চামড়া, খড়ি ফোটে শরীরের। সকালে ঘুম ভাঙলেও কাঁথার বাইরে বেরতে মন করে না। একটু রোদ উঠুক তারপর বিছানা ছেড়ে উঠবে সে। এই আলিস্যি তার চিরদিনের। সরস্বতী বলল, আর শুয়ে থাকিস নে। এবার চোখ-মুখ ধুয়ে পড়তে বস। যারা শুয়ে থাকে, তাদের ভাগ্যও শুয়ে থাকে।

মায়ের কথাগুলো এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে শুভ। সাত- সকালে পড়ার কথা শুনতে কার ভালো লাগে? এখন বাঁধের ধারের মাঠগুলোয় ছোলার গাছ ভর্তি। এ সময় ফল আসে গাছগুলোয়। শিশিরে ভিজে কেমন আদুরে দেখায় ওদের। ফলগুলোকে ছুঁতেও মায়া হয়। তবু না ছুঁয়ে তো উপায় নেই। 'হোড়া-পোড়া' করে খেতে হবে যে!

'হোড়া পোড়া'য় ছোলা সমেত গাছ তুলে এনে আগুনে ঝলসে নিতে হয়। এতে ফলগুলো সেদ্ধ হয়ে যায়, খেতে মিষ্টি লাগে-এটা এমন মিষ্টি যা কোনো দোকানে পাওয়া যাবে না। শুভ শুয়ে শুয়ে ভাবল।

আমগাছতলায় আগুন ধরিয়েছে কারা। শুকনো পাতা পুড়ছে পড়পড়িয়ে। আমের পাতাগুলোয় বুঝি তেল থাকে। সবুজ তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টিতে। শুভ গিয়ে একটা শুকনো পাতা ছুঁড়ে দিল সেই আগুনের উপর। খেজুরের ডাল ভেঙে উসকে দিল আগুন। যা শীত, উত্তাপের প্রয়োজন।

কাল বাঁধের ধার থেকে ছোলার গাছ তুলে এনেছিল সবুজ। রোজই আনে সে। ছোলার গাছ তুলে আনা মুখের কথা নয়। জমির মালিক দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। গালমন্দ করে ভূত ভাগিয়ে দেবে। এসবে সবুজের কোনো ভয় নেই। যা করতে হবে তা তো যেমন করেই হোক করতে হবে। ছোলার গাছগুলো সে না বলে নিয়ে এসেছে। বললে একদিন দেবে, রোজ রোজ তো আর দেবে না?

ধুঁয়োর মধ্যে ছোট-ছোট ফুলিঙ্গ উড়ছে আগুনের। সাত সকালে শীত হাওয়ার বুঝি দাপাদাপি খেলা চলছে। উত্তাপ পেতে আগুনের কাছাকাছি সরে বসল শুভ। ঘুমের ভাবটা এখন ছেড়ে গেছে শরীর থেকে। বেশিক্ষণ এখানে আর বসে থাকা যাবে না। সরস্বতী কোয়ার্টার থেকেই ডাক ছাড়বে পড়ার জন্য। সবাই শুনতে পাবে তার চিৎকার। শুভর বাজে লাগে এসব। এখন বড়ো হচ্ছে সে। এখন কি চামচে দুধ খাওয়ার সময়। তবু মা বুঝতে চায় না। চোখে চোখে রাখতে চায়।

হাত দুটো গনগনে আগুনের দিকে ঠেলে দিয়ে আবার গালের কাছে চেপে ধরল শুভ। বেশ আরাম লাগছিল এতে। হাতের তালুর উত্তাপ ছড়িয়ে যাচ্ছিল পুরো শরীরে। ছোলার সবুজ গাছটাকে চেনা যায় না এখন। আগুন ঝলসে দিয়েছে তার শরীর। সবুজতা হারিয়ে গিয়ে তার এখন পোড়া কালচে রঙ।

সবুজ শুভর চোখের দিকে তাকাল। আর বেশিক্ষণ ওরা আগুন পোহাবে না। ছোলার গাছগুলো ঝুলিয়ে নিয়ে ওরা চলে যাবে হাসপাতালের মাঠটায়। ওদিকটায় বেশ নির্জন। শুধু পাখির ডাক ছাড়া আর কিছু শব্দ কানে আসে না। ওখানে আরাম করে বসে ছোলার ফল ছাড়িয়ে খাবে। আধসেদ্ধ ফলগুলো খেতে তো মন্দ লাগে না। আমতলায় বড্ড বেশি ভিড়। এখানে দিতে দিতেই সব শেষ, নিজেদের জন্য কিছু থাকে না।

সবুজ খেজুরগাছের পাশ দিয়ে চলে এল মাঠটাতে। সবুজ ঘাসের উপর তখনও হীরে দানার মতো চকচক করছে শিশির কণা। সকালের রোদের সঙ্গে ওদের এত সখ্যতা—কে জানত।

পড়ে থাকা বাবলা গাছের গুড়িটায় গিয়ে বসল শুভ। তার পাশে গিয়ে বসল সবুজ। তারপর

স্বভাবসুলভ গলায় বলল, আমি আর ছোলার গাছ তুলতে যেতে পারব না। খেতের মালিকটা আমাকে চিনে গিয়েছে। কাল তো তাড়া করেছিল। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। শুভ চুপ করে থাকল। ছোলার গাছ না পেলে 'হোড়া পোড়া' আর হবে না। না হোক। তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে কারোর ক্ষতি করে নিজেদের আনন্দ কেনা, এটা না-পছন্দ শুভর। সে এমনিতে চুপচাপ। সহজ সরল। ঝুঁকি নিতে ভয় পায়। আত্মসম্মান বোধ তার তীব্র।

সবুজ থমথমে পরিবেশকে সহজ করার জন্য বলল, খাচ্ছিস না কেন? কী হল তোর? শুভ ঢোঁক গিলে বলল, কাল শুধু আগুন পোহাব। কাল আর 'হোড়া পোড়া' করে লাভ নেই।

তার মিনমিনে কথা শুনে হা-হা করে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল সবুজ, অত ভয় পেলে চলবে? হোড়া-পোড়া হবে না, এটা ভাবলি কি করে? আমি থাকলে সব হবে। ছোলার ফল ছাড়িয়ে খাচ্ছিল সবুজ, একটু ভেবে নিয়ে বলল, কাল অন্য খেত থেকে ছোলার গাছ তুলব। রোজ রোজ একই খেতে তুলতে গেলে ঝামেলা অনেক। সবার নজরে পড়ে যায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবারই ক্ষতি করা ভালো, এতে কারোর উপর চাপ পড়বে না।

পোড়ানো ছোলা খেয়ে ওরা যখন কোয়ার্টারে ফিরছিল তখন বাঁশ বাগানের খুপচি আঁধারে খেলা করছিল আলোর ঘোড়া। একটা ডাহুক পাঁচিল ঘেঁষে ছুটে পালাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ডাহুকটা আবার উড়ে গেল কক্‌ককিয়ে ডাকতে ডাকতে।

সবুজের হাত নিশপিশিয়ে উঠল, শূন্য চোখে তাকিয়ে সে বলল, হাতে গুলতি নেই, থাকলে মজা দেখিয়ে ছেড়ে দিতাম। জানিস শুভ অনেকদিন ডাহুকের মাংস খাইনি।

প্রায়ই পাখি শিকারে বেরয় ওরা। বাঁধের ধারের ঝোপঝাড়ে পাখির কোনো অভাব নেই। সেখানে কত যে নাম না জানা পাখি আছে দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায় ওদের। পাখি মারতে যাওয়া একটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গেছে ওদের। নিরীহ পাখিগুলো ওদের বুঝি চিনে গেছে। দূর থেকে দেখলেই ওরা উড়ে পালায়। হয়ত গা ঢাকা দেয় ঝোপঝাড়ে।

পাখি যেমন চালাক-চতুর, ওরাও কম যায় না পাখির চাইতে। রোজ রোজ একই ঝোপ-জঙ্গলে ঘোরাফেরা করে না শুভ। শিকারের জন্য মাঝেমধ্যে সব কিছু বদলে ফেলতে হয় ওদের। আজ চাপড়ার বিল তো, পরশু দোয়েমের চর।

হাতের ঝুলকালি ঝেড়ে শুভ বলল, আজ স্কুল নেই। আজ কি শিকারে যাবি, সবুজ? সবুজ ভাবল, শিকারে যেতে এখন আর মন চায় না। সেদিন খরগোসটা মারতে গিয়েও পারলাম না! বাঘাটা বেইমানী করল, নাহলে ওটা জব্দ করতে পারতাম।

শুভ আক্ষেপের সঙ্গে বলল, দূর, বাঘাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সেদিন বাঘার কিছু করার ছিল না। ভাব তো খরগোসের পায়ে কতো ছুট্। কুকুর কি খরগোসের সঙ্গে দৌড়ে জিতেছে কোনোদিন?

ছোট্ট কপালে ভাঁজ পড়ল সবুজের, সে যাই হোক, এবার কিন্তু জবরদস্ত ফিস্ট করতে হবে। শীত পড়েছে। এবার আর ছাড়াছাড়ি নয়। অতসীপিসিকে আগে থেকে বলে রাখতে হবে। না হলে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে।

শুভ বলল, শুনেছি পিসি এবার ডিসেম্বর মাসে দেশ-বাড়িতে যাবে। বাঘা তখন আমাদের বাড়িতে থাকবে। মা তার জন্য ভাত রেঁধে দেবে। পিসি চাল আর নগদ টাকা দিয়ে যাবে মাকে।

মন খারাপ হয়ে গেল সবুজের।

শুভ বলল, ফিস্ট নিয়ে আগাম ভেবে লাভ নেই। এখনও অনেক দেরি আছে। বড়োরা সবাই এক না হলে ফিস্ট হবে কী করে। তার চেয়ে বরং একটা কাজ করি। আমরা ছোটরা মিলে

একটা বনভোজন করি। বেশি দূরে যাব না, হাসপাতালের মাঠেই করব। দরকার হলে মাকে বলব রেঁধে দিতে।

—তার আর দরকার হবে না। সবুজ বড়োদের সান্নিধ্য এড়িয়ে যেতে চাইল, ডাক্তারবাবুর মেয়ে মাধুরী আছে। শুনেছি ও ভালো রাঁধতে পারে। চল, মাধুরীকে গিয়ে সব বলি। ও যা মেয়ে, রাজি হয়ে যাবে।

উঠল বাই তো কটক যাই।

সবার আগে সবুজ, পেছনে শুভ। ওদের গন্তব্য বদলে গিয়েছে।

মাধুরীকে গিয়ে বলতেই রাজি হয়ে গেল সে।

সবুজ বাহবা নেবার জন্য বলল, আমি জানতাম ও রাজি হয়ে যাবে। এবার তাহলে বনভোজনের আয়োজন করা যাক কি বলিস?

শুভ ঘাড় নাড়ল।

বেলা বাড়ছে। এবার ঘরে ফিরে গিয়ে বই খাতা নিয়ে পড়তে বসা দরকার। না হলে মা রাগারাগি করবে, পাড়া মাথায় তুলে চেঁচাবে। সরস্বতীর বাজখাঁই গলা বিখ্যাত। সবাই জেনে গিয়েছে। সবুজের এসব চিন্তা নেই। ওর বাবা ভোরের বাসে চলে গিয়েছে দেবগ্রাম। দুপুরের আগে ফিরবে না। ফলে দুপুর পর্যন্ত সে রাজা। তাকে কেউ শাসন করার নেই। সে টো-টো করে ঘুরবে। খুব বেশি হলে সাইকেল নিয়ে একবার বাজার থেকে ঘুরে আসবে।

সরস্বতী সবুজের এই লাগাম ছাড়া ঘুবে বেড়ানোর স্বভাবটাকে পছন্দ করে না। তার মতে পড়ার সময় পড়ো। খেলার সময় খেলো। পড়া নষ্ট করে খেলে বেড়ান তার পছন্দ নয়। কিচেনের কাছে রোদ্দুর ঝকঝক করে হাসছে। শেয়ালকাঁটা গাছে হলুদ রঙের ফুল ফুটেছে। ভারী চমৎকার দেখতে ফুলগুলো। অথচ ঐ ফুলগুলোর দিকে কেউ তাকায় না। শুভ উঁচু হয়ে বসল দেড় হাত মাপের কাঁটাওলা গাছটার সামনে। সবুজ দূর থেকে চিৎকার করে বলল, খবরদার, হাত দিসনে। যা সরু সরু কাঁটা, ঢুকে গেলে একেবারে রক্তে চলে যাবে। তখন মরবি।

ভয় পেলেও অতি সাবধানে খানচারেক ফুল তুলল শুভ। সে জানে, এই ফুল ঠাকুর পুজোয় দেওয়া যাবে না। কেন যাবে না, তার কারণ সে জানে না। সবুজকে প্রশ্ন করতেই সে-ও না-সূচক ঘাড় নাড়ল।

হাসপাতালের এই 'কিচেনটা' শুভ আর সবুজের কাছে সপ্তম আশ্চর্যের একটা। এখানকার ছাইটিপির উপর থেকে সে একটা বেড়ালছানা ধরে নিয়ে গিয়েছিল ঘরে। সরস্বতী বেড়ালছানাটাকে দেখে সাথে সাথে বিদায় করেছে তাকে। মায়ের চোখে এত ঘেন্না ভালো লাগেনি শুভর। বেড়ালছানা তো কোনো দোষ করেনি তবু তার কেন ঘরে জায়গা হবে না? শুধু সরস্বতী নয় অবনীও এ নিয়ে তার পক্ষে একটাও সাওয়াল-জবাব করে নি।

মনের দুঃখে সেই বেড়ালছানাটাকে আবার কিচেন-এ রেখে এসেছিল শুভ। সবুজ তাকে জ্ঞান দিয়ে বলল, বেড়াল থেকে ডিপথেরিয়া রোগের সৃষ্টি হয়। বেড়ালের লালা আর লোম পেটে গেলে মানুষের ভীষণ ক্ষতি হয়।

সবুজ এ বয়সে অনেক কিছু জানে যা শুভ জানে না। এর জন্য মন খারাপ হয়ে যায় তার। ব্যস্ত হয়ে বলে, আজ কপালে দুঃখ আছে। মাকে তো জানিস কেমন বদরাগী। পড়তে না বসলে শুধু আমাকে নয়, বাবাকেও বকে।

সবুজ মজা পেরে হা-হা করে হেসে উঠল। আর ঠিক তখনই একটা ম্যাটাডোর হর্ন বাজাতে বাজাতে ঢুকে এল হাসপাতালের মাঠে। দূর থেকে ওরা দেখল সেই চার চাকার ছোট-লরিটার মধ্যে ত্রেপল বাঁশ আরও কত কি যে আছে।

শুভ উৎফুল্ল হয়ে বলল, মনে হচ্ছে গ্রামে সার্কাস এসেছে। দারুণ মজা হবে তাই না? সবুজ ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল তাকে, সার্কাস যদি আসবে তো বাস-স্ট্যান্ডের মাঠে প্রথমে যাবে। এখানে কেন আসবে? এটা তো হাসপাতাল।

ঘাড় চুলকে শুভ বলল, কেউ হয়ত অসুস্থ হয়েছে—সেইজন্য। চল, আমরা কাছে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আসি। ভাব জমাতে পারলে পরে আমাদের লাভ হবে।

সবুজ আর শুভ পাশাপাশি ছুটছে। ওদের আর আনন্দ যেন ধরে না।

গাড়িটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল শুভ। ততক্ষণে ড্রাইভার সিট থেকে নেমে পড়েছে বছর পঁচিশের একজন যুবক। সবুজ তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গলা ঝেড়ে নিয়ে শুধোল, এটা কি সার্কাসের গাড়ি?

যুবকটি থতমত খাওয়া চোখে তাকাল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে হা-হা হাসিতে গলা ভরিয়ে বলল, এ গ্রামে মনে হয় বহুদিন সার্কাসের দল আসেনি?

ঘাড় নাড়ল সবুজ।

যুবক ড্রাইভার বলল, আমরা এই হাসপাতালে কাজ করতে এসেছি। আমরা কনট্রাক্টরের লোক। হাসপাতাল, কোয়ার্টার সব চুনকাম করা হবে। সেই সঙ্গে ছোটোমোটো সিমেন্টের কাজও করব আমরা। কথা থামিয়ে ঢোঁক গিলল ছোকরা-ড্রাইভার, আচ্ছা খোকা, ডাক্তারবাবুকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে? ওর পারমিশন ছাড়া তো মালপত্তর আমরা নামতে পারি না।

সবুজ হাত তুলে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারটা দেখিয়ে দিল।

একজন মাঝ-বয়েসী, বছর পঞ্চাশের মানুষ একটা খাম হাতে এগিয়ে গেল ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারের দিকে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে সে ফিরে এল মিনিট দশেকের মধ্যে। তার হাসি মুখ। পান খাওয়া দাঁত দেখিয়ে বলল, বাবলু, মাল নামা। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। তুই যদি কৃষ্ণনগর চলে যেতে চাস তো যেতে পারিস। কাল সকালে এলে হাজিরা ঠিক হয়ে যাবে।

বাবলু কোনো কিছু না বলে নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকল। নতুন জায়গাটা যে তার ভালো লেগেছে—এটা তার বিস্মিত চোখ-মুখই বলে দিল।

বয়স্ক লোকটার নাম এরফান।

বাবলু অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, না বাবা, আমি আর কৃষ্ণনগর যাব না। এখানে আসতে হবে বলে ভোর উঠেছি। শরীর ম্যাজম্যাজ করছে। একটু শুতে পারলে ভালো হত।

ক্লান্তি-অবসাদে চোখ বুজে আসতে চাইছে বাবলুর। তবু তার ছিমছাম চেহারা এক ঝলক সবার নজর কাড়বে। কত বয়স হবে বাবলুর? বড়োজোর উনিশ-কুড়ি। টাইট সাদা প্যান্টের সঙ্গে মাঞ্জা দেওয়া জামা পরেছে সে। গলায় রূপোর চেনে একটা তাবিজ।

এরফান বলল, যা, কল থেকে হাত-পা ধুয়ে আয়। চোখে-মুখে ভালো করে জল দিবি। লাট্টুকে বলছি ইট দিয়ে চুলা বানিয়ে ভাত বসাতে। আজ আর বাজারে যাব না। সঙ্গে যা এনেছি, তা সেদ্ধ দিয়ে দেব।

কালো রঙের রোগা ছিপছিপে লাট্টু দাঁড়িয়েছিল আদেশের অপেক্ষায়। ভাত রাঁধতে হবে শুনে সে আর দাঁড়াল না, হাসপাতালের দিকে চলে গেল থান ইটের জন্য। শুধু এই হাসপাতাল নয়, আরো অনেক হাসপাতালের কাজ সেরে তাদের এখানে আসা। এসে ভালোই করেছে। এখানে মাথা গোঁজার জন্য তাঁবু টাঙ্গাতে হবে না। সব শোনার পর ডাক্তারবাবু নিজেই বললেন, একটা কোয়ার্টার ফাঁকা পড়ে আছে, ওখানে আপাতত থাকতে পারো। কেউ এলে তখন কিন্তু চলে যেতে হবে।

খুশিতে ঘাড় নেড়েছিল এরফান। নাহলে এতক্ষণে তাঁবু টাঙ্গানোর তোড়জোড় শুরু হয়ে যেত। তাঁবু টাঙ্গাতে সময় বেশি লাগে না। তাঁবুতে থেকেও আরাম। তবে সাপখোপ ঝড়-ঝঞ্ঝার ভয় আছে। তাঁবু উড়ে গেলে মাথা বাঁচানো দায় হয়।

নানা অভিজ্ঞতার সাক্ষীবট এরফান।

লাট্টু ইট খুঁজে এনে চুলা বানিয়েছে জব্বর। বাবলু রান্নার বিরোধী। মুখ কাঁচুমাচু করে সে বলল, আজ হোটেলে খেয়ে নিলে হত না? তার কথা শুনে পান খাওয়া দাঁত দেখিয়ে হেসে উঠল এরফান, এখানে পাউরুটি পাওয়া যায় না আর ভাত পাওয়া যাবে! রাত আটটার পরে ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায় বাজারের। বাইরের লোক আসে না বললেই চলে। বাইরের লোক ছাড়া ভাতের হোটেল চলবে কি করে? গাঁয়ের মানুষ তো সখ করে হোটেলে খেতে যাবে না। তারা পয়সা চেনে। টাকাকে ভালোবাসে।

বাবার কথা শুনে বেশ অবাক হল বাবলু। এখানে আসার আগে সব খোঁজখবর নিয়ে এসেছে মানুষটা। নাহলে সঙ্গে করে আলু চাল পেঁয়াজ কেউ বয়ে আনে!

কাঠ ফাড়িয়ে জ্বাল দিচ্ছে লাট্টু। বড়ো হাঁড়িতে ভাত ফুটছে চড়বড়িয়ে। সেই ফুটন্ত ভাতের দিকে তাকিয়ে বড়ো আনমনা হয়ে গেল এরফান। ঘরে নতুন বউ নুরিকে রেখে এসেছে। সারা রাত ধরে নুরি কত অনুনয়, বিনয় করল তার বুড়ো শরীর আঁকড়ে। যতটুকু পেরেছে নুরিকে সুখ দেবার চেষ্টা করেছে এরফান। নুরি কাতর হয়ে বলেছে, কিরে কেটে বলো, তুমি ঐ বুড়ি ধেমড়িটার কাছে যাবে না।

এরফানের মুখে কুলুপ আঁটা।

নুরি সুর করে বলেছে, যা টাকা-পয়সা সব আমাকে দেবে। আমি টাকা জমিয়ে একটা সোন্দর পারা কোঠা দালান বানাব। ওটা হবে তোমার আমার তাজমহল।

এরফানও স্বপ্ন দেখেছে—তাকে কিছু করতে হবে। খয়রা বিবি বছরের মধ্যে ছ'মাস তো রোগে ভোগে। শরীরও টসকে গেছে বহুদিন আগে। এখন কাছে এসে বসলে বয়সের ছায়ায় বুড়ি দেখায়। সেই আগের মতো গালে আর টোল পড়ে না, চোখে আর বিদ্যুৎ খেলে না। এখন সে ভাঁটার নদী। কিছু নেই, শুধু চ্যাটচেটে কাদা। এরফান কেন যাবে তার কাছে। মৌচাকে মধু না থাকলে মৌমাছি কি সেখানে আশ্রয় নেয়?

ফোটা ভাতের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে ধরল এরফান। রাজমিস্ত্রির কাজে শরীর ক্ষয় হয় সাত তাড়াতাড়ি। সা "দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয় তাকে। বাবলুও রাজমিস্ত্রির কাজটা শিখে নিয়েছে। ওর হাতের কার্নিক যাদুকাঠির মতো নড়ে। আর কি নিখুঁত কাজ। এরফান জানে-খয়রা বিবির ছেলের কোনোদিন ভাত কাপড়ের অভাব হবে না। যেখানে যাবে কাজের গুণে বিশ্বজয় করে ফিরবে।

ছেলের জন্য মনে মনে গর্ব অনুভব করে এরফান। তবে সে বাবলুর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। গলা বুজে আসে। এই বয়সে শাদী করে কাজটা ভালো করেনি এরফান। লাট্টু বুঝিয়েছিল অনেক। কাকুতি-মিনতি করে বলেছিল, বড়ভাই, ও ভুল করো না। ঘরে তোমার

সোমত্ত ছেলে। নিজে না বিয়ে করে তার বিয়ে দাও। লোক হাসিয়ে কি লাভ হবে বলো তো!

লাট্টুর কথা কানে তোলেনি এরফান। তার তখন বুড়ো গাঙে ছলাৎ-ছলাৎ ঢেউ। নুরী রোজ হাসপাতালের চাপাকলে জল নিতে আসত। এরফান কলপাড়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলত তার সঙ্গে। অভাবী নুরির টাকার ভীষণ দরকার। মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে নায়ক হয়ে গেল এরফান। একদিন ঝোঁকের মাথায় নিকেও করে ফেলল।

নতুন বউ থাকবে কোথায়? পুরনো ঘরে তাকে মানায় না। এরফানও চাইল না নুরি খয়রা বিবির সঙ্গে থাকুক। এক সাথে থাকলে ঝামেলার শেষ নেই। রাতদিন চুলোচুলি লেগে থাকবে। তার চেয়ে আলাদা থাকা ভালো।

বস্তিতে ঘর ভাড়া নিল এরফান। নুরিকে নিয়ে উঠল সে নতুন ঘরে।

খয়রা বিবি তার প্রতীক্ষায় থাকে। রাত ভোর হয়ে যায়। এরফান তবু আসে না। বাবলুর চোখে ঘুম আসে না। উত্তেজিত হয়ে সে তার মাকে বলে, এতবড়ো অন্যায় আমি সহ্য করব না, মা। তোমাকে যে কাঁদাবে তার চোখই আমি উপড়ে নেব।

—না বাপ, চুপ যা। খয়রা বিবি বোঝাত, তোর বাপের শরীরের বদ রক্ত যাবে কোথায়? কয়লা যতই ধো ময়লা তার যায় নারে! ওকে ওর মতো সুখী হতে দে। আমি ঠিক তোর মা হয়ে বেঁচে থাকব।

পয়সা ছাড়া কি বাঁচা যায়? ভরণ-পোষণ আসবে কোথা থেকে? খয়রা বিবি না খেয়ে থাকে, দু-বেলা উপোস দেয়—তবু মুখ ফুটিয়ে সে কারোর কাছে কিছু বলতে পারে না। সবার কাছে কি সব কথা বলা যায়? তবে বাবলু কি ভাবে সব বুঝে ফেলে। গলার রগ ফুলিযে বলে, ও যদি আমারে জন্ম না দিত কবে ওর গলা টিপে খতম করে দিতাম। শুধু বাপ বলে পার পেয়ে যাচ্ছে। তবে বেশিদিন এমন চলবে না। যেদিন আমার মাথায় খুন চড়ে যাবে—সেদিন কেউ আর পার পাবে না।

ধোঁয়া ওঠা ভাত কলাই করা থালায় বেড়ে দিয়েছে লাট্টু। আজ আর তরকারি নেই, শুধু সেদ্ধ। এরকম তো প্রায় দিনই হয়।

খেতে বসে বাবলুর দিকে আড়চোখে তাকাল এরফান, ছেলের চোখে রাগ আছে কি না বোঝার চেষ্টা করল সে। বাবলু ঘাড় না তুলে খেয়ে যাচ্ছে। এরফানের মনে হল যেন খেপা ষাঁড়। সব তছনছ করে দেবে। ভয়ে ভাত আটকে গেল তার গলায়।

টিনের গ্লাসে জল ভরে এগিয়ে দিল লাট্টু, সাবধান করে বলল, এত তাড়াহুড়ো করার কি আছে, আজ তো আর কাজ হবে না! দেখে-শুনে খাও। শ্বাসনালীতে ভাত আটকে গেলে বিপদে পড়ে যাবে যে।

এরফান ঘামছিল কথা শুনে।

খেয়ে দেয়ে এঁটো থালা নিয়ে কলতলায় চলে গেল বাবলু। এরফান গলা উঁচিয়ে বলল, কলপাড়ে এঁটো ধুবি নে, বাবুরা রাগ করবে। বালতিটা নিয়ে যা। বালতিতে জল ভরে দূরে কোথাও ধুয়ে নে।

ভাতের গন্ধে দুটো কুকুর এসে হাজির হয়েছে কলতলায়। বাবলু কঠিন চোখে কুকুর দুটোর দিকে তাকাল। ওরা পিছু হটছিল। লাট্টু দূর থেকে বলল, খেদাস নে ওদের। অনেক ভাত বেঁচেছে, দিয়ে দেব।

রোজই কত ভাত বাঁচে। অথচ খয়রা বিবির দুটো ভাত জোটে না সময়মতো। কী কপাল করে এসেছে মেয়েমানুষটা!

বাবলুর চোখের কোণ চিকচিকিয়ে উঠল। মা'র জন্য ভেবে ভেবে তার নিজের জীবনটাই বুঝি শেষ হয়ে যাবে। ওই বুড়োটাকে দেখলে তার রক্তের ইবলিশ নড়ে চড়ে ওঠে।

বিকেলবেলায় রোদ মরে গেলে শান্ত হয়ে আসে চারপাশ। পাখির কিচিরমিচির ডাক শুনতে শুনতে উদাস হয়ে যায় মন। খাওয়া-দাওয়ার পর এরফান বস্তা বিছিয়ে গড়িয়ে নিয়েছে কিছু সময়। এমন যাযাবরের জীবন-যাপনে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ক্রমশ। বাবলুকে নিয়ে তার চিন্তা। ছেলেটা রগচটা। সারাক্ষণ শ্রাবণের মেঘের মতো গুম ধরে আছে, যে কোনোসময় বৃষ্টি নামতে পারে। এখানে কিছুতেই সে কাজে আসতে চায়নি। খয়রা বিবির শরীর ভালো যাচ্ছে না। কৃষ্ণনগরে ডাক্তার দেখিয়েছে বহু। আসলে রোগ তার শরীরে না, মনে। সর্বক্ষণ পুড়ছে সে। নুরিকে সে মেনে নেবে কি ভাবে। মেয়ের বয়সী মেয়েটা তার প্রতিদ্বন্দ্বী। দুম করে যে কাণ্ড করল এরফান—তার কোনো ক্ষমা নেই। খবরটা শোনার পর প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি খয়রা বিবি। পরে খবরের সত্যতা যাচাই করে লাজে-ঘেন্নায় এ পৃথিবী থেকে সরে যেতে চেয়েছিল সে। শুধু বাবলুর জন্য পারেনি। বাবলুই তাকে মরতে দিল না। ছেলেটার জন্য বুঝি যমে তাকে নিচ্ছে না, নাহলে কবে কবরে চলে যেত সে।

এবারে বাবলু আসতে চায়নি এরফানের সাথে। কেন চায়নি তার কারণটা এরফান ভালো মতন জানে। বাবলু রাগ করে বলেছিল, আমি খিদিরপুর চলে যাব। ওখানে কাজের খোঁজ পেয়েছি। তোমার সাথে ঘুরে আমার কোনো ফায়দা নেই। হতবাক এরফান প্রথমে কিছু বলতে পারেনি, পরে ঘোর কাটিয়ে বলেছে, তুই চলে গেলে আমার ঠিকেদারী দলটার কি হবে? দলটা যে ভেঙে যাবে, বাপ!

—ভাত ছিটালে কাকের অভাব হবে না। বাবলু মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে চাপা রাগে।

—তোর মাকে কে দেখবে? সে তো রুগী মানুষ। এরফানের চোখে-মুখে চিন্তা প্রকট হল।

—যার দেখার সে যখন দেখল না তখন আল্লা দেখবে। বাবলুর প্রতিটা কথায় অভিমান মাখানো।

এরপরে এরফানের মুখে কোনো কথা বেরয় না। বাপ-ছেলের সম্পর্কটাকে সে নিজেই জবাই করে দিয়েছে। এর জন্যও বাবলুর কোনো দায় নেই, যত দোষ সব তার। বিয়ের বয়স হয়েছে ছেলেটার। একটা ভালো মেয়ে দেখে তার শাদীটা চুকিয়ে দিলেই সংসারে বাঁধা পড়ে যেত ছেলেটা। খয়রা বিবিও স্বস্তির শ্বাস নিয়ে বাঁচত। তা যখন হয়নি তখন আর কপাল ফাটিয়ে কি হবে?

এরফান যা করেছে তার জন্য সে অনুতপ্ত নয়। মানুষ মনের দাস। ইচ্ছে শক্তি তাকে চালিত করে। নুরিকে দেখে ভালো লেগে যাওয়াটাই কাল হল। মেয়েটার বয়সের কথা তখন মাথায় আসেনি। আর মেয়েটাও বয়স নিয়ে কোনো কথার ঢেউ তোলেনি। সত্যিই সে ভালোবেসেছে তাকে। ভালোবাসা বুঝি একেই বলে। প্রথম রাতের কথা মনে পড়ছে এরফানের। ভয়-সংকোচে জড়িয়ে গেছে তার শরীর। ফণা তোলার জো নেই। নুরিই রাতভর খেলালো তাকে। এক সময় হাঁপিয়ে গিয়ে বলেছিল, আমার কোনো ভুল হয়নি গো! তোমার বুড়ো হাড়ের ভেলকি দেখে আমার গতরে শিহরণ আসে। তুমি যে সে মানুষ নও, যাদুকর।

যাদুকর! মনে মনে হেসে উঠল এরফান। এই বয়সে প্রেম চিটে ধানের মতো আবার নষ্ট না হয়ে যায়। পৃথিবীর আর কাউকে সে ভয় করে না, শুধু বাবলুকে ছাড়া। এই ছেলেটাই জন্মাবার সময় জান কেড়ে নিচ্ছিল খয়রা বিবির। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, কেস ক্রিটিক্যাল। হয় বেবি নয়ত মা দু'জনের একজনকে হারাতে হবে। তবু আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখব না।

মসজিদে গিয়ে এরফান দোওয়া মেঙ্গেছিল আল্লার। মা-ছেলে দুজনেই বিপদ কাটিয়ে ঘরে ফিরে এল। সেদিন এরফানের আর আনন্দ ধরছিল না। বস্তিতে জনে জনে ডেকে মিঠাই বিলিয়েছিল সে। সেদিনের সেই সুখ আজও চোখ বুজলে স্পষ্ট দেখতে পায় সে। মনে হয় যেন সেদিনের কথা।

সময় কী ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কোনো কিছু বুঝি মানুষের আয়ত্তের মধ্যে নেই এখন।

ব্যাগ হাতে লাট্টু এসে দাঁড়িয়েছে এরফানের সামনে।

ঘোর কাটিয়ে সামনের দিকে তাকাল এরফান, কিছু বলবি?

লাট্টু ঘাড় নাড়ল, রাতে তো খেতে হবে। যা সঙ্গে করে এনেছিলাম তা তো দুপুরে ঠেকা দিতে চলে গেছে। টাকা দাও। বাজার থেকে ঘুরে আসি।

এরফান অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল, বাজার তুই চিনিস?

—না চিনলেও জিজ্ঞেস করে চলে যাব। লাট্টু বলল, এখানে মাস দুয়েক থাকতে হবে। ঠিকেদারবাবু বলেছিল—এ হাসপাতালে অনেকদিন কোনো কাজ হয়নি। শুধু চুনকাম নয়, জানলা-দরজার কাজও এখানে হবে। সিমেন্টের কাজ তো আছেই।

এরফান ঘাড় নাড়ল। একটা কাপড়ের ব্যাগ থেকে টাকা বের করে লাট্টুকে দিল। ভাইয়ের প্রতি তার বিশ্বাস অটুট। এই ভাইজান তার সুখ-দুঃখের সঙ্গী। জ্ঞান পড়ার পর থেকে এই ভাই তার সঙ্গ ছেড়ে যায়নি। তবু এরফান সতর্ক গলায় বলল, বুঝে-শুনে খরচাপাতি করবি। ঠিকেদারবাবুর আসতে সময় লাগবে। সে না আসা পর্যন্ত একটা ফুটা কড়িও পাবো না। এছাড়া হপ্তায়-হপ্তায় ঘরে টাকা পাঠাতে হবে। টাকা না পাঠালে ওরাই বা খাবে কি? ওরা তো আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনেক কথা ভিড় করে আসছিল লাট্টুর মনে। বড়দার সামনে সব কথা কি বলা যায়? তবু সে রেখে ঢেকে বলল, ভাবীকে অনেকদিন তুমি টাকা দাও নি। টাকা না দিলে তারই বা চলে কি করে? বাবলু রাগারাগি করছিল। ও তোমার ছিমুতে কিছু বলতে পারে না। যা বলার আমাকে সব বলে। আমি তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এবার তুমি যা ভালো বোঝ করো।

এরফানের মুখে মেঘ নেমে এল সহসা, হ্যাঁ, আমি সব বুঝতে পারি। সে তার নতুন মাকে মেনে নেয়নি। মেনে নেওয়া না নেওয়া সব তার ব্যাপার। আমি আর কারোর পায়ে তেল মাখাতে যাব না। আমি যা ভালো বুঝেছি, করেছি।

এরফান চুপ করে গেল।

ব্যাগ নিয়ে লাট্টু চলে গেল পাকা সড়কে। ধীরে ধীরে হাওয়া বইছিল, আর তাতেই উড়ে যাচ্ছিল রাস্তার দু-ধারের খড়কুটো, ধুলোবালি। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এখানকার রাস্তাঘাট। জায়গাটা মনে ধরেছে লাট্টুর। কৃষ্ণনগর থেকে আসার সময় হাটগাছায় গাড়িটা থেমেছিল একবারের জন্য। একটা হাঁস প্যাঁক প্যাঁক ডাকতে ডাকতে চাকার সামনে এসে গিয়েছিল। পাকা ড্রাইভার ছিল, ঘ্যাস্ করে ব্রেক কষে দাঁড়াল, নাহলে কি যে হত কে জানে। দোকানে বসে থাকা লোকগুলো ছুটে এসেছিল সামনে। ততক্ষণে হাঁসটা রাস্তা পেরিয়ে নেমে গেছে ডোবায়। অন্য কোথাও হলে গালাগালির বান ডাকত। এখানকার মানুষরা বড়ো আশ্চর্য, তারা টুঁ শব্দটিও করল না। বরং ড্রাইভারকে সাবাসী দিয়ে বলল, তোমার জন্য হাঁসটা বেঁচে গেল ভাই। ড্রাইভার হতে গেলে চোখ-কান সতর্ক থাকা দরকার। তোমার দেখছি সব কিছু ঠিকঠাক আছে।

লাট্টু পথ চেনে না বাজারে যাওয়ার। একটা গোরুর গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে যাচ্ছিল কদমতলার পাশ দিয়ে। গাড়োয়ানের গায়ে গামছা জড়ানো, তবু তার স্ফূর্তির যেন শেষ নেই, মেঠোয়ালি সুর থামিয়ে সে নতুন মানুষ দেখে তাকাল, বাজারে যাবে তো দেরি কেন আমার গাড়িতে চেপে বসো। আমি বাজার হয়ে কুলবেড়িয়া গাঁয়ে যাব। টালি নিয়ে ফিরতে হবে বুঝলে?

যেন কত দিনের চেনা এমন অমায়িক তার গলার স্বর।

লাট্টু গোরুর গাড়ির পেছনে গিয়ে বসল। আর মনে করার চেষ্টা করল জীবনে এর আগে সে

গোরুর গাড়ি চড়েছে কি না! না, এই প্রথম গোরুর গাড়ি চড়ল সে। প্রথম গোরুর গাড়ি চড়ার আনন্দটা ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। খালি গায়ের গাড়োয়ান বলল, তা বাপু, কোথা থেকে আসা হয়েছে তোমার? এর আগে তো এ গাঁয়ে তোমাকে দেখিনি? তুমি বুঝি হাসপাতালে কাজ করো?

লাট্টু হা-করে শুনছিল প্রশ্নগুলো। লোকটা থামতেই সে বলল, আমরা ঠিকেদারের লোক। এ হাসপাতালে চুনকামের কাজ হবে। তাই আজই এসেছি সকালে। বাজার যাওয়ার পথ চিনি না। তোমার সাথে দেখা হল—

—ওঃ, এই কথা। লোকটা গাল ভরিয়ে হাসল, গাঁয়ের পথ আর চেনা না চেনার কি আছে। আঁধার হলে গাঁয়ের পথে ভয় শুয়ে থাকে। তুমি তো দিনের বেলায় যাচ্ছো। তোমার আবার ভয় কি!

বাজার আসতেই লোকটা বলল, এইখানে নেমে পড়ো। আমি এখান থেকে চলে যাবো অন্য রাস্তায়। ঠিক আছে ভাই, চলি। তোমার সাথে আবার পরে দেখা হবে।

গোরুর গাড়িটা চলে যাবার পর পথের মাঝখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকল লাট্টু। সেই অর্থে জমজমাট বাজার যাকে বলে—এখানে তেমন কোনোকিছু নেই। দু-একটা দোকান চোখে পড়ল বটে তবে সেগুলো জৌলুষহীন। মিষ্টির দোকানটায় থরে থরে রসকদম্ব সাজান। দেখে লোভ হল লাট্টুর। এক এক জায়গার মিষ্টি ভালো। বিশেষ কোনো মিষ্টির কদর আছে। এখানকার সেই কদরওলা মিষ্টিটার কী নাম জানতে চাইল লাট্টু।

ব্যাগ হাতে মিষ্টির দোকানে নয়—সে এগিয়ে গেল ভূষিমাল দোকানে। ফর্দ অনুযায়ী দরকারী জিনিসপত্তর কিনল সে। টাকার কথা মাথায় রেখে কেনাকাটি সারল সে।

ফিরে আসার সময় গড়িয়ে গেল বেলা।

হাসপাতালের মাঠে ঢুকে লাট্টু দেখল বাবলু ভাব জমিয়ে ফেলেছে স্টাফ-কোয়ার্টারের ছেলেগুলোর সঙ্গে। সবার সঙ্গে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা ওর প্রচুর। সবাইকে মানিয়েও নিতে পারে।

বিদেশ বিভুঁইয়ে এই গুণটুকু না থাকলে চলে না।

এরফান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল অবনীর সঙ্গে। কথার ফাঁকে-ফাঁকে গাল ভরিয়ে হাসছিল সে।

অবনী শুধোল, এখানে তাহলে কতদিন থাকা হবে?

এরফান বলল, যত তাড়াতাড়ি পারি কাজ শেষ করে চলে যাব। কাজ তো একটা নয়, অনেক বাকি আছে। সারা জেলা ঘুরে ঘুরে কাজ হয় আমাদের। ঠিকেদারবাবু সব দায়িত্ব আমার ঘাড়ে দিয়েছে।

—তা তো দেবেই। যোগ্য মানুষকে দায়িত্ব দেয় সবাই। অবনী এরফানের মুখের দিকে তাকাল। রোগা প্যাংলা চেহারা নয়—ছিমছিমে গতর। বয়স হয়েছে—এক নজর দেখলে অনুমান করা যায়। বয়স হলেও শ্রী হারায়নি চেহারা। চোখের দৃষ্টি এখনও ঠিক আছে।

এরফান বলল, একটু চা বানাই। সন্ধে নেমে এল। এদিকে মনে হয় ভালো শীত পড়ে।

অবনী বলল, শীতকালে শীত তো পড়বেই। তবে খুব বেশি শীত পড়ে না এদিকে। যেটুকু শীত পড়ে তা সহ্য করা যায়।

চা খেল না অবনী। তার মন পড়ে আছে হাসপাতালে। ডিউটি চলছে। ডিউটিতে ফাঁকি দেওয়া অপরাধ। তাছাড়া অতসী দিদিমণি রাগ করেন। গাল ফুলিয়ে বলেন, যারা ডিউটিতে ফাঁকি দেয় তাদের আমি দেখতে পারি না। কই তারা তো মাইনে নেবার সময় কম নেয় না।

অতসী দিদিমণির সঙ্গে ডিউটি থাকলে অবনী বেশি বেরতে পারে না। আবার এক জায়গায় বসে থাকতেও তার মন করে না। ঘুরে বেড়ানো স্বভাব তার সাথ দিল না। ডিউটি রুমে গিয়ে সে শুনল, পেসেন্ট এসেছে গায়ে পক্স নিয়ে। ডাক্তারবাবু বলেছেন, রোগীটাকে আইসোলেশন

ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে। বসন্ত ছোঁয়াচে রোগ। এ রোগী ওয়ার্ডে রাখা যাবে না।

হাসপাতালের বারান্দায় কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়েছিল বউটা। শাড়িটাই চাদরের মতো ঢাকা দিতে চাইছে জ্বরে কাতর শরীর। অবনী পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বারান্দায়, বউটার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার গায়ের লোম। সুন্দর মুখটা ছেয়ে গিয়েছে জলবসন্তে। শরীরের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে জলঠোসা পড়েনি। ঘায়ে জ্যাবজ্যাব করছে পুরো দেহ। বউটা এমনভাবে পড়েছিল যে ওর নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। বোঝা গেল প্রচণ্ড জ্বরে ধুঁকছিল সে।

অতসী দিদিমণি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি যখন ওর কাছে গিয়েছ তখন ওর নামটা জেনে নাও। বাড়ি কোথায়, ঠিকানা কি এসব তো জানা দরকার। এসব না জানলে আমি হাসপাতালের ফর্ম ভরব কি করে?

আশ্চর্য ভরা চোখ মেলে তাকাল অবনী, অতসী দিদিমণিকে শুধাল, এর বাড়ির লোক কোথায়? কারা এনেছে একে?

—কে যে এনে রেখে গিয়েছে কিছুই জানি না। শীত হাওয়া ঢুকছিল বলে দরজাটা ভেজানো ছিল। আমি ডিউটি রুমে বসেছিলাম। হঠাৎ কাতরানীর শব্দ কানে যেতেই বাইরে এসে দেখি এই বউটা শুয়ে আছে। তখনও বুঝতে পারিনি স্মল পক্সের রোগী। দিদিমণি হাঁফ ছাড়লেন, আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি। কে কোন ফাঁকে একে নামিয়ে রেখে চলে গেছে। ভাব তো মানুষ কেমন শয়তান!

রাগে-ক্ষোভে লালচে হয়ে উঠেছে অতসী দিদিমণির মুখখানা।

অবনী বলল, যেই আসুক, গোরুর গাড়ি ছাড়া একে এখানে আনা যাবে না। এ রোগী সাইকেলে বসে আসতে পারবে না।

—তুমি ঠিক বলেছ। অতসী দিদিমণি বললেন, সেই থেকে আমি আর ডাক্তারবাবু অনেক ভেবেছি, কিন্তু কোনো কূল-কিনারা করতে পারিনি। এ যে কাদের ঘরের বউ বোঝা দায়। যেভাবে মায়ের দয়া হয়েছে দেখলেই ভয় লাগে। দিদিমণি নির্দেশ দিলেন, আর দেরী না করে একে আইসোলেশন ওয়ার্ডে নিয়ে যাও। রোগটা তো ভালো নয়। ছোঁয়াচে।

ইতস্তত করছিল অবনী। কিন্তু ইতস্তত করে কোনো ফল হবে না বুঝতে পেরে সে দু'হাত বাড়িয়ে বউটাকে তুলে আনল বুকের কাছে। বেশ ভারী শরীর। হাত কাঁপছিল তার। এ সময় কেউ যদি সাহায্য করত ভীষণ ভালো হত। কিন্তু সে পথ বন্ধ। নাইটের লোক আসবে আটটার পরে। ততক্ষণ শীত হাওয়ায় যুঝতে পারবে বউটা? অবস্থা দেখেশুনে ভালো ঠেকে না অবনীর।

হাঁটতে হাঁটতে সে দিদিমণির দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, ডাক্তারবাবু কি বলছেন? বউটা বাঁচবে তো, দিদি?

—তা আমি কি করে বলব! হাসপাতালে যখন এসেছে তখন আমাদের সবরকম চেষ্টা করে দেখতে হবে। রোগীকে তো আমরা ফেলে দিতে পারি না। অতসী দিদিমণির কথা শেষ হল না একরকম দৌড়াতে দৌড়াতে আইসোলেশন ওয়ার্ডে পৌঁছে গেল অবনী। ছোটবেলায় তার একবার বসন্ত হয়েছিল—সেই ভয় তাড়া করছে তাকে। অতসী দিদিমণি বললেন, একে একেবারে ভেতরের ঘরে ঢুকিয়ে দাও। বারান্দায় রাখলে শীতে কষ্ট পাবে। মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে তার উপর একটা সাদা চাদর পেতে দিল অবনী। বউটাকে শুইয়ে দিয়ে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

অতসী দিদিমণি বললেন, যা করার তাড়াতাড়ি করো। ডিউটি রুমে কেউ নেই। আমাকে আবার যেতে হবে। তবে যাওয়ার আগে ওষুধগুলো তোমাকে দিয়ে যাই। তুমি একটু যত্ন নিয়ে খাইয়ে দিও।

তাড়াহুড়ো করছিলেন অতসী দিদিমণি। তাঁর তাড়াহুড়োর কোনো কারণ বুঝতে পারল না অবনী। হাত বাড়িয়ে কাগজে মোড়ানো ওষুধগুলো নিয়ে নিল সে। এখানে জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। ওষুধ তো হাওয়া দিয়ে গেলানো যাবে না। বিরক্ত অবনী দিদিমণিকে বলল, একটু জলের ব্যবস্থা করে দিন। ওষুধগুলো আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

—ঠিক আছে আমি জল নিয়ে আসছি। তুমি দাঁড়াও। ফুল তোলা রুমালে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছলেন অতসী দিদিমণি, তারপর ব্যস্ত হয়ে বললেন, আমি যাব আর আসব। তুমি কোথাও যেও না অবনী। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, কী ফ্যাসাদ! কী যে হবে—ভগবানই জানে!

কাচের বড়ো গ্লাসে জল নিয়ে এলেন দিদিমণি। চোখ-মুখ তার শুকিয়ে গিয়েছে ভয়ে। বেশি কথা বলতে চাচ্ছেন না ইচ্ছে করে। কথা বললে দুর্বলতা যদি ধরা পড়ে যায় অবনীর কাছে, তাহলে সেবার নাম করে মহান সাজবেন কি করে?

অবনী বহু কষ্টে ওষুধ খাওয়াল বউটাকে, অতসী দিদিমণি তাকে ছুঁয়েও দেখলেন না। এমন কি কাছেও গেলেন না তিনি। শুধু আপন মনে বিড়বিড়িয়ে বললেন, কার কপালে যে কি লেখা আছে কে জানে! যা ছোঁয়াচে রোগ! ভাবতেই পারছি না।

অতসী দিদিমণি চলে যাওয়ার পর একা হয়ে গেল অবনী। দূর থেকে বউটার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যথায় বুক ভেঙে গেল তার। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে? কিসের জন্য তাহলে এই পৃথিবীতে আসা। মানুষ না হয়ে পাথর হলে বুঝি ভালো হত। এত কষ্ট পেতে হত না। রোগ জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরতে হত না। দেখে-শুনে যা মনে হয় বউটা নিশ্চয় কোনো বড়ো ঘরের। যারা তাকে ফেলে পালিয়েছে তারাও নিশ্চয়ই বড়োঘরের। অসুখ-বিসুখ কি ঘর বুঝে আসে!

মনে একদলা ঘেন্না নিয়ে অবনী ডিউটি রুমের কাছে এসে দাঁড়াল।

অতসী দিদিমণি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কোয়ার্টারে যাও। এখানে আর দাঁড়িও না। তোমার গা দিয়ে পচা-দুর্গন্ধ বেরচ্ছে। তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় ছেড়ে স্নান করে নাও। না হলে কী হয় বলা যায় না তো! যা দেখলাম—চোখও এর আগে এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেনি। হায় ভগবান, কেন দেখলাম!

চুনকাম আর মেরামতির কাজ চলছে পাশাপাশি।

এরফানের হাতের কাজে মুগ্ধ সবাই।

অবনী বলল, এমন মানুষ লাখে একটা পাওয়া যায়। এমন সাচ্চা মানুষ আজকাল নজরে পড়ে কম।

কথাটা চুপচাপ শুনছিল সরস্বতী। আর থাকতে না পেরে বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেমন মানুষ জানা আছে। বুড়ো বয়সে যে আবার বিয়ে করেছে তার চরিত্র যে কত ভালো তা নিয়ে আমার কাছে আর ঢাক-ঢোল পিটিও না।

কথা বলতে বলতে কেমন চুপসে গেল অবনী। মনে মনে সে ভাবল-এরফান আবার বিয়ে না করলেই পারত। একটা বউ ঘরে থাকতে আবার অন্য কারোর হাত ধরা, মোটেও এটা ভালো স্বভাবের লক্ষণ নয়। সরস্বতী যা বলছে-তাকে একেবারে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সরস্বতী বলল, মানুষকে এক ঝলক দেখেই বিচার করতে যেও না। এত ঠকছ তবু শিক্ষা হয় না।

অবনী মিইয়ে গেল কেমন, তার মেলামেশাটা সবার সঙ্গে বড়োই আন্তরিক। মানুষের দোষ তার খুব কম নজরে পড়ে। এরজন্য তাকে যে ঠকতে হয়েছে তা নয়। তার কি আছে যে মানুষে ঠকিয়ে নেবে? এরফান-এর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইল সে। সরস্বতী যা ভালোবাসে না তা নিয়ে হৈ-চৈ করতে মন সায় দেয় না। তবে এতদিনে তাদের মেলামেশাটা গাঢ় হয়েছে। এরফান সময় পেলেই চলে আসে কোয়ার্টারে। অবনীই তাকে ডাকে। বড়ো মুখ করে বলে, সময় যখন কাটে না তখন আমার বাড়িতে চলে এসো। গল্প করে সময় কেটে যাবে।

গল্পে-গল্পে একদিন বিয়ের কথাটা বলে ফেলেছে এরফান। সহজ সরল না হলে কেউ কি নিজের সবকথা এমনভাবে অন্যের কাছে বলতে পারে? সরস্বতী সব শুনেছে নিজের কানে। শোনার পর থেকে মানুষটার প্রতি তার ভক্তি-শ্রদ্ধা সব উঠে গেছে।

অবনী তাকে কত বুঝিয়েছে, যে যা করল তাতে আমাদের কী এসে যায়! আমাদের সাথে দু-দিনের সম্পর্ক, অত গভীরভাবে না ভাবলেই চলবে। তাছাড়া, এরফান এখানে আসে, দু'দণ্ড গল্প করে চলে যায়। ও তো আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি। এরফান এমন স্বভাবের মানুষ—ওর দ্বারা কারোর কোনো ক্ষতি হবে না। চৌবাচ্চাটা ভেঙে গিয়েছিল অবনীর, সর্বদা জল চুঁয়াত, গচ্ছিত জল বেরিয়ে যেত, একদিন এরফানের নজরে পড়তেই আগ বাড়িয়ে বলল, দাঁড়াও, তোমাদের চৌবাচ্চাটা আমি আবার নতুন করে বানিয়ে দেব।

কথা রেখেছিল সে। ইট-সিমেন্ট দিয়ে নতুন একটা চৌবাচ্চা বানিয়ে দিয়েছিল সে। কাঁচা সিমেন্টের প্লাস্টারের উপর কর্নিক দিয়ে লিখে দিয়েছিল অবনী + সরস্বতী। শুধু ভাব-ভালোবাসাতেই এসব সম্ভব। নাহলে কার এত অফুরন্ত সময় আছে হাতে।

অবনী আর এরফান মুখোমুখি বসে বিড়ি খায়, বিড়বিড়িয়ে গল্প করে নিজেদের মধ্যে। কত রকমের সুখ-দুঃখের গল্প। ওরা দুটিতে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় বাঁধের গোড়ায়। হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে জল সরে যাওয়া বুড়িগাঙের দিকে। অবনী আক্ষেপ করে বলে, মানুষের জীবনও মনে হয় এই বুড়িগাঙের মতো। আজ জল আছে, কাল শুকনো খটখটে।

এরফান শব্দহীন হাসে, তা যা বলেছ। এ জীবন কোথায়, কখন যে গোঁত্তা খায় কেউ আগাম বলতে পারে না। অন্যমনস্ক হয়ে যায় সে, আপন মনে বলে চলে, নতুন বউকে সহ্য করতে পারে না বাবলু। আমি তাকে কত বুঝিয়েছি। সে কথা শোনার ছেলে নয়। ওর ধারণা নতুন বউ আসার ফলে খয়রা বিবির কদর কমে গেছে আমার কাছে। আমি তাকে দেখি না, শুনি না। জান ভাই—এসব ওর মনগড়া। আমি দু-জনকে সমান দেখার চেষ্টা করি।

অবনী বলল, তুমি ফের বিয়ে করাতে ওর একটু অভিমান হয়েছে। অভিমান হওয়া তো স্বাভাবিক। ছেলে বড়ো হয়েছে। এবার ওর বিয়ে দিয়ে দাও। দেখবে—আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এরফান ঘাড় নেড়ে সায় দিল, হ্যাঁ, তুমি যা বলেছ ঠিক বলেছ। বিয়েটা দিয়ে দিলে ছেলের হয়ত রাগ পড়ত। কিন্তু ভালো মেয়ের সন্ধান পাচ্ছি কই। তোমার যদি নজরে পড়ে, আমাকে বলো। দু-হাত এক করে দেব।

সন্ধে লাগার আগে ওরা ফিরে আসে হাসপাতালের সীমানার মধ্যে। আইসোলেশন ওয়ার্ডের বউটা চিৎকার করে কাঁদে, জল, একটু জল।

তার গোঙানী ভরা কথাগুলোয় ভয়ের রেণু ছড়িয়ে থাকে। অবিকল ভূতের মতো লাগে তার

গলা। মনে হয় পাতালপুরীর ভেতর থেকে কোন এক প্রেতাত্মা নিজেকে উদ্ধার করার জন্য মরিয়া হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করছে। হাসপাতালের অনেকেই এখন আর ঐ ঘরটার পাশ দিয়ে যায় না। আসা-যাওয়ার রাস্তা ভয়ে অনেকে বদলে ফেলেছে এখন। রাস্তা বদলালেও ভয়ের কোনো কম বেশি হয় না। ভয় হচ্ছে অলকলতার মূল। যার শেকড় খুঁজে পাওয়া দায়।

অতসী দিদিমণি কেন, এই হাসপাতালের কোনো নার্স-দিদিমণি বউটাকে ওষুধ খাওয়াতে যায় না। এমন কী ডাক্তারবাবুও ভয়ে চুপচাপ। শু'ু কাগজে ওষুধ লিখে নিজের দায়িত্ব সেরে দেন।

কারা যে বউটাকে এখানে রেখে পালিয়ে গেছে এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা, গবেষণা হল হাসপাতালে। মুখটা কারোরই চেনা নয়। আশেপাশের গ্রামে বাড়ি হলে কেউ না কেউ চিনত বউটাকে।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অবনী বলল, বউটা মনে হয় বাঁচবে না। যেভাবে বসন্ত ফুটেছে ওভাবে কারোর বুঝি হয় না।

এরফান বিজ্ঞের স্বরে বলল, যার যা ভাগ্যে লেখা আছে তা তো হবেই। নসিবকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তবে তোমার মুখে শুনে আমারও ভীষণ খারাপ লাগছে। কষ্ট পাওয়ার চেয়ে চলে যাওয়া ভালো।

চুপ করে থাকল অবনী। কারোর মৃত্যু কামনা করা অশোভন। তবু মনে মনে সে চাইল—এভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। চলে যাওয়াই ভালো। সুস্থ হয়ে সে ফিরে যাবে কোথায়? যাওয়ার সব রাস্তা তার বন্ধ। যারা অসুখে ফেলে পালায়—তাদের কাছে সুস্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

সরস্বতী সন্ধেবেলায় শুভকে নিয়ে বসেছে পড়াতে। হ্যারিকেনের আলোয় মাতাল হয়ে উড়ছে শ্যামাপোকা। সেই আলোর দিকে তাকিয়ে কত কথা মনে পড়ছে তার। বিশেষ করে বালিঘাইয়ের স্মৃতি সে ভুলে থাকতে পারে না। বাবার কথা তার বারবার করে মনে পড়ে। বুকের গভীর থেকে উঠে আসে কান্না। সে কাঁদে একা একা।

অবনী যখন এরফানকে নিয়ে ঘরে এল তখনও উদাস হয়ে বসেছিল সরস্বতী। আজ সন্ধেবেলায় সে চুল আঁচড়ায়নি, সিঁদুরও পরেনি। কেমন ভার হয়ে আছে তার সুন্দর মুখটা। দেখলে মনে হয় চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে সে।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল সরস্বতী। কপালে নড়ে উঠল বিরক্তির রেখাগুলো, এই বুঝি ঘরে ফেরার সময় হল! এত বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ালে সংসার পাতার কি দরকার ছিল?

অবনী সরস্বতীর কথার ঝাঁঝে বিব্রত, সামান্য সঙ্কুচিত। পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করার জন্য সে বলল, সারাক্ষণ হাসপাতাল চত্বরে ঘুরঘুর করতে মন করে না। তাই একটু বাঁধের ধার দিয়ে ঘুরে এলাম। এ সময় বাঁধের ধারে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। সেই হাওয়ায় শরীরটা জুড়োয়।

সরস্বতী এরফানকে বসতে বলে চোখ তুলে তাকাল, যেখানেই যাও, সংসারের কাজ সামলে যেও। একা আমার ঘাড়ে অত দায়িত্ব দিও না। আমারও শরীর ভালো নেই। আমিও হাঁপিয়ে উঠি।

একটা কাঠের চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছে এরফান।

শুভ হা-করে তাকিয়ে আছে মাঝবয়েসী মানুষটার দিকে। বাবলুর মুখে অনেক কথাই শুনেছে সে এরফান চাচার। সে সব অনেক কথাই এখন ভিড় করে আসে শুভর মনে।

সে কিছু বলার আগেই এরফান শুধালো, এখন তোমাদের ইস্কুল ছুটি আছে বুঝি?

ঘাড় নেড়ে সায় দিল শুভ।

এরই ফাঁকে লাল চা করে আনল সরস্বতী। একটা কাপ এরফানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, চা খান দাদা। সকাল থেকে খেটে খেটে শরীরে আর জোর পাই না। মন-মেজাজ তাই ভালো নেই।

এরফান সহজ হাসি হাসল। চায়ে চুমুক দিয়ে সে দেখছিল ঘরের চেহারাখানা। চার দেওয়ালের মাঝে এ সংসারে দেখার মতো কোনো জিনিস নেই, শুধু সরস্বতী ছাড়া।

অবনী বলল, খালি হাতে দেশ ছেড়ে এসেছিলাম। ডাক্তারবাবু না থাকলে ভেসে যেতাম, দাদা। ডাক্তারবাবুর দয়ায় আমার এই চাকরি। আজ তার দয়ায় দুটো করে খাচ্ছি।

উপকারীর উপকারের কথা ভোলেনি অবনী। কৃতজ্ঞতায় চকচক করছে তার চোখের তারা।

এরফান চা শেষ করে বিড়িতে দম দিয়ে বলল, এখনও এ সংসারে কিছু মানুষ আছে যারা আল্লার ফরিস্তা। তাদের দোয়ায় চাঁদ-সূয্যি খেলছে গো...। সরস্বতী কথা শুনছিল এক মনে। দুম করে সে বলে বসল, আমি শুনলাম তুমি বসন্ত-ঘরে বউটার কাছে যাও। বলি, তোমার কি জানে ভয়-ডর নেই?

অবনীর মুখে কোনো কথা নেই। অতসী দিদিমণি নিশ্চয়ই সব বলেছে সরস্বতীকে নাহলে হাসপাতালের ঘটনা সে জানবে কি করে?

উত্তর না পেয়ে সরস্বতী এরফানকে সাক্ষী রেখে বলল, দাদা, বলুন তো, ওর কি এত আগ বাড়িয়ে সব জায়গায় যাওয়া উচিত। ওর যে বউ ছেলে আছে এটা সে ভুলে যায়।

—ডিউটিতে থাকলে না গেলে কি চলে? অবনী বোঝাতে চাইল। রোগকে ভয় পাওয়া ভালো কিন্তু রুগীকে ডরলে সে বেচারী বাঁচে কি করে?

—তোমাকে আর ভগবান সাজতে হবে না। নিমেষে উত্তেজিত হয়ে উঠল সরস্বতী, পরের জন্য ঢের করেছ। এবার নিজের জন্য ভাবো। তোমার কিছু হলে আমাদের কে দেখবে?

দুঃশ্চিন্তায় মেঘলা হয়ে গেল সরস্বতীর মুখমণ্ডল।

অবনী আপন মনে বিড়বিড়িয়ে বলল, বউটা আর বাঁচবে না। একফোঁটা জলের জন্য ও যে ভাবে কাঁদে—তা কানে শোনা যায় না। সবাই পাথর হলে আমাকে যে পাথর হতে হবে তার কোনো মানে নেই।

—তোমার কিছু হলে তোমাকে কে দেখবে?

—তোমরা তো আছো। তোমরা দেখো।

রাত্রি বাড়ছিল। এরফানের ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। এ সময় রাতের বাতাস বেশ ভারী। বাতাসে হিম মিশে থাকে।

অবনী এরফানকে এগিয়ে দেবার জন্য বাতাবী লেবুর গাছ অবধি এল। তারপর এরফানই বলল, দাদা, আর আসার দরকার নেই। এবার আমি চলে যাবো।

আর একটা বিড়ি ধরাল অবনী। এরফানকে একটা বিড়ি দিয়ে বলল, আজ মনে হচ্ছে শীতটা বাড়বে। দেখ হাওয়ায় কেমন কনকনে ভাব।

বিড়ি ধরিয়ে ঘাড় নাড়ল এরফান। তারপর অন্ধকারে মিশে গেল।

ঘরে ফিরে এসে নাইট-ডিউটির তাড়ায় মেতে উঠল অবনী। ব্যাগ গুছিয়ে সে খেতে বসল বারান্দায়। আজও গরম ভাত রাঁধেনি সরস্বতী। জল ঢালা ভাতের উপর দুপুরের কুমড়ো ঘ্যাঁট আর একটা পেঁয়াজ এগিয়ে দিল সে।

খুব নিরুত্তাপ গলায় অবনী শুধোল, আজ ভাত করোনি?

—বললাম তো আমার শরীর ভালো নেই। নিস্তেজ গলায় উত্তর দিল সরস্বতী, যা আছে আজকের মতো খেয়ে নাও। কাল দেখা যাবে।

—শীতকালে ভিজে ভাত খেতে মন করে? অবনী কিছুটা প্রতিবাদী হবার চেষ্টা করল, ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে গেলে রাতে ঘুম পায়। ডিউটিতে ঘুমিয়ে গেলে দিদিমণি বকেন।

এবার মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল সরস্বতী, কত ডিউটি করো সব আমার জানা আছে। গিয়ে তো বিছানা পেতে ঘুমাও। রাতে এ হাসপাতালে ভূতই আসে না তো রোগী আসবে।

—ওরকম তোমার মনে হয়। অবনী বোঝাতে চাইল, রোগ-জ্বালা দিনরাত্রি মেনে আসে না। বলে-কয়েও আসে না।

সরস্বতী হাসল, যাও, আমাকে আর বোঝাতে এসো না। আমি সব বুঝি—। খেয়ে-দেয়ে ব্যাগ নিয়ে চলে যাচ্ছিল অবনী। সরস্বতী ছুটে এসে সামনে দাঁড়াল, শোন, আজ আর ওই বউটার কাছে যাবে না। দিদিমণি বলছিল—বড়ো ছোঁয়াচে রোগ। আমার খু-উ-ব ভয় করে। যদি তোমার কিছু হয়ে যায়।

'ভয়'—মনে মনে হাসল অবনী। নিরাপত্তাহীনতা এ পৃথিবীর কেউ চায় না। সরস্বতী-ও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই জলছবি অন্ধকারে ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে।

হাসপাতালমাঠের ঘাস বিক্রির টাকায় মুনিষ দিয়ে রাস্তায় মাটি ফেলেছেন ডাক্তারবাবু। পায়ের চড়া পড়া পথ এখন অনেকটা উঁচু। এত বড়ো বৃষ্টি গেল তবু জল জমেনি রাস্তায়।

অন্ধকার লেপটে শুয়ে আছে হাসপাতালের ঘরগুলো। সব মিলিয়ে কুড়ি বেডের হাসপাতাল। রবিবার বাদে আউটডোরে বসেন ডাক্তারবাবু। রুগীরা ওষুধ নিয়ে চলে যায়। খুব বড়ো ধরনের সমস্যা হলে তখন ভর্তির প্রসঙ্গ এসে যায়। রাত-বেরাতে কখন যে রুগী আসবে বলা যায় না। তাই চব্বিশ ঘণ্টা নার্স থাকেন ডিউটি রুমে।

নাইট ডিউটি থাকলে অবনী কামাই করে না একদিনও। গাঁয়ের হাসপাতালে রাতের ডিউটি আরামের ডিউটি। তেমন খারাপ কোনো রুগী না থাকলে বিছানা পেতে ঘুম দেয় অবনী। বেশি খারাপ রোগী কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন ডাক্তারবাবু।

এ হাসপাতালে একটা মাত্র অ্যাম্বুলেন্স। ফলে ড্রাইভারও একজন। চিত্রভানু একাই সেই অ্যাম্বুলেন্সের হর্তাকর্তা। এ হাসপাতাল চত্বরে তার কথার বেশ ওজন আছে। ড্রাইভার মানুষ। কেউ সহজে তাকে চটাতে চায় না।

হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে ঢেলায় হোঁচট খেল অবনী। 'উঃ' যন্ত্রণার শব্দ ছিলা পিছলান তীরের মতো আচমকা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। শীত হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ছে শরীরের উপর চাবুকের মতো। তুষের চাদরটা ভালো মতন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নেয় অবনী।

হাসপাতালের মেইন দরজার মুখে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল দাসপাড়ার কানুকুড়ো। রোজই সে এই সময়টাতে বাইরে আসে। এলোমেলো ক'পা হেঁটেই আবার নিজের বিছানায় ফিরে যায়। সারাদিন তার শুয়ে থাকা কাজ। কাঁহাতক আর বিছানা আঁকড়ে শুয়ে থাকতে ভালো লাগে। বয়স হয়েছে। এখন ঘুম চাপড়ার বিলে চরতে আসা শীতের পাখির মতো, শরীরে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধতে জানে না, কেবলই উড়ু উড়ু স্বভাব। ঘুম না এলেও নিয়ম করে খিদে পায় তার। হাসপাতালের ভাতে তার পেট ভরে না, বুড়ি তাই দুপুরবেলায় আউস ফুটিয়ে আনে তার জন্য। কানুকুড়ো এত খায় বলে বুড়ির মনে চাপা রাগ। প্রায় শুধোয়, হ্যাঁ গো, তোমার পেট সাফ হয় তো। পেটে গ্যাস-অম্বল হয় না তো?

কানুকুড়ো ফোকলা মাড়ি দেখিয়ে হাসে, ভগবান এই হজম শক্তি ছাড়া আর কোনো কিছু আমাকে দেয় নি। সে বড়ো কৃপণ গো! তার সাথে দেখা হলে আমার হাতাহাতি হয়ে যেত।

দাসপাড়ার ঘরগুলো হাসপাতালের বারান্দা থেকে দেখা যায়। দায়ে-অদায়ে মানুষজন চিকিৎসার জন্য ছুটে আসে এখানে। এ গ্রামে হাতুড়ে ডাক্তার ছাড়া পাস করা ডাক্তার নেই। একজন

হোমিওপ্যাথি পুরিয়া দেয়। তাতে কারোর রোগ সারে, কারোর আবার সারে না।

কানুকুড়ো ঠাট্টা করে বলে, নেশা-ভাং করলে ঐ গুঁড়ো ওষুধে কোনো কাজ হয় না। বুড়ি বলে, কাজ হয় গো, কাজ হয়। শ্রদ্ধা-ভক্তি ভরে খেতে হবে। ছটফট করলে ও ওষুধে কাজ হবে না।

কানকুড়োর কেস আলাদা।

পালবাড়ির নারকেল গাছ ঝুরতে গিয়ে সে গাছ ব্যাঙের মতো ঠিকরে পড়েছে কঠিন মাটিতে। পড়েই আর উঠতে পারে নি, যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়েছে। ওর ভাগ্য ভালো মাজায় লেগেছে কিন্তু হাড় সরেনি। ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করেছেন নিজের হাতে। পাক্কা দেড়মাস তার বিশ্রাম। দেড়মাস পরে সে পুরোপুরি সুস্থ। কিন্তু সুস্থ মানুষ হাসপাতালে থাকে কোন অধিকারে? ডাক্তারবাবু প্রায় এসে বলেন, কাল তোমাকে ছুটি দিয়ে দেব, ঘরে চলে যেও।

ঘরে গিয়ে খাবে কি কানুকুড়ো? এখানে দুধ-পাঁউরুটি, চা-বিস্কুট-ভাতের কোনো অভাব নেই। ঘরে গিয়ে কি শুকিয়ে মরবে? কে খেতে দেবে তাকে? ছেলের বউ দু'চোখে দেখতে পারে না। মনে মনে গালমন্দ করে, বুড়োটা মরলে বাঁচি। ঘর জুড়ে বসে বসে শুধু খাওয়া আর বাঁশবন ভরানো। ছ্যা:, এমন কুঁড়ে মানুষের মুখ দেখাও পাপ।

পাপ- পুণ্য অনেক দূরের পথ। তার অনেক জটিল হিসাব। আপাতত খেয়ে-পরে বাঁচতে চায় কানুকুড়ো। দরকার হলে সে ডাক্তারবাবুর পা জড়িয়ে ধরবে, তবু সে হাসপাতাল ছেড়ে যাবে না।

তিন বেলা ওষুধ দিয়ে যায় নার্স দিদিমণি। সেই ওষুধ 'পরে খাবো' বলে মুঠো করে ফেলে দেয় বাথরুমে। কারোর সাধ্যি নেই যে কানুকুড়োর কেরামতি ধরে। শুধু ইনজেকশান নেওয়ার সময় তার দৃষ্টি যেন মরা মাছের ঘোলাটে চোখ। কাতর হয়ে বলে, আর ইন্‌জিসিন দেবেন না গো, ইনজিসিন নিয়ে নিয়ে হাত দুটো আমার ঝাঁঝরা হয়ে গেল। বড্ড বিদনা হয়।

সরকারি ভাত মাগনা হয় না, সুঁচের ফোঁড়াই তো খেতে হয়। এখন কোমরের ব্যথা সেরে গিয়ে হাতে তার ভীষণ ব্যথা। সোজা হয়ে দু'হাত নাড়াতে পারে না। যেন সখের হাত দুটো তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে চলে গেছে। শুধু বসে বসে কথার জাবরকাটা ছাড়া তার আর কিছু করার নেই।

সেই কানুকুড়ো অবনীকে দেখতে পেয়ে হাত গুটিয়ে নিল দাপনার কাছে।

ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি অবনীর, চটপট সে শুধোল, কী গো বড়দা, হাতের ব্যথা সেরে গেছে?

—ব্যথা-বিদনা কি সারে ভাই? বয়স কালের ব্যথা-বিদনা চিতায় যায়। আফশোষ ধ্বনিত হল কানুকুড়োর গলায়, সেই বসন্ত হওয়া বউ মানুষটা জল-জল করে চেঁচাচ্ছিল, এখন এট্টু থেমেছে। কেমন চেঁচানী গো, শুনলে গায়ের লুমা চেগিয়ে ওঠে!

অবনী অসহায় গলায় বলল, মনে হয় আর বেশিদিন নেই! কেন যে ভগবান এত কষ্ট দিচ্ছে বুঝি না। কী তার লীলাখেলা বোঝা দায়—।

কানুকুড়ো অন্যমনস্ক হয়ে গেল ক'মুহূর্ত, পরে নিজেকে স্বাভাবিক করে বলল, ভগমান যা করে মঙ্গলের জন্য। জানো তো ভাই, কারোর পৌষমাস, কারোর সর্বনাশ। দেখ দিনে দিনে কি হয়?

এখনও ইলেকট্রিক আসে নি এ গাঁয়ে। ফলে পুরো হাসপাতাল ডুবে আছে অন্ধকারে। বাবলা গাছের মাথা থেকে উড়ে যায় কালপেঁচা। হাসপাতালের টানা লম্বা বারান্দায় দৌড়-ঝাঁপ খেলে চামচিকি। দিনের বেলায় ওরা যে কোথায় গা ঢাকা দিয়ে থাকে বোঝা যায় না। রাত হলে ওদের দাপাদাপি বাড়ে। ওদের ওড়াওড়ি কেমন ভৌতিক আর রহস্যময় মনে হয়।

ডিউটি রুমে খাতা সারছিলেন অতসী দিদিমণি। অবনীর পায়ের শব্দে তিনি মাথা তুলে তাকালেন। তারপর ঘাড় সোজা করে বড়ো দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালন। রাত সাড়ে আটটা।

তার মানে আধঘণ্টা লেটে ডিউটি এসেছে অবনী। অতসী দিদিমণি এই 'লেট' শব্দটাকে একদম সহ্য করতে পারেন না। নিজে আসেন কাঁটায় কাঁটায় আটটায়। তাকে দেখে ঘড়ি মেলানো যায়।

অবনী ব্যাগটা প্রতিদিনের মতো দরজার গোড়ায় ঠেস দিয়ে রাখল।

অতসী দিদিমণি অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, আজও আধঘণ্টা লেট করে এলে? নাইট ডিউটিতে লেট এলে আমার চিন্তা হয়। এত বড়ো হাসপাতালে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। ভাবো তো—কোনো অঘটন ঘটে গেলে কি হবে?

অবনীর মুখে কোনো কথা নেই। দেরিতে এসে বড়ো মুখ করে কিছু বলা শোভা পায় না। এতে দিদিমণি আরও রেগে যাবেন। তার চাইতে চুপ করে থাকা ভালো।

দুটো হ্যারিকেন জ্বলছিল পাশাপাশি। তার একটা তুলে নিয়ে অবনী নিজেকে শুনিয়ে বলল, যাই, দরজাগুলো বন্ধ করে আসি।

হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে হনহনিয়ে চলে গেল অবনী।

সদর দরজার কাছে এসে সে দেখল তখনও হা-করে মড়িঘরের দিকে তাকিয়ে আছে কানুকুড়ো, তার বয়স্ক চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে অন্ধকারে। অন্ধকারে মড়িঘরের দিকে তাকিয়ে কি দেখছে সে? মানুষের শেষ পরিণতিই মড়ার ঘর। দার্শনিক ভাবনায় হঠাৎ বুঝি আপ্লুত হল কানুকুড়ো। অবনী তার কাছে গিয়ে আলতো করে ঘাড়ের উপর হাত রাখল, বড়দা, চলো গো। রাত মিলা হল। আমি দরজা বন্ধ করব।

যেন আকাশ থেকে পড়ল কানুকুড়ো। অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে নিমেষে ভেঙে পড়ল ঝাঁকুনি দেওয়া কান্নায়, মন ভালো নেই, মন ভালো নেই গো! আমার মনের যে কী হলো! মনে হচ্ছে আমার আর বেশিদিন নেই, মরে যাবো। মন বড়ো কু গাইছে। আজ আমার কী হল গো...শুধু ওপরওলা জানে। যত কথা বলে তার শতগুণ কান্না এসে ঠোকরায় তার গলা। কিসের দুর্ভাবনায় দুলে ওঠে তার শরীর। কাঁদতে কাঁদতে নাকের জল-চেখের জলে একাকার হয়ে যায় সে, বার্ধক্যজনিত ভাঙা স্বরের কল্যাণে তাকে মোটেও চিনতে পারে না অবনী। সে শুধু গায়ে হাত রেখে সান্ত্বনার গলায় বলে, চুপ করো। মাথার উপর তিনি আছেন। সব ঠিক করে দেবেন। ভেবো না তো।

—যা ঠিক হবার নয়, তা কি করে ঠিক হবে?

বিছানায় ফিরে এসে আক্ষেপে মাথার চুল ছেঁড়ে কানুকুড়ো। অতসী দিদিমণি এসে বলে গিয়েছেন, জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে রেখো। কাল তোমার ছুটি হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু লিখে দিয়ে গিয়েছেন—।

কথাটা শোনার পর থেকে মাথাটা ঠিকঠাক কাজ করছে না কানুকুড়োর। আর একটা দিন ডাক্তারবাবুর হাতে-পায়ে ধরে থাকতে পারলে ভালো হত। যাওয়ার আগে আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে সে। ভাগ্যে থাকলে হবে নাহলে পগার পার হয়ে যাবে।

রাত যত বাড়ে, ভয় তত থাবা বসায় বুকের পাঁজরায়। লোহার খাটে কুঁকড়ে মুকড়ে শুয়ে থাকে কানুকুড়ো। শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ ঝরে পড়ে। তার ব্যথা-বেদনা সব ভালো হয়ে গেছে অনেকদিন হল। অনেকদিন আগেই তার ছুটি হয়ে যাবার কথা। কিন্তু ছুটি হলে সে মরে যাবে। খাবে কি? এখানে টাইমে খাবার। চা থেকে পাউরুটি সব টাইমে দেয়। ঘরে ছেলের বউ ফিরেও তাকায় না। মুখ ঝামটায়। চাপা গলায় বলে, মুনিষ খেটে খাও গো যাও। যদি মুনিষ খাটতে না পারো তো ভিক্ষে করে খাও। আর তা যদি না পারো তো ভাড়া দিচ্ছি দেবগ্রাম স্টেশনে চলে যাও। ওখানে কৌটো নাড়িয়ে ভিক্ষে কর। দেখবা—সারাদিনের পেটের ভাতের যোগাড় হয়ে যাবে।

—জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। কানুকুড়ো আবার দার্শনিকের মতো বিড়বিড়িয়ে ওঠে। তার সুখে থাকা কেউ সহ্য করতে পারে না। সবার মাথায় যেন বজ্র পড়ে তার হাসিখুশি চেহারা দেখলে। কেন কি করেছে সে? কার পাকা ধানে মই দিয়েছে?

মনে মনে সে ভাবল—কাল যেন ডাক্তারবাবু না আসে সকালে। হে ভগবান, কাল থেকে ডাক্তারবাবুর যেন পাতলা পায়খানা হয়। ডাক্তারবাবু যেন কদিন বিছানা ছেড়ে না উঠতে পারে। ডাক্তারবাবু না এলে তাকে আর কেউ ছুটির কথা বলবে না। অন্তত আর কটা দিন সে এখানে কাটিয়ে দিতে পারবে। এরপর সে ঘরের সবাইকে মানা করে দেবে হাসপাতালে আসতে। বুড়িটা রোজ দু-বেলা আসে, এসে খোঁজখবর নিয়ে যায়। তাকে মানা করতে বুক ভেঙে যাবে তবু নিজের স্বার্থের কথা ভেবে কথাটা তার মুখের উপর বলতে হবে। বাড়ির লোকজনদের দেখলে ডাক্তারবাবুর মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে, আর অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যাবে বুড়োর কথা। তার চেয়ে কেউ না এলেই সব দিক থেকে মঙ্গল। কোমরে চোট না লেগে যদি পুরো শিরদাঁড়াটা তার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত তাহলে বুঝি সব চাইতে খুশি হত সে নিজে। অল্প আঘাত স্বল্পদিনে সারে। আঘাত জোর হলে কে তাকে খেদাত হাসপাতাল থেকে?

অবনী দরজা লাগিয়ে ফিরে এসেছে ডিউটি রুমে। চেয়ারে থাকলে অতসী দিদিমণি তাকে বেশি পাত্তা দেন না। একটু দূরত্ব রেখে কথা বলেন। তবু অতসী দিদিমণির ব্যবহারে অখুশি নয় অবনী। জামার পকেট থেকে একটা মোড়ান পোস্টকার্ড বের করে বলে, দিদি, দেশ-গাঁয়ে একটা চিঠি লিখে দিতে হবে। অনেকদিন চিঠি দেওয়া হয়নি।

—কার কাছে লিখেবে? অতসী দিদিমণি চিঠি লেখার সময় চশমাটা নাকের উপর ঝুলিয়ে নেন। চশমা পরলে তাকে হাই-ইস্কুলের দিদিমণির মতো লাগে।

—বড়দার কাছে চিঠি দিতে হবে। ধান কাটা শেষ হয়েছে। আগাম না জনিয়ে দিলে এবছরও ভাগ পাব না। অবনী টুল সরিয়ে দিদিমণির কাছে সরে এল, আপনি তো জানেন দিদি, প্রতিবছর ওরা আমাকে কত ঠাকায়। দেশে গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসি আমি। ফসল ভালো হলেও বড়দা আমাকে ফসলের ভাগ দেয় না। ওদের যে এত কিসের অভাব বুঝি না।

অতসী দিদিমণি চুপচাপ শোনেন, এ ব্যাপারে তাঁর কোনো মন্তব্য করা উচিত হবে না। দাদা-ভাইয়ের ব্যাপার। রাগারাগি, মান-অভিমান থাকলেও একটা আত্মীয়তার আলো আছে এই সব সম্বন্ধের মধ্যে।

পোস্টকার্ডটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলেন তিনি, চিঠি লেখার আগে ঠিকানাটা যত্ন নিয়ে লিখলেন লাল কালির কলমে। বেশ গোটা গোটা পরিষ্কার লেখা। হ্যারিকেনের আলোয় জ্বলজ্বল করছে লাল রঙের লেখাগুলো। পোস্টকার্ডটা পুরো ভরে দিলেন তিনি। যা লিখেছেন তা পড়ে শোনালেন একবার। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক আছে তো, অবনী? আর কিছু জুড়তে হলে বলো লিখে দিচ্ছি।

—আপনার লেখার উপর কারোর কোনো কলম চলবে না দিদি, অবনী মুখ ভরিয়ে প্রসন্ন হাসল, এ তো লেখা নয় উকিলের চিঠি। দেখি এবার দাদা কি জবাব দেয়। এক মাসের মধ্যে উত্তর না পেলে আমি ছুটি নিয়ে দেশে চলে যাব। দেখি এবার কেমন করে ফসলের ভাগ না দিয়ে থাকতে পারে।

ডিউটি রুমের বাইরে পেঁচাটা ডেকে ওঠে কর্কশ স্বরে। লাঠি নিয়ে খেজুর গাছের ঠিলি পাহারা দেয় গিয়াস। তার গলার স্বর বাতাস ভেদ করে অবনীর কানে ধাক্কা মারে। গিয়াসের জন্য অবনীর

মনটা বিচলিত হয়ে ওঠে। অমন ভালো মানুষটার সঙ্গে বিপথগামী নাফিজা ভালো ব্যবহার করে না। প্রায়ই কথায় কথায় দুঃখ দেয়। কোলের ছেলেটাকেও সে খেয়াল রাখে না। খেলতে খেলতে কাচের গুলি গিলে ফেলেছিল ছেলেটা। ডাক্তারবাবু বহুকষ্টে তা বের করেন। তবু নাফিজার ব্যবহারে কোনো অনুশোচনা নেই। সে বুঁদ হয়ে আছে মকবুলের প্রেমে। সব জেনে বুঝে ঝিম ধরে আছে গিয়াস। আল্লা ছাড়া তাকে দেখার আর কেউ নেই। গুড় জ্বাল দিতে গিয়ে পোড়ের সামনে ঝিম ধরে ঢুলতে থাকে গিয়াস। অবনী বহুবার তাকে মানা করেছে। সাবধান করে বলেছে, রাতজাগা শরীর নিয়ে অমন পোড়ের কাছে ঢুলো না। বিপদ কখন ঘটে যাবে কেউ বলতে পারে না।

—আমার কিছু হবে না, দাদা। আমি দোজকের কীট। আমাকে কেউ ছোঁবে না।

রাত পাহারার ডাকেও বুঝি এই অভিমান মিশে আছে গিয়াসের। অবনীর ঘুম আসছিল না, অস্বস্তিতে সে এ-পাশ ও-পাশ করে। সারাটা দিন তার চিন্তাভাবনার বিরাম নেই। এরফানের সঙ্গ তার কাছে সাধুসঙ্গ মনে হয়। মানুষটাকে মনে হয় যেন ফেরেস্তা। রাজমিস্ত্রির কাজ করলেও ওর মন রাজার মতো।

টানা বারান্দায় পাশ ফিরে শুলো অবনী। মশার ডানা কাঁপানো শব্দ তার কাছে ঘুমপাড়ানীর গানের মতো মনে হয় না আর। হাসপাতালে মশার বড়ো উৎপাত। আজ মশারী আনতে ভুলে গেছে সে। তাছাড়া দিদিমণি মশারী টাঙালে রাগারাগি করেন। বলেন, কেউ এসে গেলে চাকরিটা যাবে তোমার! অন-ডিউটিতে মশারী টাঙিয়ে ঘুমাতে তোমার লজ্জা লাগবে না? রুগীরা দেখলেই বা কি জবাব দেবে?

সব বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকে অবনী। পেটের দায় মহা দায়। তাকে তো অস্বীকার করা যায় না। আবার ঘুমও চাই। ঘুম না হলে শরীর ভাঙে। থানার পেটা ঘড়িটা ঢং-ঢং করে রাত বাড়ার জানান দিল। স্তব্ধতা ভেঙে খান খান হল ক' মুহূর্ত। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক ভেসে আসছে বাইরে থেকে। একটা কুকুর ডাকতে-ডাকতে চলে গেল। এই হিম ঝরা রাতে সামান্য শব্দ যেন হুলু স্থুলু বাঁধিয়ে দেয় কানের ভেতর। বাথরুমে এসে চোখে-মুখে জলের ছিঁটে দিতে গিয়ে অবনী শুনতে পায় সেই কাতর আর্তনাদ, জল, জল। মরে গেলাম গো...!

আওয়াজটা চেনা। তবু এই মুহূর্তে মনে হয় অচেনা এই স্বর। একটা ভৌতিক আবহের পরিমণ্ডল তৈরি হয় এই স্বরে। গায়ের লোম চাগিয়ে ওঠে অবনীর। তবু সে কান পেতে শোনে, জল, একটু জল...! মরে গেলাম গো-ও-ও-ও! ভয়ে বাথরুম থেকে ছুটে সে চলে যায় ডিউটি রুমে। একটা ছায়া তার পেছন পেছন আসে। অবনী তাকিয়ে দেখে কানুকুড়ো। দাঁত বের করে খি-খি করে হাসছে। এ হাসি যেন মানুষের নয়, প্রেতাত্মার। ভয়ে গলা কেঁপে ওঠে অবনীর, তোমার আবার কি হল, খ্যাঁ-খ্যাঁ করে হাসছো যে!

—হাসি পায়, হাসি ঠেকাতে পারি না। টেনে টেনে জবাব দেয় কানুকুড়ো।

—এত বড়ো রাত, ঘুমোও। তোমার কি ঘুম আসে না, দাদা?

—ঘুম আসে না, ভাইরে! কপালে হাত দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে থাকে কানুকুড়ো।

তার এই ভঙ্গি দেখে আরও বিরক্ত হয় অবনী, ঘুম যখন আসছে না, তখন ঘুমের বড়ি চেয়ে নাও দিদিমণির কাছ থেকে। একটায় ঘুম না এলে দুটো খাও। তবু তুমি ঘুমোও। তোমাকে আর দেখতে ভালো লাগছে না রাতকালে—।

—গরীবকে দেখতে কারোরই ভালো লাগে না, ভাই। কানুকুড়ো গলায় দুঃখ-ঝরিয়ে বলল, গরীবের মরে যাওয়া ভালো! বিশেষ করে বয়স হলে বেশিদিন বাঁচা ভালো নয়। কে তারে খেতে দেবে, পরতে দেবে—?

—রামায়ণ থামাও। ধমক দিয়ে ডিউটি-রুমে ঢুকে গেল অবনী।

টেবিলে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন অতসী দিদিমণি। পায়ের শব্দে চোখ মেলে তাকিয়েছেন তিনি, কেমন ঘুমজড়ানো তন্দ্রামাখানো চোখ-মুখ। তিনি স্বাভাবিক হওয়ার অগেই অবনী হড়বড় করে বলল, দিদি, মনে হচ্ছে বসন্ত ওয়ার্ডের বউটার অবস্থা খুব খারাপ।

—কী করে বুঝলে? পালটা প্রশ্ন করলেন অতসী দিদিমণি, হ্যারিকেনের বাতি উসকে তিনি যেন কিছু খুঁজছিলেন।

অবনী বলল, শুনতে পাচ্ছেন না জল, জল আওয়াজ।

এবার জানলা খুলে বাতাসে কান পাতলেন অতসী দিদিমণি। হুড়মুড়িয়ে শব্দের সঙ্গে ঢুকে এল হিম। শব্দগুলো হাড় কাঁপানো। ভয়ে অতসী দিদিমণির চোখ-মুখ শুকিয়ে গেল, একবার তো ওখানে মানবিকতার খাতিরে যাওয়া দরকার। তুমি কি বলো অবনী?

হ্যাঁ। ঘাড় নাড়ল অবনী, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। যা হবার হবে—আমি ভয় পাই না। বেশি কিছু হলে সঙ্গে কানুকুড়ো বুড়োকে নিয়ে নেব।

—হ্যাঁ, তাই চলো। দিদিমনি উঠে দাঁড়ালেন।

কানুকুড়ো বুড়োকে আর ডাকতে হল না, সে নিজেই এসে হাজির। হাতজোড় করে বলল, আমি যতক্ষণ আছি ভয় পাবেন নি গো মা জননী। ভূত-প্রেত সব আমার কাছে মশা-মাছির সমান। আমি থাকতে ওদের বাপেরও সাধ্যি নেই কিছু করার।

—তুমি চুপ করবে! ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল অবর্নী।

অতসী দিদিমণির গা হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছিল। মনে ভয় ঢুকেছে তাঁর। সেই ভয়ের কথা তিনি কাউকে মুখ ফুটিয়ে বলতে পারছেন না। এ এক অসহনীয় যন্ত্রণা।

হিমঝরা রাতের পৃথিবী পড়ে আছে মরা মাছের মতো। একটা নেড়ি কুকুর ঘেউঘেউ ডাকতে ডাকতে চলে গেল পালপাড়ার দিকে। মেয়েলি কণ্ঠের চিৎকারটা কাছে যেতেই তীক্ষ্ণ হয়ে কানে বিঁধল ওদের। এর মধ্যে কোনোমতে ওষুধ খাইয়ে ফিরে এলেই দায়িত্ব শেষ। এই কাজটুকুই কত বড়ো কাজ হয়ে ধরা পড়ছে এখন।

অবনী যেন দিদিমণির মনোভাব বুঝতে পারল। সে তাকে আশ্বস্ত করবার জন্য বলল, আপনাকে ভেতরে ঢুকতে হবে না দিদি। আপনি এখানে দঁড়ান। জল আর ওষুধগুলো আমার হাতে দিন। আমি ঠিক খাইয়ে দেব।

ওষুধ আর জলের গ্লাসটা অবনীর হাতে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন অতসী দিদিমণি।

—তাড়াতাড়ি এসো। তোমার দেরী হলে আমার চিন্তা হবে। ঢোঁক গিললেন দিদিমণি। মাজা পড়া বয়স্ক কানুকুড়ো তাকে অভয় দিয়ে বলল, মোটে ভয় পাবেন নি। আমি আছি। আমি থাকতে ভয় কিসের মা জননী। বলেছি না ভূত প্রেত সব আমার ট্যাঁকে গোঁজা—।

অবনী ভয়হীন চিত্তে মাথা উঁচু করে ঢুকে গেল আইসোলেশন ওয়ার্ডে। হ্যারিকেন নিভে গেছে তেল নেই বলে। সেই ভৌতিক আঁধারে দেশলাই জ্বেলে হ্যারিকেনটা জ্বালাবার চেষ্টা করল সে। পারল না কোনোমতে। হ্যারিকেনটা মেঝের উপর নামিয়ে রাখল সে। লালচে আলোয় দেখতে চাইল বউটার মুখখানা। ফর্সা ধবধবে মুখখানা গুটি বসন্তের প্রকোপে বাসি লুচির মতো জড়িয়ে আছে। তার ভেতরে জ্বলজ্বল করছে শেষ যাত্রার দৃষ্টি। কী যেন বলতে চায় ওই চোখদুটো। অবনী সাত-পাঁচ না ভেবে বসে পড়ল বউটার মাথার কাছে। মিহি গলায় শুধোল, কিছু বলবে? খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?

বউটার মুখে কোনো উত্তর নেই, শুধু গড়িয়ে নামছে চোখের জল। ফুলে-ফুলে উঠছে বসন্ত খুবলানো ঘেয়ো ঠোঁট দুটো।

অবনী ঝুঁকে পড়ে বলল, মুখ ফাঁক করো। আমি তোমার জন্য ওষুধ এনেছি। ভালো হয়ে যাবে। পাখির বাচ্চার মতো মুখটা ফাঁক করল বউটা। অবনী প্রথমে ওষুধ না দিয়ে এক চামচ জল দিল তার মুখে। জলটুকু ঢক করে গেলার শব্দ হল। দ্বিতীয়বার আর এক চামচ জল দিতে গেলেই জলটা মুখে নিয়ে কস বেয়ে গড়িয়ে দিল বউটা। নিমেষে ঝাঁকুনি দেওয়া তার শরীরটা বন্ধন ছিন্ন করতে চাইল মাটির। এই প্রথম অবনীর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল ভয়ে। বিপদ বুঝতে পেরে সে পাগলের মতো ছুটে এল বাইরে।

—দিদিমণি, ভেতরে চলুন। খিঁচুনি উঠেছে। অবস্থা ভালো বুঝছি নে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরের ভেতরে ব্যস্ত পায়ে ঢুকে এলেন অতসী দিদিমণি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি দেখলেন বউটার শরীর ধনুকের মতো ঠেলে উঠল উপরে, তারপর ঝড়ে ভেঙে যাওয়া কাঠটগরের ডালের মতো লুটিয়ে পড়ল মাটির বিছানায়।

চোখ ভরে জল এল অতসী দিদিমণির, অবনীকে শুনিয়ে বললেন, চলে গেল! আহা, বহু কষ্ট পেয়ে মরল বউটা। ওর আত্মার যেন সদ্গতি হয়।

অবনীর মুখে টুঁ শব্দটি নেই। সে দিদিমণির নির্দেশে ছুটল ডাক্তারবাবুকে খবরটা দিতে।

গায়ে সোয়েটার চাপিয়ে ডাক্তারবাবু এলেন পনের মিনিট পরে। সবকিছু দেখেশুনে তিনি বললেন, অবনী, এই সাদা চাদরটা দিয়ে ওর মুখটা ঢেকে দাও। যাওয়ার আগে দরজার হুকটা লাগিয়ে দিও। অন্তত বাহাত্তর ঘণ্টা ডেড-বডি রাখতে হবে। এখানে বরফের কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই। দেখি শেষ পর্যন্ত কী করতে পারি। বেওয়ারিশ লাশের এই এক ঝামেলা...।

ডাক্তারবাবু আসার সংবাদ পেয়ে ওখান থেকে সটকে গিয়েছে কানুকুড়ো। একটা খেজুরগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে জুলজুল চোখে সে খুঁজছিল বেঁচে থাকার উপায়।

ধোঁয়া ওঠা আগুনের দিকে তাকিয়ে বাবলু বলল, আজ আর তোমার কাজে গিয়ে লাভ নেই, আব্বা। ড্রাইভারের হাতে মা চিঠি পাঠিয়েছে। তার কাছে কোনো পয়সা-কড়ি নেই। তুমি গিয়ে তার খায় খরচের ব্যবস্থা করে এসো। আর যদি কোনো কারণে তুমি না যেতে পারো—তাহলে আমাকে দাও, আমি কেসনগর গিয়ে সব ব্যবস্থা করে আসি।

আগুনের দিকে হাত বাড়িয়ে সেঁক নিচ্ছিল এরফান। কাল রাতে ছোটবিবির স্বপ্ন দেখেছে সে। কুয়োয় পড়ে গিয়েছে নুরি আর উঠতে পারছে না। অন্ধকার কুয়োয় দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। শুধু 'বাঁচাও বাঁচাও' আর্তনাদ। কেউ নেই। শুধু বাবলু দাঁড়িয়ে আছে কুয়োপাড়ে। হা-হা হাসিতে বুক ভরিয়ে সে বলছে, যেমন কর্ম তেমন ফল। অন্যের সুখ কেড়ে নিলে নিজের কপালে আগুন ধরে।

বাবলুর চোখ থেকে আগুনের ফুলকি ছুটে যাচ্ছে নুরির দিকে, সেই ফুলকি খাক করে দিতে চায় নুরির সাজানো শরীর।

লাট্টুর ঠেলায় ঘুম ভেঙে যায় এরফানের, কী আবোল তাবোল বকছ গো বড়ভাই। উঠে বসে

গিলাস খানিক পানি খাও। শোওয়ার পর বিড়বিড়ানী স্বভাব তোমার আর গেল না! স্বপ্ন ভেঙে গেছে কিন্তু তার রেশ ছড়িয়ে ছিল এরফানের চোখে-মুখে, আতঙ্কে সে নীল হয়ে শুধিয়েছিল, বাবলু কোথায়?

—ওই তো শুয়ে আছে।

—ওঃ। বুকে হাত দিয়ে আশ্বস্ত হয়েছিল এরফান। বাস্তবিক নুরির চিন্তায় তার ভালো ঘুম হয় না। শাদী করার পর থেকে ক'দিনই বা সান্নিধ্য পেয়েছে বউটার। যদি কোনো উপায় থাকত তাহলে সাথে করে আনত নুরিকে এখানে। নতুন বউ, তার যে একা থাকতে কী ভীষণ কষ্ট হবে তা একমাত্র খোদাই জানে। এরফান এখানে এসেও যেন তার উষ্ণ সান্নিধ্য পেতে চায়। এসব ভাবনা দুর্বল করে তোলে তাকে। ভালোবাসা সোহাগ মানেই দুর্বলতা। এসব কাটিয়ে ওঠা এরফানের পক্ষে সহজ কাজ নয়। তার আবেগ যে কোনো যুবকের চাইতে বেশি। মন করে বাস ধরে চলে যেতে কৃষ্ণনগরে। রাত কাটিয়ে ফিরে এলে কে আর টের পাবে।

লাট্টু আর বাবলু দুজনে যেন দুই দারোয়ান। ওদের চিল চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সস্তা নয়।

আগুন থেকে হাত সরিয়ে বাবলু বলল, হাত-চিঠিতে মা লিখেছে, তার শরীর ভালো নেই। ডাক্তার দেখাতে হবে। হাতে টাকা পয়সা নেই।

এরফানের কানে অসহ্য লাগছিল বাবলুর ঘ্যানর ঘ্যানর। বিরক্ত হয়ে সে বলল, তোরও তো মা। তুইও তো যেতে পারিস। শুধু আমার কি একার দায়িত্ব?

এবার আগুনে ঘি ঢালার মতো জ্বলে উঠল বাবলু, এখন নতুন বিবি পেয়ে পুরনা বিবির কাছে যেতে শরম লাগছে বুঝি? তোমার মতলবটা আমার আর বুঝতে বাকি নেই।

ছোট ছেলে ছোট ছেলের মতো থাক, মেলা ফড়ড় ফড়ড় করিস নে। তেতে উঠল এরফান, আমার এই দু-চোখ দুজনকে সমানভাবে দেখে। অধর্ম আমার দ্বারা হয় না।

—হ্যাঁ, তা যা বলেছ। বাবলু গালে হাত বুলিয়ে নিষ্ঠুর চোখে তাকাল, সেইজন্য আসার সময় ছোটবিবিকে দিলে আড়াইশো টাকা। আর খয়রা বিবির বেলায় মাত্র পঞ্চাশ টাকা। বলি পঞ্চাশ টাকায় কি হয় একজনের? ক'দিনই বা খেতে পারে? সে-কথা শুনে আঁতকে উঠল এরফান, ঢোঁক গিলে বলল, তুই যা জানিস সেটা সঠিক নয়। এসব কথা তোকে কে বলেছে?

—কে আবার বলবে! যে বলেছে—সে তোমার পাশে বসে আগুন সেঁকছে। বাবলু তির্যক দৃষ্টি মেলে লাট্টুর দিকে তাকাল ; বিশ্বেস না হলে পাশে বসে আছে শুধিয়ে নাও। সে তো আর মিথ্যে কথা বলবে না। সে তোমার এক মায়ের পেটের ভাই। বিপদ বুঝে চুপ করে গেল এরফান। বাবলু গলা চড়িয়ে বলল, আজই আটটার বাসে চলে যাও। বাজার হাট করে দিয়ে কাল চলে এসো। আমরা এদিকটা সামলে নেব।

—আজ কোনোমতেই যাওয়া যাবে না। এরফান জোর গলায় বলল, কাজ ফেলে আমি যাই কী করে। ঠিকেদারবাবু হঠাৎ এসে গেলে আমাকে বেইমান ভাববে। তার চোখে আমি ছোট হতে পারব না। আমি যদি যাই তো রবিবারে যাব, তার আগে কোনোভাবে সম্ভব নয়।

—ঠিক আছে তাহলে টাকা পয়সা আমাকে বুঝিয়ে দাও। আমি গিয়ে দিয়ে আসি। বাবলু বলল, রবিবারের অনেক দেরি। ততদিন কি উপোষ দেবে খয়রা বিবি?

—আমি তার কি জানি। এরফানের কথায় তেড়ে গেল বাবলু, তুমি জানবে না তো কি পাড়ার মোড়ল জানবে?

প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম, লাট্টু থামিয়ে দিল ওদের, তোমরা বাপবেটায় থামবে! বিদেশ বিভুঁইয়ে মান-সম্মান না খুয়ালে দেখছি তোমাদের ভাত হজম হবে না।

দু-জনকে দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিল লাট্টু।

হাঁপাতে হাঁপাতে এরফান বলল, কারোর চোখ রাঙানির আমি এত ধার ধারি না। যাকে জন্ম দিয়েছি তার এত গলা আমি সহ্য করব না।

—তাহলে ওকে টাকা দিয়ে দাও, ল্যাটা চুকে যাক। লাট্টু বলল।

এরফান অসহায় গলায় বলল, টাকা থাকলে তো দেব! গেল হপ্তায় জোগাল-দারদের হপ্তা দিতে পারিনি। ঠিকেদার বাবু যা টাকা দিয়েছিল—তা প্রায় শেষের দিকে। যতদিন তিনি না আসেন আমাকে তো দল চালাতে হবে।

বাবলু ঠোঁট কামড়ে আগুন উগলান চোখে তাকাল, তাহলে দু'জনকে সমান ভাগে টাকা দিয়ে আসতে পারতে। তাহলে কারোর কিছু বলার থাকত না। তোমার একপক্ষ বিচার দেখে আমার মাথায় বিছে কামড়ে দিয়েছে।

সকালের রাগটা আবার উঠে এল দুপুরবেলায়।

পুকুরে ডুব দিয়ে এসে বাবলু দেখল তখনও ভাত ফুটছে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে। দুটোর আগে খাওয়া না হলে বাস বেরিয়ে যাবে কৃষ্ণনগরের। এরফান বলেছিল, সে যেখান থেকে হোক টাকা ধার করে এনে দেবে।

দুটোর বাস চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। এরফান ফিরে এল শূন্য হাতে। হতাশ হয়ে বলল, ভেবেছিলাম ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ধার এনে দেব। এতক্ষণ বসে বসে ফিরে এলাম। ডাক্তারবাবু কোথায় নেমতন্ন খেতে চলে গিয়েছে। ফিরতে অনেক দেরি হবে। ফুটন্ত ভাতের মতো ভেতরে ভেতরে ফুটছিল অস্থির বাবলু। মা তার নয়নের মণি। মায়ের অমর্যাদা সে কোনো কালে সহ্য করতে পারে না। এরফানের ব্যবহারে সে তিতিবিরক্ত। নিজের অসহিষ্ণুতা বোঝাবার জন্য সে হুঙ্কার ছেড়ে ছুটে গেল ভাতের হাঁড়ির দিকে, চিৎকার করে বলল, আমার যখন যাওয়া হল না তখন এ ভাত আমি কাউকেই খেতে দেব না।

একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো উনুন থেকে বের করে সে ছুঁড়ে মারল ভাতের হাঁড়িকে লক্ষ্য করে। চোখের নিমেষে চুলা থেকে উল্টে গেল ভাতের হাঁড়ি, দাউ দাউ আগুনে লুটিয়ে পড়ল ফেন সমেত সাদা ভাত।

সেই ভাতের দিকে হাঁ-করে চেয়ে রইল এরফান। এই প্রথম সে টের পেল আগুনও রাগের কাছে নিভে যায়।

লাট্টুর চোখের সামনে সবকিছু যেন ছায়াছবির মতো ঘটে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে মূক, বিহ্বল। ধিকিধিকি জ্বলা মনের ক্ষোভ আগুন আজ প্রতিকূলতার হাওয়া পেয়ে দাউ দাউ জ্বলে উঠেছে—এই আগুন সহজে প্রতিরোধ করা যাবে না। এর যে শেষ কোথায় তাও জানে না সে। বাবলুকে সে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুতেই বুঝবে না বাবলু। নুরির নামটাকে সে সহ্য করতে পারে না। ওই একটি মেয়ে তাদের সুখের সংসারে ভাঙন ধরিয়েছে। তাই নুরিকে সে ছেড়ে কথা বলবে না, সুযোগে পেলে সে এর হিসাব সুদে-আসলে বুঝে নেবে।

অনেকক্ষণ পরে লাট্টু বলল, বাপের উপর রাগ করে ভাতের হাঁড়ি উল্টে দেওয়া তোর উচিত কাজ হয়নি।

বাবলু ফুঁসে উঠল, অমন চরিত্রহীন বাপের ভাত আমি কাউকে খেতে দেব না।

—এ তোর রাগের কথা। লাট্টু বোঝাবার চেষ্টা করল, অত মাথা গরম করলে চলবে? সংসারে থাকতে গেলে সব কিছুকে মানিয়ে নিতে হবে। না হলে পদে পদে ঠকবি। রক্তের তেজ দেখিয়ে জীবনের হিসাব মেলে না—বুঝলি।

—যোগ-বিয়োগ যা করার তোমরা করো। বাবলু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আমি চললাম।

—কোথায় যাবি, এখন তো বাস নেই?

—বাস না থাকুক, দুটো পা তো আছে। বাবলু হারবার ছেলে নয়, আমি হেঁটেই দেবগ্রাম চলে যাব। আর আসব না।

—পাগলামী করিস নে। লাট্টু ছুটে গিয়ে তার পথ আটকে দাঁড়াল।

হাত ছাড়িয়ে নিল বাবলু। রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে বলল, মা'র অসুখ। তার কাছে খরচাপাতি কিছু নেই। আমি না গেলে সে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে। বাপ দেখল না বলে ছেলে যে মুখ ঘুরিয়ে নেবে এমন তো হয় না। আমাকে যেতেই হবে।

ঘাড়ে ঝোলানো একটা ব্যাগ নিয়ে বাবলু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার পথের দিকে শুকনো চোখে তাকিয়ে থাকল এরফান।

রোদ পড়তেই সুফল ওঝা এল ভূত খেদাতে।

তার কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলছিল লম্বা একটা কাপড়ের থলি। তাতে রাজ্যের শেকড়-বাকড় ভরা।

সুফল ওঝার কপালে লম্বা সিঁদুরের টিপ। ওটাকে টিপ না বলে তিলক বলা ভালো। সে হাসপাতালের গেট দিয়ে নেমে সটান চলে গেল আউটডোরের দিকে। তার হাঁটা-চলা রাজার মতো।

হাসপাতালে ভূত ঘুরছে—এই খবরটা তার কানেও গিয়েছে।

বউটা গত হবার পর থেকে লম্বা কথার গুজব হাজার ডালপালা ছড়িয়েছে লোকের মুখে মুখে। রাতকালে হাসপাতালের ভেতর 'জল জল' করে চিল্লিয়ে ওঠে সেই বউটা। তার সেই কান্না অনেকেই শুনেছে। ভয়ে হাসপাতালের দিকে এখন আর কেউ একা যাওয়া-আসার সাহস দেখায় না। ফিমেল ওয়ার্ডের রুগীরা সব পালিয়েছে বেড ছেড়ে।

তিন দিন হয়ে গেল বউটার লাশ পড়ে আছে মড়ার ঘরে। বেওয়ারিশ লাশ, কবর না দিলে দুর্গন্ধ যাবে না। কিন্তু কবরটা দেবে কে? গাঁয়ের কোনো মানুষই সাহস করে এগিয়ে আসছে না একাজে। ফলে দুর্গন্ধে বিষিয়ে উঠেছে বাতাস। শুধু ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে এই তীব্র দুর্গন্ধ রোখা যাবে না।

বাতাস সর্বত্রগামী।

সারা হাসপাতাল চত্বরে ভয়ের একটা মেঘ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো ভয়ংকর আকার ধারণ করছে মুখে মুখে। যে যেমন পারছে গুজবের পালক গুঁজে দিচ্ছে আতঙ্কভরা বাতাসে।

তিন দিনের পচা লাশ ছুঁতে চায় না কেউ। তবু অবনী আগ বাড়িয়ে বলল, সঙ্গে আর একজন কাউকে পেলে আমিই সৎকার করে দিতাম। সৎকার হয়ে গেলে ভয়ের আর কোনো কারণ থাকত না।

ডাক্তারবাবু দিদিমণিরা সব শুনলেন যে যার মতো। হাসপাতালে এমন ঘটনা এই প্রথম। ভয়ের যতই আলোচনা হোক না কেন—ফুৎকারে সব উড়িয়ে দেন ডাক্তারবাবু। জোর গলায় তিনি বলেন, আমি ওসব ভূত-ফূত মানিনে। ভূত বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। ওসব দুর্বল মনের গল্পকথা।

দিদিমণিরা দু-দিকেই আছেন। তাদের মুখে 'হ্যাঁ-না' কোনো জবাব নেই। এর মধ্যে অতসী দিদিমণি বলেন, একটা মেয়েলী গলার স্বর আমি বহুবার শুনেছি। কান্নাটা মেল-ওয়ার্ডের কাছ থেকে আসে। সারা হাসাপাতালের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এগুলো তো মিথ্যে নয়। সব নিজের কানে শোনা।

—সব মানলাম কিন্তু... ডাক্তারবাবু বিরক্তিতে চুপ করে গেলেন। দশ চক্রে ভগবান ভূত-এর বেশি কিছু তিনি জানেন না।

থানায় খবর পাঠিয়েছেন তিনি। থানা থেকে পুলিশ এসেছে হাসপাতালে। দু-জন পুলিশ রাতে

ডিউটি দেয় এখন। তারাও শুনেছে এই আর্তনাদ। ভয়ে কাঠ হয়ে আছে তারা।

পঞ্চায়েত প্রধান হাসপাতালে ঘুরে গিয়েছেন বার তিনেক। সব শুনে তার কপালেও ভাঁজ পড়েছে চিন্তার। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে সদর থেকে জমাদার আসবে লাশ পুঁততে। তাকে সাহায্য করবে অবনী। মাটির তলায় শরীর ঢেকে গেলে ভয়ও চাপা পড়ে যাবে। এই আশায় সময় পার করছেন ডাক্তারবাবু। যত তাড়াতাড়ি এই আলোচনা বন্ধ হয়—ততই মঙ্গল।

থানার ওয়ারলেসে সদরে খবর পাঠিয়েছেন ডাক্তারবাবু। থানার ওসি তার পাশে আছেন। তিনি সাহস দিয়ে বলেছেন, আমি আপনার সঙ্গে আছি। ভয় পাবেন না। কোনোরকম চাপের কাছে মাথা নত করবেন না। কোনো কিছু হলে আমাকে খবর পাঠাবেন। আমি ঠিক পৌঁছে যাবো।

অবনীর আগে আগে হাঁটছিল সুফল ওঝা। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাকে জামাই আদরে বসাল অবনী। খবরটা কানে যেতেই বিরক্তি প্রকাশ করলেন ডাক্তারবাবু, সুফল ওঝাকে আবার কে ধরে আনল? ওকে এখান থেকে চলে যেতে বলো। ওর এখানে কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের বিপদ আমারই সামলে নিতে পারব।

রসের কলসী পাহারা দিতে গিয়ে রাতের বেলায় ভূত দেখেছে গিয়াস। একটা বউ সাদা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে বাঁকা খেজুরগাছের গোড়ায়। তার আঁচল উড়ছে কুয়াশায়। গিয়াসের সাথে চোখাচোখি হতেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল বউটা। আর ঠিক তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে ঘাসে লুটিয়ে পড়েছিল গিয়াস। হিমজলের স্পর্শে অনেক পরে তার জ্ঞান ফেরে। জ্ঞান ফেরার পরে সে আর বউটাকে দেখতে পায়নি। দেখতে না পেলেও ভয়টা তার মন জুড়ে রয়ে গেছে। এখনও সেই দৃশ্য মনে করে ভয়ে সে কেঁপে ওঠে। এসব কথা ডাক্তারবাবুকে সবিস্তারে বলতেই আবার একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল তাঁর কণ্ঠস্বরে, নিজের ভয়ের কথা নিজের বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখো। লোক এমনিতে ক্ষেপে আছে। আর লোক ক্ষেপিয়ে লাভ নেই।

গিয়াস মুখ নিচু করে চলে গেছে নিজের কাজে। ভূত দেখার প্রসঙ্গটায় ইতি টেনেছে সে। সকাল আটটার বাসে কৃষ্ণনগর থেকে এল জয়কিষাণ আর দুলারী। ওদের আসার সংবাদ পেয়ে ঘর থেকে ছুটে এল অবনী। এ কয়দিন তারও ঝামেলার শেষ নেই। নানা জনে নানা কথা শোনাচ্ছে তাকে। যেন যত দায় তার।

হাঁপিয়ে ওঠা অবনী বলল, তোমরা এসে গিয়েছ—যাক বাঁচা গেল! এবার একটা ফয়সাল্লা হয়ে যাবে। হাসপাতালের মানুষগুলো এবার ভয়ের হাত থেকে বাঁচবে।

তিন কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে জয়কিষাণ তার লম্বা গোঁফে হাত বোলাচ্ছিল আয়েস করে। চা-দোকানের কাঠের বেঞ্চিটাতে পাশাপাশি বসেছিল ওরা। দুলারী জয়কিষাণের বউ। সে তার ছায়া সঙ্গী। সেও সদর হাসপাতালের ঝাড়ুদার। প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগে আছে ওদের। চুলোচুলি হলেও কেউ কারোর সঙ্গ ছাড়ে না, ওরা যেন একে অপরের জন্য এ পৃথিবীতে এসেছে।

দুলারীর মাথা ভূর্তি কোঁকড়ান চুল, পেঁপে রঙের ত্বকের সাথে সেই চুলের অদ্ভুত একটা মিল খেয়ে যায়। কাজলটানা ওর চোখ দুটো কালী ঠাকুরের মতো, দূর থেকে দেখলে চোখ আটকে যাবে মেয়েলী শরীরের আঠায়। ওর হাসিটা মিছরি দানার চেয়েও মিষ্টি, মেটে রঙের ঠোঁটে তা যেন সর্বক্ষণ লেপটে আছে। ছাপা শাড়িতে দুলারী রানীর মতো বসে আছে কাঠের বেঞ্চিতে। পাশে বসে মন দিয়ে ও কথা শুনছে ওদের। হাত ভর্তি রঙ্গিন কাচের চুড়ি নড়াচড়ায় রিনঝিন শব্দ তুলছে বাতাসে। চা-দোকানী হা করে তাকিয়ে আছে দুলারীর গর্বিত বুকের দিকে। অবনী পাশে বসে মেয়েলী শরীরের সুগন্ধ নাক ভরে টেনে নেয়। কালোর মধ্যে দুলারীর নাক চোখ মুখ তীক্ষ্ণ। ও যে শালিক নয়, ময়না—এটা সে বুঝতে পারে।

সেই কোন ভোরে ঘর ছেড়েছে ওরা। অত ভোরে শুধু চা-ছাড়া আর কোনোকিছু পেটে পড়েনি

ওদের। দুলারী হাই তুলে তুড়ি মেরে হাত দুটো আকাশের দিকে তুলল, নাস্তাপানি কিছু হলে ভালো হত। এ দোকানী টোস্ট হবেক তোমার দোকানে। চা-দোকানী ঘাড় নাড়তেই দুলারী বলল, গোটা পাউরুটি হাফ করে সেঁকে তিন জায়গায় দাও। আগে কিছু পেটে যাক — তারপর চা খাব।

জয়কিষাণ গোঁফ নাচিয়ে হেসে উঠল, সেই ভালো। খালি পেটে লাশ খালাস হয় না। পেটে ডেড-বডির গ্যাস ঢুকে গেলে উলটি হবে।

দুলারী চিমটি কেটে ইশারা করল জয়কিষাণকে, সব কথা সবখানে বলা কি ঠিক?

অবনী সায় দিল তার কথায়। চা আর টোস্ট খেয়ে বিড়ি ধরাল ওরা। অবনী জয়কিষাণকে একটা বিড়ি দিতেই অভিমানে ঠোঁট ফুলাল দুলারী, আমি কি দোষ করলাম গো কর্তা? এক যাত্রায় আমি কেন বাদ যাবো?

তার কথা বুঝতে পারল না অবনী, সে বিস্ফারিত চোখে জয়কিষাণের দিকে তাকাল। জয়কিষাণ অবনীকে ঠেলা মেরে বলল, আমার বউয়ের ভাগটা দিয়ে দাও। আমরা খাবো, ও কি তাকিয়ে দেখবে নাকি?

এর অর্থ দুলারীও ধূমপান করে। মেয়েমানুষকে সে বিড়ি খেতে এর আগে দেখেনি। মেয়েরা বিড়ি খেলে কেমন দেখতে লাগবে—এই কাল্পনিক ভাবনায় সে রোমাঞ্চিত হল। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে অবনী বিড়ি এগিয়ে দিল দুলারীর দিকে ; এই নাও, ধরাও। আমার ভুল হয়ে গিয়েছে গো। আমি তো জানতাম না।

দুলারীর পুরুষ্ট ঠোঁটে হাসি ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে গেল, বিড়িতে টান দিয়ে সে বলল, নোংরা কাজে নেশা-ভাং না করলে চলে না। এসব কাজে মনটাকে একটু হালকা-ফুলকা রাখতে হয়। মন চাঙ্গা না হলে অপরের দুর্গন্ধ সাফ-সুতরো করা যায় না।

তিনজনে বিড়ি টানতে টানতে হাঁটছিল।

রাস্তার লোকে হাঁ করে দেখছিল ওদের। দুলারী আর জয়কিষাণের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই ওসবে। সামান্য অস্বস্তিতে পথ হাঁটছিল অবনী। চেনা-জানা কেউ দেখে ফেললে মুশকিল। হাজার-গণ্ডা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। মানুষের মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ অনেক সময় বিরক্তির কারণ হয় অন্যের।

অবনী দ্রুত পায়ে কদবেলতলার পাশ দিয়ে মড়িঘরের কাছে চলে গেল। রোদে থৈ থৈ করছে চারপাশ। পিচরাস্তার ওপাশে বাঁশ ঝাড়ে একটা ঘুঘু এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে। সেই একটানা শব্দে ক্লান্তির আভাস ফুটে ওঠে। অবনী যাবতীয় ক্লান্তি মুছে ফেলে মুক্তি প্রার্থনা করছিল এই বিপদ থেকে। মাত্র তিনদিনেই বিষিয়ে উঠেছে হাসপাতালের পরিবেশ। একটা বউ ঘুম কেড়ে নিয়েছে সবার। মরার আগেও বউটাকে ভয় করত সবাই। মরার পরে সেই ভয় চারগুণ ছাপিয়ে গিয়েছে। লাশ দেখে এসে হাত-পা ছড়িয়ে চারা আমগাছতলায় বসে পড়ল জয়কিষাণ। কপালের ঘাম মুছে সে বলল, এ যে পচে-গলে খতরনাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহুৎ বাস মারছে বডি থেকে। এ বাসটাই খারাপ। নাকে ঢুকলে শরীলের তাগত হারিয়ে যাবে। যা কিছু করতে হবে মুখে গামছা বেঁধে করতে হবে। তবে সবার আগে গাড্ডা খোঁড়া দরকার। আর গাড্ডার জন্য কোদাল ঝুড়ি গাঁইতির দরকার। আমরা তো এখানে খালি হাতে এসেছি। তা কর্তা, তোমাকে এসব যোগাড় যন্তর করে দিতে হবে।

অবনী সঙ্গে সঙ্গে বলল, ওসব নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না।

—তাহলে তো আর কথা নেই। জয়কিষাণ নড়েচড়ে বসল, তবে এসব কাজে নামার আগে গলা ভেজানো দরকার। দারু-পানি এখানে কোথায় মিলবেক? দেশী হলেই চলবে। অবনী হাসল, সবই পাওয়া যায় এ গাঁয়ে। শুধু টাকা থাকলেই হল। টাকা থাকলে এখানে বাঘের দুধও পাওয়া যাবে।

—তাহলে সবার আগে চলো ঐ কাজটা সেরে আসি। জয়কিষাণের কথায় অবনী খুশি হল, সেই ভালো। চলো তাহলে—।

পাকা রাস্তা শেষ হলে বাঁশবাগানের ছায়ায় ঘেরা পথ। মাটির পথ কুলবেড়িয়া হয়ে সোজা চলে গিয়েছে পলাশী। বেশি দূর নয়, বাজার ছাড়িয়ে ক' পা গেলেই বাঁশবাগানের ভেতর মাটির হাঁড়িগুলো যত্ন করে সাজানো। ওখানে দেশী মদ বিক্রির দোকানটা লোকচক্ষুর আড়ালে। বাঁশের বাতা দিয়ে বেঞ্চি বানিয়ে সাজিয়ে রেখেছে মালিক। দোকানদার থাকে একটা গুমটি দোকানের ভেতরে। পয়সা সঠিক পেলেই মদের বোতল এগিয়ে দেয় সে। নচেৎ ঝগড়াঝাটি হাতাহাতি লেগেই আছে। প্রায়ই পুলিশ আসে এখানে। হপ্তা নিয়ে চলে যায় থানায়।

জয়কিষাণ আর দুলারী বোতল কিনে একটা পিটুলি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল। সেদ্ধ ছোলা এখানে চাট হিসাবে পাওয়া যায়। তা ছাড়া চানাচুর ওদের সঙ্গে ছিল।

মদের বোতল হাতে নিয়ে জয়কিষাণ উশখুশ করছিল ছিপি খোলার জন্য। অবনী আসার পরে সে আর কালবিলম্ব করল না। নেশা করাটা তার কাছে জীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। এ কাজে অযথা বিলম্ব সে পছন্দ করে না।

তিনটে কাচের গ্লাসে মদ ঢালল জয়কিষাণ।

অবনী প্রথম থেকেই মানা করল, এসব আমি ছুঁয়েও দেখিনি জীবনে। তোমরা প্রাণ ভরে খাও। আমি তোমাদের পাশে বসে দেখব। ওতেই আমার নেশা হয়ে যাবে। হায়-হায় করে উঠল জয়কিষাণ, গলায় আফসোস ফুটিয়ে বলল, তা কি হয় কর্তা। এক জায়গায় দু-রকম বিচার হয় না গো! খেলে তিনজনে মিলে খাবো। নাহলে খাবো না টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

—অবুঝ হয়ো না। পয়সার জিনিস নষ্ট করা পাপ। অবনী বোঝাতে চাইল জয়কিষাণকে। জয়কিষাণ শোনার মানুষ নয়। সে ডানে-বাঁয়ে ঘাড় দুলিয়ে বলল, খেলে তিনজনে মিলে খাবো নাহলে খাবো না। এই নাও কর্তা, ধরো। টুকে খেলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

লাভ-ক্ষতির কথা নয়, অবনী ভাবছিল শুভ আর সরস্বতীর কথা। ওরা মাতাল মানুষকে একদম দু-চক্ষে দেখতে পারে না। মাতাল দেখলে ভয়ে সরস্বতীর গলা শুকিয়ে আসে। শুভ নাক কুঁচকে বলে, যারা মাতাল তারা দাঁতাল হাতির সমান। পাগলা হাতির যেমন কোনো জ্ঞানগম্যি নেই-মাতালেরও ঠিক তেমন দশা।

তবু চাপে পড়ে গ্লাস হাতে তুলে নিতে হয় অবনীকে। ওরা বাইরে থেকে এসেছে। ওদের সঙ্গ দেওয়া দরকার। গ্লাসে চুমুক দিতেই গা গুলিয়ে উঠল অবনীর। বমি ঠেলে উঠল গলার ভেতর। তবু হাজার চেষ্টা করে মাত্র এক ঢোক গিলল সে। তারপর গ্লাসটা নামিয়ে রাখল পাশে।

বেলা বাড়ছে, শুধু মদ খেয়ে সময় কাটালে চলবে না। ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই তাদের জন্য পথ দেখছেন। সময়ে না গেলে ভুল বুঝবেন। বাবুদের ভুল বুঝতে বেশি দেরী লাগে না।

পরপর দু'বোতল মদ গিলে দুলারী আর জয়কিষাণের হাঁটা চলার ক্ষমতা ছিল না। নেশার ঘোরে কথাও জড়িয়ে যাচ্ছিল ওদের। এসব দেখে শুনে ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল অবনীর। আসল কাজটাই যদি না হয় তাহলে কী ভাববেন ডাক্তারবাবু। দোষ তো তাকেই দেবেন।

বহু কাকুতি-মিনতির পর মাটিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল জয়কিষাণ। অবনীর শুকনো গালটা টিপে দিয়ে বলল, অত চিন্তা করো না। মাল যখন পেটে পড়েছে, তখন কাজ না মিটিয়ে আমরা যাব না।

দুলারী খিল খিল করে হাসল, কর্তা, অত ভাবনার কী আছে! এসব কাজ মাল পেটে না পড়লে হবে না। মাল হচ্ছে টনিক। টনিক খাওয়ার পর আমার গায়ের জোর দশগুণ বেড়ে যায়। তখন আমি দশটা মরদের কাজ একা করি।

দুলারীর আঁচল খসে পড়ে লুটায় ধুলোয়। ভরা শরীর ফুলে ভরা গাছের মতো শোভা পায়।

অবনী সেদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না। তার শরীরে কেমন জোয়ার আসে। বুকের ভেতর ছলাৎ-ছলাৎ ঢেউ ভাঙার শব্দ হয়। চোখ কুঁকড়ে সে ভাবে এরা জীবনটাকে ভোগ করতে জানে। এদের জীবন টবে লাগান গাছের মতো নয়। এরা জঙ্গলের ভেতর বেড়ে ওঠা আদিবৃক্ষ। অবনী হঠাৎ ধুলোয় বসে যাওয়া দুলারীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সাহায্যের জন্য। দুলারীও নিঃসংকোচে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল তার হাত। উত্তাপ বিছিয়ে দিল অবনীর পুরো শরীরে। গলায় আব্দার মিশিয়ে বলল, কর্তা, তোমার কাজ তো হয়ে যাবে। বলো, তুমি আমার একটা কাজ করে দেবে? দুলারী মোহনী চোখে তাকাল, দৃষ্টিতে লজ্জা মিশিয়ে বলল, পেটে আমার তিনমাসের ছানা। এ সময় মন করছে শুয়োরের মাংস দিয়ে ভাত খেতে। তুমি আমাকে কালো দেশী শুয়োরের মাংস খাওয়াবে কর্তা?

অবনী হাঁ-হয়ে দেখছিল দুলারীর পুরো শরীর। ওর কুঁড়ি ধরা শরীরে যৌবন-লাবণ্য কই মাছের মতো ছড়ছড় করছে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, শুয়োরের মাংস খাবে এ আর এমন কি বড়ো কথা! যাওয়ার পথে হাঁড়িপাড়া থেকে মাংস কিনে নিয়ে যাব। তুমি মুখ ফুটিয়ে খেতে চেয়েছ, তোমাকে না খাওয়ালে আমার পাপ হবে।

সব দিন শুয়োর মারে না পাড়ায়, আর মারা হলেও খদ্দের জোটে না ঠিকমতন। শুয়োরের মাংস যারা খায় সেই সব মানুষের অর্থনৈতিক সামর্থ্য বড়ো কম এ গ্রামে। অবনী জানত সে গিয়ে দাঁড়ালেই সের দুয়েক মাংস অবশ্যই পেয়ে যাবে। কাছে এত টাকা নেই, তবু টাকার জন্য আটকে যাবে না কেনাকাটি। এ পাড়ার সবাই তাকে চেনে, মান্য করে। ধার দেওয়া নিয়ে তাদের কোনো সংশয় নেই মনে।

পাকা রাস্তায় ওদের দাঁড় করিয়ে অবনী চলে গেল পাড়ার ভেতর। ফিরে এল হাসি মুখে। পাতায় জড়ানো মাংস'র পুঁটলি দুলারীর হাতে দিয়ে সে বলল, মাংস আমি এনে দিলাম। তোমাকে এবার রেঁধে-বেড়ে খেতে হবে।

—কেন তোমার বউ?

দুলারীর প্রশ্নে স্মিত হাসল অবনী, সে শুয়োরের মাংস ছুঁয়েও দেখে না। এমনিতে খাসীর মাংস খেতেই ঘেন্না, তার উপরে শুয়োর শুনলে আমার অবস্থা দফা-রফা করে ছেড়ে দেবে। তবে কেউ খেলে তাকে সে মানা করবে না।

—তাহলে তো তোমার ঘরে যাওয়া যাবে না। দুলারী আশাহত হল, বৌদি এত শুচিবাই আমি জানতাম না। জানলে আর ওই আব্দার তোমার কাছ করতাম না। অবনী তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, সব মানুষ তো একরকম হয় না। তবে তোমার বৌদি কারোর ক্ষতি করতে জানে না। সে নিজের খেয়ালে থাকে অন্যের পেছনে লাগার স্বভাব তার নেই।

—তুমি দেখছি ভাগ্যবান। দুলারীর কণ্ঠস্বর নেমে এল খাদে।

কোপে কোপে মাটি কাটছিল জয়কিষাণ, ঝুড়িতে করে তা ফেলে আসছিল অবনী। দুলারী কাপড় গুছিয়ে নিয়েছে ধুতি পরার মতো। কাজের জন্য টগবগ করছে সে। একটু আগের নেশা উড়ে গিয়েছে কোথায়। সে এখন সুস্থ মানুষের চেয়েও স্বাভাবিক। ডাক্তারবাবু আর হাসপাতালের ড্রাইভার চিত্রভানু এসে দাঁড়িয়েছে কাজ দেখার জন্য। ওরা মাঝে মধ্যেই উৎসাহ দিচ্ছে জয়কিষাণকে। মাটি কাটার তোড়ে গা বেয়ে ঘাম নামছে। তবু তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। বোঝা যাচ্ছে সে কত কাজপাগল মানুষ।

দুলারী ঘাসের উপর থেবড়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে টানছিল। ধোঁয়া উগলিয়ে সে অবনীকে বলল, হাঁপু লাগলে ঝুড়িটা আমাকে দিয়ে দিও। আমি তখন মাটি ফেলব। তুমি তখন বিশ্রাম নিও।

কোনো কথাই কানে ঢুকছিল না অবনীর। কাজের সময় সে একটা বুনো মানুষ। তবু মাঝে মাঝেই

মনে পড়ছিল তার সরস্বতীর কথাগুলো। শুয়োরের মাংসগুলো নিজের হাতে নিল না সে, তর্জনী উঁচিয়ে বলল, ঐ চৌবাচ্চার ধারে রেখে আসো। এ মাংস আমি ঘরে ঢোকাব না। তুমি সব জেনে-শুনেও ঘরে এনেছ। তুমি দেখছি ঘরে শান্তি ফিরুক চাও না।

অবনী অপরাধীর মতো বলেছিল, সদর থেকে ওরা এসেছে, ওরা খাবে।

—সে খাক। কিন্তু কে রান্না করবে? হাঁড়িকুড়িই বা পাব কোথায়?

—আমি মাটির হাঁড়ি এনে দিচ্ছি।

এবার জ্বলে উঠেছিল সরস্বতী তুমি দেখছি ঘরটাকে হোটেল বানিয়ে ছাড়বে। তোমার মতো ঘর জ্বালানো পর ভুলানো মানুষ আমি আর জীবনে দুটি দেখিনি। অবনী স্তব্ধ হয়ে গেল কথা শুনে। সরস্বতী ফি কথায় ভুল বোঝে তাকে। মন খারাপ করে অবনী ফিরে এসেছে কাজে।

গাঁয়ের বাজারে কোনো হোটেল নেই। দুটো মানুষ খাবে কোথায়? এই চিন্তায় কাজের গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছিল অবনীর। কোথাও কিছু না পেলে শেষপর্যন্ত হাসপাতালের কিচেন ঘরে খাওয়ার ব্যবস্থা করবে সে। জয়কিষাণ আর দুলারী এসেছে সরকারি কাজে। ওরা কিচেনে খেলে কেউ ওদের মানা করবে না। বরং খুশি হবে সবাই। ওরা সবার কাজে এসেছে। ওরা না এলে ভয়ের জীবাণু উড়ত হাসপাতালের কোণায় কোণায়।

একমানুষ মাটি কেটে হাঁপিয়ে পড়েছিল জয়কিষাণ। দুলারী চটের থলি থেকে মদের বোতলটা এগিয়ে দিল ওর দিকে। গলা ভিজিয়ে ছিপি বন্ধ করে আবার বোতলটা ফিরিয়ে দিল জয়কিষাণ। দুলারী ছিপি খুলে দু'ঢোক মেরে নিয়ে ঢেঁকুর তুলে বলল, আজ খুনোখুনি রোদ উঠেছে। আর দেরী করা ঠিক হবে না। এবার যাও মড়িঘর থেকে লাশ নিয়ে আসো। যাওয়ার আগে ভালো করে মুখে গামছা বেঁধে নিও। পচা লাসের গ্যাসটা ভেষণ খারাপ।

হাসপাতাল থেকে ব্লিচিং পাউডার আনিয়ে রেখেছে অবনী। ব্লিচিং পাউডারের ঝাঁঝাল গন্ধে মশা মাছি পোকামাকড় কাছে ঘেঁষতে পারবে না। দুর্গন্ধ থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যাবে।

মড়িঘর থেকে চ্যাং-দোলা করে লাশ বয়ে আনল জয়কিষাণ আর অবনী। সামান্য পথ তবু হাঁপিয়ে গেল ওরা। কপালের ঘাম মুছে জয়কিষাণ রসিকতা করে বলল, মরে গেলে মানুষের ওজন বুঝি বেড়ে যায়। কী ভারী লাশ! হাতের কলকব্জা ক্ষয়ে যাবার যোগাড়।

অবনী হা-করে দেখছিল বউটার মুখ। কী গায়ের বর্ণ-চোখ ফেরান যায় না। এ যে চড়ুই নয়, বনটিয়া। মনে মনে বিড়বিড়িয়ে উঠল সে। চেহারা দেখে অনায়াসে বোঝা যায় বড়ো ঘরের বউ। কাদের ঘরের বউ? কি দোষ করেছিল সে? রোগজ্বালা কি দোষের?

মুখে গামছা বাঁধা অবস্থায় অবনী বসে পড়ল ঘাসের উপর। সে দেখতে চায় না তবু তার চোখ বারবার করে চলে যায় বউটার মুখের উপর। বুকের খোদল থেকে কান্না গুমরে উঠছে বাধা পাওয়া বানের জলের মতো। বউটা তার কেউ হয় না তবু এই কান্নার বেগ তাকে বড়ো অসহায় করে তোলে।

দুলারীর চোখ এড়ায় না কোনো কিছু। সে অবনীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলে, কর্তা, তোমার চোখে জল এসেছে। গামছার খুঁট দিয়ে মুছে নাও গো। পরের জন্য কাঁদা ভালো স্বভাব। তুমি যে ভালোমানুষ এ নিয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

অবনী কোনো কথার উত্তর দিতে পারে না। কথা বলতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে তার দুর্বলতা। চোখের কুল ছাপিয়ে অসহায় হয়ে পড়বে সে।

অবনী হাত এলিয়ে দিয়েছে মাটির উপর। জয়কিষাণ বলল, কর্তা, মাছি উড়ছে। দুর্গন্ধে টেঁকা যাচ্ছে না। যা করার তাড়াতাড়ি করো। কবর দেওয়ার কাজটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিলে আয়েশ করে দু-ঢোঁক মারা যাবে।

অবনী দেখল—শবদেহ দেখার জন্য হাত দশেক দূরে ভিড় জমিয়েছে উৎসাহী মানুষের দল।

তার মধ্যে সবুজ আর শুভকে দেখতে পেল সে। ভয়ে শিউরে উঠল তার শরীর। মারণব্যাধি বসন্ত ছোঁয়াচে রোগ। ওরা এখানে কেন এল এ সময়। অবনী বিরক্তিতে এগিয়ে গেল ওদের সামনে। চাপা ধমক দিয়ে বলল, এখানে এসেছিস কেন? যা পালা।

শুভ চলে যাচ্ছিল। কিছুটা গিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল। অবনীর চোখে চোখ রেখে সে বলল, মা বলেছে ঘরে খেতে। সদর থেকে যারা এসেছে তারাও আমাদের ঘরে খাবে। মা ওদের জন্য রান্না করছে। কাজ মিটে গেলে তুমি ওদের নিয়ে ঘরে যেও।

মেঘলা আকাশ সরে গিয়ে যেন রামধনু ফুটল অবনীর মনে। এটাই মনে মনে সে প্রার্থনা করেছিল। অতিথির সম্মান রক্ষা পেলেই গৃহস্বামীর মর্যাদা বাড়ে। এই বোধ এবং বিশ্বাসে তার অন্তরাত্মা পূর্ণ। সরস্বতী হয়ত তার ব্যথিত মনের আঁচ পেয়েছে। নাহলে সে যা জেদী মেয়ে পরের জন্য রান্না করতে যাবে কেন? ও বরাবরই নাক উঁচু স্বভাবের মেয়ে। এক ঝলক দেখলে লোক ভাববে—বউটা ভীষণ অহঙ্কারী।

কাজ মিটে গেল চটজলদি।

দা-দিয়ে শ্যাকুল গাছের ঝোপ কেটে আনল দুলারী। ওগুলো কবরে পুঁতে দিয়ে সে বলল, শেয়াল এসে আবার লাশ না তুলে ফেলে। কর্তা, তুমি আধলা ইট কয়েকটা খুঁজে আনো। ইট আর কাঁটা চাপা দিলে শেয়ালের বাপের ক্ষমতাও হবে না লাশ তুলে ফেলার। তাড়াতাড়ি করো কর্তা, আমাদের আবার বাস ধরে ফিরে যেতে হবে। সাঁঝের মধ্যে ঘর না ফিরলে ঝামেলা।

—খাবে না? তোমার জন্য এত কষ্ট করে রান্না করল আমার বউ। অবনী গর্বিত দৃষ্টি মেলে তাকাল।

জয়কিষাণ বলল, নিশ্চয়ই খাবো। না খেয়ে কোথাও নড়ব না। যা ধকল গেল অনেকদিন মনে থাকবে।

পাল পুকুরে সাবান ঘষে চান করল দুলারী আর জয়কিষাণ!

অবনীও বার দশেক ডুব দিয়ে পাড়ে উঠে এসে দেখল পদ্ম দাঁত টিপে হাসছে তার ভেজা গতর দেখে। তার দৃষ্টি জোঁকের মতো লেপটে গেল শরীরে।

কেঁপে উঠল অবনী, কিছু বলবা?

—অনেকদিন আমার ওখানে আসোনি। আমার উপর বুঝি রাগ হয়েছে। রোদে ঝলসে যাওয়া পদ্মের মতো মুখ নীচু করে দাঁড়াল স্বামীখেদান বউটা।

—না, না রাগ করব কেন? অবনী বলল, সময় পাইনে। সময় পেলে ঠিক যাব।

দুলারী ভেজা শরীরে পাড়ে উঠে এল পানকৌড়ি পাখির মতো। গলায় রহস্য মাখিয়ে বলল, কর্তা, এ বউটা কে গো? এর চোখে তো পীরিতের আঠা। সাবধানে থেকো। জড়িয়ে গেলে সংসারে আগুন ধরে যাবে। তোমার যা বউ টের পেলে তোমাকে শেষ করে দেবে।

বিষণ্ণ হাসল অবনী। এড়িয়ে গেল সব কথা।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চুকতে বেলা গড়িয়ে গেল অনেকটা।

লাট্টু খাওয়া-দাওয়া সেরে গল্প করার জন্য এসেছে অবনীর ঘরে। এ কথা সে কথার পরে সে বলল, বাঁশতলায় কী কাজে যেন গিয়েছিলাম। ফেরার সময় দেখি 'জল জল' বলে কে কাঁদছে। বাঁশ পাতা উড়ছে ফরফরিয়ে পাখির মতো। ভয়ে জান নিয়ে পালিয়ে এসেছি। আর ভুল করেও ও দিকে যাইনি।

অবনী জোর গলায় বলল, ওসব তোমাদের মনের ভুল ধারণা। মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে বউটা। যা কষ্ট পেয়ে মরেছে—ও আর এ পৃথিবীতে আসবে না।

দুলারী হি-হি করে হেসে উঠল কথা শুনে। অবনীকে সমর্থন জানিয়ে গায়ে চাঁটি মেরে বলল, তুমি ঠিক বলেছ কর্তা। মেয়েমানুষ একবারই জন্মায়, একবারই মরে। বারে বারে সে কষ্ট ভোগ করতে আসে না।

দুলারীর ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে আসা ভালো চোখে দেখল না সরস্বতী। সে চাইছিল এরা যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হয় ততই ভালো। এত গায়ে পড়া মেয়েমানুষ তার ভালো লাগে না। ওদের চোখে পুরুষ ধরার ফাঁদ আছে। যে কেউ আটকা পড়তে পারে সেই ফাঁদে। তখন ভেসে যাবে তার সাজানো সংসার। অবনীর মতো ভালো মানুষকে ফাঁদে ফেলতে বেশি সময় লাগবে না দুলারীর মতো মেয়েদের। সরস্বতীর চোখের তারা কটকটিয়ে উঠল।

দুলারী জর্দা-পান মুখে পুরে বলল, মান্‌সোটা বড়ো ভালো রেঁধেছ বৌদি। যদি বেঁচে থাকি তাহলে আবার আসব তোমার হাতের মান্‌সো রান্না খেতে। অনেক দিন মনে থাকবে তোমাদের কথা। ছোট কাজ করেও মনটা তোমরা বড়ো রেখেছো দেখে ভালো লাগল। তোমাদের কথা আমি ওখানে গিয়ে জনে জনে গল্প করব। যাওয়ার সময় জয়কিষাণ শুভর হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বলল, এই টাকাটা রাখো। তোমাদের জন্য কিছু আনতে পারিনি, খালি হাতে চলে এসেছি।

শুভ টাকাটা নেবে না। শেষে অবনী বলল, নে। জ্যাঠা দিচ্ছে। না নিলে দুঃখ পাবে।

সন্ধের বাসে ওরা ফিরে গেল সদরে। মাথা হেঁট করে পিচ রাস্তা থেকে একা ফিরে এল অবনী। এত ধকল সহ্য করার পরেও আজ তাকে নাইট ডিউটিতে আসতে হবে। তার হয়ে ডিউটি করার কেউ নেই। অতসী দিদিমণি বলেছেন, অবনী না এলে আজ ছুটি নিয়ে নেবেন।

ডাক্তারবাবু তাই সমস্যায় পড়েছেন। অবনীকে ডেকে বললেন, আমি খবর পেয়েছি সব কাজ মিটে গেছে। তুমি আজ যা করলে আমার তা মনে থাকবে। একটা অনুরোধ তোমাকে। অতসী দিদিমণি একা 'নাইট' করতে পারবে না। অন্তত আজকের মতো তুমি 'নাইট'টা করে দাও। কাল থেকে পরপর দু-দিন ডিউটি না করলেও চলবে।

অবনী ঘাড় নেড়ে বলল, ঠিক আছে। আমি সময়মতো ডিউটিতে চলে আসব। আপনি দিদিমণিকে বলে দেবেন।

রাত বারোটার পরে শুনশান হয়ে গেল হাসপাতাল চত্বর। চামচিকি আর বাদুড়ের দৌরাত্ম্য বাড়ে তখন। বাবলাগাছে বসে পেঁচা ডাকে একনাগাড়ে। মড়িঘরের পায়রাগুলো কাঠ হয়ে পড়ে থাকে অন্ধকারে। অত উঁচুতে বেড়াল উঠতে পারে না, না হলে একে একে ধরে খেয়ে ফেলত ওরা।

ডিউটি আসার সময় সরস্বতী বাতাবীলেবু তলা অব্দি এগিয়ে দিল তাকে। ফিরে যাওয়ার সময় বলল, গিয়ে বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়বা। অন্যের জন্য তোমার আর বাহাদুরী দেখিয়ে লাভ নেই। তোমার কিছু হয়ে গেলে আমাদের দেখার কেউ নেই। ফলে বুঝে শুনে চলবে। লোকের তালে তাল মিলিয়ে নেচো না।

সরস্বতী শুকনো মুখে ফিরে গেল। তার ভাবনা বারবার ছুঁয়ে যাচ্ছিল অবনীকে। যত দিন যাচ্ছে সরস্বতী যেন বুঝে নিতে চাইছে তার দায়িত্ব। অবনীর এসব ভালো লাগছিল ভাবতে। একটা মেয়েমানুষ ধীরে ধীরে তার ভাবনার শরিক হয়ে উঠছে এটাই বা কম পাওয়া কিসে? তার বেশি কিছু চাওয়ার নেই। একটু সুখ পেলে সে দম ছেড়ে বাঁচে। অন্তত গর্ব করে বলতে পারে—আমাদের সংসার। এই সংসারের ভালো হোক, মঙ্গল হোক।

বিছানা পেতে এই সব আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুম এসে গিয়েছিল অবনীর তা আর মনে নেই।

'জল জল' আর্ত-চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল তার। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল দেহ। চোখ খুলতে সাহস

হচ্ছিল না তার। কে যেন ঘাড়ের উপর ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ছাড়ছে। কান খাড়া করে সে আবার শুনতে পেল সেই একই স্বর। আশে পাশে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই, শুধু ভয়ের ছায়ামূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অতসী দিদিমণি। কাঁপতে কাঁপতে বলছেন, খেতে না পাই সে-ও ভালো, এই হাসপাতালে আর একদিনও ডিউটি করা নয়। অবনী চলো—আমরা ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলি। তিনি বিচক্ষণ মানুষ। তার কাছে নিশ্চয়ই সুবিচার পাব।

তাদের যাওয়ার পথ আটকে দেয় চিত্রভানু, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার।

বেশ উত্তেজিত গলায় তিনি বললেন, ভূত আমি ধরে ফেলেছি। আপনাদের আর ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। পিছন ঘুরে তিনি গলা ধাক্কা দিয়ে মেঝের উপর ফেলে দিলেন কানুকুড়োকে। পড়েই কিছুদুর ছেঁচড়ে গেল বুড়োটা। তারপর নাকি সুরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ভূত-ফুত কিছু নেই গো, আমি হলাম সেই আসল ভূত। ডাক্তারবাবু হাসপাতালের খাতা থেকে আমার নাম কেটে দেবেন বলেছেন। নাম কেটে দিলে আমি ঘরে গিয়ে খাবো কী? আমার যে বড়ো খিদে পায়। খিদে পেলে আমার কোনো জ্ঞানগম্যি থাকে না। নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমি ভূত সেজেছি গো! ছোটবেলায় পাখপাখির ডাক নকল করে ডাকতাম। কুকুর ছাগল বেড়াল সব কিছু ডাকতে পারতাম অনায়াসে। সেই ছোটবেলার হরবোলা- বিদ্যে বাঁচার জন্যি কাজে লাগাই। বউটা মারা যাওয়ার পর ওর গলাটা আমি নিজের গলায় তুলে নিলাম। এতেই কাজ হল। ক'টা দিন তো থাকতে পারলাম হাসপাতালে।

চিত্রভানু ডাক্তারবাবুকে ওই রাতে ডেকে আনলেন হাসপাতালে। ভূত ধরা পড়েছে—এটা কোনো সামান্য খবর নয়। চিত্রভানু সারারাত মশার কামড় খেয়ে অন্ধকারে লুকিয়েছিলেন হাসপাতালে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে লোহার খাট থেকে নেমে আসে কানুকুড়ো। অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে সে চলে যায় বাথরুমে। ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের বিজ্ঞাপনের টিনগুলোর উপর চড়ে বসে সে। তারপর গলায় হাত ঢুকিয়ে শুরু করে তার অদ্ভুতবিদ্যা। অবিকল মেয়েলী গলায় 'জল-জল' বলে কাঁদতে থাকে সে। বার কয়েক কেঁদে-কঁকিয়ে সে আবার নেমে এসে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

ঘটনাটা প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল চিত্রভানুর। অত বড়ো মেল-ওয়ার্ডে কানুকুড়ো ছাড়া আর কোনো রুগী নেই। এটাও তাঁর সন্দেহের অন্য একটা কারণ। কানুকুড়োর সঙ্গে দিনের বেলায় কথা বলেছেন তিনি। ভূত নিয়ে তার ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গল্প বলার ধরণ মনে সন্দেহের একটা দাগ কেটে দেয়।

সেই থেকে তক্কে তক্কে ছিলেন চিত্রভানু। মওকা বুঝে বুদ্ধি খেলিয়ে ঠিক তাকে ধরে ফেলেন তিনি।

সমস্ত ঘটনা শুনে তাজ্জব হয়ে যান ডাক্তারবাবু। অবনীর মুখেও কোনো কথা সরে না। সব শুনে রাগে ফুঁসছেন অতসী দিদিমণি। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, একে কোনোমতেই ক্ষমা করা উচিত হবে না। এর জন্য আমার হার্ট-স্ট্রোক হয়ে যেত ভয়ে। ঈশ্বরের অশেষ দয়া যে বেঁচে গেছি! হাঁফ ছেড়ে অতসী দিদিমণি বললেন, এই পাপীটাকে থানায় দিন, ডাক্তারবাবু। হাসপাতালের ভাত খেয়েছে, এর এবার জেলের ভাত খাওয়া দরকার। নাহলে শিক্ষা হবে না বুড়োটার।

থানা-পুলিশের কথা শুনে ভয়ে গলা ফাড়িয়ে কেঁদে উঠল কানুকুড়ো। ছুটে গিয়ে সে জড়িয়ে ধরল ডাক্তারবাবুর পা।

—না খেয়ে মরব সে-ও ভালো, আর কোনোদিন হরবোলা সাজব না গো। আমারে ছেড়ে দিন গো, আমারে ছেড়ে দিন....। কান্নায় ভেঙে পড়ল কানুকুড়ো। পরের দিন ভোর হওয়ার আগে কানুকুড়োর আর কেউ দেখা পায় না। বুড়ি এসে হাসপাতালের দোরগোড়ায় কাঁদে আর কপাল ঠোকে।

রস চুরি করতে গিয়ে গিয়াসের হাতে ধরা পড়ে গেল সবুজ আর শুভ। বাঁকের ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে দিত গিয়াস, শুভ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে তার হাত চেপে ধরল, কাকা, মেরো না গো। যাকে তুমি মারবে সে তো টিকেদারবাবুর ছেলে সবুজ।

গিয়াসের উত্তেজনায় জলের ছিটে পড়ল তবু রাগের ঝাঁঝ কমল না, যার ছেলেই হোক চুরি করার শাস্তি পেতেই হবে। টাকা দিয়ে গাছ কিনেছি আমি। রাত জেগে ঘরদুয়ার ছেড়ে পড়ে আছি অপরের পেট ভরানোর জন্য নয়। গরম নিঃশ্বাস পড়ছিল গিয়াসের বুক চুঁইয়ে, হাঁপিয়ে উঠে সে বলল, ক'দিন থেকে আমার ঠিলিতে পেরেক পুঁতে চলে যাচ্ছে কেউ। গেল সপ্তাহ এক সেরও গুড় পাইনি। এভাবে লস হলে আমারই বা চলবে কি ভাবে? আমাকে তাহলে গলায় ফাঁস নিয়ে মরতে হবে। ঘরে-বাইরে এত বিপদ আমি আর সামাল দিতে পারছি না। বাঁকটা পাশে নামিয়ে রেখে ডুকরে উঠল গিয়াস।

গেল হপ্তায় খরচাপাতি নিয়ে ঘর গিয়েছিল সে। ভেবেছিল ছেলেটার চাঁদমুখে চুমা খেয়ে রাতটা নাফিজার সঙ্গে কাটিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু এ কী দেখল সে নিজের চোখে!

বিকেল বেলায় মকবুলকে নিয়ে শুয়েছিল নাফিজা। লুঙ্গি পরা মকবুল অসময়ে তাকে দেখে বাঘ দেখার মতো চমকে ওঠে। তক্তপোষের এক পাশ থেকে জামাটা তুলে নিয়ে সে ঘর থেকে ছিটকে গিয়েছিল রকেটগতিতে। যাওয়ার সময় সে তার সিগারেটের প্যাকেট আর ম্যাচিস বাক্স ফেলে গেল। আর নাফিজার অবস্থা চোখে দেখা যায় না। তার ভরা শরীরের সম্পদ নুয়ে পড়া স্তন যুগলে দু-হাত চেপে অসহায় চোখে সে তাকিয়েছিল গিয়াসের দিকে। তক্তপোষে পড়ে থাকা ছাপা শাড়িটা টেনে নিয়ে সে যে বুকে চাপা দেবে তার এমন ক্ষমতা ছিল না।

হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল নাফিজা।

বাঁচার কোনো পথ না পেয়ে সে দৌড়ে এসে পা চেপে ধরেছিল গিয়াসের। চোখের জলে পা ভিজিয়ে দিয়ে বলেছিল, ইবলিশটা জোর করে আমাকে ছিঁড়ে খেল। আমি কতদিন আর বাঁধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখব। গেল হপ্তায় তুমি ঘর আসোনি। এ হপ্তায় ঘর আসবে কিনা কোনো খবর পাইনি। আমার তো রক্ত-মাংসের শরীল। আমি হেরে গেছি গো। আমাকে মারো ধরো যা খুশি করো। আমি আর কোনো রা কাড়বোনি।

নাফিজা সময়ের সাথে নেচে কেঁদে মান-অভিমান করে মানিয়ে নিল নিজেকে। এত বড়ো চোট সামাল দেওয়া মুখের কথা নয়। গিয়াস বোবা হয়ে গিয়েছিল ক' মুহূর্ত। তারপর হুঁশ ফিরতেই সে ছুটে গিয়েছিল চোরাকুঠুরীর ঘরে। পাটে দেওয়া বিষতেল নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছিল নাফিজার কাছে। ছিপি খুলে মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, আমি মরলে তোর পথের কাঁটা সরে যায়। আমি মরে তোকে বাঁচিয়ে যাব। এই দেখ—।

নাফিজা চিলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই বিষডিবার উপর। টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল উঠোনে। তারপর গিয়াসের বুকের উপর চড়ে বসে পাগল-চুমায় ভরিয়ে দিয়েছিল তার শরীর। বাধা দেওয়ার কোনো ক্ষমতা ছিল না গিয়াসের, নারী হাতের কোমল স্পর্শে তার শিথিল শরীরের শিরাগুলো টান টান হয়ে উঠেছিল ধনুকের ছিলার মতো। নাফিজার দক্ষ শরীরী খেলায় এক সময় হেরে গেল গিয়াস। বুক উজাড় করে নিজের সর্বস্ব দিয়ে গিয়াস মুখের ঘাম মুছে শুধু একবার

তাকিয়েছিল নাফিজার সুন্দর মুখের দিকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু বলতে গেলে শঙ্খলাগা ভঙ্গিতে নাফিজা ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে যেন নামিয়ে আনে শালগাছের মতো শরীর, তারপর দুচোখে দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন এঁকে বলে, এরপরে আর কোনো প্রশ্ন করো না। খোদাকসম, আমি তোমার কোনো কথার জবাব দিতে পারব না কেননা জবাব আমার জানা নেই। আমার যা ছিল তা সব দিয়ে আমি তোমার রোজা ভাঙলাম। এবার আমাকে মারতে হলে মারো, কাটতে হলে কাটো। আমি মুখ দিয়ে টুঁ শব্দও করব না।

নাফিজার যাদুটোনা মনের জয় হল।

হাসপাতালের ছাউনীতে ফিরে এসে বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল গিয়াসকে। সে তো ভালোবাসার কাঙাল। নাফিজার মন থেকে মকবুলকে সে মুছে দিতে পেরেছে—এর চেয়ে বিরাট জয় আর কি হতে পারে। গিয়াসের অন্ধকার মনের বনে হাজার ছোট ছোট ফুলের আলো আর সুগন্ধে মাতোয়ারা পাগল ভ্রমর যেন সে। তার আর কোনো দুঃখ কষ্ট নেই। এবার সে রাতের পর রাত জাগতে পারবে বিনা ক্লান্তিতে।

নাফিজার এই পরিবর্তন ভালো নজরে নেয়নি মকবুল। সে লোক লাগিয়ে পেরেক দিয়ে মাটির ঠিলি ফুটো করে দিল গিয়াসের। ধরাও পড়ে গেল কিচেন ঘরের সামনের বেঁকা গাছটায়। হাতের বাঁক সেদিন ক্ষমা করেনি গিয়াসের। এক চোটেই ব্যাঙের মতো গাছ থেকে ঠিকরে পড়েছিল মকবুল। কপাল ফেটে রক্ত ঝরছিল ফিনকি দিয়ে। শেষে হাসপাতালের বেডে তার জায়গা হল। ডাক্তারবাবু পরপর সাতটা সেলাই দিলেন তার কপালে।

মকবুল এখন ফাটা কপাল নিয়ে ঘোরে।

নাফিজা গোয়াল পালানো গোরু, বনে-বাদাড়ে গিয়েও দুধ দিয়ে আসে। এর ওর মুখে খবর পায় গিয়াস। যে মেয়েমানুষের স্বভাব কুকুরের লেজের মতো তাকে কোন মন্ত্রে সিধা করবে গিয়াস—তা তার জানা নেই। তার মনে একটাই আক্ষেপ। খোদাতালা তার কপালে সুখ লিখে পাঠায় নি।

গিয়াসের কাছে রস জ্বাল দেবার কাজে লেগেছে রঘুনাথ। শুভই ঠিক করে দিয়েছে কাজটা। কথায় কথায় গিয়াস একদিন বলছিল, ভালো ছেলে পেলে বলো তো। একার দ্বারা দশ দিক দেখা যায় না। সারা রাত জাগি। দুপুরে একটু গড়িয়ে নিলে আরাম হয়। তাহলে রাতটা আবার জাগা যায়। যা চোরের উৎপাত, আর পারচি নে গো।

ফুট-রস খেতে এসে শুভর রঘুনাথের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল, কাকা, একটা ভালো ছেলে আছে। আমি তাকে খবর পাঠাব।

—দেখো, যত তাড়াতাড়ি হয়। সিজিন ফুরিয়ে গেলে কাজে লাগিয়ে আর কি লাভ হবে!

সেদিন গুয়ারামকে সাথে করে রঘুনাথ এসেছিল হাসপাতালে। ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার সময় কদবেলতলায় রঘুনাথের সঙ্গে দেখা হল শুভর। শুভ টিউশনি সেরে ঘরে ফিরছিল। রঘুনাথ তাকে দেখতে পেয়ে সাইকেল থেকে নামল। একগাল হেসে বলল, আজ আর তোদের ওখানে যাওয়া হল না। বাবার শরীর খারাপ। জ্বর ছাড়ছে না। ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে ঘর ফিরছি।

গুয়ারাম ঘোলাটে চোখে দেখছিল শুভকে। ছেলের বন্ধু বলে নয়, শুভকে তার ভালো লাগে নানা কারণে। কদবেল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গুয়ারাম বলল, কিছু মনে করো না। পরে আবার কোনো একদিন আসব। আজ আর শরীলটা ভালো লাগছে না। আজ চটপট ঘরে গিয়ে আরাম করব।

রঘুনাথ দুঃখ করে বলল, হাতে আমার কাজ নেই। খুব অভাব চলচে সংসারে। কাজটা যদি হয় তো দেখ।

—তাহলে বিকেলে চলে আয়। আমি তোর সাথে যাবো কথা বলতে। শুভ বলল। বিকেলে সময় করে এসেছিল রঘুনাথ। তার হৃষ্টপুষ্ট চেহারা দেখে পছন্দ হয়েছিল গিয়াসের। খাওয়া-পরা আর মাস গেলে থোক কিছু টাকা দেবে সে। বিনিময়ে হাড়ভাঙা খাটুনী খাটতে হবে তাকে। রাতে রসের ঠিলি পাহারা দিতে হবে তাকে। গুড় জ্বাল দিতে হবে সকালে। প্রয়োজন হলে হাটে গুড় নিয়ে বসতে হবে দু'বেলা। সব শর্ত মেনে নিয়েছে রঘুনাথ। পেটের দায় মহাদায়। এখানে পিছিয়ে গেলে খাদে গিয়ে পড়তে হবে।

হাসি মনে কাজটাকে মেনে নিয়েছে রঘুনাথ। শুভকে বলেছে, জিরেন কাট রস খেতে মন হলে আসিস। মালিককে বলে তোদের মন ভরে খাইয়ে দেব। জানিস তো গিয়াস- কাকা লোক হিসাবে বেশ ভালো। মনটাও উদার। কাউকে মুখের উপর না বলতে শেখেনি।

এমন একটা কাজের ছেলের খোঁজে ছিল গিয়াসে। রঘুনাথকে পেয়ে তার একটু আরাম হয়েছে। ফি-রাতে সে গাঁয়ের ঘরে চলে যায় সাইকেল চালিয়ে। এক ঘুম দিয়ে ভোর ভোর ফিরে আসে। তখন বেশ ঝরঝরে লাগে শরীর। নাফিজারও সুখ ঝরে পড়ে শরীর থেকে। রঘুনাথ সাতসকালে ভাঁড় নামিয়ে কড়াইয়ে চাপিয়ে দেয় রস। গুড় হয়ে গেলে ভাঁড় ধুয়ে খড়ের ধোঁয়া দেয় প্রতি ঠিলিতে। গিয়াস পাটালিটা বানায় নিজের হাতে। গুড়ের পাক দেখে নামানো দরকার। দানা না হলে পাটালি জমবে না। আর পাটালি না জমলে দাম পাবে না। তখন এত পরিশ্রম বৃথা যাবে।

রসের ঠিলি পাহারা দিতে গিয়ে হাবুল চোরের সাথে রঘুনাথের দেখা হল ভোর রাতে। কারোর সর্বনাশ করে ঘরে ফিরছিল সে। মাথায় কাঁসার ভর্তি-বোরা। ঠনর-ঠনর আওয়াজ হচ্ছিল হাঁটা চলায়। দূর থেকে তাকে দেখে ছুটে এসেছিল রঘুনাথ, গলা উঁচিয়ে বলেছিল, কে যায় গো? মাথায় বস্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল হাবুল চোর। হাতের ইশারায় কাছে ডেকেছিল রঘুনাথকে। চাপা গলায় বলল, বোরাটা নামিয়ে দে দেখি মাথা থেকে। সেই কোথা থেকে হেঁটে আসচি। ঘাড় লেগে গেচে, যন্ত্রণা হচ্চে।

—তুমি কে? রঘুনাথের প্রশ্নে দাঁতে দাঁত ঘষে হেসেছিল হাবুল চোর, তুই আমাকে চিনবি কি করে? তোর বাপ–ঠাকুর্দা চেনে। চেনে তোর কাকা লুলারাম। আর চেনে থানা-পুলিশ-দারোগা-চৌকিদার। আমাকে চেনে না এ গাঁয়ে এমন মানুষ আচে নাকি? হাবুল চোর দাঁত টিপে হাসল। রঘুনাথ খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল উত্তর শুনে। হাবুল চোর তার বিস্ফারিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমার নাম হাবুল চোর। অনেকে বলে, পাঁকাল মাছ। সিঁদ কাটায় এ তল্লাটে আমার মতো কেউ নেই। আমি ঘুমপাড়ানী মন্ত্র জানি। সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে আমি কাজ হাসিল করে বেরিয়ে আসি। আমি হলাম গিয়ে রেতের বনবেড়াল।

—আজ কার আবার কপাল পোড়ালে? রঘুনাথের প্রশ্নে আবার এক চোট হাসল হাবুল চোর। মাথা চুলকে বলল, আজ বেশি দুর যাইনি। ঘরের কাছেই কাজ হয়ে গেল। কাঁসা-পেতল ছাড়া টাকা-পয়সা সোনাদানা কিছু পাইনি। কাঁসা-পেতলে আজকাল আর দাম পাওয়া যায় না। ঝুঁকি অনেক। এসব মাল এখানে কাটবে না। বেথুয়া নয়ত পলাশী নিয়ে যেতে হবে। নাহলে মাল কাটানো যাবে না। তার উপর ধরা পড়ে গেলে ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে গাঁয়ের মানুষ ডুগডুগি বাজাবে। ভয়ে ভয়ে জীবন কাটেরে ব্যাটা...। কী করব, পেটের দায়।

—এক বস্তা কাঁসা-পেতল কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখবা গো? ভয়ে চোখ ছোট হয়ে আসে রঘুনাথের। হাবুল চোর ভ্রূক্ষেপহীন, ঝোপে-ঝাড়ে রাখার কি জো আছে বাপ! আগে ঝোপে-ঝাড়ে রাখতাম। এখন পুকুরে ডুবিয়ে রাখি। পুলিশের বাবাও টের পাবে না। সময়-সুযোগ মতো মাল বেচে দিই। ঝামেলা মিটে যায়। তা তোর কি একটা কাঁসার গেলাস লাগবে জল খাওয়ার জন্য?

লাগে তো বল। বোরা খুলে দিয়ে দিচ্চি। ওই অত শীতে কুলকুল করে ঘামতে থাকে রঘুনাথ। গলা শুকিয়ে যায় ভয়ে।

রঘুনাথের হাতটা শক্তভাবে চেপে ধরে হাবুল চোর বলে, ছোটবেলায় তোর মতন আমার গা-গতর ছিল। বয়সে এখন ভাঙন ধরেচে। কী ভেবে সে বলল, তোর ঘর কুথায়? বাপের নাম কি? বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল হাবুল চোর। তার মনে কোনো ভয়-ডরের চিহ্ন নেই।

—আমার ঘর হলদিপোঁতা ধাওড়ায়। বাপের নাম গুয়ারাম।

রঘুনাথের জবাব শুনে হাবুল চোর জোর গলায় বলল, তোর দ্বারা হবে। তুই আমার কাছ থেকে মন্ত্র লিবি? জীবনে ভাত-কাপড়ের কুনোদিনও অভাব হবিনি। মাথা উঁচু করে বাঁচবি। কুঁইকুঁই করে বাঁচতে হবে না।

—তার মানে? আগ্রহ প্রকাশ পেল রঘুনাথের কথায়।

হাবুল চোর বলল, এসব গুরুবিদ্যে শিখতে হয়। শিখতে গেলে গুরু ধরতে হয়। গুরু বিনা কিচু হয় না রে! তা যাকে-তাকে তো সব কিচু দেওয়া যায় না! তাহলে কচুবনে মুক্তো ছড়ানো হয়। যদি তুই রাজি থাকিস, কাল এই সময় বাঁশতলায় আসিস। কাল অমাবস্যা আচে। কাল দীক্ষা দিয়ে তোর হাতেখড়ি হয়ে যাবে। সঙ্গে পাঁচ সিকে পয়সা আর কিছু ফল আনিস। কাল থিকে আমি তোর গুরু হয়ে যাবো। তুই গুয়ারামের ব্যাটা। তোর রক্তে জোস আচে। তুই অনেক দূর যাবি, বাপ।

রঘুনাথ সারাদিন অনেক ভেবেছে। অন্যমনস্ক হয়ে গেছে কাজে। শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে হাবুল চোরের। পাঁচ সিকে পয়সা আর দুটো গাঁদা ফুল নিয়ে বাঁশতলায় হাজির হয়েছে রঘুনাথ যথাসময়ে।

গাঁজার কলকে হাতে হাবুল চোর অনেক আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিল সেখানে। রঘুনাথ কাছে যেতেই সে বলল, যা পুকুর থেকে হাত-পা ধুয়ে আয়। এট্টা পাতায় করে এই গুঁড়ো সিঁদুরটা গুলে নিয়ে আসবি। তিলক কাটতে হবে। কাঁটা ফুটিয়ে রক্ত দিতে হবে মা ডাকাত কালীকে। তবেই তোর দীক্ষা নেওয়া সার্থক হবে। আজ দিনটা বড়ো ভালোরে। আজ ছাই মুঠালে নির্দেশ মতো সব কিছু সোনা হয়ে যাওয়ার দিন রে। রঘুনাথ বুকের রক্ত দিয়ে বলল, যতই বিপদে পড়ি, কোনোদিন কোনো অবস্থাতে গুরুনিন্দে করব না। গুরুনিন্দে করলে আমার জিভ যেন খসে পড়ে। গুরুনিন্দে মহাপাপ। মা ডাকাতকালী, তোমার শ্রীচরণে আমাকে আশ্রয় দাও। তুমি আমাকে সন্তান ভেবে রক্ষা করো। তুমি আমাকে শেয়ালের বুদ্ধি দাও, হাঁসের মতো স্বভাব দাও। আমি যেন গুরুর মুখ রক্ষা করতে পারি। হাবুল চোরের পা ছুঁয়ে ধুলো নিল রঘুনাথ। মাথায় খড়খড়ে হাত রেখে তাকে আশীর্বাদ করল হাবুল চোর, বড়ো হঅ বাপ, বড়ো হঅ। ধানমাঠের ইঁদুরের চেয়েও চালাক হঅ।

কুলবেড়িয়ায় গিয়ে প্রথম কাণ্ড করে এল রঘুনাথ।

হাত কাঁপল না, মনও টলল না। একেবারে নিশ্চল গাছের মতো সে। প্রতি পদে তার বুদ্ধি তাক লাগিয়ে দিল হাবুল চোরকে। তার ক্রিয়াকর্ম দেখে বোঝা যায় না এটাই তার জীবনের প্রথম চুরির ঘটনা। পিঠ চাপড়ে দিয়ে হাবুল চোর বলল, ভাগের তিন ভাগ মাল আজ তোর। এক ভাগ নিয়ে আমি ঘর যাবো। তুইও আজ ঘরে চলে যা। ঘরে গিয়ে ঘুমো। দরকার হলে তোকে আমি ডেকে আনব। তখন যেন তোর সাড়া পাই। আর একটা কথা। এসব যেন মুখ ফুটে কারোর কাছে গল্প করবি নে। যতই চাপ আসুক মুখ যেন তোর হাঁ না হয়।

রঘুনাথ ঘর চলে যাচ্ছিল, হাবুল চোর হাতের ইশারায় তাকে ডাকল, শোন, এসব কাজে শরীরই সব। শরীরের যত্ন নিবি। শরীরই সম্পদ।

গিয়াসের কাজ ছেড়ে দিয়েছে রঘু। শুভ আর সূর্যাক্ষর সঙ্গে তার এখন খুব কম দেখা হয়। একদিন স্কুল থেকে ফিরছিল শুভ। হঠাৎ রঘুনাথের সঙ্গে দেখা হল বাঁশবাগানের ধারে।

রঘুনাথ সুস্থ ছিল না, ওর মুখ থেকে কাঁচা মদের গন্ধ বেরচ্ছিল ভুরভুরিয়ে। শুভর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জায় পালিয়ে যেতে চাইল সে, কিন্তু শুভ তাকে সে সুযোগ দিল না। দৌড়ে

গিয়ে খপ্ করে চেপে ধরল তার হাত, তুই মদ খেয়েছিস?

রঘুনাথ কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়াল।

শুভ বলল, এই বয়স থেকে মদ খেলে পরে তোর কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছিস?

এবার রঘুনাথ ঘুরে দাঁড়াল, মদ না খেলে খাবো কি, ভাতে তো তাগদ আসে না। আমাদের ভালো-মন্দ খাওয়ার ভাগ্য হয় কোথায়?

—অনেকেই শাক-ভাত খেয়ে বেঁচে আছে।

—আমি তাদের মতো নই। আমি আলাদা। রঘুনাথের গলার রগ ফুলে উঠল, আমাকে কেউ খেতে না দিলে আমি তার খাবার জোর করে কেড়ে নেব। ভিখারীর মতো বাঁচতে আমি পারব না। আমার কাকা যা করেচে আমি তাই করব। বাপের মতন আমি মিঁউমিঁউ করে বাঁচব না।

—তুই কী চাস তাহলে?

—আমি বাঘের মতো বাঁচতে চাই। আমার বাপ-ঠাকুর্দা যেভাবে বেঁচেছে আমি সেভাবে বাঁচব না। রঘুনাথ হাঁপাচ্ছিল। ওর রাত জাগা গতর ওঠা-নামা করছিল যন্ত্রের মতো।

—তাহলে লেখা-পড়া করলি না কেন? শুভর জিজ্ঞাসায় থমকে গেল রঘুনাথ তারপর শিশুর মতো দাঁত বের করে হাসল, সবাই কি লেখাপড়া শিখে বড়ো হয় নাকি? অনেকে গায়ের জোরে বড়ো হয়। আমি বুদ্ধির জোরে বড়ো হবো। তখন তোকেও আমি অনেক সাহায্য করব। দেখে নিস—!

—তোর সাহায্যের আমার দরকার নেই। অভিমানে কণ্ঠস্বর বুজে এল শুভর, তোকে আমি খুব ভালো ছেলে বলে জানতাম। এখন দেখছি তুই পুরোপুরি পাল্টে গেছিস! হাবুল চোরের সঙ্গে তোর এখন ওঠা-বসা। তুই এখন আমাদের খোঁজ কেন নিবি?

চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো মুখ করে তাকাল রঘুনাথ, ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বলল, হাবুল চোরকে তুই চিনিস? সে আমার গুরু হয়। সে আমার চোখে আলো জ্বেলে দিয়েচে। তার জন্যি আজ আমার জীবনটা বড়োগাঙের চেয়েও ঢেউ ভরা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল শুভ, রঘুনাথ তার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল, আমি আর অভাবকে ভয় পাইনে। বাবাকে সদরে নিয়ে গিয়ে বড়ো ডাক্তার দেখিয়ে এনেচি। পয়সা থাকলে ওষুধ-ডাক্তার সব হাতের মুঠোয় এসে যায়। বুঝলি?

—তুই কি লটারীর টিকিট পেয়েছিস? শুভর প্রশ্নে রঘুনাথ হা-হা করে হাসল, নেশায় চোখ কুঁচকে বলল, লটারী ছাড়া কি ভাগ্য ফেরানো যায় না? মানুষ কর্মের দ্বারা তার ভাগ্যকে বদলে দিতে পারে। আমি এখন যে কাজ করি, সেই কাজে ঝুঁকি আছে ঠিকই কিন্তু টাকাও আছে মুঠো মুঠো। যেখানে টাকা আচে, সেখানে এই রঘু আচে।

শুভ অবাক হয়ে শুনল রঘুনাথের কথাগুলো, তারপর তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তুই কি কাজ করিস আমাকে বলবি কি?

—তা আমি আজ তোকে বলব না। সময় হলে একদিন বলব।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বাজারে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়াল। রঘুনাথ পকেটে হাত দিয়ে বলল, বাড়ির জন্য মিষ্টি কিনে দিচ্ছি তুই নিয়ে যা।

—তোর মিষ্টি আমি ছোঁব না। শুভ শক্ত গলায় বলল।

রঘুনাথ হাসল, আমি তোর মিতে হই না? মিতে মানে বন্ধু। বন্ধুর সাথে কেউ অমন করে?

—মিতে যখন, তখন মদ খেলি কেন? বল, তোকে বলতেই হবে। শুভ জেদ করল।

রঘুনাথ অসহায় চোখ করে তাকাল, মদ না খেলে শরীরে তাগদ আসে না। আমার বাপ-ঠাকুর্দা খায়। আমিও খাই। আমার গুরুও খায়—।

—দাঁড়া, তোর গুরুর সাথে একবার দেখা হোক তারপর তাকেই শুধাব—মদ খাওয়ার আসল কারণটা কি? শুভ রীতিমত বিরক্ত, এত পয়সা তুই কোথায় পাস? কে তোকে মদ খাওয়ার টাকা দেয়? তোর এই হঠাৎ বদলে যাওয়া আমার খুব অবাক লাগচে।

—টাকা আবার কেউ দেয় নাকি, টাকা আয় করতে হয়। রঘুনাথ ঠোঁট টিপে হেসে উঠল। ওর কথায় আরও আশ্চর্য হল শুভ। দু-দিন আগেও যাব ভাত জুটত না, সে এখন মদের নেশায় পাগল। কী যাদুতে এমনটা সম্ভব হল শুভ বুঝতে পারল না কিছুতেই।

—মিষ্টি খাবি না তো? রঘুনাথের জিজ্ঞাসায় কোনো সাড়া দিল না শুভ। অভিমানে তার ভেতরটা গুমরে গুমরে উঠছে। মনে মনে সে ভাবল রঘুর সাথে এসময় দেখা না হলে ভালো হত। রঘু তার প্রিয় বন্ধু। তার এই অধঃপতনে মনটা বিষাদে ছেয়ে গেল।

শুভর ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে দিয়ে রঘুনাথ আর দাঁড়াল না। কমলা এসময় আখেব খেতে আসবে। কী সব কথা আছে। সুফল ওঝার মেয়েটা ঘাসফুলের চাইতেও নরম। ওর মুখের দিকে তাকালে রঘুর মাথাটা কেমন ঘুরে যায়, বুকের ভেতর ভরা গাঙ্গের জোয়ার আসে। একটা টান অনুভব করে সে, আর সেই টানের জন্য সে পাগলের মতো ছুটতে থাকে বাঁধ ধরে।

লাখুরিয়া হাই স্কুলের কাছে এসে দম নেয় রঘুনাথ। শুভর ব্যবহারে সে দুঃখ পেয়েছে। এমন দুঃখ তার মা-ও পায়। মদ খেলে মানুষ কেন দুঃখ পায়? দুধ খাওয়া আর মদ খাওয়া তো একই কথা। দুটোতেই পেট ভরে। একটাতে গন্ধ নেই, অন্যটায় গন্ধ আছে। দুটোই তরল।

হঠাৎ হুঁশ এল রঘুর। এ কী ভাবছে সে? এমন ভাবনার কি কোনো দরকার আছে এখন? এখন কমলার কাঁপা চোখের তারা তাকে টানছে আগুনের দিকে ধেয়ে যাওয়া পোকার মতো। রঘুব গোঁফের নিচে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠছে উত্তেজনায়। তার হাঁপ ধরা ভাবটা আরও বেড়ে যায়। পাগলের মতো ছুটতে গেলে পায়ে পা বেঁধে পড়ে যায় সে। হাতে পায়ের ধুলো ঝেড়ে আবার উঠে দাঁড়ায়। সুফল ওঝার মেয়ের আধো কথাগুলো একতারার সুরের মতো বাজে। জুরানপুরের মেলায় কমলার হাত ধরেছিল সে। ভিড়ে হাত ছাড়িয়ে নেয়নি কমলা। ঘেমো হাতটা শরীরের শিশিরে ভিজে যাচ্ছিল হঠাৎ। সেদিন থেকে রঘুর মনে হয়েছে কমলা আর কারোর নয় তার একার। সময় সুযোগ মতো কমলাকে সে বউ সাজিয়ে ঘরে তুলবে।

আখখেতের আলো আঁধারী পরিবেশে স্বপ্নের মতো ছোট ছোট ছায়া দৌড় ঝাঁপ খেলছিল। দুপুরের নির্জনতায় একটা কাক-পক্ষীও নেই চারপাশে। ঘন জমাট বাঁধা আখখেতের ভেতর ঢুকে গিয়ে রঘুনাথ ডাকল, কমলা।

শুকনো আখ পাতা মাড়ানোর শব্দ হল, যেন কোনো ভীতু কিশোরী হরিণী সতর্ক পায়ে এগিয়ে এল সামনে। পরনে তার সবুজ রঙের ডুরে শাড়ি, পিঠের উপর আছাড় খেয়ে পড়েছে ছাড়া চুল। টানা মোটা ভুরুর নীচে চোখ দুটো তার ভীষণ চকচকে। কমলার গায়ের রঙ কাঁঠালপাতার মতো। ষোল বছরের শরীরে কেউ যেন তেলের শিশি ঢেলে দিয়েছে এমন দুত্যিময় আভা। ঘোলাটে চোখে কম্পমান সেই সুষনিপাতা দেহের দিকে হা-করে চেয়েছিল রঘুনাথ। সুফল ওঝার মেয়েকে সে তো এই প্রথম দেখছে না। যতবার দেখে ততবার মনে হয় কলাগাছের নতুন পাতা, জোর করলে ছিঁড়ে ফাতারফাই হয়ে যাবে। এত সাহসী রঘুনাথের বুক কেঁপে গেল ভয়ে। কী ভাবে কথা শুরু করবে বুঝে পেল না সে। কমলাও নিথর, নীরব। স্তব্ধা ঢেউহীন দিঘি।

এক সময় হঠাৎ মাটিতে ভর দিয়ে উঠে বসা কমলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রঘুনাথকে জড়িয়ে, কাল বাদে পরশু আমার বিয়ে গো। ছেলের বেথুয়াতে ভূষিমালের দোকান আছে। বড়োলোক। তুমি কি তার সাথে পারবে গো?

—চলো পালাই। রঘুনাথ কমলার হাত ধরে টানল।

—কোথায়?

—গাঙ পেরিয়ে রাঢ়ের দিকে চলে যাব। রঘুনাথ উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল।

কমলা সতর্ক গলায় বলল, তোমার তো ফুটো কড়িও নেই। আমাকে খাওয়াবে কি? চুপসে গেল রঘু। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, খাওয়ার চিন্তা তোমার নয়, আমার।

কমলার ভালো লাগল রঘুনাথকে। কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, তাহলে বিয়ের রাতে এসো। বেস্‌পতিবার আমার বিয়ে। খিড়কি দরজা খোলা থাকবে। এসো। আমি তোমার পথ চেয়ে থাকব।

উৎসাহিত রঘু পাগল হাওয়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল কমলার শরীরে।

সুখ-স্বপ্ন অলকলতার মূল। চোখ মুদে আবেশে হারিয়ে যেতে থাকে রঘু। রাঢ় কোন পথে যাবে সব ঠিক করা আছে। মাত্র তো দুটো নদী, তারপর তো রাঢ় দেশের গাঁ-গঞ্জ। সেখানে মন না ধরলে তারা বর্ধমান শহরে পালিয়ে যাবে। কমলা বুনোদের বউ হয়ে গেলে তাকে আর সুফল ওঝা ঘরে নেবে না। মেয়ে হল তো কী হল? দেশ-সমাজ আছে না। ঢি-ঢি পড়ে যাবে চতুর্দিকে। যদি থানা-পুলিশ করে? ভয়ে রক্ত চলকে ওঠে রঘুনাথের। একা একা ঘামতে থাকে সে।

রাত গাঢ় হতেই ভেসে আসে ঝিঁঝির ডাক। মরাগাঙ উগলে দেয় শীত হাওয়া। বাঁধের উপর কুকুর ডাকতে ডাকতে চলে যায় লাখুরিয়ার দিকে। তার ডাক কান্নার মতো কানে বাজে রঘুনাথের। চোখের পাতা নেচে ওঠে ভয়ে।

ঘরছাড়ার সময় হয়ে এল। ঘুমন্ত মাকে দূর থেকে দেখে নিল সে। হঠাৎ করে শুভ সূর্য আর সবুজের মুখটা মনে পড়ে গেল তার। ওরা সত্যিকারের ভালোবাসা দিয়েছে তাকে। এত ভালোবাসা যে মন ভিজে যায়। হাবুল চোর তাকে অভাবের খাদ থেকে টেনে তুলেছে। ঐ লোকটার কাছে সে কৃতজ্ঞ। হাবুল চোর তার জীবনের ধ্রুবতারা। তাকে অশ্রদ্ধা বা অমান্য করা যাবে না কোনদিনও।

হাওয়া শনশনিয়ে চলে যায় গাছের পাতা কাঁপিয়ে। শুধু পাতা কাঁপে না, কেঁপে ওঠে রঘুর গায়ের রক্ত। কমলাকে উদ্ধার করতে হবে তাকে। শেষ লগ্নে মালাবদল হবে ওদের। তার আগে যাওয়া দরকার।

রঘুনাথ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। যে অন্ধকার তার প্রিয় সেই অন্ধকারকে ভীষণ ভয় পেল সে। ছমছমিয়ে উঠল গা-গতর। কাচ-টিপ্পির মতো চোখে দ্যুতি ছড়িয়ে বসে আছে কুলগাছের পেঁচাটা। রোজই বসে। আজ অন্যরকম মনে হচ্ছে রঘুর।

পা টিপে টিপে বাঁধের গোড়ায় আসতেই রঘুনাথ দেখল সাইকেল থেকে নামল হাবুল চোর। সাইকেলটা খেজুর গাছে হেলান দিয়ে হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল বাঁধের নীচে। ফিসফিসিয়ে বলল, আজ তোদের গাঁয়ে কাজ সারতে হবে। সুফল ওঝার মেয়ের বিয়ে। আমার পুরনা শত্রু। আজ মওকা। এ সুযোগ ছাড়লে হবে না।

রঘুনাথ থমথমে চোখে তাকাল। ঠোঁক গিলে বলল, কমলার বিয়ে, আজ ছেড়ে দাও ওস্তাদ। মেয়ের বিয়ে বলে কথা। আজকের দিনটা বাদ দাও।

—শরীরে এত দয়া-মায়া থাকলে এ বিদ্যের ধার কমে যায়। রঘুনাথকে ধমকে উঠল হাবুল। মুখ নীচু করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে রঘুনাথ। এ কী বিপদ মাথার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার ঠোঁটের উপর চুলবুল করল কত কথা। কিন্তু হাবুল চোরের ব্যক্তিত্বের কাছে সে সব কথা পানসে হয়ে গেল নিমেষে। অন্ধকারে তার রক্তহীন মুখের ছবি দেখতে পেল না হাবুল চোর। শুধু হাত ধরে টানল, চল, রাত বাড়চে। আর দেরী করা যাবে না। সাথে আরও তিনজন আছে। ওরা মোকামপাড়ার কাছে অপেক্ষা করচে। ওদের নিয়ে বিলের পাড় ধরে চলে যাব।

রঘুনাথের গা-হাত-পা ঝনঝনিয়ে উঠছে রাগে। তবু তার মুখে কোনো প্রতিবাদের ভাষা নেই।

শুধু মনের ভেতর দলা পাকিয়ে উঠছে ভয়। কমলা যদি তাকে দেখে ফেলে হ্যাজাকের আলোয় চুরি করতে তাহলে দিনের আলোয় কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবে সে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রঘুনাথ ভাবল—মনের কথা সব খোলসা করে বলে দিতে হাবুল চোরকে। শেষ পর্যন্ত ভয়ে ঠোঁট দিয়ে কোনো শব্দ বেরল না তার। হাবুল চোরের স্বভাব সে জানে। মতের মিল না হলে সে পথের কাঁটা সরিয়ে দেয়। তার শরীরে ক্ষমা কম।

কমলাদের বাড়ির পেছনের ঝোপটাতে ওরা লুকিয়ে থাকল পাঁচজন। পুরোহিতের মন্ত্র পড়া শেষ। সিঁদুর দান মালাবদল সাতপাকে ঘোরা সব শেষ হল একে একে।

খোলা খিড়কি দরজা দিয়ে সবার আগে দা-হাতে ঢুকে এল রঘুনাথ। মুখে সে তেল- কালি মেখে নিয়েছে যাতে লোক চিনতে না পারে।

মাঝের ঘরে ঘুমে ঢুলছিল কমলা। কী সুন্দর সেজেছে সে! জ্বলজ্বল করছে সিঁথির সিঁদুর। লাল বেনারসীতে কমলাকে যেন চিনতেই পারে না রঘুনাথ। হাতের দা-আড়াল করে সে থামের পেছনে দাঁড়ায়। হাবুল চোর চাপা গলায় ধমকায়, হাঁ-করে মেয়েছেলে দেখলে হবে? যা হাতে টাইম নেই। যা নেবার সব কেড়ে নে। গায়ে যা দেখছিস্ সব সোনার। আমি নিজের চোখে স্যাঁকরা দোকান থেকে নিতে দেখেচি।

পায়ে যেন পেরেক পোঁতা, রঘুনাথ নড়তে-চড়তে পারে না। কাঁপা কাঁপা গলায় সে শুধু বলে, ওস্তাদ, আমার ভেষণ ভয় করচে। এ কাজ আমার দ্বারা হবে নি। কমলা আমারে দেখলে চিনে ফেলবে। এক গাঁয়ের মেয়ে তো! ওর চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হবে না।

—দরকার হলে বুকে দাওলি ঢুকিয়ে দিবি। হুকুম করল হাবুল চোর। তবু থাম ঘেঁষে দাঁড়াল রঘুনাথ।

হাবুল চোর আর কাল বিলম্ব না করে একটা মোক্ষম খিস্তি আউড়ে এক ছুটে তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল কমলার কাছে, হাতের খাঁড়াটা মাথার কাছে ঠেকিয়ে বলল, বাঁচতে চাস্ তো সব খুলে দে। তাড়াতাড়ি কর। না হলে দু টুকরো করে চলে যাব। রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব। কারোর বাপেরও সাধ্য নেই যে বাধা দেবে।

ফ্যাট-ফ্যাট শব্দে হ্যাজকগুলো লাঠি দিয়ে ভেঙে দিচ্ছে হাবুল চোরের অন্য সাকরেদ। ভাঙা কাচ গেঁথে যাচ্ছে মাটিতে।

বুকে হাত চেপে অসহায় ভাবে মা বুড়োমাকে ডাকে রঘুনাথ।

—রক্ষা করো গো, মা বুড়োমা; কমলার যেন কোনো ক্ষতি না হয়। ওর কিছু হলে আমি মরে যাব। আমি পাগল হয়ে যাব।

বরবেশী বেথুয়ার ছেলেটাকে থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে হাবুল চোর। তার মাথায় খাঁড়ার বাঁট ঠুকে দিয়ে গলার সোনার হারটা ছিনিয়ে নিল সে। গলগল করে রক্তের ধারা নামছে মুখ বেয়ে। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা হারাল বর।

ততক্ষণে জেগে গিয়েছে পুরো পাড়া। কাজ শেষ করে ফিরে যাওয়ার সময় হাবুল চোর রঘুর হাত ধরে টানল, পালা। পাড়া জেগে গিয়েচে। পালা! ধরা পড়ে গেলে ছাল ছাড়িয়ে হাতে দেবে।

পালাতে গিয়ে রঘুনাথ মুখ থুবড়ে পড়ল পড়ে থাকা গাছের গুঁড়িতে হুমড়ি খেয়ে। অন্ধকারে কাঠ-ব্যাঙের মতো ঠিকরে পড়ল সে। মাটিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সে দেখল তাকে লাঠি হাতে ঘিরে দাঁড়িয়েছে জনা দশেক আগুন চোখের মানুষ। ফাঁক গলে পালাতে গিয়ে লাঠির আঘাতে আবার হুমড়ে পড়ল সে। আর তখনই লাঠির বৃষ্টি শুরু হল তার শরীরে।

রঘুনাথের আর্ত চিৎকারে বাতাস ভরে যেতেই ছুটে এল কমলা। আঁচলে মুখ ঢেকে সে কাতর হয়ে বলল, ওকে মেরো না গো, ও নির্দোষ। ও চোর নয়। ও ধাওড়াপাড়ার রঘু। আমি ওকে চিনি গো।

কেউ তার কথা শুনল না।

লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে দিল রঘুনাথের। তাতেও ক্রোধ শান্ত হল না জনতার। টানতে-টানতে তাকে নিয়ে যাওয়া হল উঠোনে। রঘুনাথের পা কাঁচা ডালের মতো মড়াৎ করে ভেঙে দিল একজন। গাল দিয়ে বলল, এই বয়স থেকে চুরির করার মজা দেখ। এমন করে দিলাম—সারাজীবন মনে থাকবে তোর। আর কোনোদিন কারোর ঘরে ঢুকতে সাহস হবে না।

মুর্চ্ছিত, রক্তাক্ত রঘুনাথ উঠোনে শুয়ে থাকল থানা থেকে পুলিশ না আসা পর্যন্ত। তার শ্বাস পড়ছিল ধীরে ধীরে। কোনোমতে চোখ খুলে সে দেখল কমলা শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছে ভ্যান চেপে। দু-চোখ ভর্তি জল। সে যেন মমতামাখা দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে রঘুর রক্তমাখা শরীরের দিকে। অনুশোচনায় পুড়ে যাচ্ছিল কমলার হৃদয়। বারবার দোষীর কাঠগোড়ায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে সে ভাবছিল আজ তার জন্য রঘুর এই দশা হল। শুধুমাত্র তার জন্য রঘুনাথ আজ চোর সেজে ধরা পড়ে গেল! এই পাপবোধ থেকে কবে যে মুক্তি ঘটবে কমলার সে নিজেও জানে না।

দৃষ্টির বাইরে গিয়েও রঘুনাথ তার শরীর জুড়ে রয়ে গেল।

এক শীতের সকালে শুভকে দেখে গিয়াস বাঁক বোঝাই রসের ঠিলি নামিয়ে শুধাল, তোমার মিতের খবর কী গো? ছেলেটার পেটের ভেতর এত কুবুদ্ধি ছিল কে জানত। আমি তো অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। না হলে আমার কপালে যে কী ছিল কে জানত।

জিরেন-কাট রস খেতে এসে রসের মজাটাই হারিয়ে ফেলেছে শুভ। এর পরে রঘুনাথের সাথে মেলামেশা করাটা তার পক্ষে শোভনীয় হবে কী না ভেবে ভেবে অস্থির হচ্ছিল সে।

গিয়াস তাকে বড়ো গাছের আধ-ঠিলি রস দিয়ে বলল, একেবারে চিনির মতো মিঠা ঠ্যাঙা গাছের রস। খেয়ে বড়ো মজা পাবা।

শুভকে একা দেখে গিয়াস শুধোল, তুমি আজ একা এসেচ, তোমার বন্ধু কোথায়? শুভ বলল, ও ভোরে ঘুম থেকে উঠতে পারে নি। যা শীত পড়ছে ক'দিন থেকে বাইরে বেরলে কনকন করে গা হাত পা। তখনই যেন শীত এসে জড়িয়ে ধরল ওকে।

—তা যা বলেচ। গিয়াস শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিল। এক সময় বাঁকটা কাঁধের উপর উঠিয়ে নিয়ে সে বলল, গুড়শালে যাবা নাকি? এখন চুলা ধরাব। গা-গতর গরম করে ঘর যেওক্ষণ—মজা পাবে।

চারিদিকে ছেঁড়া মশারির মতো উড়ছিল কুয়াশা। গুঁড়িগুঁড়ি কুয়াশা-দানায় বাতাস গর্ভবতী মেয়ের মতো গা-গতরে ভারী হয়ে আছে। সামান্য দূরের কোনো কিছুই দেখা যায় না স্পষ্ট। এত কুয়াশার ভেতর শীত ডিম ছেড়েছে সহস্র।

হাঁটতে হাঁটতে গিয়াস খুশিতে টগবগিয়ে বলল, যত শীত পড়বে পাটালিও জমবে ভালো। রস কাচের মতো দেখতে হলে পাটালিও বড়ো ঘরের বউয়ের মতো খোলতাই রঙ ছাড়ে। শীত পড়ুক, আরো শীত পড়ুক। জমিয়ে শীত না পড়লে গাছির যে মাথায় হাত।

এ সময় গিয়াসকে বড়ো স্বার্থপর মনে হল শুভর। এত হাজার হাজার মানুষ যখন শীতে কষ্ট পাচ্ছে তখন তীব্র হাড়-কাঁপানো শীতের প্রার্থনায় গিয়াসের এই আকুলতা কানে বেঁধে বই কি! তবু নিরুত্তর শুভ গিয়াসের পাশাপাশি হাঁটছিল। রস ঝোরার কাজ মেহনতের কাজ। এ কাজে শরীর মাটি হয়, গাদ তোলা রসের মতো ঘোলাটে হয় চোখ। রাতের ঘুম যায়, দিনের স্বস্তি হারায়। এত কিছু ত্যাগ স্বীকার করে যে মানুষটা হাসপাতালে খেজুর-ঝোপে পড়ে আছে তাকে কোনোমতে এড়িয়ে যেতে পারে না শুভ। এই লোকটার সঙ্গে অবনীর বড়ো ভাব। দুপুরে সময় পেলেই অবনী চলে আসে গিয়াসের ডেরায়।

কুয়াশা ঢাকা পথ তবু হাঁটতে কোনো কষ্ট হচ্ছিল না গিয়াসের। রসের কলসী নিয়ে হাঁটতে তার

কোনো কালেই কষ্ট হয় না। এ যেন খেজুরের রস নয়, তার রাতজাগা শরীরের পরিশ্রমের কষ।

বাঁক বয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল গিয়াস। হঠাৎ চাপ বাঁধা কুয়াশার ভেতর তার কানে ভেসে এল শিশুর চিৎকার। ফাঁকা মাঠে কাদের বাচ্চা কাঁদে গো? মা বুঝি জলকাজ সারতে গিয়েছে ঝোপে-ঝাড়ে, কাঁখের বাচ্চা বসিয়ে গেছে মাঠে। তাই অভিমানে গলা ফাড়িয়ে কাঁদছে দুধের শিশু। আজকালকার মা গুলো যেন সব কেমন। বড়ো বেশি দয়া-মায়াহীন। কনকনে শীত হাওয়ায় কান্নার তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল ক্রমশ। থাকতে না পেরে বাঁক নামিয়ে গিয়াস চলে গেল বাচ্চাটার কাছে। ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সে।

শিশির ভেজা ঘাসে অনাথের মতো শুয়ে আছে নাফিজার কাঁখের শিশু মেহের। মেহেরকে বুকে তুলে নিয়ে গিয়াস পাগলের মতো ডাকল, নাফিজা-আ-আ-আ। এ-না- ফিজা—আ-আ-আ। কুথা গেলি রে...।

বাঁশবাগানে প্রতিধ্বনি ফিরে এল গিয়াসের। পাগলের মতো গিয়াস মেহেরকে আঁকড়ে ধরেছে বুকে। আর ঠিক তখনই ওর ছোট্ট পকেট থেকে ঠিকরে পড়ল একটা হাত-চিঠি। তাতে লেখা আছে, বদলা নিলাম। আমার নাম মকবুল। বদলা নিতে আমার কোনোদিন ভুল হয় না। তোর সুন্দরী বউ নাফিজাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে আমি কলকাতায় চললাম। আর এ গাঁয়ে আসবো নি। তোর ছেলেটাকে তোর কাছে দিয়ে গেলাম। ও কাছে থাকলে নাফিজা কোনোদিনও আমার হত না। টা-টা বাই-বাই!

আবছা আলোয় চিঠিটা পড়ছিল শুভ। গিয়াসের মুখের টুঁ শব্দটিও নেই। সে পাথর হয়ে গেছে পাপ-হাওয়ায়।

রসের হাঁড়ি ফেলে নাফিজার খোঁজে গ্রামে ফিরে এল গিয়াস।

পুরনো সাইকেলটা যত জোরে চালান যায় তার চেয়েও জোরে চালাচ্ছিল সে। ভাবছিল দ্রুত গেলে বুঝি নাফিজার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আর একবার দেখা হয়ে গেলে বুঝিয়ে শুনিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারবে তাকে। ভুল তো মানুষেরই হয়। মানুষই আবার ভুল শুধরে নেয়। মকবুলের দ্বিচারিতায় ফাঁদে পা দিয়েছে নাফিজা। সেই কঠিন ফাঁদ কেটে তাকে মুক্ত করে আনতে হবে। কিছুটা আসার পরে গিয়াসের মনে হল হাসপাতালে গাছ ঝুড়তে না এলে তার জীবনে বুঝি এত দুর্যোগ নেমে আসত না। মকবুল সুযোগের অপেক্ষায় ঘুরঘুর করছিল শিয়ালের মতো। সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে সে। তার সাথে একবার মুখোমুখি হলে হিসাবটা বুঝে নিতে পারত সে। এক আকাশে দুটো সূর্য উঠত না, যাইহোক একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যেত।

মেহের সাইকেলের ঝাঁকুনিতে কঁকিয়ে উঠল। চিন্তার খেই হারিয়ে গেল গিয়াসের। বুক ভেঙে যাওয়া কষ্টে সে তার ছেলের মুখের দিকে তাকাল। অমনি হু-হু করে উঠল তার শূন্য হৃদয়। চোখের জল তাকে পরাস্ত করে নেমে এল চিবুক বেয়ে। মেহেরের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়ে গিয়াস বলল, আর একটু বস। এই তো এসে গেলাম...! কথাগুলো বলতে গিয়ে অস্বাভাবিক ভাবে কেঁপে উঠল তার ঠোঁট জোড়া। তেঁতুলতলা পেরিয়ে বাঁক নিলেই গিয়াসের মাটির ঘরখানা চোখে পড়ে। সাইকেল নিয়ে ধুলো পায়ে গিয়াস গিয়ে দাঁড়াল ঘরের সামনে। সবখানে নাফিজার স্মৃতিচিহ্ন ধুলোর

রেণু হয়ে উড়ছে। কত কথা মনে পড়ছে গিয়াসের। বড়োই গরীব ঘরের মেয়ে ছিল নাফিজা। গিয়াসের আব্বা মেয়েটাকে একনজর দেখেই তার ছেলের সাথে শাদীর প্রস্তাব দেয়। নাফিজার বাবা ছিল না, মা-ই তার সর্বময় কর্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায় সে। পাকা কথা বলতে এসে গ্রামসাক্ষী রেখে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। বিয়ে করে বেশ খুশিতেই দিন কাটছিল ওদের। এক অমাবস্যা রাতে খরিস সাপের ছোবলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল গিয়াসের বাবা। শোকে কাহিল হয়ে গেল সে। সেই দুঃসময়ে নাফিজাই তার পাশে ছিল।

ডুবে যাওয়া সংসারটাকে ধীরে ধীরে টেনে তুলছিল গিয়াস। নাফিজা হাসি মুখে বলত, আমি মরবনি গো, না মরা পর্যন্ত আমি তোমার পিছু ছাড়ব নি। চাম এঁটুলির মতো এটকে থাকব গায়ে। নাফিজা মিথ্যে কথা বলেছে। বনের পাখির মতো পোষ না মেনে সে উড়ে গিয়েছে। তাকে ফেরানো কি এ জীবনে সম্ভব হবে তার? শুনশান ঘরে ঢুকতে আর মন করে না গিয়াসের। বুক ঠেলে কান্না উঠে আসে। তাড়াহুড়োতে অনেক কিছুই নিতে ভুলে গিয়েছে নাফিজা। সেই সব স্মৃতিচিহ্ন আঁকড়ে গিয়াস আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। দাওয়ার খুঁটি ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে।

কান্নার আবেগ থামতে সময় লাগে বেশ কিছুটা। পাশের ঘরের বউটা এসে বলল, কার জন্য কাঁদছো? সে কোনোদিনও তোমার ছিল না। সে আমার কাছে কথায়-কথায় বলেছে—তুমি নাকি ঢোঁড়া সাপ। খরিস সাপের খোঁজ পেলে সে চলে যাবে।

কথাগুলো যেন গরম তেলের মতো কানে ঢেলে দিচ্ছিল বউটা। অসহ্য লাগতে সে ব্যাকুল হয়ে বলল, যা হবার তা হয়েছে। ওর কথা বলে আর আমাকে কষ্ট দিও না। ওর মনের কথা আমি কিছু বুঝতাম না। ও ছিল বুনো পাখি। আমি ওকে বশে রাখতে পারিনি সেটা আমার দুর্বলতা।

বউটি সব শুনে দুম করে বলে বসল, মেহেরকে দেখবে কে? ওর কপালটা খারাপ। একটা কথা বলি শোন। দুটো ভাত ফুটিয়ে দেবার তো মানুষ দরকার। আমার বুন্ আছে। বলো তো তার সাথে কথা পাড়ি।

—তোবা তোবা। জিভ কাটে গিয়াস, বিয়ে-শাদী মানুষের ক'বার হয়? যে পারে পারুক। আমি আর ওসব পারব না!

—তাহলে মেহেরকে দেখবে কে?

—ওর জন্য আল্লা আছে। অভিমানে গলা বুজে এল গিয়াসের, আমার কথা বাদ দাও। দুধের শিশুকে ফেলে কোনো মা যে এভাবে পালিয়ে যায় আমার তা জানা ছিল না।

—যে যুগের যা ধর্ম! বউটা ফ্যাকাসে হাসল। তারপর করুণ দৃষ্টিতে গিয়াসের দিকে তাকিয়ে সে চলে গেল তার নিজের ঘরে।

একটা টিপ তালা দরজার আংটায় লাগাল গিয়াস। ফাঁকা ঘরে থাকলে দুঃখ পাথরের মতো চেপে বসবে বুকে। এর থেকে নিস্তার পাওয়া দরকার। সে ভাবল মেহেরকে তার বোনের ঘরে রেখে কাজে ফিরে যাবে।

না খাটলে তার-ই বা পেটের ভাতের যোগাড় হবে কী ভাবে? মেহেরকে পাশের গ্রামে বোনের বাড়িতে রেখে ফিরে এল গিয়াস। ওখানে ওর কোনো কষ্ট হবে না। মায়ের যত্ন না পেলেও ফুপুর যত্ন পাবে। আর সময় তো কারোর জন্য থেমে থাকবে না। দেখতে দেখতে মেহের একদিন বড়ো হবে। ভুলে যাবে তার মায়ের কথা। শুধু মেহের নয়, গিয়াসের স্মৃতিও দিন বদলের সাথে সাথে ঝাপসা হয়ে আসবে। সময় কাকে কোথায় টেনে নিয়ে দাঁড় করাবে সে নিজেও জানে না।

মেহেরকে ছেড়ে আসতে নিদারুণ কষ্ট হয় গিয়াসের। ফ্যালফ্যাল করে দেখছিল মেহের। তার কোনো কিছু বোঝার শক্তি নেই। যদি বোঝার শক্তি থাকত তাহলে সে উচ্চস্বরে কাঁদত।

সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে রাস্তায় উঠে এল গিয়াস। শরীর আর চলছিল না তার। দিনভর ধকল গিয়েছে গাছ ঝোড়ায়। পরিশ্রমের কাজে ফাঁকি দেওয়া চলে না। জিরেন কাট রস পেতে গেলে খেজুরগাছের তোয়াজ দরকার। বিবিকে পোষ মানানো বুঝি সেই জিরেনকাট রস বের করার মতো। শক্ত গাছের শরীর কেটে রস বের করা কি মুখের কথা। কাঁটা বোঝাই খেজুরগাছ তার হাতের যাদুতে বশ মেনেছে অথচ নাফিজাকে সে পোষ মানাতে পারল না। কেন পারল না-এই ব্যাখ্যার উত্তর খুঁজতে গেলে তার কানের পাশটা ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে। বুক ভেঙে যায় সুখে-দুঃখে। তার বারবার মনে হয় মাটির ঘরে নাফিজা কি সুখী ছিল না? তার অসুখী মুখের ছায়া একদিনও দেখতে পায় নি গিয়াস। যদি দেখতে পেত তাহলে নাফিজাকে সে হাতছাড়া হতে দিত না। বুক ঠেলে উঠে আসা দুঃখ কুরেকুরে খায় তার হৃদয়, মন। ক্রমশ ভার হয়ে আসছে মাথা এবং শরীর। সকাল থেকে ঝামেলার অন্ত নেই। পঞ্চাশটা গাছের ঠিলি নামিয়ে সাতসকালে হাঁপসে উঠেছিল সে। তবু মনে একটা আশা ছিল। রসটুকু জ্বাল দিলে যা গুড় হবে তা ফুৎকারে উড়ে যাবে চড়া দামে। নলেন গুড়ের বাজার এখন মন্দ নয়। যা দাম আছে বাজারে তাতে পরিশ্রম পুষিয়ে যায়। গেল বারও ভালো লাভ করেছে গিয়াস, গুড় বেচার টাকায় চার কাঠা জায়গা কিনেছে বিলের ধারে। কানপাশা গড়িয়ে দিয়েছে নাফিজাকে। বাহারী দেখে একটা শাড়ি কিনে দিয়েছে দেবগ্রামের হাট থেকে। সেই শাড়ি নাফিজাই পছন্দ করে কিনেছে রোববারের হাটে। সেদিনের সেই হাসিমাখা মুখখানা আজও তো মনে পড়ছে গিয়াসের। মন বুঝি সেই এঁটেল মাটির কাদার মতো, হাত রাখলে তার চাপে ছাপ পড়ে যায়। দেবগ্রামের হাটে লাল মিঠা বরফ কিনে খেয়েছিল নাফিজা। এক মুখ হাসতে হাসতে বলেছিল, লাল বরফ খেতে আমার ভেষণ ভালো লাগে। জানো, ছোটবেলায় এই বরফ খাওয়ার জন্যি কতো জেদ ধরতাম।

ছোটবেলার দিনগুলো যেন চোখের সামনে ভেসে উঠত নাফিজার। ছোটবেলাটা তার বেশ দুঃখেই কেটেছে। এ সব খবর জানত গিয়াস। তাই সে চেষ্টা করত নাফিজাকে সুখে রাখার। তার সেই চেষ্টা ঠুনকো কাচের গ্লাসের মতো ভেঙে গেল! এই দুঃখের কথা সে কার কাছে বলবে? যে শুনবে সে-ই তো হাসবে মনে মনে। ভাববে—বউকে সুখ দিতে পারে নি, বউ পালাবে না তো কি ঘর আগলে বসে থাকবে? এখন আর কেউ ধ্বজভঙ্গ বরের মুখ চেয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে রাজি নয়। এখন সবার এক জোড়া করে পাখনা আছে। অসুবিধা কিংবা মনের মিল না হলে তারা উড়ে পালাবে। কে তাদের আটকে রাখবে?

শীতের হাওয়ার চাবুক এসে সপাং করে লেপটে যাচ্ছে গিয়াসের দুবলা-পাতলা শরীরে। তবু কোন তেজে ঘাম ফুটে বেরয় তার গতরময়। এ ঘাম রাগের ঘাম, পরাজয়ের ঘাম। নাফিজা সত্যি তাকে হারিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। সারা গাঁয়ে টি-টি পড়েছে। পাড়ার দোকানটাতে আলোচনা হচ্ছিল, তার ছিটেফোঁটা কথা কানে এসেছে গিয়াসের। চাপা গলার কথাগুলো সাপের বিষের চেয়েও ভয়ংকর। এক হাতে তালি বাজে না। নিশ্চয়ই গিয়াসের কোনো দোষ আছে। মেয়েমানুষকে খেতে না দাও কিন্তু গাদনটা নিয়ম করে দিতে হবে। শরীরের সুখ না পেলে ওরা সোনার সংসার ভেঙে পালিয়ে যাবে।

ছুটে আসা কানাকানি কথাগুলো গিয়াসের গায়ের লোম চাগিয়ে দেয়। সে যেন চোখ তুলে ধুলোর দিকে তাকাতে পারছে না। নাফিজা যেন তার মুখ ধুলোয় ঠুসে ধরেছে। দম আটকে আসছে গিয়াসের। বিষ কথাগুলো বুঝি না শুনলে ভালো হত। কার মুখে সে আর হাত চাপা দেবে? লোক যা বলে সব সত্য নয়। গিয়াস নিজের দিকে তাকাল। তার শরীরে অক্ষমতার কোনো বীজ নেই। আর দশটা সবল সুস্থ পুরুষের মতো সে-ও। ফলে এই অপবাদ মন থেকে মেনে নিতে পারে না সে। বউটা মান-সম্মান নিয়ে গেল, সেই সঙ্গে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গেল একটা মানুষকে। গ্রাম সমাজে এসব

নিয়ে বোলান গান বাঁধা হবে। রসিয়ে-টরিয়ে গাইবে মানুষ। হাঁ-করে সব শুনতে হবে তাকে। কোনো প্রতিবাদ করা চলবে না। যারা বোলান গায় তারা যা বলবে সেটাই সত্যি।

সাইকেলটা ঠেলতে-ঠেলতে গিয়াস একটা চারা বটগাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। তার মনে হল—গাছের কোনো স্ত্রী নেই। গাছকে কেউ কথা শোনায় না।

কপাল কুঁচকে গিয়াস পকেট থেকে বিড়ির ডিবাটা বের করে আনল। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায় তবু মগজে ধোঁয়া ঢোকান দরকার। ধোঁয়ার মতো যদি হালকা ভাবতে পারে নিজেকে-এই ভেবে দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরাল সে। এক বুক ধোঁয়া টেনে সে হালকা বোধ করতে চাইল নিজেকে। কিন্তু পাথর চাপা বুক ফুঁড়ে তো শীতল জল ওঠে না। শুধু দুঃখ বুজকুড়ি কাটে ফুঁসি কাঁকড়ার শ্বাস নেবার মতো। এ সময় পৃথিবীতে সে একা হলে ভালো হত। তাকে কারোর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হত না। কেউ দেখতে পেত না তার ক্ষত-জ্বালা। আঁধার নেমে এলে সেই আঁধারে ভীতু ইঁদুরের মতো নিজেকে সিঁধিয়ে নিতে পারত সে। কিন্তু মানুষ যা চায় তা কি চট করে হয়?

নুর মহম্মদ লোহালক্কড়ের ব্যবসা করে। লোহা ভাঙা, পেতল ভাঙা, সংসারের ফেলে দেওয়া জিনিস নিয়ে তার যত কারবার। সাইকেলের পেছনে বাঁশের বড়ো ঝুড়িটায় সব সময় ঘটর মটর শব্দ। বিস্কুট, খেলনা কখনও বা নাগাদ পয়সা দিয়ে ভাঙা জিনিস পত্তর কব্জা করে সে। এ সব জিনিস শহরে চালান হয়। গলিয়ে আবার নতুন হয়ে ফেরত আসে গাঁয়ে। ব্যবসাটা মন্দ নয়। অনেকদিন ধরে এতেই মজে আছে সে।

দূর থেকে মুখ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গিয়াসকে দেখে এগিয়ে এল সে। সাইকেলটা গাছে হলান দিয়ে সে সন্দেহঘন চোখে গিয়াসের দিকে তাকাল, তা, অবেলায় এই বটতলায় কি করছো হে! হাসল নুর মহম্মদ। আর তাতেই পিত্তি চটকে গেল গিয়াসের। কথা বলার ইচ্ছে হল না, তবু তিতকুড়ো ঢোক গিলে তাকে বলতে হল, গাঁয়ে এসেছিলাম। এবার কালীগঞ্জে ফিরব—

—তা তো ফিরতেই হবে। নুর মহম্মদ চুরুক দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসল, তার পান খাওয়া দাঁত বিকশিত হল নিমেষে, চিবিয়ে-চিবিয়ে সে বলল, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার কেউ মারা গিয়েছে! তা কিসের এত শোক গো তোমার?

গিয়াস আঁতকে উঠল কথা শুনে। শুক্‌নো হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল ঠোঁটের ডগায়। কিন্তু বাসি ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে গেল সেই হাসি। মুখ কাচুমাচু করে সে আড়াল করতে চাইল সত্য, তুমি ঠিকই ধরেচো, মন আমার ভালো নেই। গাছ ঝোড়ার কাজে ডাহা লস চলচে।

—তোমার কথা মানতে পারলাম না। নুর মহম্মদ বিজ্ঞের হাসি হাসল, এ বছর তো সিজিন ভালো চলছে। যা শীত পড়েচে, তাতে লস খাবার তো কথা নয়।

গলা শুকিয়ে খড়খড়িয়ে উঠল গিয়াসের কণ্ঠস্বর, কাল ঠিলিগুলোকে ফুটা করে দিয়ে পালাল। মেলা টাকার লস হয়ে গেল গো। শুধু পয়সা নয়, রসও ঝরে গেল মাটিতে। লোক যদি শত্রুতা করে তাহলে আমার কি সাধ্য আছে তা ঠেকাব।

—তা তো ঠিক। নুর মহম্মদ হাত বাড়িয়ে দিল একটা বিড়ির জন্য।

ঝামেলা এড়াতে ডিবা খুলে একটা বিড়ি দিল গিয়াস। নুর মহম্মদ বিড়ির মুখে জোরসে ফুঁ দিয়ে আগুন ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে রহস্যময় চোখে গিয়াসের দিকে তাকাল। রসিকতা করার গলায় বলল, তোমার গাঁয়ে গেছিলাম। তোমার গাঁয়ে ব্যবসা আমার মন্দ হয় না। তা তোমার ঘরে টিপ তালা ঝুলছে দেখলাম। ঘরে বুঝি কেউ নেই?

এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে গিয়াস। লোকটা সব জেনে-শুনে বোকা সাজতে চাইছে। গিয়াসের মুখ থেকে শুনতে চাইছে কেচ্ছা-কাহিনী। সব শোনার পরে এ-ও এক বিকৃত উন্মাদনা। ভাবনার

নীল হয়ে আসে গিয়াসের মুখমণ্ডল। উদ্‌ভ্রান্ত চোখে সে আকাশের দিকে তাকায়, মনে মনে সে বলে, হে আল্লা, তুমি আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করো।

নুর মহম্মদের তর সইছিল না, কী হল, কথা আটকে গেল যে! এবার সে শব্দ করে সবজান্তার হাসি হেসে উঠল, গা-হাত-পা ঝাঁকিয়ে একটা খিস্তি দিয়ে বলল, আমার কাছে গোপন করে আর কি হবে? তোমার বউ পালিয়ে যাবার খপর আমি শুনেছি। কথাগুলো বলেই চুপ করে গেল নুর মহম্মদ। তারপর লুঙ্গি উঠিয়ে দাপনা চুলকে বলল, মরদের কমজোরী হলে বউ পালাবে না তো কি ধরে বসে থাকবে? তোমার যদি অসুবিধে ছিল তাহলে হাকিমের কাছে যেতে পারতে। শেকড়-বাকড় বেঁটে এমন ওষুধ বানিয়ে দিত বা খেয়ে গায়ে হাতির বল পেয়ে যেতে।

—যা ভাবছ, তা নয়। মিনমিনে গলায় গিয়াস কিছু বলতে চাইল।

নুর মহম্মদ তার কাঁধে চাপড়া মেরে বলল, শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে যেও নি-ধরা পড়ে যাবে। নাফিজা যে পালিয়েছে তার এই একটাই কারণ। গিয়াস তবু অস্পষ্ট গলায় বলল, যে থাকার নয় সে তো পালাবেই। আমি তাকে আটকে রাখলেও সে পালাবে। সব ঠিক করা যায় কিন্তু রক্তের দোষ ঠিক করা যায় না।

নুর মহম্মদ চুরুক দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, যা হবার তা তো হয়েছে। এখন কি ভাবছ তুমি?

—ভাবার মনটাই মরে গেছে।

—অত ভেঙে পড়লে চলবে, শক্ত হও। নুর মহম্মদ চোখে চোখ ফেলে তাকাল, সে যখন ধোকা দিয়েছে তুমি তাকে গরম লোহার সেঁক দাও। সে একজনের হাত ধরে পালাল, তুমিও একজনের হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসো। ভাত ছড়ালে কাক-পক্ষীর অভাব হবে নি। তোমার যদি ইচ্ছে থাকে আমাকে খপর দিও। আমার হাতে ভালো মেয়ে আছে।

গিয়াস ঘামছিল, গামছায় মুখ মুছে সে বলল, এবার আমাকে যেতে হবে আঁধার নামছে।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাও। তবে আমার কথাটা মনে রেখো। নুর মহম্মদ জোর গলায় বলল, যে তোমাকে কাঁদিয়েছে, তুমি আর তার জন্যি কেঁদো না। এ দুনিয়ায় সব সম্পর্কই খোলামকুচি। ধুলোর যা জান আছে, সম্পর্কের তা নেই গো। গিয়াস সাইকেলটা টেনে নিল নিজের কাছে। যেন সাইকেল নয়, নাফিজাকে সে যেন নিয়ে এল নিজের নিঃশ্বাসের আওতায়। বউটা পালিয়ে গিয়ে তার মুখে চুনকালি লেপে দিয়েছে যা হাজার সাবান ঘষেও উঠবে না। গ্রাম সমাজে এখন ক'দিন দাপিয়ে বেড়াবে এই সংবাদ। গুজবের হাজার ডালপালা। তার ঝাপটা খেতে খেতে গিয়াস যে কোথায় ছিটকে পড়বে—তা তার জানা নেই। এই মুহূর্তে গিয়াসের মনে হল—হাসপাতালের মাঠটাই তার জন্য নিরাপদ জায়গা। কাজের মধ্যে ডুবে গেলে সে নিশ্চয় নাফিজাকে ভুলে থাকতে পারবে।

থানা থেকে চালান গেল রঘুনাথ।

দুর্গামণি বাস-স্ট্যান্ড অবধি এসেছিল কাঁদতে কাঁদতে। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে রঘুনাথ এমন কাজ করতে পারে। কমলার সঙ্গে ছেলেটার ঘনিষ্ঠতার খবর বানানো নয়। তারপরেও এসব কাজ করার প্রবৃত্তি হল কি করে? হিসাব ভুল হয়ে যাওয়া মানুষের মতো উদভ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাকে।

থানার দু-জন পুলিশ রঘুনাথের মাজায় মোটা দড়ি বেঁধে বাসে ওঠাল। ওর হাতে হ্যান্ড-ক্যাপ। দূরে দাঁড়িয়ে দুর্গামণি হাঁপুস নয়নে দেখল। চোখের জল আটকে রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হল না। ফুঁপিয়ে নয়, আঁচলে মুখ ঢেকে শরীর ঝাঁকিয়ে কেঁদে উঠল সে।

ওর সঙ্গে এসেছিল নূপুর। সে বলল, কেঁদো না কাকি। চলো, বাসে উঠে দাদার সঙ্গে দেখা করে আসি।

—খবরদার, ও কথা বলবিনে। রাগে জ্বলে উঠল দুর্গামণি, চোখের জল মুছে নিয়ে সে চেষ্টা করল স্বাভাবিক হবার, কিন্তু পারল না। মন চাইল একবার গিয়ে দেখা করে আসতে কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন বলল—যেও না। যে ছেলে পরের ঘরে চুরি করে মা হয়ে সে ছেলের মুখ না দেখাই ভালো। মনটা বিক্ষিপ্ত হতেই ভেতরটা ছটফটিয়ে উঠল তার। পৃথিবীর আর কোনো কিছু ভালো লাগছিল না তার। মুখ নিচু করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সে। তবু চোখ দুটো বারবার চলে গেল বাসের জানলায়। একসময় ঝাপসা হয়ে এল তার দৃষ্টি।

রঘুনাথ কুলগাছের ভাঙা ডালের মতো মুখ ঝুঁকিয়ে বসেছিল। চোখ তুলে তাকাবার ক্ষমতা নেই তার। চুরি করতে যাওয়ার বিবেক দংশন বুঝি বা তাকে ঠুকরাচ্ছিল বারবার। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজটা তার করা উচিত হয়নি, ভাবল সে। হাবুল চোরকে কোনোমতে বোঝাতে পারল না সে। মানুষটা তখন একটা শুকনো গাছ। তার কাছে কেঁদেকেটে কি লাভ?

থানায় লুলারাম এসেছিল দেখা করতে। সে এসে আরও তাতিয়ে দিয়ে গেল, ভয় পাবিনে, যা হবার তা হয়েচে। চোর বদনাম একবার রটলে চট করে তা যায় না। তবে যা হয়েচে, ভালো হয়েচে। এতদিন পরে তুর বুদ্ধিশুদ্ধি খুলেচে। তোর বাপকে তো এ লাইনে আনতে পারি নি। তুই এসে আমার দল ভারী হল।

লুলারামকে কী বলবে কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিল না রঘুনাথ। বারবার করে তার শুধু কমলার মুখটা মনে পড়ছিল। যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে কি এভাবে কষ্ট দেওয়া যায়? অথচ কমলা তাকে বাঁচাবার জন্য কত চেষ্টাই না করল। এমনকী সুফল ওঝার পায়ে ধরে কেঁদে উঠেছিল সে। তার নতুন বর ভ্যালভ্যাল করে দেখছিল, জীবনে এমন নাটক বুঝি সে দেখেনি এমন তার হাবভাব। ঘিরে ধরা লোকজনের মধ্যে কাশীনাথকে চিনতে ভুল হয়নি তার। বদলা নেবার জন্য কাশীনাথ ফুটছিল। এই সুযোগ সে হাতছাড়া করল না। তারই নির্দেশে ডান পাটা মুচড়ে ভেঙে দিল মারমুখী মানুষগুলো। তবু বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করেছিল কমলা। সে হেরে গেল। তার প্রেম হেরে গেল। ডুকরে ওঠা বধূবেশী কমলার অসহায় চাহনিই বলে দিচ্ছিল এসব কথা।

এখন সেই বিস্ময় মাখানো, কান্নাকাতর চাহনিটাই বড়ো অসহায় আর কোণঠাসা করে তুলছে রঘুনাথের থেঁতলে যাওয়া সত্তা। একটা প্রশ্ন তার মনে বারবার ঘুরে ফিরে আসছে—সে কি কমলাকে ভালোবাসত না? ভালোবাসলে কি এমন নিষ্ঠুর কাজ করা যায়? বাসটা ঝাঁকুনি দিয়ে নড়ে উঠতেই দৌড়ে এল নূপুর, দাদা, জেঠি এসেচে, তুই ওর দিকে তাকাবি না? নূপুরের কথায় আন্দোলিত হল রঘুনাথ। নিজের ভেতরে তছনছের শব্দ শুনতে পেল সে। লুললুলা মাটি দিয়ে তৈরি খেলাঘরের মতো বারবার ভেঙে যেতে লাগল তার মনের জোর।

ক্রমে ক্রমে ভরে উঠছে বাসটা। একজন পুলিশের হাতে ধরা আছে মোটা দড়িটা। নূপুরের ভালো লাগছিল না দেখতে, এমনটা দেখতে সে অভ্যস্ত নয়, ফলে চোখ ঘুরিয়ে নিল সে। বাস ছেড়ে দেওয়ার আগে নূপুর বলল, তুই ভাবিস নে দাদা, বাবা আর জেঠা পরের বাসে যাচ্চে। ওরা কেসনগরে কোর্টে গিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করবে। বাবা বলছিল—আজই তোর জামিন হয়ে যেতে পারে।

জামিন না হলেও রঘুনাথের কিছু করার নেই। কাশীনাথের নির্দেশে লাঠিয়াল মানুষগুলো ওর পাটাকে জখম করে দিয়েছে। কালীগঞ্জ হাসপাতালের ডাক্তার বলেছেন, মনে হয় পা'টা ভেঙেছে। যদি ভাঙে তাহলে সারতে সময় লাগবে। যেভাবে ফুলে আছে ডান পাটা তাতে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছে না কেউ। থানার গাড়িতে চেপে রঘুনাথ হাসপাতালে গিয়েছিল মেডিকেল চেক আপ-এর জন্য। ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে ব্যথার ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন ডাক্তার। থানায় হাজতে কাল সারারাত ঘুমাতে পারেনি রঘুনাথ। বারবার করে মনে পড়েছে কমলার কথা। কমলার সঙ্গে তার বুঝি বিশ্বাসঘাতকতা করা হল। কোন মুখ নিয়ে সে কমলার কাছে দাঁড়াবে?

বাস ছেড়ে দিতেই মন খারাপ করে নেমে এল নূপুর। যত দূর বাসটাকে দেখা যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় টানটান করে দেখছিল দুর্গামণি। বাসটা একসময় পালপাড়ার বাঁকে হারিয়ে গেল। দুর্গামণির মনটা ভরে গেল শূন্যতায়। যেন কোল ফাঁকা হয়ে গেল তার, সম্পর্ক ছিঁড়ে হারিয়ে গেল একটা মানুষ যে তার কলিজার টুকরা।

নূপুর পাশে এসে বলল, জেঠি গো, ইবার চলো। রোদ বাড়চে। আবার অতটা পথ যেতে হবে।

বেলার দিকে কোনো খেয়াল ছিল না দুর্গামণির। এখন তার মাথার কোনো ঠিক নেই। গুয়ারামও ছেলের চিন্তায় অস্থির। টাকার জন্য সে রেশনবাবুর কাছে গিয়েছিল। রেশনবাবু তাকে টাকা দেয়নি, উল্টে দু-চার কথা শুনিয়ে ছেড়ে দিল। মন বেজার করে গাঁ থেকে ফিরে এসেছে গুয়ারাম।

রঘুনাথ থানায় যাওয়ার পর থেকে মন বেজার হয়ে আছে চুনারামের। মুখে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। মন নয়তো যেন নিম্নচাপের গুমোট আকাশ। প্রথমত সে ভাবতে পারছিল না রঘুর দ্বারা এমন পাপ কাজ হল কী ভাবে? তাহলে কি লুলারামের হাত-এর পেছনে লুকিয়ে আছে? বংশের একজন বিপথগামী হলে অন্যজনকে সেইপথ অনুসরণ করতে হবে—এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। তবু ঘটনাটা দুর্ভাগ্যজনক। চুনারাম মন থেকে রঘুনাথের এই অধঃপতন মেনে নিতে পারেনি। মন বারবার বললেও সে থানায় যেতে পারেনি সংকোচে। কোন মুখ নিয়ে সে থানায় যাবে? কী ভাবে রঘুনাথের মুখোমুখি দাঁড়াবে সে? এই বয়সে এত বড়ো আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা নেই তার। তাই বুকে নীরবতার পাথর রেখে সে গাছের মতো বোবা হয়ে গিয়েছে।

হাজার চেষ্টা করেও জেলবাস রোখা গেল না রঘুনাথের। কোর্ট-চত্বরে দাঁড়িয়ে লুলারাম আশাহত-গলায় বলল, চল দাদা, গাঁয়ে ফিরে যাই। জেল যখন হল তখন তো আর কিছু করা যাবে না। মনকে বোঝাতে হবে। তবে আমরা মাঝে মাঝে এসে রঘুকে দেখে যাবো।

গুয়ারাম প্রতিক্রিয়াহীন গলায় বলল, তাতে আর কি লাভ হবে বল? দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটেরে!

কথাটা সত্যি হলেও লুলারাম পুরোপুরি মেনে নিতে পারে না। রঘুনাথ যা করেছে ভালোই করেছে, এতে তার পূর্ণ সমর্থন আছে। ভাই পারেনি, অন্তত ভাইয়ের ছেলে এসেছে রাস্তায়। এটাই বা কম কি। তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে সে-ই একদিন এ লাইনে সাবালক হয়ে উঠবে।

তিনমাস সময় দেখতে-দেখতে কেটে গেল। খড়ো নদীর জল একপ্রান্ত থেকে গড়িয়ে গেল অন্যপ্রান্তে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রঘুনাথ প্রথমে তার বাবার দিকে তাকাল। ওই মানুষটার মুখের দিকে সে তাকাতে পারছে না লজ্জায়।

ধরা পড়ার পর গুয়ারাম শুধু থানায় এসে একটা কথা বলেছিল। মুখে চুন-কালি লেপার আগে মরতে পারলি না বাপ! তুই মরে গেলে আমি সব চাইতে খুশি হতাম। ভাবতাম আমার কেউ নেই, আমি দেবদারু গাছের মতো একা। আটকুঁড়া।

পাশাপাশি হাঁটতে গিয়ে পা কাঁপছিল রঘুনাথের। গুয়ারামকে মনে হচ্ছিল থানার বড়ো দারোগা।

সময় মতো খেতে পায় না, হাতে টাকা-পয়সা নেই তবু তার তেজ খরিস সাপের চেয়েও কম নয়। ধাওড়াপাড়ায় থেকে এত সাহস কোথা থেকে পায় মানুষটা!

বাস জলঙ্গী নদীর কাছে আসতেই ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল রঘুনাথের বুকের উপর। এখন দিব্যি আরামের আবহাওয়া, রোদ্দুর রঙ এবং স্বভাব বদল করে নিজেকে ভাবছে অঘোষিত রাজা। লোহার ব্রিজে পিছলে যাচ্ছে সেই রোদ, জলের উপর রোদের ক্রমাগত সোহাগ মনকে পৌঁছে দেয় অনেক দূর দেশে।

এত কিছুর পরেও কমলা একদিন ওর স্বামীকে নিয়ে জেলে এসেছিল দেখা করতে। অনেক হ্যাঁপা সামলে শেষ পর্যন্ত কমলা দেখা করতে পেরেছিল রঘুনাথের সঙ্গে। এক পলক দেখেই কান্নাকে আটকাতে পারেনি কমলা। সমস্ত স্মৃতি এসে গলা টিপে ধরছিল ওর। কান্না থামিয়ে কমলা বলেছিল, এত রোগা হয়ে গেছ তুমি। তোমার দিকে তাকানোই যায় না।

একথার কোনো উত্তর দেয়নি রঘুনাথ। উত্তর দেওয়ার মতো ভাষা ছিল না তার। কমলা এক টুকরো কাগজ রঘুনাথকে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এখান থেকে ছাড়া পেলে আমাদের বাড়িতে যেও। ওখানে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার ঘরের মানুষটা তোমার মতো, নিজে যা বুঝবে তাই করবে, পরের কথায় নাচে না।

ঠিকানাটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে রঘুনাথ ভাবছিল ওর সাহসের কথা। সত্যি কমলার যা সাহস আছে তা হয়ত ওর নেই। সেই সাহসে ভর করে কমলা বলল, আমি জানি—তোমার দ্বারা চুরি করার মতন কঠিন কাজ কোনোদিন হবে না। যে একটা ফড়িং মারতে পারে না, সে যাবে পরের দোরে সিঁদ কাটতে! যে বিশ্বাস করে করুক—আমি এসব বিশ্বাস করি না।

কমলার এই জোর, দৃঢ়তা বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা স্থলপদ্ম। স্থলপদ্মফুল তো দূরের কথা রঘুনাথের বুকের মধ্যে সেই ভরসার চারাগাছটা বেড়ে উঠল না আজও। রঘুনাথ সংকোচে কুঁকড়ে গেল, তুমি এত কষ্ট করে এলে কেনে, খপর পাঠালেই তো হত। আমি গিয়ে হাজির হতাম।

—আমি মেসিন নই, রক্তমাংসের মানুষ। কমলার চোখ ধকধকিয়ে উঠল উত্তেজনায়, মনে রেখো, তুমি যা পারো—একটা মেয়ে তা পারবে না। আসলে মনের সাহসটাই বড়ো কথা।

কেমন কুঁকড়ে গিয়েছিল রঘুনাথ, কমলার মুখের দিকে তাকাতে পারেনি সাহস করে। সংকোচের পাঁচিলটা বাড়ছিল ক্রমশ। সেই পাঁচিল সে ভাঙতে পারেনি, এই জড়তা রঘুনাথের জন্মগত অসুখের মতো।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সবার আগে কমলার মুখটাই মনে পড়ছিল রঘুনাথের। কোথায় যেন অপরাধবোধের সূক্ষ্ম একটা খোঁচা তার মনের ভেতর বিঁধছিল। এর থেকে কিছুতেই সে নিষ্কৃতি পাচ্ছিল না।

বাস থেকে নামতেই লুলারাম তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিল, সাবাস রঘু, তুই যা করেচিস এর জন্যি আমার মনে কুনো খিঁচখিচানি নেই। তুর জন্যি আমার ছাতি ফুলে যায়। তুর বাপ যা পারেনি, তুই তা পেরেচিস। বাঁচার জন্যি সব কিচু রসদ তুর আচে। ইবার শুধু বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে হবে। দেখবি তুর জীবনের গোরুর গাড়িটা হড়হড়িয়ে চলচে।

কাকার কথা শুনে মোটেই উৎসাহিত হয়নি রঘুনাথ, বরং মনে মনে সে দগ্ধে মরছিল। এ যন্ত্রণার কথা সে কাউকেই বলে বোঝাতে পারবে না। কমলা তাকে ভুল বোঝেনি এই যা রক্ষে। বাঁধের উপর পাশাপাশি হাঁটছিল লুলারাম আর রঘুনাথ। কথা বলার ইচ্ছে ছিল না ওর। লুলারাম পিটুলিগাছের মাথা থেকে চোখ ফিরিয়ে বলল, মনটারে শক্ত কর।

রঘুনাথ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, এ কাজ আমার জন্যি নয় কাকা! প্রথমেই বাধা পেয়ে গেলাম, পরে কি হবে কে জানে।

—অতো ভাবিস নে, সব ঠিক হয়ে যাবে। লুলারাম মন পাওয়ার জন্য বলল, হাবুল চোরের তুকে দিয়ে এ কাজ করানো উচিত হয়নি।

কেন উচিত হয়নি—চমকে উঠল রঘুনাথ। কাকা কি কমলার ব্যাপারটা সব জেনে গেছে। দুর্বলতার কথা বেশিক্ষণ চাপা থাকে না। আর প্রেম-ভালোবাসার সংবাদ তো পাখি হয়ে ওড়ে। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে রঘুনাথ অস্বস্তিভরা দৃষ্টি মেলে তাকাল, আমি মানা করেছিলাম, সে আমার কথা শোনে নি।

—ওর মতন বোকা মানুষ আমি আর দুটি দেখিনি।

—সে আমার গুরুজী হয় গো। তার কথা শুনে আমি গিয়াস ভাইয়ের রসের কাজটা ছেড়ে দিলাম।

—ভালো করেছিস। ও কাজে কুনো জীবন নেই রে। লুলারাম আক্ষেপের সঙ্গে বলল, দূরের দিকে তাকাবি। বড়ো কিছু দেখবি তবে না জীবন। আর কত ছোট হয়ে থাকবি—বল ভাইপো? গাঁয়ের অনেকে আমাদের নেকনজরে দেখে। অনেকে ঘেন্না করে। তাদের আমি মুখের মাপে জবাব দিতে চাই। সবাই তো মুনিষ খেটে মরল। আমি ওভাবে মরব না। মরার আগে সবাইকে দেখিয়ে দিয়ে যাবো, লুলারাম রাজোয়ারও পারে মাথা সিধা করে বাঁচতে।

কাকার এই তেজ ভালো লাগে রঘুনাথের, আমি তুমার সাথে আচি। ভেবো না আমি পিছিয়ে যাব।

—সুফল ওঝার মেয়েটারে তুই বিয়ে করে নিলেই পারতিস।

লুলারামের কথায় ধকধকিয়ে উঠল রঘুনাথের মনটা। নিজেকে সামলে নিয়ে সে শান্ত চোখে তাকাল, পরের মেয়েকে কষ্ট দিয়ে কি হবে?

—কষ্টর কথা আসচে কেন?

—ওরা মানে-সম্মানে সব দিক থিকে বড়ো।

—ওকথা বলিস নে। সব মানুষ সমান। আমরাই সব আলাদা-আলাদা করে দিয়েচি।

—তবু পায়ের নখ আর হাতের নখ এক হতে পারে না।

—এই ভুলই তো আমাদের কাল হয়েচে। লুলারাম মেনে নিতে পারছিল না কথাগুলো, সময়ের সাথে সাথে মানুষকেও বদলে নিতে হয়, না হলে পরে ঠকতে হয়। নিজে না শুধরালে তাকে কেউ শুধরে দিতে পারে না।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল রঘুনাথের, প্লাস্টার কাটার পর থেকে পা'টা যেন আগের অবস্থায় ফিরে আসছে। মাঝে মাঝে ব্যথা উঠলে কাশীনাথের রাগী মুখটা মনের ভেতর শিঙ্গি মাছের মতো কাঁটা মারে। কাশীনাথকে সহজে ছাড়বে না—এমন একটা জেদ তার ভেতরে বেড়ে ওঠে।

বিবর্ণ পিটুলিগাছের পাতাগুলো কুঁকড়ে গিয়েছে রোদে, ধুলো জমে পাতাগুলোর মনমরা দশা। বাঁধের পাশের জামগাছটাকে এতদিন পরে নিজের বলে মনে হয় তার। এই চেনাজানা পরিবেশ আজ তাকে যেন নতুনভাবে দেখছে। এদের সবার কাছে ভীষণভাবে ছোট হয়ে গিয়েছে রঘুনাথ। নিজের দুষ্কর্মের জন্য এদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না সে।

আগড় সরাতেই দুর্গামণির সঙ্গে চোখাচোখি হল রঘুনাথের। এক জাহাজ অভিমান নিয়ে পাশে সরে দাঁড়াল সে, মুখে কোনো কথা নেই, ঠোঁট কাঁপছিল থরথরিয়ে। 'মা' বলে ডাকতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল রঘুনাথ। মায়ের এই গুমোট মনোভাবের পরিণতি সে জানে। না খেয়ে মরবে তবু এই চোরুয়া ছেলেকে ক্ষমা করবে না সে। কেন ক্ষমা করবে? যে ছেলে মায়ের মুখে চুনকালি লেপে দেয় সে আবার কেমন ছেলে। দুষ্টু গোরুর চাইতে শূন্য গোয়াল ঢের ভালো। এই নীতিতে দুর্গামণির দিন কাটে।

রঘুনাথ জড়তা কাটিয়ে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে ডেকে উঠল, মা।

দুর্গামণি ফণা তোলা সাপের মতো ঘুরে দাঁড়াল, খবরদার, তুই আমারে মা বলে ডাকবি নে। তুই কুলাঙ্গার। তোর মুখ দেখাও পাপ।

—মা। রঘুনাথ কী যেন বিড়বিড়িয়ে বলতে চাইল, তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল দুর্গামনি, কোন মুখে তুই আমাকে মা ডাকিস, এ্যাঁ? তুর লাজ লাগে না? আমি কুনো চোরের মা হতে পারবো নি। ছ্যাঁঃ! বাড়ি মেরে মাটিতে লুটিয়ে দেওয়া কচাগাছের মতো মুখ মাটির দিকে ঝুঁকে গেল রঘুনাথের, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো ভাষা তার মুখে বালিছাতুর মতো ফুটে উঠল না। উল্টে পুরো মুখটাই কালি হয়ে গেল লজ্জায়, অপমানে। কানের ভেতর থেকে একটা গরম ভাপ বেরিয়ে তার মানসিক স্নায়ুগুলোকে ঝিমিয়ে দিল।

দুর্গামণির রাগকে শান্ত করার জন্য এগিয়ে এল লুলারাম, পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করার জন্য সে বলল, কেন মিচিমিচি রাগ করচো, বৌদি? ছেলে বলে কথা, এতদিন পরে ঘরে এল, এত রাগঝাল করলে চলে?

—আমার মাথা গরম করে দিও না ঠাকুরপো। চোখে আগুন উসকে তাকাল দুর্গামণি। তবু ভয় পেল না লুলারাম। ঠোঁটে বেহায়ার হাসি ঝুলিয়ে বলল, যা হবার হয়েচে, এবার এসব ছাড়ো তো। যাও, চা বসাও। এদিক-সেদিক তাকিয়ে সে বলল, দাদাকে তো দেখচি নে, কুথায় গেল সে? দাদা কি জানে না রঘু আসচে।

—তার কথা তাকে শুধাও গে। মুখ ঝামটা দিয়ে দুর্গামণি চলে যেতে চাইলে লুলারাম তাকে থামাল, শোন বৌদি, এট্টা কথা বলি তুমাকে। মন দিয়ে শোন—

—তুমার কোনো কতা আমি শুনব না। তুমি এখন ঘর যাও।

আহত গলায় লুলারাম বলল, তাড়িয়ে দিচ্চো?

দুর্গামনি তবু নরম হল না, হ্যাঁ, তাই ধরে নাও। পচা আঙুল কেটে ফেলাই ভালো।

—তার মানে?

—মানেটা খুব সহজ গো! বিচিত্র হেসে দুর্গামনি কঠিন গলায় বলল, এই ছেলেকে আমি খরচের খাতায় ফেলে দিয়েচি। এর ভাতও চাই না, আগুনও চাই না।

—মাথা গরম করো না, একবার ভাবো।

—তিন মাস ধরে অনেক ভেবেচি ঠাকুরপো। শুধু ভাবিনি, কেঁদেওচি। কুনো কূল কিনারা পাইনি গো! আমার বাসিভাত খাওয়া পেটে এমন অসুর কুথা থেকে এল বুঝিনে। আঁচলে মুখ ঢেকে আবার ফুঁপিয়ে উঠল দুর্গামণি, তুমি এখুন যাও ঠাকুরপো। আর কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না। আর এট্টা কথা—নিজের আয়নায় অন্যকে দেখতে যেও না, ঠকবে।

লুলারাম আর দাঁড়াল না, হনহনিয়ে হেঁটে গেল বেড়ার ধারে। আগড় খুলে ধুলো পথে এসে দাঁড়াল সে। সারাদিনের মেহনতটা তার মাটি হল। দুর্গামণির মন কঞ্চি নয় যে ধাপিয়ে দেবে। পাটকাঠি হলে ভেঙে যেত। এত মনের জোর এই অভাবের সংসার থেকে পেল কীভাবে—এসব ভাবতে ভাবতে নিজের উঠোনে ঢুকে এল সে।

চুনারাম ঘাস কেটে ফিরেছে মাঠ থেকে। ঘাসের বোঝাটা গোরুর পাতনার কাছে নামিয়ে সে দেখতে পেল রঘুকে। বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল তার। বংশের বাতি জেল খেটে আজ ঘরে এল। এ লজ্জা কোথায় লুকাবে সে। গরীব মানুষের মান সম্মান ছাড়া হারাবার তো আর কিছু নেই। সেই অমূল্যধন ক্ষুইয়ে আজ ঘরে এসেছে রঘুনাথ। না এলেই বুঝি ভালো হত। বেশ বিব্রত আর অসহায় দেখাল চুনারামকে।

কীভাবে নাতির মুখোমুখি দাঁড়াবে সে—কী বলবে তাকে—এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগল

চুনারামের মাথার ভেতর। তবু দাঁড়াতে হয়, না দাঁড়ালে কি পারা যায়? অনেক দিন পরে চুনারামের মনে হল সে নিজেই যেন কোনো জঘন্য অপরাধ করে ঘরে এসেছে, তার এতদিনের জমিয়ে রাখা অহঙ্কার সব মিশে যাচ্ছে ধুলোয়।

রঘুনাথকে পাশ কাটিয়ে তক্তপোষের দিকে যেতে গেলেই একটা ডাক ভেসে আসে তার কানে, দাদু!

এবার দাঁড়িয়ে পড়ল চুনারাম। যান্ত্রিকভাবে মাথাটা বেঁকিয়ে শুধোল, কি?

—কেমুন আচো গো দাদু? রঘুনাথের গলায় আবেগ কচুপাতার জলের মতো টলমল করছিল।

চুনারাম কিছুটা নীরসভাবে বলল, না মরে বেঁচে আচি। গরীবের আর থাকা না থাকা।

অবস্থা সুবিধার নয় বুঝে রঘুনাথ বলল, বড়ো ভুল করে ফেলেচি, ইবারের মতুন মাপ। চুনারাম কিছুটা উত্তেজিত, সব কাজের কি মাপ হয় রে?

এবার কি জবাব দেবে শরীর হাতড়েও খুঁজে পেল না রঘুনাথ। এ বাড়ির সবাই এত নিষ্ঠুর হবে ভাবতে পারেনি সে। নিজের ঘর এ কমাসে পর হয়ে গেছে তার কাছে। সে ভেবেছিল অন্তত মা তাকে সব ভুলে গিয়ে আবার আগের মতো কাছে টেনে নেবে। ভুল। মা'র ভেতরের পাথরটাকে সে আর এ জীবনে গলিয়ে নরম করতে পারবে না। এত কাছের দাদুও তার পর হয়ে গেল। ভালোভাবে কথাও বলতে চাইছে না ওরা। এই মানুষগুলো এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল? রঘুনাথ ভাবত—এরা এলেবেলে, খড়কুটো। এরা শুধু পেটে খেয়ে বাঁচার জন্য প্রাণপাত করে। এদের কোনো আদর্শ নেই, ধর্ম নেই। এতদিন ভুল বুঝেছে রঘুনাথ। চোখের দু'কোল মুছে নিয়ে বাইরে এল সে।

খাঁ-খাঁ করছে দুনিয়া। আজ যেন বুড়িগাঙও তার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। বুকটা পাথর হয়ে এল তার। জমাটবাঁধা দুঃখগুলো কান্না হয়ে ঝরে পড়তে চাইল পথের ধুলোয়।

যে ঘরে তার জন্য এত ঘৃণা এত অবজ্ঞা জমে আছে—সেখানে কি তার থেকে যাওয়া উচিত হবে—একথা বারবার করে ভাবল রঘুনাথ। আকাশ আর এই ধুলোপথ ছাড়া আর কোনো কিছুকেই তার আপন বলে মনে হয় না।

টগরী কিতকিত খেলছিল, নূপুর ছককাটা ঘরের পাশে দাঁড়িতে অপেক্ষা করছিল দান পাওয়ার। ওর শুঁশিয়ার চোখ সতর্ক মাছরাঙার মতো দেখছিল টগরী দাগে পা দেয় কী না।

তখনই রঘুনাথকে ছন্নছাড়াভাবে যেতে দেখে টগরী উৎসাহ নিয়ে লাফিয়ে উঠল রঘুদা, কবে এলে গো?

খেলা থেমে গেল টগরীর। পা দুটো ফাঁক করে অদ্ভুত কায়দায় সে দাঁড়িয়ে আছে। নূপুর দৃষ্টি ঘুরিয়ে রঘুনাথকে দেখে থ। দান-দেখা ভুলে সে দৌড়ে গিয়ে রঘুনাথের মুখোমুখি দাঁড়াল, দাদা, কখন এলি রে?

রঘুনাথ কোনো কথা না বলে গম্ভীর হয়ে দাঁড়াল।

টগরী আপন মনেই বলল, তুই চলে যাবার পর জেঠি কত কানছিল।

কথাগুলো যেন লিকলিকে চাবুক হয়ে আছড়ে পড়ল রঘুনাথের পিঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে কিছু বলতে গেলেই নূপুর তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, কুথায় চললি ঘর চল। আমি আর খেলব না।

রঘুনাথ এবার বাধ্য হল মুখ খুলতে, আমি ঘর যাবো না, মাঝের গাঁ যাবো।

—মাঝের গাঁ পরে যাস। এখন ঘর চল তো, কথা আচে। নূপুরের ঠোঁটে হাসি এক রহস্যময়তার গন্ধ দিল রঘুনাথকে। এসব এড়িয়ে সে টগরীর মাথার হাত রাখল স্নেহের, এখন কেমুন আছিস রে টগরী?

টগরী মুখ ফাঁক করে বলল, খু-উ-ব ভালো। কেসনগরের ডাক্তার দেখেছিলো, ওষুধ দিয়েছিলো তাতে ভালো হয়ে গিয়েচি, দাদা। এখুন আর পেটে কুনো বিদনা হয় না। এখুন আমি রোজ কিতকিত খেলি।

সূর্যের কিরণের চেয়েও ঝকমকে হাসছিল টগরী, হাসতে হাসতে সে কেমন উদাস হয়ে গেল, রঘুনাথের ডান হাতটা চেপে ধরে বলল, দাদা গো, তুমাকে যেদিন পুলিশ ধরে নিয়ে গেল—সেদিন আমি কত কান্‌লাম। মা শীতলাবুড়িকে বললাম—আমার দাদাকে যেন পুলিশ না মারে। দাদা, তুমাকে কি পুলিশ মেরেছিল? কুথায় মেরেচে গো? আর কুনোদিন খারাপ কাজ করো না দাদা।

আবার দু-চোখ বর্ষার মেঘের মতো ভারী হয়ে উঠছিল রঘুনাথের, কোনো মতে টগরীর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলল, তুই ভালো আচিস শুনে আমারও খুব ভালো লাগল। তোর অসুখে আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেছিলাম।

—তুমার কি মন বলছিল আমি মরে যাব?

—না রে পাগলি, তা কেনে হবে?

টগরী বিষণ্ণ হয়ে বলল, আমার কাচে লুকিয়ো না। আমি সব বুঝি গো। এ পাড়ার কেউ ভাবতে পারেনি, আমি আবার বেঁচে ফিরব। তবে দাদা, আমি জানতাম—আমি মরব না। কষ্ট পাবো, কিন্তু মরব না। হাসপাতালে রোজ শীতলাবুড়ির সাথে আমার কথা হত। আমি বেছানায় শুয়ে-শুয়ে তারে ডাকতাম যে—!

টগরী আর নূপুরকে এড়িয়ে যাওয়া রঘুনাথের পক্ষে সম্ভব নয়। ওরা ফুলগাছের মতো ডালপালা দিয়ে ঘিরে ধরেছে ওকে। সুগন্ধ এড়িয়ে মানুষ কতদূর যেতে পারে?

নূপুর রঘুনাথের হাতে ইঙ্গিতপূর্ণ চিমটি কেটে হাসল, দাদা, কমলাদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অনেক কথা আচে, তুই কখন আসবি বল?

যে সম্পর্ক শুকিয়ে গিয়েছে, সেই সম্পর্কে কিভাবে ফিরে আসে বিদ্যুৎ-এর শিহরণ। রঘুনাথ শুধু চমকে উঠল না, অবাকও হল কিছুটা। নূপুরের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কিছুসময় বাক্যহারা হয়ে রইল।

নূপুর বলল, দাদা, কমলাদি ঘরে এয়েচে। ওর বরও সাথে এয়েচে। আমাকে বলল—তুমাকে খবরটা দিয়ে দিতে।

রঘুনাথের ভেতরটা তছনছ হয়ে গেলেও সে যথাসম্ভব প্রতিক্রিয়াহীন থাকার চেষ্টা করল নূপুরের সামনে। কমলার কোনো কথাই সে রাখতে পারেনি। জন্মগত সংকোচ তাকে পা বাড়াতে দেয়নি। পদে পদে বাধা এসে আগলে দিয়েছে পথ। সাহস করে কমলার হাত সে চেপে ধরতে পারেনি—এটা তার অক্ষমতা। উল্টে হাবুল চোরের কথা শুনে সে একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যার কোনো ক্ষমা নেই। এই আফসোস কবে যে শেষ হবে কে জানে।

নূপুর হাঁ-করে তাকিয়ে ছিল কিছু শোনার জন্য, রঘুনাথ এড়িয়ে যাবার জন্য বলল, ঠিক আচে, তুই এখুন যা। কমলার সঙ্গে পরে আমি দেখা করে নেব।

—দেখা করো কিন্তু। নূপুর নিশ্চিত হতে চাইল।

টগরী হাসতে হাসতে বলল, দাদা, আমাদের ঘরে কবে যাবা?

রঘুনাথ হাসতে গিয়েও পারল না, কষ্ট হল, কোনোমতে বলল, বেঁচে থাকলে ঠিক যাব। তোরা এখন যা—।

বাঁধের গা বেয়ে ঢালু পথটা গ্রামের ভেতর ঢুকে গেছে। গাছগাছালির ছায়ায় শান্ত পথ যেন ঘুমিয়ে আছে। নুয়ে পড়া বাঁশঝাড়ের সাথে পথের কি সখ্যতা রঘুনাথ জানে না তবু তার মনে হল এই চিরন্তন সম্পর্ক বুঝি মা আর সন্তানের মতো স্নিগ্ধময়।

একা হাঁটলে নিজের সঙ্গে কথা বলে মানুষ। নিজের সঙ্গে কথা বলে এখন ক্লান্তবোধ করে রঘুনাথ। বারবার করে তার মনে ভাসছে দুর্গামণির মুখ। সুখের বদলে দীর্ঘ মন্থনে উঠে আসছে দুঃখ। মা কি তার পর হয়ে গেল? দাদু? এত ঠুনকো এসব দীর্ঘকালীন সম্পর্ক? কে জানে। মানুষ অনেক কিছুই জানে না, বোঝে না।

রঘুনাথ সূর্যাক্ষের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল, সূর্য, সূর্য।

মীনাক্ষী বাইরে এসে দেখলেন তাকে। কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। মুখ ঘুরিয়ে নিঃশব্দে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন তিনি। রঘুনাথ দূর থেকে দেখতে চাইল—ওই মুখে তার জন্য কতটুকু ঘৃণা জমেছে এতদিনে?

মন খারাপ করার আরও অনেক কিছু রসদ লুকিয়েছিল রঘুনাথের জন্য। দ্বীপীদের বাড়িতে এসে সে জানতে পারল সূর্যাক্ষ পরীক্ষা দেবার জন্য কালীগঞ্জে চলে গিয়েছে। পরীক্ষা দেবার ক'দিন ওরা ওখানেই থাকবে। এতে সুবিধে অনেক, যাওয়া-আসায় সময় নষ্ট হয় কম। পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা আরও সহজ হবে। ঝড়-জলের আশঙ্কা প্রায়দিনই লেগে আছে, এখানকার বর্ষাঋতু কারও ধার ধারে না।

দ্বীপীদের বাড়িতে অদ্ভুত এক মৌনতা লক্ষ্য করল রঘুনাথ। মন খুলে কেউ তার সঙ্গে কথা বলল না। ঠিক এড়িয়ে যাওয়া নয়, অথচ অপ্রত্যক্ষভাবে এড়িয়ে যাওয়াটা মর্মে বিঁধে গেল রঘুনাথের। অন্তর্গত পাপবোধ তাকে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে দিল না কিছুতেই।

ঘরে বাইরের এই দংশন রঘুনাথকে খোলা আকাশের নিচে দাঁড় করিয়ে দিল। মনে মনে সে ভাবল তার সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এবার সে যাবে কোথায়? শুভর কাছে গেলে ওর মা নিশ্চয়ই তাকে তাড়িয়ে দেবে না। তবু ওখানে যেতে ইচ্ছে হল না তার। বিতাড়িত হবার জ্বালা অনেক। এই জ্বালা থেকে মুক্তির উপায় কি?

রঘুনাথ হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেল বড়ো গঙ্গার শ্মশানের কাছে। জায়গাটা নির্জন, জল সেই নির্জনতাকে প্রকট করেছে। এখানে এলে একটা ভেজা গন্ধ টের পায় রঘুনাথ। পা ছুঁয়ে থাকা মাটি যেন একাকীত্বের কথা বলে।

বয়ে যাওয়া গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রঘুনাথের মনে হল তার এই জীবনের কি দাম আছে? গ্রামসমাজে একবার সম্মান হারালে সহজে তা ফিরে আসে না। পুকুরের জলে হারিয়ে যাওয়া সুঁচ খুঁজে পাওয়া সহজ, কিন্তু ডাঙায় হারানো সম্মান ফিরে পাওয়া আরও কঠিন। নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই যেন ভয়ে কুঁকড়ে গেল রঘুনাথ। সূর্যাক্ষ, শুভ, সবুজ... সবার সঙ্গে মেশার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে সে। এ কালিলেপা মুখ নিয়ে সে কোন ভরসায় ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। এমন ভাবনায় কেঁপে গেল রঘুনাথের দুর্বল হৃদয়। সব হারিয়ে গেলে দুঃখ নেই, কিন্তু বন্ধু হারিয়ে গেলে সেই দুঃখভার সে কি বইতে পারবে?

হরনাথ দূর থেকে দেখেই চিনতে পেরেছিল রঘুনাথকে। অমন মুখ ঝুঁকিয়ে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এল সে। লাল-লাল চোখ, মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, ফোলা গোলাকার মুখ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল হরনাথ, খুব নিবিষ্ট চোখে রঘুনাথকে জরিপ করে বলল, কি রে কবে এলি?

মনে মনে আঁতকে উঠল রঘুনাথ, তার জেল যাওয়ার খবরটা শ্মশানের ছাইভূমিতেও এসে পড়েছে, এবার কোথায় পালাবে সে, কোথায়? মুক্তির রাস্তাগুলো কেন্নো হয়ে শুয়ে আছে জড়োসড়ো। এই গুটিয়ে থাকা জীবনের উপর তার কোনো আগ্রহ নেই।

হরনাথ সহজে ছাড়ার পাত্র নয়, রঘুনাথের পাশে বসে শুধোল, কী হয়েচে তুর? ঘর থিকে পেলিয়ে এয়েচিস বুঝি?

ঘাড় নাড়ল রঘুনাথ, পেলিয়ে আসব কেন? পেলিয়ে পেলিয়ে কদ্‌দিন আর বাঁচা যাবে বলো?

—তা ঠিক। কোমরে লাল গামছাটা জড়িয়ে নিল রঘুনাথ। চোখ রগড়ে নিয়ে সে হরনাথের দিকে তাকাল, তুমি তো শ্মশানে থাকো রাতদিন, তুমার কাচে নেশার কিচু হবে নাকি?

—তুই নেশা করিস? হরনাথ জটা ধরা চুলগুলো আঙুলে জড়াতে জড়াতে প্রশ্ন করল।

সশব্দে হাসল না রঘুনাথ, শুধু ঠোঁটে হালকা হাসি মাখিয়ে বলল, নেশা না করলে এসব কু'কাজ কি করা যায় গো?

—ছেড়ে দে বাপ। নেশায় কিচু নেই রে—

—যারে ধরেচি, তারে ছেড়ে দিলে লোকে আমাকে বেইমান ভাববে। রঘুনাথ গোল গোল চোখ মেলে তাকাল।

কপাল কুঁচকে হরনাথ আক্ষেপের সঙ্গে বলল, তুর বাবা আমার সাথে মদ খায়।

—বাপ খায় যখন, ছেলে খেলে বুঝি দোষের হয়।

—না তা নয়। হরনাথ অবাক হয়ে শুনছিল।

রঘুনাথ বলল, আজ আমি জেল থিকে ছাড়া পেয়েচি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ভাবলাম—যাক আমি আজ বেঁচে গেলাম। আমি যা ভেবেচি—তা ভুল গো। জেল শুধু কেসনগরে নেই, জেল গায়ে-গঞ্জে সবখানেতে আচে।

—তুর হেঁয়ালি কথা রাখ, বাপ। নেশা করতে মন চায় তো চ। হরনাথ ওর হাত ধরে টানল।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল রঘুনাথ। ক্লান্তিতে নুয়ে আসছে শরীর। তবু কষ্ট করে বেশ কয়েক কদম হেঁটে এল সে। চ্যাটচেটে পরিবেশে কাঁচা মদের ঘ্রাণ ভালো লাগে তার। গন্ধটা গাঢ় কুয়াশার মতো জড়িয়ে যাচ্ছে গায়ে।

পরপর তিন গেলাস খেয়ে ঢেকুর তুলে হরনাথের দিকে তাকাল রঘুনাথ, আর এট্টু দাও। নেশাটা জমচে না।

—আর খাস নে, মরে যাবি। যা, এবার ঘর যা। হরনাথ রঘুনাথকে বোঝাতে চাইলে গলা ফাড়িয়ে হেসে উঠল সে, আমাকে বোঝাতে এসো না গো। সকাল থিকে অনেক বুঝেচি। মাথা আর নিতে পারচে না। জোর করে বোঝাতে গেলে মাথা ফেটে ঘিলু বেরিয়ে যাবে—বুঝলে?

হরনাথ বুঝল নেশাটা গাঢ় হয়েছে রঘুনাথের। হাঁটা-চলার ক্ষমতা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে সে। একসময় সাট পাট হয়ে সে শুয়ে পড়ল বালির বিছানায়। তাকে আর সহজে ওঠাতে পারল না হরনাথ।

ভোরের দিকে হাবুল চোরের ঠেলা খেয়ে ঘুম ভাঙল রঘুনাথের। জড়ানো স্বরে শুধোল, কে, কে তুমি?

—চিনতে পারছিস নে ব্যাটা? আমি তোর...

—ও বুঝেচি, বুঝেচি। রঘুনাথ বালিতে ভর দিয়ে উঠে বসল। চোখ রগড়ে নিয়ে বলল, গুরু দক্ষিণা এভাবে কেনে নিলে ওস্তাদ? তুমাকে কতো করে মানা করলাম আমি যাবো নি, তবু তুমি আমার কথা শুনলে নি। ভালোবাসা অভিশাপ দেয় গো, সে অভিশাপ বড়ো মারাত্মক।

—ঘর চল। আমি তোরে ঘরে দিয়ে আসি।

—না। ওটি করো না। তাহলে আমার আঃ-ও যাবে, ফুঃ-ও যাবে। রঘুনাথের স্বরে ব্যাকুলতা ঝরে পড়ল। হাবুল চোর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, পুলিশে ছুঁলে বাঘের চেয়েও বিষ বেশি হয়। মাস কয়েক সমঝে চল। তারপর তোকে আমি সময় মতো ডেকে নেব।

—তুমার ডাকে আমি আর যাব না। তুমি হলে গিয়ে মরণফাঁদ।

—কাকে কি বলচিস? হাবুল চোর রঘুনাথের দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দিল, তোর নেশা এখনো কাটেনি। নেশা কাটলে পেছন থাবড়াবি বলে দিচ্ছি।

—আর জ্ঞান দিও না, ঢের হয়েচে। রঘুনাথ জ্বলে উঠল, তুমার জন্যি আমার সব গেল! মা ছিল,মা-ও পর হয়ে গেল!

—দূর বোকা, মা কুনোদিন পর হয় রে?

—হয় গো হয়। নাহলে আমার ঘরে গিয়ে দেখে আসো। রঘুনাথ ডুকরে উঠল, দাদুও আমার সাথে কথা বলচে না। আমাকে ঘেন্না করচে যেন আমার গায়ে কুঠ ফুটেচে।

—এতে আমার দোষ কুথায়?

—সব দোষ তুমার। তুমি আমাকে হাতে ধরে বেলাইনে নিয়ে এলে। আমি তুমার ছেলের মতো। ছেলেকে কেউ হাড়িকাঠে গলা দিতে ঠেলে দেয়। মাথার চুল মুঠো করে আর্তনাদে ভেঙে পড়ল রঘুনাথ।

হাবুল চোর আর দাঁড়াল না, পেছনের ভেজা বালি ঝেড়ে বলল, গুয়ে শালিখের মতো তোর জন্ম। কত আর ভালো হবি বাপ। আমি চললাম। এবার তুই নিজের পেছন নিজে চাপডা।

কথাগুলো শেষ না করেই হনহনিয়ে হেঁটে গেল হাবুল চোর। ভোরের আলো ফোটার আগে থানায় তাকে হাজিরা দিতে হবে। যা কড়া বড়োবাবু এসেছে হাজিরায় দেরি হলে মেরে মাজা ভেঙে ঘরে শুইয়ে রাখবে মাসের পর মাস। চুরি বিদ্যে তখন শিকেয় তোলা ফুলের মতো শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে যাবে। শুকনো ফুলের এক পয়সাও দাম নেই—এটা হাবুল চোরের চাইতে ভালো করে আর কেউ জানে না।

পাল্টে যাওয়াই প্রকৃতির ধর্ম।

মাত্র এক বছরে অনেকটাই বদলে গিয়েছে হলদিপোঁতা। পিটুলি গাছের পাতাগুলো টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে ক'দিন হল। ঝারির কোল ভরেছে মাস কয়েক আগে।

ভূষণী বুড়ি ধার পাত্তিতে ওর নাড়ি কেটে বলল, তুর বেটা হয়েচে রে, বউ! নাড়ি শুকোলে আমাকে নিদেন পক্ষে সোনা দিবি। ইবার আর কাঁসা পেতলে মন ভরবে না। তুর বাঁজাগাছের ফল, শুকনা হাতে বিদেয় আমি লিবো নি।

কোঁত পাড়তে গিয়ে ঘেরা দাওয়ায় চোখে জল এসে গিয়েছিল ঝারির। প্রসব বেদনায় যে এত সুখ স্বপ্নেও ভাবেনি সে। কাঁচা খোকার মুখের দিকে তাকিয়ে তার চোখের তারা স্থির হয়ে গেল।

ভূষণী বুড়ি বলেছিল, আর কাঁদিস নে বউ। পেট হালকা হলে মনও হালকা হয়। হালকা মন কেঁদে কেঁদে আর ভার করিস নে। মেঘলা দিন কার আর ভাল্ লাগে বল?

দেখতে দেখতে চাঁদের টুকরো ছেলেটা এখন কোল ভরিয়ে হাসে। মনে হয় যেন বুড়িগাঙের জলে কোজাগরী চাঁদ খেলছে, সাঁতরে ডুব দিয়ে আবার ভেসে উঠছে। তখন বুকের ভেতর অদ্ভুত এক কাঁপুনি টের পায় ঝারি। ভিকনাথ পাশে বসে ছেলের চুকচুকিয়ে দুধ খাওয়া দেখতে দেখতে বলে, দুধ দেওয়ার সময় এত কি ভাবো বলোদিনি?

ঝারির হুঁশ ফেরে, ভাবার আর সময় পাই কখুন? মায়ের দুটা সময় ভাবনা বেশি। ছেলেকে দুধ খাওয়ানোর সময় আর উকুন মারার সময়। এছাড়া ভাবার আর সময় কুথায়।

ঝারির চোখে দেওয়ালির তারাবাতির ঝিলিক। তার সারা শরীরে মাতৃত্বের রেণু দুধের সরের

মতো কোমল হয়ে জড়িয়ে আছে। ভিকনাথ চোখ ফেরাতে পারে না। এ ঝারি তার চেনা নয়, একে যেন সে প্রথম দেখছে।

মা হলে যে কোনো মেয়ে আকাশের চেয়েও সুন্দর। পাকুড়গাছের নতুন পাতা গজানোর মতো তার লাবণ্য-আভা। মাতৃত্বের আলোটাই আলাদা। তবু এই অলৌকিক আলোর মধ্যে অন্ধকারের সাপটি ঘাপটি মেরে বসে থাকে। সেই সাপটাই মাঝে মধ্যে ফণা তোলে। বিষ ঢেলে দিতে চায়।

লুলারামের ব্যবহার এখন ঝারির কাছে পাগলের মতো মনে হয়। ওর আব্দার মেটাতে ঝারি অপারগ। লুলারাম তাকে দোষারোপ করে বলে, তুমার জন্যি আমার বউ মরল। এখুন আমাকে এড়িয়ে গেলে চলবে? আমার এটাও তো শরীল। আমারও তো খিদে পায়।

—অন্য পথ দেখো। ঝারি মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—তুমি আমার ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। লুলারাম জোর করে হাসে, আজ সাঁঝবেলায় পাটের খেতে এসোক্ষণ।

—আমি আর তুমার কথা শুনব না।

—না শুনলে চলবে না। গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলে চলবে? ধীরে ধীরে তেতে উঠছিল লুলারাম।

ঝারি ততোধিক শান্ত হয়ে বলল, এই শরীল নিয়ে আমি পাটের ভুঁইয়ে যেতে পারব নি, জানগুরু মানা করেচে।

—ও শালারে আমি খুন করব। তুমি যদি না আসো কাল শুনবা জানগুরুর কেউ টুঁটি কেটে দিয়েচে। লুলারাম চিবিয়ে চিবিয়ে হাসল।

ভয় পেয়ে মুখটা মলিন হয়ে গেল ঝারির, খবরদার ও কাজ করো না। ওই মানুষটা না থাকলি পরে আজ আমি কুথায় তলিয়ে যেতাম। তুমরাই সবাই মিলে আমাকে মেরে ফেলতে।

—এ তুমার মন গড়া কথা। লুলারাম চোখে চোখে হেসে উঠল, কেউ কারোর জন্যি বাঁচে না। যে যার আয়ুর জোরে বাঁচে। তুমাকে আমি অসময়ে দেখেচি। ঘর-সনসার ফেলে তুমাকে দেখেচি। আমার অসময়ে তুমি আমাকে দেখবা না?

—আমি পোয়াতি।

—সারা গাঁ চষে বেড়াচ্ছো, শুধু পাটভুঁইয়ে গেলে দোষ? লুলারাম লোভী চোখে তাকাল, আমার সোনার হার ছড়া খুলে দাও। আমার হার পরে পরের মন ভরাবে তা হয় না।

গলায় হাত দিয়ে সোনার হার ছড়াটার ছোঁয়া পেল না ঝারি, আফসোসের সঙ্গে বলল, তুমার জিনিস আমি তুমায় ঘুরোণ দেব। ঠিক আচে পাটভুঁইয়ে এসো। ঘর থেকে নিয়ে তোমায় দিয়ে দেব।

—সেই ভালো। লুলারাম আর দাঁড়াল না।

হালকা হবার নাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঝারি। দূর থেকে ভিকনাথ তাকে দেখতে পেলে। মনে সন্দেহ খরানীকালের কাতলামাছের মতো ঘাই দিয়ে ওঠে। পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে ঘর থেকে সে বেরিয়ে যায়। আজ এসপার ওসপার করে ছাড়বে। রোজ রোজ ডালভাত আর ভালো লাগে না।

ঝারি এগিয়ে গিয়ে আবছা আঁধারে আলের উপর দাঁড়াল। লুলারাম আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিল। ঝারির হাত ধরে সে পাটখেতের দিকে টেনে নিয়ে যেতে গেলে ঝারি তাকে বাধা দিল—থামো। হাত ছেড়ে দাও। তুমাকে বলেচি না আমি পোয়াতি।

—তুমার কুনো ক্ষতি হবে না।

—হাত ছাড়ো বলচি। ঝারি রাগে অপমানে ফুঁসে উঠল, তুমার চোখে কি মানুষের চামড়া নেই? এই নাও তুমার হারছড়া। এবার আমাকে ছাড়ো। আমাকে যেতে দাও। সোনার হারটা মুখে পুরে

লুলারাম বলল, সেই বিকেল থিকে দেঁড়িয়ে আচি, এখুন চলে গেলে হবে?

—তুমার সে গুড়ে বালি। কোমর দুলিয়ে ঝারি ফিরে যেতে চাইলে লুলারাম তার খড়খড়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ঝারির কোমর। বুকের কাছে টেনে এনে লেপটে নিতে চাইল শরীরে। ঝারি নুন দেওয়া জোঁকের ঢঙে নড়ে উঠল শরীরে মোচড় দিয়ে, তুমি এই সাঁঝবেলায় মদ গিলেচ?

—পুরুষ মানুষ মদ খাবে নাকি দুধ খাবে? লুলারাম ক্রমশ সাহসী হয়ে উঠছিল। ঝারি দু'হাত দিয়ে ঠেলে দিল তাকে। টাল সামলাতে না পেরে আলের উপর হুমড়ে পড়ল লুলারাম।

কাছিমের মতো চোখ পিটপিটিয়ে লুলারাম এক বিচিত্র ভঙ্গিতে বলল, মাগী, আমাকে ফেলে দিলি? দাঁড়া দেখাচ্চি তুর মজা! লাথ মেরে তুর পেট ধসিয়ে দেব। ভার হয়ে যাওয়া গতর নিয়ে ঝারি দৌড়াচ্ছিল বুড়িগাঙের দিকে। ওখানে পৌছাতে পারলে তার বিপদ কেটে যাবে। অন্তত চেঁচিয়ে ডাকলে বাঁধ থেকে যে কেউ শুনতে পাবে তার ডাক। ঝারি টলমল পায়ে ছুটছিল। তার পেছন পেছন গ্যাড়া মোষের মতো ছুটছিল কামে থরথর লুলারাম।

পুরুষের কাছে নারী অনেক সময় অসহায়। লুলারাম লালসার হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ঝারির আঁচল। হ্যাঁচকা টান দিয়ে পড়পড় করে খুলে ফেলল তার শাড়ি। শায়া নেই, ব্লাউজ নেই। আঁধারে ঝারি মা কালী। ওর খণ্ডিত শরীরের একখণ্ড অঞ্চল জুড়ে আলোর চাষআবাদ। সেই আলোর উৎসকে সমূলে উৎখাত করতে মরিয়া লুলারাম তার দানবীয় হাত দুটোকে সাঁড়াশি বানিয়ে ঝারির কণ্ঠনালীর কাছাকাছি নিয়ে গেল। ঝারি 'মাগো'! আর্তনাদ করে দু'হাত পেটে চেপে বসে পড়ল মাটিতে। দুই হাঁটুতে ঠোকা খেল তার নিম্নাভিমুখী মাতৃত্বের আধার। অন্ধকারে চিৎকার করে কেঁপে উঠল সে।

ভিকনাথ আর ধৈর্য ধরতে পারল না। লাঠি উর্ধ্বে তুলে সজোরে কষিয়ে দিল লুলারামের মাথায়, ঘরে কি তুর মা-বুন নেই, ছাগল কুথাকার?

অন্ধকারে ভিকনাথের গলাটা চিনতে পারে লুলারাম। নিজেকে সামলে নেবার আগে আর একটি বেদম আঘাত তাকে থেঁতলে দেয়, মাটি নেওয়ার আগে সে শুনতে পায় ভিকনাথ গলার রগ ফুলিয়ে বলছে, এখুনো সময় আচে পালা, নাহলে মরবি। বাপ হবার আগে আমি খুনী হলে কুনো পাপ লাগবে না।

লুলারাম অন্ধকার ফুঁড়ে হাপড়ে সাপড়ে ছুটছে। তার পায়ের শব্দে রাতের পাখি সচকিত হয়। ঝারিকে বুকে টেনে নেয় ভিকনাথ, কেঁদো না চোখের জল মুচে নাও।

হাত বাড়িয়ে শাড়িটা টেনে নিয়ে গায়ে চাপা দেয় ঝারি। শীত শীত ভাবটা উড়ে এসে তার শরীর দখল নেয়। শরীর ঘিরে বাড়তে থাকে ভয়। ভয়ের আয়ু কম। তবু অজানা এক ভয় কাবু করে দেয় ঝারিকে। ফুঁপিয়ে উঠে সে বলে, ওরে আমি বিশ্বেস করি নে। সুযোগ পেলে ও আমার পেটেরটাকে খতম করে দিবে।

—অত সস্তা নয়। ভিকনাথ ঝারিকে ঝাঁকুনি দিল, চুপ করো। ঘর চলো। আলের উপর মা লক্ষ্মীর মতো ধীরে ধীরে পদচিহ্ন এঁকে ঘরের পথ ধরে ঝারি। অন্ধকার তার পিছু ছাড়ে না আলোর প্রার্থনায়।

বুড়িগাঙের জলে রোদ পড়লে আকাশের সহস্র তারা বুঝি ঝিলিক দিয়ে ওঠে জলের শরীরের বৈভব দেখিয়ে। মন ভালো না লাগলে পাকুড়তলায় মাচায় চুপচাপ পা ঝুলিয়ে বসে থাকে রঘুনাথ।

তিনদিন হল গাঁ ছেড়েছে লুলারাম। তার গাঁ ছাড়ার কারণ এখনও কেউ জানতে পারেনি। নূপুর কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছিল ঝারির কাছে। সব শুনে মুখে কুলুপ এঁটেছিল ঝারি। নূপুর কান্নাকাটি করতেই ঝারি তাকে বুঝিয়ে বলল, মা শীতলাবুড়িকে মন দিয়ে ডাক। তুর বাবা ঠিক ফিরে আসবে। সে মানুষ হারাবার নয়। যে মানুষটা সবাইকে হারিয়ে দেয় সে কেন লোকের কাচে হারবে?

—গাঁয়ে তার শত্রু কম নেই। বুঝিয়ে বলেছিল নূপুর। ঝারি কিছুটা নিষ্ঠুর হয়ে বলেছিল, আগুন খেলে অঙ্গার তো হাগতে হবেই। তবে তুর বাপের কথা আলাদা। গত পাঁচ মাসে সে এদিকপানে একবারও আসেনি।

কথা না বাড়িয়ে নূপুর ফিরে গিয়েছিল ঘরে। নিজের বাপকে সে ভালো চেনে। মানুষটা তড়বড়ে লাট্টুর মতন, এক জায়গায় স্থিতু হতে জানে না।

রঘুনাথ ভরসা জুগিয়ে বলল, ভাবিস নে বুন, সে ঠিক ফিরে আসবে। তার মতন চালাক চতুর মানুষ এ গাঁয়ে আর ক'টা আচে।

তবু মন সুস্থির করতে পারে নি নূপুর। বাপ চলে গেলে তার চারধার আঁধার। মুনিরাম থেকেও না থাকার মতো। তার কথা এখন কেউ শোনে না। নোলকও ঝিম ধরে আছে খবরটা শোনার পর থেকে। এমনিতে সে কম কথার মেয়ে। খবরটা শুনে আরও গম্ভীর হয়ে গিয়েছে সে। কিছু ভালো লাগছে না তার।

চুরি বিদ্যে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে রঘুনাথ। ওপথে হেঁটে কোনো শান্তি নেই উল্টে থানা এসে ঢুকে যায় ঘরের ভেতর। রঘুনাথ মাচায় বসে পা দোলাতে দোলাতে তার প্রথম চুরির কথাগুলো ভাবছিল। দীনু খোঁড়ার দোকানের তালা ভেঙে আঁধারে দাঁড়িয়ে সে চুরি করবে কি, থরথরিয়ে কাঁপছিল। দীনু খোঁড়ার উপর তার প্রথম থেকে রাগ। বরাবরই ওজনে কম দিত সে। দাড়িপাল্লার একদিকে চুম্বক আটকে রাখত সে। কেজিতে শ' দুশ গ্রাম কম দিতে তার হাত কাঁপত না। নীলাক্ষ কতবার ধরেছেন তাকে। তবু দীনু খোঁড়ার কোনো লজ্জা শরমের বালাই ছিল না। লোক ঠকিয়ে তার খুব বড়োলোক হওয়ার ইচ্ছে। সেই ইচ্ছের গুড়ে বালি ছিটিয়ে দেবে রঘুনাথ। লজেন্সের দাম বেশি নেওয়ার হিসাব বুঝে নেবে সে। ভগবান তাকে শাস্তি দিয়েছে, তাতে তার মন ভরেনি, শিক্ষা হয়নি। পিঁপড়ের পেছন টিপে খাওয়া মানুষকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। পেতলের ডাবর ভর্তি খুচরো পয়সাগুলো তাকে প্রলুব্ধ করে। ডাবর সমেত খুচরো পয়সাগুলো নিজের ভেবে চটের থলিতে পুরে নেয় রঘুনাথ। এত পয়সা, নির্ঘাৎ দুশ টাকার উপরে হবে। এ বাজারে দু'শ টাকার অনেক দাম। রঘুনাথের চোখ চকচকিয়ে ওঠে। পা দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে একদলা মিছরি মুখের ভেতর পুরে নেয়। কুড়মুড় করে চেবায়। পরের ধনকে নিজের ভাবার অনুভূতিতে চনমনিয়ে ওঠে মন। ডাল, গুড়, সাবু, মিছরি, মশলাপাতিতে থলি ভরে নিঃসাড় পায়ে বেরিয়ে আসে দোকান থেকে। আগু পিছু দেখে। অন্ধকার ছাড়া কেউ নেই। অন্ধকার ছুঁয়ে বোঝার চেষ্টা করে রাত ক'টা। বড়ো জোর দশটা এগারটা। এর মধ্যে ঘুমে অসাড় গ্রামখানা। গাছপালার সব মূর্ছিত দশা।

এই থলি নিয়ে রঘুনাথ কোনোদিন ঘরে ফিরতে পারবে না। দুর্গামণির হাজার প্রশ্নে কেঁচো হয়ে যাবে সে, কথা বলার ইচ্ছেটাই ফুরিয়ে যাবে চোখের পলকে। দুর্গামণিকে বোঝাবার ক্ষমতা তার আর কোনোদিন হবে না।

চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। ধরা পড়লে পিঠ হতে হবে কাছিমের খোল। মাটির সরা হলে পিঠ ফাটবে, ঝরবে রক্ত। বদনাম বদবু হয়ে ছুটবে চারধারে। রঘুনাথ এসব আর চায় না। সে চায় দুর্গামণির মুখে হাসি ফুটুক। আগের সেই প্রাণোচ্ছল হাবভাব ফিরে আসুক। মাকে সে আর দুঃখ দিতে চায় না। মাকে দুঃখ দেওয়ার আগে না খেয়ে শুকিয়ে মরা ঢের ভালো।

হাড়মটমটির ঝোপে ভর্তি থলিটা লুকিয়ে রেখে ঘরে ফিরে গিয়েছিল রঘুনাথ। দুর্গামণি তখনও ভাত নিয়ে বসে আছে। ওর চোখের কোণে কালি, দুঃশ্চিন্তা। কতদিন হাসেনি সে। একদিন আক্ষেপ করে বলল, রঘুরে, তুর জন্যি আমাদের মরণ হবে। আর কাঁদাসনে বাপ। নিজেরে সামলা।

নিজেকে সামলায়নি শুধু, পুরোপুরি বদলে ফেলেছে নিজেকে রঘুনাথ। হাবুল চোর এসেছিল তাকে কুলবেড়িয়ায় নিয়ে যাবে বলে। রঘুনাথ শরীরের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে গেছে।

হাবুল চোর তার মনোভাব বুঝতে পেরে বলেছে, তোরে বিবেকের সাপটা দংশাচ্ছে। মনে রাখিস, ও সাপের বিষ নেই। যার বিষ নেই, তার অমৃতও নেই। দুদিন পরে ঠোকা খেয়ে সেই আমার কাচে তোকে আসতে হবে। কথাটা মনে রাখিস।

হাবুল চোর চলে যাওয়ার পরেও রঘুনাথের কোনো আফসোস হয়নি। ওর সাপের গল্পটা তার বিশ্বাস হয়নি। মন যা বলে তা না করাই ভালো, বিবেক যা বলে সেটাই তো আসল আলোর পথ। সে কেন আলোর পথে হাঁটবে না? মনটাকে লোহার শিকের চাইতে শক্ত করল রঘুনাথ।

তখনই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল ভিকনাথ, কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুর বাপরে নীলাক্ষবাবুর পেয়াদা এসে ধরে গিয়ে গিয়েচে। খপখপ চল, নাহলে তুর বাপকে ওরা মেরে ফেলবে।

কথাগুলো শুনে সারা শরীর কেঁপে উঠল রঘুনাথের। শুধু ভয় নয়, এক অন্যধরনের উত্তেজনায় টনটনিয়ে উঠল তার শিরা-উপশিরা। টান ধরল স্নায়ুতন্ত্রে। ক'মুহূর্ত বাকরুদ্ধ চোখে তাকাল সে।

ভিকনাথ তাড়া দিল তাকে, চল, আর দেরি করা যাবে না। আমি যাই—পাড়ার সবাইকে খপর দিয়ে আসি।

রঘুনাথের ঠোঁট বেঁকে উঠল, খপর দিয়ে কুনো কাজ হবে না। ওঁরা ইঁদুরের চেয়েও ডরপুক। কেউ যাবে না গো। সবাই নীলবাবুকে ভয় পায়।

—কেউ না যাক, আমি যাব। ভিকনাথের গলার দু'পাশের শিরা ফুলে উঠল, এ কি মগের মুলুক নাকি—যা খুশি তাই করবে? গুয়াদার মতো মানুষ হয় না। সে কুন দুঃখে পরের খাসি চুরি করতে যাবে? তার কি খাওয়া-পরার অভাব আচে?

অভিযোগ শুনে থ' হয়ে গেল রঘুনাথ। বাঁধ ধরে ছুটতে লাগল সে। ধুলো উড়ল তার পায়ের চাপে। ঘাম নেমে এল শরীর চুঁইয়ে।

নিমতলায় ভিড় জমে গেছে শ'মানুষের। পাকমোড়া দিয়ে মোটা রশিতে গুয়ারামকে বেঁধে ফেলেছে নীলাক্ষবাবুর পেয়াদা। মুখ কাতর করে যীশুখ্রিস্টের মতো দাঁড়িয়ে আছে গুয়ারাম। বিড়বিড় করে সে যেন কিছু বলতে চাইলে লাঠির বাড়ি মেরে তাকে থামিয়ে দিল পেয়াদা, বল, বাবুর খাসি কুথায় রেখেচিস বল?

—আমি কিচু জানি নে বাবু।

—জানিস নে? শালা হারামীর বাচ্চা। এবার লাঠির আঘাতটা তার মাথা ফাটিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের করে ছাড়ল।

কঁকিয়ে উঠল গুয়ারাম, আর মেরো নি গো। মরে যাবো—

—মর। ছুটে গিয়ে জোড়া পায়ের লাথি মারলেন নীলাক্ষবাবু। হাঁপাতে হাঁপাতে শুধালেন, আমার সখের খাসিটা কোথায় বেচেছিস বল? নাহলে আজ মেরে-মেরে তোকে কিমা বানিয়ে ছাড়ব।

রাগে ফুঁসছিলেন নীলাক্ষবাবু। গ্রাম ভেঙে মানুষের ঢল নেমেছে গুয়ারামকে দেখার জন্য। ভিড়ের মধ্যে নানা মন্তব্য কান ঝালাপালা করে দিল রঘুনাথের। বড়ো অসহায় দেখাচ্ছিল তাকে। এভাবে তার বাবাকে যে কেউ মারতে পারে এটা তার স্বপ্নে ছিল না। হাতের মুঠি পাকিয়ে ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল সে। জ্যান্ত সাপের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার কষ্ট হচ্ছিল তার। বিষ আছে অথচ ঢালতে পারছে না সে। এক অসহ্য যন্ত্রণায় আঙুল কামড়াচ্ছিল রঘুনাথ। শরীরের রক্ত ফুটে উঠছিল টগবগিয়ে। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ওরা গুয়ারামকে মারছে। এর পিছনে কোনো যুক্তি নেই, প্রমাণ নেই। অনুমানের শিকার হয়ে একটা মানুষকে এভাবে শাস্তির মুখে ঠেলে দেওয়া কি উচিত হচ্ছে বাবুদের? দাঁতে দাঁত ঘষে রঘুনাথ উপায় খুঁজছিল বাবাকে বাঁচাবার।

তামাশা দেখার ভিড়টা বাড়ছিল বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছিল

ধূলিকণা। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে শংকর মাছের চাবুক হাতে দাঁড়িয়েছিলেন নীলাক্ষবাবু। তাঁর শরীরে যে অত্যাচারিতের রক্ত প্রবাহিত এবং তা বুনো হাতির জেদের চেয়ে মারাত্মক সেই সুপষ্ট আভা পরিলক্ষিত হচ্ছিল তাঁর হাবভাবে। মাঝে মাঝে তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠছিলেন, মার হারামীটাকে মেরে শেষ করে ফেল। তারপর যা হয় আমি তা সামলাব।

তাঁর কথাগুলো যজ্ঞের জ্বলন্ত কাঠে ঘি ঢালার চেয়েও অগ্নি উৎপন্নকারী। ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে গুয়ারাম কেঁদে উঠল বাতাস কাঁপিয়ে, ছেড়ে দাও গো, আর মেরো না। আমি কুনো দোষ করিনি গো! ছেড়ে দাও গো, তুমাদের পায়ে ধরি।

তার আর্তি, আবেদন শোনার মতো মানুষ জামতলায় কেউ ছিল না। শুধু রঘুনাথ ফুঁসছিল। ভিকনাথ পাশে দাঁড়িয়ে চাপা রাগে ফুঁসে উঠে বলল, ওদের ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না রঘু। যা করার কিচু কর। ওরা যে তুর বাপকে মেরে ফেলবে।

ভিকনাথের কথায় তীব্র ভূমিকম্পের প্রকোপে কেঁপে ওঠা কাচের ইমারতের মতো কেঁপে উঠল রঘুনাথ, হাতের পেশি ফুলিয়ে ছুটে গিয়ে সে তার বাপকে বুক দিয়ে আগলে দাঁড়াল। খবরদার কেউ এর গায়ে আর এট্টা ঘাও দেবা না। দিলে ভালো হবেনি বলে দিচ্চি। আমার বাপ চোর নয়। আমরা কেউ চোর নই। রঘুনাথের কথার তেজে বাতাস বারুদে ভরে উঠল। আচমকা ঢেউ আর গুঞ্জন উঠল সমবেত ভিড়ে।

নীলাক্ষবাবু ধুতির কোঁচা ফুলিয়ে এগিয়ে এলেন রঘুর কাছে, ঝাঁঝাল সুরে মুখ তুলে বললেন, তোর সাহস তো কম নয়। আমার এলাকায় এসে আমাকেই শাসানো। সর, সরে যা বলছি।

—সরব না। রঘুনাথ বুড়ো আঙুলে পা আঁকড়ে নিজেকে বটগাছের চেয়েও দৃঢ়ভাবে দাঁড় করাল।

নীলাক্ষবাবুর নির্দেশে দু-জন পেয়াদা এগিয়ে গিয়ে রঘুনাথের হাত চেপে ধরল প্রাণপণে। রঘুনাথও অনড়, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ঝড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভূমিলগ্ন বটগাছ সে, তাকে উপড়ে ফেলা কার সাধ্যি! ততক্ষণে ভিকনাথ এসে ওদের মাঝখানে দাঁড়াল। গর্জন করে বলল, কাজটা ভালো হচ্চে না, বাবু। আমরা গরীবগুবরো মানুষ মানচি কিন্তু আমরা চোর নই। গুয়াদা যে খাসি চুরি করেচে তার কুনো প্রমাণ আচে? প্রমাণ ছাড়া কাউকে কি সাজা দেওয়া যায়? আমরা ধাওড়াপাড়ার মানুষরা বাবুসমাজের একচোখি রায় মানব না।

ভিকনাথের চেঁচিয়ে বলা কথাগুলোয় আগুনের ঢেলা ছিল যা আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভাসিয়ে দিল আগুনের হল্‌কা। ভিড় আবার পিঠে ছ্যাঁকা খাওয়া অসাড সাপের মতো নড়ে উঠল, সত্যিই তো সাক্ষী প্রমাণ ছাড়া একটা মানুষকে এভাবে পশুর মতো জঘন্যভাবে মারা যায় না। নীলাক্ষবাবু যা করছেন, সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। সভ্য সমাজ তাঁর এই কর্মকে কখনও সমর্থন করবে না। স্পষ্টত দুটি মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সেই সময়। ভিড় দেখে জামতলায় সাইকেল নিয়ে হাজির হলেন কপোতাক্ষ। কোন একটি গ্রামে মিটিং সেরে ফিরছিলেন তিনি। তাঁকে দেখে বিরক্ত নীলাক্ষ কপাল কুঁচকে এগিয়ে গেলেন সামনে, তুই এখানে দাঁড়ালি যে, বাড়ি যা।

—কি হয়েছে দাদা?

—কি হয়নি বল? নীলাক্ষ উত্তেজনায় কি ভাবে শুরু করবেন কথা হাতড়ালেন, আমার বড়ো খাসিটাকে কাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না। ধাওড়াপাড়ার ধারের মাঠটাতে চড়ছিল। সন্ধেবেলায় ঘর আসেনি।

—তার জন্য ওই মানুষটাকে কেন বেঁধে রেখেছো?

—ওকে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

—কাউকে সন্দেহের জেরে ওভাবে বেঁধে রাখা যায় কি? কপোতাক্ষর কণ্ঠস্বর গুরুগম্ভীর মেঘের মতো শোনাল, স্বাধীন সভ্য দেশে তোমার এই বর্বর ব্যবহারের সাজা কি জানো?

—থাক আর জ্ঞান দিস না।

—জ্ঞান নয় দাদা, যা ঘটনা আমি তাই তোমাকে শোনাচ্ছি। নিজেকে বদলাও। তোমার এই বুর্জোয়া সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব ত্যাগ করো। না হলে সব হারাবে। দিকে দিকে মানুষ জাগছে। কপোতাক্ষর কথাগুলো বক্তৃতার মতো শোনাল।

—যা তো, মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস না। বিরক্তি আর চেপে রাখতে পারলেন না নীলাক্ষ, ঠেলে ওঠা গ্যাস অম্বলের মতো ছিটকে এল বাইরে, তোর মতন মানুষগুলো এসব ছোটলোকদের মাথায় উঠিয়েছে। তোদের জন্য এদের এত বাড়বাড়ন্ত। যা, নিজের কাজ কর। আমাকে বাধা দিস নে।

—ভালো চাও তো, ওর বাঁধন খুলে দাও।

—যদি না খুলি?

তাহলে আমি নিজে গিয়ে ওর বাঁধন খুলে দেব।

—তোর এত সাহস?

—এতে সাহসের কি দেখলে? যাকে তুমি সাহস বলছ—সেটা হল সত্য। কপোতাক্ষ থামলেন, তারপর তর্জনী তুলে বললেন, ওই দেখ, প্রতিবাদ কেমন তোমার মোটা দাড়িকে আঁকড়ে ধরেছে। পেয়াদা আর লেঠেল দিয়ে সব কাজ কি হয়? কিছু কাজ মগজ খাটিয়ে করতে হয়। তুমি আমার দাদা হও—সেই জন্য তোমাকে আমি অনুরোধ করছি, অন্য কেউ হলে আমি নিজে গিয়ে বাঁধন খুলে দিতাম। কেননা আমাদের লড়াইটা এই তোমাদের মতো গোঁড়া সামন্ততান্ত্রিক মানুষগুলোর বিরুদ্ধে। ওদের চোখে প্রতিবাদের ভাষা যতদিন না আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ছে—ততদিন আমাদের এই লড়াই থামবে না।

—যা তো, পাগলের মতো বকিস না।

—আমি পাগল নই, দাদা। আমি শুধু তোমাকে সতর্ক করছি। কপোতাক্ষ কিছু সময় গম্ভীর হয়ে গেলেন, তুমি রুদ্রর কথা ভাবো। সে তো তোমার ছেলে। তোমার ওই সোনার টুকরো ছেলে আজ তোমার বিরুদ্ধে, কেন? এসব কথা একবার ভাববে না? নিজের জেদ নিয়ে থাকা ভালো কিন্তু জেদের বশে অন্ধ হয়ে যাওয়া ভালো নয়। যাও দাদা, গুয়ারামকে ছেড়ে দাও। আর ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।

—ক্ষমা! ওর মতন ছোটলোকের কাছে ক্ষমা চাইব আমি? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? গরম তেলে জলের ছিটে পড়ার মতো চড়বড়িয়ে উঠলেন নীলাক্ষ।

—তোমার এত কিসের অহঙ্কার, দাদা? মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শেখো নাহলে শ্রদ্ধা হারাবে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল কপোতাক্ষর।

ধাওড়া পাড়া থেকে জগৎখালি বাঁধের মাটি কাঁপিয়ে পিলপিল করে ছুটে আসছে সশস্ত্র মানুষ। অস্ত্র হাতে মানুষগুলো যেন এক একটা যোদ্ধা। তাদের ক্রোধিত হুঙ্কার বাতাসকে ধর্ষিতা রমনীর চেয়েও অসহায় করে দেয়। চোখ কুঁকড়ে ওই স্রোতের দিকে অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন নীলাক্ষ। তাঁর দর্পের অট্টালিকার ফাটলটা সহজে দৃষ্টিগোচর হয়।

কপোতাক্ষর ভেতর থেকে আবেগটা ধূপের গন্ধ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, দেখলে দাদা, মানুষ যে জাগছে—আর বুঝি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। জাগরণের সময়, প্রভাতবেলায় কেউ ঘুমিয়ে থাকে না। শুধু তুমি ঘুমিয়ে আছো। তোমার এই স্বৈরাচারী মনোভাব পাড়ায় পাড়ায় দাঙ্গা

লাগিয়ে দেবে। ওই দেখো দাঙ্গা আগুন ধেয়ে আসছে।

ভিকনাথ সাতগুণ উৎসাহ নিয়ে ছুটে গেল ভিড় ঠেলে। রঘুনাথকে সরিয়ে সে ব্যস্ত আর মরিয়া হাতে গিঁট খুলে দিল মোটা রশির। গুয়ারামের কষ আর মাথার রক্ত হাতের তালুতে জেবড়ে নিয়ে বলল, তুমার এই অক্তো জল হবেনি। তুমার ঘরের রঘু এর বদলা নিবে। কেঁদো না গুয়াদা, চোখ মুছো। ঘর চলো। আমাদের পোকাড়ে ভাগ্য, সেই জন্যি তুমাকে এই বয়সে, এমনধারা মার খেতে হল!

মাজা ধাপিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটছিল গুয়ারাম। এই বয়সে এমন আঘাত সহ্য করার শারীরিক ক্ষমতা তার নেই। শরীর থরথর করে কাঁপছিল ভয়ে। বুকের ভেতর ছড়িয়ে পড়া ভয়টা পণ্ডিত বিলের পুরনো মাছের মতো শরীরের রক্তে, মাংস-কোষে ঘাপটি মেরে পড়ে আছে এখনও। একে সহজে কাবু করা যাবে না। বুকের কাছ থেকে একটা চিনচিনে শুলোনী উঠে কলজের কাছে এসে থেমে যাচ্ছে। বাবুর জোড়া পায়ের লাথিটা এই হাড়ের খাঁচায় লেগেছে, পাকাটির বেড়ার মতো মড়মড়িয়ে উঠেছে খাঁচাটা। আর একটু হলে ভেঙে যেত। যে কোনো যন্ত্রণার একটা নিজস্ব বেগ আছে। গুয়ারাম সেই যন্ত্রণাকে নিজের দেহে লুকিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছিল। বারবার করে ছোট ভাইয়ের কথা তার মনে পড়ছিল। লুলারাম এতদিন যা করেছে তা বুঝি ঠিক করেছে। রঘুনাথকে ভুল বোঝা তার উচিত হয়নি। সবাই যে যার মতো বাঁচে।

পেয়াদাগুলো ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় বলছিল, লুলারাম থাকলে তোকে আজ ধরতামনি। সে শালা কুথায় পেলুলো কে জানে। বড়ো চালাক মানুষ সে, পাঁকাল মাছের মতো কুথায় সিঁদিয়ে যায় শিবের বাপও টের পায় না। চুরি বিদ্যায় লুলারামের খ্যাতি এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। গেরস্থরা তাকে দেখলে মনেমনে ভয় খায়। মুখ ফুটিয়ে কারোর কোনো কথা বলার ক্ষমতা নেই। লুলারামের সঙ্গে থানার যা দহরম-মহরম তা প্রত্যক্ষ করে অবাক হয়ে যায় গুয়ারাম।

রেশন-দোকানী জগতবাবুর পাঁঠাটা হারিয়ে গিয়েছিল ক'দিন আগে, পাঁঠার শোকে কাতর জগতবাবু বারবার আসতেন তাদের দোরে। বিমর্ষ মুখ ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর হাঁ-করে দেখতেন গুয়ারামকে। কাকুতি-মিনতি করে বলতেন, গুয়ারে, তোরে আমি খুশ করে দেব। আমার পাঁঠাটা ঘুরোন দে। ওটা আমার জান রে। ওরে আমি রেশনের গম-চাল সব খাওয়াতাম। ওই অবলা জীবটা পোষার পর থেকে আমার যত রমরমা। গুয়ারাম শত চেষ্টা করেও রেশন দোকানীকে বোঝাতে পারেনি যে পাঁঠাটা সে নেয়নি এমন কী এধার-ওধার ঘুরতেও দেখেনি। এত বলেও মানুষটার বিশ্বাস অর্জন করতে সমর্থ হয়নি সে।

মনে মনে দুঃখ পেয়েছে গুয়ারাম। দশ বছর আগেও মানুষ তাদের বিশ্বাস করত। লুলারামের কীর্তিকলাপ সেই বিশ্বাসের দেওয়ালে ফাটল ধরাল ধীরে ধীরে। রঘুনাথ সেই ফাটলের ভেতর লুকিয়ে থাকা একটা বিষধর সাপ। আজকের এই ভয়াবহ, শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য গুয়ারাম ওদের দায়ী করে।

রেশন-দোকানীর পাঁঠাটা ফিরে এল তিন দিন পরে। একটা পাঠী ছাগলের সঙ্গে মুখে স্বজাতীয়

কামধ্বনি তুলে পাঁঠাটা চলে গিয়েছিল তার প্রেমিকার বাড়ি। প্রেমিকার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে তিন দিন সময় তার ঘোর কাটতে লেগেছিল।

পাঁঠাটা ফিরে আসার পর হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন জগতবাবু। কিন্তু গুয়ারামকে একবার জানানোর প্রয়োজন বোধ করেন নি তিনি। কেন খবর দেবেন? গরীবগুরবো ছোটলোকদের এত মাথায় তুলতে নেই। কুকুরকে লাই দিলে, মাথায় তুললে আঁচড়াতে আসে। মাথার চুল আর পায়ের লোমের ফারাক থাকা দরকার।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল গুয়ারামের তবু এসব কষ্ট যেন তার ভেতরের দুঃখটাকে শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই মাঝ বয়সে এমন বুনো মার শরীর যেন সইতে পারে না। থেঁতলে যাওয়া ঠোঁটটা চিনচিন করে জ্বলছে এখনও। হাত দিতেও ভয়। বাঁ চোখের কাছটায় ঝুলে আছে মাংস। টনটন করছে চোখের চারপাশ। মাথার রক্ত চুইয়ে পুরো মুখটাকে করে দিয়েছে বীভৎস। এক ঝলক কেউ দেখলেই আঁতকে উঠবে। গা গতরের ব্যথাটা নিয়ে জোরে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল গুয়ারামের। কিছুটা হেঁটে এসে সে পিছন ঘুরে দাঁড়িয়ে থমকে গেল। রঘুনাথ মাত্র দশ হাত দূরে। তার হাতে একটা রাঙচিতের ডাল, মাঝে মাঝে সেই সরু লিকলিকে ডালটা বাতাসে চিতেসাপের মতো হিলহিল করে নাড়ছে।

ভিকনাথ কিছুটা অবাক হয়ে বলল, গুয়াদা, দেঁড়িয়ে পড়লে যে—চলো।

—হ্যাঁ, যাবো রে ভাই। আড়মোড়া ভেঙে কেমন বিপন্ন চোখে তাকাল গুয়ারাম, বড্ড মেরেচে রে, হাঁটতে পারচি নে।

—জানি, সব জানি। দাঁতে দাঁত ঘষে তাকাল ভিকনাথ। তারপর উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে বলল, মনে দুখ লিয়ো না, সব আমাদের ফোঁপরা ভাগ্য গো। তবে মনে রেখো গুয়াদা, এক মাঘে শীত যাবে না। তুমার ছেলে রঘু এর বদলা নেবেই নেবে। ওর জিদ আমি জানি। মন করলে ও জলে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।

গুয়ারাম চুপ করে শুনল, তারপর যন্ত্রণা হজম করে বলল,ওর ওই জিদটাকেই তো আমি ভয় পাই। ছেলেটার যে কুথায় গতি হবে কে জানে। গাঁয়ে থাকলে বাবুদের হাতে মার খেতে খেতে ওর জেবনটা শেষ হয়ে যাবে।

—অত মাগনা নয়। ভিকনাথ তীব্র প্রতিবাদ করল, যুগ বদলেচে গো। যুগ যে বদলেচে তা তো তুমি নিজের চোখে দেখলে। কপোবাবু নিজের মায়ের পেটের ভাইকেও ছেড়ে কথা বলল না। সত্যি মাইরি, অমন মানুষ আমি দেখিনি গো! ইবার পঞ্চাত ভোটে বাবুরে আমরা জেতাব।

গুয়ারামের ভিতর থেকে এবার কথার উজান ঠেলে উঠল, এক গাছে দু-রকম ফুল হয় কি করে বুঝে পাইনে! একজন হয়েচে অসুর, তো অন্যজন হয়েচে দেবতা। এত দুঃখের মাঝেও ভিকনাথ হালকা করে হাসল, এ তো ভবের লীলা গো! এর ব্যাখ্যা কি আমাদের ছোটমাথায় হবে?

পাটের ভুঁইয়ে লুলারামের সাথে সেই যে দেখা হয়েছিল ভিকনাথের তারপর থেকে তার আর টিকি দেখতে পায়নি ভিকনাথ। মনের দুঃখে গাঁ ছেড়েছে লুলারাম। ঝারি তার মাথাটা আরও খারাপ করে দিয়েছে। মেয়েমানুষের উপেক্ষা অনেকের বুকে তীরের মতো বেঁধে, অনেকে আবার সেই আঘাতকে ভাবে বিচুটির জ্বলন। ঘণ্টাখানিক কুটকুটিয়ে সে জ্বলন থেমে যায়, আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় জীবনযাপন। সবাই যা পারে লুলারাম তা পারেনি। মনে মনে সে দগ্ধে দগ্ধে মরেছে। অপমানে কালসিটে মেরে গিয়েছে তার মুখ। এ পোড়ার মুখ গ্রামসমাজে সে দেখাবে কী ভাবে? কেউ না জানলে অন্তর তো জানবে। বিবেক মিছে কথা বলে না। বিবেকের ঘা কোনো মলমে

সারে না। বিশেষ করে ঝারির কাছে তার মুখ দেখানো দায়। এক সময়ের দুর্ধর্ষ ডাকাত সময়ের ফাঁসে পড়ে সিঁদেল চোরের মতো দিন কাটাতে পারে না। এর চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভালো। লুলারাম আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়নি। রাতের আঁধারে সে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়েছে। বিবেকের দংশন না জুড়ালে সে গাঁয়ে ফিরতে পারবে না। এ ঘটনায় ভিকনাথের মনে কোনো দুঃখ বা অনুশোচনা নেই। যেমন কর্ম করবে তেমন তো ফল পাবে। বরং তার পথের কাঁটা সরে গেল বিনা বাধায়। এ তো মেঘ না চাইতে জল পাওয়ার মতন।

ভিকনাথের নুয়ানো মনটা ডগা ধাপানো বাঁশ গাছের মতো হঠাৎ সিধা হয়ে গিয়েছে। মানসিক শান্তি দুনিয়ার সব চাইতে দামী টনিক। ঝারি এখন পোষা বেড়াল হয়ে তার সংসারে ঘোরাফেরা করে। ছেলে কোলে ঝারিকে মনে হয় গেরস্থঘরের তুলতুলে বউ। তার চোখেও সকালের নরম রোদের মতো গড়িয়ে নামে সুখ।

জানগুরুর পায়ের ধুলোয় কি যাদু ছিল ভিকনাথের সংসারের সব অসুখ ব্যাধি সেরে গেল। ঝারিকে এত সুখী, এত হাসিখুশি জীবনে সে দেখেনি। এখন আর ঝারিকে মনে হয় না সে দূর আকাশের তারা। ঝারি এখন বেড়ার উপর লতিয়ে যাওয়া চালকুমড়োর ফুল। সেই ফুলের ম-ম করা গন্ধ নেই, কিন্তু সৌন্দর্য আছে। তাকে ছোঁয়া যায়, নিজের করা যায়। সে ফুলের মালা হয় না, কিন্তু মালা গাঁথলে দোষ কোথায়?

ডিভিসির ছাড়া জলে যৌবন কইমাছের মতো ছড়ছড়িয়ে উঠছে বুড়িগাঙের। কোথা থেকে উড়ে এসেছে দুটো শামখোল পাখি, ওদের সাদা ডানায় জড়িয়ে আছে শ্রাবণের বুনো মেঘ। এ বছর বর্ষার ছিঁচকাঁদুনী স্বভাব বদলে গিয়ে অঝোর ধারায় ঢালছে। জগৎখালির গোড়ায় ঘোলা জল ক্ষুর নিয়ে প্রতিবার চেঁচে নিয়ে যাচ্ছে মাটি।

জল দেখবে বলে নূপুর আর নোলক দৌড়ে এসেছে বাঁধ অব্দি। ওরা যে বড়ো হচ্ছে সে খেয়াল ওদের নেই। রঘুনাথ কদমগাছের গোড়ায় বিড়ি টানছিল একমনে। এখন দিনে তার দু তাড়া বিড়ি লাগে না হলে সময় কাটতে চায় না। দু বান্ডিল বিড়িতেও অনেক সময় কম পড়ে তখন চেয়ে-চিন্তে নেশা জুড়োয়।

সব ঠিকঠাক থাকলেও মনটা ঠিক নেই রঘুনাথের। মার খাওয়ার পর থেকে গুয়ারামের বুকে বড়ো ব্যথা হয়। বারো বছরের পুরনা ঘি তার বুকে ভাপ দিয়ে ডলে দেয় দুর্গামণি। তাতেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

চুনারাম কদবেলতলা ধাওড়া থেকে শুনে এসেছে পুরনো শুয়োরের চর্বি ডলতে পারলে বুকের ব্যথা নাকি সেরে যায়। হাঁড়িপাড়ায় গিয়ে পুরনো চর্বির খোঁজ করেছিল সে কিন্তু সেখানেও পেল না। শুয়োরের চর্বি ডালডা ঘিয়ের মতো জমে গেলে অনেকেই ওষুধ করার কাজে কিনে নিয়ে যায়। হাজরা পাড়ার বুড়োটাই বলল, অতো ভেবো না তো। শুয়োরের চর্বি তুমি বসন্তপুর ধাওড়ায় গেলি পরে পেয়ে যাবে। আমি জানি, শ্রীকান্ত রাজোয়ারের ঘরে অনেক দিনের পুরনো চর্বি আছে। আগে ওদের শুয়োরের পাল ছিল। এখন অবশ্যি শুয়োরের পাল নেই কিন্তু চর্বি রয়ে গিয়েচে শিশি ভর্তি।

ছেলের জন্য বসন্তপুর ধাওড়া কেন হেঁটে হেঁটে সে মাটিয়ারি অবধি চলে যাবে। ছেলে তার প্রাণভোমরা। ছেলের জন্য সে পারে না হেন কাজ দুনিয়াতে নেই।

কিন্তু সব শোনার পর রঘুনাথ তাকে যেতে দিল না। জোর করে বলল, তুমার পায়ে বেথা, দাদু। তুমি ঘরে থাকো। আমি যেচি, চর্বি তুমাকে এনে দেবই দেব।

শুয়োরের চর্বি নিয়ে ফিরতে বেলা চড়ে গিয়েছিল টিকলিতে। চান-খাওয়া করে একটু গড়িয়ে

নিতে গিয়ে যত ঝামেলা। তালাই পেতে শুয়েছিল গুয়ারাম। একটু ধরে এসেছিল চোখ, আর ঠিক তখনিই শুরু হল হাড়ের গোড়ায় গোড়ায় শুলোনী ব্যথা। 'বাপ রে, মা-রে' বলে বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল গুয়ারাম। তার সেই চেঁচানিতে চোয়াল চাগিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল রঘুনাথ, তারপর এক ছুটে চলে গিয়েছিল গুয়ারামের কাছে, কি হল গো, অমনি ধারা করচো কেনে?

—সেই বিদনা আবার তালভুসের মতন ঠেলে উঠচে। গুয়ারামের চোখের কোণে থেঁতো হয়ে গেল জল।

আর সেই জেবড়ে যাওয়া চোখের জলের দিকে তাকিয়ে রঘুনাথের সারা শরীর টগবগিয়ে ফুটে উঠল রাগে। এক অসুরজেদ তাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল। ছুটে গিয়ে জোড়া পায়ের লাথি কষিয়ে দিচ্ছেন নীলাক্ষবাবু, এই দৃশ্য বায়োস্কোপের মতন বারবার ঘুরতে থাকে তার মনের পর্দায়। ফাঁকা মাঠে তাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় বুনো মোষ। ছুটতে ছুটতে জিভ বের করে হাঁপায় রঘুনাথ। কোয়াশের দুপাশে জমে ওঠে লতলতে ফেনা। বদলা, হ্যাঁ বদলা তাকে নিতেই হবে। গুয়ারামের প্রতিটি চিৎকার যেন ধারালো বর্শা হয়ে তার মনের আকড়া জমিতে গেঁথে যায়।

বদলা নেওয়ার নেশায় সে পালবাড়ির গোরু চরানোর কাজটা এক কথাতে ছেড়ে দিল। ভদ্রভাবে তার আর বাঁচা চলবে না। শয়তানের সঙ্গে মালাম লড়াতে গেলে তাকেও শয়তান হতে হবে। ইটের জবাব দিতে হবে পাটকেলে।

জামতলা থেকে ফিরে এসে পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছে রঘুনাথ। সে এখন কম কথা বলে, হাসেও কম। তার ভেতরে এখন লুকিয়ে আছে একটা আগুনপাহাড়। ফলে হাবুল চোরের বাড়ি গিয়ে যেচে সে সন্ধি করে এসেছে। সব শুনে খুশি হয়ে হাবুল চোর বলেছে, আমি তুর পাশে আচি। ভয় কি। মনে রাখিস, সাপের ছাল ছড়িয়ে নিলে সে সাপের তেজ কমে যায় মানুষের তো ছাল ছাড়ানো যায় না, কিন্তু দাপটে মানুষ ধরাকে সরা ভাবে সেটা আমরা বেলুন-চুপসা করে দিতে পারি। পেটের টান জব্বর টান। পেটে লাথ্ মার, দেখবি জোড়া পা কেন, জোড়া হাতও ছোট হয়ে গিয়েচে।

হাবুল চোরের কথাগুলো মাথায় ঘুরছিল রঘুনাথের। নীলাক্ষকে উচিত শিক্ষা না দিলে তার ঘুম আসবে না ভালোভাবে। বাপের রাত কাঁপান চিৎকার তাকে অসহায় করে তোলে। অথচ নীলাক্ষ দিব্যি মাঠে ঘাটে ঘুরছে বুক ফুলিয়ে। অর্থের অহঙ্কারে তার পায়ের ভার সইতে পারছে না মাটি।

হাবুল চোরের সাইকেলের পেছনে বসে ছোট কুলবেড়িয়ায় মণিরুলের ঘরে গিয়েছিল রঘুনাথ। মণিরুল শুধু কালীগঞ্জ থানায় নয়, আশে পাশের সাতটা থানার ত্রাস। আর হবেই বা নয় কেন? হাফিজ ডাকাতের রক্ত তার শরীরে বয়ে যাচ্ছে।

গণ ধোলাইয়ে হাফিজ ডাকাতের নৃশংস মৃত্যুটা মেনে নিতে পারেনি মণিরুল। সে তখন বছর কুড়ির যুবক! রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে গোরু-চোরের মতো অসহায় চোখ নিয়ে শুধু দেখেছে হাফিজ ডাকাতের মৃত্যু যন্ত্রণা। ওই পথ থেকেই তার মনে উঠে এসেছে ডাকাত হবার সুতীব্র বাসনা। পড়ালেখা জানা মনিরুলের দল গড়তে বেশি সময় লাগেনি। হাফিজ ডাকাতের বউ মোতিবিবি তাকে পথ দেখিয়েছে, চেনা-জানা চোর ডাকাতের নাম ঠিকানা সে সব বাতলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়—হাফিজ ডাকাতের লুকিয়ে রাখা অস্ত্রশস্ত্র পোশাক আশাক সব দিয়ে দিয়েছে বিনা পয়সায়। মণিরুলের মধ্যে তার ঘরের মানুষটা জ্যান্ত হয়ে উঠুক এই তার বাসনা।

পুকুড়পাড়ে হেলে পড়া বাঁশের ছায়ায় মণিরুলের দেখা পেয়েছিল ওরা। মণিরুলের দেখা পাওয়া মানে পীরবাবার দেখা পাওয়া। চড়া গরমে বড়ো পুকুরের জলে গলা ডুবিয়ে পড়েছিল মণিরুল, ওর দু'জন সাদা পোষাকের সাকরেদ দূর থেকে লক্ষ্য রাখছিল নিরাপত্তার দিকগুলো। গাঁয়ে এখন সাদা পোষাকের পুলিশ ঘুরছে মণিরুলকে ধরবার জন্য। সরকার ওর মাথার দাম রেখেছে পঁচিশ হাজার। হাইটেনশন লাইনের তার কেটে মণিরুল হইচই বাঁধিয়ে দিয়েছে জেলা-সদরে। দু'কিলোমিটার তার কেটে নিয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়। সঙ্গে একটা বিশাল মাপের ট্রান্সফরমার। এত মাল কোথায় সে চালান করে দিল পুলিশ তার টিকিও ধরতে পারল না। তবে পাশের জেলা মুর্শিদাবাদ—বর্ধমানে তার নিয়মিত ওঠা-বসা আছে। জেলা পেরিয়ে সীমান্তবর্তী জেলায় লুকিয়ে যাওয়া মনিরুলের কাছে এমন কোনো কঠিন কাজ নয়।

পুকুর থেকে উঠে আসার সময় মণিরুলের গা থেকে জল ঝরছিল কাল বাউশ মাছের আঁশ থেকে জল ঝরার মতো। তার পেটা, খাঁজ খাঁজ শরীর স্বাস্থ্য দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিল রঘুনাথ। হাবুল চোর সেলাম দিয়ে কথা শুরু করল নিজস্ব ভঙ্গিতে।

সব শুনে মণিরুল বলল, কাফেরের সাজা কায়দা করে দিতে হয়। জালিলদের বেশি বাড়তে দিতে নেই। রসে ভেসে যাওয়ার আগে রস শুকিয়ে খরার মাঠ করে দাও। দেখবা সব ঠিক হয়ে যাবে, আপসেই সাইজে এসে যাবে।

—সে ভার তুমাকে নিতে হবে মনিরুল ভাই।

—ঘর যাও। আর ভেবো নি। তাঁতি কিভাবে তাঁত বুনবে সেটা তার উপর ছেড়ে দাও। মনিরুল গামছা নিংড়ে গা মুছতে মুছতে তাকাল, আমার লোক যাবে, তারে সব পথ ঘাট দেখিয়ে দিও। আমি শেষবেলায় গিয়ে সব ছকে আসব। তবে তিনটে নৌকো ঘাটে বেঁধে রেখো। তেমন বুঝলে আমরা জলে-জলে কাটোয়া পেলিয়ে যাব।

হাবুল চোর ঘাড় নাড়ল, ওসব নিয়ে ভেবো নি। তুমাদের রাস্তায় না তুলে দিয়ে আমি ঘর ধরবোনি। কথা দিলাম—

অমাবস্যার রাত্রিতে মণিরুল তার দলবল নিয়ে চড়াও হয়েছিল নীলাক্ষবাবুর বাড়িতে। সব মিলিয়ে তার দলে ছিল ছাব্বিশজন। অতর্কিত হামলায় কেঁপে উঠেছিল সারা গ্রাম। নীলাক্ষবাবুকে থামে বেঁধে প্রায় ঘন্টা দুয়েক একনাগাড়ে পিটিয়ে গেল মণিরুল। সিন্দুকের চাবি দিতে অস্বীকার করায় প্রহারের মাত্রা বেড়ে হল দ্বিগুণ। মারের চোটে ভূত পালায় কথাটা সত্যি। নীলাক্ষবাবুর উঁচু মাথা মারের চোটে নেতিয়ে ভূমি নিল এক সময়। ঘর ছাড়ার আগে মণিরুলের ঝোলায় তখন পঁচিশ ভরি সোনা, দু'সের রূপো, নগদ ছ'হাজার টাকা। গোলা ভর্তি ধান যাওয়ার আগে পুকুরের জল ঢেলে দিয়ে গেল জনা দশেক ডাকাত। সেই সঙ্গে আগুন ধরিয়ে দিল দোতলা বাড়ি সমান উঁচু খড়গাদায়। নীলাক্ষবাবুর স্ত্রী তুঙ্গভদ্রার কপাল ফাটিয়ে দিল ওরা। একমাত্র মেয়ে ক্ষমাঞ্জলিকেও এরা ক্ষমা করল না। ওর গলায় এক ভরির সোনার চেনটা খুলে দিতে দেরি হচ্ছিল বলে হ্যাচকা টানে ছিঁড়ে দিল। শুধু রক্ষা পেয়ে গেল কমলাক্ষ। সেদিন সে ঘরে ছিল না, পাশের গ্রামের কুটুমঘর গিয়েছিল।

বোমা ফাটাতে ফাটাতে মণিরুলের দল চলে গেল বাঁধ ধরে। এক দল মানুষ থ' হয়ে দেখল খড়পোড়া আগুন। তাদের চোখে আগুন আতঙ্কের পদাবলী।

সেই আগুন-শপথ পুরোপুরি বদলে দিল রঘুনাথকে। হাবুল চোরের পায়ের কাছে বসে নেশাগ্রস্ত রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করল, হাজার বিপদে পড়লেও এ পথ আমি আর ছাড়বোনি। আজ থিকে আমি হলাম রঘু চোর। তুমার যখন দরকার পড়বে আমাকে ডেকো। আমি এক ডাকে

হাজির হবো। সেই থেকে রঘুনাথের বদলে যাওয়া শুরু। সে ঘরের বেড়াল থেকে হয়ে গেল বনের বাঘ। লোকে তাকে রাস্তাঘাটে দেখলে পাশ কাটিয়ে চলে যেত। তাসের আড্ডায়, বাঁশের মাচায়, মদের ঠেকে, সবখানে রঘুনাথের চর্চায় মশগুল হয়ে উঠল গ্রামের বাতাস। সেই হাওয়ায় নড়েচড়ে বসল থানা। পুলিশ থেকে চৌকিদার সবার খোঁজ ছিল রঘুনাথের। কিন্তু রঘুনাথ বুঝি রঙ বদলাতে পারে। গাছে উঠলে সে গাছের পাতা হয়ে যায়, রাতে সে আরও মিশমিশে কালো। দিনের বেলাতেও সে চোখে ধুলো দেওয়াতে মাস্টার। রঘুনাথ তখন স্থিতু হতে জানে না, তার পায়ের তলায় সর্ষে, এখন এপারে তো তখন ভিনপারে।

ছেলের কু'কীর্তির কথা শুনতে শুনতে চোখের জলে ভাসে দুর্গামণি। দিনমানে রঘুনাথ গাঁয়ে ঢুকতে পারে না পুলিশের ভয়ে। রাত-বেরাতে সে যখন আসে তখন তীব্র অভিমানে দরজা খোলে না দুর্গামণি। গুয়ারাম ঘুম জড়ানো চোখে কাতর হয়ে বলে, দরজা খুলে দাও গো, ছেলেটারে আসতে দাও। লুলার সাথে আমাদের রঘুর অনেক ফারাক আচে। লুলা যদি তুষের আগুন হয়, আমার ঘরের রঘু হল গনগনে আগুনের টিপি। আমার বাপ-ঠাকুরদা যা পারেনি, রঘু তা হাসতে-হাসতে পেরেচে। ও নীলবাবুরে উচিত শেক্ষা দিয়েচে। বড়ো বাড় বেড়েছিল বাবুটার। ধরাকে সরাজ্ঞান করত। আমার ঘরের রঘু ওর সরা ফেটিয়ে দিয়েচে। রঘুনাথকে ঘরে ঢুকতে দেওয়ার পেছনে গুয়ারামের স্বার্থ ছিল। বুকের ব্যথায় মাঠে খাটতে যেতে পারে না সে। গা রোদ লাগলে চিড়বিড় করে জ্বলে। খরানীতে ঝ্যানঝেনে কাশি ওঠে। অসহ্য বেদনাটা বুকের চারপাশে কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো বিড়া বানিয়ে ছোবল মারার জন্য তৈরি থাকে। এই ভয় আর ব্যথা দিনরাত গিলে খাচ্ছে তাকে।

হাসপাতালের বড়ো ডাক্তার ওষুধ লিখে দিয়েছে সাদা কাগজে। মুখ দেখিয়ে ওষুধ আসবে না। আর ওষুধ না খেলে বাঁচবে না জান। জান বাঁচানোর জন্য রঘুনাথের কাছে হাত পাতা দরকার। ছেলে রোজগেরে হয়েছে। ছেলে দেবে তার চিকিৎসা খরচা।

দুর্গামণি গুয়ারামের এই মনোভাবকে সমর্থন করে না। সে কান্না ভেজা গলায় বলে, আমার কুনো ছেলে নেই। আমার যে ছেলে ছিল সে মরে গিয়েচে গো। তুমরা সেই মরা ছেলের কথা আমাকে আর শুনিয়ো না গো, তার কথা শুনলে আমার কলিজার হাড় মড়মড় করে ভেঙে যায়।

কান্নার বেগকে সামাল দেওয়া যায় না, দুর্গামণি কাঁদে। গুয়ারামের চোখও লেবু চিপকায়। চুনারাম আক্ষেপ করে বলে, কাঁদিস নে গুয়া, কাঁদিস নে। আমি বেঁচে থাকতে তুর কুনো ক্ষতি হবে না। সে বামুন বাচ্চা তুরে জোড়া পায়ের লাথ মেরেচে। তার ওই সোনার বরণ পা শুকিয়ে মরা আখের মতো হয়ে যাবে। নর হচ্ছে নারায়ণ। তার গায়ে কি পা তোলা ভালো রে! সবুর কর, তার শাস্তি সে পেয়ে যাবে। এখনও যে চাঁদ-সূয্যি ওঠে। এখনও যে আগুন তাপ দেয়।

বাঁধের গোড়ায় সড়সড় করে জল। এই জলের স্বভাব চোরের মতন। রঘুনাথ জলের দিকে তাকিয়ে সুতোর কাছাকাছি এসে যাওয়া বিড়িটা ছুঁড়ে দিল দূরে। স্যাঁত করে একটা হেরে যাওয়ার শব্দ হয়ে নিভে গেল বিড়িটা।

নূপুর এগিয়ে এল তার সামনে, দাদারে, ঘর যাবি নে?

নূপুরের কথায় ছ্যাকা খেল রঘুনাথ, মুখ ফেরাল সে, ঘর যেতে তো মন চায়, কিন্তু মা তো কথা বলে না।

—ও জেঠির কথা বাদ দাও। নূপুর হালকা করতে চাইল প্রসঙ্গ।

রঘুনাথ সেই একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে বলল, মা'র কথা বাদ দিলে হয় বল? আমি বুঝতে পারিনে, মার কাচে আমি কি দোষ করেচি?

—ও তোমার বুঝে কাজ নেই। নূপুর রঘুনাথের হাত ধরে টানল, নিজের ঘরে না যাও তো, আমাদের ঘরে চলো। বাবা চলে যাওয়ার পর ঘরটা কেমন ফাঁকা হয়ে আচে।

—তা তো হবেই! মানুষটা যে কুথায় গেল।

—আমার মনে হয় তারে কেউ মেরে ফেলেচে! নূপুর বোবার মতো তাকাল।

—কে মারবে তাকে? তার কেউ শত্রু ছিল না।

—ছিল গো, ছিল। তুমি জানো না। নূপুরের গলা একটুও কাঁপল না। সে দৃঢ় গলায় কথাগুলো বলে রঘুনাথের মুখের দিকে তাকাল।

রঘুনাথ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, মোটে ভাববি নে, কাকা ঠিক ফিরে আসবে। তার মতন মানুষ বেশিদিন ঘরছাড়া হয়ে থাকতে পারবে না। হলদিপোঁতা ছেড়ে সে সঙ্গে গিয়েও সুখ পাবে না।

নূপুর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, ঘর খরচা এট্টা টাকাও নেই আমার কাচে। ক'দিন খুদ ফুটিয়ে খাচ্চি। দাদু জাউভাত খেতে পারে না। প্রতিদিন খাওয়ার সময় চোখের জল ফেলে। আমার দেখতে ভালো লাগে না।

নূপুরের কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল রঘুনাথের। অথচ একসময় কত মানুষ ওদের ঘরে পাত পেড়ে খেয়ে যেত। লুলারামের মন খোলা আকাশ না হলেও সে কৃপণ নয়। মানুষের বিপদে আপদে প্রায় সে দাঁড়াত। হলদিপোঁতার পুজো পরবে সে ছিল সবার আগে। রঘুনাথ ছোটবেলায় ভাবত—বড়ো হয়ে সে কাকার মতো হবে। তবে ঢিলি কাকির জন্য তার দুঃখ হত। মনটা কঁকিয়ে উঠত হর সময়। ঢিলি কাকির উপর কাকার ব্যবহার মোটেও ভালো ছিল না। তার মনে হয় কাকা কোনোদিন চাইত না কাকি ভালো থাকুক।

পাপ করলে আজকাল শাস্তি হাতেনাতে পেতে হয়। এক আকাশে দুটো চাঁদ ওঠে না। ঢিলি কাকি নিজেকে সরিয়ে নিল স্বেচ্ছায়। তার মৃত্যু ওদের স্বাধীনতা দিতে পারেনি, বরং বিচ্ছেদের সাপটা ছোবল মেরেছে দু-জনকে। সেই বিষে জ্বলে পুড়ে দগ্ধেছে ওরা দু-জন।

নূপুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রঘুনাথ অকপটে বলল, তুই ভাবিস নে, আমি সময়মতো তোর কাছে সব কিছু পৌঁছে দেব। পকেট হাতড়ে সে কিছু টাকা নূপুরের হাতে গুঁজে দিল, এগুলো রাখ। পরে আরও দেব। মা'র খোঁজ নিবি। আমি রাতে এসে বাবাকে দেখে যাব। বলা যায় না—কোথায় কোন পুলিশের লোক ঘুরচে।

—পুলিশ তুমার কি করবে?

—কিছু না। ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে দেবে।

—তুমার দোষ কি যে তোমাকে হাজতে দেবে? নূপুরের সরল জিজ্ঞাসায় একটু অবাক হল রঘুনাথ, নিজেকে আড়াল করে সে বলল, আমি ধোয়া তুলসীপাতা হতে পারলাম কই? আমারও মেলা দোষ আচে।

—তুমার কি দোষ তা জানি। নূপুর বিশ্লেষণী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। রঘুনাথ হতভম্ব। পাশ কাটিয়ে বলল, জল দেখে ঘরে ফিরে যা। আমার তাড়া আচে। আমাকে পাশের গাঁয়ে যেতে হবে। ক'পা এগিয়ে আবার ফিরে এল রঘুনাথ, পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা মুঠো করে বের করে বলল, শোন নূপুর, এই টাকাগুলো লুকিয়ে বাবাকে দিয়ে দিবি। মা যেন না দেখে। মা দেখলে আমার ছোঁয়া লাগা টাকা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে উড়িয়ে দেবে।

নূপুর ঘাড় নেড়ে বাঁধের গোড়া বেয়ে নেমে গেল।

বর্ষায় বৃষ্টির দেখা নেই অথচ শরৎ ঋতুতে হড়হড়িয়ে ঢালল মেঘ। টানা সাতদিনের বৃষ্টিতে হাঁপিয়ে উঠেছিল দুর্গামণি, ঘরে চাল বাড়ন্ত অথচ খিদের জন্য গুয়ারামের বুকের ব্যথাটা আরও চাগিয়ে ওঠে। সে ভ্যালভেলিয়ে আশেপাশে তাকায়। কাউকে দেখতে না পেয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। এই দুর্দিনে ছেলেটা একবার ঘরে এলে ভালো হত। ওর কি মন কাঁদে না বাপ-মা'র জন্য? আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতিগতি বোঝা দায়। ওরা আষাঢ়ের মেঘের চেয়েও হড়বড়ে, তড়বড়ে—এক জায়গায় তিষ্টুতে জানে না।

রঘুনাথের চিন্তায় গুয়ারামের রাতের ঘুম ছুটে গিয়েছে, চোখে ঘুম না এলে দল বেঁধে ব্যথা আসে। ওরা খাবলায়, খুবলায়। আছড়ে-পাছড়ে ঘুম চটকে পালায়। তখন বিছানা আঁকড়ে বাকি রাতটুকু আবোল-তাবোল ভাবা। ভাবনার কি শেষ আছে? ভাবনা তো স্বর্ণলতার মূল। ওর মুড়ো খুঁজে পাওয়া ভার।

পেছল পথে লাঠি ছাড়া হাঁটতে কষ্ট হয় গুয়ারামের। বাপের আগে তাকে লাঠি ধরতে হল বলে মাঝে মাঝে তার মনে খেদ জন্মায়। খেদ থেকে সৃষ্টি হয় ঘৃণার। নীলাক্ষবাবুকে সে ক্ষমা করতে পারে না। যদি কোনোদিন আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ওই মানুষটাকে সে ছেড়ে কথা বলবে না।

খুব সতর্কতায় লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বাঁধের গোড়া অবধি এল গুয়ারাম। নুয়ে পড়া বাঁশগাছের ছায়ায় আঁধার হয়ে আছে পথ। একদল সাতভায়া পাখি কাদার উপর খপর খপর করে হাঁটছে। ওদের শিস দেওয়া বন্ধ নেই। ঝগড়া করার মতো অনর্গল বকে যাচ্ছে ওরা। গুয়ারামের সহ্য হচ্ছিল না সেই চিৎকার। লাঠি উঁচিয়ে পাখিগুলোকে সে তাড়াতে গেলে ভারসাম্য হারিয়ে শরীরটা টলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখনই কচু শাকের বোঝা নামিয়ে ঝারি তাকে ধরে ফেলল, সাবধানে চলাফেরা করো গো, পড়ে গেলে এঁটেল কাদা গায়ে জড়িয়ে যেত যে—

গুয়ারাম অনেকদিন পরে ঝারিকে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। রূপ যেন ফেটে পড়ছে বউটার। বর্ষার মানকচু গাছ বুঝি লজ্জা পাবে তাকে দেখে। রসিকতা করার লোভটা সামলাতে পারল না গুয়ারাম, ছেলের মুখেভাত হয়ে গেল—আমার মিঠাইটা কুথায় গো বউমা?

ঝারি মজা পেয়ে হাসল, হবে, সব হবে। আগে আমার দুয়ারে তুমার পায়ের ধুলো পড়ুক—তারপর।

—দেখচো তো আমার শরীলের অবস্থা। বড়ো বিপন্ন শোনাল গুয়ারামের কণ্ঠস্বর, জানি না আর কোনোদিন তুমার ছেলের মুখ দেখা হবে কি না! তবে আমার শরীলের অবস্থা ভালো নেই। পাটকাঠির বেড়ায় উই লেগেচে গো...।

—তুমার ভাইয়ের মুখে সব শুনেচি। ঝারির চোখে সমবেদনা ফুটে উঠল। গুয়ারাম বলল, শরীর পারলে একদিন তুমার দুয়ারে যাব। তবে কবে যাবো আগাম বলতে পারচি নে। তুমি একবার সময় পেলে ছেলেটারে নিয়ে এসো। আমার ছেলেটা তো আর আমার হল না!

—সে কি কথা!

—হ্যাঁ, যা সত্যি তাই বলচি। মেলা দিন হল সে ঘর আসেনি। গুয়ারাম কাছিমের মতো মুখ তুলে চারপাশটা দেখে নিল, আগে তাও রাত-বেরাতে আসত। এখন আর মুটে আসে না। জানি না সে বেঁচে আচে কি না।

—কি যা তা বলচো! ঝারি বিমূঢ় ঢঙে তাকাল, রঘুর কুনোদিন ক্ষতি হবে না। ওর মতন ছেলে হলদিপোঁতায় কটা আচে বলতো?

গুয়ারাম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উপরের দিকে মুখ তুলল, ওই ওপরওয়ালাই জানে সে এখুন কুথায়। সন্‌সারে বড়ো অভাব গো! সে এলে জান-মান বাঁচত।

ডিভিসি জল ছাড়ল আবার। আখের ভুঁই ডুবে গিয়েছে জলে। বুড়িগাঙ চওড়া হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে চরসুজাপুর কমলাবাড়ি পর্যন্ত। দিগন্ত জুড়ে শুধু ঢেউ আর ঢেউ। সেই সঙ্গে ঘোলা জলের তান্ডব। এই জলের দিকে তাকালে রঘুনাথের কথা মনে পড়ে গুয়ারামের। অথচ ঘোলা জলের সাথে কালো কুচকুচিয়া রঘুনাথের কত ফারাক।

কয়লা কালো, বেবুর কাঠ কালো। ওদের দেহে লুকিয়ে আছে আগুনের ঝোরা। আগুনের পাহাড়। বুড়িগাঙের জলে আগুনের ঢেউ উজান ঠেলে চলেছে জীবনের নতুন পদাবলী রচনার জন্য।

গুয়ারাম বাঁধে দাঁড়িয়ে লাঠিটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

ঘেঁটকুল গাছের মসৃণ পাতায় মোটা মোটা বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে চোখের নিমেষে। অ্যাশশাওড়ার পাতাতেও জল দাঁড়ায় না, শুধু ওর গোড়াগুলো ডুবে আছে চেটো ডোবা জলে। টানা সাতদিন ধরে বৃষ্টি, আকাশের তবু থামবার কোনো লক্ষণ নেই। এমন সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টিতে মিয়ানো মুড়ির মতো মন নিয়ে ঘুরছিল শুভ। অবনী তাকে দেখতে পেয়ে ডাকল, শোন, আকাশের মতিগতি ভালো বুঝছি নে। এইমাত্র পঞ্চায়েত অফিস থেকে ঘুরে এলাম। সবাই বলাবলি করছে যে কোনো সময় বাঁধ ভাঙতে পারে। বাঁধের যা দশা বেশিক্ষণ আর ঠেকা দিতে পারবে না।

শুভর চোখ থেকে নিমেষে উধাও হয়ে গেল স্বস্তি। তার বদলে একটা শিউরে ওঠা ভাব ওর চোখের সাদা জমির দখল নিল। অবনীর তর সইছিল না। চিন্তার শেষ নেই ওর। বাঁধ ভাঙলে ঘর সংসার নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে সে? কোয়ার্টারের সবাই যে যার মতো গোছগাছ করে নিয়েছে। খাটের পায়ায় চারটে-ছটা ইট দিয়ে উঁচু করেছে খাট। সেই উঁচু খাটের উপর ঘরের জিনিস সাজিয়ে রেখেছে সবাই। জল যাতে ছুঁতে না পারে তার জন্য সবার মধ্যে এক অসম লড়াই।

জলের থাবা বিশাল থাবা। সেই থাবা থেকে বাঁচার ক্ষমতা নেই কারো। অবনী কপাল কুঁচকে ভাবল এ যাত্রায় পার পেয়ে গেলে ভালো। নাহলে বিপদের আর শেষ থাকবে না। বাঁধ ভেঙে গেলে হাসপাতালের মাঠ নাকি সমুদ্র হয়ে যায়, থৈ-থৈ জলে তখন সাঁতার ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

ডাক্তারবাবু তাঁর কোয়ার্টারের যাবতীয় জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছেন শিবনাথবাবুর বাড়িতে। চারবার ট্রিপ দিয়েছে শিবনাথবাবুর ট্রাক্টর। কালীগঞ্জ বাজারের ওদিক বেশ উঁচু। বড়ো বন্যার সময় জল ওঠেনি। এবছর যে জল উঠবে না একথা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। তবে জল উঠলেও ভয়ের কোনো কারণ নেই। কেননা শিবনাথবাবুর দোতলাবাড়ি, দোতলাতেই প্রায় ছ'খানা ঘর। ছ'খানা ঘরের দু'খানা ঘর তিনি ছেড়ে দিয়েছেন ডাক্তারবাবুকে। একদিন আগে থেকে মাধুরীরা ভয়ে চলে গিয়েছে ওখানে। শুধু ডাক্তারবাবু নন কোয়ার্টারের আর সবাই যে যার মতন ব্যবস্থা করে নিয়েছেন মাথা গোঁজার।

সবাই যা অনায়াসে পেরেছে, অবনী তা পারেনি। এটা তার অক্ষমতা কিনা ভাবছিল সে। গালে হাত দিয়ে হাত ব্যথা হয়ে গেল তবু সে এর কোনো উত্তর পায়নি। গ্রামসমাজে ছোঁয়াছুঁয়ি রোগটা বালি ঢাকা নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে। অস্পৃশ্যতা বুঝি স্বর্ণলতার মূল, যার গোড়া খুঁজে কেউ উপড়ে ফেলতে পারে না। হাসপাতালের আউটডোরে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, অবনী শেষ পর্যন্ত তুমি কি ঠিক করলে? কোথায় যাচ্ছো? যদি কোথাও ঠিক না হয়ে থাকে তাহলে সময় থাকতে বড়ো ইস্কুলে চলে যাও। শুনেছি, ইস্কুলের মাঠটা উঁচু। সবাই বলছিল গেল বন্যায় ওখানে জল ওঠেনি।

এসব উপদেশ হাজারবার শুনে অবনী ঠিক করেছে বাঁধ ভাঙলেও সে আর কোথাও যাবে না। বাঁশ দিয়ে ছাদে ওঠার সিঁড়ি বানিয়ে নিয়েছে সে। একটা বড়ো মাপের ত্রিপল সংগ্রহ করেছে সে। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে ত্রিপলটাকে কাজে লাগাবে সে। আকাশ ধরলে তার আর কোনো চিন্তা নেই। কোয়ার্টারের ছাদের উপর দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারবে। লোকের বাড়িতে গেলে বউ-ছেলে নিয়ে নিরাপদে থাকতে পারত সে। গাঁয়ের কেউ তাকে থাকার প্রস্তাব দেয়নি। আর এসব কথা আগ বাড়িয়ে সে কাউকে বলতে পারেনি। তার ভিতরেও সংকোচ জড়তার শেষ নেই। সবাই ছোট কাজ করে বলে ঘেন্না করে। তাদের চোখের ঘৃণা সে কি ভাবে মুছে দেবে? তার এত শক্তি কোথায়? সে শুধু শুভকে বলল, তুই খপখপ চাপড়া চলে যা। চাল আর আটা নিয়ে চলে আসবি। চাল আটা থাকলে অনেকটাই ঠেকা দিতে পারব। খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা না থাকলে তখন অন্য চিন্তা করা যাবে।

শুভর পাশের গ্রাম চাপড়ায় যাবার কোনো ইচ্ছে ছিল না। এখন কাদা পথে সাইকেল ঠেলতে হাজার সমস্যা। মাইলখানিক পথ মাঠে মাঠে যাওয়া যায়, নয়তো আমবাগানের পথটা ধরতে হবে। দাসপাড়ার পাশ দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে সেটা তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো। বেলে মাটিতে কাদা হয় না, আর হলেও সে কাদা কোনো সমস্যা তৈরি করে না।

ঘর থেকে দুটো থলি আর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শুভ। অন্য সময় হলে সে অজুহাত তৈরি করে এড়িয়ে যেত। সরস্বতী যাওয়ার সময় বলল, সাবধানে যাবি। মোটে দেরি করবি নে। তুই না আসা পর্যন্ত আমার খুব চিন্তা হবে।

শুভরও ভয় করছিল। বলা যায় না কখন বাঁধ ভেঙে যায়। বন্ধুদের মুখে বন্যার ভয়াবহতার কথা সে বিশদ শুনেছে।

শুভ কাছ থেকে তার বাবাকে দেখে। বাবার মুখের দুঃখী ভাবটা তার ভালো লাগে না। একটা মানুষ সব সময় গালে হাত দিয়ে কী ভাবে এত? মানুষের সমস্যার শেষ নেই। সমস্যা থাকবে তা বলে সমস্যার ভেতরে তলিয়ে যেতে হবে মানুষকে? মাথা তুলে দাঁড়াবার কোনো চেষ্টা থাকবে না মানুষের? এভাবে কথায় কথায় হেরে যাবার কোনো অর্থ হয় না। কালীগঞ্জ বাজারে বিদুর কাকার বক্তৃতা শুনেছে সে। এত সুন্দর গুছিয়ে কথা বলে যা শুনে গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। মাথা ঠিক রাখা যায় না। অথচ বিদুরকাকার দুবেলা ভাত জোটে না। শিবনাথবাবু কত হেয় করে কথা বলেন তার সঙ্গে। মাথা গরম হয়ে ওঠে শুভর। মানুষের সঙ্গে মানুষ এত খারাপ ব্যবহার করে কি ভাবে? তার মা বলে, চোখের চামড়া মোটা হলে মানুষ পশু হয়ে যায় যখন তখন। শুভর মনে হয় মায়ের কথাটা সত্যি।

শিবনাথবাবু শুধু মোটা নয়, তার চোখের চামড়াও মোটা। মনটা ভাগাড়ের চেয়েও নোংরা। শুধু সাদা ধবধবে পোশাক পরলেই মানুষের মন পরিষ্কার হয় না।

চাপড়া থেকে ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল। সাইকেল ঠেলে হাঁপিয়ে উঠেছিল শুভ। মেঘে

ঢাকা আকাশের গোমড়া মুখ ভাসছিল কালভার্টের জলে। যে কোনো সময় ঝাঁপিয়ে পড়বে এমন একটা মুহূর্ত। বড়ো অসহ্য লাগছিল শুভর। এক সময় বৃষ্টি না হলে ভীষণ মন খারাপ করত তার। এখন মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিতে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। কতদিন মাঠে যায় নি খেলতে। খেলবে কোথায়? মাঠ ভর্তি জল সাদা আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে পরম মমতায়। ক'দিন থেকে শুভ লক্ষ্য করছে টিউবওয়েলটার দৈন্য দশা। হ্যান্ডেলে চাপ না দিলেও জল ঝরছে অনবরত।

সরস্বতী কপাল কুঁচকে বলল, এ লক্ষণ ভালো নয়। এমন হলে মানুষের কপাল ফাটে।

শুভ এ কথার অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারেনি। তবে সামনে যে খুব খারাপ সময় এটা সে অনুভব করতে পেরেছে। অবনী হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বলল, দেখো মাঠের কেঁচো সব বারান্দায় উঠে এসেছে। এ লক্ষণ ভালো নয়। মনে হচ্ছে সামনে মহাবিপদ। আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে।

প্রকৃতি ক্ষেপলে তার ক্ষেপামু চট করে দূর করা যায় না। বিধির থাবা বাঘের থাবার চাইতেও হিংস্র। বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে অবনী ঠকঠক করে কাঁপছিল। কথা বলার ইচ্ছে হল না তার।

—কি ভাবলে? বেজার মুখে শুধোল সরস্বতী।

অবনী নিরুপায় হয়ে বলল, কি আর ভাবব, ভাবার আর কি আছে। যা হবে দেখা যাবে।

—জানো, আমার খুব ভয় করছে। আমি জীবনে বন্যা দেখিনি।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকাল অবনী, অত ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। মাথার উপর একজন আছে তো—

সরস্বতীর বুকটা ভয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠল, অশুভ আশঙ্কায় দুলে উঠল মন।

—আমাদের ঘরটা যদি জলের তোড়ে ভেঙে যায় তাহলে?

—ধুর, অমন কোনোদিন হয় নাকি? অবনী জোর গলায় বলে, সাবধানে থাকতে হবে। সাবধানের মার নেই। আমি নিজেকে নিয়ে ভাবি না। শুধু শুভর কথা ভাবছি—

সরস্বতী মুখ ফিরিয়ে বলল, গাঁয়ের মানুষগুলোর কি হবে গো? ওরা কোথায় যাবে?

—শুনেছি সবাই বাঁধের উপর থাকবে। এক বাঁধ ভেঙে গেলে বাকি বাঁধের ক্ষতি হয় না।

অবাক হয়ে শুনল সরস্বতী। বিস্ময়ও অনেক সময় রক্ত চলাচল বাড়িয়ে দেয়। কালো চাপ বাঁধা মেঘের দিকে তাকিয়ে বুক শুকিয়ে গেল তার। চারপাশ থেকে উঠে আসা জলীয়গন্ধ অসহ্য লাগল তার নাকে।

হাসপাতালের পাঁচিলের ও পিঠে কুমোরদের খাদ। বারো মাস ওখান থেকে মাটি কেটে নিয়ে যায় ওরা। গত বছর গরমে খাদে ঢুকে মাটি কাটতে গিয়ে চাপা পড়ে গিয়েছিল একজন। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও সে বাঁচল না। মাটির বিরাট চাই তার বুকটাকে জলে চুবানো স্পঞ্জের মতো নরম করে দিয়েছিল। বড়ো ডাক্তার বুকে চাপ দিতেই গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল নাক-মুখ দিয়ে। সেই ভয়াবহ দৃশ্য এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে সরস্বতীর। কুমোরখাদের দিকে তাকাতে তার ভয় করে। চোখের তারা কেঁপে ওঠে।

সবুজরা আর একটু পরে চলে যাবে। ওদের গোছগাছ প্রায় সারা। পাল বুড়ো দুটো গোরুর গাড়ি পাঠিয়েছে ওদের জন্য। সবুজের মা অনেক আগে দুই মেয়েকে নিয়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর পায়ে ব্যথা জোরে হাঁটতে পারেন না। হঠাৎ বাঁধ ভেঙে জল এলে কোথায় যাবেন তিনি। আগাম সতর্কতার কোনো বিকল্প নেই। সবুজ দূরে দাঁড়িয়ে ওদের ব্যস্ততার আঁচ পাচ্ছিল। মাত্র ক'দিনেই সবকিছু যেন বদলে গেল। এত নিবিড় সম্পর্ক সব যেন ছানাকাটা দুধের মতো ছাড়া-ছাড়া হয়ে গেল। গত ক'দিনে অনেক বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছে সবুজকে। বাঁধের ধারে সে একদিনও যায় নি জল দেখতে। ওর বাবা ভীষণ কড়া ধাঁতের মানুষ। ডাক্তারবাবু বলেন, হাই প্রেসার।

রেগে গেলে সহজে আর স্বাভাবিক হতে পারেন না। তবে বেঁটে খাটো মানুষটার মন ভালো। পেয়ারা তলায় অবনীকে ডেকে বললেন, আমরা চলে যাব। তোমরাও চলে যাও। আগুনকে বাগে আনা যায় কিন্তু জলকে তো বাগে আনা যায় না। জলের মতো বেয়াদপ পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

দাঁড়িয়ে থেকে চোখ ঝাপসা হয়ে এল শুভর। সবুজের ব্যবহার আজ তার অস্বাভাবিক ঠেকছে। সবুজ যেন তাকে চেনে না এমন মুখভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কত অজানা, অচেনা। কেন এমন অপরিচিতের মতো মুখ করে চেয়ে আছে সবুজ। ওকি কিছু বলতে চায়? তা যদি হবে তাহলে এগিয়ে আসছে না কেন? ওর সাথে তো ঝগড়া হয়নি? ওরা চলে যাবে বলেই কি বিচ্ছেদের পাঁচিল তুলছে ইচ্ছে করে? শুভ এক দৌড়ে ঘরের মধ্যে চলে এল। চেনা ঘরের চেহারা বদলে গিয়েছে বন্যার ভয়ে। এক মানুষ সমান উঁচু করা হয়েছে তক্তপোষ। দরকারী জিনিসপত্তর বস্তায় বেঁধে নিয়েছে অবনী। ত্রিপল দিয়ে অস্থায়ী ছাউনি বানিয়েছে ছাদের উপর। বাঁশের সিঁড়িটা যাতে বন্যার জলে ভেসে না যায় সেইজন্য সিঁড়ির দু'মাথা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে শক্ত করে। ঝড়ো হাওয়ায় ত্রিপল যাতে না উড়ে যায় সেইজন্য ইটচাপা দিয়ে রেখেছে ত্রিপলের ডগায়। মুষলধারে বৃষ্টি হলে এই অস্থায়ী ছাউনি কতটা কাজে দেবে তা ওপরওয়ালাই জানেন।

এতকিছুর পরেও মনোবল হারায়নি অবনী। সে বান-বন্যা দেশের মানুষ। ঘোলাজল তার কাছে চাষের জল। জলকে সে ভয় পায়নি কোনোদিনও। তবে স্রোতের মুখে সে বাহাদুরী দেখাতে ভয় পায়। স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব কিছু। তবু জীবনের অন্য নাম স্রোত একথা সে অস্বীকার করতে পারে না।

পাঁচিলের ধারে আইশ্যাওড়া গাছের পাতাগুলো চকচক করছে কৃষ্ণবরণ যুবতীর মুখমণ্ডলের লাবণ্যের মতো। আইশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে দাঁত মাজলে সাদা মুলোর চেয়েও ঝকঝক করে দাঁত। ওই বেঁটে গাছের গোলাপী ফলগুলো নেশা ধরিয়ে দেয় অবনীর চোখে। মেদিনীপুরের দেশ গাঁয়ে এমন ফল তার চোখে পড়েনি। এক এক জেলার মাটিতে একেক ধরনের চাষ, গাছপালা ঝোপঝাড়ও ভিন্ন ভিন্ন। মাটি কি তাহলে রূপ বদলায় জায়গা বুঝে? অবনীর মাথাটা ঝিমঝিমিয়ে ওঠে বৃষ্টি ভেজা গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে।

তার মনের অনেকটাই খেয়ে নিয়েছে বন্যা। এই বন্যা বুঝি হাঙরের মতো এগিয়ে আসবে তাকে পুরোপুরি গিলে নিতে। টিকেদারবাবুর তিনজন মুনিষ গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে দিচ্ছে ঘরের জিনিস। তদারকির কাজ মন দিয়ে দেখছেন তিনি।

একে একে এই হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবে সবাই। ওরা জানে জলের সঙ্গে কুস্তি লড়া সহজ ব্যাপার নয়। বাঁধ ভাঙা জল বুনো হাতির চেয়েও ভয়ঙ্কর। তার পাগল হয়ে দৌড়ে বেড়ান সবাই সহজ চোখে মেনে নিতে পারবে না। বানের জল আর ঘূর্ণি হাওয়া দু'জনের বড়ো ভাব। সামনে যা পাবে তাই গিলে খাবে গোগ্রাসে, রাক্ষস।

অবনী চোখ ফিরিয়ে নিয়ে উদাস হয়ে গেল নিমেষে। কুমোরখাদকে এখন আর চেনা যায় না, ভরা যৌবন ঢ্যাপফুলের চেয়েও সুন্দর। রোদের সাথে জলের খেলা সহজাত। কতদিন রোদের মুখ তারা দেখেনি—সে কথা ভাবার চেষ্টা করল অবনী। মন খারাপ হয়ে গেল তার।

পালবাড়ির উদ্দেশ্যে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে যাচ্ছে মালবোঝাই গোরুগাড়ি। পেছন পেছন হাঁটছেন টিকেদারবাবু। অবনী ভাবছিল তিনি হয়ত যাওয়ার সময় পিছু ফিরে তাকাবেন। কিন্তু তার ভাবনায় গোড়ায় গলদ। বিপদের দিনে মানুষ আগে বাঁচাবে নিজেকে। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। আশাহত অবনীর মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল।

ঘেঁটকুল গাছের পাতা চুঁইয়ে জল ঝরছে হরদম। এই গাছগুলোকে কেউ বুঝি দেখেও দেখে না। এর রূপ যেমন তেমনি এর বদগুণ। গিয়াস গাছি রস চুরি ঠেকাতে ঘেঁটকুল কচুর গোড়া কুঁচি কুঁচি করে কেটে রেখে দিত রসের ঠিলিতে। চুরি করে রস খেতে গেলে তার কুটকুটানি আর কমত না। ডাক্তার-বদ্যি না করালে নিস্তার নেই এমন জ্বলন। অবনী ঘেঁটকুল ভেজানো রস খায়নি তবু তার ভেতরটা জ্বলছে। শুভর প্রশ্নটা তাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না কিছুতেই, বাবা, সবাইকে ডেকে নিয়ে গেল অথচ আমাদের কেউ ডাকল না। কেন ডাকল না বাবা?

কি উত্তর দেবে অবনী ছেলের এই প্রশ্নের। সব প্রশ্নের কি উত্তর হয়। কিছু প্রশ্ন আছে যার উত্তর জেনেও নীরব থাকতে হয়। অবনীও এ ঘটনায় কম দুঃখ পায়নি। এতগুলো বছর এক সঙ্গে বসবাস করা অথচ বিপদের সময় ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়া এ কেমন বিচার বাবু ভদ্র সমাজের? চোখের চামড়া মোটা না হলে এমন কাজ কেউ কি করতে পারে?

ডাক্তারবাবুর মেয়ে মাধুরীই একমাত্র বলেছিল, আমাদের সঙ্গে শুভদেরও নিয়ে চল। বাঁধ ভেঙে গেলে ওরা কোথায় থাকবে?

মেয়ের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারেন নি ডাক্তারবাবু। প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে মুখ কালো করে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। মেয়ের নির্বুদ্ধিতায় তিনি যে রীতিমত অপ্রস্তুত এটা তাঁর হাবভাব চোখের দৃষ্টি বলে দিচ্ছিল। দিনের আলোতেও আড়াল খুঁজছিলেন তিনি।

দিনের আলোতে যার মন কালো হয়ে যায় তার আড়াল বুঝি কোনোদিনও জোটে না। অবনীর ভাবনায় এই চিন্তাগুলো মিছিল করে আসছিল বারবার। ডুমুরের পাতার চেয়েও খসখসে হয়ে গেল তার মনের আস্তরণ। ব্যাধিটার কোথায় জন্ম, জন্ম থেকে জেনে গিয়েছে অবনী। বামুনবুড়ির ছেলে তাকে যে কাজটায় ঢুকিয়েছে সে কাজটা আদৌ তার নয়। প্রথম প্রথম সংকোচ হত হাসপাতাল ঝাড়ু দিতে। পরে সেই সংকোচ ব্যাঙাচির লেজের মতো খসে যায়। জীবনের জন্য কোনো কাজ ছোট নয়। মন ছোট হলে বুক ছোট হতে বাধ্য। বুক ছোট হলে ভাবনা হয়ে যায় সাগর থেকে ডোবা। গন্ধ ডোবার মন নিয়ে সুগন্ধ আশা করা যাবে কিভাবে।

অবনী হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এসেছিল সেদিন। মুখ আর মুখোশের মানে সেদিনই সে ভালো ভাবে জেনে গেল। নদীয়ার কালীগঞ্জ, আর মেদিনীপুরের বালিঘাই এগরার কোনো ফারাক নেই।

পঞ্চায়েত থেকে ঢেঁড়ি পিটিয়ে গিয়েছে কাল ডিভিসি আবার জল ছাড়বে। এই ছাড়া জলে শুরু হবে নতুন করে তাণ্ডব। বাঁধের কোণায় ছুঁয়ে থাকা জল উপচে যাবে এবার। ইঁদুরগর্তে ঘোলা জলের স্রোত ঢুকে তৈরি করবে ঘূর্ণি। বাঁধের ঘোঘা বড়ো হলে বাড়বে জলের ঘর-সংসার।

বাঁধ বাঁচানোর চেষ্টা চলছে সব প্রকার। সবাই এক বাক্যে দুষছে আকাশকে। আকাশের ছেরানি রোগ না সারলে সমূহ বিপদ। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ছাড়া জল আরও ভয়ঙ্কর। শুধু মাঠ ভাসবে না, ভাসবে ঘর। ভয়ে পা থেকে মাথা অবধি শিরশিরিয়ে উঠল অবনীর।

—মা শীতলাবুড়ি মুখ রেখো মা। জয় মা বুড়িমা মুখ রেখো মা। অবনী বিড়বিড়িয়ে উঠল, আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই মা। দয়া করো, —আমার সংসারটা যেন না ভেসে যায়।

সরস্বতীর অসহ্য লাগছিল অবনীর হাবভাব। সে চেঁচিয়ে ডাকল তার ঘরের মানুষটাকে কৈ গো, এদিকে এসো। ঠাকুর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে? ঠাকুর নয়, মানুষের মতো দাঁড়িয়ে ছিল অবনী, কথাটা তার গায়ে লাগল। কোনোমতে ফ্যাসফেসে গলায় বলল, যাচ্ছি, তুমি সব ঘরের জিনিসগুলো বের করে দাও।

—গুঁড়িগুড়ি বৃষ্টি ঝরছে, ভিজে গেলে? সরস্বতীর গলায় বজবজিয়ে উঠল সংশয়জনিত সন্দেহ।

সামান্য বিরক্তি হলেও তা চেপে রাখল অবনী, তোমাকে যা বলছি তাই করো তো।

সরস্বতী ঝাঁঝিয়ে উঠতে পারত কিন্তু সে ওপথে হাঁটল না, মাথা নীচু করে সুড়সুড়িয়ে সে ঢুকে গেল ঘরের ভেতর। সংসারের ছড়ানো জিনিস চোখে লাগে না, গোছাতে গেলে সেটাই হয়ে ওঠে একটা মস্ত বোঝা। তবু একা কোনোমতে মালপত্তর ভর্তি বস্তাটা বহু কষ্টে টেনে আনে দোরগোড়ায়। সামান্যতেই হাঁপিয়ে যায় সে। সাহায্যের জন্য শুভর দিকে তাকাতেই শুভ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, মা ধরব।

কোনো উত্তর না দিয়ে সরস্বতী বুঝিয়ে দিল তার কি কর্তব্য। ততক্ষণে অবনী এসে হাত লাগাল বস্তায়, যাও আর একটা বস্তা আছে, সেটাও নিয়ে আসো।

—অত জিনিস ছাদের উপর রাখবা কোথায়? সরস্বতীর প্রশ্নে যথেষ্ট যুক্তি ছিল, অবনী না ভেবেই বলল, থালা-বাসন না নিয়ে গেলে মাটিতে যে খেতে হবে। এগুলো আগে ছাদে তোলা দরকার।

—দেখো রাতে যেন শোওয়ার মতো জায়গা থাকে। আমি বাপু সারাদিন খাটাখাটনির পর রাত জাগতে পারব না।

—তোমার রাত জাগার কোনো দরকার নেই। রাতটা আমি সামলে দেব। তুমি দিনটা সামলিও।

—খাওয়ার জলের কি হবে? সরস্বতীর প্রশ্নে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল অবনী, অনবরত জল ঝরা টিউবওয়েলটার দিকে তাকিয়ে সে বলল, এখনও সময় আছে জল ভরে নেওয়ার। বানের জল ঢুকলে কল ডুবে যাবে। তখন খাওয়ার জল আর পাওয়া যাবে না।

শুভ মা-বাবার কথা মন দিয়ে শুনছিল, অবশেষে সে বলল, জল পাওয়া যাবে তবে জল আনতে গেলে থানার কলে যেতে হবে। সবুজ বলছিল বড়ো বানের সময় সব ডুবেছে কিন্তু থানার মাঠ ডোবে নি।

কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে শ্বাস ফেলল অবনী। বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে একতলার ছাদে ওঠা কোনো কঠিন কাজ নয়। তবে বাঁধ না ভাঙলেও রাতটা ওখানে কাটাতে হবে না হলে যে কেউ ছাদে উঠে গায়েব করে দেবে মালপত্তর।

নৈঋতে মেঘ করেছে যা হারিয়ে দেবে কালো খাসীর গায়ের রঙ। এই বুনো মেঘকে ভীষণ ভয় পায় অবনী। এর হাবভাব, মতিগতি কিছুই বোঝা যায় না। এই মেঘ পদ্মর মতো সুন্দর, ঘোলা নেশার চেয়েও নেশাখোর। চাপ বাঁধা মেঘ ঢাললে চট করে থামতে চায় না। আবার পেছল হয়ে যাবে পথঘাট। মাঠের বাকি কেঁচো উঠে আসবে উঠোনে। অবনী হা-করে তাকিয়ে থাকে সেই ধূমসা মেঘের দিকে।

দুপুরের আগে বাঁধ ভেঙে গেল দু'জায়গায়। মালীপাড়া আর কদবেলতলা ধাওড়ায়। ঘাসুরিডাঙার কাছে বাঁধ উপচে জল ঢুকছে গাঁয়ে। চুইয়ে চুইয়ে ভেসে যাচ্ছে বাঁধের মাটি। বালির বস্তা ফেলেও কোনো কাজের কাজ হল না। বিদুর বলল, আর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দরকার নেই। এবার যে যার ঘরে যাও।

লোকমুখে হাজার কথা কানে আসছিল অবনীর। যত শুনছিল ততই অস্থির হচ্ছিল মনটা।

দেশগাঁয়ে কেলেঘাই নদীতে বান আসত। বৃষ্টির জলে কখন কেলেঘাই মাঠ পেরিয়ে ঢুকে যেত গাঁয়ের ভেতর। অতিথির মতো জলদস্যু সেজে খুন করত গরীব মানুষের স্বপ্ন। সে বান আর এ বানে কত ফারাক। এ বানের জলের শব্দ দশটা বুনো হাতির সমান। কান পাতা দায়। ভয়ে ধড়াক করে বুক। কলজেয় বুঝি কেউ ঢুকিয়ে দেয় নখ।

অবনী ধড়াস বুকে ছাদে উঠে এল সবার শেষে। সরস্বতী বলল, দেখো, আর কিছু রয়ে গেল কি না।

অবনী গা করল না, কেমন বিষণ্ণ চোখে তাকাল। হাসপাতালের মাঠে ফণা তোলা সাপের মতো জল ঢুকছে। অবনী ভ্যাদামাছের মতো ড্যামা ড্যামা চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে। ছাদ থেকে মালীপাড়ার বাঁধের ভাঙা চেহারাটা দেখা যায়। জলের সাথে ভেসে আসছে কান-ফাটানো আওয়াজ।

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল সরস্বতীর, ওগো, দেখছো কেমন জল ঢুকছে।

—বাঁধ ভাঙলে জল ঢুকবেই। এ তো জলের ধর্ম--

সরস্বতী চুপ করে শুনল কথাগুলো। তারপর কেমন ঝিমিয়ে গিয়ে বলল, এত কাছে বাঁধ ভাঙল যে রাতে জলের শব্দে ঘুম আসবে না। জলের শব্দ নয়তো যেন বিসর্জনের হাজার ঢাক বাজছে।

—ধীরে ধীরে কানে সব সয়ে যাবে।

—সয়ে যাওয়ার আগে যেন কালা না হয়ে যাই।

কষ্টের মধ্যেই হাসল অবনী, কপালে যা লেখা আছে তা তো হবেই। এ কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

—কপাল ধরে বসে থাকলে কি দিন চলবে?

—দিন চলুক না চলুক কপালই সঙ্গে যাবে। অবনী জোর খাটাল কিন্তু তার কথাকে কোনো পাত্তা দিল না সরস্বতী।

শুভ অবাক চোখে দেখছিল জলের যাতায়াত। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই হাঁটু ডোবা জল খলবলানো মাঠে। কত কি যে ভেসে গেল তার চোখের সামনে। ঘর গুছিয়ে যারা হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেল তার আর কোনোদিন দেখতে পাবে না এমন ভয়ংকর সুন্দর দৃশ্য!

সরস্বতী ইটের চুলা বানাচ্ছে যত্ন নিয়ে। সেদিকে অলস চোখে তাকিয়ে আছে অবনী। পেটের মতো অগ্নিকুণ্ড আর হয় না। চুলা না বানালে ভাত ফুটবে না। ভাত না ফুটলে পেটের গর্ত ভর্তি হবে কি করে? ভাগ্যিস চাল আটা আনিয়ে রেখেছে বেশি করে! কেউ তো জানে না আগাম, জল কবে নামবে?

বেলা মরে এলে জলের গভীরতা আরও প্রকট হয়। ঘোলা জলের রঙ বদলে সে তখন রূপ বদলান মায়াবী। এই জলে নাকি বিষ থাকে। ছোঁয়া লাগালে কুটকুটায় গা-গতর। জল বসে গেলে জ্বরজালা এড়ানো বড়ো মুশকিল।

ঝমঝমানো বৃষ্টি নয়, বুক সমান জলে তীক্ষ্ণ কাচের মতো ঢুকে যাচ্ছে বৃষ্টির ফলা। আর একটু পরে অন্ধকার নেমে আসবে, আকাশের গুড়গুড় শব্দ আর ঠান্ডা বাতাস জানিয়ে দিচ্ছিল তার পূর্বাভাস। ধেয়ে আসা অন্ধকারের দিকে ধেয়ে আসছিল ফেনামুখো জল। চাপড়ার বিল পেরিয়ে এই জল সটান চলে যাবে পাগলাচণ্ডীর দহে।

বানের জলে মাছ ধরতে গিয়ে তোড়ের মাথায় ভেসে গিয়েছে জটা হালদার। তার বউ আদুরী বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে গাঁয়ে ফিরছে। হাসপাতালের ভাঙা পাঁচিলের পাশ দিয়ে

পাড়ায় ঢোকার পথ। পথের পাশে কামারডোবা। গোড়া মোটা তেঁতুল গাছটার শেকড় সর্বদা ছুঁয়ে আছে ডোবার-হৃদয়। একটু এদিক হলে গলা জল থেকে ডুব জলে পৌঁছে যাবে মানুষ। সাঁতার না জানলে ওখানেই একবারে সাঙ্গ হবে ভবলীলা।

আদুরীর মাথার কোনো ঠিক নেই, তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আরও তিনজন। ওদের সান্ত্বনা বাক্যে মন ভুলছে না আদুরীর, থেকে থেকে হিক্কা মেরে উঠছে। তার কাঁধ থেকে খসে গিয়েছে শাড়ির আঁচল। মানকচুর মতো ফর্সা শরীর বলে দিচ্ছে এরে শরীর ত্রিশও পেরয়নি। এই বয়সে স্বামী হারালে সে যে খোঁটা উপড়ানো গোরুর মতো চরবে। সমাজ লোকলজ্জাকে তার খুব ভয়। দাদ হলে সারানো যায় কিন্তু শরীরে ঘা হলে সারবে কিসে।

পাশের মেয়েটি আদুরীর চেয়ে ছোট, লজ্জায় চোখ কুঁকড়ে সে বলল, দিদি গো, সব বেরিয়ে গেছে বুকটা ঢাকো।

জলের আড়াল কোনো আড়াল নয়। জল বড়োজোর আশ্রয়।

আদুরী কাঁদতে কাঁদতে বুক ঢাকা দিয়ে বলল, কত করে মানা করলাম তবু কথা শুনল না। মাছ ধরার নেশাই ওর কাল হল। ওকে কালে খেল, এখন আমাকে যে কে খাবে হে ভগবান বলে দাও।

সুরেলা কান্না আর্দ্র বাতাসের বুক ভার করে দেয়। পাশের মেয়েটি আদুরীর হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলল, কেঁদো না, কেঁদো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। জটাদা ভালো সাঁতার জানে। সে ভেসে গেলেও ডুবে যাবে না।

—ঘূর্ণি জল ফুটরসের চেয়েও প্রাণঘাতী। ওরে বুন, আগুন গেলে আমার মানুষটাকে কি ছেড়ে দেবে? নাকের সকড়ি মুছে বড়ো করে শ্বাসটান দিল আদুরী। আবার বুকের শাড়ি তার খসে পড়ল নাভি ডোবা জলে। কেমন ভয়ে-চিন্তায় ছোট হয়ে গিয়েছে আদুরীর বুক দুটো। জলীয় হাওয়ায় ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছিল তার কান্নার গতি।

বৃষ্টির তোড়ে সারারাত দু-চোখের পাতা এক হল না সরস্বতীর। ভোরের দিকে শুভ ওই স্যাঁতসেঁতে বিছানায় দেহ এলিয়ে দিল। তখনও বজ্র-বিদ্যুৎ-এর খেলা চলছে আকাশে। গালে হাত দিয়ে ঠায় বসে আছে অবনী। হাওয়াতে তার উড়ে গেলে সে চেপে ধরবে খুঁট। সরস্বতীও সতর্ক। মাথা বাঁচানোর জন্য ছাউনিটাকে বাঁচাতে হবে। আকাশ যখন মাথা বাঁচাতে অপারগ তখন একটা মানুষ অন্য মানুষের ছায়া হয়ে বেঁচে থাকে।

সকালের আলোয় অবনী দেখল আর জল বাড়েনি। কলাগাছের কোমর ডোবা জল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

লাল চা বানিয়ে সরস্বতী ডাকল, কই আসো। চা খাবা না?

চায়ের কথা শুনে মনে স্ফূর্তি হল অবনীর। ঝি-সকালে অতসী দিদিমণি তার জন্য চা বানান। ওর জন্য আলাদা কাপ রাখা আছে দিদিমণির ঘরে। সকালবেলায় অতসী দিদিমণির ঘরে চা খাওয়াটা তার কাছে একটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছে।

লাল চায়ের দিকে তাকিয়ে অবনীর মনটা হঠাৎ ভরে উঠল বিষাদে। অতসী দিদিমণি তার পাশের গাঁয়ের অথচ বিপদের দিনে তাকে ফেলে চলে গেলেন। এই ক্ষোভ জ্বালার কথা সে কাকে বলবে? কিছু কথা থাকে যা গলা ফাড়িয়ে বলা যায় না? অতসী দিদিমণি ফিরে এলে সে কি আগের মতো তার সাথে মিশতে পারবে?

সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে জলে হাত রেখেছে শুভ। সরস্বতী তাকে দেখতে পেয়ে সাবধান করল, অমন করিস নে বাবা, পড়ে গেলে বিপদ ঘটে যাবে।

শুভ মা'র কথাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার মতো করে তাকাল, পড়ে গেলেই বা, আমি তো সাঁতার জানি!

—সাঁতার সব সময় কাজে লাগে না। এ তো পুকুর নয় যে সাঁতার কাটবি। বানের জল বড়ো নোংরা হয়।

শুভ তবু জলের কাছ থেকে নড়ল না। সরস্বতী তাকে ভোলাবার জন্য বলল, সময় নষ্ট না করে বরং ছিপ নিয়ে বস। বানের জলে ডোবা-পুকুরের মাছ থাকে।

মাছ ধরার প্রস্তাবটা লুফে নিল শুভ। মাটি ডুবে গিয়েছে জলে। এ সময় কেঁচো পাওয়া যাবে না। মাছ ধরতে হলে আটার টোপকে কাজে লাগাতে হবে। টোপ ছাড়া কেউ আর বঁড়শির কাছে ঘেষতে চায় না।

শুভ লম্বা ছিপ ফেলে বসে আছে জলের দিকে তাকিয়ে। বেলেমাছগুলো সাঁতরে চলে যাচ্ছে পগার-পার। মাছগুলো বোকা। একবার টোপের দিকে ওদের নজর পড়লে ভাগ্য খুলে যাবে। বেলে মাছগুলো খেতে খুব সুস্বাদু।

শুধু মাছ ভাসে না, ভেসে যায় কাঠের খাট, কাঠের সিন্দুক, দরজা। খড়ের চালাঘর ভেসে যেতে দেখে শুভ চেঁচিয়ে ডাকল, মা, দেখে যাও ঘর ভেসে যাচ্ছে।

হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল সরস্বতী। এই বান বন্যায় কত মানুষের যে কপাল পুড়ল কে জানে। স্রোতের মুখে যে পড়বে সেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এ তো জানা কথা। জটা হালদার সব জেনেও ঝাঁপ দিয়েছে জলে। ওর দৈনন্দিন অভাব বাধ্য করেছে ওকে ঝাঁপ দিতে। বিপদে সুযোগ খোঁজে অনেকে। চরম বিপদের দিনে অনেকেই আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এসব কাজে সফলতা কম এলেও ঝুঁকি হাজার গুণ বেশি।

জটা হালদার যদি ভেসে যাওয়া পাটের মাড় ধরতে পারত তাহলে বেশ কিছু টাকা সে পাট ছাড়িয়ে উপার্জন করে নিতে পারত। তা যখন হয় নি তার জন্য আর মনে মনে আফসোস করে লাভ নেই।

জল স্থিতু হবার পর কলার ভেলা নিয়ে হাসপাতালের দিকে গিয়েছিল অবনী। পিচ রাস্তার দিকে যতই এগোচ্ছিল ততই যেন পাঁক খাচ্ছিল কলার ভেলা। লগা ঠেলেও বাগে আনা যাচ্ছিল না সেই ঘূর্ণি। তবু দক্ষ হাতে ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতিকে সামাল দেয় অবনী।

পুরো হাসপাতাল চত্বর বান ঢোকার পর আর চেনা যায় না। শুধু খেজুর গাছগুলো মাজা জলে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের ঝাঁকড়া মাথায় আশ্রয় নিয়েছে সাপ পোকামাকড়। সব চাইতে বেশি বিপদে পড়েছে পিঁপড়ের দল। ওদের বেশির ভাগই ভেসে গিয়েছে জলের স্রোতে, যারা নিজেদের কোনোমতে বাঁচিয়েছে তাদের আশ্রয় এই গাছগুলো।

ফেরার সময় অবনী শিউরে উঠেছিল খরিস সাপের ফণা তোলা মাথা দেখে। বান-বন্যায় ওরাই বা যাবে কোথায়? জলে খরিস সাপের সাঁতার কাটা এর আগে সে দেখেনি। হাসপাতালের মাঠে সেই বিরল দৃশ্য দেখতে পেয়ে মনের ভয়ে সে জড়িয়ে গেল।

খরিস সাপের গল্পটা শুভ বা সরস্বতীর কাছে করা যাবে না, ওরা তাহলে ভয়ে আর জলের দিকে তাকাবে না। বন্যার আলোচনা যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেদিন থেকে শুভ ভীষণ মনমরা। এই অসাম্য তার মন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। মেঘলা আকাশের মতো গুম মেরে আছে সে। বোঝা যাচ্ছে নিজের ভেতর ঝড় বইছে তার। এত দিনের সাজিয়ে রাখা স্বপ্ন ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে তার।

সবুজ যাওয়ার সময় তাকে একটা কথাও বলেনি। এই হাসপাতালে শুভর সব চাইতে কাছের

মানুষ অতসী পিসি। জ্ঞান পড়ার পর থেকে এই পিসিকেই সে নিজের পিসি বলে জেনে এসেছে। অথচ কোয়ার্টার ছাড়ার সময় এই পিসিও একবার মুখে জিজ্ঞেস করল না। এত দিনের আগলে রাখা সম্পর্ক এভাবে টলে উঠবে হঠাৎ ভাবতে পারেনি শুভ। মানুষ কি তাহলে এরকম স্বার্থপর হয়? কেন হয়? আত্মরক্ষার জন্য মানুষের এই বেহায়া স্বার্থপরতা মন থেকে মেনে নিতে পারে না শুভ। অথচ সবাই যে একই ছাঁচে গড়া তা নয়। নোনা আতা আর মিষ্টি আতার ফারাক নিয়ে যে যার মতো বেঁচে আছে।

শুভর মন খারাপ লক্ষ্য করে অবনী বলল, জল চিরকাল একভাবে থাকবে না। যত দিন যাবে ধীরে ধীরে জল কমবে। জল কমলে তুই বাজারের দিকে যেতে পারবি, তখন তোর এত মন খারাপ করবে না।

শুভ কিছু না বলে অবনীর মুখের দিকে তাকাল। চারদিকের জল তার মনে কোনো শান্তি দিতে পারছিল না এটা সত্যি কথা। তবু সবুজ আর রঘুনাথের কথা মনে পড়ে তার মনটা কেমন বিষাদে ছেয়ে গেল। বিপদের দিনে ওরা যদি পাশে থাকত তাহলে মনের জোর কত বেড়ে যেত। ঢোক গিলে সে বলল, এত জল জীবনে আমি প্রথম দেখলাম। সবাইকে হারানো যাবে কিন্তু জলকে হারানো অত সহজ নয়।

খুশিতে ঘাড় নেড়ে অবনী বলল, ঠিক কথা। বন্যা আমি জীবনে ঢের দেখেছি। তবে এবারে বন্যা বেশ জমকাল। এবার বন্যা আঁটঘাট বেঁধে এসেছে।

—বৃষ্টি কমে গেলে বন্যার থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে। সরস্বতী মুখ বেজার করে বলল।

অবনী তার কথায় সায় দিল, ঠিকই বলেচো। বৃষ্টি হল গোদের উপর বিষফোঁড়া। ফোঁড়া ফেটে যতক্ষণ না পুঁজ বেরচ্ছে ততক্ষণ আর রেহাই নেই।

শুভ উশখুশ করছিল কিছু বলার জন্য। সরসবতী তাকে বলল, বৃষ্টি হোক, বানবন্যা যাই হোক তবু এর মধ্যে তোকে পড়তে হবে। ইস্কুল খুললে তোর পরীক্ষা। এবার আরও ভালো করে পাশ করতে হবে—

সরস্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুভ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সব বইখাতা নিয়ে ছাদে ওঠা সম্ভব হয়নি। কাপড়ে বইগুলো বেঁধে রেখে এসেছে তক্তপোষে। জল আর না বাড়লে ওগুলোর আর কোনো ঝুঁকি নেই। মাধুরী বলেছে এবার একসাথে পড়বে। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর অঙ্কটা দেখিয়ে দেবেন ডাক্তারবাবু। এছাড়া টিউশনির মাস্টার তো আছেন।

মাধুরী এত বড়ো বিপদেও তাদের কথা ভোলেনি। সবুজের চাইতে মাধুরীর মন ঢের ভালো। সে তার বাবার সঙ্গে তর্ক করে গেছে সমানে। জোর দিয়ে বলেছে, শুভদের আমাদের সঙ্গে শিবনাথবাবুর বাড়িতে নিয়ে চলো। আমরা না নিয়ে গেলে ওদের কেউ থাকার কথা বলবে না। এটা গ্রাম। আমি সব বুঝে গিয়েছি।

—তুই চুপ কর। যা হচ্ছে হতে দে।

—তার মানে? সবাই অন্যায় করছে তুমি তাকে সাপোর্ট করবে?

—যেখানকার যা কালচার। আমি কি করব বল? আমি রামমোহন হতে পারব না।

—বাবা, তোমার মুখে এমন কথা মানায় না। অভিমানে চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল মাধুরীর। অভিমানের দাম বেশির ভাগ সময় পাওয়া যায় না। মুখ ফুলিয়ে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল মাধুরী। বাবার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছেটাই হারিয়ে গেল তার। সবাই গড়পড়তা, কেউ আর ব্যতিক্রমী হওয়ার দুঃসাহস দেখাল না। নিজের বাবাকে নিয়ে মাধুরীর গর্ব ছিল মনে। সে ভাবত তার বাবা অসাধারণ। এ গ্রামের কারোর সঙ্গে তার বাবার তুলনাই চলে না।

ভুল। তার ভাবনাটা সম্পূর্ণ ভুল। সব মানুষের ভিতরে বাঘ আর বেড়াল ঘাপটি মেরে বসে থাকে। ওরা সময় আর সুযোগ বুঝে বাইরে আসে। সচরাচর ওদের থাবায় নখ লুকানো থাকে, সাধারণ ছা-পোষা মানুষ সেই নখগুলো দেখতে পায় না।

চারদিনের মাথায় প্রায় বিশটা কলাগাছ হুমড়ে পড়ল জলে। সব চাইতে আশ্চর্য ডুমুর গাছটাও বাদ গেল না বানের জলের কামড় থেকে। গোড়ার মাটি কী ভাবে যেন আলগা হয়ে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে গাছটাকে। ডুমুরের খসখসে পাতা ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে জল। উপরের জল ধরলেও মাঠের জল ঠায় দাঁড়িয়ে। চড়া রোদ উঠলে জল মরবে একথা বলছে মুরুব্বিরা। সবার কথা মন দিয়ে গিলছে শুভ। এই জলে ঘেরা জীবনকে ধীরে ধীরে মানিয়ে নিচ্ছে সে।

টানা ছ'দিনের পর জল কমতে লাগল বন্যার। ডুবে যাওয়া ঝোপ ঝাড়ের পাতা পচে গন্ধ ছাড়ছে চারধারে। এই গন্ধটাই ভয়ের কারণ। পরিবেশ একেবারে বিষিয়ে ছাড়ে। ডুবো ঘাস খেয়ে গলা ফুলেছে ছাগলের। গোরুগুলো ছেরানী রোগের প্রকোপে প্রায় শেষ হয়ে গেল। মাঠের ফসল হারিয়ে চাষীর মাথায় হাত।

সন্ধের আগে পাকা রাস্তায় জটা হালদারকে ভ্যান-রিকশা থেকে নামতে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল অবনী। দেশলাই আর বিড়ি কিনতে সে ব্রহ্মাণীতলায় গিয়েছিল। জটা হালদারকে দেখে বুকের ভেতরটা ধড়মড় করে উঠল তার। বাঁধ ভাঙার দিন মাছ ধরতে গিয়ে জলে ভেসে গেল জটা হালদার। তার বউ আদুরী কাঁদতে কাঁদতে গ্রামে ফিরেছে এ পথ দিয়ে। বউটার সেই কান্না এখনও কানে লেগে আছে অবনীর। স্বামী হারানোর শোক সেদিন তার চোখেমুখে লক্ষ্য করেছিল সে। মনে মনে ব্যথা পেয়েছিল সে নিজেও।

হঠাৎ কোথা থেকে ফিরে এল জটা হালদার? এই প্রশ্নটা যখন অবনীর মাথায় ঘোঁট পাকাচ্ছে তখন থুতনি চুলকাতে চুলকাতে এগিয়ে এল জটা হালদার। বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে বলল, অবনীদা ভালো আছো তো?

—হ্যাঁ ভাই সব ভালো। তা তোমার খবর কি?

—আমার কথা বাদ দাও। মা বুড়োমার দয়ার কোনোমতে আমি প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে এলাম।

—বাঁধ ভাঙার দিন ঠিক কি হয়ে ছিল তোমার? অবনী কৌতুহল আর চেপে রাখতে পারল না।

—কী আর বলব দাদা। কপাল মন্দ হলে যা হয়। বিমূঢ় স্বরে কথাগুলো আউড়ে আকাশের দিকে তাকাল জটা হালদার, খ্যাপলা জাল নিয়ে মাছ ধরছিলাম বাঁধের গোড়ায়। বাঁধ যে ভেঙেছে সে খবর আমার কানে এসেছে যথাসময়ে। কুমোর খাদে যেই না জাল ফেলেছি এমনি শরীরের ভারে বাঁধের কোনার মাটি খসে আমি একেবারে ঠিকরে পড়লাম জলে। বানের জল তখন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। সেই ঘূর্ণি জলে বেশ কয়েকবার পাক খেয়ে আমি তলিয়ে গেলাম। স্রোতের টানে আবার ভেসে উঠলাম দশ হাত তফাৎ-এ গিয়ে। তখন আর ডাঙায় ফেরার কোনো উপায় নেই। জল হুড়মুড়িয়ে ছুটছে চাপড়ার বিলের দিকে। প্রাণের দায়ে গা ভাসিয়ে দিলাম সেই জলে। মনে মনে ভেবে নিলাম সাঁতার জানি যখন ডুবব না। দেখি জল আমাকে ঠেলতে ঠেলতে কদ্দুর নিয়ে যায়। মুখ ফাঁক করে শ্বাস নিল জটা হালদার। অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা হাতড়াল অনেকক্ষণ।

—তারপর? অবনীর তর সইছিল না। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

জটা হালদার অবনীর মনের ভাব বুঝতে পেরে মুচকি হাসল, তারপর ছুঁচলো চিবুকে আলতো হাত বুলিয়ে বলল, দাদা গো ভাসতে-ভাসতে পড়ে গেলাম একেবার পাগলা চণ্ডীর দহে। কী

কালো জল, আর কী ঠাণ্ডা! মনে হল জল নয়, কিলবিল করছে সাপ। সেই যে ভাসার শুরু তার আর শেষ নেই। শেষে কি না উঠলাম নবদ্বীপের গঙ্গায়। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে জল ভেঙে আসছি। দেবগ্রামে ভ্যান পেলাম। এটুকু রাস্তা আর হাঁটতে হয়নি।

অবনী জটা হালদারের ভেসে যাওয়ার গল্প শুনে বিস্মিত না হয়ে পারল না, অবশেষে বিড়বিড়িয়ে সে বলল, একে বলে রাখে হরি তো মারে কে? যাও, ঘর যাও। তোমার বউতো কেঁদে কেঁদে মুর্চ্ছা যাচ্ছে। তার তো পাগলের দশা।

—বউয়ের কথা না শুনলে এমন বিপদ হয় গো। আফসোস ঝরে পড়ল জটা হালদারের গলায়, যাই গো, জানি না আদুরী আমার কেমন আছে। বেঁচে পাড়ের মাটি যখন প্রথম ছুঁলাম, তার মুখটাই আমার মনে পড়ছিল। হাঁটুডোবা জলে জটা হালদার ছোটার মতো করে হাঁটছিল। ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি মুখটা কালচে হয়ে গিয়েছে বানবন্যায়।

হাসপাতালের মাঠ অনেক নামলা। হাঁটুডোবা জল এখনও আড়াল করে রেখেছে ঘাসের সংসার। ঝোপঝাড়ের ডুবে থাকা সংসার এখন হাঁটুজলে ঝাঁকড়া মাথা তুলে শ্বাস নিতে চাইছে। কদিনের জমা জলে গাছের পাতায় ভরে গিয়েছে পলি। রোদ পড়লে বদলে যাবে পাতার বরন। পলিমাটি শুকিয়ে ঝুরঝুরে বাতাসে ঝরে পড়বে নীচে।

ফি-বছর গাঁয়ে গাছপুজো করে বুনোপাড়ার মেয়েরা। ভাইফোঁটার সময় ফোঁটা দেওয়া হয় গাছকে। এই গাছ ঝড়-দুর্যোগ থেকে বাঁচায় তাদের। প্রকৃতির ক্রোধ সহজে মেটে না। এখনকার ঝড়-বৃষ্টি বাঁধনহারা। ফি-বছর ঝড়ে কত ঘর ভাঙে, ধসে পড়ে দেওয়াল, এমন কি উড়ে যায় ঘরের চাল। বুড়িগাঙ ফুঁসতে ফুঁসতে ঢুকে যায় উঠোনে। বুড়িগাঙের পাড়ে বাস করে এসব আনুগত্য না মানলেও চলে না। ভুষণীবুড়ি এই পুজো পাঠ নিয়ে মেতে আছে। গাঁয়ের মঙ্গল সে-ও চায়। তার ভেতরেও অসহায় দহন ছারখার করে।

শুধু গাছপুজো করেও মন ভরে না। এত বড়ো নদী, তারও তো খাতির দরকার। গঙ্গাপুজোর সাথে সাথে তারা দল বেঁধে শুরু করেছে নদীপুজো। নদীর কাছে করজোড়ে বলা, মাগো,দয়া করো। এবছর আর বানবন্যা দিও না। গেল বছর ফসল খেল, তার আগের বছর চাষ হল না, এবছর মাগো যেন উঠোনে ধানের বিড়া আসে।

শাঁখ বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে গাছ আর নদীর পুজো সারে ওরা। এ পুজো চলে আসছে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে। আগে মেয়েরা সাফ-সুতরো শাড়ি পরে নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে যেত গঙ্গার ধারে। এখন পুরনো শাড়িতে মন ভরে না, নতুন শাড়ি চাই।

এ পুজোয় কোনো পুরোহিত নেই, নিজেরাই নিজেদের বামুন ঠাকুর। ঝারি হাসতে হাসতে বলে, এ বছর আর বাঁধ ভাঙবে নি। মানুষের দশা ভেষণ শোচনীয়। ভালো করে পুজো না করলে কপালে বিপদ আচে।

অবনী পিচ রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল, শাঁখা পরা হাত, সবাই একসাথে গাছের গোড়ায় হাত দিয়ে প্রার্থনা করছে গ্রামবাসীর মঙ্গল। এত কিছুর পরেও বাঁধ ভাঙল কিভাবে, কিভাবে ভেসে গেল জটা হালদার? তাহলে প্রকৃতি কি রুষ্ট মানুষের উপর?

রাস্তার ধারে জলে ডুবে থাকা আপাংগাছের মরমর দশা। অবনী এই গাছটাকে অন্য নামে চেনে। গ্রামের প্রায় মানুষ একে বলে চচ্চড়ি গাছ। হাতে ধরে টানলে ব্যথা লাগে তালুতে। ছ'দিন ছ'রাত্রি জলে ডুবে গাছটা তবু মরেনি। ছোট হয়েও সে যেভাবে বেঁচে আছে—তা বড়োর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

জল কমতে মাঝে রঘুনাথ একদিন এসেছিল। অভিমানে তার সঙ্গে কথা বলেছে শুভ। আক্ষেপ

করে সে বলেছে, রঘু, তুই যে অমন বদলে যাবি—আমি স্বপ্নেও তা ভাবিনি।

রঘুনাথের সারা শরীর কেঁপে উঠেছে কথা শুনে। শুভর কাছে তার মুখ দেখাবার জো নেই। শুভই তাকে বলেছিল, প্রথম আগুন ধরানোর গল্প। গল্প করতে করতে হারিয়ে যাওয়া। আর দাসত্ব নয়, পরাধীনতার শেকল ছিঁড়ে, নতুন আলো এসে পড়ছে হাসপাতালের মাঠে। সেই আলোকরশ্মি ছুঁয়ে যাচ্ছে মেহনতী মানুষের স্বপ্ন।

রঘুনাথ খুব অবাক হয়ে শুনছিল শুভর কথাগুলো। শুভ তার চাইতে বয়সে ছোট কিন্তু কথাবার্তায় ধানিলঙ্কার ঝাঁঝ। ওর কথা শুনে রঘুনাথ ভিতরে ভিতরে তেতে ওঠে। শুভ অকপটে বলে, মারের বদলে কুঁইকুঁই করে লেজ নাড়লে হবে না। যে হাত দিয়ে ওরা আঘাত করবে ওদের সেই হাত ভেঙে দিতে হবে। তবে যদি উচিত শিক্ষা হয়।

এসব কথা বলার পরে শুভ হাসপাতালের সবার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে। তাদের ফেলে সবাই যে যার নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছে এই যাওয়াটাই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না শুভ। অথচ এদের নিয়ে এক সমাজে বাস করার কোনো অর্থ হয় না। তার আদর্শ বিদুর রাজোয়ার, লাবনি রাজোয়ার। ওদের কথাবার্তায় থাকে আগুনের হলকা। ওরা নিজেরাই যেন একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ আগুনের কুণ্ড। ওই অভাবী মানুষ দুটিকে মন থেকে শ্রদ্ধা করে শুভ। বিদুর কাকা প্রায়ই হাসপাতালে আসে রোগী নিয়ে। প্রায়ই বড়ো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তার তর্কাতর্কি হয়। ডাক্তারবাবুর মনটাও খুব যে সংস্কারমুক্ত তা নয়। তিনি বিদুরকে শুনিয়ে বলেন, ওভাবে কৌটো নাড়িয়ে বিপ্লব আসবে না। চীনের চেয়ারম্যান যেমন আমাদের চেয়ারম্যান হতে পারেন না, তেমনি ভারতবর্ষের মাটিতে আপনাদের কমিউনিস্টের পতাকা কোনোদিনও উড়বে না। কেন উড়বে না জানেন? আরে মশাই, দীঘার বালিয়াড়িতে কাজুবাদামের চাষ ভালো হয়, তা বলে সেখানে পাটচাষ করলে ভালো হবে না। মার্কসইজিমের চাষ আবাদ করতে গেলে ভালো মাটি দরকার। সেই মাটি ভারতবর্ষের কোনো প্রান্তে পাবেন না।

বিদুর সেদিন ডাক্তারবাবুর কথা শুনে উত্তেজিত হয়নি, শান্ত নম্র ভঙ্গিতে সে প্রতিবাদ করল শুধু, সময়ই বলে দেবে চাষ-আবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা। আপনি-আমি আগাম ভবিষ্যৎবাণী করার কে? আমাদের সেই অধিকার বা ক্ষমতা নেই। আঠারো শো শতাব্দীতেও মানুষ ক্রীতদাস প্রথার অবলুপ্তির কথা ভাবতে পারত না। কালো মানুষদের ঘৃণা করা হত। অথচ দেখুন দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার কত পরিবর্তন ঘটল। আসলে কি জানেন ডাক্তারবাবু, পরিবর্তনটা ভূমিকম্পের মতো হুড়মুড়িয়ে আসে না, পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে। সময়ের হাত ধরে পথ চলে বিপ্লব। প্রতিবাদ তার দর্শন। আমরা এগুলো অস্বীকার করতে পারব না।

রঘুনাথ শেরপুর ধাওড়া থেকে জলপথে এসেছে। তার পরণে একটা হাঁটুকাটা খাকি প্যান্ট। পায়জামা আর সাদা গেঞ্জিটা সে বেঁধে নিয়েছে মাথায়। তাকে অনেকটাই সাহেবমাঠের পেয়াদার মতো দেখতে লাগছে। রঘুনাথ এতটা পথ হেঁটে এলেও হাঁপিয়ে ওঠেনি।

সরস্বতী ছাদের উপর বাটি ভর্তি মুড়ি দিয়ে বলল, এগুলো খেয়ে নাও। আজ এখানে সেদ্ধভাত খেয়ে যাবে। রঘুনাথ না করতেই সরস্বতী কেমন মনমরা চোখে তাকাল, আমি তোমার মা হই না, মায়ের কথা শুনতে হয়। আর একটা কথা। খাওয়ার জল ফুরিয়ে গিয়েছে। ভেলা নিয়ে থানার কল থেকে দু-ঘড়া জল এনে দিও। শুনেছি—থানার চাপাকলটা কোনো বন্যাতেও নাকি ডোবে না।

রঘুনাথ মুড়ি চিবাতে চিবাতে ঘাড় নাড়ল।

সরস্বতী বলল, একটু সরষের তেল দেব? কাঁচা সরষে তেলের ঝাঁঝটা আমার ভালো লাগে।

রঘুনাথের মতামত না নিয়েই ছোট চামচের আধ চামচ তেল মুড়ির বাটিতে পরিমাণ মতো ছড়িয়ে দিল।

কলার ভেলায় থানার পথটা দীর্ঘ নয়। কুমোর ডোবা পেরলেই পালপাড়ার ডাঙা। বাঁশঝাড়ে ভেলাটা তুলে রেখে ওইটুকু পথ অনায়াসেই পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়।

কলার ভেলা বলে বেশি ঝুঁকি নিতে চাইল না রঘুনাথ, শুভকে বলল, তুই ঘরে থাক। আমি ঘুরে আসি। থানা থেকে দু'ঘড়া জল আনতে আর কত সময় লাগবে?

বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর থেকে একরকম বন্দী হয়ে দিন কাটছে শুভর। ফলে এ সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চাইল না। তাছাড়া কুমোর ডোবা ভেলায় করে পেরনোর আনন্দটাই আলাদা যদি সঙ্গে রঘুনাথের মতো বন্ধু থাকে। লগা ঠেলে কুমোর ডোবার মাঝখানে আসতেই একটা মাছ ঘাই দিয়ে কাঁপিয়ে দিল জল। ঢেউগুলো ছড়িয়ে যেতে লাগল চারদিকে। শুভকে অবাক করে দিয়ে রঘুনাথ বলল, যে মাছটা ঘাই দিল সেটা কম করে সের তিনেকের তো হবেই। জানিস শুভ, এই বন্যায় পণ্ডিত বিলের মাছ সব ভেসে গিয়েচে।

—কি করে বুঝলি?

শুভর পাল্টা প্রশ্নে রঘুনাথ বলল, আখের খেতে ভিকনাথ কাকা এট্টা কাতলা মাছ ধরেছিল যার মাথাটা এট্টা বাছুরের মাথার চেয়েও বড়ো। আঁশগুলো এট্টা কাঁচা টাকার চেয়ে বড়ো আর মোটা। ধাওড়া পাড়ায় মাছটারে পাট মাপার কাঁটায় ওজন করা হল। পাক্কা সাড়ে পাঁচসের। কাকা একা খায়নি মাছটা। সবাইকে দিয়ে তারপর খেল—।

শুভ বলল, এখানেও একটা ঘটনা ঘটেছে। জটা কাকা মাছ ধরতে গিয়ে ভেসে গিয়েছে। তার খবর কেউ জানে না। লোকে যে খোঁজ খবর নেবে জলের জন্য তা পারছে না। আর একটা কথা। বানের প্রথম দিনে পোদ্দারদের ফাইভে পড়া ছেলেটা বাজারের বড়ো ড্রেনটাতে পড়ে গিয়েছিল। তাকে শেষে পাওয়া গেল হাজরাপাড়ার নালাটায়। জল খেয়ে পেট ঢোল হয়ে গিয়েছিল ছেলেটার। পরে সে বেঁচে যায়।

বাঁশ ঝাড়ের কাছে ভেলা থামিয়ে শুভ বলল, এই বানবন্যায় সুফল ওঝার বাজার এখুন ভাল চলছে। সাপখোপ, পোকামাকড়ের উৎপাত বেড়েচে। শুনেছি কাজের চাপে সুফল ওঝা নাকি নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়েচে। শালা ধাপ্পাবাজটা আর এট্টু হলে আমার গলায় শ্বশুর হয়ে এটকে যেত! অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েচি মাইরি! ঝটকা মেরে কলার ভেলা থেকে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ল রঘুনাথ। তার দেখাদেখি শুভও ঝাঁপ দিল ডাঙায়। ভেলাটা সামান্য হেলে গিয়ে আবার ঢেউয়ের ধাক্কায় ফিরে এল ডাঙায়।

রঘুনাথ হুশিয়ার হয়ে বলল, ভেলাটা না বাঁধলে ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে দূরে চলে যাবে তখন আর ফেরা যাবে না। কি দিয়ে বাঁধা যায় বলদিনি?

শুভ কপালে ভাঁজ ফেলল, জলের লতা নিয়ে বাঁধবি? বলেই সে গা জড়াজড়ি কলমীলতার ঝোঁপটার দিকে তাকাল।

ভ্রূ-কুঁচকে রঘুনাথ বলল, জলের যা স্রোত কলমীলতা ছিঁড়ে যাবে।

—তাহলে কাঁচা দিয়ে বেঁধে রাখলে কেমন হয়।

—মন্দ হয় না। তবে—। রঘুনাথের আধভাঙা গলায় সংশয় ধরা পড়ল।

—কঞ্চি যদি ঢেউয়ে-ঢেউয়ে খুলে যায়?

—তাহলে চল ওটাকে ডাঙায় তুলে দিই। শুভ নিরীহ চোখে তাকাল।

বাঁশবাগানে বুঝি আলো আঁধারের খেলা চলে সর্বদা। দুটো ঘুঘু বাঁশের ডালে বসে করুন

চোখে চেয়ে আছে পরস্পরের দিকে। ওদের দৃষ্টিতে স্বাচ্ছন্দ্য বা সুখ কোনোটাই নেই। মানুষের মতো গভীর এক বিপন্নতা ওদের যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে।

অন্যসময় হলে রঘুনাথ নিদেন পক্ষে একটা ঢেলা ছুঁড়ে মারত তাক করে। আজ আর সেই মনটাকে খুঁজে পেল না সে। পরিস্থিতি এবং পরিবেশের সঙ্গে মনও বুঝি পাল্টে নেয় নিজেকে।

কলার ভেলাটা ডাঙায় তুলে ওরা দু'জনে নিশ্চিন্ত হল। থানায় পথটা পালপাড়ার ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে। পালপাড়ার অবস্থান বেশ উঁচুতে। দেশ গাঁ নামলা ভুঁই সব ডুবে গেলেও এখানে জল উঠবে না কোনোদিনও। তাই এখানে যারা বসবাস করে তাদের মনে মৃদু একটা গর্ব আছে।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শুভ বলল, থানায় যেতে তোর ভয় করে না?

—ভয়? ভয় করবে কেন? কথাগুলো বললেও রঘুনাথের বুকটা ধকধকিয়ে উঠল।

লুলারামের খোঁজে মাসখানেক আগে দু'জন পুলিশ এসেছিল পাড়ায়। পুলিশের ড্রেস পরে এলে পাড়ার মানুষের কৌতূহল বাড়ে। কেউ কেউ ভয়ও পায়। রঘুনাথ ভয় পায়নি। সে এগিয়ে গিয়ে শুধিয়েছিল, কি ব্যাপার অসময়ে এলেন যে?

—তোমার কাকা কোথায়? থানায় অনেক দিন তার হাজিরা নেই। বড়োবাবু পাঠালেন।

—ওঃ, এই কথা! তারপর রঘুনাথ সবিস্তারে লুলারামের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা বলেছিল। কাকা চলে যাওয়ার পর তার মাথার উপর দু'বোনের দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ করে নূপুর আর নোলকের জন্য কষ্ট হয়। ওরা তো কোনো দোষ করেনি।

নোলক পুলিশ দুটোর সামনে কথা বলতে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। তার সেই কান্না এত ছোঁয়াচে ছিল যে নূপুরও চোখের জল আটকে রাখতে পারল না। বাবা ছিল তাদের কাছে ছাতার মতো। সেই ছাতাটা ফুটো হয়নি, ভাঙেনি, শুধু কোথায় যেন হারিয়ে গেল ছাতাটা! মাঝে মাঝে তার মনে হয় বাবা বেঁচে নেই। যদি বেঁচে থাকত—সে কি একবার আসত না?

থানার কলে জল নেওয়ার লম্বা লাইন। শুভ গিয়ে সেই লাইনে দাঁড়াতেই একজন পুলিশ এসে খপ করে হাত চেপে ধরল রঘুনাথের, চল, বড়োবাবু তোকে ডাকছে—।

—আমাকে? রঘুনাথ ভ্যালভ্যাল করে তাকাল। শুভর সামনে এমন ঘটনা তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। ঝামেলার ভয়ে সামান্য বাধা দেওয়ারও চেষ্টা করল না সে। সুড়সুড় করে এগিয়ে গেল থানার পাকা ঘরটার দিকে।

বড়োবাবু রাগী মানুষ একথা রঘুনাথ অনেক আগেই শুনেছে। মাথা ঝুঁকিয়ে বড়োবাবুর সামনে দাঁড়াতেই সিগারেটের ছাই ঝেড়ে লম্বা চওড়া মানুষটি বাঘের গলায় হুঙ্কার দিয়ে বললেন, লুলারাম কোথায়?

—আজ্ঞে, জানি না বাবু।

—জানিস না মানে? আমার কাছে লুকানো হচ্ছে। এমন মার দেব পাছা দিয়ে আমরক্ত বের হবে।

—আমি কিছু জানি না বাবু, মায়ের দিব্যি।

—থানায় এসেছিস কি করতে?

—আজ্ঞে জল নিতে?

—শেরপুর থেকে এসেছিস জল নিতে? আশ্চর্য—।

রঘুনাথ ঘাড় নাড়ল, না বাবু, আমাদের গাঁয়ে কল আছে। আমি জল নিতে এয়েচি মিতেমায়ের জন্যি।

—কে তোর মিতে-মা?

—ওরা হাসপাতালে থাকে। আমার মিতেকে ডাকব?

—না, দরকার নেই। বড়োবাবু সিগারেটের পোড়া অংশটা অ্যাশট্রেতে জোর করে গুঁজে দিলেন, তোর রিপোর্ট সব আমার কাছে আছে। দু-বার বেঁচেছিস বলে তৃতীয়বার যে বাঁচবি—এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। থানায় যদি তোর নামে কোনো কমপ্লেন আসে তাহলে মাঠে দাঁড়িয়ে গুলি করে দেব।

রঘুনাথের কলিজায় বড়োবাবুর কথাগুলো বাঘনখ ঢুকিয়ে দিল। ঢোক গিলে কাঁপা কাঁপা চোখে সে বড়োবাবুর দিকে তাকাল। বড়োবাবু চিৎকার করে বললেন, আমার দুটো চোখ নয়, দশটা চোখ—বুঝলি? আমার চোখকে ফাঁকি দিতে গেলে তোকে আবার দশবার জন্ম নিতে হবে। যা চোখের সামনে থেকে দূর হ।

রঘুনাথ মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল থানা থেকে। মুখটা মেঘলা আকাশের চেয়েও থমথমে। থানা পুলিশ ঝুটঝামেলা তার ভালো লাগে না। অথচ ওরাই তার পিছু ছাড়ছে না। সে যে কি করবে, কোন পথে চলবে কোনো কথাই তার মাথায় এল না সেই সময়।

শুভর জল ভরা শেষ। সে ঘাড় তুলে হকচকানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ তোকে আবার থানায় ডাকল কেন রে?

রঘুনাথ কি উত্তর দেবে ভাবল। সত্যি কথা শুভর কাছে বলা যাবে না। ওর খুব আত্মসম্মানের ভয়। আসল ঘটনা শুনলে শুভ হয়তো আর কোনোদিন তার সঙ্গে মিশবে না। সব যদি হারিয়ে যায় যাক তবু বন্ধুত্বটা বেঁচে থাকুক। শুভর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রঘুনাথ চাপা গলায় বলল, বড়োবাবু কাকার কথা শুধোচ্ছিল।

—কেন?

—কাকা ওর বন্ধু হয়।

—থানার বড়োবাবু তোর কাকার বন্ধু? শুভর যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না কথাগুলো। রঘুনাথ হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ রে বাবা, আমরা গরীব বলে কি বড়োলোকের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না?

শুভ ঢোঁক গিলল, না, তা নয়। আসলে বড়োলোকরা গরীবলোককে প্রয়োজন ফুরোলে ভুলে যায়।

আমাদের বড়োবাবু অমন মানুষ নয়। রঘুনাথ জোর দিয়ে বলল, অতসীপিসি কি তোদের সাথে মেশে না বল?

শুভর মন খারাপ হয়ে গেল অতসীপিসির নাম শুনে, পিসির কথা আর বলিস না। পিসিও বড়োলোকদের মতো—

—কেনে কি হয়েচে রে?

এড়িয়ে যেতে চাইল শুভ। রঘুনাথ ওর হাত ধরে বলল, বল, তোকে বলতেই হবে।

শুভ জড়তা ভাঙল, বাবা যে বলে—এক গাছের ছাল আরেক গাছে লাগে না—সত্যি। পিসি আমাদের ফেলে চলে গেল। যাওয়ার সময় আমাদের একবারও মুখের বলাটাও বলল না।

—ওসব কথা মনে রাখা ভুল। রঘুনাথ বিষয়টাকে হালকা করতে চাইল, ভুলে যা, সব ভুলে যা। যে কথায় বুক মোড়া মারে—সে কথা ভুলে যা।

—যে কথায় দুঃখ থাকে সে কথা কি ভোলা যায়?

—মনটাকে পাথর কর, তাহলে সব পারবি।

শুভ ঠোঁট কামড়াল। রঘুনাথের সঙ্গে সে একমত হতে পারছে না কিছুতেই। ভিতরটাতে শুরু হয়েছে তছনছ। ঝড়-বৃষ্টি রাতে ত্রিপল উড়ে যাবার ভয় ছিল। আধলা বা থান ইটের কত জোর যে হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়বে। তবু অবনী তাকে বলল, আজ আর ঘুমানো যাবে না। ঝড়ে ত্রিপল উড়ে গেলে পুরো ভিজতে হবে।

আকাশে বিদ্যুৎ-এর সাপ ছুটে বেড়াচ্ছিল, তার সেই জ্বলন্ত রূপ দেখে ভয়ে গলা শুকিয়ে এসেছিল সরস্বতীর, শুভর কাছে ঘেষে সে বলেছিল, আজ রাতটা ভালোয় ভালোয় কেটে যাক। কালই ইস্কুল মাঠে চলে যাব। বড়ো ভয় লাগছে গো। যে ভাবে বাজ পড়ছে কিছু হয়ে গেলে গুষ্টিসুদ্ধ মরব।

ইস্কুল মাঠে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না অবনীর। এত জিনিস নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে সে। মোকামপাড়া আর স্কুলপাড়ার ঘরহারা মানুষগুলো সেখানে জায়গা নিয়েছে। ভিড়ে গিয়ে ভিড় বাড়িয়ে লাভ নেই। এখানে শতকষ্ট হলেও নিজের বাসা। কেউ তাড়িয়ে দেবার নেই। খেয়ে না খেয়ে এখানে মুখ বুজে পড়ে থাকা যায়। তা সত্ত্বেও চাপা অভিমানটা বুকের খোদলে চোরা হিমের মতো ঢুকে যায়। তখন কষ্ট পাওয়াটা বাড়ে, বাড়তেই থাকে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে বেলা গড়ায়। রঘুনাথ ছাদের উপর থেকে মাছ ধরছিল ছিপ ফেলে। এক ঝাঁক বেলেমাছ ভাসতে ভাসতে চলে গেল মাঠের দিকে। গাঙতোড় মাছের লম্বা ঠোঁট জলের উপর জেগে আছে। এই মাছটাকেই রঘুনাথ বলে, কেঁকলে মাছ। এক কাঁটার মাছ এটা। বড়ো সুয়াদ। টক রাঁধলে জিভে জল এসে যাবে হড়হড়িয়ে।

এত মাছ ভেসে যায় তবু একটাও ঠোকর মেরে দেখে না। বিরক্তিতে ছিপ গুটিয়ে রঘুনাথ সরস্বতীর মুখোমুখি দাঁড়াল। অবনী মাদুরে শুয়ে কাত হয়ে বিড়ি টানছে। কথাটা কিভাবে শুরু করা যায় রঘুনাথ ভেবে নিল কিছু সময়। তারপর সহজ সরলভাবে বলল, মা, এট্টা কথা বলি। এত কষ্ট করে এখানে পড়ে থেকে কি হবে? তার চেয়ে আমার দোরে চলো। আমাদের হলদিপোঁতা উঁচু জায়গায়। ওখানে জল ওঠে না।

সরস্বতী আড়চোখে অবনীর দিকে তাকাল। আগুন মুখো বিড়িটায় টান দিয়ে অবনী বলল, যেতে পারলে ভালো হত বাবা কিন্তু যাওয়া যাবে না।

—কেনে যাওয়া যাবে না?

—পুরা হাসপাতাল খালি। বান-বন্যায় চুরি চামারি বাড়ে। হাসপাতাল ফেলে আমি কোথাও যাব না।

—সবাই যে তুমাকে ফেলে চলে গেল? তখন?

—সে যারা গিয়েছে—যাক। আমি কাউকে বাধা দেব না। আমার ধর্ম আমাকেই মানতে হবে।

—ধর্ম রাখতে গিয়ে জীবন বেরিয়ে গেলে সেটা কি ভালো হবে?

—ভালো-মন্দের হিসেব রাখি নে বাবা। আমার অতো হিসেব কষার সময় নেই। অবনী হাল ছেড়ে দেওয়া ভঙ্গিতে বলল, যে পেটের ভাতের যোগান দেয় তাকে অবহেলা করা পাপ। কিছু মনে করো না। এ হাসপাতাল ছেড়ে এখন আমি কোথাও এক পা নড়তে পারব না।

হাল ছেড়ে দিল রঘুনাথ। অবনীর এই আত্মঘাতী জেদ তার ভালো লাগল না। নিমেষে কঠিন হয়ে উঠল তার ঠোঁট। থিরথির করে কাঁপছে চোখের তারা। জলের দিকে তাকিয়ে সে ভাবল-এই ধর্মটাই গরিবের ঘোড়া রোগ। এই রোগ যতদিন থাকবে ততদিন এই জাতটার মুক্তি নেই।

হলদিপোঁতায় মন খারাপ করে ফিরে এল রঘুনাথ।

দুর্গামণি তাকে দেখতে পেয়ে বলল, কুথায় ছিলিরে রঘু এতক্ষণ? তোরে খুঁজতে একজন বাবুপারা লোক এসেছিল। দেখে মনে হল আগে একে দেখেছি। রঘুনাথ স্মৃতি হাতড়ে খুঁজতে থাকে পরিচিত মুখগুলো। সব মুখ ভিড় করে এল একে একে। শত চেষ্টা করেও সেই সব মুখের মিছিল থাকে আলাদা করে কোনো একটা মুখকে সে চিহ্নিত করতে পারল না।

দুর্গামণি ছেলের মনোভাব বুঝতে পেরে বলল, অত ভাবার কি আচে। যে এসেছিল সে তোর চেনা জানা। আমি বসতে বললাম, সে বসল না। বলল—আবার আসবে।

—কখুন আসবে বলেচে? উৎসাহ নিয়ে ঝুঁকে পড়ল রঘুনাথ।

দুর্গামণির অভিব্যক্তিহীন মুখ, কখুন আসবে সেই টেইমটা আমাকে বলে যায় নি। তবে সে মাঝের গাঁয়ের দিকে চলে গেল। তুই ঘরে চ তো। মিলা কাজ আচে।

—কি কাজ?

—ভিকনাথ এসে বলে গেল দুলুর সঙ্গে তোরে দেখা করতে।

—কেনে সে আসতে পারল না?

—আমি তার কি জানি।

—তুমি জানো না কিন্তু আমি জানি। রঘুনাথ অস্থির হয়ে উঠেছিল মনে মনে, দুটা কাঁচা পয়সার মুখ দেখে ধরাকে সরা ভাবচে মানুষটা। ঠিক আচে, আমার যখন দরকার তখুন আমিই যাব দেখা করতে।

—এখুন আর ঘরের বাইরে যাস না। আগে বান যাক তারপর। দুর্গামণির কথা শেষ না হতেই ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল কাশির খ্যাসখেসে শব্দ। ভয় পাওয়ার মতো শব্দগুলো আছড়ে পড়ছিল ঘরের দাওয়ায়। দুর্গামণি কথা থামিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘাড় তুলে তাকাল, আমি যাইরে। তুর বাবা ঘুম থিকে উঠেচে। এবার চা বসাব। মানুষটার যে ভেষণ চায়ের নেশা।

রঘুনাথ কোনো কথা না বলে নিথর হয়ে দাঁড়াল। দুর্গামণি তাকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলল, কি ভাবছিস রে?

—কিছু না।

—মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অতো সস্তা নয়।

যেন ধরা পড়ে গেল রঘুনাথ, গলা খাদে নামিয়ে সে শুধোল, সত্যি করে বলদিনি—বাবার কাশিটা কমেচে কিনা।

দুর্গমণি-হা-করে তাকাল, এ জন্মের কাশি কি কমে রে বাপ? এ হল বুড়ো শিবের ধার। একেবারে সাথে যাবে।

—এসব কথা বলতে তুমার একবারও মুখে বাঁধিল না? রঘুনাথের মুখ বিরক্তিতে বেঁকেচুরে গেল।

দুর্গামণি চাপা গলায় আগুন ঝরিয়ে বলল, সত্যি কথা বলতে দোষ কুথায়?

—নীলুবাবুর জোড়া পায়ের লাথিটা ওর বুকের কলকব্জা সব নড়িয়ে দিয়েচে। আমি আর কত দেখব। এ সব দেখার আগে আমার মরণ হলে ভালো হত। আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল দুর্গামণি।

রঘুনাথ মহা সংকটে পড়েছে, কানছ কেনে? চুপ করো।

—চুপ করা যায়, বল? আজ দুপুরেও তোর বাপের মুখ দিয়ে চাপ চাপ অক্ত উঠেচে। মনে হচ্চে—। দুর্গামণি পুরো কথা বলল না। থামল।

রঘুনাথ বিপদের সংকেত পেয়ে বলল, নীলুবাবুর যা সর্বনাশ করার তা আমি করে দিয়েচি। বড়োগাছ বলে ঝড়টা সামলে নিয়েচে।

—সে সামলে নিলেও তোর বাপ তা পারেনি। আজও বিড় বিড় করে নীলুবাবুকে গাল দিচ্ছিল।

—তুমি কি চাও আমি নীলুবাবুকে শেষ করে দিই?

আঁতকে উঠে মরা ভ্যাদভেদে চোখে তাকাল দুর্গামণি, মা হয়ে তুর অমঙ্গল হোক এ আমি কি করে চাই বাপ? তুই তোর মতো থাক। তোর বাপ যতদিন শ্বাস নেয় নিক। এত মার খেলে কোন মানুষটা বাঁচে বল।

রঘুনাথ চুপ করে গেলে দুর্গামণি বলল, তোর দাদুও কেমন নেসকে গিয়েচে। তারে আমি কত বুঝিয়েচি। সে কিছুতে বুঝবে না। সে ঠোঁট কামড়ে আফসোসের সঙ্গে মায়ের দিকে তাকাল। দুর্গামণি নিরাসক্তভাবে বলল, ছেলে বড়ো হলে বাপ-মা তার উপর অনেক কিচু আশা করে। আমিও তোর কাচে কিচু চাই রঘু। তোকে তা দিতে হবে।

রঘুনাথ ঢোক গিলল, আমার চেষ্টার কুনো খামতি থাকবে না মা।

—তাহলে তুই কথা দে তুই তোর বাপের বদলা আমি বেঁচে থাকতি নিবি। কথা দে। মানুষের চোখ যে চুলার আগুনের চেয়েও তীব্র হয় সেই প্রথম মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে টের পেল রঘুনাথ। এ কোন মাকে দেখছে সে। এতো মা নয়—আগুনের ঢিপি।

রঘুনাথ ধীরস্থির ভাবে বলল, বাবুদের সাথে মিশলেও বাবুরা আমাকে আপন করে নেয়নি। ওরা আমাকে ভাবে বুনো, রাজোয়ার। হ্যাঁ, বুনো হয়েই আমি দেখিয়ে দেব-আমিও কারোর চাইতে কম নই। আমোর শরীলেও রাগ আচে।

সন্ধে নেমে এল হলদিপোঁতার উপর। সাঁঝ নামলে কালো হয়ে যায় বুড়িগাঙের জল। ডি ভি সির ছাড়া জলে তার রূপ খোলতাই হয়েছে দশগুণ। এখন চোখ ফেরালে চেনা যায় না তাকে। যুবতীর ঠাটবাট নিয়ে সে এখন অনন্যা। রঘুননাথ হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল পাকুড়তলায়। সেখানে গামছা গায়ে জড়িয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল দুলাল। বেশ ক'দিন হল তার হাতে কোনো কাজ নেই। বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর মুনিষ খাটার সব আশা ধুয়ে গিয়েছে। এভাবে বেকম্মা হয়ে ঘরে জুতে গেলে ভাত জুটবে না। সকালে ইন্দু তাকে পঞ্চায়েত অফিসে পাঠিয়ে ছিল রিলিফের জন্য। হরিনাথপুর থেকে দুলাল শুনে এসেছে ত্রাণবণ্টন আগামীকাল থেকে শুরু হবে। শুকনো খাবার চাল-ত্রিপল দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। দেবগ্রাম থেকে টিন বোঝাই হয়ে গুঁড়ো দুধ এসেছে। সেই গুঁড়ো দুধও দেওয়া হবে সবাইকে।

রঘুনাথকে দেখে বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকা দুলাল এগিয়ে এল সামনে, গলা খেঁকারি দিয়ে বলল, হ্যাঁ রে রঘু, সকাল থিকে কুথায় গেচিলিস?

—মিতের ঘরে গেচিলাম।

—তা কখুন ফিরলি? তুর সাথে কিচু দরকারি কথা ছিল।

—বলে ফেল। রঘুনাথ গুরুত্ব দিতে চাইল না দুলালের কথাকে। তবু দুলাল ঘনিষ্ট হয়ে সরে এল, তোর বাপের অবস্থা কিন্তু ভালো বুঝচি নে। আমার মনে হয় গুয়াদাকে বড়ো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

রঘুনাথ ঝিম মেরে শুনল কথাগুলো, একই কথা মা-ও বলছিল।

—বলবে তো। ঘরের মানুষ বলে কথা। তবে এখন বান বন্যায় কুথায় যাবি? চারদিকে তো জল থৈ থৈ করচে। ডাঙা দেখা যায় না।

—হ্যাঁ, তা যা বলেচো।

—যা করার তাড়াতাড়ি করিস। তোদের সময় বড়ো খারাপ চলচে। তোর কাকাও তো-। গোপাল থেমে গেল, যা বলতে চেয়েছিল সেটা বলা শোভন হবে কিনা ভাবল। তারপর গলা ছেড়ে নিয়ে সে দেবদারু গাছের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল, এখুন কুথায় যাচ্চিস? আঁধার নামচে। ঘর যা-

—কাকা? রঘুনাথের ডাকে চমকে উঠল দুলাল, ব্যাকুল গলায় সে বলল, কিচু বলবি?

—শুনচিলাম পঞ্চায়েত থেকে রিলিফ দেবে—সত্যি?

—সত্যি-মিথ্যে জানি না, তবে কথাটা শুনে এসেচি। দুলাল অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টাল, শুধু চাপাকলের জল ছাড়া ঘরে আর কিচু নেই রে। বসে খেলে রাজভাণ্ডারও শেষ হয়ে যায়। ভাবচি জল কমে গেলে টেউনের দিকে পেলিয়ে যাবো।

—পেলিয়ে কতদিন আর বাঁচবা?

—যতদিন বাঁচা যায়। তোর কাকির শরীরটা ভেঙে গেছে না খেয়ে-খেয়ে। মার শরীরও ভালো নেই। আসলে বয়স হচ্চে তো—। দুলালের স্বর জড়িয়ে এল। দম নিয়ে সে বলল, তোর ঘরে কে এসেছিল রে? দেখে মনে হল বাবুঘরের ছেলে।

—তুমি চিনতে পারোনি।

—সামনা সামনি তো দেখিনি, পেচন থেকে দেখেচি। দেখে কুনো আন্দাজ করতে পারিনি। কপালে ভাঁজ ফেলে কথাগুলো বলল দুলাল। বলে সুখ পেল সে। কোমরের খুঁটে গোঁজা বিড়ি-দেশলাই বের করে সে রঘুনাথকে বলল, বিড়ি খাবি?

প্রস্তাবটা ঝামেলায় ফেলে দিল রঘুনাথকে, ইতস্তভাব সরিয়ে সে বলল, থাকলে দাও। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগচে।

বিড়ি ধরিয়ে কাকা-ভাইপো দু'জনে চেয়ে আছে বুড়িগাঙের দিকে। বিড়ির ধোঁয়া উড়তে উড়তে চলে যাচ্ছে মাঠ পেরিয়ে। দুলাল আক্ষেপ করে বলল, এত জমিন অথচ আমাদের আর কিচু নেই! বাবুরা কায়দা করে চরের খাস জমি সব নিজের নামে করে নিয়েচে। সেখানে ফি-বছর আখ হচ্চে। সুগার মিল চলচে। আমাদের কি লাভ হচ্চে বল?

—এ তো সাহেব জামানা থিকে হচ্চে। এখুন সাহেব নেই, সাহেবের মতুন কিচু মানুষ আচে। রঘুনাথের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, এ সব ব্যাপারে আমাদের হয়ে কথা বলার কেউ নেই। বিদুর কাকা বলছিল লড়াই হবে। চরের জমি জোর করে দখল নেবে ওরা। শুনেচি—কামারশালে লুকিয়ে তীর বানাচ্ছে খাঁদু কামার। সেই তীরে দেখ আমাদের মরণ হয় কিনা।

—মরার আগে কাউকে সাথে লিয়ে মরব। ছাড়ব না, দেখে নিস। দুলালও তেতে উঠল কথায় কথায়।

ব্রিটিশ আমলে সাহেবরা এ তল্লাটে দাপিয়ে বেড়াত। থানার কাছে মালী পাড়ায় জাহাজ ঘাট ছিল। আর একটু এগিয়ে গেলে হরিনাথপুর ধাওড়ায় ছিল সাহেবকুঠী। এগুলো এখন আর কোনো গল্পকথা নয়, বুড়োথুড়োদের মুখে এ গল্প প্রায়ই শোনে রঘুনাথ।

বনমালী মালাকারের বয়স হয়েছে, তার মাথার একটা চুলও কালো নেই। সেই মানুষটা স্মৃতিতে ডুবে গেলে কথার খেই হারিয়ে ফেলে, শ্লেষ্মা উগলে বলবে, তখুন মালীপাড়ার ঠাকঠমক ছিল আলাদা। জাহাজ বোঝাই হয়ে শোলার টুপি যেত কাটোয়া-নবদ্বীপ হয়ে কোলকাতায়। সাহেবরা

শোলার বড়ো বড়ো টুপি ছাড়া আর কিছু পরত না। এই লাখুরে- কলীগঞ্জের টুপি চালান যেত বিদেশে।

শুধু টুপি নয় গঙ্গার পাড়ে গঞ্জের বাজার ছিল রমরমা। তিন জেলার ব্যবসায়ীরা আসত এই গঞ্জের হাটে। মুর্শিদাবাদ আর বর্ধমান—সবাই চাইত সবাইকে টেক্কা দিতে। কমসে কম হাজার মানুষের আনাগোনা ছিল সেখানে। এছাড়া ছিল নানা পুজোপার্বন। কার্তিক মাসের কালীপুজো ছিল অন্যতম। সেই কালীঠাকুরের নাম মহিমায় জায়গার নাম হয়ে গেল কালীগঞ্জ। এসব গল্প চুনারামের মন ভালো থাকলে রঘুনাথকে শোনায়। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের দিকে তাকিয়ে মুখ হা হয়ে যায় রঘুনাথের, দুলালকে নাড়া দিয়ে সে বলে, কাকা, চারধারে এত জমিন অথচ আমাদের এক কাঠা চাষের জমিন নেই গো! সব জমিন বাবুরা দখল করে নিয়েচে। আমাদের জমিতে আমরা এখুন দিনমজুর। আমাদের দু-বেলা মাড়ভাত জোটে না।

—তা যা বলেচিস। দুলাল দুঃখী মুখ করে তাকাল, দীর্ঘশ্বাস নেমে এল তার বুক ছুঁয়ে, এত বড়ো এট্টা বন্যা তবু দেখ কারোর কুনো সাড় নেই। মানুষ খেল কি মরল এ খোঁজে কারোর গা নেই। দেশ-দুনিয়া বড়ো স্বার্থপর হয়ে যাচ্চেরে। আমাদের দিনটা হয়ত কোনোমতে কেটে যাবে, তোরা বাঁচবি কি করে?

—প্রতিটা দিন পাল্টে যায়। আমরাও পাল্টে যাব। রঘুনাথের কণ্ঠস্বর কঠিন শোনাল।

দুলাল চাপা গলায় বলল, নিজেদের বদলে নিতে তোরা পারবি তো? সবার ভেতরে আগুন আচে রে। আগুনটা উসকে নিয়ে ভালো করে ফুঁ দিয়ে জ্বালতে হয়। না হলে পুড়ে পুড়ে সেই আগুন একদিন ছাই হয়ে যায়। দুলালের কথাগুলো মনে ধরল রঘুনাথের, তুমি ঠিক কথা বলেচ কাকা। আগুন সবার ভেতরেই আচে। বিদুরকাকা বলেচিল—আগুনের ব্যবহার জানতে হয়। আগুনও কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে থাকে। তার ঘুম ভাঙাতে হয়। কথায় কথায় ওরা পাড়ার ভেতর পৌঁছে গেল। টিমটিম করে আলো জ্বলছে প্রায় ঘরে। সেই সীমিত আলোয় অন্ধকার দূর হয় না। ভিকনাথের ঘরের সামনে এসে কি মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল রঘুনাথ। কাকার নিখোঁজ হওয়ার পিছনে এই ঘরটার ভূমিকা কম নেই। ঝারি রহস্যময়ী চরিত্র। তাকে বোঝার সাধ্য লুলারামের হয়নি। সে শুধু আগুন পোকার মতো না বুঝেশুনে ঝাঁপ দিয়েছে রূপের টানে। রূপ তো মরণকূপ—একথা জানত না লুলারাম। শরীরের নেশাটা তার কাল হল। যখন নেশা ভাঙল তখন আর মানুষটা গাঁয়ে থাকল না। হয়ত অনুশোচনায় পুড়ছিল তার মন। মনের জ্বালা হলদিপোঁতায় মেটেনি। হলদিপোঁতার আগুন সে কোথায় গিয়ে নেভাবে?

রঘুনাথের দীর্ঘশ্বাস অন্ধকারে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

রাতে বুকের ব্যথায় পাড়া জাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠল গুয়ারাম। বানের জল তখন কমতে শুরু করেছে। পণ্ডিতবিল কানায় কানায় ভরে গিয়ে রাজা মহারাজাদের মতো গম্ভীর। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় জলের সাথে মায়াবী চাঁদের কথা হয় রাতভর।

চুনারাম কঁকিয়ে উঠে বলল, যা রে রঘু, তোর বাপের অবস্থা ভালো বুঝচিনে, যা করার খপখপ কর।

দুয়ার গোড়ায় কপালে হাত দিয়ে বসেছিল দুর্গামণি, পাথরের মতো মুখ, চোখ দুটো নিরেট হয়ে আছে দুঃখে। রঘুনাথ কোনোমতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, মা, তুমি কি বলচো?

মুখ তুলে বিষণ্ণ গলায় দুর্গামণি বলল, আমি কিছু বলব না, যা ভালো বুঝিস তোরা তা

কর। মানুষটার শরীল ক'দিন থেকে ভালো যাচ্ছিল না—সেটা আমি টের পেয়েচি। তুই ঘরে থাকলি কতক্ষণ যে তোকে আমি বলব।

কথাটায় সাফাই নয়, ছিল রঘুনাথের উপর অনুযোগ। তর্ক বাঁধানো এসময় উচিত নয় তাই চুপ করে রইল রঘুনাথ। একে একে ওই অত রাতে তাদের উঠোনে হাজির হল দুলাল, ভিকনাথ, বিশু আর পাড়ার ক'জন। সবার চোখে-মুখে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা। বুকে তারা যেন আগুনের গোলা নিয়ে ঘুরছে। ভালো মানুষটা নীলাক্ষবাবুর জোড়া পায়ের লাথ খেয়ে নেসকে গেল। এ তো তৈরি করা অসুখ, এর বিহিত দরকার। বাবু বুকের ছাতি ফুলিয়ে ঘুরছে। তার বুকে কে মারবে জোড়া পায়ের লাথি।

ভিকনাথ ফুঁসছিল। রঘুনাথকে বেঁড়ার ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, টাকার জন্যি ভাবিস নে, তোর কাকিমা এগুলান খুলে দিয়েচে। আগে মানুষটা বাঁচুক। পরে এসব নিয়ে ভাবা যাবে।

আবছা আলো আঁধারে রঘুনাথ দেখতে পেল সোনার গয়নাগুলো। এগুলো সে হাত পেতে নেবে কি করে? পরের সোনা নিলে ফেরত দেবে কিভাবে? তার সে যোগ্যতা কোথায়?

—না কাকা, এ আমি নিতে পারবো নি। রঘুনাথ অসহায়ভাবে ডানে-বাঁয়ে ঘাড় নাড়ল।

—আমি তো দিচ্চি, তুই নে। পারলে দিবি, না পারলে দিবি না। গয়নার বিনিময়ে মানুষটার জীবনটা যদি বাঁচে—তাহলে এর চাইতে সুখের আর কি হবে। ভিকনাথ মনে প্রাণে চাইছিল গয়নাগুলো দিয়ে দিতে, তোর কাকা থাকলে কি আজ আমাকে এভাবে আসতে হত। তখন সে নিজের কাঁধে দায়-দায়িত্ব তুলে নিত। তাছাড়া গুয়াদা তো আমার আপনজন। আমার নিজের কুনো দাদা নেই। ওই মানুষটাকে আমি জ্ঞানপড়ার পর থেকে দাদার মতো দেখে এসেচি।

রঘুনাথের আর না বলার হিম্মোত হল না। ভিকনাথ কাঁপড়ে বাঁধা গয়নাগুলো ওর হাতে তুলে দিয়ে বলল, ভালো কাজে ভালো জিনিস লাগলে তবে তা সার্থক হয়। তোর বিপদ তো আমার বিপদ। এই ভাবনাটা যদি মানুষ হয়ে না থাকে তাহলে আর কিসের মানুষ!

রঘুনাথ যত শুনছিল ততই যেন মুগ্ধতা তাকে শুষে নিচ্ছিল। এই মানুষগুলোর উপর কোনোদিন তার আস্থা পূর্ণমাত্রায় ছিল না, আজ সেইসব সংস্কারের বেড়া ভেঙে ওরা যেন হৃদয়ের কাছাকাছি চলে এসেছে।

রঘুনাথ ভেতরে ভেতরে কাঁপছিল, দুর্গামণির ফোঁপানীর শব্দে তার সম্বিত ফিরে এল, তুমি কানচো কেনে, মা? বাবার তো কিচু হয়নি। এ কাশি তো মাস দুয়েকের পুরনা।

—সেই জন্যিই তো ভয় বাপ। দুর্গামণি সজোরে ডুকরে উঠল, জল জোলোরা কাশি সেরে যায়, লাথের কাশি কি সারে রে? কাশব্যামোর অক্ত দাবাইয়ে জল হয়—কিন্তু চোট-খাওয়া অক্তের রঙ সহজে ফিকে হয় না। ভয়টা তো ইখানে—।

দুর্গামণির জোড়া চোখে টলটল করে জল। চুনারামও সেই ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হয়। ময়লা ধুতির খুঁটে চোখ রগড়ে নিয়ে সে ধরা গলায় বলল, চৌপায়া বার করে দিয়েচি। গুয়ারে নিয়ে সত্বর হাসপাতালে যা। বড়ি আর ইনজিসিন দিলে ছেলে আমার ঠিক হয়ে যাবে।

গুয়ারাম নেতিয়ে পড়েছিল মেঝেতে পেতে রাখা বিছানায়। সবার কথা কানে আসছিল তার। রাতকালে এত মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করা তার ধাতে নেই। চিরদিন অভাব নিয়েও মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সে। আজ তার বিপদে সবাই এসেছে দেখে সে খুশি। রঘুনাথকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে সে বলল, কাশিটা এখুন কমের দিকে। আমার মন চাইচে না হাসপাতালে যেতে। এই বানবন্যায় ডাঙা খেয়ে নিয়েচে জল। যা হয় ঘরেই হোক। তোরা যে যার মতো শুয়ে পড়।

—তা কি হয়। ধকধকিয়ে উঠল রঘুনাথের চোখ, শুধু তো কাশি নয়, কাশির সাথে খুন বেরচ্ছে। এ তো ভালো লক্ষণ নয়, বাবা?

চিঁ-চিঁ স্বরে গুয়ারাম বোঝাতে চাইল, খুন তো সেই চোট পাওয়ার পর থিকে হচ্চে। এসব নিয়ে আমি আর ভাবিনে। যা হবার হোক। হয় ঘরের খাট নইলে শ্মশান ঘাট। মরতে আমার আর কুনো ভয় লাগে না—।

ভিকনাথ উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, কই রে রঘু, দেরি হচ্চে কেনে? গুয়াদারে ধরে ধরে নিয়ে আয়। অতটা পথ আবার যেতি হবে —

গুয়ারামের মাথার কাছে বসে রঘুনাথ নিচু গলায় বলল, বাবা, এবার দুহাতে ভর দিয়ে উঠে বসো। আমি তুমাকে ধরে ধরে. চৌপায়া অবধি নিয়ে যাবো।

গুয়ারাম কেমন বিপন্ন স্বরে বলল, আমি কি অতটা যেতে পারব?

—কেনে পারবে না, চিষ্টা করো, ঠিক পারবে। কথাগুলো রঘুনাথ জোর দিয়ে বললেও মনের জোর খুঁজে পেল না গুয়ারাম। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে তার শরীর গোবর লাঠির মতো ভেঙে পড়ল।

দেখে শুনে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল রঘুনাথের, কপালে ভাঁজ ফেলে সে ভাঙা ভাঙা স্বরে ডাকল, কাকা গো, খপখপ আসো....।

দুলাল আর ভিকনাথ ভয় পেয়ে ঝড়ের গতিতে ঘরে ঢুকে এল, হাঁপাতে হাঁপাতে দুলাল শুধাল, কি হল আবার?

—বাবা আর দেঁড়ুতে পারচে না।

—খাওয়া-দাওয়া না থাকলে মানুষ কি দেঁড়ুতে পারে রে! হাওয়ায় তো গায়ের জোর বাড়ে না।

ভিকনাথ শুনছিল। রঘুনাথকে সাহস দেওয়ার জন্য সে বলল, সামান্য জ্বরজ্বালা হলে মানুষ হাঁটতে চলতে পারে না। আর এতো হল কাশরোগ! তবে আজকালকার দিনে এরোগ কোনো রোগ নয়।

গুয়ারামের হাঁটাচলা করার ক্ষমতা নেই, তাকে খাটিয়া অবধি কোলপাঁজা করে নিয়ে যেতে হবে। অত বড়ো মানুষটাকে কোলপাঁজা করে খাটিয়া অবধি নিয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়। রঘুনাথকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল দুলাল আর ভিকনাথ। ধরার সময় বুকের কাছটাতে চাপ লাগতেই অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরে উঠল গুয়ারাম। এবার সে আর তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না, তোরা যা তো ইবার। মরা মানুষটাকে নিয়ে আর টানাহিঁচড়ে করিস নে। আমার শরীলে আর সে বল নেই। অসুখের উঁইপোকাটা আমাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

বাঁধে বাঁধে গিয়ে পুরাতন বাজারের ঢালু পথটায় নেমে গেল ওরা। ওখানে চারটে খাম্বা পুঁতেছে ইলেকট্রিক অফিসের লোকে। শোনা যাচ্ছে ট্রান্সফরমার বসবে। কাজ পুরো হয়নি। কাজ শেষ হলে বাতি জ্বলবে বাজারে। গমকলগুলো আর ডায়নামোতে চলবে না, সুইচ-টেপা কারেন্টে চলবে।

ওদের দেখে অত রাতে এগিয়ে এল হারাধন চৌকিদার। তার হাতের লাঠিটা তার চাইতে লম্বা। রোগা খিটখিটে মানুষটার গোঁফ দুটো দেখার মতো। ছুঁচলো মুখে গোঁফ দুটো তার আসল সম্পদ।

লাঠি ঠুকে শুধোল,কারা গো তুমরা?

—আজ্ঞে, আমরা হলদিপোঁতা ধাওড়ার।

—কি হয়েচে? খাটিয়ায় কে আচে?

—উগী আচে গো, উগী।

—আগে নামাও। তারপর অন্য কথা। হারাধন চৌকিদার গলা চড়াল। পাশেই থানা। থানার সঙ্গে তার বেশ দহরম মহরম।

অবশেষে খাটিয়া নামাল ভিকনাথ আর দুলাল। কাঁধ রগড়ে নিয়ে তারা একটু আরাম করার জন্য দেহটাকে আলগা করে দিল। তিন ব্যাটারির টর্চ জ্বেলে হারাধন চৌকিদার ঝুঁকে পড়ে বলল, শুয়ে আচে যে, কি হয়েচে ওর? সাপে কেটেচে বুঝি?

বান বন্যায় এছাড়া আর বিপদের কোনো কারণ খুঁজে পেল না হারাধন চৌকিদার। এ পথ দিয়ে রাত-বেরাতে যে কটা রুগী গিয়েছে প্রায় সব কটাই তো সাপে কাটার কেস। রাতে সাপে কাটলে জান চটকে ছেড়ে দেয়।

রঘুনাথের হাতে হ্যারিকেন টিমটিম করে জ্বলছিল,সে ক'পা এগিয়ে এসে বলল, সাপে কাটেনি গো, এর কাশব্যামো। বুকে বেদনা হয়। কাশলে মুখ দিয়ে অক্ত বেরয়। এবার কপাল কুঁচকে ভয়ে তিনহাত পিছিয়ে গেল হারাধন চৌকিদার, রোগটাতো ভালো নয়, বড্ড ছোঁয়াচে! কালীগঞ্জের লোক এ রোগটাকে টি.বি বলে।

হারাধন চৌকিদার আধুনিক হতে চাইল, তাহলে এমন কঠিন অসুখ নিয়ে তোমরা কোথায় যাবে ভাবছ?

—হাসপাতালে যাবো গো।

—হাসাপাতাল তো সেই কবে থেকে বন্ধ। বাঁধ যেদিন ভাঙল সেদিন থেকে শিবনাথ বাবুর বাড়িতে বড়ো ডাক্তার আশ্রয় নিয়েছেন।

—তাহলে এখন উপায়? দুলাল মানসিকভাবে ভেঙে পড়ল।

—উপায় একটা আচে। ষষ্ঠীতলার শিবনাথবাবুর কাছে নিচতলায় দিনমানে অনেক লোক আসে ওষুধ নিতে। তোমরা ওখানেই চলে যাও। আমার মন বলচে ওখানে গেলে কিচু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

অন্ধকারের মধ্যে সামান্য আলোর চিহ্ন বদলে দিল ওদের গতিপথ। রঘুনাথ আগে আগে হাঁটছিল। তার হাতে দুলছে হ্যারিকেন। মাঝে মাঝে দপদপ করছে আলোর শিস।

—আমি শিবনাথবাবুর ঘরটা চিনি। তোমরা আমার পেছন পেছন আসো। রঘুনাথের কথায় আবার খাটিয়াটা ঘাড়ে চাগিয়ে নিল ভিকনাথ আর দুলাল। বাজারে জল বেশি নেই তবু মাঝে মাঝে হাঁটু ডুবে যায়, কোথাও আবার চেটো ডোবা জল চিকচিক করছে আলো আঁধারির খেলায়।

ডাক্তারবাবু গুয়ারামকে পরীক্ষা করে দেখলেন, তারপর মুখ শুকিয়ে বললেন, অনেক দেরি করে এনেছেন, এখানে কিছু করা যাবে না। ইমিডিয়েট চেস্টের একটা এক্স-রে দরকার। কৃষ্ণনগর ছাড়া এ কেসের প্রপার ট্রিটমেন্ট হবে না। আমি একটা কাজ করতে পারি। কাল সকাল হলে একে অ্যাম্বুলেন্সে করে আমি সদরে পাঠিয়ে দিতে পারি।

—তাই করুন ডাক্তারবাবু, আমরা তৈরি হয়ে এসেচি। কখন সকাল হবে এই ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়ছিল ভিকনাথ। বারবার সে ঘাড় তুলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। বিপদের রাত বুঝি তাড়াতাড়ি ফুরোয় না।

কথাগুলো আচ্ছন্ন গুয়ারামের কানে ঢুকেছে কিনা বোঝা গেল না। শুধু হাই তুলে রঘুনাথ বলল, কাকা ভোর হতে এখন ঢের বাকি। চলো, বারোয়ারি তলায় গিয়ে বসি। ওখান কমসে কম মাথার উপর ছাদ আচে।

হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সটা খরগোসের মতো ছুটছিল। চৌত্রিশ নাম্বার জাতীয় সড়কে তখনও বন্যার জল গড়িয়ে নামছিল খেতের দিকে। ভাগা পেরতেই কাশির বেগটা ঝাঁকিয়ে দিল গুয়ারামকে, 'বাবা গো' বলে বুকে হাত দিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সহযোগে কেঁপে উঠল। দলা দলা কাঁচা মাংসের মতো রক্ত উঠে এল মুখ দিয়ে। কাশিটা এত টানা আর দীর্ঘ কেউ তাকে আটকে রাখতে পারল না। পেতে রাখা কাঁথা কানি ভেসে যাচ্ছিল রক্তে।

ভয় পেয়ে চোখ ছোট করে রঘুনাথ বলল, ও কাকু, গাড়ি থামাও।

অ্যাম্বুলেন্স রাস্তার এক পাশে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। তখনই স্তব্ধ হয়ে গেল গুয়ারামের জীবন। রঘুনাথের দেওয়া জলটুকুও তার গলা দিয়ে নামল না। দু কোয়াশের পাশ দিয়ে গড়িয়ে গেল বিছানায়।

বাবার বুকে মাথা দিয়ে রঘুনাথ শুনতে চাইল জীবনের পদাবলি। কোনো ছন্দ নেই,ঢেউ নেই—শুধু নিথর একটা দেহ আঁকড়ে কান্নায় ডুবে গেল এক আগুন যুবক।

সবাই মাটি পায় না, সবার ভাগ্যে শ্মশান জোটে না।

মানিকডিহির শ্মশান গিলে খেয়েছে বড়ো গঙ্গা। ঘোলা জল পাগলা ষাঁড়ের মতন দৌড়ে বেড়াচ্ছে পুরো সাহেবমাঠ। কবে যে তার রাগ পড়বে কে জানে। মানুষ এখন ভয়ে এদিকে আসে না। জলের সাথে আর যাই হোক বন্ধুত্ব করা যায় না।

গুয়ারামকে দাহ করা হবে কোথায় এই নিয়ে চুনারাম আর মুনিরামের নিচু গলার আলোচনা আর থামছে না। রঘুনাথ পাগলের মতো ঘুরছে এদিক সেদিক, তারও মাথার কোনো ঠিক নেই। বুক ভরে গেছে একরাশ শূন্যতায়। মাঝ পথ থেকে ফিরে এসেছে অ্যাম্বুলেন্স। ভিকনাথ চোখের জলে কাতর হয়ে বলল, ফিরে চলো গো ড্রাইভারদা। যে মন্দিরে ঠাকুর নেই সেই মন্দিরের আর কি দাম? দুর্গামণি কাঠ হয়ে গিয়েছে শোকে। কেঁদে কেঁদে তার আর এখন শব্দ করে কাঁদার কোনো ক্ষমতা নেই। রঘুনাথের দিকে পাথর চোখে তাকিয়ে সে যেন কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো ভাষা বেরল না, শুধু অস্পষ্ট গোঙানীর শব্দ বেরিয়ে এল। আর রঘুনাথও চাইছিল না দুর্গামণির মুখোমুখি দাঁড়াতে। মার কাছে গেলে সেই একই কথা উগলে দেবে সে।

—নীলুবাবুকে ছাড়বিনে, ও তোর বাপকে খুন করেচে। আমার বুকের দুধ যদি তুই খেয়ে থাকিস তাহলে আমার সিঁদুরের হিসাব চুকিয়ে নিবি। কথা দে।

শ্লেটের মতো মেঘ করেছে আকাশে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় শীত গন্ধ। পাতা আর ঘাস পচার গন্ধগুলো নাক সয়ে নিয়েছে এতদিনে।

দুলাল গিয়েছিল বড়ো গঙ্গার ধার। সে ফিরে এসে হতাশ হয়ে বলল, হরদার সাথে দেখা হল। গোরা সাধুর মতো এট্টা গাছে চড়ে বসে আচে। নামতে বলতেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর মুখে শুনলাম—এখন আর মড়া পুড়ছে না শ্মশানে। মা গঙ্গার নাম নিয়ে গাঙের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে লাশ। আসলে কি জানিস ডাঙা কুথায় যে মানুষ পুড়বে!

গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়ানো মানুষগুলো হাঁ হয়ে কথা শুনছিল ওর। শীতল হাওয়ায় নড়ে চড়ে উঠতেই রঘুনাথ ঠাণ্ডা গলায় বলল, একটা কিচু তো করতে হবে। তুমরা সবাই মিলে যে রায় দেবে আমি তা মেনে নেব।

এবার ভিড়টা একে অন্যের দিকে চকচকে চোখে তাকাল। কেউ আবার স্তব্ধ হয়ে রইল কিছু সময়। ভিকনাথ ওদের ভেতর থেকে ঠেলে উঠল। গলা চড়িয়ে বলল, পোড়াব যে তেমন ডাঙা নেই। অথচ শুয়াদা ভেষণ মাটি ভালোবাসত। জীবনের বেশির ভাগ সময় মাঠের কাজে তার চলে গেল। আমার মনে হয় বাসি না করে লাশ ভাসিয়ে দিলে ভালো হবে।

পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসেছিল দুর্গামণি। আলোচনার সব কথা তার কানে ঢুকছিল। মানুষটাকে ভাসিয়ে দেবে, কেন? শরীর রিরি করে উঠল দুর্গামণির। নীরবতা ভেঙে সে চেঁচিয়ে উঠল সজোরে, না-আ-আ। ওরে তুমরা ভাসাবে না।

—তাহলে কি করতে চাও বৌদি? দুলাল গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল। রঘুনাথ কাঁপাকাঁপা শরীরে এগিয়ে এল দুর্গামণির সামনে, মা, তাহলি পরে তুমি কি চাইচো খোলসা করে বলো। আর দেরি করা যাবে না। বেলা ফুরলো বলে।

দুর্গামণি কি খেয়ালে নিজের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। চিন্তায় তার মাথা বনবন করছিল। কেঁদে কেঁদে চোখের জল শুকিয়ে গেছে গালে। এলোমেলো চুলগুলোয় তাকে বড়ো অস্বাভাবিক দেখায়। ভিকনাথ সাহস করে তার সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, গাঙে ভাসালে তুমার আপত্তি কেন, বউদি?

সাপের ফণা আছড়ানোর মতো শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়াল দুর্গামণি, রঘুর বাপকে কি সাপে কামড়েছে যে মানুষটাকে গাঙের জলে ভাসিয়ে দেবে? তুমরা কেমন মানুষ, এমন কথা বলচো কি করে?

হতচকিত শোক কাতর মুখগুলো সাদা হয়ে গেল নিমেষে। চুনারাম মাটিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল কোনোমতে। পুত্রশোক তার চোখের জল শুকিয়ে দিয়েছে। এই বয়সে কাঁদলে মনে হয় এক্ষুনি আকাশ ভেঙে পড়বে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, বউমা, মাথা ঠাণ্ডা রাখো। দশে যা বলচে তাই মেনে নাও।

—না, আমি মানতে পারব না।

—তাহলে কি করতে চাও তুমি? বাসি মড়া ঘরে আগলে রাখবে? চুনারামের বুকের গভীরে পাথরের স্তব্ধতা ছেয়ে গেল। ঘাড় ঝুঁকিয়ে একবার সে সবার দিকে তাকিয়ে নিয়ে শরীরের ভারে ঝুপ করে বসে পড়ল মাটিতে। কান্না ঠেলে উঠল তার গলায়। কান্নার ভাষা বোঝা গেল না, শুধু ক্ষীণ একটা গোঙানী আছড়ে পড়ল বাতাসে।

দুর্গামণির বুকের ভেতরটা টনটন করছিল শোকে-দুঃখে। না সামলাতে পেরে সে অবোধ স্বরে কাতর হয়ে বলল, ঘরের মানুষটাকে জলে না ভাসিয়ে ঘরের উঠোনে মাটি দাও। এতে তার সদগতি হবে। আমাদের চোখে চোখে থাকবে মানুষটা।

—তা কি করে সম্ভব? কেউ কিছু বলার আগে চুনারামই গলা ফাটাল। দুর্গামণি বিচলিত হল না, শুধু আহত চোখে তাকাল, ধাওড়াদের এমন চল অনেক বস্তিতে আচে। বামুনরা যদি সমাধি দেয় তাহলে আমাদের দিলে দোষ কুথায়? কামারী, দোয়েমের লোকেরা মরা মানুষকে কবরে নিয়ে যায়। মাটির শরীর মাটিতে মিশে গেলে আত্মা নাকি পাখি হয়ে ওড়ে।

সবাই হাঁ হয়ে শুনল দুর্গামণির যুক্তিগুলো। রঘুনাথ ভাবছিল তার মায়ের বুদ্ধির কথা। দেখে মনে হয় হাবাগোবা, অথচ সময়ে জ্বলে উঠতে জানে। মায়ের এই যুক্তিকে একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না।

ভিকনাথ একটা সমাধান চাইছিল দ্রুত। সে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, রঘু, এই ব্যাপারে তোর কি মত?

একটুও ভাবল না রঘুনাথ, মার যা মত আমারও তাই মত।

—তাহলে তো আর কথা নেই। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। ভিকনাথ স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে এগিয়ে গেল পিটুলিগাছটার গোড়ায়। ঠিক হয়েছিল বাঁধের ধারের এই গাছটা কেটে দাহ করা হবে গুয়ারামকে।

কুড়ুল হাতের লোকটাকে ভিকনাথ বলল, এসো গো, আর গাছ কাটার দরকার নেই। ঘরের মানুষ ঘরেই থাকুক সেই ভালো।

চুনারাম বলল, পয়সা কড়ি জমলে গুয়ার সমাধিটা আমি পাকা করে দিব।

কোপে কোপে মাটি কাটছিল দু'জন। রঘুনাথের মুখে কোনো কথা নেই। সে জানে আর একটু পরে একটা মানুষ মাটি চাপা পড়ে যাবে অনন্ত সময়ের জন্য। মাস তিনেক পরে শুধু হাড়গোড় ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। মানুষ জীবনটা বড়ো আশ্চর্য মনে হল তার কাছে।

রাতের আঁধারে বুড়িগাঙের দিকে তাকালে সে-ও বুঝি কিছু বলতে চায়। কি বলতে চায় সে? রাতের ভাষা বোঝা গেলেও গাঙের ভাষা বোঝা যায় না।

ভোররাতে সব যখন শান্ত হয়ে গিয়েছে তখন সদ্য খোঁড়া সমাধিটায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল রুদ্রাক্ষ। হাত মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পাড়ার কুকুরগুলো সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। চাপা গলায় কুকুরগুলোকে সংযত হতে বলছে রুদ্রাক্ষ। ওরা কথা শোনার মন্ত্র জানে না। বিকট চিৎকারে পাড়া মাথায় তুলে চেঁচাতে লাগল।

সারা দিনের ধকলেও ঘুম আসেনি রঘুনাথের। নিঃশ্চুপ পায়ে সে বিছানা ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। আবছা আলো-আঁধারে বাঁশ গাছ থেকে ভেসে আসছে ভৌতিক শব্দ। রঘুনাথ রোজ শোনে তবু আজ তার গা কাঁটা দিয়ে উঠল, কে, কে ওখানে?

—আমি রে রঘু। কাঁপা কাঁপা উত্তর ভেসে এল হাওয়ায়।

—আমি কে? নিরীহ গলায় জিজ্ঞাসা করল রঘুনাথ।

—আমি রুদ্রাক্ষ।

জবাব শুনে সারা গায়ে বিদ্যুৎ-এর শিহরণ নেচে গেল রঘুনাথের। ঢোঁকে গিলে সে বলল, অসময়ে এলে যে।

—বিপ্লবীদের কোনো সময় অসময় থাকতে নেই। রুদ্রাক্ষ চোখ রগড়ে নিয়ে ঢিবি হয়ে যাওয়া মাটির দিকে তাকাল। ডাঁই করা মাটি দেখে সে একটু অবাক হয়ে শুধোল, এখানে এত মাটি কাটা হয়েছে কেন? এভাবে উঠোন কেউ কি কাটে?

—ওখানে আজ বাবাকে কবর দেওয়া হল। রঘুনাথের চোখ জোড়া আর্দ্রতায় ভরে গেল।

রুদ্রাক্ষ ব্যথিত হয়ে বলল, ওঃ, সরি!

রঘুনাথ কিছু বুঝল না, অন্ধকারে ওর চোয়াল কঠিন হয়ে উঠছিল। চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলল, আজ এই মৃত্যুর জন্য তুমার বাবা দায়ী। সে আমার বাপের বুকে জোড়া পায়ের লাথি মেরেছিল। সেই থিকে মানুষটা আর এক দিনের জন্যও হাসেনি। বড়ো অভিমান নিয়ে মানুষটা চলে গেল!

রুদ্রাক্ষ অন্ধকারেই মুখ ঢাকা দিল দু'হাতের আড়ালে। কথা হারিয়ে সে মাটির চেয়েও নীরব থাকল অনেক সময়। রঘুনাথ চিৎকার করে বলল, এখুন আর মাঝরাতে যাত্রা করে কুনো লাভে নেই। তুমি যেমন এসেচো তেমন চলে যাও। হলদিপোঁতার মানুষ জাগলে তুমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে।

রুদ্রাক্ষ নিজের মাথার চুল দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল, মরতে আমি ভয় পাই না। এসেছি যখন একবার তোমার মায়ের সাথে দেখা করে যাব। বাবার হয়ে ক্ষমা চেয়ে তার পাপের ভাগ আমি কিছুটা কমাতে চাই।

—সে সুযোগ তুমার আর হবেনি গো। তুমি ঘুরোন যাও। আর এগিও না।

—কেন?

—আমি এর বদলা নেব।

—তুমি একা কেন, আমিও তোমার সঙ্গে থাকব। চলো।

গল্পের মতো কথাগুলো শোনাল রঘুনাথের কানে, সে অবিশ্বাসের চোখে তাকাল। রুদ্রাক্ষ বলল, তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না? বিশ্বাস না হবারই কথা। এই নাও। বলেই সে কোমরে গোঁজা রিভলভারটা ছুঁড়ে দিল রঘুনাথের দিকে, লোড করা আছে। চাইলে তুমি আমাকে খতম করে দিতে পার।

রঘুনাথের হাত কাঁপছিল। এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে তাকে স্বপ্নেও ভাবেনি সে। রুদ্রাক্ষ পায়ে পায়ে এগিয়ে এল তার কাছে। হাত বাড়িয়ে ধরলো রঘুনাথের হাত, তুমি আমার ভাইয়ের মতো। আজ তোমার মনের কষ্টটা আমি বুঝতে পারচি। বাবাকে ছোট থেকে দেখছি। তার মতো অত্যাচারী মানুষ আর হয় না। উচ্চবর্ণের মানুষ বলে গর্বে মাটিতে তার পা পড়ে না। চলো কমরেড, আজ সেই বুর্জোয়া মানুষটাকে খতম করে আসি। অমন মানুষকে বাঁচার অধিকার দিলে সমাজের আরও ক্ষতি হবে।

—নিজের বাবাকে নিজে মারতে পারবে?

আমার কাছে বুর্জোয়ার কোনো সংজ্ঞা নেই। খতমের রাজনীতিতে আমরা বুর্জোয়াদের সবার আগে রেখেছি।

রঘুনাথ কথা না বাড়িয়ে পুরনো খড়গাদাটার দিকে এগিয়ে গেল। হাত ঢুকিয়ে খড়গাদার ভেতর থেকে বের করে আনল রিভলভারটা। রুদ্রাক্ষকে রিভলভারটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, তুমার এই মেসিনটার জন্যি আমি কুথাও খোলা মনে যেতে পারতাম না। হলদিপোঁতায় বন্দি হয়েছিলাম এতকাল। আজ আমার বুকের বোঝা নেমে গেল। এবার তুমি যেতে পারো।

—কোথায় যাব, আমি তো তোমার কাছে এসেছিলাম। নাহলে এত ঝুঁকি নিয়ে গ্রামে ঢোকার কোনো অর্থ হয় না।

—আমি এত ছোট যে তুমার মতোন মানুষের সাথে থাকতে পারবো নি। রঘুনাথের হাতটা ব্যাকুল হয়ে জড়িয়ে ধরল রুদ্রাক্ষ, আমাকে ভুল বুঝো না। তোমাদের কথা ভেবে আমি অনেক কষ্ট পাই। নিজের কষ্ট দুর করার জন্য আমার এই সংগ্রাম আমৃত্যু চলবে। আজ আসি ভাই। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।

অস্ত্রটা নিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল রুদ্রাক্ষ।

বন্যার জল সরে গেলেও দাগ সরে না।

হাসপাতালের দেওয়ালের পলির দাগ নারকেল ছোবড়া দিয়ে ঘষে ঘষে তুলছিল অবনী। সেই সকাল থেকে কাজে লেগেছে, দম নেবারও ফুরসত পায় নি। মাঝে শুভ এসে তার জলখাবার দিয়ে গিয়েছে। কুমড়োর তরকারি আর তিনখানা রুটি। বাটিতে খবরের কাগজ ঢাকা দেওয়া। এসময় মাছি ভয়ানক উৎপাত করে, রোগ ছড়ায়। ডুবো ঘাস খেয়ে গোরু-ছাগলের অবস্থা খারাপ। পেট ছাড়ছে অনেকের।

খবর এসেছে দোয়েম আর চরসুজাপুরে বমি আর পাতলা বাহ্যি শুরু হয়েছে পাড়া জুড়ে। কারোর আবার গলা ফুলে ব্যামো, কারোর চুলকানি আর দাদ হাজা। সেই সঙ্গে জ্বরজ্বালার কোনো ঘাটতি নেই। এত স্টাফ নেই যে ডাক্তারবাবু সব জায়গায় লোক পাঠাবেন। সাইকেল ঠেলে দোয়েম গিয়েছেন টিকেদারবাবু, সেই সকালে গিয়েছেন, এখনও তিনি ফেরেননি। তিনি না ফেরা পর্যন্ত রীতিমতন চিন্তায় আছেন ডাক্তারবাবু।

অবনী দেয়াল ঘষতে ঘষতে থামল, চেয়ারে বসা ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে অকপটে জিজ্ঞাসা করল,. বাবু, কি ভাবছেন তখন থেকে? কোয়ার্টারে চলে যান, আর মনে হয় রুগী আসবে না।

সেই সকাল থেকে আউটডোর খুলে বসে আছেন তিনি। জ্বরজ্বালার দু-দশজন যা ওষুধ নিয়েছে, এর বেশি কেউ আর আসেনি। কাদাজল ঠেলে হাসপাতালে আসা এখন ঝক্কির।

হাই তুলে ডাক্তারবাবু বললেন, বাসায় গিয়ে আর কি হবে? ওখানে গেলে হাসপাতালের চিন্তা হয়। আমাদের চাকরিটায় শুধু চিন্তা ছাড়া আর কিছু নেই।

অবনীর কণ্ঠস্বরে আনুগত্য ঝরে পড়ল, তা যা বলেছেন বাবু। আমার বাবা বলত—বড়োগাছে ঝড় বেশি লাগে। তা বাবু, আপনি হলেন বড়ো গাছ। আমাদের বাপ- মা। আপনার তো চিন্তা হবেই।

চেয়ারে মাথা দিয়ে স্বস্তির সন্ধান করছিলেন ডাক্তারবাবু। দু'জায়গায় কলেরার খবর তার সেই স্বস্তি-শান্তি কেড়ে নিয়েছে। আজ বিকেলে থানায় যাওয়া দরকার। ওয়ারলেসে সি. এম. ও. এইচ-কে খবর দেওয়া দরকার। ওপরওয়ালাকে না জানিয়ে রাখলে পুরো দায়টা পরে তার ঘাড়ে চলে আসবে। চাকরির নিরাপত্তার বিষয়টা সবার আগে তাঁকে ভাবতে হবে।

অবনী ভাবছিল ডাক্তারবাবু চলে গেলে হাত ধুয়ে এসে সে টিফিনটা আরামে খেতে পারত। ডাক্তারবাবুর সামনে তার খেতে কেমন সংকোচ হয়। হাজার হোক এই হাসপাতালের মাথা বলে কথা। তার কলমের দু খোঁচায় অবনীর বদলি অবধারিত।

এর আগে নগরউখড়ায় থাকার সময় এক পেসেন্ট পার্টির সঙ্গে তার ঝুটঝামেলা হয়েছিল। যার সাথে ঝামেলা সে দলবল জুটিয়ে অবনীকে মারার জন্য তৈরি ছিল। অবনীও ছেড়ে কথা বলত না। রাগ তার শরীরেও আছে। বিপদের আঁচ পেয়ে ডাক্তারবাবু মিটমাট করে দিলেন সেবার। হাতে হাত মিলিয়ে শান্ত হল ওরা।

সেদিনের সেই ঘটনাটা প্রায়ই মনে পড়ে অবনীর। নগরউখড়ার অনেক স্মৃতি সে এখনও মন থেকে মুছতে পারেনি। চাকরির প্রথম জীবনটা জন্মদাগের মতো, কিছুতেই মেলায় না। স্মৃতি কাতরতায় ডুবে থাকে।

ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার পর ঝটপট টিফিন করে নিল অবনী। এতগুলো ঘরের সাফ-সুতরো করার দায়িত্ব তার। বন্যা চলে গেছে কিন্তু পচা ভ্যাপসা গন্ধটা রেখে গেছে। আশপাশে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়েও কোনো লাভ হয়নি। মশা মাছি পচা জলের ঘ্রাণে ধেয়ে আসছে। চড়া রোদ না উঠলে এসব আর দূর হবে না।

ছ-সাতটা দিন ছাদে কাটানোর অভিজ্ঞতায় বেশ ঝানু হয়ে গিয়েছে অবনী। চোখের পর্দা সরে গিয়ে মানুষের আসল রূপ চিনতে পেরেছে সে। বিপদের দিনে কেউ কারোর নয়—এ কথাটা আর একবার তার কাছে প্রমাণ হল। একটা চাপা দুঃখ তার ভেতরে পচা পাঁকমাটির মতো বিছিয়ে আছে। এই দুঃখটা ধীরে ধীরে শুভর মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। সেও ভীষণ মনমরা আর বিষণ্ণ। শুধু রঘুনাথ ছাড়া আর কেউ তার খোঁজ নেয়নি। খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করেনি।

কেন করেনি? এ প্রশ্ন কোনোদিনও শুভ মুখ ফুটিয়ে করেনি। শুধু সরস্বতী আক্ষেপ করে বলল, যাদের আপন ভাবতাম তারা চোখ সরিয়ে নিল। শুধু ভগবান ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই।

অভিমানের কথায় মনের ভীষণ অসুখ করে। সেই অসুখ সারতে সময়ও লাগে। মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুভর এই কথাগুলোই মনে পড়ল বারবার করে। মাধুরী কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, দেখ শুভ, আমার কিছু করার ছিল না। তুই আমাকে ভুল বুঝিস না।

শুভ কি বলবে? কোনো কথা বলার মতো অবস্থায় সে ছিল না। শুধু তার ঠোঁট কেঁপে উঠল, অভিমানে ভার হয়ে এল গলা, না রে, মনে করার কি আছে, যা স্বাভাবিক,যা হবার তাই হয়েছে।

—এ তোর রাগের কথা।

মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুভর কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল, পুরনো কথা ভুলে যা। বল কি জন্য এসেছিস?

—আমাকে বসতে বলবি নে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বস না। শুভ পেতে রাখা খাটটা দেখিয়ে দিল।

উশখুশিয়ে মাধুরী বলল, স্কুল খুললেই পরীক্ষা। কিছু পড়া হয়নি। কী যে করব!

—পাকা বাড়িতে ছিলিস অথচ পড়িসনি কেন?

—সত্যি কথা বলব?

—হ্যাঁ, বলতে পারিস।

—তোর কথা ভেবে আমার খুব মন খারাপ করত। অনেকবার বই নিয়ে বসেছি, কিন্তু পড়ায় মন বসাতে পারিনি। আচ্ছা, তুই কি একবারের জন্য আমার কথা ভেবেছিলিস? খুব নিচু গলায় কথাগুলো বলে তাকাল মাধুরী।

এসব কথায় কোনো প্রতিক্রিয়া হল না শুভর। মৃদু হেসে সে বলল, মন থাকলে তা খারাপ করে। এ আর নতুন কি?

—বন্যার পরে মাটি নরম হয় অথচ তুই তোর মনটাকে শক্ত করলি কি ভাবে? মাধুরীর জিজ্ঞাসায় প্রচ্ছন্ন খোঁচা ছিল, তা গায়ে মেখে নিয়ে শুভ বলল, আমাকে বাজারে যেতে হবে চাল কিনতে। তুই যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

—আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস? আহত চোখে তাকাল মাধুরী।

শুভ কিছুটা ঘাবড়ে গেল তার কথার স্বরে, তোকে কেন তাড়িয়ে দেব। আমি শুধু আমার দরকারের কথাটা বললাম।

—আগে তো তুই এত হিসাব করে কথা বলতিস না? মাধুরীর কথার তীক্ষ্ণতায় হকচকিয়ে গেল শুভ।

মাধুরী নিজেকে শোনানোর মতো করে বলল, ঠিক আছে, আমাকে যখন পছন্দ নয় তখন আমি চলে যাচ্ছি। আর যদি কিছু শোনানোর থাকে তাহলে ভালো করে শুনিয়ে দে। আজ আমি গায়ের চামড়া মোটা করে তোদের কোয়ার্টারে এসেছি। জানি এসব কথা আমার পাওনা। তবে একটা কথা, আমি মরে গেলে তো তুই আমাকে এসব কথা শোনাতে পারবি না?

ধ্বক করে উঠল শুভর বুকটা। হাড়-পাঁজরা সব কেঁপে উঠল শব্দের ঝাঁকুনিতে। কিছু বলতে গিয়ে মুহূর্তে তার কথাগুলো বরফ হয়ে গেল। সে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল মাধুরীর মুখের দিকে।

মাধুরী ক'পা সরে এসে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চোখে তাকাল, এখন আমি যাই। তবে একটা কথা

শুনে রাখ। আমি শিবনাথবাবুদের ছাদের তলায় থাকলেও তোর জন্য রোজ বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কাঁদতাম। এখন বৃষ্টিও নেই, জলও নেই। চোখের জলের দাগও মিলিয়ে গেছে। তুই প্রমাণ চাইলে আমি মিথ্যেবাদী হয়ে যাব। মাধুরী আর দাঁড়াল না, আগুনে পোড়া পাখির যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে গেল।

ফিল্ড থেকে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল টিকেদারবাবুর। কুমোর খাদে জলপাখিদের আওয়াজ থেমে গেছে। বাতাসে জলীয় কণার অতর্কিত হামলা। আঁধার দেখলেই মশারা উড়ে আসে কলাবাগানের ভেতর থেকে। অবনী এখনও ঘরে ফেরেনি। সরস্বতী সন্ধ্যা দেখিয়ে হ্যারিকেনের পোড়া সলতে কাটতে বসে গেল। আর একটু পরেই এরফান আসবে, এসে গল্প শুরু করবে রাজ্যের। হা করে তার সেই আবোল তাবোল গল্প শুনতে হবে তাকে।

সবুজের সঙ্গে গত দু-দিনে একবারও দেখা হয়নি শুভর। হয়ত টিকেদারবাবু মানা করেছেন তার সাথে মিশতে। বড়ো মানুষদের বড়ো চিন্তা। আসলে টিকেদারবাবু চান না সবুজ তার সঙ্গে মিশুক। মেলামেশাটাও একটা ছোঁয়াচে রোগের মতন। একটা পচা আলুর কাছে একটা ভালো আলু থাকলে সেই ভালো আলুটাও নাকি পচে যায়!

টিকেদারবাবুর এই চিন্তা ভাবনা শুভকে মনমরা করে রাখে সব সময়। অথচ সবুজের সঙ্গ তার ভালো লাগে। সবুজ বুড়িগাঙের হাওয়া। তাকে আটকে রাখা যায় না। তবু কিভাবে যেন আটকে আছে সবুজের স্বাভাবিকতা। টিকেদারবাবুর কড়া শাসন পাঁচিল তুলেছে এই মেলামেশায়। অথচ সবুজের মা অন্য মানুষ। তিনি কম কথা বলেন। কিন্তু যেটুকু বলেন কাজের কথা। তাঁর মধ্যে বিভেদ নেই। তাঁর ধর্ম জলের ধর্ম। তিনি বিশ্বাস করেন—মানুষই ভগবান, ঈশ্বর। অথচ টিকেদারবাবু ধমক দিয়ে বলেন, তুমি থামো তো। যা বোঝ না তা নিয়ে বেশি কথা বলো না। সবাই যদি এক হবে তাহলে 'ভালো', 'মন্দ' কথা দুটো সৃষ্টি হত না। বাজার থেকে ফিরে শুভ হাত-পা ধোওয়ার জন্য টিউবওয়েলটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে পুরো এলাকার চেহারাটা বুঝি বদলে যায়। কালীগঞ্জ বাজারের আগের শ্রী এখনও ফেরেনি। জলকাদায় প্যাঁচপ্যাঁচ করছে চারধার। বড়ো ড্রেনগুলো ভরে আছে জলে। সেখানেও মশা-মাছির চাষ-আবাদ। সব চাইতে করুণ দশা হয়েছে বারোয়ারিতলার। ঠাকুরথানটা জল সরে যাওয়ার পর কেউ পরিষ্কার করেনি। জলের দাগ, সেই সঙ্গে পা জড়িয়ে যাওয়া পলি ছড়িয়ে আছে ইতস্তত।

প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ফেরার সময় মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বই দোকানটার সামনে দেখা হল শুভর। তাকে দেখতে পেয়ে মনে খেদ চেপে রেখে মৃত্যুঞ্জয় শুধালো, কেমন আছো বাবা?

শুভ দাঁড়িয়ে পড়ল, ভালো আছি কাকা। তোমরা সব ভালো তো?

মৃত্যুঞ্জয় হাসতে গিয়েও যেন হাসতে পারছে না, এই কোনোরকমে গড়িয়ে সড়িয়ে চলে যাচ্ছে বাবা। বান-বন্যায় কি আর ভালো থাকব? ঘরে অন্ন না থাকলে মন তো ছন্নছাড়া হবেই।

মৃত্যুঞ্জয়ের দুঃখটা অন্তর দিয়ে বুঝতে পারল শুভ। কালীগঞ্জ বাজারে তার ইটপাতা সেলুন আছে। সেখানে পেছনে ইট দিয়ে চুলদাড়ি কাটে অনেকে। পয়সা আর জায়গার অভাবে বাজারে ঘরভাড়া নিতে পারেনি মৃত্যুঞ্জয়। একটা সেলুনের স্বপ্ন দেখে সে। বড়ো আয়নায় গ্রাহকরা মুখ দেখবে, সরু চিরুনি নিয়ে চুলের টেরি কাটবে—এ স্বপ্ন বুঝি তার পূরণ হবার নয়। মাছ ধরা ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তাই সে এখন ভ্রাম্যমাণ ক্ষুর-কাঁচি নিয়ে পড়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের ইটালি-সেলুনে নামমাত্র মূল্যে চুলদাড়ি কাটা হয়। তবে গাঁয়ের লোকে বিবাহ-শ্রাদ্ধে তাকে ক্ষৌরকর্মে নেয় না। ঠাট্টা করে বলে, জাল ফেলে যে ক্ষুর-কাঁচি ধরে সে আবার প্রামাণিক হল কবে থেকে? কথাটা

সত্যি। এর জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের মনে কোনো দুঃখ নেই। তার সব সুখ জুড়ে আছে তার একমাত্র ছেলে সঞ্জয়। সঞ্জয় এবার আর্টস নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবে। হালদার বংশের সে হবে একমাত্র ইলেভেনের টেস্ট দেওয়া ছেলে।

ইটালি সেলুনের শ্যাওলা পড়া ইটে বসে মৃত্যুঞ্জয় মা-মরা ছেলে সঞ্জয়ের কথা ভাবে। ছেলে বড়ো হয়ে তার স্বপ্ন পূরণ করবে। ইটালি সেলুনের ইট নিয়ে গিয়ে সে ঘর গাঁথবে। সে ঘরে মাথার উপর ঢালাই ছাদ থাকবে, দেওয়ালে থাকবে বড়ো আয়না। মৃত্যুঞ্জয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষটার স্বপ্নের কথা বহুবার শুনেছে শুভ। অবনীর সঙ্গে তার এত কেন খাতির বুঝতে পারে সে। এক অভাবী আরেক অভাবীর দুঃখ বোঝে। ওদের দু'জনের দেখা হলে কথা আর শেষ হতে চায় না। মুখোমুখি বসে ওরা দুটিতে ভসভসিয়ে বিড়ি টানে। কখনও মন হলে অবনী গিয়ে মুড়ি আর চপ কিনে আনে দু ঠোঙ্গা। তেল জড়ানো ঠোঙ্গায় পৃথিবীর সব সুখ বুঝি চুঁইয়ে নামে। মৃত্যুঞ্জয় বলে, ছেলেটার একটা পাশ হয়ে গেলে বাঁচি। শিবনাথবাবুর হাতে পায়ে ধরে ইস্কুলের লেখা-পড়া কাজে লাগিয়ে দেব।

—তোমার তো হয়ে এল দাদা, আমারটা যে কি করবে কে জানে।

—শুভ তো পড়াশোনায় ভালো। অত চিন্তা করছ কেন?

চিন্তা কাউকে ছাড়ে না। মৃত্যুঞ্জয় বেজার মুখে বলল, বান চলে যাওয়ার পর এট্টা খদ্দেরও আসেনি বাবা। কি করে সংসার চলবে ভেবে পাচ্ছি নে। শিবনাথবাবু বলেছিল, মন্ত্রী আসবে। হেলিক্যাপ্টার চক্কর কাটবে। বস্তা বস্তা চাল গম চিড়া কেউ তার কিছু পেল না! এখন ঘর খরচের পয়সা জুগাতে মনে হচ্ছে বুকের হাড় বাঁধা দিতে হবে।

অভাব একটা আগুন। অভাব সব খায়। মৃত্যুঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শুভর মনে হল অভাবের লেলিহান শিখায় মানুষটা বুঝি ঝলসে গেছে!

মৃত্যুঞ্জয় ঢোঁক গিলে নিয়ে শুভকে বলল, বানে তোমরা বড়ো কষ্টে ছিলে এ সংবাদ আমি লোকের মুখে শুনেছি। কিন্তু কাছে গিয়ে তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারিনি। বাজারের ভেতর দিয়ে যা জলের সোরত, ঘাস ফেললে নিমেষে তা দু টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। তবু সঞ্জয় বলছিল সে গিয়ে তোমাদের সাথে করে নিয়ে আসবে। আমি তাকে যেতে দিইনি বাবা। আসলে কি জানো? জলকে আমার বরাবরের ভয়। জল নিজের কথা ছাড়া কারোর কথা শোনে না।

এ প্রসঙ্গে শুভর আর কথা বলার ইচ্ছে ছিল না, সে অলসভাবে অন্য কথায় চলে গেল, আমি এখন আসি কাকা। ঘরে অনেক কাজ পড়ে আছে। লিটনদাকে বলো আমি ওর সঙ্গে পরে দেখা করে নেব।

লিটন সঞ্জয়ের ডাক নাম। ইস্কুলের সবাই ওই নামে তাকে বেশি চেনে। লিটন চরিত্রটি কারোর সঙ্গে মেলে না। তার ভেতরে একটা সবজান্তা গোছের ভাব আছে। মহাকাশ থেকে নিয়ে পাতাল অবধি তার জ্ঞানের পরিধি। কোনো বিষয়ে সে মন্তব্যহীন থাকা পছন্দ করে না। সব বিষয়ে তার জ্ঞান ফলানো চাই-ই—চাই। সেই কারণে হেড-মাস্টারমশাই তার উপর ভাষণ বিরক্ত। অমলকান্তি স্যারও মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠেন লিটনের ব্যবহারে।

কেউ হাঁপিয়ে উঠল কিংবা বিরক্ত হল তাতে লিটনের কোনো কিছু যায় আসে না। সে তার গলার চড়া স্বরে প্রভুত্ব করতে অভ্যস্ত। শুভর লিটনের এসব গুণ ভালো লাগে না, সে ভালোবাসে লিটনের প্রতিবাদী সত্তাটাকে। শিবনাথবাবুর মুখের উপর গলা চড়িয়ে কথা বলার স্পর্ধা রাখে এই ইস্কুলের একমাত্র লিটন। সে নির্দ্বিধায় বলবে, যান, যান, আপনার মতো সেঁকা রুটি মানুষকে আমার জানা আছে। ক্ষমতার লোভে আপনারা সব করতে পারেন। যারা ভাইপোকে ছেলে সাজিয়ে

ইস্কুলের সেঁকা রুটি হয় তাদের মন যে কত বড়ো হিমালয় তা আমার জানা আছে।

শিবনাথবাবু অবিবাহিত। ইস্কুলের সেক্রেটারি হতে গেলে প্রাথমিক শর্ত হল ওই ব্যক্তির ছেলে-মেয়েকে এই ইস্কুলে পড়তে হবে। ছেলে-মেয়ে না থাকলেও তিনি যে কারোর লিখিত অভিভাবক এমন সত্যতা অবশ্যই থাকতে হবে। প্রথমটা সম্ভব না হওয়ায় ক্ষমতার লোভে দ্বিতীয় পন্থাটাই অনায়াসে বেছে নিয়েছেন শিবনাথবাবু। এতে সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।

মানুষকে বোকা ভাববার এত কারণ নেই। জেগে ঘুমানো মানুষের সংখ্যা দিনে দিনে কমছে। মৃত্যুঞ্জয় হালদারের ছেলের মতো অনেকেই ঘুম ভেঙে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে অনেক আগে থেকেই। তারা ক্ষমতার স্বচ্ছতা এবং বিকেন্দ্রিকরণ পছন্দ করে। লিটনও তাদের মধ্যে একজন। সে নিজে গরিব বলে বিদুর আর লাবণি রাজোয়ারের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। কিছু শব্দকে বিকৃত করে লিটন নিজের মতো করে বলতে ভালোবাসে। যেমন সেক্রেটারি শব্দটাকে সে সবসময় সেঁকা রুটি বলে বলতে ভালোবাসে। শব্দকে বিকৃত করতে তার মতো ওস্তাদ আর কেউ নেই। লিটনের এসব ভাষণ মৃত্যুঞ্জয়কে মোহিত করে দেয়। আগামী দিনের স্বপ্নে তার চোখ কামরাঙার মতো রঙিন হয়ে ওঠে। সত্যিই লিটন কোনো বাঁশের পলকা লাঠি নয়, সে একেবারে ইস্পাত। এই বয়সে ছেলেটা যে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে হালদার বংশে এর আগে কেউ তা অর্জন করতে পারেনি।

অন্ধকার নেমে এলে মন খারাপের পোকাগুলো ঝিঁঝি পোকার মতো কানের পর্দায় ভাসতে থাকে। বিরক্তিকর টানা সেই শব্দ। কদবেলতলার কাছে এসে হাঁপিয়ে উঠল শুভ। বাঁ-পাশের টালি কারখানাটা কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে ধুঁকছে। যত অন্ধকার সব যেন বুকের খোদলে ঢুকিয়ে নিয়েছে কারখানাটা। এক ঝলক হাওয়া আসতেই পাকা কদবেলের গন্ধটা আছড়ে পড়ল শুভর নাকের উপর। পাতার ঘোমটায় ঢাকা পড়া পুরুষ্ট কদবেলগুলো নতুন বউয়ের দৃশ্যমান ফরসা মুখের মতো।

এই কদবেল গাছটার গোড়ায় দাঁড়ালে আকাশ দেখা যায় সম্পূর্ণ। বাঁশঝাড় কারখানা পরিত্যক্ত-পোড়ে কোথায় যেন একটা শ্বেতখরিস আত্মগোপন করে আছে। অনেকেই তাকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

এতদিন, এত বছর হল তবু শুভ কোনোদিন দেখতে পায়নি সাপটাকে। শুধু গল্পকথায় জীবন্ত হয়ে আছে শ্বেতখরিসের ফণা তোলা মাথা। শুভ হাসাপাতালের গেট দিয়ে নামতে গেলে একটা চাপা মেয়েলী কণ্ঠস্বর তার কানে এসে বিঁধল। বাঁকা, হেলে পড়া খেজুরগাছটার আড়ালে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। মেয়েটা তার সমস্যার কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলছে। যার সারমর্ম—বান বন্যায় মরে আচি গো। এট্টা ছাগল ছিল, তাও বেচে দিলাম জলের দরে। ছেলেটারে নিয়ে সন্‌সার আর চলতে চায় না। বানে আমার কারবার সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। এখন আর কেউ আমার কাছে মদের জন্যি আসে না। জল যতদিন না টানবে ততদিন এই দুর্ভোগ।

ছায়ামূর্তিটা মন দিয়ে কথা শুনছিল। শেষে সে বলল, আমাকে কি করতে হবে বলো?

—কি আর করবা। যদি কিছু ধার হিসাবে দিতে পার দাও। আমি শোধ দিয়ে দেব।

—টাকা আমি দিতে পারি কিন্তু তোমার কাছ থেকে ঘুরোণ নেব না। তুমি আমার কোথায় আছো তা আমি কি করে তোমাকে বোঝাব। লোকটা ব্যাকুল হয়ে উঠল মেয়েমানুষের হাতটাকে বুকের কাছে টেনে এনে।

হাত ছাড়িয়ে নিল না মহিলা। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, আর আসো না কেন? বউদি বুঝি মানা করেচে।

—তার মানা আমি শুনব না। সে কে? সে আমাকে ভালোবাসে না। লোকটির গলায় উত্তেজনা ছেয়ে গেল।

বউটি নির্দ্বিধায় বলল, বউদি বড়ো হিংসুটে। শুধু তাই নয়—দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। তোমার সাথে কথা বলি বলে আমাকে তো দু-চোখে দেখতে পারে না।

লোকটি সাদা জামার পকেট হাতড়ে পঁচিশ টাকা বউটির হাতে ধরিয়ে দিল।

বউটি টাকাটা স্পর্শ করে কেঁদে উঠল, আজ আমি ভিখিরি, অথচ একদিন আমার সব ছিল। আসলে কি জান, এসব হল ভগবানের মার। হরিয়া আমাকে জান দিয়ে ভালোবাসত, একদিন পুকুরে সে আমাকে ডুব দিয়ে জড়িয়ে ধরল। জলের মধ্যে আমি তাকে বাধা দিতে পারছি না। সে-ও আমাকে ছাড়বে না। দিলাম ওর হাত কামড়ে। দাঁত বসে গেল। শিরা কেটে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত। হরিয়া জলের উপর উঠে আমার দিকে ভ্যাল ভ্যাল করে তাকাল। ওর চোখে জল। আমাকে অভিশাপ দিল। তুই কুনোদিন সুখী হবি না। আমাকে কাঁদালি, তুইও কাঁদবি। হরিয়া চলে গেল। সেই থেকে আমি কাঁদছি।

—হরিয়াকে তো এখন আর দেখি না?

—সে আছে। তবে তার মাথার ঠিক নেই। আমার যেদিন বিয়ে হল সেদিনও মরতে গিয়েছিল। যমরাজ ওকে নেয়নি। আমবাগানে ফাঁস নিতে যাওয়ার সময় বাহ্যি করতে যাওয়া একজন মুরুব্বি তাকে দেখে ফেলে। সে-ই বাঁচায় তাকে। তারপর থেকে ও পাগল। রাত বেরাতে গান গেয়ে গেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ফেরে। জানো, ওর অভিশাপ আমার গায়ে লেগেছে। মাঝে সে আমার কাছে এসেছিল মদ খেতে। আমি ওকে ফিরিয়ে দিয়েছি। মহিলাটি চোখের জল মুছে নিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলল, এবার আমি যাই। ছেলেটাকে পড়শির ঘরে রেখে এসেছি। তুমি কবে আসবে। তুমি না এলে আমার মন কাঁদে।

বউটি চলে যাওয়ার পর লোকটি দেশলাই ঠুকে একটা বিড়ি ধরাল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে কি সব বিড়বিড় করতে করতে কোয়ার্টারের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

প্রথমেই গলার স্বর শুনে অবনীকে চিনতে পেরেছে শুভ। বউটিও তার চেনা, দাসপাড়ার স্বামী খেদানো পদ্ম। পদ্মর সাথে তার বাবার এই অযাচিত ঘনিষ্ঠতার কোনো অর্থ বুঝতে পারে না শুভ। মার ব্যবহারে বাবা যে তিতিবিরক্ত এটা সে টের পেয়েছে। মাঝে মাঝে মাকে তার নিষ্ঠুর বা পাথরের নারী বলে মনে হয়। মানুষ এত নির্দয়, হৃদয়হীন হয় কি করে? দয়ামায়া শরীর থেকে হারিয়ে গেলে মানুষের আর কি অবশিষ্ট থাকে?

পদ্ম অবনীকে দুর্দিনে ছায়া দেয়। এই ছায়াটাই ভালোবাসা। এই ভালোবাসা একদিন আগুন হয়ে জ্বালিয়ে দেবে সুস্থির সংসার। ভুসোকালির মতো সারা গায়ে জড়িয়ে যাবে কলঙ্ক। এত জেনেও মানুষ তবুও ভালোবাসে, ফাঁসে লটকান ঘুঘুপাখির মতো ছটফট করে।

আজ অবনীর সেই ছটফটানি প্রত্যক্ষ করেছে শুভ। পদ্মও বিচলিত ছিল নানা কারণে। হরিয়ার অভিশাপ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। হরিয়াকে সে আজও ভুলতে পারেনি।

হাবাগোবা অবনীকে শুভর এখন কেমন অন্যরকম লাগছে। ভালোবাসা কি তাহলে কদবেল গাছের আশেপাশে আত্মগোপন করে থাকা শ্বেতখরিস সাপ? এই শ্বেতখরিস সাপ কি সবার বুকের ভেতর ফণা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে? হাসপাতালের সামনে এসে শুভর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। সে দৌড়াতে দৌড়াতে হাজির হল ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারের সামনে। মাধুরীকে এত কঠিন কথা বলা তার উচিত হয়নি। মাধুরী দুঃখ পেয়েছে। সে কারোর দুঃখের কারণ হতে চায় না।

তার পৃথিবীতে সামান্য হলেও মাধুরীর একটা জায়গা আছে। সেই জায়গাটাকে সে কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না। যত দিন বাঁচবে, আগলে রাখবে যেমন নদীর জলকে আগলে রাখে পাড়, মাটি, শেকড় সমেত বৃক্ষ।

শুভ অধীর হয়ে ডাকল, মাধুরী, মাধুরী, আমিই-ই-ই-ই। দরজা খোল। ঘেরা বারান্দায় ঠোঁটে হাসি ফোটাল বনশ্রী, আয়, ঘরে আয়।

সংকোচের সঙ্গে শুভ বলল, আজ আর ঘরে ঢুকব না। মাধুরীর সঙ্গে দেখা করে চলে যাব।

—বাপস রে, এত কিসের তাড়া?

শুভ উত্তর না দিয়ে নীরব চোখে তাকাল।

বনশ্রী বললেন, তোদের মধ্যে কি হয়েছে রে? তোদের ওখান থেকে ফিরে মাধুরী একেবারে হুলো বেড়ালের মতো মুখ ফুলিয়ে বসে আছে।

—কিছু হয়নি তো!

—লুকাচ্ছিস? বনশ্রী চাপা গলায় শুধালেন, তোরা আজকালকার ছেলেমেয়েরা বড্ড বেশি নিজেদের চালাক ভাবিস—তাই না?

শুভ রীতিমতো অপ্রস্তুত, না, তা নয়। ওর সাথে আমার কিছু হয়নি। মাধুরী এত ভালো মেয়ে, ওর সাথে ঝগড়া করা যায় না।

—তাই নাকি? অদ্ভুত কায়দায় চোখ নাচালেন বনশ্রী, অথচ ঘরে ও প্রতি কথায় ঝগড়া করে। আমাকে মোটে পাত্তা দেয় না। আমি ওর মা। অথচ ওকে ঠিক বুঝতে পারি না।

কাউকে চেনা কি সহজ কথা? ভাবল শুভ। অবনীকে সে কি চিনত—আজ একটু আগে যেমন চিনল। রাত্রি চেনা সহজ, মানুষ চেনা কঠিন। সব মানুষের মনে হাজারটা জানলা থাকে। তার কোনোটা দিয়ে আলো আসে তো—অন্যটা দিয়ে অন্ধকার। এর হিসাব রাখা বড়ো কঠিন।

শুভর মাথাটা কেমন গুলিয়ে যায়। বনশ্রী জিজ্ঞাসা করেন, কি ভাবছিস? শুভর কথায় সারল্য ধরা পড়ে, মনে হচ্ছে এখন না এলে ভালো হত। কষ্ট হজম করা আমার অভ্যাস আছে, কিন্তু কাউকে অকারণে কষ্ট দিতে মন চায় না।

—বাঃ, বেশ বললি তো? বাংলায় কত পেয়েছিলি? বনশ্রী তির্যক চোখে বিঁধলেন।

শুভ মনে মনে বিরক্ত হলেও যথাযথ ধীর-স্থির কণ্ঠে বলল, তমালবাবু এবারও আমাকে হায়েস্ট দিয়েছেন। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রির চেয়েও বাংলা পড়তে আমার ভালো লাগে।

—তাহলে আর্টস নিয়ে পড়তে পারতি?

—আমার তো তাই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অমলকান্তি স্যার বললেন সায়েন্স নিতে।

—কী আশ্চর্য! নিজের ভবিষ্যৎ-এর কথা নিজে ভাববি তো? অন্যের মুখে ঝাল খেলে তোর কি ঝাল খাওয়া হয়ে গেল? বনশ্রীর চোখা চোখা প্রশ্নগুলো বিদ্ধ করছিল শুভকে।

সে মাথা সোজা করে বলল, সায়েন্স নিয়ে পাশ করলে তাড়াতাড়ি চাকরি পাওয়া যায়। হেড-মাস্টারমশাই প্রেয়ারের সময় বলছিলেন এখন সায়েন্সের বাজার।

—ওঃ, ঠিক আছে। বনশ্রী খুশি হলেন না জবাব শুনে।

শুভরও ভালো লাগছিল না, সে ঘাড় তুলে বলল, আমি এবার আসি।

—আসি মানে! তোকে ছেড়ে দিলে আজ সারারাত ও আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে। তুই ওর সাথে একটু দেখা করে যা।

—আমি তো দেখা করতেই এসেছিলাম। শুভ নিঃশ্বাস ছাড়ল।

বনশ্রী কিছু বলার আগেই খাট থেকে নেমে এল মাধুরী। তার ঢুলুঢুলু চোখ। যেন ঘুম থেকে

উঠে এল। চুল বাঁধা নেই, কাঁধের উপর ছড়ানো। লম্বা চুলগুলো রাত হয়ে শুয়ে আছে। বনশ্রী যাওয়ার আগে বললেন, তোরা বসে গল্প কর। আমি দুধ দিয়ে সিমাই করে আনি। শুভ কতদিন পরে এসেছে বল তো?

অন্ধকারেরও চোখ ধাঁধানো রূপ থাকে। মাধুরীর ফোলা গালে তখনও শেষ বিকেলের রোদের মতো লেপটে আছে অভিমান। সে ভারিক্কী গলায় শুধালো, তুই কেন এসেছিস?

—খুব মন খারাপ করছিল, তাই। শুভ কিছু লুকাল না।

—আমার জন্য তোর মন খারাপ করছে—হাসালি।

—এতে হাসির কি হল? কারোর জন্য কারোর বুঝি মন খারাপ করতে নেই?

মাধুরী বিস্ময়ে ঠোঁট কামড়াল, তোর মন বলে কোনো বস্তু আছে? আমার তো মনে হয় তুই পাথর।

—দ্যাখ, ঝগড়া করবি না, আমি ঝগড়া করতে আসিনি। শুভ বোঝাতে চাইল। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল মাধুরী, আর ন্যাকা সাজিস না। তোর মনের কথা আমি জেনে গিয়েছি।

কথা শুনে চোখের তারা কেঁপে উঠল শুভর। মাধুরী কি জেনেছে? শুভ যে প্রথম থেকে মাধুরীর উপর দুর্বল—এটা ক্লাসের সবাই জানে। এই নিয়ে অনেকে আড়ালে হাসাহাসি করে। শুভ মুখ বুজে থাকে। অনেক মানুষ হাওয়া অফিসের মতো আগাম সব কিছু জেনে যায়।

শুভর চোখ চকচক করছিল হ্যারিকেনের আলোয়, তুই এত মুখ ভার করে থাকলে আমার কিছু ভালো লাগে না। আমি যাচ্ছি।

ব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে শুভ পা বাড়াতে গেল। মাধুরী এগিয়ে এসে তার হাত চেপে ধরে, কপট রাগে গালে টোল ফেলে বলে, যা দেখি, তোর সাহস কত! হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে শুভকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল মাধুরী, চাপা গলায় বলল, অনেকক্ষণ ধরে তোর অত্যাচার সহ্য করছি, আর কিন্তু করব না। চুপচাপ ভালোছেলের মতো চেয়ারটায় বস। তোর কি কি প্রশ্ন আছে আমাকে বল।

শুভ বলল, আমি পরীক্ষা নিতে আসিনি। আমি এসেছিলাম তোকে দেখতে।

—ভালো কথা, চোখ ভরে দেখে নে। ছাপা ফ্রকটা টেনেটুনে, ডল পুতুলের মতো হাত ছড়িয়ে দাঁড়াল মাধুরী, নে, এবার যত খুশি দেখে নে। তুই ভাবছিস আমি মরে যাব। আমি অত সহজে মরব না। তুই মিলিয়ে নিস আমার কথাটা।

—আজ তোর কি হয়েছে বল তো, সেই সকাল থেকে শুধু মরা-মরা করছিস!

শুভর কথায় ফণা তোলা সাপের মতো মাথা নামিয়ে নিল মাধুরী। শুভ ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না, কি বলতে কি বলে ফেলেছি। সেই থেকে অনুশোচনায় জ্বলছি। তুই আমাকে ক্ষমা করে দে। মাধুরী অনড় গলায় বলল, ক্ষমা তো তোর কাছে আমারই চাওয়া উচিত। আমরা স্বার্থপরের মতো তোদের ফেলে চলে গেলাম। কাজটা ভালো হয়নি। এই নিয়ে আমার আফসোসের শেষ নেই। মাধুরী এগিয়ে এল শুভর কাছে, তর্জনী দিয়ে থুতনী তুলে বলল, আমার দিকে তাকা। আমাকে কি তোর ভয়াল, ভীষণ বন্যা বলে মনে হয়?

শুভ চুপ করে থাকল।

অসহ্য লাগতে মাধুরী বলল, চুপ করে থাকবি না। উত্তর দে।

মাধুরী জোর করতেই শুভ আধভাঙা স্বরে বলল, আকাশ আছে বলে তো চাঁদ-সূর্য খেলতে পারে। আকাশ হল তারা-নক্ষত্রদের ঘরবাড়ি। আমার মনে হয় এক একটা ভালো মানুষ এক একটা তারা। তবে তোকে আমি তারা ভাবি না। তুই—।

আমি কি তাহলে? বল, তোকে বলতেই হবে। মাধুরী একরকম চেঁচিয়ে উঠল।

শুভ ঝকঝকে গলায় বলল, তুই তো আকাশের চাঁদ। তাই সবাই তোকে হা করে দেখতে থাকে।

—কেউ দেখলে আমি কি করব?

—তুই অত সাজবি না। ব্যস, মিটে গেল ঝামেলা।

—অত সহজ নয় রে! আবার ঠোঁট ওল্টাল মাধুরী,আমি এখন বড়ো হচ্ছি। মা কি বলে জানিস? স্কুল যাবার সময় আমি যেন মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটি। শুভ হাসল, তাহলে তো ঠোক্কর খাবি!

—মেয়েরা তো ঠোক্কর খেতে খেতে বড়ো হয়। মাধুরী কেমন নিরীহ চোখে তাকাল। বাইরে একটা নেড়িকুকুর বিশ্রি গলায় ডাকছিল। টানা সেই স্বরটা অবিকল শ্মশান কুকুরগুলোর মতো। যা শুনলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

মাধুরী ভয় পেয়ে বলল, তোকে তো আবার কোয়ার্টারে ফিরতে হবে। যা বলার তাড়াতাড়ি বল।

—বলছিলাম কি, তুই কি আমার উপর খুব রেগে আছিস? আত্মসমর্পণের চোখে তাকাল শুভ।

আলতো হেসে মাধুরী মায়াবী স্বরে বলল, শুভ এইটুকু কথা বলার জন্য রাত মাথায় নিয়ে চলে এলি? তোর কি মাথায় ছিট আছে?

কথাগুলো খারাপ শুনতে লাগলেও খুব খারাপ লাগে না শুভর। অন্য কেউ এমন ঠেস দেওয়া কথা বললে সে খুব রেগে যেত। তাকে ছেড়ে কথা বলত না। দু'চারটে কথা অবশ্যই শুনিয়ে ছেড়ে দিত। তার সঙ্গে মাধুরীর হিসাবটাই অন্য যা ক্লাসের অন্য কেউ টের পায় না।

হাওয়ায় পর্দা উড়ছিল জানলার, মাধুরী জানলার দিকে মুখ করে তাকিয়ে ছিল বাইরের দিকে, চাপ বাঁধা ঘন অন্ধকারের কাছে বারবার হেরে যাচ্ছিল চোখের দৃষ্টি। মাধুরী আর কারোর কাছে হারবে না। শুভ তাকে রোজ রোজ হারিয়ে দেবে এমন হয় না। গলা চড়িয়ে সে বলল, ইস্কুল কবে খুলবে বলতে পারিস? ঘরে আর মন বসছে না।

শুভ ভেবে নিল, তারপর বলল, এখনও সবাই ঘরে ফিরে যায়নি। বন্যার ঘা কি সহজে শুকায় বল?

—জানি না। মাধুরী মুখ ফিরিয়ে নিল।

শুভ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, রাত হচ্ছে, এখন আমি যাই। কাল আবার তোর সাথে দেখা করে যাব।

—মা যে তোর জন্য টিফিন বানাতে রান্না ঘরে গিয়েছে।

—ওঃ, হো! আফসোস ভাসিয়ে দিল শুভ, ঠিক আছে, আর একটু অপেক্ষা করে যাই।

দুটো সাদা প্লেটে সিমাই নিয়ে ঘরে ঢুকলেন বনশ্রী। শুভর দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে হাসি মাখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোদের রাগ পড়েছে? দু'জনেই চুপ করে থাকল, উত্তর দিল না কেউ। বড়োদের এই আদিখ্যেতা মন থেকে মেনে নেওয়া যায় না। ওঁদের সব কথাতে হয় উপদেশ না হয় তিরস্কার-সহ খোঁচা। যুগটা যে পালটাচ্ছে তা ওঁরা বুঝতে চায় না। এরা সবাই বুঝি পিছিয়ে পড়া মানুষ?

মাধুরী বিরক্তি চেপে বলল, মা, তুমি যাবে?

—কেন আমি থাকলে তোদের কি অসুবিধে? আমি তো কারোর পাকা ধানে মই দিচ্ছি না।

গজগজ করতে করতে চলে গেলেন বনশ্রী।

দ্রুত সিমাই খেয়ে শুভ বলল, এবার আমি আসি।

—যাবি? সত্যি? নরম দৃষ্টি মেলে কাতর কবুতরের মতো তাকাল মাধুরী। তারপর ঠোঁটে হাসি ভরিয়ে বলল, তোর হাতটা একটু ধরব?

—তুই কি পাগল হলি?

আহত হল মাধুরী, চেঁচিয়ে বলল, হ্যাঁ, হয়েছি। তাতে তোর কি?

—ঠিক আছে,নে। দু'হাত পদ্মপাতার মতো মাধুরীর সামনে বিছিয়ে দিল শুভ। মাধুরী কি করবে—বুঝতে পারল না। হাত দুটো মুঠো করে ধরে বুকের কাছে আনতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর একসময় নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তোদের ফেলে আমাদের এভাবে চলে যাওয়াটা উচিত হয়নি। আমার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। শুভ, তুই বল—আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিস? বিশ্বাস কর, তোর কথা ভেবে আমি ক'রাত যে ঘুমাই নি। আচ্ছা, আমার কেন এমন হয় বলতো!

—তোর আবেগটা বেশি।

—ধুর, আবেগ নয়রে, আমার রক্তটাই অন্য!

—আমি এসব কিছু জানি না। শুভ ঘরের দিকে পা বাড়ালে মাধুরী আবার তার হাতটা শক্তভাবে চেপে ধরে, দাঁড়া। আমি এক্ষুনি আসছি।

মাধুরী এক ঘর থেকে অন্য ঘরে চলে গেল। ফিরে এল টর্চ-লাইট হাতে নিয়ে। অবশেষে কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, সাবধানে যাবি। আজ অনেক কথা বলার ছিল, বলা হল না। দেখি, চিঠি দিয়ে যদি জানাতে পারি। মাধুরীর কথাগুলো যেন উত্তরের বাতাস, কেঁপে গেল শুভ। টর্চ লাইটটা হাতে নিয়ে সে বলল, ভালো থাকিস, তুই ভালো থাকলে আমিও ভালো থাকব—বুঝলি? ঘাড় নেড়ে অন্ধকারে শুকতারা হয়ে গেল মাধুরী।

মনে খুশির হাজার ঢেউ। টর্চ জ্বেলে পথ হাঁটছিল শুভ। সারাটা পথ মাধুরী তার সঙ্গে আছে। স্মৃতির জাবর কাটা আর শেষ হয় না।

ঘরে পৌঁছাতেই সরস্বতী বলল, এত দেরি করলি, আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল।

—আমি মাধুরীদের বাড়ি হয়ে এলাম।

—ভালো করেছিস। মেয়েটা যাওয়ার সময় কেমন ভেজা-ভেজা মুখ করে চলে গেল। আমার ভালো লাগেনি। তখনই ভেবেছিলাম, তুই ঘরে আসলে ওর কাছে পাঠাব। সরস্বতী আশ্বস্ত চোখে তাকাল।

শুভ অবনীকে খুঁজছিল। ঘরে না দেখে তার মনে দানা বেঁধে উঠল সন্দেহ। বাবা আবার পদ্মর কাছে চলে গেল নাতো? কোনো বিশ্বাস নেই মানুষটাকে। যে মানুষটা ভালোবাসায় অন্ধ, সে তো অন্ধকারেও পথ দেখতে পায়।

শুভ অবনীকে মন থেকে মুছে দিতে পারল না। টানা শ্বাস নিয়ে শুধালো, মা, বাবা কোথায়?

—আমাকে কিছু বলে যায়নি। নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়াল সরস্বতী। কিছু সময়ের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে।

জয়কিষাণ আজই দশটার বাসে সদর থেকে ফিরেছে। দুলারী বন্যার আগে হাসপাতালে ছিল না। প্রায়ই ছুটি নিয়ে কৃষ্ণনগরে চলে যায়। এই গ্রামে তার নাকি মন বসে না।

জয়কিষাণ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বারান্দায় দাঁড়াল, চিৎকার করে বলল, শুভ বেটা, এ শুভ বেটা বাইরে আয়। তোর বাপকে সাপে কেটেচে।

সাপ শব্দটায় একটা কিলবিলান, রুদ্ধশ্বাস ভয় কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে থাকে। শুভ বাক্যহারা চোখে তাকাল। তার মুখের কথা হারিয়ে গেল, সে ভ্যালভেলিয়ে জয়কিষাণের মুখের দিকে হকচকিয়ে তাকাল। হৃৎপিন্ডের ধুকধুকানি বেড়ে গেল শতগুণ।

—তোর মা কুথায়? জয়কিষাণের প্রশ্ন শেষ হল না, রান্নাঘর থেকে ঝড়ের বেগে বারান্দায় ছুটে এল সরস্বতী, দাদা, সে কোথায়? কিভাবে সাপে কাটল তাকে?

হাঁপাচ্ছিল সরস্বতী। জয়কিষাণ ঠাণ্ডা গলায় বলল, অত চিন্তা করার কিছু নেই। তোমরা আমার সাথে চল। ডাক্তারবাবু হাসপাতালে এসেছেন। দাবাই ইনজেশন সব চলছে।

তবু আশ্বস্ত হতে পারে না সরস্বতী। তার বুকের ব্যাঙ লাফানিটা বাড়ছে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শুভর চোখের তারা কেঁপে উঠল। ব্যস্ত হয়ে সে বলল, মা, আমি যাচ্ছি। তুমি কাকুর সঙ্গে এসো। অনুমতির অপেক্ষা করল না সে। অন্ধকারে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ইঁদুরে গর্ত করে, সাপে তা ভোগ করে। চুনারামদাদুর কথাগুলো মনে পড়ল তার। এসময় রঘুনাথ তার পাশে থাকলে মনের সাহস বাড়ত। ওদের গাঁয়ে ভালো ওঝা আছে। সুফল ওঝার নাম দশ গ্রামের মানুষ জানে। সে নাকি সাপেকাটা মানুষ ঝাড়-ফুঁকে সরিয়ে তোলে। এমন অনেক গল্প সে নানান মানুষের মুখে শুনেছে। শোনা কথায় বিশ্বাস কি। যেসব কথা মানুষের মুখে মুখে ঘোরে সেসব কথায় বিশ্বাসের মাটি কতটা এ নিয়ে শুভর মনে বরাবরের সংশয় আছে। ওঝা গুণিনের উপর তার একেবারে আস্থা নেই। তবু অবনী বাধ্য করায় তাকে এসব শোনার জন্য।

এখনও কারেন্ট আসেনি হাসপাতালে। কথা চলছে মাস ছ'য়েকের মধ্যে সুইচ টিপলে আলো জ্বলবে। মাঠে মাঠে শাল খুঁটি পুঁতছে ঠিকেদারের লোক। দিন রাত খাম্বা পোঁতার কাজ চলছে। তিনটে হ্যারিকেনের আলোতে এত বড়ো হাসপাতালের কোণে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার দূর হয় না। ম্যাড়মেড়ে অন্ধকার সাদা-কালোয় মিলেমিশে থাকা ভেড়ার লোমের মতো শুয়ে আছে আনাচে-কানাচে। শুভ হন্তদন্ত হয়ে টানা বারান্দা পেরিয়ে ও.টি.র ভেতর ঢুকে গেল। বন্যার পর হাসপাতালের চেহারাটা বদলে গিয়েছে অনেকটাই। এখনও জলের গন্ধ প্রায়ই নাকে এসে লাগে। মাঝে মাঝে আঁশটে গন্ধ ভেসে আসে। তখনই গা গুলিয়ে ওঠে ডলি দিদিমণির। তার যুবতী রসালুর মতো শরীর পাঁকমোড়া দিয়ে ওঠে ঘেন্নায়।

শুভ দেখল ও.টি. ফাঁকা। হাই-বেঞ্চে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। লাল আলো ছড়িয়ে। শুধু ডিউটিরুমে জনা চারেক মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। ওরা নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলছিল। সিস্টারদের চেয়ারটায় গা হেলান দিয়ে বসে আছেন ডাক্তারবাবু। তাঁর পরনে পায়জামা, গায়ে সাদা হাফ-হাতা জামা, জামার উপরে গাঢ় নস্যি রঙের একটা হাফ-হাতা সোয়েটার।

ডলি দিদিমণি শুভকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন, আয়।

—বাবা কোথায় পিসি? শুভর কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা।

ডলি দিদিমণি তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, অবনীদা বাথরুমে গিয়েছে। একা যায়নি, সঙ্গে তোর সুবীরকাকু গিয়েছে। তোদের কে খবর দিল?

—জয়কিষাণ কাকু কোয়ার্টারে গিয়েছিল। তার মুখে শুনলাম।

—তোর মা আসেনি?

—মা ঘর বন্ধ করে আসছে।

—শোন শুভ, অত চিন্তা করার কিছু নেই। তুই চুপচাপ বোস। ডলি দিদিমণি বসবার জন্য একটা কাঠের বাক্স দেখিয়ে দিলেন। শুভ বসল না, দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। মনে কত রকমের চিন্তা এসে ভিড় করছে। এই হাসপাতালে সে দেখেছিল হরিনাথপুরের একটা বউকে চোখের সামনে মরে যেতে। ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে কামড়েছিল বউটাকে। একেবারে কাঁধের কাছে কামড়ে দেয় সাপটা। কামড়ে দিয়েই সাপটা ঢুকে যায় দেওয়ালের ফাঁকে। জ্বালাপোড়া করতেই ঘুম ভেঙে বউটা শুধু সাপের লেজটাকে দেখে। ভয়ে তার জিভ শুকিয়ে যাবার উপক্রম হয়। ঘরের লোক তাকে বাঁধন দিতে পারে না। কাঁধে কামড়ালে বাঁধন দেবে কোথায়? ফলে খাটিয়ায় করে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল তারা।

হাসপাতালে সব রকম চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না বউটাকে। শেষের দিকে কথা জড়িয়ে গিয়েছিল তার। সারা শরীর ভেঙে ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতা। কেউ বুঝি জিভ টেনে ধরছিল ভেতরের দিকে। মুখের দু'পাশে গ্যাঁজলা উঠিয়ে বউটা চিরকালের জন্য চোখ বুজল। এই দৃশ্য অনেক দিন আগের, তবু এখনও মনে পড়ে শুভর। সেদিনের সেই দৃশ্যটা আজ কেন মনে পড়ছে বারবার।

ডলি দিদিমণি অভয় দিয়ে বললেন, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। যতদূর মনে হচ্ছে অবনীদাকে বিষাক্ত সাপে কামড়ায়নি। পায়জোনাল সাপের দাঁত খুব ছুচলো। ওরা কামড়ালে মাংস তুলে নেয় না। শুধু ছোট ছোট ফুটো হয়। সেটাই মারাত্মক। অবনীদার বেলায় দেখলাম সবটাই উল্টো। ক্ষতস্থানে বেশ রক্ত দেখলাম। ডাক্তারবাবু এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, অবশেষে ডলি দিদিমণির বক্তব্যকে তিনি সমর্থন করলেন, চিন্তা করিস নে। দু-তিন ঘণ্টা অবজারভেশনে রেখে ছেড়ে দেব। শুধু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। দেখবি—তোর বাবা যেন ঘুমিয়ে না যায়। চেয়ারে হাতলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, হাই তুলে বললেন, আমি এখন আসি সিস্টার। অ্যাবনরম্যাল কিছু দেখলে সুবীরকে কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেবেন। আমি দশটা অবধি জেগে থাকব।

ডাক্তারবাবু নিঃশব্দে চলে যাওয়ার পর শুভর মুখে রাত্রির যাবতীয় অন্ধকার বিছিয়ে গেল। আর তখনি চিৎকার করতে করতে আলুথালু শরীরে ডিউটিরুমে ঢুকে এল সরস্বতী। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করল, ও কোথায় গেল দিদিমণি, ভালো আছে তো?

সরস্বতীর চোখের জল হেমন্তের কুয়াশার চেয়েও ভারী হয়ে নেমে এল। ডলি দিদিমণি নিস্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। তুমি চুপচাপ বসো তো বৌদি। ডাক্তারবাবু সব দেখেছেন। উনি নিশ্চিন্ত হয়ে কোয়ার্টারে এই মাত্র ফিরে গেলেন।

তবু মনের দিক থেকে শান্ত হতে পারছিল না সরস্বতী, নিজেকে শান্ত করার সবরকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল সে। নাড়ি-কাঁপানো টানটা এই মুহূর্তে উন্মুক্ত হয়ে উঠল ভেজা মাটির বুক থেকে উঁকি দেওয়া অন্ধকারের মতো। ঝগড়াঝাটি, মানসিক টানাপোড়েন ভুলে সে অবনীর আরোগ্য কামনায় অস্থির হয়ে উঠল।

টলমল পায়ে বাথরুম থেকে ফিরে এল অবনী। তার সঙ্গে সুবীর। সরস্বতী ক'পা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এখন কেমন বুঝছো গো?

ভয়ের রেণুগুলো এখন অবনীর দু'চোখ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে, ম্লান হেসে সে কোনোমতে বলল, ভয়ের কোনো কারণ নেই। এক ঘণ্টা হয়ে গেল। মনে হচ্ছে ঢোঁড়া।

—ঢোঁড়া হোক আর হেলে হোক সাপ তো সাপই। সরস্বতী কটাক্ষর চোখে তাকাল।

অবনী আশাহত হল। এই সময় সে সমবেদনা আশা করেছিল। সরস্বতীর মনমেজাজ বোঝা দায়। ওর জোয়ার-ভাঁটা খেলা মন। বোঝা যায় না। বিরক্তিতে মুখ নামিয়ে নিল অবনী।

অবনীর দুর্বলতায় ক্ষুর হয়ে ওঠে সরস্বতীর ঠোঁট, স্থান কাল পাত্র ভুলে বিরক্তির সঙ্গে সে বলল, পথ হাঁটার সময় কি চোখ কপালে তুলে হাঁটো। রাস্তাঘাট দেখে শুনে হাঁটতে হয় জানো না বুঝি? আজ যদি ঢোঁড়া না হয়ে খরিস হত তাহলে?

—চলে যেতাম। ভালো হত। কাটা ঘুড়ির মতো লাট খাওয়া গলায় বলল অবনী।

—তুমি তো চলে যেতে, আমাদের কি হত? সরস্বতী ঝাঁঝিয়ে উঠল।

—আঃ, থামবে বৌদি! এটা হাসপাতাল, ঘর নয়। ডলি দিদিমণি ধমক দিয়ে উঠলেন সরস্বতীকে। ধমক খেয়ে সরস্বতী কেমন নিরীহ চোখে তাকাল, দু'দণ্ড তাকিয়ে থাকার পর ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল সে, ওর জন্য আমার জীবনটাই শেষ হয়ে গেল। ও আমার মরামুখ না দেখে শান্তি পাবে না। আপনারা জানেন না দিদি, ও কি ভয়ঙ্কর মানুষ। ওর মতো ঘরজ্বালানী পরভুলানী মানুষ খুব কম আছে।

—বৌদি, প্লিজ চুপ করো। ডলি দিদিমণির কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল উত্তেজনায়। শুভর অসহ্য লাগছিল এসব নাটক। চোয়ালে চোয়াল ঘষে সে চাপা অথচ গম্ভীরভাবে বলল, মা, চুপ করো। আর ভালো লাগছে না!

পাশের কোয়ার্টারের সুবীর জ্ঞান দিয়ে বলল, বৌদি, বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ নাও। এখন অশান্তি করলে লোক হাসবে। এমনিতে আমরা ছোট পোস্টে কাজ করি। কত লোকে কত কথা বলে তার জন্য।

একরকম চাপে পড়ে মুখে কুলুপ আঁটল সরস্বতী। অবনী আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো চেষ্টা করল না, টুলের উপর মুখ ঝুঁকিয়ে বসে থাকল চুপচাপ। ডলি দিদিমণি একবার মুখ তুলে দেওয়ালের পেন্ডুলাম ঘড়িটার দিকে তাকালেন, সময় দেখে অবনীকে শুধোলেন, তোমার কি ঘুম ঘুম পাচ্ছে অবনীদা? ঘুম পেলে বলো। ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে হবে তাহলে।

অবনী না-সূচক ঘাড় নাড়তেই আশ্বস্ত হলেন তিনি। তারপর আপনমনে বললেন, ভগবানকে অনেক ধন্যবাদ ফাঁড়াটা অন্যের উপর দিয়ে গেল।

সুবীর ওস্তাদি দেখিয়ে বলল, ঢোঁড়াসাপে কামড়ালেও বিষ হয় দিদি। শনি-মঙ্গলবারে সব সাপেরই বিষ হয়। শুনেছি ঢোঁড়াসাপ কামড়ালে গোবর ছোঁয়া নিষেধ।

কেন? ডলি দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন কৌতূহলবশত।

সুবীর চোখ মটকে হাসল, বিষ কেন হয় জানেন না বুঝি? সেই যে অমৃত মন্থনের সময় ঢোঁড়া সাপ বিষ নিয়ে গিয়ে গোবরে লুকিয়ে রেখেছিল—সেই জন্য। পরে গিয়ে দেখে সব বিষ গোবরে মিশে গিয়েচে। আর কিছু করার নেই। সেদিন থেকে ঢোঁড়াসাপ বিষহীন বুঝলেন?

ডলি দিদিমণি হয়ত এই গল্পটা জানতেন তাই হালকা হেসে বললেন, রাতের বেলায় আর সাপের গল্প করে লাভ নেই। এবার অন্য কথা বলো।

সুবীর কথা হাতড়াচ্ছিল। শুভ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, কাকু, বাবা কখন বাড়ি যাবে?

—দশটা না বাজলে যাওয়া উচিত হবে না। সুবীর জোর দিয়ে বলল।

সরস্বতীর অসহ্য লাগছিল, সে শুভর দিকে কটমট করে তাকাল, বসে থাকলে কি গা চুলকাচ্ছে? চুপচাপ থাক। ঘরে কি হাতি ঘোড়া বাঁধা আছে যে যাবার জন্য লাফাচ্ছিস? কথা শুনে মেজাজ গরম হয়ে গেলেও শুভ আহত চোখে তাকাল। মায়ের ব্যবহার দিন দিন বিশ্রি হয়ে যাচ্ছে।

সবার সামনে কিভাবে কথা বলতে হয় সেই শিক্ষাটাই বুঝি ভুলতে বসেছে। কোনোরকম তর্কের মধ্যে না গিয়ে শুভ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কাচের ওপিঠে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই। এখন পৃথিবী জুড়ে শুধু তরল অন্ধকার, আঁধার সমুদ্র।

হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পথে মরা চাঁদের ক্ষীণ জ্যোৎস্না বাসি সজনে ফুলের মতো নিঃশব্দে ঝরে পড়ছিল। ঠাণ্ডা বাতাসে মন খারাপের কোনো ভাইরাস বেঁচে ছিল না। বাড়ির কাছে পৌঁছে অবনী অন্ধকারকে শুনিয়ে বিড়বিড়িয়ে বলল, যাক, এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম।

বাঁধের ধারে একটাই পলাশগাছ। বেঁটে খাটো গাছটার গাম্ভীর্যই আলাদা। বকফুলের মতো কুঁড়ি এসেছে শাখা প্রশাখায়। শীত চলে যাবার পর রঘুনাথ এই গাছটার দিকে অবাক করা চোখে তাকায়। বালিকা থেকে কিশোরী হওয়ার সৌন্দর্য গাছটার সর্বশরীরে ছড়িয়ে আছে। আর ক'দিন পরে কনে বউয়ের মতো সেজে উঠবে পলাশরঙে। পাতা ঝরার দিন শেষ হচ্ছে দিনে দিনে।

অনেকদিন পরে বাঁশিটা চাল থেকে নিয়ে এসে রঘুনাথ বাঁধের ধারে পা ছড়িয়ে বসল। অনভ্যাসে অব্যবহারে ধুলো জমে গিয়েছে বাঁশির ছিদ্রে। অথচ এই বাঁশি তার কত সখের ছিল। চুনারাম ছাতার বাঁট কেটে শিক গরম করে বানিয়েছে এই বাঁশি। প্রতিটি ছিদ্র তৈরির সময় তার যত্নের শেষ ছিল না। পাশে বসে অবাক চোখে রঘুনাথ দেখেছিল সেসব।

যৌবনে শখের যাত্রায় নাম লিখিয়েছিল চুনারাম। ডাক আসলে ভিনগাঁয়ে যেত যাত্রা করতে নামমাত্র টাকায়। যাত্রাদলে থেকেই বাঁশিটা শিখেছিল চুনারাম। শখের যাত্রার দিন শেষ হয়ে গেল কলকাতার যাত্রার আগ্রাসী থাবায়। সব দিকে পিছিয়ে গেল গ্রামীণ যাত্রা।

মনের দুঃখে চুনারাম বাঁশি বাজাত বুড়িগাঙের ধারে ধারে। তার সেই বাঁশির সুর ছাড়িয়ে যেত আখখেতে। আখখেত ছাড়িয়ে সুর ছুটে যেত কমলাবেড়িয়া, সুজাপুর, নারাণপুর। এখন আর বুড়ো গালে ফুঁ ধরে না চুনারামের।

রঘুনাথকে সে মন দিয়ে বাঁশিটা শিখিয়েছিল। বাঁশিকে ভালোবাসত ছেলেটা। সারাদিন বনবাদাড়ে টো-টো করে বাঁশি হাতে ঘুরত। কমলা মুখে হাসি ভরিয়ে বলত, তোমার বাঁশি কথা বলে গো! কত সোন্দর সুর তোমার ফুঁয়ে ফুঁয়ে।

কমলার হাসির মতো বাঁশিও মুগ্ধ করত রঘুনাথকে। দুর্গামণি সতর্ক করে বলত, দিনের বেলায় বাঁশি বাজাবিনে বাপ। অধর্ম হয়।

সুরে আবার কিসের অধর্ম? এ জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর পেত না রঘুনাথ। চুনারাম হাসত, বাঁশিকে ভালো না বাসলে সে তুরে সুর দিবে নি। সুর হল মেয়ে মানুষের মন গো! যদি সে বুঝতে পারে কেউ তারে অবহেলা করচে তাহলে সে সাতজন্মেও ধরা দিবেনি দাদুভাই।

পলাশ গাছের কুঁড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন উদাস হয়ে গেল রঘুনাথ। বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে সুর ভাসাল পণ্ডিত বিলের জলের দিকে। দীর্ঘ সময় ধরে একমনে বেজে চলল বাঁশি। চোয়াল আর গালের কাছটা শক্ত হয়ে উঠছিল রঘুনাথের। হঠাৎ-ই বাঁশি থেমে গেল তার। কাকার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। এই পলাশ গাছের কাছে লুলারামকে কারা যেন পিটিয়েছিল বেধড়ক। শুধু

মার নয়, হাত-পা দুটোই ভেঙে দেয় ওরা। সারারাত শীতজল ছোঁয়ায় কোনোমতে বেঁচেছিল লুলারাম। সেদিন সে আত্মগোপন পর্ব শেষ করে লালগোলা থেকে বাড়ি ফিরছিল। তখন রাত অনেক। সঙ্গে টাকাপয়সা, মালপত্তর। সব কেড়ে নিল গভীর রাতের ছিনতাইবাজরা। ওদের মুখ ঢাকা ছিল গামছায় ফলে লুলারাম দলের কাউকেই চিনতে পারেনি। তাহলে কি দলটা জানত লুলারাম ফিরছে!

আশেপাশের গ্রামে লুলারামের শত্রুর কোনো অভাব ছিল না। স্বভাবদোষে সে সবার চোখের বালি। সবাই আড়ালে ফুঁসত কিন্তু মুখের উপর কেউ কিছু বলত না। আসলে বলার ক্ষমতা ছিল না ওদের। অনেকেই তার ডাকাত দলের খবরাখবর রাখত। লুলারামের হিংস্রতা অনেকেই জেনে গিয়েছিল অল্পদিনে। পরকে জ্বালালে নিজের জ্বলন অনিবার্য। সেদিন লুলারাম ভেবেছিল রাতের আঁধারে চুপি চুপি সে গ্রামে ঢুকে যাবে। সকাল হলে সবাই তাকে দেখলে কোনো ক্ষতি নেই। এটা সেটা কিছু একটা বুঝিয়ে বলে দিলেই হল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, বিধি করে আর এক।

শেষপর্যন্ত গোরুর পাল খেদাতে নিয়ে যাওয়া রাখালগুলো অচৈতন্য অবস্থায় পলাশতলায় পড়ে থাকতে দেখে লুলারামকে। তাদেরই একজন মাথায় গামছা বেঁধে পাঁচন নিয়ে দৌড়ায়। গাঁয়ে খবর দেয়। খবর পায় রঘুনাথ। দলবল নিয়ে সে পড়ি মড়ি করে ছুটে যায় শিমুল গাছটার কাছে। তারপর ধীরে ধীরে সব খোলসা হয়। সর্বস্ব হারিয়ে লুলারাম চুল চেপে ধরে কোঁকাচ্ছিল। হাত-পা ভাঙা নড়াচড়ার তার ক্ষমতা নেই।

চুনারাম তার শোচনীয় অবস্থা দেখে বলল, এ ভাঙা হাড় হাড়জোড় গাছের পাতায় ভালো হবেনি। এরে ঝটপট হাসপাতালে নিয়ে যাও। নাহলে এরে বাঁচানো যাবেনি। কথা সত্যি। সদর থেকে হাত-পায়ে প্লাস্টার করে, ওজন বাড়িয়ে ফিরে এসেছে লুলারাম। এখন সে নড়তে-চড়তে পারেনা। রঘুনাথ গিয়ে মাঝেসাঝে তাকে দেখে আসে। লুলারাম তখন বিছানায় শুয়ে নাঁকি সুরে কাঁদে। রঘুনাথকে বলে, হরিনাথপুরের সার দোকান থিকে বিষ এনে দে বাপ, খেয়ে মরি। এ জেবন আর টানতে ভালো লাগচে না।

কখনও সে ফোঁপায়, অনুশোচনায় ডুকরে ওঠে, কাতর হয়ে বলে, দাদার কাচে লিয়ে চল। তার মতুন মানুষ হয় না। সে আগে চলে গেল। আমি এখুন বসে বসে ডাল ভানচি।

গাঁয়ের কম বেশি সবাই এসে লুলারামকে দেখে গিয়েছে। ভূষণী বুড়ি এসেছিল সবার শেষে। সে এসে দগদগে ঘায়ে আঙুল ঢুকিয়ে দিল। হাসতে হাসতে বাণ মারল, হ্যাঁরে বাপ, সবাই এলো, ঝারি কি এসেছিল?

বুড়িটা কি বলতে চায়? বাজিয়ে দেখছে নাকি? নাকি পরখ করতে চায় এখনও টান আছে নাকি? লুলারাম ভূষণীবুড়ির প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। ঝারি তার সুখ নিয়ে সরে গেছে। মুঠো মুঠো স্মৃতি আর দুঃখ দিয়ে গিয়েছে লুলারামকে। সেই গা-চিমটান দুঃখের কথা সে ভুলবে কিভাবে? তার অত মনের জোর নেই। তার মন তো পলকা বাঁশের ঠেক।

প্রায়ই লুলারাম শুয়ে শুয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে। সে তখন খুব যত্ন সহকারে ঝারির মুখটা দেখতে চায়। তার পালিয়ে যাওয়ার পেছনে ঝারির অদৃশ্য চাহনি ছিল। বউটার উপেক্ষাই তার কাল হল। ওই অপমানের ফাঁদ ছিঁড়ে বেরতে পারল না সে।

মনে মনে জ্বলছিল। শুরু হয়েছিল নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই দীর্ঘ সময় ধরে। ভিকনাথকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিত সে, শুধু ঝারির জন্য পারল না। ভিকনাথ সরে গেলেও তার সমস্যার

সমাধান হত না। ঝারির হয়ত শরীর পেত কিন্তু মন পেত না। সোনার মন না পেলে পচা কুমড়োর এই দেহ নিয়ে কি লাভ। সে ভালোবাসার কাঙাল। কেউ তাকে ভিক্ষে দিল না। ভেবেছিল—ঝারি তাকে ছায়া দেবে। মিথ্যে, সব মিথ্যে। ঝারি এখন কাঁটার ঝোপে ফুটে থাকা ফুল। কাছে যাওয়া যায় না, ছুঁয়ে দেখা তো দূরের কথা।

নুপুর আর নোলকের মুখ চেয়ে আঁধার রাতে ফিরে এসেছিল লুলারাম। বুড়িগাঙের পাড়ে বসে কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। হলদিপোঁতায় কার জন্য থাকবে সে? টিলি ছিল, সেও আজ শূন্য। ঝারি তো থেকেও নেই। মনের দুঃখে হাঁটতে হাঁটতে লুলারাম পৌঁছে গেল দেবগ্রাম স্টেশানে। সেখান থেকে আপ লালগোলা ধরে একেবারে লালগোলায়।

কটা মাস কিভাবে যে কেটে গিয়েছে সেটা টের পায়নি লুলারাম। পেটের দায়ে তখন তার কুকুর পাগল অবস্থা। ধাবার হোটেলে থালা-বাসন ধোওয়া থেকে শুরু করে বাজারে ঝাড়ু দেওয়া কোনো কাজ সে বাদ রাখেনি। টাকা এল, ভাত এল কিন্তু মন থেকে গেল হলদিপোঁতায়। হলদিপোঁতাই মনটাকে ঘুড়ির মতো ওড়াল না। পারল না, হেরে গেল সে।

আঁধার নামলে পণ্ডিত বিলের জলপাখিরা নজরে পড়ে না। শুধু দূরের ঝোপঝাড়ে জোনাকির চোখ পিটপিটিয়ে জ্বলতে থাকে মায়ায় ভরা আবহ তৈরি করে। নরম আলোয় চোখ সয়ে যায় রঘুনাথের। ভালো লাগার রেশটা ঈষৎ ঠাণ্ডা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তার শরীরে। মাথার উপর দিয়ে গোটা চারেক চামচিকি স্বজাতীয় চিৎকার করতে করতে উড়ে গেলে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় রঘুনাথ। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার টানা ডাক ছাপিয়ে সাইকেলে ঠুনঠুন শব্দ তার কানে এসে বেঁধে।

সন্ধের পর ফাঁকা হয়ে যায় বাঁধ। শুধু মোকামপাড়ার কুকুরগুলো তেঁতুলতলা থেকে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে চক্কর কেটে হাওয়া খেয়ে চলে যায়। ওদের গলায় কোনো শব্দ নেই, সব যেন বোবা।

ঠুনঠুনানো সাইকেলটা রঘুনাথের পেছনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। এ সময় সূর্যাক্ষকে দেখতে পাবে ভাবেনি রঘুনাথ। দেখা মাত্র তার শরীরে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। কতদিন সূর্যাক্ষর সঙ্গে দেখা হয়নি তার। নীলাক্ষবাবুর প্রতি অভিমানে সূর্যাক্ষকে ভুল বুঝেছিল সে। এমন কি রুদ্রাক্ষের সঙ্গেও তার ব্যবহারটা শোভন হয় নি আদৌ। সেদিন রুদ্রাক্ষ চলে যাওয়ার পর অনুশোচনায় পুড়েছে রঘুনাথ। বাপের দোষ ত্রুটি ছেলে কেন ঘাড়ে বইবে? যার পাপ তাকেই বইতে হয়। নীলাক্ষর সঙ্গে হিসাব বুঝে নেবে রঘুনাথ। দিন ফুরিয়ে যায় নি, এখনও সামনে অনেকদিন পড়ে আছে।

সূর্যাক্ষ সাইকেল থেকে নামল। তার ক্যারিয়ারের পেছনে লটবহর বাঁধা। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, কালই দেবগ্রামে চলে যাব। ওখানকার হাইস্কুলে সিট পড়েছে। দ্বীপীও আমার সঙ্গে যাবে। আমরা ওখানে দিন পনের ঘরভাড়া করে থাকব। রঘুনাথ নীরবে সব শুনল। পড়াশোনা নিয়ে তার এখন আর কোনো আগ্রহ নেই। তবে সূর্যাক্ষর সব ব্যাপারে তার আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। দ্বীপীর মুখটা মনে পড়তেই মুখ ফসকে সে বলে ফেলল, হ্যাঁ রে, সূর্য—দ্বীপী কেমুন আচে রে।

—তার কথা বাদ দে, সে পড়ে পড়ে পাগল। সূর্যাক্ষ হাসি-মুখ করে বলল।

—অনেকদিন তোদের গাঁয়ে যাওয়া হয়নি।

—আজই চল। কাল তো চলে যাব। আবার সেই কবে দেখা হবে। সূর্যাক্ষর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল।

রঘুনাথ বলল, না রে, আজ আর যাওয়া হবে নি। কি করে যাব বলত? বাপ মারা যাওয়ার পর মা ঘরে একা থাকতে ভয় পায়।

—কেন তোর দাদু থাকে না?

—সে তো থেকেও না থাকার মতন।

—তার মানে? সূর্যাক্ষর কৌতূহলী জিজ্ঞাসা। রঘুনাথ অস্বস্তির সঙ্গে বলল, বুড়া হয়েচে, তার আর কতটুকুই বা ক্ষেমতা। বিছানা নিলে নাক ডাকা শুরু। দশ ডাকেও দায়ে-অদায়ে সাড় আসে না।

—ওঃ, এই কথা! সূর্যাক্ষ ঠোঁট টিপে হাসল।

কিছুটা আসার পর রঘুনাথ হাওয়ার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরাল। ধোঁয়া উগলিয়ে বলল, তোকে আর দিলাম না। বিড়ি খেলে মুখ দিয়ে বদঘেরান বেরুবে। তোর মা টের পেয়ে যাবে।

সূর্যাক্ষ রঘুনাথের ব্যবহারে ভীষণ অবাক হল, সে আর তার সেই বিস্ময়বোধ নিজের ভেতর লুকিয়ে রাখতে পারল না, খোঁচা দেওয়া গলায় বলল, রঘু রে, তুই এত বদলে গেলি কিভাবে?

—কেনে, কি হয়েচে?

—কি হয়নি বল? তুই বিড়ি ধরালি অথচ আমাকে একবার যাচলি না।

—তোরা বাবুঘরের ছেলে। বিড়ি খেলে জাত যাবে।

এসব বুলি কি বিদুর কাকার কাছ থেকে শিখেছিস? সূর্যাক্ষ সহজ হতে পারছিল না, জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে সে রঘুনাথের দিকে তাকাল। বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে বলল, আমি বাবুঘরের ছেলে ঠিকই কিন্তু তুই তো আমার বন্ধু। তোর কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করিনি।

—রাগ করিস নে, ভুল হয়ে গেচে। মুর্খ মানুষের ভুল তো হামেশাই হয়। রঘুনাথ ডিবা থেকে বিড়ি বের করে সূর্যাক্ষকে দিল।

দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরাল সূর্যাক্ষ। দু'টান দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে রঘুনাথের দিকে তাকাল, আঃ, শান্তি। পরীক্ষার আগে বিড়ি না খেলে পড়া মনে থাকবে না। আচ্ছা বলতো, বিড়িকে ভদ্রলোকেরা কি বলে?

রঘুনাথ কথাটা জানত কিন্তু মনে করতে পারল না। সূর্যাক্ষ গলার স্বর বদলে হাসতে হাসতে বলল, বিড়ি হলো গিয়ে ইন্ডিয়ান খাকি, মাজায় দড়ি। মুখে লাল টুপি। বিড়ি হল—মেহেনতী মানুষের ঐক্যের প্রতীক। বুঝলি?

রঘুনাথ হাঁ করে শুনছিল, না বুঝতে পেরে বলল, তোর কথার মানে বোঝা যায় না। ওসব হেঁয়ালি কথা শিকেয় তুলে রাখ তো। কাল কখন যাবি? আমার কি তোর সাথে যাওয়ার দরকার আচে?

সূর্যাক্ষ ঘাড় নাড়ল, কাল বাবা আমার সঙ্গে যাবে। দ্বীপীর বাবা-মাও যাবে।

আমরা বিডিও অফিসের সামনে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি। পাঁচজনে মিলে থাকব। আমাদের মধ্যে দ্বীপীই একমাত্র মেয়ে।

—ওর দিদিগুলান তো ওর সাথে যেতে পারত।

—তা পারত। কিন্তু ওদের যাওয়ার কোনো দরকার নেই। লিটনের মাসী যাচ্ছে আমাদের সাথে। মাসী আমাদের রান্না বান্নার কাজটা করে দেবে।

—কোন লিটন? রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করল।

সূর্যাক্ষ কপালে ভাঁজ ফেলে অবাক গলায় বলল, লিটনকে চিনিস না? ইস্কুল পাড়ায় থাকে। আরে, ওর বাবার ইটালি সেলুন আছে কালীগঞ্জ বাজারে।

—বুঝতে পেরেচি। রঘুনাথ হাসল। হাঁটতে হাঁটতে ওরা হলদিপোঁতা ধাওড়ার কাছে চলে

এল। অন্ধকার এর মধ্যে কালো চাদর বিছিয়ে দিয়েছে চত্বর জুড়ে। এখানটায় দাঁড়ালে মিষ্টি বাতাস এসে গায়ের উপর আছড়ে পড়ে। পাকুড়তলায় আগের মতো আর আসা হয় না রঘুনাথের। সময় হয় না, ইচ্ছেও করে না। একরাশ অবসাদ মনের ভেতর বুনো হাওয়ার মতো ছটফটাচ্ছে। চুনারাম এই বয়সে মাঠের কাজে ঘাম ঝরাতে পারে না। তবু চেষ্টার কোনো তার ত্রুটি নেই। বনবাদাড় থেকে সে সের পাঁচেক বুনো আলু তুলে এনেছে। পন্ডিত বিলের ধারে ধারে রসকচুর ডাঁটিগুলো বেশ চোখে লাগার মতো হয়েছে। ওগুলো কেটে আনলে দিন তিনেকের তরকারির চিন্তা আর করতে হবে না।

সাইকেলের হ্যান্ডেলটা শক্তভাবে ধরে সূর্যাক্ষ বলল, রঘুরে, এবার আমি যাই। রাত হচ্ছে। ঘরে গিয়ে সব গোছগাছ করে পড়তে বসতে হবে। পরীক্ষা নিয়ে খুব টেনশন হচ্ছে। জানি না শেষপর্যন্ত কি হবে।

—কি আর হবে। যা হবে সব ভালোই হবে। রঘুনাথ বিজ্ঞের গলায় কথাগুলো বলে হাসল।

সূর্যাক্ষ রঘুনাথের দিকে অন্ধকারে ধার চাকুর দৃষ্টি মেলে তাকাল, তারপর অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা রঘু, একটা সত্যি কথা বলবি?

রঘুনাথ চমকে উঠল, তোর কাচে কুনোদিন সত্যি বই মিথ্যে বলিনি।

—আমার দাদা এসেছিল? সূর্যাক্ষ গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল।

ক্ষণিকের জন্য ইতস্তত করে রঘুনাথ ঢোক গিলল, হ্যাঁ, সে একদিন এসেছিল। তখন আমার বাপ মরেচে। মাথার ঠিক নেই। সে রাতে এল। তাকে দেখে আমি মাথার কুনো ঠিক রাখতে পারিনি। মুকে যা আসল তাই বললাম। সে বেচারি মন খারাপ করে চলে গেল। আমি তারে আর বাধা দিইনি।

—দাদাকে দেখে তোর কি মনে হল? দাদা ভালো আছে তো?

রঘুনাথ পাল্টা প্রশ্ন করল, কেনে তুর দাদা ঘর যায়নি? সে আমারে বলল—মাকে দেখতে এয়েচে। তাহলে কি ঘর যাওয়ার সে সুযোগ পায়নি?

—ঘরে গিয়েছিল সে কিন্তু ঘরে গিয়ে সে জেঠুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি। জেঠুকে শাসিয়ে গিয়েচে। সেই থেকে জেঠু ভয়ে ভয়ে আছে। এখন আর আগের মতো চোটপাট করে না। নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছে। সূর্যাক্ষর কথায় রঘুনাথ বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। সে জানে—শয়তানের ছলনার অভাব হয় না। এই নাটকের কোনো প্রয়োজন আছে কি? রাগে রঘুনাথের সারা শরীর উথাল-পাতাল করে উঠল। এ প্রসঙ্গে তার আর কথা বলার কোনো ইচ্ছে হল না।

বাঁধের নিচ থেকে ভেসে আসছে ভুঁইলতা ফুলের মিষ্টি সুগন্ধ। সবুজ পাতায় ঢাকা লতানে গাছগুলো মাটিকে মায়ের মতো ভালোবেসে তার কোলেই মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। অপূর্ব গোলাপি রঙের থোকা থোকা ফুলগুলোয় সারাদিন মৌমাছির দল উড়ে বেড়ায় মধু সংগ্রহের জন্য। পাঁচ বছর আগেও এই গাছগুলোর বাড়বাড়ন্ত দশা ছিল না, বড়ো বানের পর থেকে এরা ভূমি জুড়ে বিস্তার করেছে আধিপত্য।

সূর্যাক্ষ চলে যাবার পর বিষণ্ণতা ছেয়ে ধরে রঘুনাথকে। তবু ঘরে ফিরে যেতে তার ইচ্ছে করে না। কাকার কাছে গেলে নানা ধরনের গল্প শুনতে পাবে সে। এককালের গাঁ কাঁপানো মানুষটা আজ গাঁয়ের মধ্যে অথর্ব হয়ে পড়ে আছে। এখন আর তার সেই টাকার জোর নেই। লালগোলায় গত ক'মাসে যা কামিয়ে ছিল তার সবটাই কেড়ে নিয়েছে সেদিন গভীর রাতে। সেই থেকে মানুষটার ঝিমিয়ে আছে সংগত কারণে। টাকা না থাকলে এখন আর কিছু হয় না।

নূপুরটা ক'মাসেই চোখে লাগার মতো হয়ে উঠেছে। শাপলাফুলের চেয়েও সুন্দর তার গায়ের রঙ। নাক চোখ মুখ ভালো। গায়ের লাবণ্য পণ্ডিত বিলের রস কচুর পাতাগুলোর চেয়েও ঝকঝকে সুন্দর। একমাথা ঘনচুল পিঠ ছাপিয়ে কোমরের কাছে কিৎকিৎ খেলে। নূপুরের ভরন্ত শরীর খলবলানো কইমাছের মতো সুন্দর। তাকে যে দেখবে, পছন্দ তার হবেই।

দিন সাতেক আগে মাটিয়ারি থেকে তাকে দেখবার জন্য লোক এসেছিল তিনজন। চুনারাম তাদের পাকুড়তলা থেকে পথ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে আসে। মা মরা নাতনিটার উপর তার টানও কম নেই।

অতিথির দেখাশোনার কাজটা দুর্গামণি সব এক হাতেই করল। নূপুরকে দেখে পছন্দ করে গিয়েছে মাটিয়ারির লোকেরা। ছেলে পড়াশোনা জানে। হাসপাতালের কোম্পাণ্ডার। ফরিদপুর-পাঁচপোতা এলাকায় ধাওড়াদের অমন শিক্ষিত ছেলে আর দুটি নেই।

পাত্রপক্ষ সুন্দরী মেয়ে খুঁজছিল, পেয়েও গেছে। কিন্তু চুনারাম সলজ্জ গলায় নিজেদের অসহায়ত্বের গল্পটি বলে দিল সংক্ষেপে, তা বুঝলে বাপু, আমাদেরও কুনো অসুবিধা নেই। এত করে বলচো যখন, তখুন একবার পাঁচপোঁতায় যাবই। তবে শুভ কাজ কবে নাগাদ হবে আগাম তা বলতে অক্ষম। আসলে হাতে এখুন নগদ পয়সা নেই। যা ছিল বান-বন্যায় সব খেয়ে নিল। এখন ঠনঠনানো ফাঁকা ঘি-শিশির মতো আমরা বেঁচে আচি গো! শিশি আচে অথচ ঘি নাই। টাকা-পয়সা নিয়ে কোনো সমস্যাই হবে না ওরা বলে গেল। মানুষ হিসাবে পাত্রপক্ষের ওরা খারাপ নয়। চুনারাম-মুনিরাম দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নূপুরের বিয়ে ঘরটা ওখানেই হবে। একটু সুখ পাক মেয়েটা। অল্পবয়স থেকে দায়িত্ব নিয়ে কেমন যেন মনমরা হয়ে গিয়েছে মেয়েটা। ওর মুখে হাসি ফুটাতে চায় সবাই। রঘুনাথ জোর দিয়ে বলেছে, আমার বুনের বিয়ে মাটিয়ারিতেই হবে। আমি নিজে ফুরসত মতো ফরিদপুর-পাঁচপোঁতা যাব। সব দেখে-শুনে আসব। তারপর তুমরা গিয়ে পাকা কথা বলে এসো। বুনের বিয়ে বলে কথা। হড়বড়ানোর কোনো দরকার নেই। যা হবে দেখে-শুনে হবে। লাখ কথার এক কথা। চুনারাম ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল রঘুনাথকে।

কালকাসুন্দি গাছের ছায়া মানুষের কোনো কাজে লাগে না। গাছ শুকিয়ে যাবার পর জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার হয় ওগুলো। তবু শীতের আগে যখন ওইগাছে ফুল আসে তখন ফুলগুলো দেখার জিনিস হয়ে ওঠে।

সঞ্জয় হালদার কালাকাসুন্দি গাছ নয় কিন্তু তার ওই উত্থান অনেকটা ওই গাছের মতন। মৃত্যুঞ্জয় সব জানে তবু ছেলেকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলে, পরীক্ষায় মোটে ভয় পাবিনে। মনে না পড়লে মা বুড়োমার নাম স্মরণ করবি, মা বুড়োমা তোকে সব মনে করিয়ে দেবে। বড়ো জাগ্রত দেবী। আমি মানত করেছি—তুই বড়ো পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেলে ঢাক বাজিয়ে পুজো দেব।

দেবগ্রামের ভাড়া বাড়িতে হাঁ করে শুনছিল সঞ্জয়। বিস্ময়ে চোখের পাতা পড়ছিল না তার। এমনিতে সঞ্জয়ের চেহারা ভালো, নাদুস নুদুস। খেয়াল করে দেখলে মনে হবে ফুলো রুগী। আসলে মাত্রাতিরিক্ত খাওয়ার প্রভাব। সঞ্জয়ের সব ভালো শুধু খাওয়ার ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ

নেই। খেতে পারলেই সে পৃথিবীর সব চাইতে খুশি মানুষ। ফি-বিয়ে বাড়িতে বাজি ধরে সে কম সে কম পঞ্চাশটা রসগোল্লা খাবেই খাবে। সের খানিক মাংস তার জন্য বাঁধা। পিকনিকে গেলে সে একার চাঁদা দিয়ে ডবল মিল খাবে। এ নিয়ে কেউ রাগারাগি করলে তার ভীষণ অপছন্দ।

সঞ্জয় যার ভালো নাম, ডাক নাম তার লিটন। মাথায় তার ঝাকড়া চুল, গা-হাত-পায়ের গড়ন শিলনোড়ার চেয়েও মজবুত। লোকে বলে, লিটনের যেমন চেহারা তেমন খ্যাটন। আর খাবে না কেন সারাদিন তো টো-টো করে ঘুরছে। ঘুরলে শরীলের ক্ষয় হয়, ইঞ্জিন ডিজেল-পেট্রল চায়। নতুন বাসাবাড়িটায় ছ-সাত জনের ভালোমতন ঠাঁই হয়ে যাবে। মৃত্যুঞ্জয় ছেলের মুখোমুখি বসে আছে বারান্দায়। সঞ্জয় ওরফে লিটন মুখ ফাঁক করে তাকিয়ে আছে বাবার দিকে। সে যে টেস্টের নদীটা পেরতে পারবে এমন মনের জোর তার ছিল না। হেড-মাস্টারমশাই বলেছিলেন, এ বছরটা ড্রপ দে লিটন। এক বছরে পাকা হয়ে উঠবি। তারপর বোর্ডের পরীক্ষায় বসে যা। তোর ভালো হবে।

বাবার কথা ভেবে লিটন হেড-মাস্টারমশাইয়ের কথা কানে তুলল না, স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলল, পড়াশোনা পুরনো ঘিয়ের মতো নয়, মাস্টারমশাই। পড়াশুনো হল খরালীকালের ডিমের মতো। বেশিদিন রেখে দিলে ভেতরে-ভেতরে পচে গিয়ে বাসনা ছাড়বে।

—তোর যা ইচ্ছে তাই কর। বিরক্ত হয়ে হেড-মাস্টারমশাই বলেছিলেন, আমি তোকে দেবগ্রামের সেন্টার অবধি পাঠিয়ে দেব। নদী পেরনো তোর কাজ।

ভাড়াবাড়িটার চারধারে গাছপালায় ঢাকা। সূর্যাক্ষ দ্বীপীকে নিয়ে গিয়েছিল কিছু কেনা-কাটা করতে। ফিরে এসে দেখল কপোতাক্ষ বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে দ্বীপীর বাবা-মা। ওঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। ওদের আলোচনায় ভাড়া বাড়ির প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে আসছিল।

অষ্টমী বেশ খুশি হয়েছে ঘর দেখে। স্কুল পাড়ায় তাদের মাটির ঘর, ঘরের উপরে খড়ের ছাউনি। পয়সার অভাবে খড় পচে ছাইবর্ণ হয়েছে, এখনও পাল্টান হয়নি।

অষ্টমীকে সবাই কম বেশি চেনে। মাঝের গাঁ, হলদিপোঁতায় যেতে গেলে এ পথ ধরে বাঁধের উপর উঠতে হবে। জগৎখালি বাঁধের গায়েই পাশাপাশি তিনটে গুয়োবাবলার গাছ। ওদের বয়সের কোনো গাছপালা নেই। প্রকাণ্ড খসখসে ছালওঠা গুঁড়িগুলোই বলে দিচ্ছে ওরা বয়স্ক।

অষ্টমী শাড়ি গুছিয়ে নিজেকে ভদ্রস্থ করে বলল, এ বেলায় রান্না হবে, আমি আঁচ ধরিয়েছি। আপনারা তাহলে দুটো সেদ্ধ ভাত এখান থেকে খেয়ে যাবেন। সবার প্রথমে বাধা দিলেন কপোতাক্ষ, না, না তা হয় না! দেবগ্রামে ভালো হোটেল আছে—আমরা সেখানে খেয়ে নেব। তোমার ব্যস্ত না হলেও চলবে। অষ্টমী ম্লান হাসল, ব্যস্ত নয় গো, এটা আমার কর্তব্য। ঘরে থাকলে আপনাদের কি না খাইয়ে ছাড়তাম।

—এটা ঘর নয়, ভাড়াবাড়ি। দেবোত্তর বললেন, যেখানে যেরকম, সেখানে সে রকম। বুঝে-শুনে পনেরটা দিন চালিয়ে নিও। ছেলে-মেয়েগুলোকে একটু শাসনে রাখার চেষ্টা করো, অষ্টমী। ওরা যেন বায়োসকোপ দেখতে যেতে না পারে।

অষ্টমীর কঠিন ঘাড় ডানে-বাঁয়ে নড়ে উঠল। বাইরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সে বলল, আমার শাসন ভীষণ কড়া। আমি এদের রাস্তার ওদিকে যেতে দেব না। টাইমে খাবে, টাইমে ঘুমুবে, মাঝখানে শুধু পড়াশোনা।

—ঠিক বলেচো, এই তো চাই। দেবোত্তর চক্রবর্তী অষ্টমীর কথাকে সমর্থন করলেন। এই সমর্থন অষ্টমীকে ডানা মেলে ওড়ার সুযোগ করে দিল। তার সাহস বেড়ে গেল হাজার গুণ। লিটনকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলল, ভালো করে শুনে রাখ, প্রতিদিন রাত বারোটা পর্যন্ত পড়তে

হবে। পড়ার সময় ঢুলুনী বা ঘুম কোনোটাই চলবে না। সকাল ছ'টার মধ্যে উঠতে হবে। আমার কথার অবাধ্য হলে আমি নালিশ ঠুকে দেব।

মুখের উপর কথা বলার স্বভাব লিটনের। অন্য জায়গায় হলে সে মাসীকে মুখের মাপে জবাব দিয়ে দিত। ভাড়াঘরে অনেকেই উপস্থিত। বিশিষ্ট লোকজনের মাঝখানে তার কোনো উত্তর দেওয়া সাজে না। সেটা বরং খারাপ দেখায়।

বাধা না পেয়ে অষ্টমী বলল, বেলা অনেক হয়েছে, এবার আপনারা যেতে পারেন। আমাকে ভালো করে ঘর দুটো গুছিয়ে নিতে হবে।

—হ্যাঁ, তা তো ঠিক। অনেকক্ষণ পরে অষ্টমীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলল মৃত্যুঞ্জয়, ভালোভাবে থেকো সব। আমি সময় পেলে আবার এসে দেখা করে যাব। কপোতাক্ষ বললেন, হ্যাঁ, বেলা অনেক হল। এবার আমরাও উঠব। এরপরে গেলে হোটেলে আর ভাত পাওয়া যাবে না। তখন দুপুরবেলায় জল-মিষ্টি খেয়ে থাকতে হবে।

চন্দ্রিকা এসব কথা শুনছিলেন না। মেয়ের পরীক্ষা নয় তো যেন তারই পরীক্ষা। কপালের ঘাম রুমালে মুছে তিনি দ্বীপীকে বললেন, সাবধানে থাকবি। কোনোদিন বাইরে থাকিস নি, আমার ভয় করছে।

দ্বীপী হাসল, ভয়ের কি আছে?

—তুই মা হলে বুঝবি।

লজ্জায় এত লোকের মাঝখানে দ্বীপী যেন জল লাগা সন্দেশের মতো গলে গেল। গালে রাঙা টোল পড়ল তার। কথা শুনে সূর্যাক্ষ পিটপিটিয়ে হাসছিল। দ্বীপী তার দিকে কটমট করে তাকাল।

কয়লার আঁচে ভাত বসিয়েছিল অষ্টমী। এতক্ষণ গমগম করছিল ভাড়া ঘর। ওরা চলে যাওয়ার পর ঘরটাতে ফাঁকা হাটের নীরবতা নেমে এল। চন্দ্রিকা যাওয়ার আগে দ্বীপীকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলে দিয়েছেন—শরীর খারাপ হলে বিদেশে কীভাবে তা সামলাতে হবে।

দ্বীপী খুব বিরক্ত হচ্ছিল। কিন্তু তার কিছু করার নেই। মায়ের মুখের উপর সে একটাও কথা বলতে পারে না। তাছাড়া মা যা বলেন—তা তো ভালোর জন্যই বলেন।

চন্দ্রিকা এ-ও বললেন, ঘুমোনোর সময় মাসীর কাছে ঘুমিও। তোর ঘুম খুব খারাপ। ঘুমালে বড্ড এলোমেলো হয়ে যায়ে তোর জামাকাপড়। এসব কথা চন্দ্রিকা বলতেন না কিন্তু না বলেও তার কোনো উপায় নেই। সূর্যাক্ষ তাদের ঘরের ছেলের মতন। ওর কথা আলাদা। কিন্তু বাকি আরও তিনজন আছে। তারা দ্বীপীকে আর কতটুকু চেনে! ওদের মনে একটা খারাপ ধারণা জন্মালে সহজে তা মুছবে না। দ্বীপীর এখন নজরকাড়া চেহারা। চুল থেকে পায়ের নখ সবখানে উপচে পড়া যৌবন। এঁটেল মাটির মতো গায়ের রং যেন ফেটে পড়ছে। কথা বললে কলকল ঢেউ ওঠে জলের। শুধু ঠোঁট নয়, দিঘল চোখ দুটো কথার তালে তালে নাচে। ডাগর বুকের সে কি দুর্নিবার আকর্ষণ—দেখলেই পানকৌড়ি পাখির মতো ডুব দিয়ে হারিয়ে যেতে চাইবে যুবক সত্তা। তবু মেয়েটাকে এক সাথে না রেখে উপায় নেই। এত টাকা ঘরভাড়া তাদের একার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। পাঁচজনে মিলে দিলে ভাগে কম পড়বে। সেইজন্য এই ব্যবস্থা।

ওরা চলে যেতেই শুনশান হয়ে গেল ঘরগুলো।

সূর্যাক্ষ লোভী চোখে ঘরটার চারপাশে তাকাল। পাঁচিলঘেরা ঘর, সামনে একফালি জমিতে ফুলগাছ যেমন আছে, তেমনি আছে ইউরিয়া দেওয়া পুঁইগাছ। এ এলাকায় ঢোলকলমী গাছের ছড়াছড়ি। এখন ছোট ছোট মাইকের মতো ঈষৎ গোলাপী সাদা ফুল ফুটে আছে। গাছগুলো রোগা ডাল নিয়ে দোল খাচ্ছে হাওয়ায়।

সূর্যাক্ষ ছাদে যাওয়ার সিঁড়িটার দিকে তাকাল। তার মনে হল ওই খোলা ছাদে কত রহস্য বুঝিবা লুকিয়ে আছে। ফুরসত মতো ছাদে গিয়ে হাওয়া খেতে হবে। ছাদ থেকে চৌত্রিশ নাম্বার জাতীয় সড়ক নিজের বুকের হাড়ের মতো স্পষ্ট দেখা যায়।

অষ্টমীর রান্না শেষ। এ বেলাটা সেদ্ধ খেয়েই কাটাতে হবে। ও বেলার রান্না নিয়ে কারোর মনে কোনো সংশয় নেই। সবাই যে যার থালা নিয়ে লাইন করে বসে গেল মেঝেতে। দ্বীপী এল না। সূর্যাক্ষ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বলল, মাসী, দ্বীপীরটাও বেড়ে দাও। আজ অন্তত সবাই একসাথে খাই। তুমিও আজ আমাদের সঙ্গে খেয়ে নাও।

—তা হয় না, বাবা। আমার অভ্যাস সবার শেষে খাওয়া।

—ও তো বাড়িতে করতে। এখানেও কি তাই করবে? সূর্যাক্ষর প্রশ্নে অষ্টমী বিরক্তির চোখে তাকাল।

দ্বীপী এগিয়ে এল, আমি তোদের সঙ্গে বসছি। মাসী পরে খাক। কেন না কারোর কোনো কিছু দরকার হলে এঁটো হাতে কে বেড়ে দেবে?

—তাই তো! সমস্যাটা বুঝতে পেরে সূর্যাক্ষ মাথা ঝুঁকাল।

খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে দ্বীপী ওর ঘরে চলে গেল। জাতীয় সড়ক কাঁপিয়ে একের পর এক ট্রাক বাস ম্যাটাডোর ছুটে যাচ্ছে। বিরামহীন তাদের চলা। এখান থেকে ট্রেনের শব্দ স্পষ্ট কানে আসে।

এত শব্দ তবু জায়গাটার একটা শান্তশ্রী ভাব আছে। এখানকার বেশিরভাগ মানুষই পরিশ্রমী। যুদ্ধের সময় শিকারপুর বর্ডার পেরিয়ে এরা এখানে আশ্রয় নিয়েছে। কলোনীর পরিবেশ গড়ে উঠেছে চারধারে। পাকা বাড়ির সংখ্যা খুব কম চোখে পড়লেও যে কটা পাকাবাড়ি আছে তা একেবারে নজর এড়িয়ে যাবার মতো নয়।

সবার খাওয়া শেষ, লিটন তখনও ওঠেনি। অষ্টমী তার পাতের গোড়ায় বসে আছে চুপচাপ। পাকা চুলের গোড়া কুটকুটালে সে তর্জনী দিয়ে চুলকে নিচ্ছে জায়গাটা।

কি ভেবে সূর্যাক্ষ দ্বীপীর ঘরে ঢুকে এলে তার মনে হল কাজটা উচিত হল না। এক অপ্রতিরোধ্য সংকোচ তাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখল। গ্রামে থাকতে এই জড়তা তার কোনোদিনও অনুভব হয়নি। কোনো কিছু না বলেই সে দ্বীপীর ঘরে ঢুকে যেত মুক্ত বাতাসের মতন। আজ এখানে কে যেন ভেতর থেকে বলল, যেও না। এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় সূর্যাক্ষ দ্বীপীর দিকে নীরব চোখে তাকাল।

দ্বীপী প্রশ্ন করল, এখানে কি করতে এসেছিস?

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি বলবি?

—ন্যাকামো করিস না। বল কি কথা?

—কাকিমা তোকে আড়ালে ডেকে কি বলল রে?

মায়ের কথাগুলো মনে পড়তেই দ্বীপীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল, মা যা বলেছে-সব কথা তোকে বলতে হবে নাকি?

—তুই তো আমার কাছে কিছু গোপন করিস না।

—দেখ সূর্য, পাগলের মতো বকছিস কেন? তোর কি কোনো কাজ নেই। যা তো—

—তাড়িয়ে দিচ্ছিস?

—তাহলে কি ফুলবেলপাতা দিয়ে পুজো করব তোকে? দ্বীপী কপট রাগে চোখ পাকাল। সুবিধা হবে না বলে সূর্যাক্ষ নরম গলায় বলল, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। একটু আগেও

তুই ঠিক ছিলিস। এখন বদলে গেলি। মেয়েরা গিরগিটির চেয়ে তাড়াতাড়ি নিজেদের বদলে নেয়। ছেলেরা অতটা পারে না।

—যা আর ঝোল টানতে হবে না। দ্বীপী চোখ বন্ধ করে বলল, তুই যা তো, আমি পড়তে বসব। কাল পরীক্ষা। ভীষণ চিন্তা হচ্ছে—

—তুই তো ভালো মেয়ে, তোর আবার চিন্তা কি?

—ভালো মেয়ে হলেও পড়তে হয়।

—কাল তো বাংলা। অত পড়ার কি আছে?

—ভুলে যাস না, দু'শ নাম্বারের পেপার। ম্যাকসিমাম ছেলে-মেয়ে বাংলায় ফেল করে। দ্বীপী গম্ভীর গলায় বলল।

তার কথায় দিশেহারা বা ভীত হল না সূর্যাক্ষ, এবার তোর স্টার বাঁধা।

—হায়ার সেকেন্ডারীতে স্টার মার্কস পাওয়া ছেলের হাতের মোওয়া নয়। দ্বীপী অবজ্ঞায় ঠোঁট ওল্টাল।

কিছুটা হলেও মনে মনে দুঃখ পেল সূর্যাক্ষ। দ্বীপীকে বাগে আনতে হবে। কথা দিয়ে ওর মন ভুলবে না। মাঝে মাঝে ও খুব গম্ভীর হয়ে যায় তখন কাউকে চেনে না যেন। ওর এই নির্দয় ব্যবহারটা সূর্যাক্ষকে বড়ো আঘাত দেয়। সব বুঝেও সে দ্বীপীকে বলল, শুনেছি, এবার খুব চোতা চলবে। সুযোগ পেলে আমিও চালিয়ে দেব। ছাড়াছাড়ি নেই।

—তুই দেখছি ঝালেও আছিস, অম্বলেও আছিস। দ্বীপী কষ্ট করে হাসল। সূর্যাক্ষ এবার আর দ্বীপীকে কোনো কথা বলার সুযোগ দিল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে খপ করে দ্বীপীর হাতটা চেপে ধরল। ওর খোঁপা বাঁধা চুল ছড়িয়ে গেল পিঠে, মুখ কালো হয়ে গেল কষ্টে, ছাড়, ছাড় বলছি।

—ছাড়ব না। না ছাড়লে তুই কি করবি?

—দ্যাখ সূর্য, ভালো হচ্ছে না কিন্তু। কেউ যদি দেখে নেয় তো মুখ দেখাতে পারবি না। দ্বীপীর ঠোঁট কেঁপে উঠল।

—আগে আমার কাছে ক্ষমা চা। নাহলে তোর মুক্তি নেই।

—আহারে, কী আমার বীর-যোদ্ধা! মুখ বিকৃত করে ঠোঁট ওল্টাল দ্বীপী।

সূর্যাক্ষ বলল, হাত ছেড়ে দেব। আগে বল তুই ভালো ব্যবহার করবি।

—আমি খারাপ ব্যবহার করলে তোর কি আসে যায়?

—আমার মন খারাপ হয়ে যায়। পড়তে বসলে তোর মুখটা খালি ভেসে ওঠে। সূর্যাক্ষ দিশেহারা চোখে তাকাল।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল দ্বীপী, কষ্ট হয় না, ছাই হয়। তোর মনভুলানো কথায় আমি আর গলছি না। যা ভাগ।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দ্বীপী সূর্যাক্ষকে ঠেলা মারল। টাল সামলাতে না পেরে দেওয়ালে মাথা ঠুকে গেল সূর্যাক্ষর। আর সঙ্গে সঙ্গে কপালটা মার্বেল গুলির মতো ফুলে গেল।

দ্বীপী বিস্ফারিত চোখে দেখল সেই দৃশ্য। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল তার। কান্না পেল। এ কী সর্বনাশ করল সে। কাল পরীক্ষা। ফোলাটা যদি না কমে। যদি সবাইকে ফোলার কারণটা বলে বেড়ায় সূর্যাক্ষ? তাহলে সে মুখ দেখাবে কিভাবে? দ্বীপীর গা হাত পা কাঁপছিল ভয়ে। তবু সে সূর্যাক্ষর হাতটা চেপে ধরল গভীর আবেগে, তোর বুঝি খুব লেগেছে। দেখ, আমি ঠিক, ওভাবে ...

—ঠিক আছে, বুঝেছি। চুপ কর। সূর্যাক্ষ ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল।

ফাঁকা ঘরে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল দ্বীপী। আর তখনই ভেসে ওঠা শুশুকের মতো দম নিয়ে অষ্টমী বলল, এখনও দাঁড়িয়ে আছো, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে না! কী মেয়েরে বাবা...!

দ্বীপীর ডাগর চোখের তারায় বিস্ময় লুটিয়ে গেল, ঝোঁক সামলে সে বলল, মাসী, দুপুরে শোওয়ার অভ্যাস আমার নেই। দুপুরে ঘুমালে গা-হাত-পা ম্যাজম্যাজ করে। শরীরটা কেমন খারাপ লাগে।

অষ্টমী কেমন পাংশু মুখে তাকাল, আমাদের লিটনটা তো কথা শোনে না। খাওয়ার পরে ঘুম না দিলে ওর পেটের ভাত হজম হবে না। দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ছেলেটা কেমন মোটা হয়ে গিয়েছে দেখো। আমি কত মানা করি, তবু ও আমার কথা শোনে না।

এই বয়সে লিটন তার চেহারাটাকে বয়স্কদের মতন করে ফেলেছে। শরীরের ওজন বেড়েছে মাত্রাতিরিক্ত। তবু খাওয়া-দাওয়ার উপর ওর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। খাবার দেখলে ওর ভেতরটা অস্থির হয়ে ওঠে। বয়সকালে লিটনের মা সপ্তমীর খাওয়া-দাওয়ার প্রতি আসক্তি খুব বেশি ছিল। জলঢালা ভাত খেতে সে খুব ভালোবাসত। শীতকালে বেগুনপোড়া আর জলঢালা ভাত তার কাছে ছিল অমৃতসমান। খুব তাড়াতাড়ি সপ্তমী চলে গেল। প্রসব হতে গিয়ে তার রক্তচাপ অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয় ধার-দেনা করে সদরে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হল না। লাউগাছটা মরে গেল, জালি রেখে। সন্ধের মুখে সপ্তমী ইস্কুল পাড়ায় এল ছোট লরিতে চেপে, তার সারা শরীর তখন কাপড়ে মোড়ান, আর সেই কাপড় ভিজে গিয়েছে রক্তে। মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে ধরা একদিনের লিটন।

পাড়া-পড়শিরা দুঃখ করে বলল, যা হবার হয়েচে মৃত্যুন, এবার এই ছেলেটার মুখ চেয়ে বাঁচো। সপ্তমী বড়ো ভালো মেয়ে ছিল গো, কখনো মুখ তুলে কথা বলত না। যারা ভালো তারা চটজলদি ভগবানের কাছে চলে যায়। এসব শাস্ত্রের কথা, তুমি-আমি কি করতে পারি বলো।

দুধের শিশু লিটনকে মানুষ করবে কে? এই চিন্তায় ক'দিন ঘুমাতে পারেনি মৃত্যুঞ্জয়। শেষে ঠিক করল শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসবে ছেলেটাকে। ওখানে দশজনের হাতে-কোলে মানুষ হয়ে যাবে ছেলেটা। বছর পাঁচেকের হয়ে গেলে লিটনকে নিজের কাছে এনে রাখবে।

শাশুড়ি-মা তার প্রস্তাব শুনে বললেন, ভালো কথা। কিন্তু শুধু ছেলের কথা ভাবলে চলবে না। তোমার নিজের কথাও ভাবতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ করো—অষ্টমীকে নিয়ে যাও। ওরও তো কপাল পুড়েছে। জলজ্যান্ত জামাইটা আমার পেটে জল জমে মরে গেল। অত বড়ো কাটোয়ার হাসপাতাল, জামাইটাকে বাঁচাতে পারল না! সবই ভাগ্য বাবা, বুঝলে! শাশুড়ির কথা মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনে আশীর্বাদ হয়ে নেমে এল।

একদিন শ্বশুরঘরে কাটিয়ে একমাত্র শালী অষ্টমীকে নিয়ে ফিরে এল সে। সেই থেকে উনিশ বছর ইস্কুল পাড়াতে কাটিয়ে দিল অষ্টমী। লিটন তাকে ছোট মা বলে ডাকে। তার এই সম্বোধনে কোনো খাদ নেই। অষ্টমী দু দিনের শিশুকে মায়ের মতো লালন-পালন করেছে। লিটন কাঁদলে নিজের ভরন্ত দুধহীন স্তনবৃন্ত ধরিয়ে দিয়েছে ছেলেটার মুখে। মা হতে না পারার যন্ত্রণাটা ভুলিয়ে দিয়েছে লিটন। অল্প বয়সে স্বামীহারা হয়ে বাঁচার অনেক জ্বালা। মৃত্যুঞ্জয় দেবতার মতো মানুষ। কোনোদিন তার প্রতি লালসার চোখে তাকায়নি। একই ঘরে শোওয়া বসা খাওয়া পরা—তবুও। অথচ পাড়ার লোকে ভুল বোঝে। প্রথম প্রথম চোখ টাটাত। ভ্রূর ধনুক বাঁকিয়ে বলত, আগুন আর ঘি পাশাপাশি থাকলে গলবেই। কেনে মিছে কথা বলচো মৃত্যুনদা। তোমার আর কতটা বা বয়স? এই বয়সে বউ মরলে লোকে চার-চারটা বিয়ে করতে পারে।

জিভ কেটে মুখ নামিয়ে নিয়েছে মৃত্যুঞ্জয়, তা নয় গো ভাই, তা নয়। সবাই যা ভাবছে তা ভুল। ঘা শুকোতে সবার একই সময় লাগে না। কারো কারোর ঘা গভীরে থাকে, বাইরে থেকে তা চট করে দেখা যায় না। দেখা না গেলেও ঘা তো ঘা-ই।

অষ্টমী তার ক্ষুদ্র জীবনে অনেক মানুষ দেখেছে, কিন্তু জামাইবাবুর মতো অমন সজ্জন, চরিত্রবান মানুষ সে আর দুটি দেখেনি। এক একটা পুরুষমানুষের চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না, নারীমন কার্তিকমাসে শ্যামাপোকার মতো দগ্ধে মরে। অষ্টমী উনিশটা বছর দগ্ধে দগ্ধে মরল, কোনোদিন মৃত্যুঞ্জয় তাকে দুর্বল সময়েও ইশারা করে ডাকল না। অথচ দেখতে শুনতে সে কখনও মন্দ ছিল না। আখের আলসের মতো গায়ের রঙ, মাথাভরা চুল ঢলঢল করে নাচত পিঠের উপর, শিরদাঁড়ার ভেতরে প্রায়সময়ই বইয়ে দিত উষ্ণস্রোত। নারীত্বের পাশাপাশি তার এই ভরাট শরীরের দীপ্তমান বক্ষশোভা যেন জাহির করে দিত গোপন যৌবনসত্তা। ঢেউ খেলান শরীরে এখন চর্বি জমলেও জ্যোৎস্নার ঘোলাটে রঙ ধুয়ে গিয়ে ফুটে উঠেছে কামিনীকাঞ্চন। বয়সটাকে বুঝি ঢাকতে পারে যৌবন। এখনও তার ছোট্ট কপালে লাউ আঁকসির চেয়েও সুন্দর চুলগুলো দোল খায় যখন-তখন। তখন ওই হাড়ভাঙা খাটুনির মুখটাকে মনে হয় শ্রীময়ী। দু'কানে বিয়েতে পাওয়া সোনার দুটি বেলকুঁড়ি আজও ফুটে আছে, ঝরে যায়নি। হাতের শাঁখা ভেঙেছে প্রায় বছর কুড়ি আগে, এখন শুধু সোনার রুলি কব্জির নিম্নদেশে খেলা করে, আর রোদে ঝলসায়। আর সেই ঝলকানি শরীরে পড়লে তেতে ওঠে গা-গতর। প্রথম প্রথম কষ্ট হলেও এখন সব মানিয়ে নিয়েছে অষ্টমী। সে জেনেছে পাতলা ঠোঁটের যাদুতে সে পুরুষের হৃদয় অবশ করে দেবে, তাতে লাভের চাইতে যে ক্ষতি বেশি—এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। তাই এই সুরভিত শরীরটাকে নিয়ে তার এখন আর কোনো গর্ব নেই, সে শুধু চায় ভালোয় ভালোয় বাকি দিনগুলো কাটিতে দিতে। লিটনের মধ্যে তার আগামী দিনের সব সুখ যেন গন্ধদানীর আতরের মতো লুকিয়ে আছে।

দ্বীপী এসব গল্পের কিছু জানে না। লিটনকে সে ইস্কুলে দেখেছে কথার পিঠে কথা বলে যেতে। ওর মুখে সর্বদা যেন খই ফোটে। হেড-মাস্টারমশাই ওর ব্যবহারে তিতিবিরক্ত। দ্বীপীও একদিন রাগের মাথায় সঞ্জয়কে বলে দিয়েছিল, শূন্য কলসি বাজে বেশি। ওই জন্য সবাই তোকে লিটন না বলে নিউটন বলে!

দুপুরবেলায় জানলা টপকে রোদ এসে শুয়ে পড়েছে মেঝেয়। আলোর গোল গোল ফুটকিগুলো বড়ো বেশি ভ্রাম্যমাণ এখন। ওরা বুঝি এক জায়গায় স্থিতু হতে জানে না। দ্বীপী হাঁ-করে অষ্টমীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তার মন পড়ে আছে সূর্যাক্ষর কাছে। একটু আগে সে যা ব্যবহার করেছে তা কখনও সমর্থনযোগ্য নয় তার নিজের কাছে। ইদানীং নিজেকে নিয়ে সে বেশি চিন্তিত।

দেবোত্তর চক্রবর্তী সংসারের হাল ফেরাতে গিয়ে ফুটো নৌকোর মতো টলছেন। শিবমন্দিরের পুরোহিতের ভাগ্যে আর ক'টাকা দক্ষিণা জোটে? পুজোর শাড়ি গামছা দোকানেও কিনতে চায় না। কত আর ওগুলো জমিয়ে রাখা যায়? বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বীপীর মন ভেঙে যায়। পাশ করে তাকে কিছু করতেই হবে। এ নিয়ে সূর্যাক্ষর সঙ্গে তার বিস্তর আলোচনা হয়েছে। দ্বীপী বলেছে, হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে পি-এস-সি' পরীক্ষায় বসবে।,কেরানীর চাকরি খারাপ নয়। যদি সে চাকরি যোগাড় করতে পারে তাহলে বাইরে থাকতেও তার কোনো অসুবিধা হবে না। সংসারের জন্য অর্থ চাই। সেই অর্থ তাকে শ্রমের বিনিময়ে যোগাড় করতে হবে। সে জানে পড়াশোনার রাস্তাটা দেবগ্রামের সেন্টার অবধি এসে থেমে যাবে। এর জন্য মন খারাপ হয় না তা নয়। মন খারাপ করলেও তার কোনো উপায় নেই।

সূর্যাক্ষ এসব শুনে তাকে অভয় দিয়ে বলেছে, তুই এত ভাবিস নে, আমি আছি, আমি তোদের সংসার চালিয়ে দেব।

—তুই চালাবি? আশ্চর্য!

—কেন, আমি বুঝি তোদের কেউ নই?

—না, না। তা নয়। তবে—

—তবে কি?

—এটা বাস্তব নয়। বাস্তব বড়ো কঠিন। তুই আমাদের সংসারে টাকা দিলে সেটা তোর বাবা-মা মেনে নেবো কেন? দ্বীপী বুঝিয়ে বলল, মন তো অনেক কিছু চায়, কিন্তু বাস্তবে কি তা করা যায়?

—বাস্তবে যা করা যায় না, তা অনেক সময় করে দেখানো যায়।

—এটা তোর জেদের কথা।

—জেদ নয়, এটা আমার মনের কথা। তুই আমার পাশে থাকলে আমি অনেক কঠিন কাজ সহজে করতে পারব।

—তার মানে?

—মানেটা আমি নিজেও জানি না এখনও।

সেদিনের আলোচনাটা আর বেশি দূর গড়ায়নি। দ্বীপী মনে মনে খুশি হয়েছিল সূর্যাক্ষর কথা শুনে। এমন কিছু কিছু সম্পর্ক থাকে যা ডুমুরের ফুলের মতো লুকানো। যা বাইরে এলে মুগ্ধতার রেশ কেটে যাবে। দ্বীপী আর দাঁড়াল না। যে ভুল সে করেছে, তার জন্য ক্ষমা চাওয়া দরকার। অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও সূর্যাক্ষকে তার একান্তে পাওয়া দরকার। ভুল বোঝাবুঝি ব্যাঙাচির লেজের মতো যত দ্রুত খসে পড়বে ততই মঙ্গল।

সন্ধেবেলায় আলো ছিল না, চৌমাথা থেকে মোমবাতি কিনে এনেছে সূর্যাক্ষ। তিনটি ঘরে এখন মোমবাতি জলছে। অষ্টমী হ্যারিকেনের কাঁচ মুছছিল মন দিয়ে। দ্বীপী তার পাশে দাঁড়াতেই মুখ তুলে তাকাল, কিছু বলবে মা?

—না, এমনি...দেখছি।

—হ্যারিকেনের কাচমোছা কেউ দেখে বুঝি? অষ্টমী সহজভাবে হাসল, তোমার মনটা খুব ভালো, খুব নরম।

—কি করে বুঝলে? কৌতূহলী হল দ্বীপী।

অষ্টমী বলল, বোঝা যায় মা, বোঝা যায়। নদীর দেশের মেয়েরা পলিমাটির চেয়েও নরম হয়।

কথাটায় ভালোলাগা ছিল, ভালোবাসা ছিল। দ্বীপী মুগ্ধ চোখে তাকাল, মাসী, তোমার জীবনটা বড়ো কষ্টের, তাই না?

—কেন একথা বলছো? কষ্ট ভাবলে কষ্ট, না হলে কিছু নয়। অষ্টমী কোনো জটিলতায় গেল না, বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে স্বামী মারা গেল। মানুষটাকে চিনতে না চিনতেই চলে গেল সে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ভাবলাম এবার হয়ত আমার পালা। দেখো, কেমন বেঁচে গেলাম এতদিন। বাপের দোরে আর হাত পোড়াতে হল না। একটা ঘর পেলাম, ছেলে পেলাম। জানো লিটনকে আমি পেটে ধরিনি ঠিকই কিন্তু লিটন আমার সব। আমি জানি এই ছেলেই আমার মুখে আগুন দেবে।

দ্বীপী আশ্চর্য হয়ে গেল কথা শুনে, গলা নামিয়ে বলল, হ্যাঁ মাসী, তোমার কথাই ঠিক।

লিটন বড়ো ভালো ছেলে। ওর ভেতরে একটা প্রতিবাদী মন আছে। আমার ওই মনটাকে ভালো লাগে।

খুশী হল অষ্টমী, কাছে সরে এসে ঘনিষ্টস্বরে বলল, তোমাকে একটা কথা বলি মা। লিটনকে যেন ভুল করেও বলো না। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে দেবগ্রামের পাশটা হয়ে গেলে লিটনের বিয়ে দিয়ে দেব। তা তোমার নজরে তেমন কোনো ভালো মেয়ে আছে? থাকলে বলো। আমি যোগাযোগ করব।

—সে কী মাসী, এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেবে?

—কেন বিয়ে দিলে ক্ষতি কি?

—ওর চাকরি-বাকরি নেই, কিছু করে না। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও।

—চাপ না পড়লে কেউ বাপ বলে না—বুঝলে? অষ্টমী ঘন দাঁত বের করে হাসল।

দ্বীপী আর এ প্রসঙ্গে কোনো কথা না বলে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া লোডশেডিং দৈত্যের আলোচনায় মেতে উঠল, দেখো তো, কী ঝামেলা! এ সময় লাইট গেলে আমরা পড়ব কখন?

অষ্টমী ক্রোধিত হয়ে বলল, সব কানা, বিবেকহীন। না হলে পরীক্ষার আগে কেউ বাতি কেটে দেয়। পুরো এলাকাটা অন্ধকারে ডুবে আছে মনে হচ্চে। এদিক থেকে ভালো হয়েচে—আমাদের ঘরে এসব ঝামেলা নেই। হ্যারিকেন-ডিবরিতে আমাদের চোখ সয়ে গেছে।

সাড়ে আটটার পরে অন্ধকার খুন হল। সঙ্গে সঙ্গে ছাদ থেকে নেমে এল ওরা। দ্বীপী সবার পেছনে, লিটন সবার আগে। সিঁড়ির বাল্বটা লালচে আলো ছড়িয়ে জ্বলছিল।

অষ্টমী ওদের আসার অপেক্ষায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল, আলো এসেছে, এবার তোরা সবাই খেয়ে নে। আবার কখন বাতি চলে যাবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। যা হাত-মুখ ধুয়ে আয় কলতলা থেকে। আমি ভাত বেড়ে রাখছি।

সূর্যাক্ষ হাত নেড়ে বলল, এত তাড়াতাড়ি খাওয়া কি ঠিক হবে মাসী, যদি ভোরের দিকে খিদে পেয়ে যায়?

—খিদে পেলে খাবি। টিনে মুড়ি আছে। মুড়ি খেতে দোষ কোথায়?

এবার আর কোনো আপত্তি টিকল না কারোর। কলতলায় গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এল ওরা। নতুন টিন কেটে বানানো হয়েছে কলতলার দরজা। আলো পড়ে চকচক করছে টিন। টিন নয় যেন ধাতুর-জ্যোৎস্না।

খাওয়ার পর দু'ঘণ্টা টানা পড়ে নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল দ্বীপী। পাশে বসা সূর্যাক্ষকে চিমটি কেটে বলল, ঘুম পাচ্ছে, ছাদে যাবি, সূর্য?

—এত রাতে?

—আমার ভালো লাগছে না। ভীষণ মন খারাপ করছে বাড়ির জন্য।

—সে কি রে, একদিনেই এত?

—যার হয়, একদিনেই হয় না হলে জীবনভর হয় না।

সূর্যাক্ষ অবাক হয়ে শোনে দ্বীপীর কথাগুলো। নরম কথা কিন্তু নেশা ধরে যায় মনে। দ্বীপী অস্থির হয়ে বলল, যাবি তো চল। আমার আর ভালো লাগছে না।

—আমরা একা যাব?

—একা কোথায় রে, আমরা তো দু'জন আছি।

—হ্যাঁ, দু'জন আছি। কিন্তু আমরা দু'জন মানে তো একজন।

—অঙ্কে তুই নির্ঘাত ফেল করবি। এই যদি তোর হিসাব জ্ঞান হয় আমি তোকে কি বলব

বল। দ্বীপী আনমনে আঙুল কামড়াতে লাগল, চল না রে সূর্য, আমার যে ছাদে যেতে মন করছে।

—যেতে পারি, কিন্তু আমি যতক্ষণ বলব ততক্ষণ তোকে ছাদে থাকতে হবে।

সূর্যাক্ষর শর্তটা উপভোগ করল দ্বীপী, এবার হাসি ফুটল তার ঠোঁটে, ঠিক আছে মেনে নিলাম। কিন্তু একটা কথা বল তো, এতক্ষণ ছাদে থেকে কি হবে?

—রকেটবাসের নাম শুনেছিস? হাইওয়ে দিয়ে বাসটা রোজ যায় গভীর রাতে। তার মাথায় থাকে সার্চ-লাইট। বাসটা রকেটের গতিতে দৌড়য়। দিনের বেলায় বাসটাকে দেখা যায় না, এ হল রাতের রানী।

সূর্যাক্ষর কথায় দ্বীপী অবাক হল, তুই এত সব জানলি কি করে?

—জানতে হয়। বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়াল সূর্যাক্ষ, মোমবাতি কিনতে গিয়ে সব শুনে এসেছি। তুই যদি সঙ্গে থাকিস তাহলে আজ রাতেই রকেট বাস দেখার আশাটা পূর্ণ হয়ে যাবে।

—অত রাত অবধি থাকব, যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়?

—তাহলে গায়ে একটার চাদর জড়িয়ে নে।

—তুই কি গায়ে দিবি?

—আমার দরকার হবে না।

—কেন?

—তুই আছিস না। তুই থাকলে আমার শীতও লাগে না।

দ্বীপী অবাক না হয়ে পারল না। চাপা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে রঘুর চাইতে তুই আরও বড়ো চোর। প্লিজ সূর্য, অন্তত পনেরটা দিন তুই আমার সঙ্গে কথা বলবি না।

—তুই থাকতে পারবি?

—জানি না, যা। তবে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কোথায়?

সময় পেরিয়ে গেল কিন্তু রকেট বাস আর দেখা হল না দ্বীপীর। হয়ত বাসটা গিয়েছিল, দীর্ঘ অপেক্ষার ঘুম চোখে আর দেখা হয়নি।

তখন রাত্রি দুটো বা তারও বেশি হবে হঠাৎ ঘুম ভেঙে সূর্যাক্ষ দেখল তার মাথার চুল হিম পড়ে ভিজে গেছে। দ্বীপী খোলা আকাশের নীচে শুয়ে আছে তার বুকে মাথা রেখে। জড়তায় ধড়ফড়িয়ে উঠে বসতে গেলেই সূর্যাক্ষ টের পায় মেয়েদের মাথার চুল কচুরিপানার শেকড়ের চেয়েও ভারী।

মেয়েদের চুলে হাত দিতে নেই তবু গোপনে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল সূর্যাক্ষ। ঘুমিয়ে থাকলে মেয়েদের রূপটা রাতের শাপলা ফুলের চেয়েও নজরকাড়া। সূর্যাক্ষর চোখের তারা কেঁপে গেল। দ্বীপী এত সুন্দরী, কই আগে তো তার কোনোদিন মনে হয়নি। দ্বীপীকে তার মনে হল ঘন পাতার আড়ালে ফুটে থাকা কাঁঠালীচাঁপা ফুল। সুগন্ধে ম-ম করছে রাতের বাতাস। অকাতরে ঘুমাচ্ছে তবু তাকে জাগাতেই হবে।

—দ্বীপী, এই দ্বীপী ওঠ।

মুখের দু'পাশ হাত দিয়ে ঘষে নিয়ে দ্বীপী স্বপ্নময় আচ্ছন্নতার মধ্যে উঠে বলল, আক্ষেপ বেজে উঠল তার গলায়, ইস, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রকেট বাস কি চলে গিয়েছে?

—জানি না, আমারও তো তোর মতন দশা। তবে বুকটা বড়ো ব্যথা করছে।

—কেন রে, কি হল আবার?

—কিছুই হয়নি, তোর মাথাটা ভীষণ ভারী।

—তার মানে?

—মানেটা নাই বা বললাম। শুনলে তুই খুব অবাক হবি, নয়ত রাগ করবি।

—আমি কোনো দোষ করেছি বুঝি?

—না।

—তাহলে? তুই কি কিছু দেখেছিস?

—হ্যাঁ।

—কি দেখেছিস?

—কত কি দেখেছি। সব তোকে বলতে হবে?

মুখ শুকিয়ে গেল দ্বীপীর, কথা আটকে গেল গলায়। লজ্জা এসে রাঙিয়ে দিল ওর কাঁঠালকোয়া মুখ।

সূর্যাক্ষ বলল, শুয়ে থাকলে মেয়েরা আকাশের তারা হয়ে যায়। আজ বুঝতে পারলাম কথাটা কত সত্যি।

দ্বীপী ঠোঁট ওল্টাল কিন্তু ওর দিশেহারা চোখে কোনো ভাষা ছিল না। পৃথিবী নিজস্ব পথে ঘুরছিল তখনও।

বাংলা পরীক্ষা সবারই ভালো হয়েছে, খুবই সাধারণ মানের প্রশ্নপত্র, ছাত্র-ঠকানোর কোনো দূরভিসন্ধি ছিল না। ফার্স্ট পেপারটায় বড়ো বেশি লিখতে হল সূর্যাক্ষদের, তবে গুছিয়ে লিখলে আরও হয়ত একখানা লুজ সিট কম নিতে হত তাকে।

দ্বীপী রিকশা করে ফিরে এল সেন্টার থেকে। সাদা নীল পাড় শাড়িতে তাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। গায়ে গাঢ় নীলরঙের ব্লাউজ, যেন কামড়ে ধরেছে শরীরের মাংস, এমন চেপে আছে শরীরে। লিটন, সূর্যাক্ষরা হেঁটে আসছিল জাতীয় সড়ক ধরে।

একটা পরীক্ষা শেষ হওয়া মানে ঘাড় থেকে একমণি বস্তা নেমে যাওয়া। সূর্যাক্ষ হাঁটতে হাঁটতে লিটনকে শুধালো, কেমন হয়েছে রে তোর পরীক্ষা?

লিটন বেশ মুডেই ছিল, ভদভদ করে বলল, এত ভালো কশ্চিন এলে কে খারাপ পরীক্ষা দেবে বল? তাছাড়া মাতৃভাষা সবার ভালো হবে। তাছাড়া তমালবাবু যেভাবে বাংলা পড়ান তাতে ক্লাসেই সবার পড়া হয়ে যায়। ওঁর মতন সবাই যদি যত্ন নিয়ে পড়াতেন তাহলে আর চিন্তা ছিল না।

লিটন যা বলল তাতে কোনো খাদ নেই। সত্যিই তমালবাবুর কোনো তুলনাই চলে না কারোর সঙ্গে। তাঁর কোনো ছেলেমেয়ে নেই অথচ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপর তাঁর যে অগাধ টান, মায়া মমতা স্নেহ ভালোবাসা একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

আজ পবীক্ষার হলে তমালবাবু এসেছিলেন হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে। সমস্ত ক্লাস রুম ঘুরে ঘুরে দেখলেন। এমন কি ঐশীর কাছেও গেলেন। ঐশী শুধুমাত্র তাদের স্কুলের নয়, আশেপাশের গ্রামগুলোর মধ্যে সব চাইতে সুন্দরী মেয়ে। ওর দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া বড়ো কঠিন

হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েটা এত সুন্দরী তবু তার কোনো রূপের বড়াই নেই। সূর্যাক্ষর মনে হয় ঐশী মৃন্ময়ী দুর্গাঠাকুরের রক্ত-মাংসের সাক্ষাৎ রূপ।

সেই ঐশীর ঘুসঘুসে জ্বরের পর পক্স বেরিয়েছে সারা গায়ে, বেশ বড়ো বড়ো জলঠোসার মতো, তার এখন হাঁটতে, কথা বলতে এমন কি বেশি সময় ধরে বসে থাকতে কষ্ট হয়। সে শুয়ে শুয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে আলাদা ঘরে, ইস্কুলের বাঁ পাশে, প্রাইমারী ক্লাসরুমে তার জন্য ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে মশারি টাঙানো সব সময়, একজন মহিলা পিওন ঘরের বাইরে টুল নিয়ে বসে আছে। ঐশী জল চাইলে তাকে জল দেবে, বাথরুমে যেতে চাইলে মহিলাটি তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাবে।

হেডমাস্টারমশাই আর তমালবাবু ঐশীর ঘরে গেলেন, দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, তোমার এই অবস্থার জন্য খুব খারাপ লাগছে। তবে মনোবল হারিও না। সবরকম পরিস্থিতিকে যে মানিয়ে নিতে পারে সেই-ই তো আসল মানুষ। তা ঐশী, তোমার বাড়ি থেকে কে কে এসেছেন?

ঐশীদের বাড়ির অবস্থা বেশ ভালো, তাদের একটা টালি কারখানা, পাটের রমরমা ব্যবসা ছাড়া চরে প্রায় দেড়শ বিঘার উপর জমি আছে আর বেশ বড়ো সড়ো পাকাবাড়ি। বাড়িতে ঢোকার মুখে খান তিনেক গোরুর গাড়ি, একটা লাল রঙের ট্রাক্টর দাঁড়িয়ে থাকে।

মাস্টারমশাইরা চলে যাওয়ার পর লিটন সূর্যাক্ষকে জিজ্ঞাসা করল, মেঘনাথ বধ কাব্যটা কার লেখা রে? মাইরি কিছুতেই মনে পড়ছে না, সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

লিখতে লিখতে হাসি আর চেপে রাখতে পারেনি সূর্যাক্ষ। সে তখন বাপ্পাদিত্যের প্রশ্নটার উত্তর লিখছিল। লিটনের খোঁচা খেয়ে বিরক্ত হয়ে তাকাল। লিটন চাপা গলায় প্রশ্ন করল, কি রে বল, কার লেখা? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের না?

সূর্যাক্ষ ধমকে উঠল, গাধা, ওটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নয়, মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মাসী! যা আর জ্বালাবি নে। আমাকে লিখতে দে।

কথা শেষ হল না, একেবারে দরজার ওপ্রান্ত থেকে জাঁহাবাজ গলায় ভেসে এল, ডোন্ট টক। ইউ, ইউ, আমি তোমাকেই বলছি! গার্ড দেওয়া শিক্ষকটি এগিয়ে এলেন সূর্যাক্ষর সামনে, গম্ভীর গলায় বললেন, মনে রেখো এটা পরীক্ষার হল, মাছের বাজার নয়। আবার যদি কথা বলতে শুনি তাহলে অন্য জায়গায় বসিয়ে দেব।

সূর্যাক্ষ মুখ নামিয়ে নিল, ওকে সবাই দেখছে। লিটন বেশ মজা পেয়েছে ঘটনাটায়। ঘন হওয়া গোঁফে হাসি মাখিয়ে সে রগড়ের চোখে তাকিয়ে আছে। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে সে শিক্ষকটিকে ডাকল, স্যার, এদিকে একটু...।

শিক্ষক এগিয়ে গেলেন, কি, কি বলতে চাও? আমি কিছু হেলপ করতে পারব না। আমি ফিজিক্স পড়াই। এটা আমার সাবজেক্ট নয়। যতটুকু জান, ততটুকু লেখো। ডোন্ট সাউট।

লিটনও সহজে ছাড়ার ছেলে নয়, স্যার লাস্ট-ইয়ার গণটোকাটুকি হয়েছে। এবছর একটু ঘাড় ঘোরালেই আপনি চেঁচিয়ে উঠছেন, এটা কি ঠিক? আমরা তো টুকলি করছি না, একটু ডাউট ক্লিয়ার করে নিচ্ছি। এতে দোষ কোথায়? বোর্ডের পরীক্ষায় এরকম একটু আধটু হয়েই থাকে। শিক্ষক রাগলেন না, বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকালেন, ইউ, ইউ, তোমার নাম কি? দেখি তোমার রোল নাম্বার। আই মাস্ট কমপ্লেন এগেনস্ট ইওর নেম। মাইন্ড ইউ! চুপচাপ বসো। ডিসটার্বিং এলিমেন্ট। পরিস্থিতি অনুকূল না দেখে লিটন ধপ করে বসে পড়ল।

হাঁটতে হাঁটতে এসব কথা ভাবতে মন্দ লাগছিল না সূর্যাক্ষর। এ সময়টা জাতীয় সড়কের চারপাশটা বড়ো মনোরম। রোদ কমে গিয়ে গাছের স্নেহের মতো নরম ছায়া নেমেছে। পশ্চিম

দিগন্তে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে আলোর রঙ। পাখির ডাক সেখানে আবহসংগীতের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে।

দ্বীপী সূর্যাক্ষদের দেখতে পেয়ে রিকশা থেকে নেমে পড়ল। কোমল আলোয় ওর মুখটাতে বুঝি শান্তির আগুন জ্বলছে। লালচে হয়ে আছে ওর পুরো মুখ। সামান্য চ্যাটচেটে ঘাম ফুটে উঠেছে সেই মুখে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল জ্বালাময়ী এক দীর্ঘস্থায়ী অশান্তি কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দ্বীপী সূর্যাক্ষর কোমরের কাছে জোরে চিমটি কেটে জিজ্ঞাসা করল, বটতলায় ঐশীর সঙ্গে তোর কি কথা হচ্ছিল রে? মেয়ে দেখলে একেবারে কাদার মতো লতলতে হয়ে যাস কেন? তোর হ্যাংলামী আর যাবে না।

সূর্যাক্ষ অবাক হল না, সে জানে এটা দ্বীপীর পুরনো রোগ, তুই দেখেছিলি বুঝি?

—দেখব না, আমি কি অন্ধ? ঝাঁঝিয়ে উঠল দ্বীপী।

সূর্যাক্ষ মন খারাপ করে বলল, ওর জন্য কষ্ট হয়। আহারে অত ভালো মুখ যার তারই শেষ পর্যন্ত পক্স বেরিয়ে গেল। মুখে নিশ্চয়ই কালো কালো দাগ হয়ে যাবে। তখন কেমন দেখতে হবে ঐশী কে জানে?

—ওর চিন্তায় তোর দেখছি ঘুম আসছে না। দ্বীপী কটাক্ষ করল।

সূর্যাক্ষ সহজভাবে বলল, পক্সের জ্বালা তুই আর কি করে বুঝবি বল? যাকে সাপে কামড়ায়নি সে কি সাপের বিষের জ্বালা বোঝে রে। ছোটবেলায় আমার পক্স হয়েছিল। এক মাসের উপরে ভুগেছি। মা মাছ-মাংস কিছু খেতে দিত না। সব মনে আছে।

দ্বীপী এসব কথা গায়ে মাখল না, শুধু কটমট করে তাকাল, ঐশী তোকে কি বলল বললি না তো?

—ওই রকম অবস্থায় কি কিছু বলা যায়, নাকি বলা সম্ভব?

—ও নিশ্চয়ই তোকে কিছু বলেছে। আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি। ওর মতন শয়তান মেয়ে খুব কম আছে। দ্বীপীর সাদা চোখের জমিতে লালচে আভা ফুটে বেরল, তুই জানিস না সূর্য, ও দেখতে সুন্দরী বলে কত ছেলের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ায়। ওর কেমিস্ট্রি বইতে আমি দুটো চিঠি পেয়েছিলাম। তোকে দেখাতে পারি।

—না, না। আমাকে আর দেখানোর দরকার নেই।

—আমি জানি তুই দেখবি না। তুই তো—

—থামলি কেন? বলে ফেল—।

—হ্যাঁ, বলছি। ভাবিস না, আমি তোকে ভয় পাই। থানাপাড়ার আকাশদার সঙ্গে ওর প্রেম চলছে। দ্বীপী কথাগুলো বলে শান্ত হল।

কথাগুলো শুনে সূর্যাক্ষ বলল, প্রেম করা কি অন্যায়? সবাই কি তোর আমার মতো বোকা নাকি?

—কি বললি? একথা বলে তুই কি বোঝাতে চাইছিস?

—তুই খুব ঝগড়া করার মুডে আছিস আজ। নিশ্চয়ই তোর পরীক্ষা ভীষণ ভালো হয়েছে। দ্বীপী থামল না, তোর সাথে কথা বলতে আমার ভালো লাগছে না।

—একটু গুড়াখু দিয়ে দাঁত মেজে নে তাহলে মুড ফ্রেশ হয়ে যাবে।

—ওসব বদ-অভ্যাস আমি কবে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। আমি তোর মতো নইরে। তোর তো মাঝেমাঝে মুখ দিয়ে বিড়ির গন্ধ বেরয়।

—পুরুষ মানুষের মুখ দিয়ে বিড়ির গন্ধ বেরবে না তো ধুনোর গন্ধ বেরবে? আমাদের মধু

খাওয়া মুখ নয় বুঝলি? সূর্যাক্ষর কথাগুলো দ্বীপীর গায়ে চিমটি কাটল।

দ্বীপী চুপ করে থাকার মেয়ে নয়, হাত নেড়ে নেড়ে সে বলল, মধু খাওয়ার ভাগ্য আর তোর কোথায় হল? আর খেলেও নিমফুলের মধু খেয়েছিস। সেইজন্য কথাবার্তার তোর কোনো ছিরি নেই।

সূর্যাক্ষর আর লড়াই-ঝগড়াতে মন করছিল না, সে চাইছিল সন্ধি। অনেকটাই আপোষের সঙ্গে সে বলল, আচ্ছা তুই কি চাইছিস বল তো?

—আমি যা চাই তা তো আগেই বলেছি। দ্বীপী হাঁপাচ্ছিল, তুই ঐশীর সঙ্গে মিশবি না। আর যেন কোনোদিন ওর সঙ্গে কথা বলতে না দেখি। ও ভালো মেয়ে নয়, আমাকে হিংসা করে।

সূর্যাক্ষ অনেক কিছুই বলতে পারত কিন্তু সে চুপ করে থাকল। ওদের মধ্যে মধ্যস্থতায় এগিয়ে এল লিটন, ঝামেলা মিটল তোদের? পরীক্ষা দিতে এসে এসব মান-অভিমানের পালা আর ভালো লাগছে না। আমাদের ইস্কুলটার তোরাই বদনাম করে ছাড়বি।

কথা নয় যেন অ্যাসিডের ছিটে, জ্বলে উঠল দ্বীপী, তোর সাহস তো কম নয়, এ কথা তুই বলতে পারলি? কেন বললি বল? কি দেখেছিস?

নিমেষে বেলুন চুপসান চুপসে গেল লিটন, ঢোক গিলে বলল, কথাটা মুখে এল তাই বলে ফেললাম। মনে কিছু করিস না।

—জুতো মেরে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করা যায়? দ্বীপীর রাগ তখনও পড়েনি।

সূর্যাক্ষ শান্ত করল তাকে, চুপ কর। ও তো ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে।

—ক্ষমা চাইলেই সব হয়ে যায়? দ্বীপী কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না কথাটা।

খিরিষগাছের পাশ দিয়ে রাস্তাটা নেমে গেছে বাঁ দিকে। তার কিছু দূরে পরপর দাঁড়িয়ে আছে নিরীহ কটা তালগাছ। তালগাছের হাত পাঁচেক দূরে টলটলে জলের বড়ো একটা পুকুর। হাড়মটমটি ঝোপের পাশ দিয়ে দেখা যায় দেবগ্রামের গোরুর হাট। ঘাসহীন জায়গাটায় রবিবারে গোরুর ক্ষুরে ধুলো ওড়ে। গোরু-মোষের চিৎকারে, মানুষের ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তায় জায়গাটা জমজমাট থাকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত। মানিকডিহি থেকে সাইকেল চালিয়ে সূর্য আর তার বন্ধুরা হাট অবধি আসত গল্পে-গল্পে। এসব বেশি দিনের কথা নয়, সূর্যর যেন সব পর পর মনে পড়ে যায়।

রবিবার ছাড়া হাটের দিকে তাকালে মন খারাপ হতে বাধ্য। ফাঁকা মাঠটা তখন ঘুমোয়, বিশ্রাম করে। গোরুর পায়ের ক্ষুরের দাগগুলো ধুলোয় ঢাকা পড়ে যায় তখন।

সূর্য থাকতে না পেরে বলল, দ্বীপী, জানিস গোরুর হাটের কাছে একটা বরফ কল আছে। ওখানে লাল-সাদা-হলুদ রঙের আইসক্রীম পাওয়া যায়। এখন ওখানে দুধমালাইও বানাচ্ছে। আগে দুধমালাই বেলডাঙা থেকে আসত।

দ্বীপীর এসব ছেলেভুলানো কথা শোনার কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না সে চুপচাপ হাঁটছিল। তার চোখ টেলিগ্রাফ তারের উপর। গোল খুঁটির উপর তারগুলোকে ধরে রেখেছে সাদা কাপের মতো দেখতে চীনামাটির ইনসুলেটর। টান টান তারের উপর বসে আছে পিচের চেয়েও কালো রঙের একটা ফিঙে পাখি। পাখিটার নজর উড়ে বেড়ান ঘাসফড়িংগুলোর দিকে। ডানা কাঁপিয়ে উড়ে গিয়ে ছোঁ মেরে ফড়িং ধরায় বুঝি অনেক সুখ, পড়ন্ত বেলায় আহারের জন্য এই সান্ধ্য-শিকার ফিঙে পাখিদের কাছে বুঝি রীতিমতো উপভোগ্য।

দ্বীপীর ভালো লাগে না এই জবরদখল। চোখ সরিয়ে নিয়ে সে নিজেকে স্বাভাবিক করার খেলায় মেতেছে। আগামীকাল কোনো পরীক্ষা নেই। অথচ চিন্তামুক্ত হতে পারছে না সে। ছোটছোট

ঘটনায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে মনটা। আর ক'পা হাঁটলেই ভাড়া বাড়িটাতে পৌঁছে যাবে ওরা। দ্বীপী ভাবল আজ আর সে ছাদে যাবে না। চোখে মুখে জল দিয়ে একটু গড়িয়ে নেবে বিছানায়। সারাদিন যা ধকল গেল টনটন করছে শিরদাঁড়া। টানটান হয়ে ঘুমালে শুধু শিরদাঁড়া নয়, মনটাও তার জুড়াবে।

সন্ধের পর থেকেই গাড়ি ঘোড়ার যাতায়াত বেড়ে যায় রাস্তায়। ভারী ট্রাকের শব্দে কাঁপতে থাকে মাটি। যেন মৃদু ভূমিকম্পে নড়ে উঠছে ঘরবাড়ি।

হালকা টিফিন খাওয়ার পর থেকে যে যার মতো বই নিয়ে বসে গিয়েছে পড়তে। অষ্টমী রান্নার কাজে এদিকে আর আসার সময় পায় না। এতগুলো মানুষের রান্নাবান্না নিয়ে সে রীতিমত হিমসিম খাচ্ছে।

বাথরুমে যাবার নাম করে লিটন উঠে গিয়েছে মিনিট দশেক আগে। টানা পড়ার অভ্যাস তার কোনোদিনও ছিল না। একভাবে বসে থাকলে তার মাথায় ঘুঘরোপোকা ঘোরে।

লরির শব্দটা হাইওয়ে থেকে মিলিয়ে যেতেই হঠাৎই গোঙানীর একটা শব্দ বাথরুম থেকে ভেসে এল সূর্যাক্ষর কানে। কেউ গলা টিপে ধরেছে এমন ঘড়ঘড় আওয়াজ।

সূর্যাক্ষ, দ্বীপী এবং অন্যান্যারা একে অপরের দিকে তাকাল, তারপর সন্দেহ হতেই দৌড়ে গেল বাথরুমের দিকে। অষ্টমীও না থাকতে পেরে তাদের পেছন পেছন গেল।

বাথরুমের কোণে হতভম্ব শরীর নিয়ে দাঁড়িয়েছিল লিটন। সারা গায়ে হরলিকসের গুঁড়ো। ঢাকনা খোলা নতুন শিশিটা পড়ে আছে সামনে। সেদিকে কোনো লক্ষ্য নেই লিটনের। জোরে জোরে শ্বাস টেনে সে গোঙানীকে এখন নিজের বশে আনতে অক্ষম। বেশ বোঝা যাচ্ছিল তার কষ্টটা সময়ের সাথে সাথে বাড়ছে।

—তোর কি হয়েছে? সবার আগে বাথরুমের ভেতরে ঢুকে গেল দ্বীপী। তার চোখে মুখে ভয়। নিজেকে সামলে নিয়ে সে লিটনের হাত শক্ত করে চেপে ধরল। লিটনের মুখের চারপাশে ঘাম আর লালায় চ্যাটচেটে হরলিকস। ঠোঁটেও তার ছোঁয়া, যেন শ্বেতী হয়েছে।

শ্বাসকষ্টে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আমার উপক্রম হল লিটনের। সেইসঙ্গে বাড়ছিল গোঙানীর মাত্রা। নিদারুণ কষ্টে টলটলিয়ে উঠল ওর চোখের তারা। শুধু মুখ নয়, সারা শরীরে ফুটে উঠল সেই অস্বাভাবিকতা। বুক চাপা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে স্যাঁতসেঁতে মেঝেতেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল লিটন। বেশিক্ষণ বসে থাকার ক্ষমতা ছিল না তার, একসময় শরীর এলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে ভেজা বাথরুমে।

অষ্টমী এসব দেখে হাউ হাউ কান্নায় আলগা করে দিল নিজেকে। বুকের কাপড় সরে গেল তার অসাবধানে। চুল আছাড় দিয়ে পড়ল মুখের উপর। এই অবস্থায় কোনোমতে টলতে টলতে সে ছুটে গেল ঘরের দিকে। হাতপাখা আর এক জগ জল নিয়ে ফিরে এল সে দ্রুত। এখন আর শব্দ নেই, শুধু চোখ বেয়ে অনর্গল ধারা নামছিল অষ্টমীর, মা বুড়োমা, মাগো মা, একি করলে? কাঁপতে কাঁপতে নিজের তর্জনী জোর করে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল লিটনের মুখের ভেতর। বহু কষ্টে বের করে আনল লালা থুতু আর কফ মিশ্রিত হরলিকস।

সূর্যাক্ষ ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিছুটা আন্দাজ করে সে বলল, মনে হয় শ্বাসনালীতে হরলিকস আটকে গিয়েছে। তাড়াহুড়ো করে খেতে গেলে অনেকসময় এমন বিপদ হয়।

—ও কথা বলো না গো, ছেলের কিছু হলে আমি যে শেষ হয়ে যাব। সুর করে ডুকরে উঠল অষ্টমী। মুখে আঙুল ঢুকিয়ে দলা পাকানো হরলিকসগুলো বহু কষ্টে বের করে আনল অষ্টমী। তার কপালে ফুটে উঠল বোঁদের মতো বিন্দু বিন্দু ঘামের দলা। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অষ্টমী

আর দ্বীপীর যৌথ প্রচেষ্টায় লিটনের গলার ঘড়ঘড়ানী আওয়াজটা বন্ধ হল। তখনও উঠে বসার ক্ষমতা ছিল না তার।

অষ্টমী তাকে চায়ের চামচে জল খাওয়াল। দ্বীপী তার বুক ডলে দিতে দিতে একসময় জিজ্ঞাসা করল, এখন কেমন মনে হচ্ছে তোর?

ভ্যালভেলিয়ে চারপাশে দৃষ্টি ঘোরাল লিটন, আস্তে আস্তে বলল, আগের চেয়ে একটু ভালো। আমার হাতটা ধর তো, উঠে বসি। পিঠে বড়ো ঠাণ্ডা লাগছে। অষ্টমী বুক হালকা করে শ্বাস ছেড়ে লিটনের মুখের দিকে তাকাল, হরলিকস খেতে মন চায় তো আমাকে বললি না কেন? আমি বানিয়ে দিতাম।

—ওটা তো সূর্যর হরলিকস। লিটন অপরাধীর মতো মুখ কাচুমাচু করে বলল, বাবাকে বলেছিলাম একটা কিনে দিতে। বাবা পয়সার অভাবে পারেনি। অথচ গুঁড়ো হরলিকস খেতে আমার খুব ভালো লাগে।

—ভালো জিনিস তো খেতে ভালো লাগে, তা বলে এই ভাবে? অষ্টমী ধীরে ধীরে তেতে উঠছিল, বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে সে এবার ছেলেকে শিক্ষা দেবার জন্য ব্যস্ত, শেষপর্যন্ত তুই খাওয়ার জন্য চুরি করলি? ছিঃ। তোর বাবা কত কষ্ট করে তোকে পড়াচ্ছে। তার মূল্য তুই এভাবে দিলি?

অষ্টমী যা বলছে তা সত্যি। তবু কথাগুলো কানে লাগছে দ্বীপীর। সে চাপা গলায় সতর্ক করল অষ্টমীকে, আঃ মাসী ছাড়ো তো এসব কথা। এখন এসব কথা বলে কোনো লাভ হবে কি?

—লাভ-ক্ষতির কথা নয়, চুরি করে খেতে গিয়ে ওর যদি কিছু হয়ে যেত? কষ্টে চোখবন্ধ হয়ে এল অষ্টমীর। মনের দুঃখে কেঁদে ফেলল সে।

লিটন মেঝেতে দু'হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বুকের কাছে ব্যথাটা পুরোপুরি মেলায়নি এখনও। গলাটাও চিরে আছে, সেখানেও ব্যথা।

নীরবে লিটন হেঁটে গেল ঘরের কাছে। হাত উঠিয়ে ডাকল, এই সূর্য, শোন।

—শোনার কিছু নেই। তুই একটু রেস্ট নে।

দ্বীপী সমর্থন করল, সূর্য ঠিকই বলেছে। আর কথা বলিস না তুই। বিছানা পেতে শুয়ে পড় তো।

—আমি ঠিক হয়ে গিয়েছি, আর ভয় নেই। লিটন জোর করে বলল, সূর্য, তোর কাছে আমি ঋণী হয়ে গেলাম।

—বন্ধুর কাছে ঋণী হলে কিছু যায় আসে না। সূর্য হাসল।

লিটন হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলল ঝরঝরিয়ে। লিটনের হাতটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল সূর্য। এমন দৃশ্যে দ্বীপী খুঁজে পেল তার হারানো মাটি।

ফেরার দিন কালীগঞ্জের বাসটা ভরে গিয়েছে যাত্রীতে। কেমন যেন মন খারাপ করছিল সূর্যাক্ষর। কটা দিন বেশ আনন্দেই কাটল ওদের। শেষের দিন অমলকান্তিবাবু এসেছিলেন। তাঁর কেসটা মিটে গিয়েছে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে ফিরে এসেছেন তিনি। শিবনাথবাবু এখন লজ্জায় আর তার দিকে তাকাল না।

অমলকান্তিবাবু সূর্যাক্ষদের পরীক্ষার পরে ডাকলেন, বেশ আবেগঝরা গলায় বললেন, এবার থেকে তোমাদের আলাদা জীবন শুরু হবে। স্কুলের গণ্ডি আজ তোমাদের শেষ হল।

সূর্যাক্ষ ভাবছিল অন্যকথা। সব কি শেষ হয়ে যায় নাকি শেষ হয়ে শুরু হয় আবার।

বাসটা ছেড়ে দিতেই ধুলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জানলার উপর। দেবগ্রাম ছাড়িয়ে বাস ছুটছিল হাটগাছার দিকে। দু'পাশে ছড়ানো মাঠ। মাঠ ভরে আছে আখের পাতায়। আলসের ভেতর হাওয়া ঢুকে সুড়সুড়ি দেয়। হাওয়া মানে মুঠো মুঠো অক্সিজেন।

দূর মাঠে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে শুকনো পাতায়। পড়পড় করে পুড়ছে পুরনো ছাল বাকল। এখন আর পাতা নয় শুধু দেখা যাচ্ছে আগুন আর আগুনের শিখা।

আগুনের আরাধনায় মানুষ হয়ে উঠবে আগুনের পদ, অবশেষে পদাবলি। যাত্রাপথের শুরুতেই সূর্যাক্ষ টের পায় মাটি তেতে ওঠার আগেই বৃষ্টির ভীষণ প্রয়োজন।

কাঠটগর গাছের পাতাগুলো আলকেউটে সাপের ফণার চেয়েও চওড়া। এই গাছটার কাছে দাঁড়ালে সূর্যাক্ষর মনে হয় প্রখর রৌদ্র দিনেও ছাতার কোনো প্রয়োজন হবে না। এর মোটা পাতাগুলোর শিরা-উপশিরা দেখা যায় স্পষ্ট। ঈষৎ কালচে সবুজে মেশান পাতাগুলো বুঝি রঘুনাথের গায়ের রঙকে মনে করিয়ে দেয়।

রঘুনাথের কথা মনে পড়তেই সূর্যাক্ষর মনের ভেতরে কেমন একটা অপরাধবোধ জেগে উঠল। পরীক্ষার ব্যস্ততায় রঘুনাথের সঙ্গে অনেকদিন তার যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি। মীনাক্ষীও চান না তার ছেলে বখাটে হয়ে যাওয়া ধাওড়াপাড়ার ছেলেটার সঙ্গে যোগাযোগ রাখুক। রঘুনাথকে তিনি ভেবেছিলেন নিষ্পাপ সরল সাধাসিধে একজন ছোকরা। ধীরে ধীরে তার সব গুণ প্রকাশ হল। গ্রামে থাকলে সব কথা কানে আসে তার। আর আসবেই না কেন? রঘুনাথ যে এখানে দু'চারবার রাত্রিবাস করে গিয়েছে। গ্রামের মানুষ চোখ বুজে থাকে না। সুযোগ বুঝে তারাই সমালোচনার ঝড় তুলেছে।

নীলাক্ষবাবুর বাড়িতে যে ডাকাতিটা হল তাতে সবাই ধরে নিয়েছে এর পেছনে রঘুনাথের হাত কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে আছে। গুয়ারামের মারের বদলা সে না নিয়ে ছাড়বে না। এটা হল সেই বদলা। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ না থাকায় থানা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

সেই থেকে বুক ফুলিয়ে বাঁধের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে রঘুনাথ। তার মনে থানা পুলিশ নিয়ে আর কোনো ভয় ডর নেই। সৎপথে থাকলে আবার ভয় কিসের?

সূর্যাক্ষ সাইকেলটা নিয়ে গেটের বাইরে আসতে গেলেই মীনাক্ষী গলা উঁচিয়ে বললেন, রোদে রোদে এখন আবার যাচ্ছিস কোথায়?

কি উত্তর দেবে সূর্যাক্ষ এক মুহূর্ত ভেবে নিল। রঘুনাথের গ্রামে যাচ্ছি এটা বলা উচিত হবে না। রঘুনাথের নামটায় মীনাক্ষীর গায়ে আমবাত বেরিয়ে যাবে—এসব ভেবে সূর্যাক্ষ বলল, গঙ্গার ধার থেকে একটু ঘুরে আসি মা। ওদিকটায় অনেকদিন যাওয়া হয়নি।

—নৌকায় যেন চাপবি না। মীনাক্ষী সতর্ক করলেন, বল্লভপাড়ার ঘাটে ফেরি উল্টে গিয়ে তেরোজন মারা গিয়েছে—শুনেছিস নিশ্চয়ই। এখনও অনেকের দেহ পাওয়া যায়নি।

—যারা ডুবে গিয়েছে তারা সাঁতার জানত না।

—সাঁতার জানলেও জলের কাছে কোনো বিদ্যে খাটে না। মীনাক্ষী অসন্তুষ্ট হলেন। যাচ্ছিস যখন যা। তবে দুপুরের আগে চলে আসবি। আমি ভাত নিয়ে বসে থাকতে পারব না।

ঘাড় নেড়ে সাইকেলে চাপতে গেলে মীনাক্ষী গেটের সামনে এসে বললেন, ফেরার পথে তোর জ্যাঠাকে দেখে আসবি। কাল কমল এসে বলছিল ওঁর শরীরটা ভালো নেই। ডাকাতরা যেভাবে ওকে মেরেছে ওভাবে কেউ গোরু-ছাগলকে মারে না।

সূর্যাক্ষর ঠোঁটের কাছে একটা মোক্ষম উত্তর চুলবুল করছিল, কিন্তু সে চেপে গেল। তার জ্যাঠামশাই গুয়ারামের অকাল প্রয়াণের কারণ এটা সে ভালোভাবে জানে। কেউ যদি কারোর মৃত্যুর কারণ হয় তাহলে তাকে সে কারণের জন্য উপযুক্ত খাজনা দিয়ে যেতে হয়। এই জীবনের পাপ অন্য জীবনে পরিশোধ হবে এখন আর তেমন হিসাব খাটে না।

সাইকেল নিয়ে সোজা বাঁধের উপর উঠে এল সূর্যাক্ষ। বাঁধের উপর দাঁড়ালে পুরো আকাশটাকে মনে হয় কত আপন! নীল রঙটা তার খুব পছন্দ। দ্বীপীর মন ভালো থাকলে গালে টোল ফেলে সে বলে, তুই নীল রঙের জামা পরলে তোকে মনে হয় ফুলে বোঝাই অপরাজিতা লতা। এক একটা রঙ, এক এক জনকে দারুণ মানায়।

কি তাকে মানায়—এসব নিয়ে ভাবে নি সে। তবে দ্বীপীর কথাগুলো তার শুনতে ভালো লাগে। দ্বীপী তাকে কালীগঞ্জ বাজার থেকে একটা নীল রঙের রুমাল কিনে দিয়েছে। সেই রুমালটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে সূর্যাক্ষ। কলকাতায় পড়তে গেলে রুমালটা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

রোদ মাথায় নিয়ে গাঙধারের ঝাউগাছগুলো যেন হাতের ইশারা করে ডাকছে সূর্যাক্ষকে। সূর্যাক্ষ আপন মনে হেসে উঠল। সাহেব মাঠে আখ কাটা শেষ। মাঠ এখন ফাঁকা। আলসে পুড়িয়ে দেবার পর পড়ে আছে কালো কালো ছাইয়ের পাহাড়। গাঙ-পালানো হাওয়া এলে সেই ছাই হয়ে যায় এক একটা রাগী ক্রোধী ভোমরা। মাথা সমান উঁচুতে উঠে তারা হাওয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে উড়তে থাকে, তারপর শূন্যে ভাসতে ভাসতে কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

এই বাঁধের উপর সূর্যাক্ষর মায়াটা যত দিন যাচ্ছে তত যেন ঘনীভূত হচ্ছে। এই গ্রাম, এই বাঁধ এই চেনা পরিবেশ ছেড়ে সে কোথাও গিয়ে শান্তি পাবে না। পরীক্ষা দিতে গিয়ে মাত্র পনের দিনে হাঁপিয়ে উঠেছিল সে। দু'চোখ যেন খুঁজত কাউকে। কাকে খুঁজত সেটা টের পেল ফিরে আসার দিন। বাঁধে বাঁধে ফেরার সময় কত হালকাবোধ হচ্ছিল নিজেকে। মনে হচ্ছিল যেন নিজের চেনা বিছানায় শোওয়ার জন্য এই উন্মুক্ত প্রকৃতি সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছে—যা দেবগ্রামে ছিল না। তাহলেও নির্জন ছাদে বসে ঘন অন্ধকারে দ্বীপীর সঙ্গে রকেটবাস দেখার অভিজ্ঞতার কথা তার দীর্ঘদিন মনে থাকবে।

প্রথম রাতে ব্যর্থ হলেও তৃতীয় রাত্রে সফল হয়েছিল তারা। লম্বা বাসটার মাথায় সাইরেন আর সার্চ লাইট। তার গতি পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো। রাতের স্তব্ধতাকে খানখান করে বাসটা ছুটে যাচ্ছিল শিলিগুড়ির দিকে। বাসটা চলে যাওয়ার পর একরাশ শূন্যতা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওদের দু'জনের মাঝখানে। দ্বীপী মন খারাপ করা গলায় বলেছিল, বাসটাকে দেখতে না পেলে বুঝি ভালো হত।

—কেন?

—জমিয়ে রাখা আগ্রহটা গলে জল হয়ে গেল।

—মানছি। তবে কৌতূহল শেষ হলে নতুন কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। আর এই প্রসেসটা না থাকলে পৃথিবী একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যেত।

—সূর্য, একটা কথা বলব। রাগ করবি না। দ্বীপী গম্ভীর চোখে তাকিয়ে বলল, পণ্ডিত বিলের

তলায় কি আমরা জানি না। জেনে গেলে কি ভালো লাগবে বল? তেমনি আমরা দু'জন যদি দু'জনকে জেনে যাই তখন ভালোলাগাটা কি আগের মতো কাজ করবে? তোর কি মনে হয়?

—মানুষকে জানা-চেনা এক জীবনেও সম্ভব নয়। আমার মা বলে—মানুষ সমুদ্রের চেয়েও বিশাল। পৃথিবীর সব চাইতে মজার আর কঠিন পাঠ মানুষকে পাঠ করা। সূর্যাক্ষ পূর্ণতার হাসি হাসল, তাই বলছিলাম কি প্রতি মুহূর্তে মানুষ নিজেকে সবদিক থেকে বদলে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। রোদ্দুরের ভাষা যেমন বোঝা যায় না, তেমনি মনুষ্য চরিত্রও অবোধ্য।

হুম্। দ্বীপী শ্বাস ছেড়ে বলেছিল, শেষ পর্যন্ত তুই কি গোরাসাধুর মতন আধ্যাত্মিক লাইনে চলে যাবি?

—আমি একদিন আগে কি হবে তাই জানি না। অত বছর পরের কথা বলব কি করে? আমার লক্ষ্য কি জানিস? আমার হাতের মুঠায় যে দিনটা আছে সেই দিনটাকে শুধু উপভোগ করা, চিনে রাখা।

হলদিপোঁতা ধাওড়ার চেহারাটা মাঠ কুড়োনীর চুলের চেয়ে এলোমেলো। খড় পচে যাওয়া ঘরগুলোয় কত শান্তি আদৌ তা বোঝা যায় না। পাকুড় তলায় গোল্লাছুট খেলছিল ছেলে-মেয়েরা। সূর্যাক্ষকে সাইকেল থেকে নামতে দেখে ওরা খেলা থামিয়ে তাকাল।

টগরী সাহস করে এগিয়ে এসে বলল, তুমি রঘুদাকে খুঁচ্ছো তাই না? রঘুদা ঘরে আচে—যাও। একটু আগে পাকুড়তলা থেকে সে ঘরে গেল।

পুরো পাড়াটায় মাকড়সার জালের মতো অভাব তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। ভাঙা বেড়াটা সারিয়ে নেবার ক্ষমতা বুঝি রঘুনাথের ছিল না। ঘরে বসে সে ভাবছিল-সামনের দিনগুলো চলবে কি ভাবে? আখ কাটার পর ফাঁকা মাঠে এখন কোনো কাজ নেই। ট্রাক্টর দিয়ে লাঙলের কাজটা সারছে মালিকরা। এক কোপে অনেকগুলো রোজ বরবাদ হয়েছে মানুষের। দুলাল গালে হাত দিয়ে বলছিল, আর বাঁচা যাবে না। গাঁয়ে থাকা তো ভাগ্যে হল না, এবার ভাবছি শহরে পেলিয়ে যাব।

এই আক্ষেপ নিয়ে বছরের পর বছর বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। রঘুনাথ নিজের ভবিষ্যৎ-এর কথা ভাবতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছিল। দুর্গামণি ইদানীং খুব কম কথা বলছে তার সঙ্গে। গুয়ারাম গত হবার পর থেকে মনটা তার ভালো নেই। সে একটা দম দেওয়া পুতুলের মতো হয়ে গেছে। হাসি শুষে নিয়েছে শোক। জীবনে কোনো ছন্দ নেই। বেঁচে থাকাটাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে।

রঘুনাথ এক কাপ চায়ের জন্য উশখুশ করছিল, বাবু-ভদ্রলোকের নেশাটা তার ভেতরেও শেকড় চারিয়েছে। চায়ের কথা বলতেই দুর্গামণি ফুঁসে উঠল না কিন্তু এমন ভাবে তাকাল যাতে অবজ্ঞা ফুটে উঠল চৈত্রের রোদ্দুর হয়ে। রঘুনাথ অবাক করা চোখে তাকাল মায়ের দিকে। দুর্গামণি বিতৃষ্ণার মুখ তুলে বলল, ঘরে চা-পাতাও নেই। গুঁড়া দুধও নেই। চিনি ছিল, তা-ও শেষ। চা-কি হাত-পা সিজিয়ে বানিয়ে দেব?

এমন কথা বলা দুর্গামণির উচিত নয়, সামান্য এক কাপ চায়ের জন্য এত কথা? রঘুনাথ সব বুঝতে পেরেও চুপ করে রইল।

দুর্গামণি কি ভেবে বলল, চা খেতে যখন মন হয়েচে, করে দিচ্চি। যাই, ঝারির কাছ থিকে চা-পাতা উধার লিয়ে আসি।

ঘর থেকে বেরতেই সূর্যাক্ষকে দেখতে পেল দুর্গামণি। অমনি পুরনো রাগটা ছোবল মারল

মাথার ভেতর। মুখে কড়া শব্দ এসে জড়ো হল। বহু কষ্টে নিজেকে সামলাল সে। কোনো কথা না বলে আগড় খুলে বেরিয়ে গেল দুর্গামণি।

সূর্যাক্ষকে এ সময় দেখতে পাবে স্বপ্নেও আশা করেনি রঘুনাথ। উঠে দাঁড়িয়ে সে তাকে ডাকল, আয়, ভেতরে আয়।

বাইরে রোদ ফুটেছে কড়া ধাতের। হাওয়া থাকলেও তার জোর নেই একফোঁটা। গুমোট হয়ে আছে চারপাশ। এ সময় বাঁধের উপর ধুলো ওড়ে। শুষ্ক দেখায় মাঠঘাট। এমন কী গাছের পাতায় সবুজভাবটা ফিকে হতে থাকে। পণ্ডিতবিলে মাছ ধরার হিড়িক পড়ে যায়।

সূর্যাক্ষর প্রথম কথাটা অভিমানের স্তর ছুঁয়ে এল, হ্যাঁ রে রঘু, তুই একবার দেবগ্রামে যাওয়ার সময়ও পেলি না। আমি ভাবছিলাম আর কেউ না আসুক অন্তত রঘু আসবে।

রঘুনাথ আফসোসের সঙ্গে বলল, যেতে তো মন চেয়েছিল কিন্তু যাই কি করে বল তো? হাত বেবাক খালি। পায়ে হেঁটে গেলেও এই খরানীতে তোকে এট্টা ডাবও কিনে দিতে পারতাম নি।

—তাতে কি হয়েছে, তুই যেতে পারতিস!

—খালি হাতে যেতে মন টানল না। রঘুনাথ শুকনো মুখে বলল, বড়ো টানাটানি চলচে রে! কবে যে এ অভাব ঘুচবে মা শীতলাবুড়িই জানে।

সূর্যাক্ষ সব শুনল মন দিয়ে, তার মুখে কোনো ভাষা নেই। সাহেব মাঠে পুরো দমে কাজ শুরু না হলে ধাওড়া পাড়ায় কারোর মুখে হাসি ফুটবে না। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে অভাব ঠুকরাবে।

চা খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। একটা চারা জামগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রঘুনাথ জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে দ্বীপী কেমন আচে রে?

দ্বীপীর প্রসঙ্গ উঠতেই চমকে উঠল সূর্যাক্ষ। আজ লহরীকে দেখতে বেলডাঙা থেকে পাত্রপক্ষের লোক আসবে। দ্বীপী বলেছিল, আজ তাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করতে।

বেমালুম ভুলে গিয়েছে সূর্যাক্ষ। কাকা-কাকিমা কি ভাববেন? দ্বীপীই বা কি ভাববে? এত দূর এসে ফিরে যাওয়া পোষায় না। সূর্যাক্ষ নিজেকে চাপমুক্ত করে বলল, কুশল মাস্টারের সঙ্গে তোর কি আর দেখা হয়েছে?

কথা শেষ হল না, রঘুনাথ মন খারাপ করা গলায় বলল, মাস্টুরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেচে।

—তার মানে? সূর্যাক্ষর ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছিল।

রঘুনাথ সংক্রামিত হল না, ঠাণ্ডাভাবেই বলল, কেসনগরের পুলিশ তাকে ধরেচে। মারধোর করেচে শুনেচি। কিন্তু গিয়ে যে দেখে আসব তেমন সুযোগ আর হয়নি।

—মনে হচ্ছে এভাবেই সরকার আন্দোলনটাকে শেষ করে দেবে? বিড়বিড়িয়ে উঠল সূর্যাক্ষ। রঘুনাথ অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, কি রে কী হল তোর?

—না, কিছু না। অন্য একটা কথা ভাবছিলাম। সূর্যাক্ষ প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইল, জানিস রঘু, রেজাল্ট বেরলে আমি আর গ্রামে থাকব না। হয় কোলকাতা, না হয় বহরমপুর চলে যাব।

—ভালো কথা! রঘুনাথের মন খারাপ হয়ে গেল, তখন তোর সাথে আর দেখা হবে না।

—মাঝে মাঝে আসব, তখন দেখা হবে।

—এরকম অনেকেই বলে, পরে ভুলে যায়।

—আমি সবার মতো নই, আমি আলাদা। সূর্যাক্ষ জোর দিয়ে বলল।

রঘুনাথ বিষন্ন চোখে তাকাল, দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়!

ফিরে আসার সময় সূর্যাক্ষ জিজ্ঞাসা করল, আমাদের বাড়িতে কবে আসবি রঘু?

—যাব না রে, তোর মায়ের সামনে কুন মুখ নিয়ে যাব, বল?

—মা সব ভুলে গিয়েছে।

—এসব কথা কেউ কোনোদিন ভোলে না। ভালো কথা সবাই ভুলে যায়। রঘুনাথের গলার স্বর আর্দ্র হয়ে উঠল। মন খারাপের মোড়ক কেটে বেরিয়ে এল সে।

দ্বীপীদের বাড়িতে সূর্যাক্ষর জন্য অপেক্ষা করছিল আর এক বিস্ময়। বড়ো মেয়েকে দেখতে এসে দ্বীপীকে পছন্দ করে গেল পাত্রপক্ষ। লহরী সেই যে ঘরে ঢুকেছে লজ্জায় আর বেরচ্ছে না।

নিজেকে অপরাধী ভেবে দ্বীপীও বসে আছে মুখ গোমড়া করে। সূর্যাক্ষকে দেখে অভিমানে ভেঙে পড়ল সে, তোর এখন সময় হল আসার? এতক্ষণ কোথায় ছিলিস?

—ধাওড়াপাড়া থেকে ফিরে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—বাঃ, বেশ ভালো! দ্বীপী কথা দিয়ে খোঁচা মারল, এই না হলে ঘরের ছেলে!

—ভুল হয়ে গিয়েছে, প্লিজ আর কিছু বলিস না।

দ্বীপী ঠোঁট শক্ত করে বলল, তুই যদি থাকতিস হয়ত এমনটা হত না।

—যা হবার তা হয়েছে, ভেবে আর কি হবে বল?

—ভাবছি না, তবু ভাবনাটা জোর করে এসে যাচ্ছে। দ্বীপী বড়ো অসহায়, তার চোখ দুটো দুঃখ আর আক্ষেপে ভরে আছে।

সূর্যাক্ষ বলল, তোর কি মত?

—আমি এখনও কিছু ভাবিনি। তবে আগে আমি চাকরি করব তারপর অন্য কিছু।

—গ্রামের মেয়েরা তাড়াতাড়ি বিয়ে করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই ঝোঁকটা তোর মধ্যেও আছে। সূর্যাক্ষ মৃদু হাসল।

দ্বীপী চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে সবাই পারে। তুই খুব সাধারণ। আমি ভাবতাম তুই বুঝি বৃত্তের বাইরে।

—তোর কথাটা ঠিক বুঝলাম না? কি বলতে চাইছিস?

—তোকে আর কিছু বলার নেই। দ্বীপী দীর্ঘশ্বাস ভাসাল, তুই জলে নামবি অথচ চুল ভেজাবি না—এই তো?

—তার মানে?

—মানেটা বুঝে নে। দ্বীপী অবাক চোখে চেয়ে রইল, আচ্ছা সূর্য, তুই কাউকে ভালোবাসিস?

—একশবার ভালোবাসি।

—কি নাম তার?

—তোকে কেন সব কথা বলব? সময় আসলে সব জানতে পারবি।

আশাহত দ্বীপীর চোখে মেঘ এসে জড়ো হল। কাঁদতে পারল না, বুকে চেপে রইল কান্না, তুই এখন যা। আমাকে একা থাকতে দে।

—একা থাকলে কষ্ট আরও বাড়বে।

—আমার সব সহ্য করার ক্ষমতা আছে। জোর দিয়ে বলতে গিয়ে গলাটা ঝ্যানঝেনিয়ে উঠল দ্বীপীর। চোখে-মুখে হাত চেপে সে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বহু সাধ্য সাধনার পর দরজা খুলল লহরী। সে দ্বীপীকে খুঁজছিল। না দেখতে পেয়ে রাগে-ঈর্ষায় জ্বলে উঠল তার চোখ। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মা, ওকে ডাকো। ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

মুখ ঝুঁকিয়ে ঘরে ঢুকল দ্বীপী, ভয়ে তার বুক হাঁপর টানছে, সবার সামনে এসে বোবার চোখে তাকাল। তাকে দেখে ঝাঁঝিয়ে উঠল লহরী, ওই সময় তোর না গেলে কি চলত না? হওয়া কাজটা তোর জন্য সব ভেস্তে গেল।

দ্বীপী ভেবেছিল সে কিছু বলবে না, শুধু চুপচাপ শুনে যাবে, কিন্তু অসহ্য লাগতেই মৃদু স্বরে বলল, মা আমাকে বলল, যা সন্দেশগুলো দিয়ে আয়, আমি তাই ঢুকেছিলাম। যদি দোষ হয়ে থাকে তুই আমাকে ক্ষমা করে দে দিদি।

—ক্ষমা? কিসের ক্ষমা। তুই কোনো দোষই করিসনি। সব বুঝতে পেরে লহরী কান্নার মতো করে বলল কথাগুলো, ভালোই হয়েছে অমন সম্বন্ধ না হয়ে। ওরা তো রূপের পূজারী, মেয়েদের দুঃখ বুঝবে কি করে? যারা হৃদয়হীন হয় তাদের তো পাথরের সঙ্গে আত্মীয়তা করা উচিত। দ্বীপী, তুই এবার যা সূর্য এসেছে। ওর সাথে কথা বল।

বুকের ভার লাঘব হতেই দ্বীপী আকাশের দিকে তাকাল। তার চোখ ক্রমে ভরে যাচ্ছিল জলে। তার দুঃখটা যে কোথায় তা যদি সে সূর্যাক্ষকে বুঝিয়ে বলতে পারত।

রামনগর থেকে ফিরে এসে চুপচাপ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন কপোতাক্ষ। জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকছিল তবু কলকল করে ঘেমে যাচ্ছিলেন তিনি। মীনাক্ষী কাঁসার গ্লাসে জল এনে তার সামনে দাঁড়ালেন, কী গো, এত ঘামছো যে—।

—পেটটা পাকমোড়া দিয়ে উঠছে, প্রচণ্ড ব্যথা।

—এত সাইকেল চালালে ব্যথা তো হবেই। রামনগর তো কম রাস্তা নয়। মীনাক্ষী বুঝিয়ে বললেন, শরীর খারাপ যখন কদিন বিশ্রাম নিতে পারতে।

—বিশ্রামের কথা এখন ভাবলে অন্যায় হবে।

—শরীর পারছে না তবু তুমি দৌড়াবে!

—আমার উপর যে সম্মেলনের সব কিছু নির্ভর করছে। আমি বিছানা নিয়ে নিলে সব এলোমেলো হয়ে যাবে। কপোতাক্ষ বুঝিয়ে বললেন, বাইরের জেলা থেকে অন্তত একশ জন ডেলিগেটস আসবে। তাদের খাওয়া-থাকার সব কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। নাহলে আমাদের লোকাল কমিটির বদনাম হবে। জান তো এখনও সব কালেকশন করে উঠতে পারিনি।

পার্টি নিয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন মীনাক্ষী। এই পার্টি তাঁর এখন সতীনতুল্য। ঘরের খেয়ে মানুষটা বনের মোষ তাড়াক-এটা তাঁর পছন্দ নয়। পার্টির নেশা না তাড়ালে ঘরে আর শান্তি ফেরার কোনো আশা নেই।

পেটের ব্যথায় মাঝে মাঝে কাবু হয়ে যান কপোতাক্ষ। কালীগঞ্জের বড়ো ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বললেন, বেটার আপনি একবার সদরে গিয়ে দেখিয়ে নিন। পেট বলে কথা। অবহেলা করবেন না, প্লিজ।

সদরের ডাক্তার পাঁচরকমের পরীক্ষা করে বললেন, ভয়ের কিছু নেই তবে একটা অপারেশন করতে হবে। আপনার মাস খানিকের বিশ্রাম প্রয়োজন। আশা করছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

শুধু মীনাক্ষী নয়, কপোতাক্ষকে নিয়ে চিন্তায় আছে সূর্যাক্ষও। বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে সে কৃষ্ণনগর ছুটছে এটা-সেটা টেস্ট করানোর জন্য। দু'হাতে টাকা উড়ছে তবু ব্যথা কমার কোনো লক্ষণ নেই। সদর হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বললেন, অপারেশন মাস্ট। আগামী শুক্রবার আপনারা তৈরি হয়ে আসুন। দু'বোতল ব্লাড দরকার হলেও হতে পারে।

অপারেশনের দিন মীনাক্ষীকে হাসপাতালে নিয়ে এল বিদুর আর লাবণী।

সামান্য হলেও ওরাও ঘাবড়ে আছে। কপোতাক্ষর সুস্থ হওয়ার প্রয়োজন আছে গ্রামের জন্য।

এই গ্রামের কথা কেউ ভাবে না, একমাত্র তিনি ছাড়া। গ্রামের নিম্ন বর্গীয় মানুষরা তাঁর চোখের মণি, আরাধ্য দেবতা। এদের অবহেলা করলে নিজেকেই অবহেলা করা হয়।

একমাস পরে গ্রামে ফিরে এলেন কপোতাক্ষবাবু। সুস্থ হয়ে ফিরলেও তাঁকে আরও একমাস বিশ্রাম নিতে হবে। পেটে অপারেশনের কাটা দাগ, দু'মাস সাইকেল চালান বারণ। কথা না শুনলে বিপদ ঘটতে পারে যে কোনোসময়।

ঘুরে বেড়ান মানুষ, ঘরে বসে থাকলে ছটফট করে মন। হাঁপিয়ে ওঠেন তিনি, পুরনো বইয়ের পাতা ঘেঁটে তিনি খুঁজতে থাকেন সাম্যবাদের মন্ত্র।

সূর্যাক্ষ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়, বাবা, তোমার কোনো কাজ থাকলে আমাকে বলো, আমি করে দেব।

কপোতাক্ষ হাসেন, আমার কাজটা তোকে দিয়ে কি হবে রে? যার কাজ তাকেই করতে হয়, না হলে তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

—সে আমি জানি। তবু...

—তোর রেজাল্ট কবে বেরবে? ভালোভাবে পাশ করবি তো?

সূর্যাক্ষ মাথা নাড়ল, ভালোভাবে পাশ করলে আমি আরও পড়তে চাই। রুদ্রদার মতো আমারও ইচ্ছে কোলকাতায় গিয়ে পড়ব।

—সবই হত কিন্তু তোর জ্যাঠা আমাকে সর্বশ্রান্ত করে দিয়েছে। এখন যা আছে তাতে সংসারটা কোনোমতে চলছে। কপোতাক্ষ বোঝালেন, যদি কোলকাতায় পড়তে চাস তাহলে আমাকে জমি বিক্রি করতে হবে। আর জমিও তো বেশি নেই, বিক্রি করলে খাব কি?

মনোক্ষুন্ন হলেও নিরুত্তর থাকল সূর্যাক্ষ। ঘটনাটা সত্যি। নীলাক্ষ তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকিয়ে নিয়েছেন। তিনি এমনভাবে কায়দা করে ঠকিয়েছেন যাকে বলে পেছন থেকে চাকু মারা।

মন খারাপ হয়ে গেল সূর্যাক্ষর। পাশ করেই তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে চাকরির খোঁজে। চাকরি ছাড়া কোনো গতি নেই। গ্রামে পড়ে থাকলে হাঁড়ি ঠনঠনাবে। মায়ের দুঃখী মুখ সে দেখতে পারবে না। প্রাচুর্যের মধ্যে যাদের দিন কেটে গেছে হঠাৎ অভাবের ঝড় তাদের টলিয়ে দিলেও আভিজাত্যের রং চটে না। সূর্যাক্ষ চেষ্টা করবে আগের সেই সোনালী দিন ফিরিয়ে আনার। ধুলা মাখা গ্রামের মায়া ভুলে সে পাড়ি দিতে চায় শহরে। কষ্ট হবে, তবু কষ্টের মধ্যে থেকে সে খুঁজে নিতে চায় জীবনের রসদ।

গরমে আইঢাই করছিল চারপাশ। আগুন হাওয়া ধুলো উঠিয়ে নেয় শূন্যে, তারপর সেই লাটখাওয়া ধুলোকে আছড়ে ফেলে দেয় নির্জন কোন প্রান্তরে। গোল চক্করকাটা এই ধুলোকে অনেকে বলে ভূতঘূর্ণি। ছোট বেলায় ভূত ঘুরছে বলে ভয় পেত সূর্যাক্ষ। এখন আর সেই অবাস্তব ভয় মনের কোণে বিন্দুমাত্রও নেই।

এখন প্রায় রাতেই সূর্যাক্ষ স্বপ্ন দেখছে পরীক্ষার। কখনও ভয়ের কখনও বা আনন্দের সেই

সব স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন তো স্বপ্নই। দ্বীপীর কাছে গেলে পরীক্ষার চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা ওদের গ্রাস করে না। প্রায়ই দ্বীপী মুখ শুকনো করে বলে, আর ভালো লাগছে না রে, বড়ো হাঁপিয়ে উঠেছি। মনে হচ্ছে কোথাও ঘুরতে গেলে মনের এই গুমোটটা কাটত।

দ্বীপী ঘরে বসে থাকলেও সকালে-বিকালে টিউশনি করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সে নিয়ম করে পড়তে বসায়। দেবোত্তর বলেছেন, কাজের মধ্যে থাক, মন ভালো থাকবে।

মন ভালো না থাকলেও সময়টা দিব্যি কেটে যায়। গ্রামের টিউশনিতে পয়সা খুব কম। তবু যেটুকু উপার্জন হয় সেটুকুই এই অভাবের সংসারে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।

প্রথম মাসের টাকাটা দ্বীপী বাবার হাতে তুলে দিতে চাইলে দেবোত্তর স্মিত হেসে বলেন, মেয়ের উপার্জনের পয়সা আমি হাতে নেব না। তোর টাকা তুই সযত্নে গুছিয়ে রাখ। শুনছি—আর ক'দিনের মধ্যেই তোদের রেজাল্ট বেরবে, তখন টাকাগুলো তোর ভর্তির কাজে লাগবে।

সূর্যাক্ষ এলে দ্বীপীর মনে এক ঝাঁক টাটকা বাতাস হুটোপুটি লাগিয়ে দেয়। তার গুছিয়ে রাখা রক্ষণশীল মনটা এলোমেলো হতে শুরু করে। ভালোলাগার স্নায়ুগুলো অদ্ভুত দক্ষতায় দ্বীপীর সরল সুন্দর মুখে আনন্দের ঢেউ বইয়ে দেয়।

সূর্যাক্ষ পরীক্ষার কথা ভুলে দ্বীপীকে সম্মোহনী গলায় বলে, আমি শুনেছি, বেথুয়াডহরীতে ববি বই দিয়েছে। যাবি দ্বীপী?

শিবানী টকিজে সিনেমা দেখার মজাটাই আলাদা। দ্বীপী মাত্র দু'বার সিনেমা দেখেছে ওখানে। আর প্রতিবারই দিদিদের সঙ্গে। আগে দল বেঁধে মেয়েরা মাসের কোনো এক রবিবারে সিনেমায় যেত ঘটা করে। তার প্রস্তুতি চলত একমাস আগে থেকে। যে যার জমানো পয়সা নিয়ে আনন্দ করতে করতে চলে যেত সিনেমায়। পড়ুয়াদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। দ্বীপীর তাই যাওয়া হত না। মায়ের মন না ভিজলে অনুমতি পাওয়া যাবে না। এ কাজে মাত্র দু'বার সক্ষম হয়েছে সে।

সূর্যাক্ষর প্রস্তাবটা অন্তর দিয়ে লুফে নিল দ্বীপী। মনে হল তীব্র খরায় এ যেন হঠাৎ মুষল ধারায় বৃষ্টি। দ্বীপী তার আগ্রহ বশে রাখতে পারল না, ফুটন্ত দুধের মতো চঞ্চল হয়ে উঠল তার মন, হ্যাঁ রে সূর্য, কখন যাবি? খুব ভালো হয়। চল না রে—

—যাব বলেই তো তোর কাছে এলাম। সূর্যাক্ষর কণ্ঠস্বর হঠাৎ করে নিচু হয়ে এল, শোন, ঘরে সত্যি কথা বলে গেলে হবে না। বলবি দেবগ্রামে যাচ্ছি ফটো তুলতে। রেজাল্টের পর ফর্ম ভরার সময় কাজে লাগবে।

—ভালো যুক্তি। দ্বীপী লাফিয়ে উঠল।

সূর্যাক্ষ ওকে সতর্ক করল, আনন্দে কাঁসি হারিয়ে ফেলিস নে। যতক্ষণ না যাচ্ছি, ততক্ষণ কোনো বিশ্বাস নেই। যা বললাম—মনে থাকবে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বেশ মনে থাকবে। তুই কখন আমাকে নিতে আসবি?

—আমি ঠিক এগারটায় আসব। তুই খেয়ে-দেয়ে তৈরি থাকবি। সূর্যাক্ষ চলে গেল।

ঠিক এগারটার সময় সে এসে হাজির হতেই লহরী মুখ গম্ভীর করে বলল, তোরা কি ভেবেছিস বল তো? এখন আবার ফটো তোলার কি হল?

—ফটো না হলে কোনো কাজ হবে না, দিদি। এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জের কার্ড করাতে গেলেও ফটো লাগবে, আমি খোঁজ নিয়েছি। তাছাড়া—। সূর্যাক্ষ আরও কিছু ফিরিস্তি দিতে যাচ্ছিল লহরী বিরক্ত হয়ে তাকে থামিয়ে দিল।

ঊর্মি পাশে দাঁড়িয়ে বলল, সাবধানে যাবি। যা রোদ। দ্বীপীর তো রোদে বেরলে গলা শুকিয়ে যায়।

—তোমার কোনো চিন্তা নেই, ঊর্মিদি। আমি ওকে লেবু লজেন্স কিনে দেব। লেবু লজেন্স চুষলে গলা ভেজা থাকবে। সূর্যাক্ষ বুঝিয়ে বলল।

চন্দ্রিকার মন ছিল না মেয়েকে এভাবে একা ছাড়ার। ঊর্মিকে তিনি বলেছিলেন সঙ্গে যাওয়ার জন্য। দ্বীপী তা মেনে নেয়নি। মাকে বুঝিয়ে বলেছে, সেজদি গেলে আমাদের সবাইকে হেঁটে যেতে হবে। একটা সাইকেলে তিন জনের হবে না। সূর্য তিনজনকে নিয়ে এই রোদে সাইকেল চালাতে পারবে না। হাঁপিয়ে উঠবে ও।

দ্বীপীকে সমর্থন করল ঊর্মি। তা ছাড়া বোনকে নিয়ে দেবগ্রামে ফটো তুলতে যাওয়ার ইচ্ছে তার বিন্দুমাত্র ছিল না। শুধু শুধু সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে কোনো লাভ হবে না জেনে সে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি যাওয়ার জন্য।

ধুলো ওড়া দুপুরে সাইকেলের সামনের রডে পা ঝুলিয়ে বসেছিল দ্বীপী। সূর্যাক্ষর শরীরের স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল সে। এই সুখ আর ক'দিন তার ভাগ্যে লেখা আছে কে জানে। রেজাল্ট বেরলেই ছিটকে যেতে হবে দু'জনকেই। কার ভাগ্যে যে কি লেখা আছে কেউ জানে না। একটা দায়িত্বের ভূত সূর্যাক্ষ বয়ে বেড়াচ্ছে ক'মাস থেকে। পড়ার সুযোগ না পেলে ঘরে বসে সে কি করবে? চাকরি তো ছেলের হাতের মোয়া নয়, যে চাইলেই পেয়ে যাবে। চাকরির জন্য পড়াশোনার দরকার। এই সামান্য যোগ্যতায় কোথায় সে পা রাখবে? সাইকেল চালাতে গিয়ে নানান চিন্তায় টনটনিয়ে ওঠে সূর্যাক্ষের কপাল। হঠাৎ সাইকেল থেকে নেমে পড়ল সে। দ্বীপী অবাক চোখে তাকাল, কি হল তোর?

সূর্যাক্ষ সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে বলল, কিছু হয়নি। ঘরের কথা মনে পড়তেই মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল।

—কাকা কেমন আছেন? অনেকদিন তাকে দেখিনি।

—দেখবি কি করে? বাবাকে ডাক্তারবাবু সাইকেল চালাতে নিষেধ করেছেন।

—উনি যা মানুষ, এ নিষেধ তাঁর পক্ষে মানা তো খুব কষ্টের হবে।

—কষ্ট হলেও জীবনের জন্য তা মানতে হবে। সূর্যাক্ষ হঠাৎ পণ্ডিত বিলেরর পাড়ে সাইকেল থামিয়ে দ্বীপীর মুখের দিকে উদাস হয়ে তাকাল, জানিস দ্বীপী, আমার মনে হয় আর পড়া হবে না। বাবা বলছিল—আমাদের অবস্থা আগের মতো নেই।

—সে কি রে, তোদের এত জমিজমা বিষয় সম্পত্তি!

—সব জেঠু তাঁর নিজের নামে করে নিয়েছেন।

—এটা কি করে সম্ভব?

—সম্ভব। বাবা যা খামখেয়ালি মানুষ। সংসারের উপর একটুও নজর নেই। মা প্রায়ই রাগারাগি করে। মাকে এখন প্রায়ই কাঁদতে দেখি। এর আগে আমি কোনো দিন মায়ের চোখে জল দেখিনি। কথাগুলো বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে গেল সূর্যাক্ষ।

দ্বীপী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, চিন্তা করিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কোনো কিছুই আর ঠিক হবে না দেখিস! যা হারিয়ে যায়, তা আর চট করে কি পাওয়া যায় রে?

—আমি তো আছি, তুই ভাবছিস কেন? ঘোরের মাথায় কথাগুলো দ্বীপীর মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, না, বলছিলাম কি—তোর পাশে আমি সবসময় থাকব।

—সে তো তোকে থাকতেই হবে। প্রকাশ্য দিনের আলোয় জল সাক্ষী রেখে দ্বীপীর হাতটা চেপে ধরল সূর্যাক্ষ।

দ্বীপী হাতটা সরিয়ে নিল না, সরে এল আরও পাশে। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে সে বলল, তোকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে আমি জানি না।

—আমি জানি।

—তুই জানিস!

—হ্যাঁ।

—তাহলে বল।

—সব কথা বলা যায় না। কিছু কথা আছে যা ঝিনুকের পেটে মুক্তোর মতো লুকিয়ে রাখতে হয়।

—দ্বীপীর গলার স্বর মধুর হয়ে এল, আমারও কিছু কথা আছে—যা সময় এলে বলব।

কালীগঞ্জ বাজারে সাইকেল রেখে ওরা বাস ধরল বেথুয়াডহরী যাওয়ার। বারোটার বাসে ঠাসা ভিড় থাকে। তবু বসার একটা জায়গা পেয়েছে দ্বীপী। সূর্যাক্ষ বাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার মুখোমুখি। কালীগঞ্জ জায়গাটাকে সূর্যাক্ষের ভালো লাগে, হৈ-চৈ নেই অথচ সব কিছুই হাতের কাছে ছড়িয়ে আছে। এত বড়ো বারোয়ারীতলা আশেপাশে আর কোনো গ্রামে নেই। দোতলা পাকাঘরগুলো তাদের পুরনো ঐতিহ্য ধরে রেখেছে আজও। বাঁধের ধারে গম পেষা মেসিনের ঘড়ঘড় আওয়াজ এখনও কানে লেগে আছে সূর্যাক্ষর। অনেকটা রূপকথার মতো মনে হয় তার এই গ্রামটাকে। এই গ্রাম হাতে ধরে টেনে আনছে উন্নয়নকে। এর সংস্কারমুক্ত ভাবনাটা অনুভব করতে পারে সূর্যাক্ষ।

বাস ব্রহ্মাণীতলা ছাড়িয়ে যাবার পর নিজের সিট ছেড়ে দ্বীপীর কাছে উঠে এল ঐশী। ওর সারা গায়ে চিকেন পকসের দাগগুলো জন্মতিলের মতো বিছিয়ে গেছে। ডালডা ঘিয়ের চেয়েও উজ্জ্বল ত্বকে সেই ছিটিয়ে যাওয়া তিলগুলো অন্য একটা সৌন্দর্য এঁকে দিয়েছে। ঐশী ওর টানা চোখের ভ্রূ কুঞ্চিত করে সাদা শাপলার মতো হাসল, কোথায় যাচ্ছিস, দ্বীপী? আঃ, কত দিন পরে তোর সাথে দেখা হল! ঐশীর গলা কাঁপিয়ে ঝরে পড়ল আন্তরিকতার ঝর্ণা।

দ্বীপী মেয়ে হয়েও মুগ্ধ চোখে দেখছিল ঐশীর পেখমতোলা রূপ। শুধু সে নয়, বাসের প্রত্যেকেই চোরাচোখে ঐশীকে স্পর্শ করছিল বারবার।

পাল কোম্পানীর এই বাসটা কৃষ্ণনগর যাবে দেবগ্রাম ছুঁয়ে। এ সব নিয়ে কোনো ভাবনা ছিল না দ্বীপীর। সঙ্গে সূর্যাক্ষ থাকলে এসব তুচ্ছ ব্যাপারে সে বড়ো বেশি মাথা ঘামায় না।

ঐশী এতক্ষণ সূর্যাক্ষকে দেখতে পায়নি, চোখাচোখি হতেই আনন্দে টগবগিয়ে উঠল সে, ওঃ, তুইও এ বাসে আছিস, বাঃ কি মজা। দারুন ভালো লাগছে। কোথায় যাবি রে সূর্য?

—বেথুয়া। ফটো তুলতে।

—কি ব্যাপার হঠাৎ ফটোর দরকার পড়ল?

—এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জে নাম লেখাতে হবে। পাশ করার পর আমার ইচ্ছে চাকরি করার। সূর্যাক্ষ লাজুক গলায় বলল, ভাবতেই খারাপ লাগছে যে আর কোনোদিন আমার পড়া হবে না।

—হঠাৎ যে চাকরির কথা ভাবলি? ঐশীর গলায় চাপা জিজ্ঞাসা।

সূর্যাক্ষ উদাস হয়ে বলল, না ভেবে উপায় নেই ঐশী।

—আমি তো শুনেছিলাম তোদের অবস্থা গ্রামের মধ্যে ভালো।

—হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছিস। তবে সব শোনা কথা কোনো না কোনো সময় আর সত্যি থাকে না। সময়ের সাথে সাথে মানুষের অবস্থারও বদল ঘটে। সেই যে বলে না—নামে তালপুকুর, অথচ ঘটি ডোবে না। এর মানে এই নয় যে কথাটা মিথ্যে। আগে হয়ত তালপুকুরে ঘটি ডুবত,

এখন হয়ত ডোবে না। সূর্যাক্ষ বেশ ধীরে ধীরে ঐশীকে বুঝিয়ে বলল কথাটা।

ঐশী সমব্যথীর চোখে তাকাল, সব ঠিক হয় যাবে, ওই নিয়ে ভাবিস না। তোর সাথে কি দ্বীপী যাচ্ছে?

—হ্যাঁ, ও আর কার সাথে যাবে? এতদিন তো আমিই ওকে বয়ে বেড়াচ্ছি।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? দ্বীপীর সঙ্গে তোর কি কোনো—।

সূর্যাক্ষ হাত নেড়ে থামিয়ে দিল ঐশীকে, হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছিস। দ্বীপী আমাদের গ্রামের মেয়ে। আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়।

অপ্রস্তুত ঐশী আশেপাশে তাকাল। উত্তর শুনে লজ্জা পেয়েছে সে। তবু নিচু গলায় বলল, তোদের মেলামেশা দেখে আমি অন্যরকম ভাবছিলাম।

—এটা তোর অন্যায় নয়, সবাই ভাবে।

—তুই খুব ম্যাচিওরড হয়ে গেছিস। ঐশী ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসল।

—হব না, আঠার বছরে পা দিলাম। এখনও ছোট বললে লোকে নাক টিপে দেখবে দুধ বেরচ্ছে কিনা। সূর্যাক্ষ ভুঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল, আমার কথা বাদ দে এবার তোর কথা বল।

—আমার কথা? আমার কথা লম্বা কথা। বাসের মধ্যে বলা যাবে না। সবাই শুনছে। ঐশীর চোখের তারায় খুশির আলো নেচে গেল, গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, জানিস, ও এসেছে। এই বাসেই আছে।

—আকাশদা এসেছে? কই? দেখতে পাচ্ছি না তো?

—ড্রাইভার কেবিনে বসে আছে। নামলে দেখতে পাবি। ঐশীর সারা শরীরে খুশির ঢেউ। সে তার আবেগ বাঁধ দিতে পারল না কিছুতেই, আমার অসুখের খবর পেয়ে ও এসেছিল। তারপর পনের দিন থেকে ও আবার দিল্লি ফিরে গেল। এবার এসেছে—কোলকাতায় কি একটা কাজ আছে সেই জন্য। এতদূর এসে বাড়ি আসবে না তা কি হয়?

—তা ঠিক। তোরা এখন কোথায় যাচ্ছিস?

ঐশী হাসল, সিনেমায়। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী। দারুণ বই। যা গান আছে না!

—ওঃ! তুই কি এর আগে দেখেছিস?

—হ্যাঁ, মার সাথে একবার এসেছিলাম। আজ আবার ওর সঙ্গে আসতে হল।

উপায় নেই। ঐশী কেমন চোখে তাকাল।

সূর্যাক্ষ দেখল দ্বীপী মুখ ঘুরিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে। ফসল শূন্য মাঠে সাদা বক গায়ে থান জড়িয়ে বসে আছে। রোদ নৃত্য করছে তার সামনে। পুকুরের জলে মেঘ ভাসছে, কত রকমের মেঘ। দ্বীপী কি এসবই দেখছে নাকি অন্য কিছু ভাবছে। মেয়েদের কপালের রেখা কুঁচকে গেলে ওদের ভাবনার গভীরে হিংসা ঢুকে পড়ে। তখন আর স্বাভাবিক দেখায় না তাদের।

সূর্যাক্ষ দ্বীপীর ভাঙাচোরা মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য ঘাবড়ে গেল। আজকাল পান থেকে চুন খসলে রেগে যায় দ্বীপী। তখন ও যে কি বলে ঠিক থাকে না নিজেরই।

দ্বীপীর মাথা গরম হয়ে গেলে অস্বাভাবিক ব্যবহার করে। তখন ওকে কিছুতেই বোঝানো যায় না।

সূর্যাক্ষ ভয় পেয়ে আস্তে করে মুখ নামিয়ে ডাকল, দ্বীপী।

—এ্যাঁ! চমক ভেঙে দ্বীপী বাসের মধ্যে তাকাল, কিছু বলছিস?

—তোর কি ঘুম পাচ্ছে?

—ধ্যাৎ! দুপুরবেলায় আমি কোনোদিন ঘুমাই না বুঝলি?

—তা ঠিক। তবে অনেকের বাসে বসলে ঘুম পায়। বাসের দুলুনীতে ঘুমপাড়ানী ছন্দ আছে।

—কবিত্ব রাখ তো। দ্বীপী বিরক্তিতে উষ্ণ হয়ে উঠল।

ঐশী মুখ কাচুমাচু করে বলল, আমি হয়ত তোদের ডিস্টার্ব করে দিলাম।

—না, তা কেন? দ্বীপী জোর করে বলল, আজ কালের মধ্যে রেজাল্ট বেরবে। এই সময় সব পরীক্ষার্থীই ডিস্টার্ব থাকবে। রেজাল্ট বেরনোর টেনশানটাই আলাদা। বিডিও অফিস পেরিয়ে বাস বেথুয়াডহরীতে ঢুকল। ঐশী ঢিল ফেলা পুকুরের মতো চঞ্চল হয়ে উঠল, আমি যাই, ও নাহলে খুঁজবে।

ড্রাইভার কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল ঐশী। কে বলবে মাস তিনেক আগেও এই মেয়েটা অসুস্থ হয়ে মশারির মধ্যে বন্দী ছিল।

সপ্তাহের শেষে রেজাল্ট বেরিয়ে গেল সূর্যাক্ষর। দ্বীপী ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। দুর্ভাগ্য, সূর্যাক্ষ মাত্র দশ নাম্বারের জন্য ফার্স্ট ডিভিশন পেল না। মন খারাপ করে দেবগ্রাম থেকে ফিরে এল সে। খবরটা শুনে দ্বীপী নিজের আনন্দ চেপে সূর্যাক্ষকে বলল, রেজাল্টই সব কথা নয়, তুই ভালো ছেলে এটা সবাই জানে। মন খারাপ করিস না। তুই গম্ভীর হয়ে গেলে আমার চারপাশ গুমোট হয়ে ওঠে।

সূর্যাক্ষ চেষ্টা করছিল স্বাভাবিক হতে, কিন্তু পারল না। দ্বীপী কিছু বলার আগে কপোতাক্ষ বললেন, পাশ করেছিস আনন্দ কর। তোরা ইস্কুলের প্রথম সায়েন্সের ব্যাচ। সবাই যে রেজাল্ট করেছে তাতে ইস্কুলের সুনাম হবারই কথা।

—যেমনটা আশা করেছিলাম তেমন হল না, বাবা! সূর্যাক্ষর দীর্ঘশ্বাস বিচলিত করল কপোতাক্ষকে। তিনি সূর্যাক্ষকে শান্ত করার জন্য বললেন, আমি সেকেন্ড ডিভিশনে প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশ। তোর জ্যাঠার খবর তো সব জানিস। এরপরে তোর মন খারাপ করা অন্যায়। যা, টাকা দিচ্ছি দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে আয়। দ্বীপী তুই এখানে খেয়ে যাস। তুই আমাদের গ্রামের গর্ব। এই গ্রাম থেকে আগে কেউ ফার্স্ট ডিভিশন পায়নি। আজ তোর বাবা-মায়ের সব চাইতে আনন্দের দিন।

—আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি। মা-বাবাকে খবরটা দিয়ে আবার আসব। দ্বীপী সূর্যাক্ষর দিকে তাকাল, সূর্য, তুইও আমার সঙ্গে চল। আমাদের ঘরে গেলে তোর আর কোনো কষ্ট থাকবে না। মন ভালো হয়ে যাবে।

দ্বীপীর চলে যাওয়া দেখতে দেখতে সূর্যাক্ষর মনে পড়ল রঙিন প্রজাপতির কথা।

যে কোনো পাশের একটা শক্তি থাকে।

দেবোত্তর চক্রবর্তী দ্বীপীর পাশ করার সংবাদে খুশি হয়েছেন। চন্দ্রিকা মেয়ের চিবুক ছুঁয়ে বলেছেন, আমি জানতাম আমার সোনা মেয়ে কিছু একটা করবেই। তবে তোর এই পাশের পেছনে সূর্যর খুব হাত আছে। ও পাশে না দাঁড়ালে হয়ত এত ভালো রেজাল্ট তোর হত না।

দ্বীপী কৃতজ্ঞতার ঘাড় নাড়ল। দেবোত্তর চক্রবর্তী বললেন, সায়েন্স বইয়ের যা দাম, আমি

তো বই কিনে দিতেই পারিনি। বলতে গেলে মেয়েটা সূর্যর বই নিয়ে পড়েছে। সত্যি, সূর্য সাহায্য না করলে দ্বীপী হয়ত পাশ করত, কিন্তু এত ভালো নাম্বার পেত না।

চন্দ্রিকা সমর্থন করলেন এক বাক্যে। দেবোত্তর চক্রবর্তী গত চারদিন হল মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে ভাবছেন। মেয়েদের পড়িয়ে কি লাভ হবে, সেই তো পরের ঘরে তুলে দিতে হবে। পরমুহূর্তে অন্য ভাবনা তাকে ছিন্নভিন্ন করেছে। না, এসব কথার কোনো অর্থ হয় না এখনকার দিনে। দ্বীপীকে যে করেই হোক পড়াতে হবে। একটা গাছ বাড়ছে তাকে স্বাভাবিকভাবে বাড়তে দেওয়া উচিত। তার ডালপালা কেটে দেওয়া ঠিক হবে না।

দেবোত্তর চক্রবর্তী চন্দ্রিকাকে বললেন, দ্বীপীকে কলেজে ভর্তি করাব, এতে তোমার কি মত?

—এতে মতের কি দরকার। দ্বীপী পড়বে। জানি ভর্তি হতে গেলে অনেক টাকা লাগবে। আমার কিছু গয়না আছে, ওগুলো বেচে দাও। সহজ মনে চন্দ্রিকা বললেন।

—গয়না বেচে পড়ালে অন্য মেয়েদের কি দেবে? দেবোত্তর চক্রবর্তী কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, তিনটে মেয়েই তো আমাদের কাছে সমান। সবাই তোমার পেটে জন্মেছে, কেউ তো পিঠে আসেনি।

—হ্যাঁ, ঠিক। তবে... দুর্ভাবনায় কথা আটকে গেল চন্দ্রিকার।

দেবোত্তর চক্রবর্তী আক্ষেপের সঙ্গে বললেন, দেখি কি করা যায়! তবে কিছু একটা ব্যবস্থা তো হবেই।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লহরী আর ঊর্মি বাবা-মায়ের আলোচনা শুনছিল। লহরী স্বতঃস্ফূর্ত গলায় বলল, বাবা, আমাদের জন্য ভেবো না, দ্বীপীকে এগিয়ে যেতে দাও। আমরা কিছু করতে পারিনি। ও বড়ো হলে শুধু তোমাদের মাথা নয়, আমাদের সবার মাথা উঁচু হয়ে যাবে। গ্রামের মানুষ তখন বোনের জন্য আমাদের সমীহ করে চলবে।

—তা যা বলেছিস। দেবোত্তর ভরসা পেলেন। চন্দ্রিকা বললেন, আমি জানতাম তোরা এই কথা বলবি। আমার মেয়েরা যে অন্য ধরনের সেটা লোক জানুক।

সূর্যাক্ষ যাবে ফর্ম আনতে কৃষ্ণনগরে। গর্ভমেন্ট কলেজে ভর্তি হলে পড়ার খরচ একটু কম হবে। উইমেন্স কলেজটাও খারাপ নয়। শহর থেকে একু দূরে এই আর কি।

দ্বীপীর শরীরটা ভালো ছিল না। সূর্যাক্ষ বলল, তুই থাক। আমি যাচ্ছি। যদি ফর্ম দেয় তাহলে আমিও ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করব। তবে আমার যা নাম্বার তাতে অনার্স পাওয়া যাবে না।

চাকরি খোঁজার সময় দরকার। অতদিন ঘরে বসে থাকা কি ভালো দেখায়। মীনাক্ষী বলেছেন, তোকে পড়তে হবে সূর্য। ঘরে বসে থেকে বাবার মতো পার্টি করবি—এসব আমার সহ্য হবে না।

কপোতাক্ষ চুপচাপ শুনেছেন। ইদানীং মীনাক্ষীর মুখের উপর তিনি কোনো কথা বলছেন না। তাছাড়া মীনাক্ষী যা বলছে—সেটা তো তারও মনের কথা। ঘরের একমাত্র ছেলেটা পড়াশোনা না করে টো-টো করে ঘুরবে, বাউন্ডুলে হয়ে যাবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। চাকরি উঠোনে বাঁধা নেই যে যখন খুশি তাকে উঠিয়ে নিয়ে মনের বাসনা চরিতার্থ করা যাবে। চাকরি এক কুহেলিকা, কুয়াশা। তার জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন।

কপোতাক্ষ সূর্যাক্ষকে কাছে ডেকে বললেন, আজই কৃষ্ণনগরে গিয়ে ফর্ম তুলে নিয়ে আয়। তোর মায়ের কাছে টাকা রাখা আছে, নিয়ে যাবি।

—তাহলে চাকরি খোঁজার কি হবে?

—চাকরি তো মুখের কথা নয়, তার জন্য তপস্যার প্রয়োজন। কপোতাক্ষ বিরক্ত হলেন।

সূর্যাক্ষ সংকোচ না করে বলল, বাবা, তুমি তো কত মানুষকে সুগার মিলে কাজ পাইয়ে দিয়েছ, আমার জন্য একটু বলে দেখ না।

—এখন আর তা হয় না সূর্য। তাছাড়া নিজের জন্য আমি কারোর কাছে হাত পাতি নি। যারা চাকরি পেয়েছেন তারা তাদের নিজের যোগ্যতায় পেয়েছেন। সেখানে হয়ত আমার ভূমিকা ছিল সলতে পাকানোর। ম্লান হেসে কপোতাক্ষ ছেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন।

—তাহলে তুমি বলছ আমি কৃষ্ণনগরে যাব? সূর্যাক্ষ নিশ্চিত হতে চাইল।

—হ্যাঁ, অবশ্যই যাবি। তোর বাবা এখনও মরে যায়নি। তুই পড়। যতদূর মন চায়—তুই পড়। বেশ জোরের সঙ্গে কথাগুলো বললেন কপোতাক্ষ।

মীনাক্ষী তার সেই কথার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিলেন, তোর উপর আমাদের অনেক আশা। আমরা কখনও জোর করিনি তোকে ফার্স্ট ডিভিশনেই পাশ করতে হবে। তুই পাশ করেছিস এতেই আমরা খুশি। তুই মানুষ হ, এর বেশি আমাদের কিছু চাওয়ার নেই।

মীনাক্ষীর কথাগুলো সূর্যাক্ষের অন্তরে গিয়ে বিঁধল। কপোতাক্ষর জীবনযাত্রা সে নিজের চোখে কাছ থেকে দেখছে। শুধু মানিকডিহিতে নয়, আশেপাশের দশটা গ্রামে তাঁর সুখ্যাতি কানে এসেছে সূর্যাক্ষর। বাবার জন্য গর্ববোধ হয় তার।

ইচ্ছে ছিল সকাল সাড়ে সাতটার বাসে সরাসরি কৃষ্ণনগরে যাবে সে কিন্তু দেবগ্রামে বাস পৌঁছাতেই পেছনের একটা চাকা বার্স্ট হয়ে গেল। হুড়মুড়িয়ে সব যাত্রীরা নেমে এল চৌত্রিশ নাম্বার জাতীয় সড়কে।

বাস ছাড়তে ঘণ্টাখানেক দেরি হবে। ড্রাইভার কন্ডাক্টর চা খাবে। সকালের টিফিনটা দেবগ্রামে সেরে বাসে উঠবে। সূর্যাক্ষ ভাবছিল কি করা যায়, তখনই লিটন এসে তার পিঠের উপর হাত রাখাল, কোথায় যাচ্ছিস রে সূর্য?

—ফর্ম আনতে কৃষ্ণনগর যাব।

—বাঃ, ভেরি গুড। চল এক সাথে যাওয়া যাক। লিটন বলল, কলেজ মাঠে মিলিটারিতে লোক নেবে। আমি অতনু আর বীরু যাচ্ছি লাইন দিতে।

—তোরা আর পড়বি না? ফ্যাকাসে গলায় জিজ্ঞাসা করল সূর্যাক্ষ।

নিঃশব্দ হাসি খেলে গেল লিটনের ঠোঁটে, চাকরি পেলে কেউ আবার পড়ে নাকি? আকাশদাকে দেখলি না চাকরি পেয়ে দিল্লি চলে গেল। আরে, চাকরি হল দিল্লিকা লাড্ডু। এই দিল্লির লাড্ডু বাগাতে হবে বলে তো পড়াশোনা করা।

—তা ঠিক। তবে—।

—দেখ সূর্য, আমরা তোর মতন অত ভালো ছেলে নই। আমরা সো-সো। মিলিটারিতে না হলে পুলিশে ঠিক মাথা গলিয়ে দেব। এখন পুলিশের চাকরিতেও বিয়ে করা যায় বুঝলি? পাশ করার পর লিটনের কথা বলার গতিবেগ আরও বেড়ে গিয়েছে। সে নিজের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি এখন পাঁচ ফুট আট, ওজন সিক্সটি টু। চেস্ট থার্টি ফোর প্লাস। ছুটতে পারি, হাই জাম্প লং জাম্প মারতে পারি—তাহলে মিলিটারিতে যাওয়ার আর অসুবিধা কোথায়?

—তুই যা যা বললি, আমারও তো তাই আছে। সূর্যাক্ষ কপালে ভাঁজ ফেলে ভাবল, তাহলে তোদের সঙ্গে আমার যেতে আপত্তি কোথায়?

—তোর বাবা-মা মিলিটারিতে ছাড়বে? মিলিটারি মানে এক বুলেটে জীবন বাঁধা। বাড়ির একমাত্র ছেলে তুই। ডিসিশন নেওয়ার আগে ভালো করে ভেবে দেখ। লিটনের গলার স্বর অন্যরকম শোনাল।

সূর্যাক্ষ অস্থির হল না তার কথায়, শুধু অবজ্ঞায় ঠোঁট ওল্টাল, যুক্তি দেখিয়ে বলল, তুইও তো ঘরের এক ছেলে! তোর বাবা যদি তোকে পাঠাতে পারে তাহলে আমার যেতে অসুবিধা কোথায়?

—তোর বাবা শিক্ষিত। আমার বাবা মূর্খ। মূর্খ বাবারা মিলিটারি কি, পুলিশ কি তা বোঝে না। তারা দেশসেবা বোঝে না, বোঝে চাকরি।

—তাহলে তোর কি মত?

—মন চাইলে চল। আমি বাধা দেব না। লিটন ঠাণ্ডা মাথায় বলল, অবশ্য গেলেই যে হবে তার কোনো মানে নেই। হাজার হাজার ছেলে আসবে লাইন দিতে। মাপজোক ঠিক হলে একটা চান্স থাকবেই।

—তাহলে চল বাস ধরি। অতনু আর বীরুকে তো দেখছি না?

—ওরা বাথরুমে গিয়েছে। আসল বলে। চল চা খাই।

তখনই একটা বহরমপুর-কৃষ্ণনগর বাস এসে দাঁড়াল জাতীয় সড়কে। সূর্যাক্ষ অস্থির হয়ে বলল, থ্রু বাসে গেলে ভালো হত।

—তোর মাথা খারাপ? বাসে কেন যাব? যে পয়সা বাস ভাড়া দেব, ট্রেনে গেলে সেই পয়সায় হোটেলের খরচটা হয়ে যাবে।

—তার মানে?

—লালগোলা ট্রেন তো মামার ট্রেন। মামার ট্রেনে ভাড়া লাগে নাকি?

—যদি স্পেশাল চেকিং থাকে?

—ওসব আগে থেকে জানা যায়, বুঝলি? কলেজে ভর্তি হলে তুই ভেবেছিস আমি মাস্থলি করব—কখনো নয়। ডবলু-টি'তে যাব আর আসব।

—ডবলু. টি?

—ডবলু-টি বুঝিস না? উইদাউট টিকিট!

সূর্যাক্ষ চেহারায় বড়ো হলেও ওর ভেতরে একটা ভয় আছে। অন্যায় করা তার ধাতে সয় না। হয়ত এই কারণে দ্বীপী তাকে ভীরু বলে। তার ধারণায় ভীরু মানুষরা পাপ করতে গেলে হাজারবার ভাববে। ভীরুরা নির্ঘৃণ হতে পারে না, যার জন্য ওরা সবখানে সমালোচিত। সূর্যাক্ষ ঢোক গিলল। বীরু তাকে দেখে বলল, গুরু কি ব্যাপার? কানের পাশ দিয়ে তোর ফার্স্ট ডিভিশনটা বেরিয়ে গেল। তোর বাবা নিশ্চয়ই বহুৎ ঝেড়েছে তোকে।

—মোটেই না। প্রতিবাদ করল সূর্যাক্ষ।

বীরু কেমন মিইয়ে গেল, মাইরি বলছি—আমার বাবাটা না একটা মক্ষিচোষ। কোথায় পড়াবে, তা না ঠেলে পাঠিয়ে দিল লাইন দিতে!

অতনু বলল, আমার মনে হয় মেসোমশাই ঠিক করেছেন। তুই যা মাল, থার্ড ডিভিশনে পাশ করে কোথায় ভর্তি হবি?

—আরে শালা, আর্টসে থার্ড ডিভিশন পাওয়া আর সায়েন্সে ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়া একই কথা। ভাবিস না একেবারে বেফালতু। আমাদের জন্য বেলডাঙা কলেজের গেট খোলা আছে।

—এই নাম্বারে বেলডাঙাতেও চান্স হবে না।

—তুই দেখছি সবজান্তা দাড়িওয়ালা! চুপ কর বে। আজ যদি লাগিয়ে দিতে পারি তাহলে কিস্তিমাত। তাহলে আর কষ্ট করে বইয়ের পাতা ওল্টাতে হবে না। তখন শুধু থুতু লাগিয়ে টাকা গুনব।

বাস-স্ট্যান্ডের দোকানে চা খেল ওরা। উজ্জ্বল রঙের রোদ গড়াগড়ি খাচ্ছিল পথের ধুলোয়। মাত্র কয়েক হাত দূরে টেলিফোনের তারে কাক বসে ডাকছিল কা-কা স্বরে। সূর্যাক্ষর মনটা বিষিয়ে উঠছিল সেই ডাক শুনে।

সকালবেলায় চৌরাস্তার মোড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে মানুষের আনাগোনায়। দোকান-পাট গা ঝাড়া দিয়ে চেষ্টা করছে পথচারীর নজর কাড়ার। এ সময় শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি থেকে লরি বোঝাই হয়ে আনারস আসে। প্রমাণ সাইজের আনারসগুলোর স্বাস্থ্য চোখে লাগার মতো। লরি রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে মাল আনলোড করছে দু'জন কুলি। মালিক চিৎকার করে গুনছে আনারসের সংখ্যা।

কৃশানুর বারুইপাড়ায় ঘর। অল্প বয়স থেকে বিড়ি টেনে তার ঠোঁট জোড়া এখন সেদ্ধ করা পাঁঠার মেটের রং। জামার পকেট থেকে কলেজ বিড়ি বের করে সে জিজ্ঞাসা করল, খাবি নাকি?

দেখতে ধানী লঙ্কার মতো, গুণেও কম যায় না। সবার আগে হাত বাড়িয়ে দিল লিটন, দে, ধোঁয়া না গিললে পেট ফেঁপে যাচ্ছে। নেশা করার মহাফ্যাসাদ, মন আনচান করে।

বীরু বলল, বিড়ি রাখ। আজ একটা শুভ দিন। অন্তত আজকের জন্য সিগারেট খা। কি খাবি? নাম্বার টেন না চারমিনার?

—সিজার খাওয়াবি তো বল। পাছায় তুলো দেওয়া হতে হবে।

—ঠিক আছে, তাই খাওয়াব। দাঁড়া। বীরু রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল বটতলায়। আর একটু হলে একটা স্টেটবাস ওকে পিষে দিত। বীরু ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেল। ড্রাইভার অনুচ্চ স্বরে গালি দিয়ে বাস হাঁকিয়ে দিল কৃষ্ণনগরের দিকে। সিগারেট নিয়ে বীরু ফিরে আসতেই সূর্যাক্ষ ওকে ধমকাল, এখনই মায়ের ভোগে লেগে যেতিস! একটু সাবধানে রাস্তা পার হবি তো?

বীরু দোষ করেছে, তাই কোনো উত্তর করল না। অতনু বলল, বীরু চলে গেলে আমাদের কে সিগারেট এনে খাওয়াত বল তো? আর যাই বলিস—ওর মনটা কিন্তু ভালো। জান বাজী রেখে যেভাবে ও রাস্তা পার হল তাতে মনে হচ্ছে বীরুর চান্স একেবারে পাকা।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। পরিমল হাসতে হাসতে বলল। সকালবেলায় ঠাকুরের গান চালিয়েছে রেডিও দোকানের মালিকটা। গালে হাত দেওয়া শিশুর সাইনবোর্ডটা রোদে ঝকঝক করে হাসছে। পাশে একটা রেডিওর ছবি,তার নিচে বড়ো বড়ো করে লেখা মারফি রেডিও।

সূর্যাক্ষ দেবগ্রামে এলে এই সাইন বোর্ডটার দিকে একবার তাকাবেই। রেডিও দোকান থেকে ছিটকে আসা ধূপের গন্ধে ম-ম করছে বাসরাস্তা। পাশে হোটেলের মাছ ধুচ্ছে রান্নার জন্য। বাস-লাইনের লোকেরা ওই হোটেলের বাঁধা খদ্দের। একেবারে ঘরের মতো রান্না। ঢেকুর বা গ্যাস-অম্বল হবার কোনো সুযোগ নেই।

ওরা রাস্তা পেরিয়ে রিকশা-স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়াল। এখানে দাঁড়ানো মানে রিকশাওয়ালারা হাঁ-করে তাকাবে। আশ্চর্য, আজ আর ওদের দেখে রিকশাওলাদের কোনো উৎসাহ বা ডাকাডাকি নেই। ওরাও বুঝে গিয়েছে ওরা রিকশায় চড়ার পাবলিক নয়। এরা ফুটো পার্টি।

লিটন একটা ফাঁকা রিকশার দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হাসল, দেখলি ওদের আশায় কেমন জল ঢেলে দিলাম।

—আগে তো তুই এত খচ্চর ছিলিস না? সূর্যাক্ষ না থাকতে পেরে বলল।

হাসি থামল না লিটনের, গা ঝাঁকিয়ে বলল, আমি হলাম মানববিদ্বেষী। বুঝলি? গরিব হয়ে গরিবের মন বুঝি, তাই এই বিকৃত খেলা।

—চুপ কর। ধরনী ফেটে গিয়ে সীতার মতন পাতালে ঢুকে যাবি। অতনু খেঁকিয়ে উঠল।

পরিমল হঠাৎ করে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, ঐশী বেশি সুন্দরী না সীতা বেশি সুন্দরী?

চোখ বন্ধ করে কৃশানু উত্তর দিল, সীতা।

—কেন? পরিমল জানতে চাইল।

পরিমল সহজভাবে বলল, সীতা লাঙলের ফলায় উঠেছিল। লাঙলের ফলায় গোঁড়ি গুগলি খোলামকুচি ছাড়া আর কি ওঠে বল? মাটির মেয়ে ঐশীর মতো সাজার জিনিস পাবে কোথায়?

—ফাইন! বীরু শেষ পর্যন্ত আক্ষেপ করল, মাইরি, আমার জীবনের একটা সাধ পূরণ হল না। ঐশীকে দেখার পর ভেবেছিলাম ওর সাথে লাইন মারব। কিন্তু আমি বড়ো হওয়ার আগেই আকাশদা ওকে বুক করে নিল। তবে অসম লাভ। দুইয়ে দুইয়ে চার হবে কিনা ডাউট আছে।

—অসম ভালোবাসায় রোমাঞ্চ বেশি। লিটন বলল, গ্রামের ভালো ভালো মেয়েগুলোর সব বিয়ে হয়ে যাবে। আমরা শালা হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব। আর কপাল বাড়িয়ে দেব ভাইফোঁটা নেওয়ার জন্য। ছ্যাঃ, এটা একটা জীবন!

—তাহলে কি চাস তুই? পঙ্খীরাজ ঘোড়াসমেত রাজকন্যা? পরিমলের ঠাট্টায় রেগে গেল লিটন, তোর শালা মধ্যযুগীয় মনোভাব আর যাবে না। বাইরের বই না পড়ে পড়ে কুয়োর ব্যাঙ হয়ে গেলি! জীবনটাকে চাখলি কোথায়, যে স্বপ্ন দেখবি?

খোলা তরোয়ালের মতো চুপচাপ শুয়ে আছে টানা রেললাইন, রোদ ঝাঁপিয়ে পড়ছে আত্মহত্যার জন্য। রোদের এই স্বভাব নজর এড়িয়ে যায় সবার। দূরে তাল গাছ, রঘুনাথের ঝাঁকড়া চুলের মাথার মতো। সিগন্যাল পোস্টটা দাঁড়িয়ে আছে অলস ভঙ্গিতে। মাথা ঝুঁকিয়ে আছে বাধ্য ছেলের মতো। টিকিট কাটার ঘণ্টা হয়ে গেছে কখন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই লালগোলা ঢুকবে। সিগন্যাল হয়ে গেছে। ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম, কোনো আব্রু নেই তবু বেশ কিছু মানুষের ব্যস্ততা ঠেলে উঠল বুক চিরে।

সূর্যাক্ষ শেষবারের মতো টিকিট কাটার কথা বলতেই চরম গালি দিয়ে উঠল লিটন। লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিল সূর্যাক্ষ কিন্তু সঙ্গীরা মজা পেয়ে হেসে উঠল গলা ফাড়িয়ে।

লিটন বলল, তোর যদি টাকা সস্তা হয়ে থাকে আমাকে দিয়ে দে। আমার কাজে লাগবে।

সূর্যাক্ষ কোনো কথা বলল না, কিন্তু অপমানটা বিঁধে রইল ওর মনের ভেতর। পরিমল ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, বন্ধুদের কথায় কিছু মনে করতে নেই। মনটাকে জিয়ানো মাছের মতো লাভারের জন্য রেখে দিতে হয়। মন মরে গেলে এ জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে—মনে রাখিস?

—তুই দেখছি উত্তরকুমারের ডায়লগটা ঝেড়ে দিলি! লিটন হাসতে হাসতে বলল। পরিমল উৎসাহিত হল, এটা উত্তমকুমারের ডায়লগ নয় রে, এটা কালীগঞ্জ বাজারের ডায়লগ! সব জায়গার কিছু স্পেশ্যাল ডায়লগ থাকে।

—এই মনোযোগটা পড়াশুনায় দিলে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়ে যাতিস। তোর মধ্যে স্পার্টস ছিল। শুধু ব্রেক আর ক্ল্যাচ না থাকায় টসকে গেলি! লিটন বাহাদুরী নেওয়ার জন্য তাকাল। দুর্ভাগ্য তাকে কেউ বেশি গুরুত্ব দিল না।

অতনু এগিয়ে গিয়ে পাগলা চণ্ডীর দিকে তাকাল। কুণ্ডুলী পাকানো ধোঁয়া নজরে পড়ল তার। বুক হালকা করে বলল, এই, সাবধান ট্রেন আসছে। শোন, হুটোপুটি করবি না। সবাই মিলে এক কামরায় উঠব তাহলে চেকার আমাদের কিছু বলতে সাহস পাবে না।

লিটন বলল, টিকিট চাইলে বলবি স্টুডেন্ট। দেখবি তাহলে আর কিছু বলবে না।

—যদি আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চায়? সূর্যাক্ষ ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল।

সবাই মুখ শুকিয়ে আছে, লিটন বলল, বলবি ফার্স্ট ইয়ার। আইডেনটিটি কার্ড এখনো কলেজ থেকে দেয়নি।

—যদি বলে কোন কলেজে পড়ো—তাহলে?

লিটন সঙ্গে সঙ্গে বলল, বলবি কমার্স কলেজে। কমার্স কলেজের ছাত্রদের নাম আছে। ওদের চট করে কেউ ঘাঁটাবে না।

সূর্যাক্ষ কথাগুলোকে মুখস্থ করার চেষ্টা করছিল। একটা উত্তেজনা ধীরে ধীরে ছেয়ে যাচ্ছিল তার ভেতরে। অস্বাভাবিক গরম লাগতে সে বুঝতে পারল কপালে তার অবাঞ্ছিত ঘাম জমেছে।

নিজেকে স্বাভাবিক করার জন্য ক'পা এগিয়ে এল সে। ট্রেনের শব্দটা বাড়ছে ক্রমশ। টানা হুইসেলের শব্দ ভেসে আসছে। যেন মনে হচ্ছে বাঁশি থেমে গেলেই খেলা শুরু হবে।

কপালের ঘাম মুছে নিয়ে সিমেন্টের বেঞ্চিটার দিকে তাকাল সূর্যাক্ষ। অন্ধকার গায়ে মেখে তখনও ক'জন মানুষ বসে আছে ঝিম ধরে। ট্রেন আসছে বলে ওদের কোনো হেলদোল নেই। অদ্ভুত নির্বিকার ওরা।

মাটি কাঁপিয়ে ট্রেন ঢুকে আসতেই প্ল্যাটফর্মের ওপর বেড়ে ওঠা কলকে ফুলের গাছ থেকে উড়ে গেল জোড়া শালিক। ক'টা পাতিকাক চেঁচিয়ে উঠল তারস্বরে।

বাতাস নোংরা হয়ে উঠছে ধোঁয়া আর চিৎকারে। যেন ঝাল লেগেছে স্টিম ইঞ্জিনটার, শুধু ঝোল টানার হিসহাস শব্দ। ট্রেনের হ্যান্ডেল ধরতেই সূর্যাক্ষর মনে পড়ল দ্বীপীর মুখটা। যেন একটা রাজহংসী পুকুরের পাড়ে গায়ে রোদ লাগিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ট্রেন চলার শব্দে অদ্ভুত একটা ছন্দ আছে যা অক্ষয়কুমার বড়াল বা জসিমুদ্দিনের কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। চলমান বাংলার ছবি ট্রেনের জানলার ভেতর দিয়ে দেখতে দেখতে মনটা উদাস হয়ে যায় সূর্যাক্ষর। ভালো কিছু দেখলেই চকিতে দ্বীপীর মুখটা রূপালি কোনো মাছের মতো মনের জলাশয়ে ঘাই দিয়ে হারিয়ে যায়।

নানা ধরনের গল্পে মেতে উঠেছে লিটনরা, বিশ্বপ্রকৃতির খোলামেলা চেহারা দেখার তাদের ফুরসৎ নেই। রেল লাইনের দু-পাশে ফসলের মাঠ, ছোট ছোট ডোবা-পুকুর, বাঁশঝাড়, ঘরবাড়ি, গোরু-ছাগল, ঝোপঝাঁড় সব যেন শিল্পীর হাতে আঁকা নিখুঁত ছবি।

অনেকক্ষণ পরে লিটন তার সিট থেকে উঠে এসে সূর্যাক্ষর পাশে এসে বসল, কিরে, একা-একা গালে হাত দিয়ে কি ভাবছিস? সুকান্ত হয়ে গেলি নাকি?

সূর্যাক্ষর চমক ভাঙল, অপ্রস্তুত চোখে তাকাল সে; বাইরের দৃশ্যগুলো কত চমৎকার—তাই না বল? চোখ আটকে যায়, ভীষণ ভালো লাগে রে। কেমন সন্দেহের মন নিয়ে ঘোলাটে চোখে তাকাল লিটন, তারপর চিৎকার করে অতনুদের ডাকল, এ্যায়, দেখ রে, এ শালা সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গিয়েছে। দেখ মাইরি, কবিতা করছে।

শুধু অতনু নয়, পরিমল আর বীরু উঠে এল ওদের সঙ্গে। প্রত্যেকের ঠোঁটে লেপটে আছে শব্দময় হাসি। অতনু সূর্যাক্ষর চোখের দিকে ম্যাটম্যাট করে তাকাল, কি হয়েছে রে সূর্য? পাগলের মতো কি সব বলছিস শুনলাম?

—না রে, বাইরের দৃশ্য দেখতে ভালো লাগছে—তাই বলছিলাম। এরা না পেছনে লেগে মাথাটা খারাপ করে দেবে। সূর্যাক্ষ নিরীহ গলায় বলল।

অতনু হাসল না, বেশ গম্ভীর হয়ে গেল কথা শুনে, তোকে দেখছি গরীবের ঘোড়ারোগে ধরেছে। ভাইরে, এ রোগ বড়ো ডেঞ্জারাস! সারে না, বুকের ভেতরে টিবির জীবাণুর মতো বাসা বাঁধে। অবশ্য তোর দোষ নেই। তোর ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। তোর বাবা তো ঝোলা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় দেশোদ্ধারের জন্য।

অতনু এমন ভঙ্গিতে কথাটা বলল যে দুঃখ পেল সূর্যাক্ষ। সূর্যাক্ষ মুখ ফুটিয়ে কোনো প্রতিবাদ

করল না। প্রতিবাদ করে কি হবে? তাহলে ওরা বাক্যবাণে আরও অস্থির করে ছাড়বে। আসলে ওরা একটা ঘোরের মধ্যে আছে। জানে না কখন কি বলতে হবে।

লালগোলা মুড়াগাছা ছাড়ার পর ট্রেন পাত কাঁপিয়ে ছুটছে। বেথুয়াডহরীর জংগলমহল দুচোখ ভরে দেখল সূর্যাক্ষ। আহা, কত যে গাছ আছে ওখানে, যদি সব গাছের নাম সে জানত তাহলে দ্বীপীকে সঙ্গে নিয়ে গল্পের ছলে চিনিয়ে দিতে পারত। প্রকৃতির পাঠশালায় সে এখন নিতান্তই শিশুশ্রেণীর ছাত্র।

লিটন ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলল, আমরা কৃষ্ণনগর অবধি যাব না, বাহাদুরপুরে নেমে যাব। কৃষ্ণনগরে প্রায় দিন চেক থাকে। ওখানে নামা রিসকের হবে। ওখানকার মামাগুলো ভাগনেদের কোনো ক্ষমা করবে না। ধরতে পারলে ভাগনে আদরে একেবারে শ্রীঘরে ভরে দেবে। তাছাড়া যদি ম্যাজিস্ট্রেট চেকিং থাকে তাহলে তো আর কথা নেই। স্টুডেন্ট বলেও কেঁদে কেটে, হাতে পায়ে ধরে পার পাওয়া যাবে না। তোরা সব রেডি হয়ে নে, ধুবুলিয়ার পরই বাহাদুরপুর ঢুকবে।

সূর্যাক্ষ বোকার মতো আফসোস করে বলল, তাহলে খড়ো নদীর ব্রিজটা দেখা যাবে না?

—কেন, ওখানে কি তোর ইয়ে থাকে? দাঁত বের করে খিঁচিয়ে উঠল লিটন, এ মাইরি দেখছি একেবারে ভাবুক সাগর! কোনো বাস্তব জ্ঞান নেই। শালা, যারা মেয়েদের সঙ্গে বেশি মেশে তারাই দেখছি কেমন মেয়েলী হয়ে যায়।

লিটনের কথা বলার ভঙ্গিতে হাসির ফোয়ারা গড়িয়ে পড়ল ট্রেনের কামরায়। সেই হাসির ধাক্কায় মুখটা শুকিয়ে গেল সূর্যাক্ষর, কোনোমতে ঢোক গিলে সে বলল, বড়ো বকবক করছিস, দেখা যাবে। মেয়েরা না হলে ছেলেদের এক-পাও চলে না। মেয়েরা হল ছেলেদের ভিটামিন, অনুপ্রেরণা।

—এই রে, কি সব কঠিন কঠিন কথা বলছে, শুনলি? লিটন সবাইকে দলে টানতে চাইল।

পরিমল তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, ওসব অনুপ্রেরণা-ফেরনা এখনকার বাজারে আর চলে না। এখন ইয়াহিয়ার জামানা। ধরো আর জবাই করো। মেয়েদের সাথে মেশো, আর ব্লটিং পেপারের মতো মধু চুষে নিয়ে ছেড়ে দাও। এই তোরা ববি দেখেছিস, হাম তুম এক কামরা মে বনধ হো। পরিমল ঘাড় নাড়িয়ে বিশ্রি ভঙ্গিতে খি-খি করে হাসল।

লিটন না থাকতে পেরে বলল, তোরা মাইরি, একেবারে যাচ্ছেতাই। মেয়েদের নিয়ে এমন ভাবা অন্যায়।

—আহা রে, কোথাকার কোন রামমোহন এসে গেলেন? পরিমল খোঁচা মারতে ছাড়ল না, পিতামহ ভীষ্মের নাম শুনেছিস। মহাভারতে আছে পড়ে নিস। ওঁর জীবনে কত মেয়ে আসল, একটারও হাত ধরল না। একেবারে টাটা স্টিলের মতো ক্যারেকটার। যাই বলিস, লোকটার ক্যালি ছিল। সারা জীবন মেয়ে ছাড়া কাটিয়ে দিল। তোরা পারবি? তোদের বুকে অত দম নেই।

ধুবুলিয়া পেরতেই গেটের কাছে চলে এল ওরা। লিটন সতর্ক করে বলল, মোটে হড়বড় করবি নে। হড়বড় করলেই গড়বড়। শালা, লালগোলা ট্রেন হল অজগরের হাঁ-এর মতো, নিঃশ্বাসে টেনে নেয় মাইরি! একবার তলায় ঢুকে গেলে ডাইরেক্ট যমনগরের টিকিট কাটা হয়ে যাবে।

ট্রেনটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল বাহাদুরপুরে। মাঠের মধ্যে ছোট স্টেশন। কোনো আভিজাত্য নেই, মাঠকুড়োনী মেয়ের মতো সাদাসিধে। ডান পাশে নয়, বাঁ পাশের দরজা দিয়ে নেমে এল ওরা। প্ল্যাটফর্ম না থাকাতে নামতে বড়ো অসুবিধা। বিশেষ করে মেয়েরা নামতে গেলে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে রাস্তা, দুপাশে ঝোপঝাড় আর ঘাসহীন জায়গা। এখানকার মাটির

রঙ ঘিয়ে বর্ণ। অদ্ভুত দৃষ্টি আকর্ষণী ক্ষমতা রাখে এই রং। চোখে নেশা ধরায়। একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে পথের মাঝখানে শিবঠাকুর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সূর্যাক্ষ। একটা বাস এসে থেমেছে পাকা রাস্তায়। পিলপিল করে লোক ছুটে যাচ্ছে বাসটাকে ধরবার জন্য। কেউ উঠতে পারল, কেউ আবার পারল না। দূরে দাঁড়িয়ে এমন দৃশ্য দেখতে মন্দ লাগল না সূর্যাক্ষর। দৌড়াল না সে, ধীরে ধীরে হেঁটে এল রাস্তা পর্যন্ত। লিটন খোঁচা দিয়ে বলল, এমন হাঁটছিস যেন তুই ন'মাসের প্রেগনেন্ট। আজ তোর কি হয়েছে বল তো?

সূর্যাক্ষ হালকাচালে বলল, কি আর হবে? বলতে পারিস বাড়ি থেকে প্রথম একা একা বাইরে আসা। মনটা হঠাৎ করে খাঁচা ভাঙা পাখি হয়ে গেল, তাই মনের আনন্দে উড়ছি।

একটা স্টেটবাস এসে থামল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সাইন বোর্ডটার কাছে। হুড়মুড়িয়ে সবার সাথে উঠে এল সূর্যাক্ষ। বেশ লম্বা বাস। পিছনের সিটে বসার জায়গা পেয়ে গেল ওরা। বারুইপাড়ার কৃশানু হাতে টাকা নিয়ে কন্ডাক্টরের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলল অনেকক্ষণ ধরে, তারপর জোর করে হেসে বলল, কাকু, টিকিট না দিলেও চলবে। আমরা গভমেন্ট কলেজের মাঠের সামনে নেমে যাব।

জলঙ্গী নদীর ব্রিজটা বেশ সুন্দর। লোহার ব্রিজ দিয়ে ট্রেন গেলে বিয়ে বাড়ির ব্যান্ডপার্টির মতো ঝমর ঝমর শব্দ হয়। বাস যাতায়াতের ব্রিজটা যেন বোবা মেয়ে, শত অত্যাচারে ওর মুখে কোনো কথা নেই, শুধু পিষ্ট হওয়ার ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপে। হাত পঁচিশ নিচে জল কখনো কাজলাবরণ, কখনো বা স্বচ্ছ জলে হাবুডুবু খায় মেঘের সংসার। খুব ভালো করে দেখলে জলের শ্যাওলা-ভেজা শরীর মনটাকে আরও সবুজ করে দেয়।

মহিলা কলেজ থেকে দ্বীপীর জন্য ফর্ম নিয়ে সূর্যাক্ষ হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেল কলেজমাঠে। ছোটখাটো মেলার মতো ভিড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মাঠের উপর। সামনের চার্চটা মাথা তুলে স্পর্শ করতে চাইছে আকাশ।

প্রায় কুড়িটা যুবক ছুটতে ছুটতে মাঠের এক প্রান্তে গিয়ে থামল। ওরা হাঁপাচ্ছিল। ওদের মধ্যে প্রথম তিনজনকে বেছে নিলেন অফিসার। ওরা চেস্ট মেজারমেন্টের সেকশনে গিয়ে দাঁড়াল।

মাঠের মাঝখানে টাঙানো হয়েছে খাকি রঙের তাঁবু। এছাড়া রোদ আটকানোর জন্য মাঠের মাঝখানে পোঁতা হয়েছে বিরাট বৃত্তের রঙিন ছাতা। এর বড়ো, এত সুন্দর ছাতা সূর্যাক্ষ এর আগে দেখেনি। সত্যি, শহর কত আজব জায়গা, এখানে এলে কত কি যে দেখা যায়!

ছাতার নিচে টিনের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন জলপাই রঙের পোষাক পরা চারজন অফিসার। মোচসমেত মুখগুলোয় গাম্ভীর্য এবং কাঠিন্য যেন একটা মূল্যবান প্রসাধন। কেটলিতে করে চা-দিয়ে বেড়াচ্ছে জলপাই পোষাক পরা একজন সৈনিক। মাটির ভাঁড় ফেলার জন্য তাঁবুর সামনে রাখা হয়েছে অস্থায়ী একটা ডাস্টবিন। উচ্চতা মাপার মেজারিং বারটা রাখা হয়েছে তাঁবুর পাশে। ওর ঠিক হাত পাঁচেক দূরে ওয়েট-মেসিন। লাল রঙের একটা রেজিস্টার নিয়ে পেনের ঢাকনা খুলে বসে আছেন একজন ফৌজি অফিসার। লাইন দিয়ে একে একে এগিয়ে যাচ্ছে যুবকরা। ওদের গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। পরনে হাফ-প্যান্ট। কারোর পরনে আবার শুধু গেঞ্জি আর ফুলপ্যান্ট। একজন ফৌজি চিৎকার করে রিডিং বলছে, অন্যজন তা লিখে রাখছে রেজিস্টারে।

চেস্টে এক ইঞ্চি কম হওয়াতে বাদ চলে গেল অতনু। দৌড়ে বাদ গেল লিটন। পরিমলের ওজন কম দু-কেজি। পাকা কলা আর চিড়ে খেয়েও সে ওজন বাড়াতে পারল না। আক্ষেপে মাথার চুল আঁকড়ে বলল, পারলাম না! হেরে গেলাম। মাঠ জুড়ে জমে উঠেছে চাকরির খেলা।

এ-ও এক আজব খেলা যে খেলার কোনোদিন শেষ নেই। রান দিয়ে এসে গাছের ছায়ায় হাঁপাচ্ছিল সূর্য। পরপর তিনজন বাদ যাওয়াতে ওর মনটা খারাপ হয়ে আছে তখন থেকে। দশজনের মধ্যে দৌড়ে রান থেকে ছিটকে গেল লিটন। সেভেনথ হয়েছে সে। সূর্যাক্ষ সবার আগে, ফার্স্ট। ঘর থেকে বড়োগঙ্গার ঘাট রোজ সকালে দৌড়ে যেত সে। তারপর গঙ্গায় ডুব দিয়ে ভেজা শরীরে দৌড়ে দৌড়ে ফেরা। কোনো কাজ বুঝি বিফলে যায় না, আজকের ঘটনা তাই দ্বিতীয়বার প্রমাণ করে ছাড়ল।

মন খারাপ কাটিয়ে লিটন এল গাছের ছায়ায়, ওর চোখে-মুখে আর কোনো দুঃখ বা আফসোস নেই। সূর্যাক্ষর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, সাবাস বন্ধু, সাবাস! গ্রামের মুখ রাখলি তুই আর কৃশানু। আমরা পারলাম না, তার জন্য কোনো দুঃখ নেই। তোদের আনন্দটাই আমরা সবাই মিলে ভাগ করে নেব। সূর্যাক্ষর খারাপ লাগছিল, তবু সে জোর করে বলল, মন খারাপ করিস নে। তোদের জন্য হয়ত আরো ভালো চাকরি অপেক্ষা করছে।

—হাসালি! ওদের কি হবে জানি না, কিন্তু আমার কপালে চাকরি নেই। লিটন কষ্ট করে হাসল।

বিকেল ঢলছে পশ্চিমে, মাঠ ফাঁকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। মোট ত্রিশ জন এই মাঠ থেকে ট্রেনিংয়ে যাবে পুনেতে। অফিসার-ইন-চার্জ স্পষ্ট বাংলায় বললেন, যাদের নাম ডাকা হল তারা সবাই সিলেকটেড। বাড়িতে চিঠি যাবে। চিঠিতে সব জানতে পারবে।

সূর্যাক্ষ আর কৃশানুর পাশে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনল লিটন। মন খারাপের ঘোর কাটিয়ে সে বলল, চাকরিটা আমার খুব দরকার ছিল। ভেবেছিলাম চাকরিটা পেলে বাবাকে আর চুল কাটতে দেব না। মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক। ছ্যা!

খাঁ-খাঁ করছে মাঠ, বৃষ্টির কোনো দেখা নেই। ধুলোর ঝড়ে যেন ঢাকা পড়ে যাবে পুরো পৃথিবী। মাঠ থেকে ফিরে রঘুনাথের আর ভালো লাগছিল না কিছু। শেয়ালকাঁটা গাছের মতন মনটা এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে। হাতে টাকা না থাকলে পুরুষ মানুষের কিছু ভালো লাগে না, আঁধার হয়ে যায় দুনিয়া। নিজেকে হীন মনে হয়। চেয়ে চিন্তে আর যাই হোক, সংসার চলে না।

চুনারাম দিন দশেক হল উঠতে পারে না বিছানা ছেড়ে। গা-হাত-পা ফুলে গিয়েছে, শ্বাসকষ্টটা বেড়েছে প্রচণ্ড। কাশলে টিন পেটানোর শব্দ হয় বুকের ভেতর। সকালবেলায় রঘুনাথকে কাছে ডেকে বলল, দাদুরে, আমি মনে হয় আর বাঁচব না। খাসির মান্‌সো খেতে মন করচে, দেখ না যদি হাট থেকে আনতে পারিস।

গাঁয়ে খাসি কেটেছিল হপ্তাখানিক আগে। লাঠি নিয়ে কি একটা দরকারে চুনারাম গিয়েছিল গ্রামের ভেতর। রাস্তার ধারে কাটা খাসিটা তার লোভ বাড়িয়ে দেয়। ছাল ছাড়ান তাগড়াই খাসিটার সারা শরীরে তখন রক্তের ঘাম। থিরথির করে নড়ছিল লালচে মাংসগুলো। অদ্ভুত একটা গন্ধ এসে টোকা মারছিল নাকে। এমন চেনা গন্ধ জল এনে দেয় জিভে। যার খাসি সে হাড়-কৃপণ। মোটেও ধার দেবে না। এমন কি নাড়িভুঁড়িটা ফেলে দেবে, শ্যাল-কুকুর খাবে তবু হাতে তুলে

চুনারামকে দেবে না। আজকাল নাড়ি-ভুঁড়িও মানুষ কিনে নিয়ে যাচ্ছে। গরম জলে সিজিয়ে নিয়ে সাফ-সুতরো করে কাটলে একটা ভুঁড়িতে কমের উপর সের খানিক ছালচামড়া হবেই হবে। গোল আলু দিয়ে ঝোল রাঁধলে তার স্বাদও ভোলা যায় না।

গাঁ থেকে ফিরে এল চুনারাম, কিন্তু লোভটা তার সঙ্গে এল। দুপুরবেলায় ভাত আর কুমড়োর ঘ্যাঁট খেতে গিয়ে জবাফুলের চেয়ে টকটকে লাল মাংসর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তার, আর তখনি সেই অদ্ভুত গন্ধটা ছড়িয়ে গিয়েছিল তার চারপাশে। জিভে জল চলে এল তার।

রঘুনাথ পাশে বসে মুখ ঝুঁকিয়ে খাচ্ছিল। তখনই মাংসর গন্ধটা লোভে পড়ে বলে দেয় চুনারাম। তার এই আব্দার শুনে বিরক্তিতে ঠোঁট উল্টায় দুর্গামণি। রঘুনাথ খাওয়া থামিয়ে দাদুর মুখের দিকে তাকায়। শেষবেলায় নোলা বাড়ে মানুষের। চলে যাবার আগে আশ মিটিয়ে যেতে চায় সবাই।

যে করেই হোক সের খানিক মাংস আনতে হবে রঘুনাথকে। হাতে টাকা থাকলে কালই হাট থেকে মাংস কিনে আনত সে। কিন্তু টাকা না থাকলে মনের জোর তলানীতে গিয়ে ঠেকে। তাছাড়া এ বাজারে কেউ খালি হাতে ধার দেয় না। বাঁধের উপর হাবুল চোরের সঙ্গে দেখা হল তার সেদিন। হাবুল চোর আফসোস করে বলল, আর দিন চলছে না গো, এবার মনে হয় শুকিয়ে মরতে হবে। হাতে কাজ না থাকলে পুরো দেশ-দুনিয়া আমার কাছে মরুভূমি মনে হয়।

তখনই ঠিক হয় কাঁসারিদের বাড়িতে আজ রাতেই সিঁদ কাটবে রঘুনাথ। হাবুল চোর তার পাশে থাকবে সাহায্য করার জন্য। যা হবে আধাআধি ভাগ। চোরাই মাল জলপথে চলে যাবে কাটোয়ায়। সেখানে মাল বেচার কোনো অসুবিধা নেই। কাটোয়া হাবুল চোরের পুরনো জায়গা। মহাজনরা সব তার জানাশোনা।

সিঁদ কাটতে গিয়ে ঘরের চাল কাটল রঘুনাথ। পুরনো দিনের মাটির ঘর, দেওয়াল আড়াই হাত চওড়া। কাঁসারিবাড়ির মাটি যেন পাথরের খাদান।

শব্দহীন পায়ে এক বোঝা দড়ি নিয়ে খড়ের চালে উঠে গিয়েছিল রঘুনাথ। তেঁতুলগাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাবুল চোরের বুক এখন ধুকধুক করছে ভয়ে। বিড়ি ধরাবে সে ক্ষমতাও তার নেই। বিড়ির ধোঁয়া যদি কাঁসারি বুড়ার নাকে গিয়ে লাগে তাহলে কেস শুবলেট হয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার নব্বুই ভাগ সম্ভাবনা।

রাতের বেলায় রঘুনাথ কারোর কথা শুনতে রাজি নয়। হাবুল চোর ঘরের চালে ওঠার আগে কী যেন বোঝাতে চেয়েছিল তাকে, রঘুনাথ তার কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল, তুমি থামো তো ওস্তাদ, আমাকে চড়তে দাও। সিঁদ কেটে ঘরে ঢোকার চাইতে চাল কেটে ঢোকা আরও সহজ।

কথা হল কাঁসার থালা বাসন বস্তায় ভরে দড়ি বেঁধে উঠিয়ে দেওয়া হবে ওপরে, তারপর কুয়ো থেকে জল তোলার মতো টেনে তুলে নিলেই হবে।

আজ বেশি নয়, মাত্র দু'বস্তা হলে কাজ মিটে যাবে। চুনারামের জন্য খাসির মাংস এসে যাবে তার পরের দিন। শুধু মা শীতলবুড়ির দয়া চাই। তার দয়া ছাড়া গাছের পাতাও নড়বে না। রঘুনাথ ধার কাস্তে দিয়ে চাল কেটে দেয়াল বেয়ে কায়দা করে নেমে এল নীচে। বাদুড়ের চিৎকারে ঘাবড়ে গেল সে। এ ঘরটা দিনের বেলায় জমজমাট থাকে কর্মীদের ভিড়ে। সন্ধে সাতটার পর কাঁসা-ছিলা বন্ধ করে দেয় কাঁসারি বুড়া।

শুনসান ঘরে থরে থরে সাজানো কাঁসার থালা বাটি গ্লাস। ছাঁট কাঁসা ভরা আছে কুইন্টাল মাপের বস্তায়। ওদিকে নজর দিল না রঘুনাথ। ছাঁটের দাম কম, খাটুনির মূল্য পোষাবে না।

তার চেয়ে তৈরি জিনিস ঢের ভালো। রঘুনাথ ব্যস্ত হাতে ভরতে লাগল বাসন-পত্র।

এক বস্তা ভরে দড়ি ছুঁড়ে দিল কাটা চালের ভেতর দিয়ে। প্রস্তুত ছিল হাবুল চোর। সামান্য শব্দে সে খরগোসের মতো চঞ্চল হয়ে উঠল। চালের উপর উঠে গিয়ে দড়ি ধরে টান মারল।

ভারী বস্তা ওঠাতে ঘাম ছুটল হাবুল চোরের। তবু সে বহু কষ্টে বস্তা টেনে নিয়ে গেল তেঁতুলতলায়। ছেলেটার এলেম আছে বলতে হবে। এ লাইনে আর দু-পাঁচ বছর থাকলে ঝানু হয়ে যাবে। গাছের পাতা নড়া দেখে বুঝতে পারবে হাওয়া কোনদিকে বইছে।

দ্বিতীয় বস্তাটা ওঠাতে গিয়ে অসাবধানে হাত ফসকে পড়ে গেল মেঝেয়। আর একটু হলে রঘুনাথ চাপা পড়ত তার তলায়। কোনোক্রমে রক্ষা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে।

কিন্তু সেই স্বস্তির নিঃশ্বাস কাল হয়ে দাঁড়াল তার কাছে। কাঁসারিবুড়া বস্তা আছড়ে পড়ার শব্দে হৈ-চৈ না করে ধীর পায়ে এগিয়ে এল ঘরের দরজার কাছে। আগেভাগে ভেজান ছিল দরজা। হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে শেকল তুলে দিল কাঁসারিবুড়া। আশে-পাশের বাড়িতে গিয়ে মানুষ জনকে জাগিয়ে তুলল সে।

বিপদ বুঝে বস্তা ফেলে পালিয়ে গেল হাবুল চোর। রঘুনাথ দড়ির সাহায্যে চালের উপর উঠে এল কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ইঁট-পাথরের আঘাতে খড়ের চালে শুয়ে পড়তে বাধ্য হল সে। চারজন মিলে তাকে যখন খড়ের ছাদ থেকে নামাল তখন তার দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। মাথা ফেটে রক্তে ভরে গিয়েছে মুখ। চুঁয়ানো রক্ত জমাট বেঁধে লাল কেঁচোর মতো নড়ছে শরীরের কাঁপুনিতে। শুধু মাথা নয়, আঘাত জমাট বেঁধে আছে চোখের নীচে, ফলে বাঁ পাশের চোখটা নারকেল কুলের মতো ফুলে আছে মোটা হয়ে। কিছুটা জায়গা আম ছ্যাঁচার মতো ছেঁচে গিয়ে অনবরত চুঁইয়ে যাচ্ছে রক্ত। কালসিটে দাগটা অন্ধকারেও দেখা যায় স্পষ্ট।

রঘুনাথের দাঁড়াবার কোনো ক্ষমতা ছিল না, তবু অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় সে সুযোগ খুঁজছিল পালিয়ে যাওয়া যায় কিনা, কিন্তু কোনো উপায় না দেখে ভয়ে সে চোখ বন্ধ করে নিল সবার সহানুভূতি পাওয়ার জন্য। সহানুভূতি দূরে থাক রাত বাড়ার সাথে সাথে ক্রোধ বাড়ছিল মানুষের।

দু'জন মই নিয়ে এসে পায়ে দড়ি বাঁধল রঘুনাথের। সেই দড়ি ধরে টানতেই প্রায় দশ হাত উঁছু ছাদ থেকে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রঘুনাথ। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কাটা তালগাছের গুঁড়ির মতো গড়িয়ে গেল কিছুটা,তারপর এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেল। আর তখুনি শুরু হল শাবল আর লাঠির বেদম প্রহার। শেষ রাতের বাতাস কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠল রঘুনাথ। সেই চিৎকার পৌঁছে গেল সূর্যাক্ষর দোতলার শোওয়ার ঘরে। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল সে। ঘুম জড়ানো চোখে সে শুনতে পেল মানুষের স-উল্লাস চিৎকার, বুনো পাড়ার রঘু ধরা পড়েছে গো....।

একবার নয়, বারবার ভেসে এল সেই কর্কশ কণ্ঠস্বর। আতঙ্ক আর দুঃশ্চিন্তায় ঘুম ছুটে গেল সূর্যাক্ষর। টেবিল ল্যাম্পের সলতে উসকে সে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সতর্ক হতেই শুনতে পেল উন্মাদ মানুষের কণ্ঠস্বর, ঢ্যামনাটাকে শেষ করে দে। ওকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই। বড়ো হলে এ নির্ঘাৎ হাফিজ ডাকাত হবে।

শাবল আর লাঠির আঘাত শুরু হল পর্যায়ক্রমে। বাতাস বিদীর্ণ করে ভেসে এল আর্তস্বর, মরে গেলাম গো, আর মেরোনি গো-ও-ও-ও। মরে যাবো গো-ও-ও-ও। তবু প্রহারের শব্দ স্তব্ধ হল না।

সূর্যাক্ষ অস্থির হয়ে ছুটে গেল দরজার কাছে। পুকুরপাড়ে সময়মতো না পৌঁছাতে পারলে ওরা রঘুনাথকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। দশের মার একা সে কাঁহাতক সহ্য করবে?

দরজা খুলতে গিয়ে বাধা পেল সূর্যাক্ষ। রঘুনাথ ধরা পড়ার পর চিৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল

মীনাক্ষীর। কপোতাক্ষকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে ছুটে এসেছিলেন দোতলায়। শেকল তুলে দিয়ে নেমে গেছেন চুপিসারে। কেন না তিনি জানতেন আর একটু পরেই পুকুরপাড়ে বিচার করার জন্য হাজির হবেন নীলাক্ষ এবং সেই বিচার যে কত নির্মম হবে তা মীনাক্ষীর অজানা নেই। এ সময় ঘর থেকে সূর্যাক্ষ বেরিয়ে গেলে বিপদ আসন্ন। সূর্যাক্ষ বাধা দিলে মোটেও খুশি হবেন না নীলাক্ষ। এর প্রভাব এসে পড়বে দুটি পরিবারে। মীনাক্ষী দরজায় শেকল তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন। মনে মনে অনুতপ্ত হলেও তাঁর এই যন্ত্রণার কথা তিনি ঘরের মানুষটিকে ছাড়া আর কাউকেই বলে বোঝাতে পারবেন না।

দোতলা থেকে নেমে তিনি থরথর করে কাঁপছিলেন। কপোতাক্ষ বিস্ময়ে শুধোলেন, তোমার কি হল? তুমি কেন কাঁপছ?

—ওরা রঘুটাকে মেরে ফেলবে গো।

—মারুক। মেরে মেরে শেষ করে দিক। একটা চোরকে আমি কখনও সাপোর্ট দেব না। ওই অত রাতে রাগে-উত্তেজনায় সিগারেট ধরালেন কপোতাক্ষ। ধোঁয়া ছেড়ে সেই উড্ডীয়মান ধোঁয়ার কুণ্ডলির দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তখনই দোতলার দরজায় সজোরে ধাক্কা মারল সূর্যাক্ষ, মা, দরজা খোল। তাড়াতাড়ি দরজা খোল মা। ওরা রঘুকে মেরে ফেলবে। দরজা খোল। শুধু চোখ নয়, মীনাক্ষীর সমস্ত শরীর দুলে উঠল সেই বিধ্বংসী আওয়াজে। একটু বিলম্ব হতেই দরজাতে দুমাদুম লাথি মারছিল সূর্যাক্ষ। এরই মধ্যে ভেসে আসছিল রঘুনাথের প্রাণ কাঁপানো আর্তস্বর। কিছু মাতব্বর স্থানীয় মানুষ বদ্ধপরিকর তারা আজ রঘুনাথের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবেন—তাতে যদি থানা-পুলিশ হয় তো হোক। ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীকে আরও বেশি তাতিয়ে দিচ্ছিল নীলাক্ষবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, মেরে ফেল তোরা। জাতসাপের বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই। সুযোগ পেলে এ আবার ছোবল মারবে।

সূর্যাক্ষ দরজা খুলতে না পেরে পাগলের মতো হয়ে উঠল। সে চিৎকার করে বলল, মা, শেষবারের জন্য বলছি—দরজা খোল। যদি দরজা না খোল তাহলে ভোরবেলায় আমার মরা মুখ দেখতে পাবে। শুনে রাখো—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। মরব বলেছি যখন মরবই।

সূর্যাক্ষর এই হুমকি কানে যেতেই অস্থির হয়ে উঠলেন মীনাক্ষী। পরের জন্য নিজের সন্তানকে তিনি হারাতে চান না। সত্যি, এ কী বোকামি তিনি করেছেন? জোয়ান ছেলেকে ঘরে শিকল তুলে রাখা তার উচিত হয়নি। যৌবন এই পরাধীনতা মানবে না। আর ক'দিন পরে সূর্যাক্ষ বাড়ি ছেড়ে চাকরির জন্য ট্রেনিং নিতে মহারাষ্ট্রে চলে যাবে। ঈশ্বরের কৃপায় সব এখনও পর্যন্ত ঠিকঠাক চলছে। নিজের ভুলের জন্য মীনাক্ষী তা ধ্বংস করে দিতে পারেন না।

এখন আর দরজায় আঘাত করছে না সূর্যাক্ষ। শুধু ভোর রাতের বাতাসের বুকে বান মারার মতো কথাগুলো আছড়ে পড়ছে মীনাক্ষীর কানে। সেই হুমকিভরা কথা শুনে কপোতাক্ষর চোখ ভয়ে ছোট হয়ে এল। মীনাক্ষীকে ঠেলা দিয়ে তিনি বললেন, যাও, ঘরের শেকলটা খুলে দিয়ে আসো। মানুষের জন্য মানুষের মন কাঁদবেই। তুমি শেকল তুলে ভাবছ এটা আটকে দেবে? অসম্ভব।

মীনাক্ষী ত্রস্ত পায়ে উঠে এলেন দোতলায়। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে ফুঁসছিল সূর্যাক্ষ। হাত বাড়িয়ে শেকলটা খুলে দিতেই কাঠের দরজায় ঘটাং করে শব্দ হল। আর ঠিক তখন তীরের বেগে মীনাক্ষীকে উপেক্ষা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সূর্যাক্ষ।

ঘরের পেছনের বাঁশবাগানের পথটা সোজা চলে গিয়েছে পুকুরধারে। এক মুহূর্ত সময় আর

নষ্ট করতে চায় না সূর্যাক্ষ। রঘুনাথকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে। চুরি করার শাস্তি ও পাক, কিন্তু এভাবে কেন? মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিলে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে কতক্ষণ?

নীলাক্ষবাবু ঘাড় সোজা করে দাঁড়িয়ে আছেন পুকুরপাড়ে, তাঁর দু'হাত পিঠের নিম্নদেশে শক্ত করে ধরা। আটপৌরে ধুতি হাঁটুর নিচে লুটানো। গায়ে হাতওয়ালা ধবধবে গেঞ্জি। গেঞ্জির ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল নোংরা হয়ে যাওয়া মোটা পৈতেটা। পাকা গোঁফ নাচিয়ে তিনি নির্দেশ দিচ্ছিলেন, মার, মেরে শেষ করে দে। আর দেরি করিস না।

ভেঙে পড়া গাছের ডালের মতো সূর্যাক্ষ ছুটে গিয়ে সারা শরীর দিয়ে আঁকড়ে ধরল ক্ষত-বিক্ষত রঘুনাথকে। কাউকে কোনো সুযোগ না দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, খবরদার, ওকে তোমরা আর মারবে না। যদি মারতে হয় আমাকে মারো। দু'হাত বাড়িয়ে নিজের শরীর দিয়ে রঘুনাথকে প্রাণপণে আড়াল করতে চাইছিল সূর্যাক্ষ। যারা প্রহারের কাজে হিংস্র হয়ে উঠছিল তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নীলাক্ষবাবুর দিকে তাকাল।

নীলাক্ষবাবু এই উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য আদৌ তৈরি ছিলেন না। তিনি জানতেন বুনো পাড়ার রঘুনাথের সঙ্গে তাঁর ভাইপোর জানাশোনা আছে, কিন্তু সেই জানাশোনা যে এতদূর তলায়-তলায় বন্ধুত্বের জাল বিছিয়েছে সেটা তাঁর ক্ষুদ্রবুদ্ধির হিসাবের মধ্যে ছিল না।

ভাইয়ের সোমত্ত ছেলের গায়ে হাত তোলা যে উচিত হবে না এই সিদ্ধান্ত তিনি চোখ বুজে নিয়ে ফেললেন। প্রায় ঘণ্টাখানিকের প্রহারে রঘুনাথের উঠে দাঁড়াবার কোনো ক্ষমতা ছিল না। সূর্যাক্ষ পাগলের মতো রঘুনাথকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, ওঠ, রঘু—ওঠ। ঘর যাবি না? এখানে থাকলে এরা তোকে মেরে ফেলবে।

সূর্যাক্ষর কথাগুলো সম্ভবত কানে গিয়েছিল রঘুনাথের। রক্তে ঢাকা চোখ মেলে বহু কষ্টে সে তাকাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। তার চোখের পাতা যেন ইটের চেয়েও ভারী হয়ে গিয়েছে, তাই চোখ খুলতে গিয়ে রক্তমাখানো অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ল দু-চোখের কোণ ভিজিয়ে।

ওর শরীরের রক্ত মাটি ভিজিয়ে জমাট বেঁধে আছে পুকুরধারে। ভোর হয়ে আসছে। গাছের ডালে কাক-পক্ষীদের চিৎকার। পাশের কর্মকার বাড়ির হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকতে ডাকতে পুকুরধারে এসে রক্ত দেখে থমকে দাঁড়াল। মুখ নামিয়ে ওরা সেই জমাটবাঁধা রক্ত পুঁচপুঁচ করে খেতে লাগল। সূর্যাক্ষ চিৎকার করে হাঁসগুলোকে তাড়াতে গিয়ে দেখল জেদি হাঁসগুলো তখনও মন দিয়ে জমাট বাঁধা রক্তগুলো খেয়ে যাচ্ছে। শিউলিফুলের বোঁটার মতো ওদের ঠোঁটগুলো ভরে উঠেছে রক্তের দাগে। ভোরের কুসুম ফোটানো আলোয় রঘুনাথকে আঁকড়ে ধরে শেষবারের মতো গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সূর্যাক্ষ, খবরদার, তোমরা কেউ ওর গায়ে হাত দেবে না। যদি হাত দাও তাহলে পুরো গাঁয়ে আমি আগুন ধরিয়ে দেব।

আগুন শব্দটায় ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে। ভোরের বাতাস তাকে বুকে নিয়ে ছুটে যায় গাঙধারে। গাঙধার থেকে হলদিপোঁতা ধাওড়া হয়ে পণ্ডিত বিল। সেখান থেকে দোয়েম হরিনাথপুর হাটগাছা হয়ে একেবারে চৌত্রিশ নাম্বার জাতীয় সড়কে। ঢেউ ছুটতে থাকে গ্রাম পেরিয়ে শহরের দিকে। বাতাস পদাবলি গায়, আগুনের পদাবলি।